# ITIHAS ANUSANDHAN - 20

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ২০০৬

প্রকাশক ঃ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ ঃ
জেনিথ অফসেট
২০বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৪

# সূচীপত্র

## মূল নিবন্ধকারের অভিভাষণ



## বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ



## বিভাগ ঃ প্রাচীন ভারত

## বিভাগ ঃ মধ্যযুগের ভারত

## বিভাগ ঃ আধুনিক ভারত

### আর্থ সামাজিক - রাজনৈতিক ইতিহাস



### আন্দোলনের ইতিহাস

## আঞ্চলিক ইতিহাস

## চিন্তা-চেতনার ইতিহাস

**সাংস্কৃতিক ইতিহাস**



**সাহিত্য-কেন্দ্রিক ইতিহাস**



**নারী ইতিহাস**

## বিভাগ ঃ ভারত বহির্ভূত

### বাংলাদেশ

**বাংলাদেশ ব্যতীত**

# কলকাতার ইতিহাস রচনার সন্ধানে

## প্রদীপ সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের মত একটি সংস্থা কেন আমাকে মূল নিবন্ধ পাঠ করতে বলেছে তা আমি জানি না। যদিও পারিবারিক সূত্রে আমি বৈষ্ণব, তবুও বৈষ্ণব বিনয় না করেও বলা যায় যে ঐতিহাসিক হিসেবে আমি প্রতিষ্ঠিত নই। পরিমাণের দিক থেকে আমার লেখা খুবই কম। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি ইতিহাসকে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে আমার লেখাগুলিকে শুধু পরিমাণের দিক থেকে দেখা নাও যেতে পারে। যখন আমি ইতিহাসের ওপর লেখা শুরু করি তখন আমার অভিসন্ধি ছিল কি করে কম পরিশ্রম করে মোটামুটি সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা যায়।

পারিবারিক সূত্রে পরিশ্রম করার অভ্যেস আমার পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা পাইনি। আমার এক বন্ধু সমালোচক জন্ রসেলি আমার দ্বিতীয় বই 'ক্যালকাটা ইন্ আরবান হিস্ট্রী'-র সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন আমি যেন একটু শক্ত হাতে লিখি। অর্থাৎ আর একটু পরিশ্রম করি। এখনও পর্যন্ত তাঁর সেই আশা আমি পূর্ণ করতে পারিনি। যখন দেখি বাংলার লোক-ইতিহাস এবং আঞ্চলিক ইতিহাস সম্বন্ধে কত ভালো লেখা হচ্ছে তখন মনে হয় এই ধরনের উপাদানগুলি আমিও তো ব্যবহার করতে পারতাম। তবে একটি কথা বোধহয় আত্মরক্ষার জন্য বলা যায় যে আমিও খুঁজেছি এমন সব উপাদান যা আমার সময় ততখানি প্রথাগত ছিল না। এমনও হতে পারে যে সেই কারণে আমি কোনদিনও ঐতিহাসিকদের উচ্চশ্রেণীতে উঠতে পারিনি। প্রায় প্রান্তিক দিক থেকে আমি উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস রচনা দেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশীদিন কাজ করতে পারিনি।

এই কথাটির মধ্যে বোধহয় এক ধরনের শ্লেষ আছে যা আমি অর্দ্ধেকটা উচ্চারণ করছি। আসলে প্রান্তিক দিক থেকে ইতিহাসকে দেখার মত ক্ষমতাও আমার সীমিত। এই ধরণের ইতিহাস রচনায় যে সাহস এবং অনুভূতি প্রয়োজন তা যথেষ্ট পরিমাণে আমার ছিল না। তবে ইতিহাস সম্বন্ধে মমতা বোধহয় ছিল। তা নাহলে পুরানো একটি বাড়ি বা একটি দলিল দেখলে কেন আমার মনে এক ধরনের ভাবনা জেগে

উঠত। উত্তর কলকাতার পুরানো পাড়াগুলি কেন এত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হত। হাইকোর্টের দলিল-দস্তাবেজ যা অনেকে ধূলোর মত শুকনো ভাবে, তার মধ্যে কি রোমাঞ্চ পেয়েছিলাম বা এখনও পাচ্ছি।

বর্তমানে আমি দুটো প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত বা বিব্রত আছি। একটি হল বিশ শতকের প্রথমে কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। অন্যটি হল জাস্টিস্ হাইডের রেখে যাওয়া প্রায় সত্তরটি খণ্ডের কাগজপত্র। যার মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতের বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাত দেখা যায় এবং আঠারো শতকের কলকাতার সমাজের প্রতিফলনও চোখে পড়ে। প্রথম প্রকল্পের রূপরেখা হিসাবে দু'তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায় যা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি। দ্বিতীয় প্রকল্প অর্থাৎ জাস্টিস হাইডের ডায়েরি থেকে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, যা থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি 'overview volume' তৈরি করার কথা। এই দুটি প্রকল্প ভিন্ন ধরনের। তবে সামাজিক ইতিহাসের ঝোঁক দুটি প্রকল্পের মধ্যেই আছে। সামাজিক ইতিহাস বলতে আমি বুঝি নানা ধরনের এবং অনেক সময় টুকরো টুকরো উপাদান নিয়ে গড়ে তোলা এক ধরনের চিত্র সমষ্টি। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে এই চিত্রগুলির যোগসূত্র কি। বিশ শতকের কলকাতার ইতিহাসের চিত্রগুলি সম্বন্ধে আমার মনে হয়েছে একটি অসম্পূর্ণ মহানগরীর ধারণা। এই ধারণাকে ভিত্তি করে আমি এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বেথুন কলেজের বিশেষ অনুষ্ঠানে কিছু বক্তব্য রেখেছি। যে ধরনের উপাদান আমি ব্যবহার করেছি তা পরিচিত হলেও কোন নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী সংঘবদ্ধ হয়নি। যে পদ্ধতি আমি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছি তা আমার নিজের পুরানো বই 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল-আসপেক্‌টস্ অফ্ সোশাল হিস্ট্রি'-র প্রায় প্রাচীন এবং ভুলে যাওয়া একটি ধারা। এই ধারাকে আমি প্রায় ঠাট্টার সুরে বলতে পারি প্রাক্-উত্তর আধুনিক (pre-post modern)।

কিছুদিন আগে উত্তর-আধুনিক ধারার এক বিখ্যাত লেখক এবং প্রবক্তা আমাকে বলেছিলেন 'আপনি শুরু করেছিলেন বেশ, কিন্তু শেষ করতে পারছেন না।' অর্থাৎ বিশ্বায়নের যুগে আমাদের মত ব্যক্তিরা প্রায় অচল। কয়েক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভারতীয় অধ্যাপক আমাকে অনুযোগ করে বলেছিলেন 'প্রদীপ-দা আপনার প্যাকেজিং পাল্টাতে হবে।' আমার অনুরোধে তিনি কতগুলি গ্রন্থের তালিকা করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে দেরিদা-র গ্রন্থ ছিল। আমি কিছু পড়া এবং বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালি মস্তিষ্কে নব্যন্যায়ের ধারা থাকলেও আমি সুবিধে করে উঠতে পারিনি। সঙ্গত কারণে আমি আন্তর্জাতিক পণ্ডিত

সমাজ থেকে বিচ্যুত—যে সমাজের সঙ্গে একসময় আমার যোগ ছিল। এরজন্য আমি যে ক্ষুব্ধ তা বলতে পারিনা - তবে আর্থিক দিক থেকে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। অর্থের যে প্রয়োজন তা আমি বিশেষভাবে জানি এবং এই ব্যাপারে আমি নিছক পান্ডিত্যে বিশ্বাসী নই - যা সম্ভবত আমাদের পূর্ববর্তী ধারায় ছিল। সেই দিক থেকে আমি উত্তর-আধুনিক।

প্রশ্ন উঠতে পারে আমি কেন এইসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ইতিহাসের নিবন্ধে টেনে আনছি। আসল কথা হল ঐতিহাসিকের বক্তব্য — ইতিহাস পড়ার আগে ঐতিহাসিককে জান — আর একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলা যায় যে ইতিহাস ঐতিহাসিকের আত্মচরিত। অবশ্যই এই কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যায় না এবং দার্শনিক অর্থে ভাষাই চিন্তার পথে একটি বড় বাধা। তবে context-এর সঙ্গে মিলিয়ে কোন বক্তব্যের সামঞ্জস্য বোঝা যেতে পারে।

মূল নিবন্ধ লেখার একটি সুবিধা হল এর ওপর কোন প্রশ্ন করা যায় না অর্থাৎ এই নিবন্ধ প্রশ্নাতীত। তা না হলে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন ফলাও করে আত্মকথার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন হতে পারে এই কারণে যে আমাকে কোন কোন সময় প্রশ্ন করা হয়েছে আমি কি বলতে চাই। অর্থাৎ আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। তা না হলে 'ক্যালকাটা ইন্ আরবান্ হিস্ট্রি' নামে পুস্তিকাটি কেন শেষ হল হুতোম প্যাঁচার নস্কার একটি চিত্রকল্প দিয়ে অর্থাৎ প্যালানাথবাবু বড়লোকের ছেলে, সাঁতার জানতেন না তাই ডুবে মারা গেলেন। প্রভাত কুমার ঘোষ আমার ইংরেজি দেখে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমার অনুবাদে বাংলা গন্ধ আছে। এর মধ্যে কি একটু প্রশংসা আছে? তিনি কি এই বলতে চেয়েছিলেন যে আমার লেখায় প্রতিফলন ঘটেছে এক ধরনের বাঙ্গালি মেজাজের যা হতাশা এবং মজার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কয়েক বৎসর আগে লেখা আমার দু'টি রচনা 'To Be or Not to Be' এবং 'Currents of History - Calcutta' স্বাভাবিকভাবেই প্রায় সবাই লক্ষ্য করেন নি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন কথাই বোধহয় নেই। কিন্তু হতাশার চিহ্ন আছে। তার সঙ্গে আছে বোধহয় এক ধরনের আনন্দ যে বাঙ্গালিও ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে Bengal Renaissance-এর কথা বলা যেতে পারে। আমি কোন লেখায় 'রেনেসাঁস' শব্দ ব্যবহার করিনি। কেন জানি মনে হয়েছিল যে, আমার কম বয়সেই, আমরা যেন আমাদেরকে ইউরোপীয় ইতিহাসের মূলস্রোতের সঙ্গে নিজেদের যোগ করতে চাই। কিন্তু যদি কিছু ব্যক্তি এই রেনেসাঁসের ওপর বিশ্বাস করে সৃষ্টি করে থাকেন তবে আমি কোন তাত্ত্বিক আপত্তি তুলব না। এই তর্ক আমার কাছে

তাহলে অবান্তর। এমন হতে পারে আমার বাঙালি সত্ত্বা এত প্রবল যে আমি বিদেশে এবং প্রবাসে গিয়ে 'culture shock' পেয়েছি এবং এখনও পাই। আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি আমার এই বাঙালি সত্ত্বা কি বস্তু। ইতিহাসের অন্য অনেক প্রশ্নের মত এর কোন নির্দিষ্ট উত্তর নেই এবং এখানেই আমার ব্যর্থতা যে আমি ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই নি। যাঁরা এই উত্তর খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা ভাগ্যবান।

বিশ শতকের প্রথমে কলকাতা তথা বাংলার ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে অর্থনীতিবিদ্‌রা যাকে উন্নয়নশীলতা বলেন তার সম্ভাবনা এখানে ছিল। পুঁজি যদি অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে আবশ্যিক হয় তা হলে বাংলায় বৃটিশ পুঁজি, মাড়ওয়ারী পুঁজি, জমিদার পুঁজি, সাহা পুঁজি এবং সুবর্ণবণিক পুঁজি ছিল। তার সঙ্গে ছিল — আজ যাকে ইনফরমেশন্ টেকনোলজি বলা হয় — অর্থাৎ উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মান যা কোন কোন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে যোগ সাধন করেছিল। ১৯১৭-১৮ সালের Industrial Commission Report এবং সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অর্থাৎ স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে এর প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু সেই পুঁজি একত্রিত হতে পারেনি। বিনয় সরকার ক্লাইভ ষ্ট্রীট এবং কলেজ ষ্ট্রীটের মধ্যে যোগসাধনের কথা বলেছেন। এই ধরনের অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এবং শিল্পের যোগসাধন কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটলেও তা বেশিদূর এগোতে পারেনি। ব্যবসায়িক সংগঠনে এক সফল বাঙ্গালী উদ্যোগী ১৯৩৫ সালে একটি প্রতিবেদনে সহজ একটি হিসাব দেন। নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁর সমসাময়িক সমাজে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে তাঁর hard common sense এর জন্য তিনি চাপা প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বাংলায় ব্যবসায়ী উদ্যোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে একই ক্ষেত্রে অনেকগুলি ছোট ছোট সংস্থা থাকার ফলে কোন সংস্থার হাতে যথেষ্ট পুঁজি নেই এবং তার ফলে ব্যর্থ সংস্থার সংখ্যা খুবই বেশি। নলিনীরঞ্জন এর পর যা বলেছিলেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

Bengal's total investment as represented by the paid-up capital of joint stock companies had advanced from Rs. 58.5 crores in 1920-21 to Rs. 133.2 crores in 1933-34. During the same period however, Bengal's loss of capital on account of companies ceasing to function has reached the neighbourhood of Rs. 60 crores. There is a tendency to work in small groups and to run down even well-

established concerns on the filmsiest grounds was a serious drag on the prospects of Bengal's economic progress.

আমি অর্থনীতিবিদ নই এবং আমার পক্ষে বিশ শতকের প্রথমে কলকাতার অর্থনীতির বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আমার মূল উদ্দেশ্য হল কোন এক সময় সমাজ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সমসাময়িক মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি ভাবছে এবং কি ধরনের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আচরণ করছে, কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে বা হচ্ছে না তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। একে যদি মানসিকতার ইতিহাস বলা হয় তাতে আমার আপত্তি নেই। এই প্রসঙ্গে আমার লেখা প্রবন্ধ যা প্রকাশিত হতে পারে তার থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

'To an extent, in early twentieth century Calcutta, there was an efflorescence in various spheres of activity including small skill-based industries, research in natural science and humanities, the arts of entertainment such as the theatre and the cinema. But sometime there was a problem of sustainability. The twists and turns of Calcutta's and, in the broader perspective Bengal's history in the early twentieth century led to the catastrophic forties with famine, riots and partition. Few could imagine what was in store for the future. At the moment there were optimism and enthusiasm with occasional expression of anxiety - a kind of mentality characteristic of history may be in Bengal.

বিশ এবং তিরিশ দশকের কয়েকটি ধারা কলকাতাকে সম্ভাবনাময় করেছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে standard তৈরি হয়েছিল পরবর্তী দুই তিনটি দশকে তা কোন কোন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বলতা বা ঝঞ্ঝা সেই সাফল্যকে সংগঠিত হতে দেয়নি।

তিরিশের দশকের বিনোদন শিল্পের বিকাশ New Theatres এর মাধ্যমে হয়েছিল। আলাদা করে New Theatres- এর ইতিহাস লেখা যায় কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তা নয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আর্থিক সংগঠনের ক্ষেত্রে কলকাতায় সেই সময় যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। ভারতীয় সিনেমায় প্রথম নক্ষত্র ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। সায়গল এবং কাননদেবী ছিলেন প্রথম সঙ্গীত নক্ষত্র। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এঁরা জাগিয়েছিলেন তা আমাদের শৈশবেও লক্ষ্য করেছি। সমসাময়িক উপাদানে তা চোখে পড়ে। চূড়ান্ত সাফল্যের পর এল অবসাদ। অতিরিক্ত ব্যক্তি-নির্ভর ছিল এই সংস্থা এবং নিজের স্মৃতিকথায় বি. এন. সরকার

বলেছেন যে তাঁর আদর্শবাদিতা শেষ পর্যন্ত New Theatres- এর সংকট এনেছিল। প্রায় একই ভাবে দেখা যায় বাংলা থিয়েটারে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করে শিশির কুমার ভাদুড়ী আর্থিক অনটনের কাছে হার স্বীকার করেন। অর্থাৎ কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আদর্শ এবং দক্ষতার অভাব ছিল না। কিন্তু আদর্শবাদের স্রোতে কোন কোন সময় অসাধারণ ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জন করেননি। কলকাতার নগর জীবনের সাংগঠনিক দুর্বলতা নৃতত্ত্ববিদ নির্মল কুমার বোস পরে লক্ষ্য করেছিলেন এবং 'A Premature Metropolis' সম্ভবত সেই অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।

আমার দ্বিতীয় প্রকল্পের সঙ্গে প্রথমটির কি কোন মিল আছে? জাস্টিস্ হাইডের কাগজপত্রের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ ভারতের বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাত সম্বন্ধে যে পড়াশোনা আমরা করছি - আমরা বলছি তার কারণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর জন্য একটি কমিটি তৈরি করেছে - তার মধ্যে থেকে একটি প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসতে পারে। ঊনিশ শতকের শেষে ব্রিটিশ ভারতের এক প্রখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ - ফিটজেম্‌স স্টিফেন - ভারতে ইংরেজ অবস্থানকে এক 'belligerent civilization' -এর উপস্থিতি বলে বর্ণনা করেছেন। 'Colonial' বা ঔপনিবেশিক কথাটি সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু স্টিফেন এর ব্যবহার করা শব্দ দুটির অন্য একটি ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই 'civilization' কথাটির প্রাতিষ্ঠানিক তাৎপর্য আছে।

আমার প্রথম প্রকল্পে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতার খোঁজ পেয়েছি অর্থাৎ নগর সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে গিয়ে কলকাতার ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন কোন সময় বেশ কিছু এগিয়েও শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারেনি। এই 'যুদ্ধপ্রিয় সভ্যতা' প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কিছুকালের মধ্যে এক কাঠামো তৈরি করেছিল যার বিকল্প আমরা এখনও খুঁজে পাইনি। জাস্টিস্ হাইডের কাগজপত্রের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের প্রথম যুগে ইম্পে, হাইড এবং চেম্বার্স ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি হলেও নন্দকুমারের মৃত্যুদন্ড সম্বন্ধে দ্বিমত হননি। অর্থাৎ তাঁরা ইংরেজ আইন প্রবর্তন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। নন্দকুমারের মৃত্যুদন্ডের কিছুকালের মধ্যেই স্যার উইলিয়াম জোন্স তাঁর চার্জ টু দ্য গ্র্যান্ড জুরি শিরোনামায় ইংলন্ডের আইন ভারতে প্রণয়ণ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। ইংলন্ডের আইন তিনি সোজাসুজি ভারতে প্রয়োগ করতে চাননি। যে আইনগত কারণে নন্দকুমারের মৃত্যুদন্ড হয়েছিল ইংলন্ডের সেই statute তিনি ভারতে প্রয়োগ করতে চান নি। কিন্তু যেহেতু এই ব্যাপারে একটি কিংবা দু'টি precedent ছিল তাই তিনি ইংলন্ডের উচ্চতম বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছিলেন। উইলিয়াম

জোন্স-এর চার্জ টু দ্য গ্রান্ড জুরি সংখ্যায় মোট ছয়টি পাওয়া যাচ্ছে। হাইডের কাগজপত্রের মধ্যে তিনটি পাই। উইলিয়াম জোন্স-এর গ্রন্থ সঙ্কলন থেকে আরও তিনটি পাই। আমরা এই বক্তব্যগুলি বোঝার চেষ্টা করছি। কোন কোন জায়গায় আইনের বিশেষ করে আঠারো শতকের ইংরেজি আইনের তত্ত্ব বোঝা মুস্কিল হচ্ছে। কিন্তু জোন্স-এর একটি স্থির লক্ষ্য থাকার জন্য সামগ্রিক ভাবে তাঁর বক্তব্য বোঝা যায়। এই লক্ষ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক। একটি জঙ্গী সভ্যতাকে তিনি মডারেট করে স্থান, কাল পাত্রের উপযোগী করতে চান কিন্তু সেই সভ্যতার কেন্দ্র হল ইংলন্ড যদিও পারিবারিক সূত্রে জোন্সকে ওয়েলস্‌ম্যান বলা যায়।

জোন্স-এর বক্তব্য থেকে একটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে আইনের ক্ষেত্রে তুচ্ছ জিনিষেরও গুরুত্ব আছে। জাস্টিস্ হাইডের কাগজপত্র তুচ্ছ ঘটনায় ভরা। যেমন, Larceny, Petty larceny, grand larceny ইত্যাদি। একটি খণ্ড পেয়েছি যাতে ১৭৭৮- ৭৯ সালের ছোট ছোট অপরাধ এবং তার শাস্তির ওপর রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। যেমন ১৭৭৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর জানানো হচ্ছে — 'Nancy against Tom for stealing her peticoat this stolen from her window... about 2 months since and was yesterday found upon Tom who can give no satisfactory account how he came buy it. Ordered him 5 Rattans.' অর্থাৎ বিশেষ ধরনের বেত। আর একটি হল Flooa against Sooagey for stealing her cowrees acknowledged by the defendant. Ordered her 10 slippers. এই ধরনের প্রায় দুশোটি কেস্ একটি খণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে। তার থেকে আমরা আশীটি সংকলন করেছি। কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ড বলব না সম্ভবত আন্ডারবেলী সম্বন্ধে এখানে টুকরো টুকরো ঘটনা বা ছবি পাওয়া যায়। ইংরেজি আইনের ধারণায় রাম যদি কলকাতায় কোন অপরাধ করে পাঁচটা জুতো খায় তবে রামস্বামী কন্যাকুমারিকায় ওই ধরনের অপরাধে একই দন্ডে দন্ডিত হবে। অর্থাৎ আইন হবে ইউনিফর্ম যা ইম্পে দৃঢ়স্বরে বলেছেন। Equity-র ক্ষেত্রে আইনের ব্যখ্যার কিছুটা হেরফের হতে পারে বলে উইলিয়াম জোন্সও সাবধান।

'হিন্দু' শব্দটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ 'Hindu Law' - এর মাধ্যমে ঘটেছে। তথাকথিত Hindu Law প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বিপুল উপাদান দেখা যায় তার সূত্রপাত হাইডের কাগজপত্র লক্ষনীয়। শাস্ত্র বা পান্ডিত্য নির্ভর হিন্দু আইন ক্রমশ anglo-sastric বা ইঙ্গ-শাস্ত্রীয় আইনে পরিণত হচ্ছে। ১৮০০ সালেই একটি বিখ্যাত মামলা গোপীমোহন দেব বনাম রাজকৃষ্ণ দেব পন্ডিতদের মত ছাড়াই নিষ্পত্তি হয়েছিল।

এই মামলাটি আমরা হাইডের কাগজপত্রের বাইরে সুপ্রীম কোর্টের কেস্‌গুলির একটি সংকলন থেকে নিয়েছি।

জাস্টিস্‌ হাইডের কাগজপত্রের ওপর কাজ আমার অন্যান্য রচনা থেকে আলাদা হবে। এই কাজ হল ইংরেজ সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যায়ের ইতিহাস যা মূলত প্রাথমিক উপাদান এবং দলিল নির্ভর। যে কমিটি এই কাজের তদারক করছে তারা নিশ্চয়ই আমার খেয়ালখুশি মত ইতিহাস লিখতে দেবে না।

# প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-চর্চা, ঐতিহাসিক ও সমাজ-পরিবর্তন: প্রসঙ্গ শ্রী রমেশ চন্দ্র দত্ত

চিত্ররেখা গুপ্ত

(১)

'পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ' 'প্রাচীন ভারত' বিভাগের 'সভাপতি' হিসাবে আপনাদের সামনে আমাকে কিছু বলবার সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত।

একটা গল্প বলি। শুনেছিলাম সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মুখে। তাঁরা ট্রেনে করে যাচ্ছেন। নানা গল্প হচ্ছে। হঠাৎ এক সহযাত্রী জিজ্ঞাসা করে বসেন, 'আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?' ব্যক্তিগত প্রশ্নে বিরক্ত সৌমেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'দু'টি'। আবার প্রশ্ন, 'তারা কি করে?' এবার গল্পের ঢঙে তিনি উত্তর দিলেন। 'ওদের মধ্যে যেটা চালাক-চতুর তাকে করেছি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, আর যেটা শান্ত-শিষ্ট তাকে রাষ্ট্রপতি'। তখন গল্পটি শুনে হেসেছিলাম আর শিখেছিলাম, ব্যক্তিগত কথা স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ নয়। গল্পটা তাই মনে হয় ভুলিনি। পরবর্তীকালে মনে হয়েছে, এই গল্পের মধ্যে আছে ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের সংলাপের মূল কথাও। ঐতিহাসিক ইতিহাসকে কথা বলাতে চান, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা যদি অর্থবহ না হয় তাহলে সেই ইতিহাস চর্চায় কোন ফল হয় না।

আমার শিক্ষকতা জীবনে অনেককে বলতে শুনেছি, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার বর্তমান কোন উপযোগিতা নেই। এমন একটা ধারনার ফলেই বোধহয় ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক যুগের ইতিহাস পড়তেই আগ্রহী হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মত ঐতিহ্য নির্ভর দেশে, যেখানে শিক্ষার অগ্রগতি এখনও যথেষ্ট কম, সেখানে জন-জীবনকে গড়তে ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার ও তার প্রসারের যে প্রয়োজন আছে তা মহাকাব্যের কাল্পনিক চরিত্রের উপর দেবত্ব আরোপ, তার জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক আর বিরোধের ঘটনা থেকেই বোঝা দরকার। প্রাচীন ভারতবর্ষ আজও আমাদের মধ্যে সজীব থাকতে বাধ্য। তাই প্রাচীন-ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার মূল্য কমবে না, কিন্তু যোগ্য হাতে সে দায়িত্ব না থাকলে ঐতিহ্য বা

পরম্পরার বিশ্লেষণে ভুল থাকতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন রোমিলা থাপার।[১]

প্রাচীন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইতিহাসের চর্চাও যখন কোন ঐতিহাসিক করেন, তখন তিনি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন বর্তমান সময়ে। সমকালীন সমস্যাতেই আলোড়িত তাঁর মন। এই সমকালীন সমস্যার প্রেক্ষাপটেই অতীতের দিকে তিনি তাকান।[২] আর, তখনই সেই বৌদ্ধিক আলোচনা ফলপ্রসূ হয়ে সমাজকে পথ দেখায়। নইলে ইতিহাস, তা যে পর্বেরই হোক, বন্ধ্যা, অর্থহীন।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও ইতিহাস, ঐতিহাসিক ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝবার জন্য আমি এই প্রবন্ধের পরিসরে বেছে নিয়েছি উনবিংশ শতকের এমন একজনকে যিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার একজন কর্ণধার হয়েও সাহিত্য-সাধনা ও সমকালীন ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায়ও আগ্রহী হয়েছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। উনবিংশ শতকে প্রাচীন-ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যদি হয়ে থাকেন প্রত্ন-উপাদান নির্ভর ইতিহাস-চর্চার অগ্রপথিক, রমেশচন্দ্র দত্তকে বলা যেতে পারে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। রাজেন্দ্রলাল সামাজিক ইতিহাস লেখেন নি তা-নয়, কিন্তু রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তফাৎ সামগ্রিক ভাবে প্রাচীন ভারতের সমাজকে দেখার ক্ষেত্রে। দু'জনেই উপাদানের অপ্রতুলতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে প্রাচীন ভারতীয় লিখিত উপাদানের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে, রাজেন্দ্রলালের পক্ষে যে ভাবে উড়িষ্যা বা বুদ্ধগয়ার প্রত্ননিদর্শন পর্যালোচনার সুযোগ ছিল, শাসন-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকায় রমেশচন্দ্রের সেভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে জড়িত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও রমেশচন্দ্র মূলত পুস্তক নির্ভর। তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ। রাজবৃত্তে নয়, তিনি ইতিহাসকে খুঁজেছেন সমাজ বিবর্তনের ধারায়। " ..........কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর মনুষ্যসমাজ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, এবং ক্রমশ যে উন্নতি লাভ করা যায় তাহা এক একটি বিশেষ যুগে যেন সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে বিকশিত হইতেছে"।[৩] তিনি যেভাবে ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে যুগ বিভাগ করেছেন এখন আমরা তা আর মানি না. কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-ধর্মের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস জানার যে প্রক্রিয়ার কথা তিনি বলেছেন তা এখনও সত্য ইতিহাস বলে মান্য। তাই রমেশচন্দ্রকেই আলোচনার কেন্দ্রে রেখে দেখব প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরা বা ঐতিহ্য-সম্পর্কিত ধারণা এই

ঐতিহাসিকের মাধ্যমে কি ভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাঙ্গালী-সমাজে উপস্থাপিত হয়েছিল।

আধুনিক যুগে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাত ১৭৮৪ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপনের মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্বে শুরু হল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ ও আলোচনা। ১৭৮৯ সালে উইলিয়াম জোন্স অনুবাদ করলেন কালিদাসের শকুন্তলা নাটক। শুরু হল মূল্যবান ইতিহাস-জিজ্ঞাসা। জোন্স সংস্কৃত ও কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়ে যে উক্তি করেন তা থেকেই আর্য-সমস্যার ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার সূচনা।[৪] এই আর্য-সমস্যার অনুষঙ্গ ধরেই এল ভারতবর্ষের বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা।

এ ছাড়া শকুন্তলা নাটকটি ঘিরেই শুরু হল ভারতীয় নারীর আদর্শ নির্ধারণ। শকুন্তলার মধ্যে Orientalists রা খুঁজে পেলেন আর্য-নারীর আদর্শ-সারল্যে, সৌন্দর্যে, প্রকৃতির কোলে লালিতা অপরূপা এক নারী। ইউরোপে উনবিংশ শতকে শুরু হয়েছে নারীবাদী আন্দোলন। ধাক্কা খাচ্ছে মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও চিরাচরিত জীবনযাত্রা। শকুন্তলার মধ্যে ঐতিহাসিকরা, বিদগ্ধজনেরা দেখতে পেলেন সেই নারীকে যে পুরুষের রোমান্টিক কল্পনাকে আনন্দ দেয়। তাই শকুন্তলাকেই আদর্শ-নারী-প্রতিমা হিসেবে তুলে ধরা হল।[৫]

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের এই প্রাথমিক জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে দেখা যেতে পারে রমেশচন্দ্রের চিন্তায় এই জাতি ও নারী বিষয়ক জিজ্ঞাসা কোন পথ ধরে এগিয়েছিল।

(২)

১৮৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন রমেশচন্দ্র।[৬] এই বংশের নীলমনি দত্ত তৎকালীন কলকাতায় অর্থনৈতিক ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর তিন ছেলে-র সময়, হরিশ ও পীতাম্বর। রসময় দত্ত উনবিংশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তি। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। পীতাম্বরের দুই পুত্র-ঈশানচন্দ্র ও শশীচন্দ্র। ঈশানচন্দ্রের পুত্র রমেশচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র পেশায় ডেপুটি কালেক্টর। সাহিত্য-চর্চাও করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দুকলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন তার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্রের মা থাকমণি দেবী। বাবার মৃত্যুর পর কাকা শশীচন্দ্রের অভিভাবকত্বে বড় হতে থাকেন রমেশচন্দ্র। শশীচন্দ্রও সুসাহিত্যিক ছিলেন এবং ইংরাজীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই লেখেন। রমেশচন্দ্রের দাদা যোগেশচন্দ্র লিখেছেন যে এই কাকার কাছ থেকেই তাঁর ভাই পেয়েছিলেন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও গৌরবস্পৃহা (independence of character and thirst for fame)।

১৮৬৪ সালে রমেশচন্দ্র প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরেই মোহিণী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৬৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কলেজেই বি. এ. পড়তে পড়তে বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নেন। পরিবারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতেন একমাত্র দাদা যোগেশচন্দ্র। নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায় বিদেশে যাবার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল তাঁদের বিধবা বোনের সঞ্চয় থেকে। ১৮৬৮ সালে বিলেত গিয়ে আকাঙ্খিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৮৭১ সালে।

বিলেত থেকে তিনি যে সমস্ত চিঠি লিখেছিলেন তারই অংশবিশেষ নিয়ে ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই 'Three Years in Europe'.[৭] এই বইটিতে তিনি লিখেছিলেন, ভারতীয় নারীর বিদ্যাশিক্ষার অভাবে অনেক অমঙ্গল হয় বলা হয়ে থাকে কিন্তু ইউরোপীয় মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষাও "পুরুষের মনোহরনের উপায়" শেখার জন্য, "চিত্তোকর্ষ সাধনে"র জন্য নয়। সেখানেও নারী পুরুষের শিক্ষনীয় বিষয় আলাদা। "অঙ্ক কি বিজ্ঞান, দর্শন কি অন্যান্য দূরহ শাস্ত্র যুবতীগণের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে নাই, কেবল কাব্য, ইতিহাস, আশুবোধ সাহিত্য। উপন্যাস ও পুরাবৃত্ত, কিঞ্চিৎ ফরাশি ভাষা, সুলেখন ও নৃত্য, গীত, বাদ্য, অর্থ্যাৎ যদ্দ্বারা তাঁহারা পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেন তাহাই শিখিলে তাঁহদের বিদ্যা পর্য্যাবসান হইয়া থাকে"।[৮] প্রকৃত স্বাধীনতা ওদেশে মেয়েদের নেই। স্বাধীনভাবে কোন মেয়ে জীবিকানির্বাহ করলে 'জনসমাজে হাস্যাস্পদ' হতে হয়। মেয়েরা তাই হয় মা-বাবা অথবা স্বামীর ওপর নির্ভর করে। ফলে, বিয়েকেই তারা চরম সুখ মনে করে স্বামী ধরার জন্য ব্যস্ত হয়। ইউরোপীয় বিবাহ পদ্ধতি যে ত্রুটিমুক্ত একথাও তিনি ভাবেন নি। ইংরেজ মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "সভামধ্যে যুবতী কন্যা স্বাধীনতা প্রকাশ করেন না, সর্ব্বমনোরঞ্জনী এবং চারুশীলা হন। কোন বিয়য়ে স্বীয় মতামত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন না। স্নেহ কি পীড়া ভিন্ন অপর ভাব অস্ফুটিত রাখেন। রাজনীতি সম্বন্ধে কোন স্থির ও স্বতন্ত্র মত অবলম্বন করেন না"।[৯] রমেশচন্দ্র এ কথাও লিখেছিলেন যে, মেয়েদের জীবনের এই সব অনিষ্টের "একমাত্র মহৌষধি"[১০] তাদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত করে তোলা।

১৮৬৩ সালে একই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলেত থেকে দেশে ফিরেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ও রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির কি পার্থক্য! প্রবাস জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: " বিলেত গিয়ে আমি দেখতুম

স্ত্রীপুরুষ কেমন স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করছে। .......গার্হস্থ জীবনে তাদের মেয়েদের কি মোহন সুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমনী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন"।[১১] তুলনায় ভারতবর্ষীয় মেয়েদের পর্দার অন্ধকারে খর্বিত, বদ্ধ জীবনের জন্য তিনি দুঃখ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে এদের মন সঙ্কীর্ণ, স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া কিছুই স্ফূর্তি পায় না।

সত্যেন্দ্রনাথের মত রমেশচন্দ্রও নিশ্চয় John Stuart Mill এর Subjection of Woman পড়েছিলেন। পড়েছিলেন ১৮১৭ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত James Mill এর The History of British India, যার একটি অধ্যায়ে ভারতীয় মেয়েদের নিপীড়িত অবস্থার কথা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির ভিত্তিতেই লেখা। Orientalists ও Utalitarians দের ভারতীয় নারী-বিষয়ক বিতর্কে রমেশচন্দ্র যে ভাবেই প্রভাবিত হন না কেন বিলেত থেকে দেশে এসে সমাজে নারীর স্থান যে আলোচ্য বিষয় তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি আলোচনায় নানা ভাবে মেয়েদের প্রসঙ্গ এঁকেছেন, যেমন গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন বর্ণ-জাতি-সমস্যা।[১২]

ভারতবর্ষে এসে কাজে যোগ দেবার পর তিনি লেখেন 'The Peasantry of Bengal' নামক বইটি। প্রকাশকাল ১৮৭৪। এখানে বাংলার চিরন্তন গ্রাম সমাজের বর্ণনা। রমেশচন্দ্রের মতে এই গ্রামসমাজে মেয়েরা শহরের মেয়েদের চাইতে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে। সেই স্বাধীনতার মাপকাঠি কি? মেয়েরা জল আনতে কুয়ো বা পুকুরে যায়, নদীতে স্নান করতে যায়। পরিচিত ছোটদের সঙ্গে অবাধে কথা বলে। "তবে অতি বৃদ্ধ বা প্রায় বৃদ্ধ ছাড়া তাদের অচেনা কারও সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না"।[১৩]

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক এখানে দ্বন্দ্ববিহীন। মদ খেয়ে মাতলামি করার ব্যাপার গ্রামে ঘটে না। স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার নেই। স্ত্রীরা স্বামী অনুরক্ত। পারিবারিক শান্তি এখানে অটুট। তবে, মাঝে মাঝে স্বামীদের অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে দেখা যায়। রমেশচন্দ্র নির্দ্ধিধায় বলেছেন, "সেই সব স্ত্রীরা নষ্ট চরিত্রের"।[১৪] অর্থাৎ, নষ্ট চরিত্রের মেয়েদের জন্যই পুরুষরা বিপথগামী। গ্রামের অটুট পারিবারিক শান্তির মধ্যে অবশ্য কখনো কোন স্ত্রীকেও অন্যের সঙ্গে গৃহত্যাগ করতে দেখা যায়। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, ফিরে আসলে স্বামীরা আবার তাদের গ্রহণ করে।

তবে, এ সব গ্রাম সমাজের নিম্নবর্গের কথা। উচ্চবর্ণের সমাজ-নীতি কঠোর।

"একজনের বউ যদি কারও সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর ফিরে আসে, তবে স্বামী যদি তাকে আবার ঘরে নেয়, তবেই তাদের পরিবারকে জাতে পতিত করা হয়। কোন বিধবা যদি কোন ভুল করে, তার বাবা যদি তাকে ঘরে নেয়, তবে বাবাকেই জাতে পতিত করা হয়। এ ধরনের ব্যাপার নিয়েই জাতপাতের লড়াই চলে গ্রামে"।[১৫] এতেই যেন সাধারণ জাতপাতের লড়াই!

বাল্য বিধবাদের সমস্যা গ্রামাঞ্চলের একটি গুরুতর সমস্যা। একথা স্বীকার করে নিয়ে, ১৮৫৩ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হবার পরেও, ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত এই বইয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "হিন্দুধর্ম মতে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ"।[১৬] বাল-বিধবাদের করুণ জীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি এখানে যা লিখেছিলেন তা অভাবনীয়। তিনি লিখছেন: "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা গ্রামের কোন একটা নির্দিষ্ট ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। তারপর তারই সঙ্গে বছরের পর বছর স্ত্রীর মত সহবাস করে। হিন্দুদের বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে মনোভাব, আর অসহায় হিন্দু বিধবাদের চরম পরিণতির কথা ভেবে, বিধবাদের এমনভাবে পালিয়ে গিয়ে কোনও একজনের স্নেহের ছায়ায় বাস করাটাকে তেমন কোন গর্হিত কাজ বলে মনে করা যায় না। বরং নির্দিষ্ট একজনের প্রতি এই বিধবার একনিষ্ঠতা, বিশ্বাসপূর্ণ ব্যবহার, এই তো সমাজের কাম্য"।[১৭] বিধবা বিবাহ 'সমাজের কাম্য' হওয়া উচিত বলার পরিবর্তে তিনি সামাজিক স্বীকৃতি-বিহীন দুটি মানুষের একত্র থাকাকে স্বীকার করতে বললেন!

১৮৭৪ ও ১৮৭৭ সালে যে দুটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন সেখানে বাল-বিধবাদের পতি ভক্তিকে তিনি মহিমান্বিত করে চিত্রিত করলেন। 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে বাল-বিধবা কমলার স্বামীর নাম স্মরন নেই, কিন্তু তার দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে সদা জাগ্রত। কঠিন অসুখে যন্ত্রনায় অস্থির হলে সে সেই দেবীমূর্ত্তি দেখত। " বোধ হইত যেন অপরিসীম নীল আকাশের মধ্যে চন্দ্রকরোজ্জ্বল একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘ খন্ডে সেই দেবমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন। এখনও আকাশের দিকে চাহিলে তাঁহাকেই দেখিতে পাই"।[১৮]

'মাধবী কঙ্কন' উপন্যাসে বাল-বিধবা শৈবালিনীর কোন দুঃখবোধ নেই। সে সকালে উঠে সংসারের কাজ করে, সন্ধ্যায় শান্ত মনে বিধবার কার্য্য শেষ করে, মা ও ছোট ভাইয়ের সেবা যত্ন করে। তার বৈধব্য জীবনের এক রোমান্টিক বর্ণনা দিয়েছেন রমেশচন্দ্র। উদ্ধৃটি দীর্ঘ হলেও প্রয়োজনীয়। "এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্খিনী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মন্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়া বর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর। তাহারাও যেমন প্রকৃতিব সন্তান, শৈবলিনীও

তেমনি প্রকৃতির সন্তান; কিন্তু প্রেমের আকাঙ্খিনী নহে, কেন না, সমগ্র জগৎ শৈবের প্রেমের জিনিষ। বৃক্ষে বসিয়া যে কপোত কপোতী গান করিত, তাহারও শৈবের প্রেমের পাত্র, তাহাদের সহিত শৈব একত্র গান গাহিত, তাহাদের প্রত্যহ তন্ডুল দিয়া পালন করিত। শৈব যখন বৃক্ষ মাতাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হইত, মাতাকে সুখী দেখিলে শৈবের নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইত। যখন শিশু শ্রীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে চুম্বন করিত, যখন শিশু আহ্লাদিত হইয়া 'দিদি' বলিয়া শৈবকে চুম্বন করিত, তখন যথার্থই শৈবের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অশ্রুতে বসন ভিজিয়া যাইত। আর যখন সায়ংকালে শান্ত নিস্তব্ধ নদীর প্রশস্ত বক্ষে চন্দ্রতারাবিভূষিত স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভগবানের কথা মনে পড়িত, যিনি চন্দ্র-তারা ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি পক্ষী শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ দিয়াছেন, সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত। তখনই শৈবলিনী হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই; শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল না, সুতরাং বর্ষাকালের নদীস্রোতের ন্যায় শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া যাইত। গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকাকে শৈব বড় ভালোবাসিত; শৈব অনাথ দরিদ্রদিগের সমদুঃখিনী; পশু-পক্ষীও শৈবের প্রেমের ভাগী; জগতে শৈবলিনীর ন্যায় প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত"।[১৯]

রমেশচন্দ্রের শৈবলিনী যেন Orientalistদের শকুন্তলারই অন্য একটি রূপ—প্রকৃতির কোলে লালিতা, নিরাসক্ত প্রেমমূর্ত্তি।

শুধু বৈধব্য নয়, সহমরণও একই ভাবে রোমান্টিকতার আবরণে পরিবেশন করেছিলেন রমেশচন্দ্র, 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' উপন্যাসের একটি অনৈতিহাসিক চরিত্র লক্ষ্মী। 'নারীর ধর্ম' মনে করে সে সহমরণে যায়। রমেশচন্দ্র বর্ণনা করেছেন: "ধীরে ধীরে লক্ষ্মী চিতায় আরোহন করিলেন, স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তি ভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদ্রিত করিলেন, বোধ হইল যেন সেই মুহুর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

"অগ্নি জলিল; অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিশিখা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লোহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবিত হইল লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না"।[২০]

যে পর্বে রমেশচন্দ্র এই ধরনের বিভিন্ন কথা নানা প্রসঙ্গে বলেছিলেন তখনও

পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। সমাজে প্রচলিত আদর্শগুলিকেই তিনি লেখায় ভারতীয় পরম্পরা বা ঐতিহ্যের রূপ হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন।

(৩)

এর পরের পর্বে রমেশচন্দ্রকে আমরা পাই প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও ইতিহাসের গবেষক হিসাবে। তাঁর প্রাচীন ভারত-ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাত ঋক্‌বেদের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। এই বেদকে অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত শাস্ত্র না বলে 'সরল সুন্দর প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ' অপূর্ব কাব্য হিসেবে মহিমান্বিত করলেন। অব্রাহ্মণ হয়ে বেদ নিয়ে আলোচনা করে তিনি আঘাত হানলেন ব্রাহ্মণ্য রক্ষনশীলতায়। আর, শিক্ষিত বাঙ্গালীর হাতে তুলে দিলেন আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। শুরু হল তাঁর সচেতন ভাবে দেশকে চেনার চেষ্টা।

এরপর তিনি লিখলেন, তিন খন্ডে, A History of Civilizion in Ancient India based on Sanskrit Literature (প্রকাশকাল ১৮৮৮-১৮৯০)। এই গবেষণাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে তিনি আরও কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বই লেখেন। ১৮৯৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় Ancient India। ১৯০০ সালে লন্ডন থেকেই প্রকাশিত হয় The Civilizion of India.

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান নিজে ও বিশিষ্ট পন্ডিতদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে ঋক্‌বেদ থেকে শুরু করে পুরাণ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রকাশ। 'হিন্দু শাস্ত্র' নামে সম্পাদিত, নয় খন্ডে প্রকাশিত এই বই, পন্ডিতদের জন্য শুধু নয়, সাধারণ মানুষকে ভারতীয় শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই অনুদিত হয়। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে বাংলার নারী সমাজকেও তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও শাস্ত্র পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। A History of Civilizion in Ancient India বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর দুই মেয়ে কমলা ও বিমলাকে। 'হিন্দুশাস্ত্রে'র অন্তগর্ত 'ধর্মশাস্ত্র' খন্ডটি উৎসর্গ করেছিলেন দুই বোন - চমৎকারমাহিনী ও অপরাসুন্দরীকে।

নানা ভাবে তিনি ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে দেশের ও বিদেশের মানুষকে আগ্রহী করতে চেষ্টা করেছেন। বাংলায় ও ইংরাজীতে লিখেছেন পাঠ্য পুস্তক, সেখানে সংযুক্ত করেছেন প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত অধ্যায়। ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন রামায়ণ, মহাভারত। সংকলন করেছেন প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে ভারতীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সংগ্রহ।

কেবলমাত্র বই লিখে নয়, অধ্যাপনার মাধ্যমেও তিনি বিলেতের মানুষদের কাছে ভারতবর্ষের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারত-বিষয়ক বক্তৃতা সুযোগ পান। তিন বছরের জন্য তিনি 'লেকচারার' মনোনীত হন। ১৮৮৮ সালে, অর্থাৎ যে পর্বে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষনায় মগ্ন ছিলেন, দাদাকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল' যাবার পরিবর্তে তিনি অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বা লন্ডনে পড়াবার সুযোগ পেলে খুশী হন। এতদিনে তাঁর আকাঙ্খা পূর্ণ হল। তিনি সুযোগ পেলেন ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদেশীদের অবহিত করার এবং ভারতবাসীদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করার। তিনি অর্থ চান নি, নিজের জন্য প্রতিষ্ঠাও নয়, তিনি শুধু চেয়েছিলেন এমন একটি পদ যেখান থেকে পদাধিকার বলে তিনি ইংল্যান্ডের মানুষদের সচেতন করে ভারতীয়দের অধিকার আন্দোলনকে সংগঠিত করতে পারবেন। রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের আন্দোলনে ইতিহাস-গবেষণা ও প্রচারের সার্থকতা বুঝতে পেরেছিলেন রমেশচন্দ্র।

তাঁর এই চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণার মূল্যায়ন করতে হবে। সে সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শন আবিস্কৃত হয় নি, প্রগৈতিহাসিক জীবন-উপাদানও নয়। সাহিত্য নির্ভর ইতিহাসের যাত্রা শুরু ঋক্‌বেদকে উপজীব্য করে। রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারতবর্ষকে দেখলেন আর্য-সংস্কৃতির আলোয়।

তাঁর প্রাচীন-ভারতীয় যুগ বিভাগের প্রথম পর্ব 'বৈদিক যুগ'। নির্ধরিত সময়-পরিধি খৃষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৪০০। ইতিহাসের উপাদান কেবল মাত্র ঋক্‌বেদ। সাতটি অধ্যায়ে এই পর্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইতিহাস তিনি আলোচনা করেছেন। আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব তাঁর জাতি-বিন্যাস ও নারী-বিষয়ক অনুমিতিতে।[২১]

'সমাজ জীবন' অধ্যায়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন যে এই যুগে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ছিল না। সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ছিল না। দশম মন্ডলের বর্ণবিভাগ সংক্রান্ত শ্লোকটি যে পরবর্ত্তী কালের সংযোজন এ কথা তিনি পাদটীকায় জানিয়েছেন। কিন্তু তখন 'আর্য' অনার্যে ভেদ ছিল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল আর্য-কৌম সমাজে।

পরিবার পিতৃতান্ত্রিক হলেও রমেশচন্দ্র মনে করেন নারীর মর্যাদা ছিল। পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ মেয়েরা গৃহকর্মের দায়িত্ব নিত। 'গৃহোপযোগী নানা গুণের' সমাবেশ তখন থেকেই ভারতীয় নারীর মধ্যে বিকশিত হতে থাকে। নারী ছিল অবরোধহীনা। মেয়েদের

শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বাল্য-বিবাহ হত না। স্বামী নির্বাচনে তাদের স্বাধীনতা ছিল। স্ত্রী ছিল স্বামীর ধর্মকাজের সহায়িকা। বিয়ে না করায় স্বাধীনতাও ছিল। সহমরণ প্রথা ছিল না।

এই স্বাধীন বৈদিক নারীর চিন্তা আজও অব্যাহত। কিন্তু রমেশচন্দ্রই দেখিয়েছেন সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ছিল না। স্বামী নির্বাচনে বাবার অনুমোদন বা 'wise control' এর কথাও বলেছেন। বোনেদের চরিত্রের উপর ভাইয়েদের নজরদারীর শ্লোকের উল্লেখও তিনি করেছেন।

বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও মেয়েদের ভূমিকা রমেশচন্দ্রের আলোচনায় নেই। কৌম সমাজে মেয়েরা যে ধরনের কাজে অংশ নিত এবং পরবর্তী কালে যে অধিকার তারা হারায় সে সম্পর্কে তিনি নীরব। যেমন, 'Wars And Dissensions' অধ্যায়ে তিনি আর্য-অনার্যের লড়াই, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদির কথা লিখলেও কোথাও যুদ্ধে মেয়েদের অংশ গ্রহণের কথা লিখলেন না। শক্তির সামজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভূমিকার গুরুত্ব আলোচনা করলেও কোথাও বিশ্‌পলার নামোল্লেখ করলেন না।[২২] খেলর স্ত্রী বিশ্‌পলা স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। রণক্ষেত্রে তিনি আহত হন এবং একটি পা হারান।

মেয়েদের 'মন্ত্র-রচয়িত্রী' বললেও রমেশচন্দ্র 'বৈদিক ঋষি' অধ্যায়ে তাঁদের প্রসঙ্গ আনেন নি। পুরুষ ঋষিদের তিনি দেখিয়েছেন একাধারে পরিবারের কর্তা, পুরোহিত ও যোদ্ধা হিসাবে। মন্ত্র-রচয়িত্রী নারীদের উল্লেখ করলে আলোচনা জটিল হয়ে উঠত।

রমেশচন্দ্রের যুগ বিভাগে 'বৈদিক যুগে'র পর 'মহাকাব্যের যুগ'। সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১০০০। এটি গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্যদের অনুপ্রবেশের কাল বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই যুগের ইতিহাস-উপাদান কেবলমাত্র রামায়ণ, মহাভারত নয়। ঋক্ ভিন্ন বাকী তিন বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সাহিত্য-সমগ্র এই যুগেই নির্দিষ্ট হয়েছে।

এই পর্বে বর্ণ-বিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠে বলে রমেশচন্দ্র মনে করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষয়িত্রদের দাপট ও সাধারণ মানুষের দুর্বলতাই বর্ণবিভাগের কারণ বলে তিনি সাব্যস্ত করেছেন।[২৩] উনবিংশ শতকে বর্ণভেদ সমস্যা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিব্রত করেছিল, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এ সমস্যা বোঝার চেষ্টা হয় নি, হয়তো বা উপাদানের অপ্রতুলতার জন্য তা সম্ভবও ছিল না। লিখিত উপাদানের সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আবিষ্কৃত উপাদানকে সংযুক্ত করে এখন রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে খৃষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে প্রাচীন ভারতে নগরায়নের সূচনা হয়। গড়ে ওঠে বর্ণ-বিন্যস্ত সমাজ। উন্মেষ হয়'রাষ্ট্র' চেতনারও।

বর্ণ-বিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠার পিছনে আছে সময়কালের জটিল আর্থ সামাজিক অবস্থা।[২৪] কাজেই রমেশচন্দ্র যখন লেখেন, "The historian of Ancient Indian may deplore the commencement of the caste system", তখনও যেমন তিনি এই সমাজ-বিধি গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ করেন না, তেমনি যখন বলেন যে, "The worst results of that system were unknown in India until after the Mahommedan conquest" তখনও তিনি ইতিহাস সচেতন নন।[২৫] দামোদর কোশাম্বি, রামশরণ শর্মা, বিবেকান্দ ঝা ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে এখন আমরা প্রাচীন ভারতের জাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস ও অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠীর নিম্নবর্ণে স্থান পাওয়ার কথা জানার পর বলতে পারি যে প্রাচীন ভারতবর্ষেও বর্ণ-জাতি-প্রথা জটিল ছিল এবং কোন সরল সূত্র দিয়ে এ সমস্যা বোঝা সম্ভব নয়।[২৬]

সমাজ বর্ণ-বিন্যস্ত হলেও, মেয়েদের অবস্থা, রমেশচন্দ্রের মতে, এই যুগেও ভাল ছিল। তাঁর সমকালীন ইউরোপের মত না হলেও মেয়েরা অবরোধহীনাই ছিল। তিনি মৈত্রেয়ী, গার্গীর কথা বলেছেন। পন্ডিতা কন্যার জন্য যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন। মেয়েদের বাল্য-বিবাহ ছিল না। বিধবা-বিবাহ হত। পুরুষের বহু বিবাহ রাজন্য শ্রেনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর বহু-বিবাহ প্রথা রমেশচন্দ্রের আর্য-রীতি সম্মত মনে না হওয়ায় দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর প্রসঙ্গে তিনি লেখেন যে গল্পের এই অংশের সঙ্গে প্রাচীন বা বর্তমান কোন ভারতীয় আচারের সামঞ্জস্য নেই।[২৭] ঐতিহাসিক এই ভাবে কোন রীতিকে পরম্পরা বলে দেখাতে পারেন, আবার কোন রীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন।

রামায়ণের কাহিনী বলতে গিয়েও রমেশচন্দ্র বিব্রত। প্রজাদের কথা শুনে পরিব্রতা সীতাকে বনে পাঠালেন রাম। তাহলে নারীর সম্মান কোথায় রইল! রমেশচন্দ্র এজন্য সমাজ-ব্যবস্থাকে দায়ী না করে দোষী করলেন ব্যক্তি রামকে। পিতা দশরথের মতই দুর্বল চরিত্রের মানুষ।[২৮] দশরথের দুর্বলতা স্ত্রীর কথায় নিজের সিদ্ধান্ত পালটে রামকে বনবাসে পাঠানোয়, আর রামের দুর্বলতা প্রজার কথায় স্ত্রী-ত্যাগে। প্রথম ক্ষেত্রে, একজন নারী শাসনব্যবস্থায় বা রাজনীতিতে অংশ নিয়ে ঘৃণিত চরিত্রের হয়ে গেলেন। অপরক্ষেত্রে অত্যাচারিতা নারী হলেন সমাজের আদর্শ। রমেশচন্দ্রও সীতাকে আদর্শ নারী বলেছেন। তিনি লিখেছেন কন্যার নাম সীতা রাখতে হিন্দুরা ইতস্তত করে, পাছে তার জীবনটাও দুঃখময় হয়।[২৯] সে কেমন 'আদর্শ' যাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারি না। সে দুঃখের আদর্শতো তাহলে মেয়েদের উপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আরোপিত।

রমেশচন্দ্র বলেছেন, পতিব্রতা ছিল ভারতীয় নারীর স্বধর্ম। অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর সংখ্যা ছিল নগন্য। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানালেন যজ্ঞের সময় পুরোহিত যজ্ঞকর্তার স্ত্রীকে তার চারিত্রিক স্খলনের দোষ থাকলে স্বীকার করতে বলতেন, কারণ তার সত্যভাষণের উপর নির্ভর করত যজ্ঞ-ফল, আত্মীয়-পরিজনের বিপদ্-মুক্তি।[৩০] এক্ষেত্রেও কিন্তু মেয়েদের জীবনই বিধি-নিষেধে আবদ্ধ। পুরুষের নয়, নারীর স্খলনই বিপজ্জনক। সামাজিক ন্যায়-নীতির মানদন্ড স্ত্রী-পুরুষের জন্য ভিন্ন।

রমেশচন্দ্র পরবর্তী যুগ বিভাগের নামকরণ করেছেন Rationalistic Age বা যুক্তিবাদের যুগ। এই পর্বের সময় সীমা খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৩২০ পর্যন্ত। এযুগ সমগ্র ভারতে আর্য প্রভাব বিস্তারের যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে। ছাত্র-পাঠ্য বইয়ে রমেশচন্দ্র একে 'Hindu colonization' বা হিন্দু উপনিষদ বিস্তারের যুগ বলেছেন। এই যুগের ইতিহাসের উপাদান সূত্র-সাহিত্য, বেদাঙ্গ, দর্শন-শাস্ত্র, বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ, মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

রমেশচন্দ্রের মতে এই পর্বে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে কঠোর নিয়মের অধীনে আনার চেষ্টা হয়। তিনি সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন, সংকর বর্ণের বর্ণনা ও চতুর্বর্ণের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের বিবরণ কাল্পনিক। তিনি লিখেছেন, সূত্রকারেরা চতুবর্ণ বিভাগে বিশ্বাসী হলেও, চারিপাশের অনার্য কৌম সম্প্রদায় ক্রমশ জাতি-ব্যবস্থার অন্তর্গত হতে থাকে। তাদের বর্ণব্যবস্থার অর্ন্তভুক্ত করতেই সংকরবর্ণের কল্পনা। সংকরবর্ণের উৎপত্তি বিবরণ, তাঁর মতে, সূত্রকারদের চিন্তার দৈন্য প্রকাশ করে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে এ সব মতবাদ ভুলে যাওয়া উচিত।[৩১] এখানে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক হিসেবে ভুল করলেন। আধুনিক কালে সমাজ-ইতিহাসের গবেষকেরা এই তথাকথিত কাল্পনিক বর্ণ-বিন্যাসের মধ্যে শ্রেনী বৈষম্যের ইতিহাস খুঁজেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কখনও গ্রহণ, কখনও বর্জনের নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে মর্যাদা বা অমর্যাদা দিয়েছে সেই ইতিহাস তাঁরা সন্ধান করছেন।

আর্যদের সমন্বিত শক্তির বিশ্বাস বশতঃ রমেশচন্দ্র বর্ণ-বিভক্ত সমাজের বৈষম্যের রূপ দেখার চেষ্টা করেন নি। স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের তিনি বৈশ্যবর্ণভুক্ত করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আর্য জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ এই যুগে একতাবদ্ধ ছিল এবং প্রত্যেকে সমান ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকারী হতে পারত।[৩২]

বিচার ব্যবস্থায় দন্ডাদেশের ক্ষেত্রে বর্ণ-বৈষম্যের ধর্মশাস্ত্রীয় বিধি রমেশচন্দ্রকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। শূদ্রা স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত তিন উচ্চ-বর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে দন্ডাদেশ ছিল রাজ্য থেকে বিতাড়ণ, কিন্তু শূদ্র পুরুষ একই অপরাধ উচ্চ-

বর্ণের নারীর ক্ষেত্রে করলে তার জন্য ছিল মৃত্যুদন্ডের বিধান। এই বিভেদমূলক নীতির ব্যাখ্যা করলেন তিনি। বললেন, শূদ্রদের ভয় দেখিয়ে শাসনে রাখাই এর উদ্দেশ্য, নীতিগুলি কার্যকর ছিল না।[৩৩]

এই যুগেও মেয়েদের সম্মানিত অবস্থানের কথা রমেশচন্দ্র লিখেছেন। কিন্তু তাঁর " সমাজ-জীবন" অধ্যায়টি পড়ার পর মেয়েদের জীবন ঘিরে বহু প্রশ্নই থাকে। চতুরাশ্রম নির্দেশিত সমাজে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য-পর্ব কোথায়? কোথায় উপনয়ন ও শিক্ষার ব্যবস্থা? মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে আনা হল কেন? কেন বিধবা-বিবাহ অস্বীকৃত হতে থাকে? শুভ কাজে বিধবাদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ কেন?

ইংরেজ রাজত্বের অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাস লেখক রমেশচন্দ্র জানতেন জীবনে অর্থের প্রয়োজনের কথা এবং এ সম্পর্কে, রাষ্ট্রীয় নীতির উপযোগিতার কথাও। বিলেতের মেয়েদের তিনি উপার্জনক্ষম হতে বলেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার সময় ধর্মশাস্ত্রে মেয়েদের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী করা হয়েছে কি-না; স্বাধীন মেয়েদের জীবনে কতটা কার্যকরী সম্পত্তি ছিল, নারী-জীবন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত এ সব আলোচনা তিনি গভীর ভাবে করেন নি। অন্যদিকে, ধর্মসূত্রে যেখানে মেয়েদের জমিজমা, পশু ও অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত করে তাদের বিষয়ে মালিকের অধিকার নির্দেশ করা হয়েছে সেখানে তিনি 'মেয়ে' শব্দটিকে 'দাসী' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ভেবে দেখেন নি যে সেক্ষেত্রে দাসদেরও তালিকাভুক্ত করা উচিত ছিল।

গৃহ পরিসরের বাইরে তিনি মেয়েদের দেখতে চান নি। তাই মেগাস্থিনিস বর্ণিত স্ত্রীরাজ্যের প্রসঙ্গ 'কাল্পনিক' বলে মূল্য দিলেন না। মেয়েদের যুদ্ধরত মুর্ত্তি তাঁর পছন্দের ছিল না বলেই মৌর্য-রাজদরবারের বর্মাবৃত্ত নারী দেহরক্ষীদের বর্ণনাও তাঁর ভাল লাগে নি। রাজদরবার ও শিকার-পর্বে রাজা যে নারী দেহরক্ষী পরিবৃত্ত হয়ে থাকতেন, মেগাস্থিনিসের এ বর্ণনা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে মহাকাব্যের যুগের বীর্যবত্তার দিন শেষ হয়ে যুক্তিবাদের যুগে বিলাস-ব্যসনের প্রাধান্য হয়।[৩৪] তাঁর এই ধারনার পিছনেও কি নারীকে বিলাস-সামগ্রী ভাবার মনোভাব কাজ করে নি?

পরবর্ত্তী যুগকে 'বৌদ্ধ যুগ' (সময়সীমা খৃষ্টপূর্ব ৩২০ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ) আখ্যা দিলেও রমেশচন্দ্র সমসাময়িক সমাজ-জীবন, জাতি-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন মূলত মনুস্মৃতি থেকে। বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সমাজকে দেখেন নি, প্রাধান্য দিয়েছেন ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারাকেই।

এই যুগের জাতি-বর্ণ-পেশা ইত্যাদির আলোচনায় তাই পূর্বযুগের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাই। মনুও সংকরবর্ণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী সূত্রকারদের মত গ্রহণ করায় রমেশচন্দ্র বিস্মিত। বর্ণ ও জাতির পার্থক্য উপলব্ধি না করায় তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই যুগেও পেশাগত গোষ্ঠীগুলি বহুধা বিভক্ত জাতিতে পরিণত হয় নি, তারা বৈশ্যবর্ণভুক্ত (তাঁর ভাষায় caste) হয়ে অবিভক্ত আর্য-জাতি হিসেবেই ছিল।

পূর্বযুগের দন্ডনীতির মত এযুগের আইনেও বর্ণ-বৈষম্যের প্রভাব লক্ষ্য করে এক্ষেত্রেও তিনি বিভেদমূলক আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেন।

মনু-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায়ও রমেশচন্দ্র মেয়েদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের পরিচয় পেয়েছেন। নারীদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রোধ করতেই তাদের বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের কর্তৃত্বাধীনে রাখার বিধান। মনু-কন্যাপণের বিরোধী। মাকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলে তিনি মহিমান্বিত করেছেন। দেবর বা স্বামীর সপিন্ড কোন ব্যক্তির ঔরসে বিধবার সন্তান-উৎপাদনকে তিনি নিন্দা করেছেন।

কিন্তু মনুর অনুশাসনেই বাল্যবিবাহ স্বীকৃত হল। আট বছরে গৌরীদান পুণ্যকর্ম। বিধবার পুনর্বিবাহ নিন্দনীয় হল। বলা হল, পুণ্যবতী নারীরা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে না। মনুস্মৃতিতে সাধারণের মধ্যেও বহু বিবাহের প্রসঙ্গ পাওয়া গেল। রমেশচন্দ্র বললেন, এটি মনুর অখেয়ালের উক্তি। নারী-স্বভাব মন্দ হওয়ায় মনুই তাদের শাসনাধীন রাখতে বলেছেন। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মেয়েরা হয় নি। মাতৃত্বকে কোন বিশেষ শ্লোকে মর্যাদা দেওয়া হলেও নারীকে সন্তান উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি এবং পুরুষকে বীজরূপে কল্পনা করে দ্বিতীয়টিকেই তিনি প্রধান্য দিয়েছেন।

রমেশচন্দ্রের যুগ-বিভাগের পরবর্তী পর্ব 'পৌরাণিক যুগ', যার সময়কাল তিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। সমসাময়িক ইতিহাস সূত্র হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক প্রভৃতির সাহিত্য সম্ভার, বৈজ্ঞানিকদের রচনা কল্হনের রাজতরঙ্গিনী, রামচরিত, হিউয়েন সাঙের বিবরণ। জাতি-বর্ণ সংক্রান্ত আলোচনায় এই পর্বের মুখ্য সূত্রকার হিসেবে গ্রহণ করেছেন যাজ্ঞ্যবাল্ক্যকে।

এ যুগের উল্লেখযোগ্য শাসক হিসেবে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করলেও তিনি তাকে সনাক্ত করেছেন কনৌজের যশোধর্ম্মনের সঙ্গে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নয়। এই সময়কালে আঞ্চলিক রাজ্যগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস পৃথক ভাবে জানার প্রয়োজন হয়। রমেশচন্দ্রও সেই ভাবেই রাজনৈতিক

ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তিনি এই যুগকে চিহ্নিত করেছেন আর্য-রাজপুত্রদের উত্থানের কাল বলে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রাজবংশকে 'রাজপুত' আলোয় অভিহিত করেছেন। বাংলার পালরাজাদেরও তিনি 'রাজপুত' বলেছেন। এই জন্যই সম্ভবত রাজপুত গৌরব কাহিনীর সঙ্গে একসময় বাঙ্গালীরা একাত্মতা বোধ করতেন। কিন্তু ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার ফলে এখন আমরা 'রাজপুত' নামে অভিহিত গোষ্ঠীর উৎপত্তির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণগুলি জানায় কোন ক্রমেই 'আর্য' ও 'রাজপুত' সমীকরণ মেনে নিতে পারি না।[৩৫]

এই যুগের জাতি-সমস্যা আলোচনায় রমেশচন্দ্র কোন নতুন চিন্তার সংযোজন করতে পারেন নি। একতাবদ্ধ আর্য-জাতি কল্পনায় তিনি অনড়। এই অধ্যায়ে কায়স্থদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে এই পর্বে 'কায়স্থ' পেশা গুরুত্বপূর্ণ হওযায় ধর্মশাস্ত্রে, সাহিত্যে ও অন্যত্র তাদের কথা পাই, মনুস্মৃতিতে পাই না। 'কায়স্থ' কোন জাতি নয় এবং এই পেশায় নিযুক্ত মানুষরা আর্য-বর্ণ ভুক্ত। এমনি ভাবে চতুর্বর্ণের মধ্যেই ছিল পেশাদারী গোষ্ঠীরা। বিভিন্ন জাতি হিসেবে তারা ছিল না। কিন্তু কায়স্থদের সম্পর্কে বর্তমান গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, বিভিন্ন বর্ণের মানুষরাই এই পেশা গ্রহণ করেছিল এবং শূদ্রবর্ণের কায়স্থদেরও উচ্চ-পদাধিকার ও সামাজিক সম্মান লাভ হত।[৩৬] ফলে, 'আর্য'দের ঐক্যবদ্ধ থাকার ধারণা ও সমাজে জাতি সমস্যা না থাকার বিশ্বাস ইতিহাস সম্মত নয়। কি ভাবে ও কেন একটি পেশা 'জাতি' মর্যাদা পায় ও সমাজে তাদের অবস্থান কেমন হয় তাই বর্তমানকালে ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দীর্ঘ ইতিহাসে জাতি-বর্ণ সমস্যার নানা বিবর্তন, অবস্থান্তর হয়েছে। মধ্যযুগেও এই ব্যবস্থা বিবর্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে মুসলমান আক্রমণের যোগ খোঁজা তাই অর্থহীন।[৩৭]

এই 'পৌরাণিক যুগের' 'হিন্দু ও জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' অধ্যায়েও রমেশচন্দ্রের ভ্রান্ত বর্ণ-জাতি চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। ফার্গুসন হালেবিডের মন্দিরের সঙ্গে পার্থেননের তুলনা করে প্রথমটিকে নিকৃষ্ট ও দ্বিতীয়টিকে শিল্প স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন হিসেবে দেখিয়েছিলেন। হালেবিদের মন্দিরের শিল্পকলা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন ঃ "All that is wild in human faith or warm in human feeling is found portrayed on these walls; but of pure intellect there is little less than there is of human feeling in the parthenon." দুই দেশের দুটি ভিন্ন ধরনের স্থাপত্য-নিদর্শনের এ রকম তুলনামূলক আলোচনা করা যায় না। কিন্তু রমেশচন্দ্র ফার্গুসনের বক্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয় মন্দির শিল্পে

বিশুদ্ধ মেধার অভাবের সামাজিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। কপিল, কালিদাসের দেশে উৎকৃষ্ট মেধা বা 'pure intellect' এর অভাব ছিল এ কথা তিনি স্বীকার করলেন না। বললেন, উচ্চবর্ণের মানুষরা পাথর কাটার মত দৈহিক শ্রম-নির্ভর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। বুদ্ধিদৃপ্ত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়েরা তাই মন্দির শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত নয়। যারা এ কাজ করত তারা পুরুষানুক্রমে এ বিদ্যায় শিক্ষা পাওয়ায় নিপুণ কারিগর হয়ে উঠলেও শিল্পী হতে পারেনি। "The wonderful edifices with which they have covered India under the bidding of the priest or the king, are remarkable more for the gigantic labour and the minute and endless elaboration which they display than for any lofty intellectual conception, and design of elaborate mind. .....A Phoedias and a Michael Angelo were impossible in India."[৩৮]

দেশ-বিদেশের ভারত-শিল্প বিশেষজ্ঞরা বোধহয় ভারত-শিল্পে শিল্পীর বৌদ্ধিক স্ফুরণ নেই এ কথা স্বীকার করবেন না। ভারতবর্ষে নিজস্ব শিল্প শৈলী তার বৈশিষ্ট্য নিয়েই স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা রমেশচন্দ্রের সামাজিক উক্তিটি ভয়ঙ্কর। স্থপতি, শিল্পীদের পেশাগত গোষ্ঠী হিসেবে যদি বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এরাও অবিভক্ত বা একাতাবদ্ধ আর্যগোষ্ঠীর অন্যান্যদের মত শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সমঅধিকারী ছিল। তবে তাদের মেধায় পার্থক্য কেন? আর, এদের যদি শূদ্রবর্ণভুক্ত মনে করা হয় তাহলে বলতে হবে সাধারণ মানুষের মেধার প্রতি বিশ্বাস রমেশচন্দ্রের মত জাতীয়তাবাদীর ছিল না। আর্য-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিরাট এক জনগোষ্ঠীকে বাবু-সমাজের বাইরে রেখেছিলেন কারিগরী উৎকর্ষের সঙ্গে বুদ্ধি বা মেধার যোগকে অস্বীকার করে।

এই যুগের মেয়েদের অবস্থার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভবভূতির 'উত্তরারামচরিত' থেকে অনূদিত কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করে রামসীতাকে উপলক্ষ্য করে ভারতীয়দের সুখী দাম্পত্য সম্পর্কের কথা বলেছেন। যেমন, রাম সীতা সম্পর্কে বলছে —

Her presence is ambrosia to my sight,
Her contact fragrant sandal, her fond arms
Twined round my neck are a far richer clasp
Than costliest gems; and in my house she reigns
The guardian goddess of my fame and fortune.

কিন্তু গৃহপরিসরের বাইরে মেয়েদের জীবন এই পর্বেও প্রশংসিত উল্লেখ পায় নি। কাশ্মীরে বেশ কয়েকজন রাণী রাজত্ব করেছেন। তাঁরা কেউই রমেশচন্দ্রের প্রশংসা

পান নি। শঙ্করবর্মণের মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রবতী ও অন্য দুই রাণী সহমরণে যায়। কিন্তু বজ্জাত রাণী (dissolute queen) সুগন্ধা সহমরণে না গিয়ে সিংহাসনের দখল নিলেন। আর একজন বজ্জাত রাণী ক্ষেমগুপ্তের স্ত্রী দিদ্দা। পুত্র অভিমন্যুর অকালমৃত্যুর পর দিদ্দা সিংহাসনে বসেন ও দীর্ঘ তেইশ বছর রাজত্ব করেন। এই রাণী নারী হয়েও সিংহাসন নিষ্কন্টক করার জন্য তিনটি ছোট ছেলের প্রাণবধ করিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র ছি-ছিক্কার দিলেন এবং এরই সঙ্গে যুক্ত করলেন গজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকে। বললেন, কাশ্মীরে যখন এই ধরণের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটছে তখনই বিদেশী শত্রু এসে পড়েছে দোরগোড়ায়। বর্তমান কালের ঐতিহাসিকরা উচ্চ প্রশংসা করেছেন দিদ্দার। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীরে চলছিল বিশৃঙ্খলা। প্রাণ দিয়েছিলেন ষোলজন রাজা। দিদ্দা এসে শক্ত হাতে এদের দমন করেন। দীনেশচন্দ্র সরকার দিদ্দার 'অদ্ভুত কর্মশক্তি এবং অতুলনীয় রাজনীতি জ্ঞানের' জন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন।[৩৯]

অনঙ্গপালের রাজত্বকালে সুলতান মামুদ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে দিদ্দার মত তাঁকে অভিযুক্ত করেন নি রমেশচন্দ্র। এবার আমাদের তিনি শোনালেন এ রাজ্যের মেয়েদের ত্যাগের কথা। বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য অলঙ্কার খুলে দিয়েছিলেন সে দেশের নারীরা।

রমেশচন্দ্রে ভাবনায় রাজ্য শাসনের, রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব থাকা উচিত পুরুষের হাতে। নারী থাকবে গৃহ পরিসরে স্বামীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী হয়ে। তারা পুরুষদের যোগাবে সাহস এবং প্রয়োজনে স্ত্রীধন অর্থাৎ অলঙ্কার। গৃহেও তারা স্বামীর বিরোধিতা করবে না। শকুন্তলা স্বামীর দ্বারা বিতাড়িত হয়েও কোন অভিযোগ না করে শান্তমনে আশ্রমিক পরিবেশে ছেলেকে মানুষ করেছে। স্বামীর সুখই ভারতীয় নারীর আদর্শ। স্বামীর সুখের জন্য দেবী ধারিণী মালবিকার সঙ্গে অগ্নিমিত্রের বিয়ে দেন। পুরুরবার মহিষী উর্ব্বশীব সঙ্গে তার মিলনে বাধা দেন নি।

রোমিলা থাপার তাঁর 'শকুন্তলা' শীর্ষক বইয়ে দেখিয়েছেন এ ভাবে পরম্পরার আদর্শ তুলে ধরা ভুল ঐতিহাসিক ভাষ্য। মহাকাব্যের শকুন্তলা দৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। কালিদাসের যুগে পিতৃতন্ত্রের প্রভাব বাড়ে। মেয়েরা নম্র, অনুগত হওয়াই আদর্শ হয়। শকুন্তলাও সে ভাবেই চিত্রিত। ঊনবিংশ শতকেও এই নারী প্রতিমাকেই চিরন্তন্ ভারতীয় নারীর আদর্শ বলা হল। রমেশচন্দ্রও ঐতিহাসিক হিসেবে মেয়েদের জন্য কোন নতুন পথনির্দেশ দিলেন না।

ইংরাজী ভাষায় লেখা তাঁর পারিবারিক চিঠিপত্র থেকেও তাঁর মানসিকতার পরিচয়

পাওয়া যায়। সেখানে পুরুষদের জন্য থাকে সংস্কার ভেঙ্গে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান আর মেয়েদের জন্য থাকে সনাতন ভারতবর্ষকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছে। ইংলন্ড থেকে ফেরা ভাবী জামাইকে তিনি লিখেছেন বিলেত যাবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করতে। উৎসাহিত করেছেন অসবর্ণ বিয়েতে, কারণ জাতি ভেদ প্রথাই দেশকে বিভক্ত ও দুর্বল করেছে। তবে এ জন্য পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন যেন না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে বলে লিখেছেন ঃ "Your wife should help you in doing this, should be dutiful and respectful to her father-in-law and should in fact, conform the Hindu usage in respect to her father and mother-in-law." তিনি জানাচ্ছেন যে তাঁর অন্য বিবাহিতা মেয়েরা এ সব নিয়ম মেনে চলে। শ্বশুর শাশুড়ির সামনে তারা ঘোমটা দিয়ে থাকে, কখনও তাঁদের সঙ্গে কথা বলে না এবং তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে। এ সব তিনি পছন্দ করতেন এবং এ সব রীতি ভাঙ্গবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। "We should depart from them only where we should do so in principle."[৪০] সেটা পুরুষেরা ভাববেন।

যে সমস্ত বিধি বা অনুশাসনকে আমরা শাস্ত্রসম্মত বা পরম্পরা বলে মনে করি প্রকৃতপক্ষে তারা সেই মর্যাদা পেতে পারে কি না সে সম্বন্ধে জানতে হলে সজাগ ও সংস্কারবর্জিত মন নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও ইতিহাস চর্চা করা দরকার। সাম্প্রতিক কালে রিচার্ড ডব্লু ল্যারিভিয়র তাই বলেছেন, কোন শাস্ত্র গ্রন্থের critical edition না করে ব্যবহার করলে এই ধরনের ভুল হওয়া সম্ভব। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বহু প্রথার কথা লেখা থাকলেও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা সেগুলোকে পরম্পরা বলে প্রচার করেন নি এবং মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও এই স্মৃতিশাস্ত্র মতে মেয়েদের অসন্তোষজনক বিয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিকারের পথ খোলা ছিল তা পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় বিধি বলে প্রচারিত হয় নি। ল্যারিভিয়র মনে করেন এই সমস্ত বিধি এক সময় সমাজে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হত বলেই নারদস্মৃতিতে সুনির্দিষ্টভাবে এগুলো বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।[৪১]

একই ভাবে ঐতিহাসিকও তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা সংক্রান্ত বক্তব্য ও নীরবতার মাধ্যমে যা ঐতিহ্য বলে প্রমাণ করতে চান তা সঠিক ঐতিহাসিক ভাষ্য না হতে পারে। তাই বারে বারে প্রয়োজন হয় ইতিহাসকে ফিরে দেখার। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি। আর্য-গরিমা জাতীয়তাবাদী মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। জাতীয় জীবনে যা কিছু অবমাননাকর

তা তিনি আড়াল করতে চেয়েছেন নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে। নীরব থেকেছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায়। ফলে, নিম্নবর্গীয় মানুষ ও মেয়েরা তাদের সমস্যার প্রতি রমেশচন্দ্রে যথাযোগ্য দৃষ্টিপাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৪

রমেশচন্দ্র যখন পরবর্ত্তীকালে সমাজ-উন্নয়নের মানসিকতা নিয়ে 'সংসার' ও সমাজ এর মত গ্রামীন সমাজ-কেন্দ্রিক উপন্যাস লেখেন তখন সেখানে তাঁর প্রধান ভারতীয় ইতিহাস চর্চার প্রভাব দেখা যায়। প্রথমদিককার উপন্যাসে তিনি সহমরণ ও বাল্য বিধবার বৈধব্য অনুশাসন রোমান্টিক ভাবে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন এগুলি পরবর্ত্তী কালে আরোপিত। ঋক্‌বেদের বিশেষ শ্লোকের অনুবাদ করতে গিয়ে পাদটীকায় এবং বৈদিক যুগের সমাজ ইতিহাস লেখার সময় তিনি দেখালেন একটি শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিভাবে পন্ডিতেরা পরবর্ত্তীকালে সহমরণের মত নিষ্ঠুর বিধি মেয়েদের উপর আরোপ করেছিলেন। ১৮৭৪ সালে তিনি যে লিখেছিলেন বিধবা বিবাহ হিন্দু ধর্ম্মমতে নিষিদ্ধ, সে ধারণাও পাল্টে যায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ফলে।

পরিবর্তিত মানসিকতায় তিনি লিখলেন 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাস দুটি। 'সংসার' উপন্যাসটি আবর্ত্তিত হয়েছে তালপুকুর গ্রামের চারটি মেয়ের জীবনকে ঘিরে। বিন্দু ও তার বোন সুধা। বিন্দুর তারিণীজ্যাঠার মেয়ে উমা। তাদের খেলার সাথী কালিতারা। বিন্দুর বিয়ে হয় শিক্ষিত ও উন্নতচরিত্রের কায়স্থ সন্তান হেমচন্দ্রের সঙ্গে। এ বিয়েতে সে সুখী। মায়ের অবুঝপানায় পাঁচ বছরে বিবাহিত ও সাত বছরে বিধবা সুধা মায়ের মৃত্যুর পর তাদেরই সংসারের একজন। উমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ধনী ধনঞ্জয়ের সঙ্গে। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্লিষ্ট উমার অকালমৃত্যু হয়। কালীতারার কুলীন কিন্তু রুগ্ন স্বামী তাকে অকালবৈধব্যে ফেলে।

কালীতারার ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ে। ভাল কাজের সন্ধানে হেমচন্দ্র বিন্দু ও সুধাকে নিয়ে কলকাতায় এলে শরৎ-সুধার মেলামেশা বাড়ে। শরৎ সুধাকে বিয়ে করতে চায়। বিধবা-বিয়েতে প্রথমে সকলের আপত্তি থাকলেও এবং সমাজে নানা ধরণের নিন্দা অপবাদ ছড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত এ বিয়ে হয়। শরৎ এর মা যখন তার গুরুদেবের কাছ থেকে জানতে পারেন যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়, তখন সুধার মত ভাল মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে আর আপত্তি থাকে না। এই বিয়ে সম্ভব হয় একদিকে শাস্ত্রজ্ঞ গুরুদেবের ও অন্যদিকে শিক্ষিত শরৎ এর মুক্ত মনের জন্য। এই শরৎ-ই একদিন বলেছিল ঃ "বিন্দুদিদি, সমাজ পরিষ্কার করিবারও

উপায় আছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ মাদুরের ছারপোকাগুলি সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর সামগ্রীগুলি একে একে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয়। যদি শিক্ষার সে ফল না ফলে, তাহা হইলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে।"[৪২]

শিক্ষার এত মূল্যের কথা বলা হলেও স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে কোথাও কোন বক্তব্য নেই। বিন্দুরতো নয়ই, এমনকি সুধার জন্যও গৃহশিক্ষা ছাড়া, প্রতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে শোনা যায় না। তবে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার ফলে 'মাধবী কঙ্কণের' শৈবলিনীর মত বাল-বিধবা সুধাকে তিনি বিশ্বপ্রেমে তৃপ্ত দেখান নি। আর পাঁচটি মেয়ের মত সে-ও ভালবাসতে চায় এবং নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলে শরৎকে। বিধবা সুধাকে পালিয়ে গিয়ে শরৎ এর স্নেহের ছায়ায় বাস করার মত গর্হিত কাজও করতে হয় নি। তাদের ভালবাসা বিয়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

'সমাজ' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে সুধার দ্বিতীয় বিয়ের সুখের সংসারের ছবি দিয়ে। বাল-বিধবা সুধার দ্বিতীয় বিয়ে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী বর্তমান থাকলেও তারিণীজ্যাঠামশাই যখন বালিকা গোপবালাকে বিয়ে করে তখন তা নিন্দনীয়। গোপবালাকেও রমেশচন্দ্র দোষী সাব্যস্ত করেছেন। সে অর্থের লোভে বৃদ্ধকে বিয়ে করেছিল এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করে নি।

শরৎ ও দাদামশায়ের কথোপকথনে প্রকাশ পায় হিন্দু পরিবারে স্ত্রীদের উপর অত্যাচারের কথা। স্ত্রীর প্রতি "ঘোষালের পো'র ব্যবহার প্রায় স্বাভাবিক গার্হস্থ্য চিত্র। তখন শরতের জবানীতে রমেশচন্দ্রকে বলতে শুনি, "....নারীর অসম্মান করা ও নারীকে যাতনা দেওয়া হিন্দু ধর্ম্ম নহে, হিন্দু-আচারও নহে। আজকালকার স্বার্থপর লোকে স্বার্থপরতা অবলম্বন করিতে চাহিলে দেশীয় আচারের দোহাই দেয়, হৃদয়শূন্য লোকে স্ত্রী পরিবারের প্রতি নৃশংস আচরণ করিয়া আর্য রীতির দোহাই দেয়। ....যাহারা স্বার্থসাধনের জন্য দেশীয় আচারের দোহাই দেয়, বিলাসপরায়ণ হইয়া ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দেয়, এবং আত্মসুখের জন্য ক্ষীণ, দুর্ব্বল, বহুশ্রমক্লিষ্টা বহু দুঃখভাগিনী নারীর প্রতি নির্দ্দয় হয় — তাহারা আর্যও নহে, হিন্দুও নহে, তাহাদের স্পর্শ করিলে ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুদের জাত যায়। স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা ও নির্দ্দয়তা হিন্দু আচার নহে - প্রকৃত হিন্দু ধর্ম উদার, মহৎ ও নিঃস্বার্থ।"[৪৩]

এই হিন্দু ধর্মেরই গুণগান করতে শুনি রমাপ্রসাদ সরস্বতীর কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করেও। তালপুকুরের অনতিদূরে সনাতনবাটি। সেখানকার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদার

কামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। কাশীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রমাপ্রসাদ পুত্র দেবীপ্রসাদ সহ এসে এই গ্রামে আস্তানা গাড়েন। তিনি যোগী সন্ন্যাসী নন। হাত দেখেন না। যাদু করেন না। তিনি টোল চালান। ধর্মশাস্ত্রের পাঠ দেন। হেমচন্দ্র তার গুণগ্রাহী। বয়স্ক হয়েও তিনি রমাপ্রসাদের টোলে সংস্কৃত পড়েন।

রমাপ্রসাদের গৃহস্থলীর কাজ করে দেন জমিদার বাড়ীর বিধবা বৌ যোগমায়া। একসময় তার শ্বশুরই ছিলেন সনাতনবাটীর জমিদারীর প্রধান অংশীদার। এখন তিনি নিঃসহায়। জমিদারীর অংশ অন্যদের করতলগত।

উপন্যাসের শেষ পর্বে জানা যায় রমাপ্রসাদ প্রকৃত পক্ষে কামিনীকান্তেরই জ্ঞাতি ভাই রমনীকান্ত, যোগমায়ার স্বামী। সম্পত্তির জন্য তাকে হত্যার চেষ্টা হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। আঠারো বছর বয়সে সমস্ত হারিয়ে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। কাশীতে থাকাকালীন শাস্ত্র-অধ্যয়নরত রমাপ্রসাদ পাঞ্জাব দেশীয় কৃপাল সিংহ নামক এক ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে বিয়ে করেন। তাদের পুত্র দেবীপ্রসাদ। সেই স্ত্রী মৃত।

এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি কামিনীকান্তকে হারিয়ে রমনীকান্তের জমিদারী লাভে। যোগমায়ার সঙ্গে তার পুনর্মিলন হয়। হেমচন্দ্রের বারো বছরের মেয়ে সুশীলার সঙ্গে দেবীপ্রসাদের বিয়ে হয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের এ বিয়েতে সমাজে আলোড়ন হয়েছিল, কিন্তু রমনীকান্ত বা হেমচন্দ্র কেউ-ই তাতে বিচলিত হন নি।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের লেখক হিসেবে রমেশচন্দ্র বার বার আর্য হিন্দুদের সমন্বিত শক্তি বলে দেখাতে চেয়েছেন। 'সমাজ' উপন্যাসের মাধ্যমেও এই ঐক্য সাধনের চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। ১৮৯৪ সালে একটি চিঠিতে তিনি লেখেনঃ "On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage etc) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we are only a portion and advanced guard, may take heart and follow"।[৪৪]

কিন্তু রমেশচন্দ্র কি সত্যি জাতি-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করতে প্রস্তুত ছিলেন? 'সমাজ' উপন্যাসে তিনি দু'বার অসবর্ণ বিয়ে ঘটিয়েছেন। একবার খোদ কাশীতে ব্রাহ্মণ রমনীকান্তের সঙ্গে ক্ষত্রিয় কৃপাল সিং এর কন্যার বিয়ে, দ্বিতীয়বার ব্রাহ্মণ দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কায়স্থ (যাদের ইতিহাস আলোচনায় তিনি আর্য বর্ণভূক্ত বলেছেন) হেমচন্দ্রের কন্যার বিয়ে। দুটি বিয়েই অনুলোম বিয়ের উদাহরণ এবং তাই ব্রাহ্মণ্য

শাস্ত্র সম্মত। রমেশচন্দ্র যদি কোথাও প্রতিলোম বিয়ে দিয়ে অসবর্ণ বিয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতেন তবেই তা বৈপ্লবিক্ সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা হত। আর্ন্তপ্রাদেশিক বিয়ের যে দৃষ্টান্ত তিনি 'সমাজ' উপন্যাসে দিয়েছেন, (বাঙ্গালী-পাঞ্জাবীর বিয়ে) তা তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস প্রসূত। রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যা বিমলার আন্তর্প্রাদেশিক অনুলোম বিয়ে হয়েছিল।

'সংসার' বা 'সমাজ' কোন উপন্যাসেই তিনি মেয়েদের আত্মপ্রসারণের পথ উন্মোচন করেন নি। বারো বছরের সুশীলার বিয়ে নারী-শিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা-চিন্তার পরিপন্থী। মেয়েদের সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছুই পুরুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল। মেয়েদের সমস্যা রয়েই গেল। রমাপ্রসাদ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। যোগমায়াও কি স্বামীকে মৃত জেনে এমনভাবে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারতেন? রমেশচন্দ্র তা অনুমোদন করতেন না। যোগমায়াতো বাল-বিধবা নন। দশ বছরে তার বিয়ে হয়, চোদ্দ বছর বয়সে তিনি স্বামীকে হারান। তাই বৈধব্যের আদর্শ দিয়েই তাকে গড়লেন তিনি। "চতুর্দ্দশ বৎসরের বধূ স্বামীকে চিনিয়াছিল। স্বামীর দেবতুল্য মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিতে শিখিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে যোগমায়া কেবলমাত্র পতির সেই দেবতুল্য মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া শোকে, কষ্টে, পরের অত্যাচার ও অবমাননা সহ্য করিয়া, পতিপ্রাণা নারী প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।"[৪৫] রমেশচন্দ্রের চিন্তায় সমাজে নারী-পুরুষ রইলেন অ-সম অবস্থানে।

রমেশচন্দ্র যখন তিন খন্ডে বিভক্ত বিরাট প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস লেখেন তখন বইটি লেখার কারণ হিসেবে ভূমিকায় বলেন, "The Hindu student's knowledge of Indian history practically begins with the date of the Mohommedan conquest — thc Hindu period is almost a blank to him...... And yet, such things should not be. No study has so potent an influence in forming a nation's mind and a nation's character as a critical and careful study of its past history. And it is by such study alone that an unreasoning and superstitious worship of the past is replaced by legitimate and manly worship."[৪৬]

এই প্রবন্ধের পরিসরেও এটাই বলার চেষ্টা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-চর্চা রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারাকে পরিশীলিত করেছিল। প্রথাগত কিছু ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সংস্কারবাদী আর্য-হিন্দু হয়ে ওঠেন এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি ফিরিয়ে সেই আদর্শে সমাজ-উন্নয়নের বিধান দিতে থাকেন।

কিন্তু এরই ফলে তিনি ঐতিহাসিক ও সমাজ সংস্কারক দুই হিসেবেই ব্যর্থ হলেন।

তাঁর আন্তরিক দেশপ্রেমে আমরা নিঃসংশয়। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিই নিবেদিতার উক্তি যে তিনি যা কিছু করেছেন তা আত্মগৌরবের জন্য নয়, দেশের উন্নতির জন্য করেছিলেন।[৪৭] তবু বলতেই হবে, ইতিহাসের কাঁটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। হিন্দুত্বের আদর্শ সমাজকে একত্রিত করার পরিবর্তে খণ্ডিত করেছে এবং রক্ষণশীলতাকে সহায়তা করেছে। হিন্দুত্বের আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকেরা, যাঁরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান এবং সেই অর্থে জাতীয়তাবাদী, তাঁদের গবেষণায় দেখাচ্ছেন যে ঐতিহ্য বা পরম্পরা সম্পর্কে আমাদের অনেক প্রচলিত ধারণারই পরিবর্তন আবশ্যক।

তা যদি না করা হয় তবে রক্ষণশীলতা কি ভাবে আবার দানা বাঁধে সেকথা সাম্প্রতিক কালে পুর্ণপ্রকাশিত, একদা রমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দুশাস্ত্র' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে। রমেশচন্দ্র, অন্যান্য পন্ডিতদের সহায়তায়, যখন এই বিরাট গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের কাছে হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা। একশ বছর বাদে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান সম্পাদক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী "পাঠকদের সুষ্ঠু উপলব্ধির জন্য" মাঝে মাঝে শাস্ত্রবিধির সঙ্গে নিজের ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। মনুর বিবাহ সংক্রান্ত অনুশাসনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, — "হিন্দুর বিবাহ রক্তের ও সংস্কারের বিশুদ্ধি রক্ষণ আবশ্যিক। নির্বিচারে রক্তের মিশ্রণে দম্পতির নানাবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগ, দম্পতির ও সন্তানবর্গের আয়ুক্ষীণতা, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম, মানসিক ভাবে বিকৃত পুত্রকন্যার আবির্ভাব মনুষ্য ও জীবজগতে পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে জীব-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্বজনের সমত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে।"[৪৮]

এইভাবে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। বলছেন, "বর্ত্তমান ভারতেরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কেউই প্রায় অশাস্ত্রীয় বিবাহের সন্তান নন। যাঁরা অশাস্ত্রীয় বিবাহের সন্তান, তাঁরা প্রতিভাশালী কেউ কেউ হলেও তাঁদের দ্বারা জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয়েছে কিনা এবং তাঁরাও ব্যক্তিগত জীবনে শান্তিলাভ করেছেন কিনা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবেচ্য। দু-চারটা ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তা বিধিকেই সুদৃঢ় ভাবে প্রমাণিত করে।"[৪৯]

এ যুগের ঐতিহাসিকেরা কিন্তু দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতেও রক্তের সংমিশ্রণ যথেষ্টই ঘটত এবং এমন বিয়ের ফলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্য-শাস্ত্রে আছে। ঋষি দীর্ঘতমস্ ছিলে দাসীপুত্র। স্বয়ং মহাভারত রচয়িতা

বেদব্যাস ছিলেন 'ধীবর কন্যার পুত্র। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন, সংস্কৃতায়নের ফলে নিম্নবর্গ ও কৌম জন গোষ্ঠী উন্নত হয়। তখন তাদের ঘিরে 'genealogical myth' তৈরী হয়।[৫০] সমাজ এগিয়ে চলে।

ঐতিহাসিক হিসেবে যে ভুল রমেশচন্দ্র করেছিলেন তারই জন্য তাঁর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টাও সার্থক হয় নি। আর্য-হিন্দু রমেশচন্দ্র তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর মেয়েরা ঘোড়ায় চড়তেন, ফিটনে করে হাওয়া খেতে যেতেন, পিয়ানো বাজাতেন, গান করতেন, টেনিস খেলতেন। হিন্দুপাড়ায় এ সমস্ত অনুমোদিত হয় নি বলে রমেশচন্দ্র সাঁহেবপাড়ায় উঠে গিয়েছিলেন। তাঁর মেয়েরা স্বামী নির্বাচন করেছেন, অসবর্ণ বিয়ে করেছেন, ভিন্ন প্রদেশের মানুষকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু তাতে সমাজ পাল্টায় নি। এই অগ্রসর বাঙ্গালীরা এক নতুন সমাজের জন্ম দিলেন — যাকে বলা হয় 'ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজ'।[৫১] এই নতুন সমাজভুক্তরা হিন্দুও নন, ব্রাহ্মও নন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা মুসলমানও নন। তারা আর একটি সম্প্রদায়। তাদের জীবনযাত্রা আপামর জনগনকে অনুপ্রাণিত করতে পারল না। তাই রমেশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস লেখার শতাধিক বর্ষ পরেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে খুব বেশী পরিবর্ত্তিত হতে দেখি না।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) Romila Thapar, *Cultural Transaction and Early India*. Delhi, 1994, P. 23.

২) ঐ, *The Past and Prejudice*, Delhi, 1975, pp. 1-4; ঐ, *Interpreting Early India*, Delhi, 1993, pp. 1-22.

৩) রমেশচন্দ্র দত্ত, উন্নতির যুগ, *প্রবন্ধ সংকলন* (নিখিল সেন সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৫৭।

৪) William Jones, The Third Anniversary Discourse, *Asiatic Researches*, Vol. I, pp. 415-31.

৫) Romila Thapar, *Sakuntala,* Delhi, 1999, pp. 208-215.

৬) রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী জানার জন্য পড়া যেতে পারে — J. N. Gupta, *Life and work of Romesh Chunder Dutt*, C.I.E., London 1911; R. C. Dutt, *Romesh Chunder Dutt*, Delhi, 1968; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রমেশচন্দ্র দত্ত*, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, মনি বাগচী, *রমেশচন্দ্র*, কলকাতা, ১৯৬২।

৭) এই বইটির বঙ্গানুবাদ থাকায় বাংলা বইটি থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। রমেশচন্দ্রের অন্য যে বইয়ের বঙ্গানুবাদ আছে সে ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৮) রমেশচন্দ্র দত্ত, *ইউরোপে তিন বছর*, কলকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪।

৯) *ঐ*, পৃ. ৪৫।

১০) *ঐ*, ঐ।

১১) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাল্যকথা*, ৩য় বৈতানিক সংস্করণ ১৯৮৩, পৃ. ১২।

১২) উমা চক্রবর্ত্তী ও কুমকুম রায় তাঁদের লেখা প্রবন্ধ—In Search of our past - A Review of the Limitations and possibilities of the Historiography of women in Early India তে লিখেছেন ঃ The setting for the interest in the status of women may be found in the reaction of the indigenous elite to their perception of their own society in the context of colonialism. As part of this reaction, the socio-religious reform movements of the 19th century advocated a reform of Hindu society whose twin evils were seen as the existence of the caste system and the low status of women. দ্রষ্টব্য, *Economic and political weekly*, Vol. XXIII, No. 18, April 30, 1988.

১৩) রমেশচন্দ্র দত্ত, *দি প্যেজেন্ট্রি অফ বেঙ্গল* (বঙ্গানুবাদে) কলকাতা, ১৮৭৪, পৃ. ৪২।

১৪) ঐ, *ঐ*, পৃ. ৪৩।

১৫) ঐ, *ঐ*, পৃ. ৪৬।

১৬) ঐ, *ঐ*, পৃ. ৪৩।

১৭) ঐ, *ঐ*, ঐ।

১৮) আশুতোষ দাস সম্পাদিত, *রমেশ রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৬২।

১৯) ঐ, *ঐ*, পৃ. ১২০-২১।

২০) ঐ, *ঐ*, পৃ. ৩৪৩।

২১) Romesh Chunder Dutt, *A History of Civilization In Ancient India*, Calcutta 1889-90, Reprint, Calcutta, 1963, pp. 53-66.

২২) ঐ, *ঐ*, পৃ. ৫২। রমেশচন্দ্র লিখেছেন ঃ Civilization has done much for the cause of humanity, but civilization has not converted the sword into scythe, or enabled man to reap the results of his peaceful industry without a struggle to the death against his neighbour. বিশ্‌পলার কথা জানার জন্য, রমেশচন্দ্র দত্ত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা*। কলকাতা, ১৯৬৩র সংস্করণ, পৃ. ৬৭, ৭২, ৭৪, ৫৪২।

২৩) ঐ, *ঐ*, পৃ. ১৩৭।

২৪) Romila Thapar, *From Lineage to state*, Delhi 1984; R. S. Sharma,

*Origin of State in India*, Bombay, 1989 এবং *The State and Varna Formation in the Mid-Ganga plains - An ethnoarchaeological View,* Delhi, 1996; Kumkum Roy, *The Emergence of Monarchy in North India : Eighth to Fourth centuries B. C.,* Delhi, 1994.

২৫) রমেশচন্দ্র দত্ত, *A History of Civilization......*, পৃ. ১৪০।

২৬) D. D. Kosambi, *An Introduction to the study of Indian History,* Bombay, 2nd ed. 1915; R. S. Sharma, *Perspective in Social and Economic History of Early India*, Delhi, 1983; *Sudras in Ancient India*, Delhi, 3rd ed. 1990; Vivekananda Jha, from Tribe to Untouchable. The caste of Nishadas, Indian Society - *Historicdal Probings*, (R. S. Sharma ed.), Delhi 1974.

২৭) R. C. Dutt, *The Civilization of India,* London, 1900, p. 17.

২৮) ঐ, ঐ, পৃ. ২০।

২৯) ঐ, *A History of Civilization......*, পৃ. ১২৮।

৩০) ঐ, ঐ, পৃ. ১৫৩-৫৪।

৩১) ঐ, ঐ, পৃ. ২১৯।

৩২) ঐ, ঐ, পৃ. ২২২।

৩৩) ঐ, ঐ, পৃ. ২০৬।

৩৪) ঐ, ঐ, পৃ. ২০১।

৩৫) B. D. Chattopadhyaya, *The Making of Early Medieval India*, Delhi, 1997, pp. 57 ff.

৩৬) Chitrarekha Gupta, *The Kayasthas*, Calcutta, 1996.

৩৭) ছাত্রপাঠ্য বইগুলিতে রমেশচন্দ্র যখন বাংলা ও ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করেছেন তখন এই সময় জাতি-বর্ণ প্রথা কি ভাবে কঠোর হল তার কোন ব্যাখ্যা দেন নি। বরং তিনি লিখেছেন বাংলার জমিদারেরা এই পর্বেও অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু এবং গ্রাম-সমাজের উপর তারাই কর্তৃত্ব করতেন। দ্রষ্টব্য, *A Brief History of Ancient and Modern India*, Calcutta, 1909, p. 69 এবং *A Brief History of Ancient And Modern Bengal*, Calcutta, 1904, p. 68.

৩৮) R. C. Dutt, *The History of Civilization.......*, p. 238.

৩৯) দীনেশচন্দ্র সরকার, *প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী*, কলকাতা ১৯৩০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৫-১০০।

৪০) R. C. Dutt, *Romesh Chunder Dutt*, Delhi, 1968, pp. 150-51.

৪১) Richard W. Lariviere, Protestants, Orientalists, and Brahmanas : Reconstructing Indian Social History, *Royal Academy of Arts and Science*, 1995 pp. 9,14.

৪২) উপরোক্ত *রমেশ রচনাবলী*, পৃ. ৫১৪।

৪৩) *ঐ*, পৃ. ৬৩৪।

৪৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২।

৪৫) *রমেশ রচনাবলী*, পৃ. ৬২৮।

৪৬) R. C. Dutt, *A History of Civilization......*, p. XI.

৪৭) Sister Nivedita, Romesh Chandra Dutt, *Sister Nivedita's Lectures and Writings*, Kolkata, 1975, p. 265.

৪৮) রমেশচন্দ্র দত্ত, *হিন্দুশাস্ত্র* (ধ্যানেশনারায়ন চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় পুর্ণমূদ্রিত), কলকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ধর্মশাস অংশের পৃষ্ঠা ১৯।

৪৯) *ঐ*।

৫০) Romila Thapar, *Clan, Caste and Origin Myth in Early India*, Simla, 1992.

৫১) দ্রষ্টব্য রমেশচন্দ্র দৌহিত্র মধু বসুর আত্মজীবনীব; মনি বাগচীর রমেশচন্দ্রের জীবন কথা ইত্যাদি।

# নদী
# বসতির পটভূমি ও শহর

উত্তরা চক্রবর্তী

'কোথাও নদীর ঢেউএ
কোন এক সমুদ্রের জলে
........আমাদের জীবনের আলোড়ন'

"Rivers first create the land, then fertilize it, and finally distribute its produce"

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে এক কবি তাঁর কাব্যে বাংলার প্রধান নদী পথেব বিবরণ দিয়েছিলেন। কাব্যের প্রধান পুরুষ চাঁদ নামে এক সওদাগর, সপ্তডিঙা মধুকরে বেসাতি নিয়ে সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে বাণিজ্য যাত্রায় রওনা হন, সমুদ্রের দিকে। ভাগিরথীর জলরাশিতে বিমুগ্ধ সওদাগর, নদীর দু'ধারে জনপদ বসতি, শহর, গ্রাম দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে পৌঁছন।

যে কবি এই কাব্য কাহিনী লেখেন, তাঁব নাম বিপ্রদাস পিপলাই। কবির নিজের কথায় তাঁর বাসস্থান বাদুড্যায়। যে নদীর কথা তিনি লিখেছেন, তার থেকে বেশীদূর ছিলনা তাঁর ঘরবাড়ী। কাব্যের নায়ককে যে নদী পথ দিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন, সেই নদী পথ তাঁর অতি পরিচিত ছিল। নদীর কোন পারে, কোন বসতি - তার নিখুঁত বর্ণনা তাই তার লেখায়।[১]

পিপলাই এর একশো বছর পর আরেক কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঠিক একইভাবে, এই একই নদী পথের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর লেখাতেও আমরা পূবে পশ্চিমে — কোতরং, কামারহাটি, আড়িয়াদহ, চিৎপুর, শালকিয়া, বরানগর, কলিকাতা, কুচিনানের বিবরণ পাই।[১খ] তাঁর লেখাতেও নদীর দুই ধারের সমৃদ্ধ জনপদের ব্যস্ত পথঘাটের খবর পাওয়া যায়। বোঝা যায় নদী আর তার জলধারার গতিপথের দু'পাশের জনবসতি, পনেরো শতক এবং ষোল শতকের দুই কবিকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল।

নদীর সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ - এই তত্ত্বটি তাঁদের লেখায় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি পরিষ্কার ধরা পড়েছে, নদীর গতিপথের ভৌগোলিক অবস্থান।

পনেরো এবং ষোল শতকেরও আগে, গঙ্গা নদীর ভাগিরথী প্রবাহের দুই পাশে যে জনপদ সুদূর অতীতে গড়ে উঠেছিল, সে কথাও ঠিক একইভাবে অতীত কালের বিবরণী থেকে জানা যায়। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের অনামী গ্রিক লেখক গঙ্গার মোহনার কাছে গাঙ্গে বন্দরের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[২] পিপলাই বা মুকুন্দরাম যেমন লিখেছেন, তেমনি ভাবে পেরিপ্লাসের অজানা গ্রিক লেখক লিখেছেন, তাঁর সময়ে রপ্তানি পণ্য নদীপথে বাহিত হয়ে গাঙ্গে বন্দরে পৌঁছত, পাল তোলা জাহাজে, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য। নাম-নাজনা-গ্রিক নাবিকের লেখা পেরিপ্লাস গ্রন্থটিতে গঙ্গা এবং গাঙ্গের বিশদ বিবরণ আমরা পাই। দু'হাজার বছর আগে, এই বন্দর শহরটি ছিল নদী এবং সমুদ্রের যোগাযোগের মধ্যবিন্দু — এ তথ্যটি স্পষ্টই বোঝা যায়।

গঙ্গা এবং ভাগিরথী শাখানদীর এবং তীরবর্তী জনস্থান গুলির অসংখ্য উল্লেখ আছে সেকালের সাহিত্যে। রঘুবংশের চতুর্থসর্গে গঙ্গাতীরবর্তী সুহ্মদেশের কথা বলেছেন কালিদাস। দশকুমার চরিতে বা বারোশতকের কবি ধোয়ীর লেখা পবন দূতমে সুহ্মদেশের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সুহ্মদেশের কল্পিত রাজরানী বিজয় পুরের বর্ণনায় ধোয়ী লিখেছিলেন 'গঙ্গাবীচি বিধৌত নগরী'। সে নগরী কি তাঁর সময়ের গঙ্গাতীরবর্তী নদীয়া?[৩]

বারোশতকের শেষের দিকে ডোম্মনপাল নামক সেন রাজাদের জনৈক সামন্ত, 'দ্বারহাটক' অঞ্চলে একটি 'ভূমিদান পত্র' পত্র জারি করেছিলেন, দ্বারহাটক গঙ্গার মোহনার ওপর অবস্থিত ছিল। সেন রাজাদের তাম্রপত্রে 'বেতড্ড' নামে একটি 'চতুরক'র উল্লেখ আছে। 'চতুরক' কথাটির অর্থ, চারটি পথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি জনপদ, 'দ্বারহাটক' কথাটিও অর্থবহ। কোন প্রবেশ নির্গম পথের দুয়ার বা দ্বার হিসেবে যে হাটক বা হাট অবস্থিত, তাই 'দ্বারহাটক'। নদীর মোহনার কাছে বা সমুদ্রের কাছেই সম্ভবত 'দ্বারহাটক' গুলি গড়ে উঠত। 'চতুরক' এবং 'দ্বারহাটক' দুই-ই ছিল কোন হাট বাজারের এলাকা। বেতড্ড চতুরক গঙ্গার পশ্চিম পারের মোহনার ওপরে অবস্থিত ছিল।[৪] পনেরো এবং ষোল শতকের বেতোর আর দ্বাদশ শতকের বেতড্ড, একই অঞ্চল, একই তার চরিত্র। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একই নদীর পারে তার বহুদিনের অবস্থান। এখানেই ষোল শতকে, ইটালিয় পর্যটক সিজার ফ্রেডরিক, পর্তুগিজদের জাহাজ নোঙ্গর করতে দেখেছিলেন।

এই সমস্ত তথ্য থেকে যে বৃত্তান্তটি সুনিশ্চিত হ'ল - তা এই, যে, গাঙ্গেয় দক্ষিণ

পশ্চিম অঞ্চল, গঙ্গা-ভাগিরথী নদীর দৌলতে এবং আরও অনেক শাখা এবং উপনদীর দাক্ষিণ্যে, বহুদূর অতীতকাল থেকে সুসমৃদ্ধ এবং জনবসতি পূর্ণ ছিল। জনবসতির উল্লেখ সাহিত্যিক উপাদানে যেমন পাওয়া যায়, তার পাথুরে প্রমানও মেলে নদীরই ধারে। হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, আদি গঙ্গার পার ধরে, বোরাল, হরিদেবপুর, ছত্রভোগ, এই সব অঞ্চল গুলি থেকে পাওয়া নানা প্রত্ন নিদর্শন থেকে।[৫]

এই সব প্রাচীন জনপদের উপস্থিতি, এগুলির অবস্থান অবশ্যই হল একটি homogenous এলাকায়, পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপে।

গঙ্গার শাখা-প্রশাখার বাহিত পলিমাটিতে গাঙ্গেয় বদ্বীপ বহুকালের প্রক্রিয়াতে গড়ে উঠেছিল। নদীর বয়ে আনা পলির ক্রমাগত জমে ওঠা থেকে বদ্বীপ তৈরী হয়। পুঞ্জীভূত পলির সমষ্টিতে যে ভূখণ্ড তৈরী হয়েছিল, তার পরিমান কতদূর হবে — এই নিয়ে নানা মত আছে। আর ডি সলসবারির অভিমত - নদীর উচ্চ অববাহিকা পর্যন্ত স্তূপীকৃত পলিমাটির বিস্তারই বদ্বীপের দূরতম সীমানা বলে মনে করা যেতে পারে।

Δ ত্রিকোণাকৃতি এই গ্রীক অক্ষরটি - DELTA , প্রথম ব্যবহার করা হয় মিশরের নীল নদের ক্ষেত্রে। দুটি শাখা নদীর দূরতম ব্যবধানের মধ্যে এবং একটি বিশাল স্থায়ী জলরাশির (সমুদ্র) বিপরীতে, যে ভূখণ্ড জমে ওঠা পলি দিয়ে তৈরী হয়, বাংলা '**ব**' বা গ্রীক Δ অক্ষরের আকৃতি নিয়ে, তাই, বদ্বীপ বা DELTA .[৬]

একটি সুদূরবাহী নদীর গতির বদল হয়, নিম্নবাহিকায় পৌঁছনর পর। উচ্চ অববাহিকায় উপনদী গুলি মূলনদীর সঙ্গে মিশে, তাকে পুষ্ট করে।

নিম্নএলাকায় নদীর ক্রমাগত পলি ফেলার ফলে নদীর দুই পার উঁচু হয়ে যায়, নদীর জল পার ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুপাশের তীরভূমিতে পলি জমতে থাকে, আর তারই ভেতর দিয়ে পথ কেটে মূল নদীর জলধারা নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হয়। এভাবে সমুদ্রের কাছাকাছি, মূল নদী এবং অসংখ্য শাখা নদীর পলি জমে তৈরী হয় বদ্বীপ।

নিম্নবাহিকায় নদীর গতি সর্পিল, আঁকাবাঁকা (meandering oscillation), দেখতে পাই। এই সব লক্ষণ গুলি গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলেও আমরা দেখতে পাই। গাঙ্গেয় বদ্বীপের পরিসীমার কথা বলতে গিয়ে টমাস ওল্ডহ্যাম বলেছেন, পশ্চিমে হুগলি নদী এবং পূর্বদিকে মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং সমগ্র সুন্দরবন নিয়ে গাঙ্গেয় বদ্বীপের পরিধি। এই বদ্বীপ তৈরী হয়েছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখাপ্রশাখা দিয়ে।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের শুরু রাজমহল থেকে - এখান থেকে গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগিরথী নামে পরিচিত। ভাগিরথী নামটি পুরাতন। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। বহুপরে, অনেকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে, আজকের কলকাতার কাছাকাছি এসে ভাগিরথীর নাম বদলে হয় 'হুগলি'। এই নাম ইংরেজদের দেওয়া। একদা ভাগিরথী-হুগলি দক্ষিণ পশ্চিমে বাঁক নিয়ে বেতোরের কাছে এসে, সরস্বতী নামক আরেকটি শাখানদী, যা কিনা হুগলির শহরের ওপরে ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গা থেকে বিমুক্ত হয়ে আরও দক্ষিণ পশ্চিম ধরে প্রবাহিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে খানিকটা পূর্ব দিক ঘেঁষে হাথিয়াগড়, ছত্রভোগ হয়ে সাগরদ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে পৌছত।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Changing Face of Bengal' বইটিতে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের ক্রমাগত পরিবর্তনের কথা বলেছেন। নদী এবং তাঁর শাখা-প্রশাখা কতভাবে বাংলার ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তার বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। সমগ্র বাংলাই, তাঁর মতে একটি বিরাট পলিমাটির সমভূমি। রাধাকমল এই সমভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন (১) পুরোনো বদ্বীপ অথবা পশ্চিম এবং মধ্য বাংলা, (২) নতুন বদ্বীপ বা পূর্ব বাংলা এবং (৩) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দোয়াব অথবা উত্তরবঙ্গ। পশ্চিমে ভাগিরথী, উত্তরে পদ্মা এবং পূর্বে মধুমতী এই তিন নদী দিয়ে ঘেরা মধ্য বাংলাই প্রকৃত অর্তে গাঙ্গেয় বদ্বীপ।[৭] এই অঞ্চলটির মধ্যেই বাংলার রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়গুলি বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছে। আর এই পরিবর্তন এবং পরিকাঠামোর প্রসার নির্ভর করেছে নদীর ওপর, নদীর গতি ও প্রবাহের ওপর। নদীর সঙ্গে তাই বাংলার ইতিহাস একান্তভাবে জড়িত। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় একথা বলেছেন, নদীর তীরের বসতি, জনপদ এবং শহরগুলির উত্থান, বিকাশ, পতন, নদীর গতির ওপর নির্ভর করেছে। যেমন সোনারগাঁও, বাকলা, শ্রীপুর — তাঁর মতে এগুলি কোন এক সময় সমুদ্র বন্দর ছিল, ভাগিরথী ক্রমশ পশ্চিমদিকে সরে যাওয়ায় এই সমুদ্রবন্দর গুলির পতন হয়। মধ্যযুগের চট্টগ্রাম বা আরও পরে সপ্তগ্রামের পতনও এভাবে হয়েছিল।[৮]

জনবসতির প্রধান উপকরণ হল সুমিষ্ট পানীয় জল, যেখানে নদীর সুমিষ্ট জলের জোর বেশী, বন্যা এবং জোয়ারের ভেসে আসা সামুদ্রিক নোনা জলকে অতিক্রম করতে পারে, মোহনার কাছেও যা পাওয়া যায়, সেখানেই জনবসতি গড়ে ওঠে।[৮খ] শহর ও গ্রাম গড়ে ওঠে, কৃষি, শিল্প এবং পণ্যের বাণিজ্য নদীপথ ধরে প্রসারিত হয় — যুগ যুগ এবং শতক ধরে গড়ে ওঠে। আবার যখন জলধারার প্রবাহ ভিন্ন পথ

ধরে, তখন, যে নদী প্রাণ সঞ্চারের উপাদান জুগিয়ে ছিল, তার সঙ্কোচন, প্রত্যাহার, অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে।

নদীর এই আকস্মিকতা (unpredictability) কোন linear রেখায় চলেনা এবং ঘটেনা। সোজা সরল রেখায় নদীর গতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বরঞ্চ অপ্রত্যাশিত এবং অভাবিত বক্রতায় নদীর গতি সময়ে, অসময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ predictable linear রেখায় না বয়ে, অভাবিত non-linear বক্রতায় গতির পরিবর্তন, খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় বদ্বীপে পৌঁছে, নদীর meandering oscillation বা আঁকাবাঁকা সর্পিল বহমানতায়। দুধারের levee কে অতিক্রম করে যখন নদীর জল, শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যায়, তখন তার অবিধেয় এলোমেলোতার মধ্যে বিশৃঙ্খলার, বিপর্যয়ের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এই সম্ভাবিত বিশৃঙ্খলা (chaotic) রূপায়িত হয় বন্যায়, প্লাবনে, প্রাণের চিহ্ন, বসতির নিদর্শন ধুয়ে মুছে যাওয়ায়।

নদীর এই অবারিত দান, অকারণ প্রত্যাহার, গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের নগর, জনপদের কখনও জন্ম দিয়েছে, কখনও বা তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে। জনৈক ভৌগোলিক সম্ভবত একথা মনে রেখেই তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন '*Romance of the Rivers of the Ganges Delta*'[৯] মধ্যযুগের শহর ও নগরের গড়ে ওঠা, বিন্যাস এবং কখনও হারিয়ে যাওয়া, নদীর এই বিচিত্র লীলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

সতীশচন্দ্র মজুমদার তার Rivers of the Ganges Delta বইতে বলেছেন, ভাগিরথী-হুগলির প্রবাহই বহু প্রাচীন কাল থেকে বদ্বীপ অঞ্চলে গঙ্গার জলপ্রবাহ ছিল। এর দু'পাশে প্রাচীন কালের বসতি গড়ে ওঠে। জনবসতির নানা লক্ষণের প্রধান একটি ছিল ধর্মস্থান। নানা মন্দির, দেবালয়, ভাগিরথী-হুগলির পুরোনো প্রবাহের দুপাশে গড়ে উঠেছিল। যার প্রত্ন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।[১০] ষোল শতক পর্যন্ত ভাগিরথীর জলধারা, হুগলি, চব্বিশ পরগণা হয়ে, হাতিয়াগড়, ছত্রভোগ পার হয়ে সাগর দ্বীপের কাছে সমুদ্রে পৌঁছত। ভাগিরথী-হুগলির এই অংশ আদি গঙ্গা নামে এখনও পরিচিত, যদিও ভাগিরথীর জলপ্রবাহ এখন আর ও পথে প্রবাহিত হয় না। সতেরো শতকের শেষাশেষি, অথবা আঠেরো শতকের গোড়ায় ভাগিরথী-প্রবাহ, পশ্চিমদিকে সরে এল। যে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত জলপথ এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল, তা বদলে গেল। ফলে আদিগঙ্গার ধারা ক্ষীণ হল; হাথিয়াগড়, ছত্রভোগ এই সব অঞ্চলের জনবসতির ওপর তার প্রভাব পড়তে শুরু করে। অঞ্চল গুলি ক্রমশঃ জনশূণ্য হয়ে গেল।

নদীর আঁকাবাঁকা গতির হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন, কৃষি ও বসতিতে পরিবর্তন এনেছিল অনিবার্য ভাবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ থেকেই গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে ধান চাষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার পাথুরে প্রমান মিলেছে পান্ডুরাজার ঢিবির উৎখননের সময়ে।[১০(খ)]

তেরো শতকের মধ্যে ভাগিরথী-হুগলির পশ্চিম অংশের সমভূমি বিস্তৃত কৃষি ভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। পূর্ব অংশ কিন্তু তখনও বিস্তীর্ণ জলাভূমি। পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে পূর্ব অংশের জলাভূমি কৃষি অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সীমানাও পূর্ব দিকে প্রসারিত হতে শুরু করেছে।

মধ্যযুগের বাংলার সুলতানি শাসনও প্রসারণের এই ভৌগোলিক ধারাকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছিল। মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, হাভেলি, দরগা, মাজহার, সামরিক ছাউনি, এসমস্ত তার বাহ্যিক লক্ষণ, দক্ষিণ পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত হয়ে মধ্যযুগীর বাংলার সুলতানি শাসনকে চিহ্নিত করেছে।[১০(খ)]

ষোল শতকের তৃতীয় দশকে পর্তুগিজ বণিক পর্যটকরা বাংলায় এসে পৌঁছয়। বাংলার পূর্ব প্রান্তে চট্টগ্রামে তাদের বাণিজ্যের জাহাজ নোঙ্গর করেছিল। ততদিনে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের দখল থেকে বাংলার সুলতানদের হাতে এসেছে। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, সমুদ্র বণিক পর্তুগিজদের তাই চট্টগ্রাম পছন্দ ছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তারা আরেকটি বন্দর অবিষ্কার করল, সরস্বতী এবং ভাগিরথীর ওপর - সপ্তগ্রাম বন্দর। হুসেন শাহি আমলে সপ্তগ্রাম জমজমাট শহর।[১০(গ)] এই শহরের রমরমার বিবরণ পিপলাই এবং মুকুন্দরাম, দু'জনেরই লেখায় পাওয়া যায়।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন সপ্তগ্রামের বিস্তৃতি একসময় সরস্বতী থেকে ভাগিরথী পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল।[১১] এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র হৃতগৌরব সপ্তগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

"একদিকে নিবিড় বন;......অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সুতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। .....অন্যদিকে, অনেকদূরে নৌকাভরণা ভাগিরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যা তিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।"[১২]

একদিকের যে ক্ষুদ্র খালের কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, সেটি *'বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর', 'সঙ্কীর্ণ শরীরা স্রোতস্বতী'*, কিনা স্পষ্ট করে তা তিনি লেখেন নি। এমনটি *'তন্নগরের (সপ্তগ্রামের) প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত'* — সেই স্রোতস্বতীর নাম তিনি লেখেননি। তবু *'বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর'* (খ্রিঃ সতেরো

শতক) হৃতশ্রী সপ্তগ্রামের একপাশে ক্ষীণতর সরস্বতী এবং আরেক পাশে জলভারে পুষ্ট ভাগিরথীর বর্ণনাই সম্ভবত পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।[১৩] সপ্তগ্রাম নগরের একপাশে সরস্বতী আরেকপাশে ভাগিরথী - রাধাকমলের এই উক্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ষোল শতকের সূচনা পর্যন্ত পিপলাই বর্ণিত জলপথ ধরে বাণিজ্যের নৌকা যাতায়াত করেছে বেতোর পর্যন্ত, সেখান থেকে আজকের আদিগঙ্গার পথ ধরে সমুদ্রে। ষোল শতকের দ্বিতীয় ভাগে শাখানদী সরস্বতীর খাতে পলি জমে, সরস্বতী শুকিয়ে যেতে শুরু করে। ১৫৬৭ সালে ভেনেশিয় পর্যটক সিজার ফ্রেডরিক (ফ্রেডোরিচি) বলছেন — সরস্বতী নদীর উত্তরে আর জাহাজ যেতে পারে না। বঙ্কিম চন্দ্র, কপালকুন্ডলা উপন্যাসের সময় কালের (১৭ শতকের গোড়ার দিক) সপ্তগ্রাম শহরের বর্ণনায় সময় একই কথা লিখেছিলেন। ১৫৭৪ সালে আবুল ফজল লিখছেন ঃ 'টান্ডার কাছে গঙ্গা দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। নদীর একটি ধারা প্রবাহিত হচ্ছে সাতগাঁওর দিকে, আরেকটি সোনারগাঁওর দিকে'।[১৪]

নদীর গতি পরিবর্তনের জন্য জনবসতির পরিবর্তন ঘটছে। চোদ্দ শতকে গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম বেগবতী প্রবাহ বদ্বীপ অঞ্চলের এই অংশের জনবসতি, কৃষি, শহরের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। চোদ্দ শতকেই ইবন বতুতা সপ্তগ্রাম থেকে নদীপথ বেয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে লক্ষ্য করেছিলেন দুধারে ঘন বসতি, গ্রাম গঞ্জ - 'আমি যেন একটি ব্যাপ্ত বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছি', ইবনবতুতা লিখেছিলেন তাঁর 'রেহলা' গ্রন্থে।[১৫]

একশো বছর পরেও এই প্রবাহ সমান গতিশীল। ষোল শতকে নদীব জলধারার গতি বদলাচ্ছে। পূর্বদিকের পদ্মা শাখার জল বাড়ছে. পূর্ব দিকে চাষবাস হচ্ছে, জনবসতি ঘন হচ্ছে।[১৬]

সতেরো শতক পর্যন্ত ভাগিরথীর সমুদ্র যাত্রা আজকের টলির নালা বা অদিগঙ্গার প্রবাহ দিয়েই অব্যাহত ছিল; যে পথ দিয়ে পিপলাই এর চাঁদ সওদাগর বা মুকুন্দরামের ধনপতি এবং শ্রীমন্ত সওদাগর রওনা হয়েছিলেন। সতেরো শতকের শেষাশেষি, অথবা আঠেরো শতকের সূচনায় আদিগঙ্গার প্রবাহ ক্রমশ: ক্ষীণ এবং অগভীর হয়ে যাচ্ছে। ভাগিরথীর নতুন প্রবাহ তখন একপাশে মোগলদের মাটিয়াবুরুজ, অন্যপাশে তান্না দূর্গ পার হয়ে, ফলতা পেরিয়ে সমুদ্রে পৌঁচচ্ছে। ভাগীরথীর এই নতুন প্রবাহের দু'পাশে নতুন বসতি গড়ে উঠতে শুরু করল।

পনেরো অথবা ষোল শতকের কোন এক সময় শেঠ বসাক তন্তুবণিকরা সপ্তগ্রাম ছেড়ে ভাগিরথীর কূলে, গোবিন্দপুর, সুতানুটি এবং কলিকাতা - এই তিনটি গ্রামের

বসত করিয়েছিল। মূলত তাঁত ব্যবসার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে তিনটি গ্রামের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে যায় - বিশেষ করে কলিকাতা গ্রামের বড়বাজারের আকর্ষণে বহু ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করতে আসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে শেঠ বসাকরা নদীর উপযোগিতা বুঝেই নদীর ধারে বসত করেছিলেন। নদীর বাণিজ্য, সমুদ্রের বাণিজ্যের পরিপূরক, একথাও তাদের মনে ছিল।[১৬খ]

সতেরো শতকের সত্তরের দশকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট স্ট্রেইনশাম মাস্টার, নতুনতম বাণিজ্যঅঞ্চলের সন্ধানে, গঙ্গার মোহনা দিয়ে গোবিন্দপুরে এসে পৌঁছন। গোবিন্দপুরের বিবরণ পাই তার ডায়েরিতে। মাস্টার লিখছেন গোবিন্দপুরের সমৃদ্ধি এবং বাসিন্দাদের কথা; মাস্টারের ডায়েরি থেকে জানা যায় বাঙালী বণিকরা নদীপথ দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছত এবং উপকূল বেয়ে মাদ্রাজে এসে উপস্থিত হত প্রায়শই।[১৭]

কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর এই তিন উপাদান নিয়ে ষোল, সতেরো আঠেরো শতক ধরে আজকের কলকাতা শহর পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে। এই গড়ে ওঠার নানা রাজনৈতিক নানা অভিঘাতের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলিও কাজ করেছিল। শহর গড়ে ওঠার পর্যায়গুলিতে নানা বিঘ্ন ছিল। কিন্তু বড় বিঘ্ন ছিল নদী। ইংরেজদের শহর কলিকাতা গড়ে ওঠার পেছনে নদীর বড় ভূমিকা আছে। নদী সাহেবদের বিমুগ্ধ করেছিল, আকৃষ্ট করেছিল, আবার ভীতও করেছিল। ফলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নদীর সঙ্গে মোকাবিলা তাদের ফুরোয়নি।

শহর গড়ে ওঠার প্রবল উৎসাহে প্রথম দিকে নদীর প্রকৃতি নিয়ে তেমন মাথা না ঘামালেও, অল্প পরেই, নদীর ক্রমাগত পার ভাঙ্গা তাদের উদ্বিগ্ন করে। ১৭০৩-৪— ১৭৩৭-৪০ পর্যন্ত নদীর পূর্ব পারে, বিশেষ করে গোবিন্দপুরের কাছে ক্রমাগত পার ভাঙ্গা নিয়ে কলিকাতা, সুতানুটি অফিস এবং লন্ডন অফিসে চিঠি চালাচালি হত। কোম্পানির নথিপত্র থেকে কোম্পানির এজেন্ট এবং কর্মচারীদের ভাবনা চিন্তার আভাস পাওয়া যায় — embankment বা বাঁধ দিয়ে, নানা পরিকল্পনাও চলতে থাকে। জনৈক জোসেফ টলসনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, গোবিন্দপুরের কাছে, নদীর পার বাঁধানোর কাজে।[১৮]

প্রতিবছর বর্ষার সময়ে জোয়ারে গোবিন্দপুরের পার ভেঙ্গে, গঞ্জ, কাছারি বাড়ী বিপন্ন হত। তলিয়ে যাওযার সম্ভাবনা, শঙ্কা থেকেই যেত। ১৭৩৭ সালের বিধ্বংসী ঝড়ে এবং জলোচ্ছ্বাসের পর গোবিন্দপুর ছেড়ে বাসিন্দারা উত্তরে সুতানুটিতে চলে আসতে শুরু করে। গোবিন্দপুর গ্রাম পরিত্যক্ত হ'ল — তার জায়গায় নদীর পার বাঁধিয়ে উঁচু করে, নতুন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তৈরী হয়।[১৯]

Meandering oscillation বা বড় বড় বাঁক তৈরী করে বয়ে যাওয়া, নিম্ন অববাহিকায় বা বদ্বীপ অঞ্চলে নদীর প্রবাহের একটি বড় লক্ষণ। এখানে পলি জমতে থাকে, নদীর পার এবং তলা উঁচু হয়ে যায়, ফলে এক বাঁকের মুখে বাঁধা পেলে, নদী আরেক বাঁকের দিকে সরে যায়। নিম্ন অববাহিকায়, সমুদ্রের কাছে নদীর এই আঁকাবাঁকা গতি, linear বা সরল পদ্ধতিতে চললেও, কখন নদী কোন দিকে এবং কোন সময় বাঁক নেবে এবং কিভাবে, অনেক সময়ই তা বলা যায় না। অবধারিত পথ ছেড়ে, নদী হঠাৎ অন্য দিকে মোর নেয়। শহরের ভাঙ্গা গড়া ও জনবসতি গড়ে ওঠা বা হঠাৎ বিরল থেকে বিরলতর হয়ে হারিয়ে যাওয়াও এই non linear বা অভাবিত, চকিত, অপ্রত্যাশিত রেখাপথের ওপর নির্ভর করে।

সতেরো শতকের শেষের দিকে 'সুমাত্রা' নামে একটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল ভাগিরথীর পশ্চিম পারে। নদী বাঁধা পেয়ে পশ্চিম থেকে পূব দিকে সরে যায়। নদীর গতির জোর বাড়ে সেই দিকে। সে কারণেই আঠোরো শতকের গোড়া থেকে পূর্ব পারের গ্রাম গোবিন্দপুরের পার ভাঙ্গতে থাকে। সমৃদ্ধ গোবিন্দপুর গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে নতুন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ গড়ার জন্য, নদীর পার বাঁধিয়ে যে, embankment তৈরী হয়েছিল, তাতে বাধা পেয়ে নদী আবার পশ্চিম দিকে সরতে থাকে। যার ফলে দেখা যায় সতেরো আঠেরো শতকে নদী পূব ঘেঁষা হলেও, উনিশ শতকে নদী আবার অনেকটাই পশ্চিমদিকে সরে গেছে।

দক্ষিণ গাঙ্গেয় অঞ্চলের নদীর শাখা প্রশাখা, উপশাখা, উপনদীর জলপ্রবাহ, ইংরেজদের কতখানি বিমুগ্ধ এবং আলোড়িত করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, নদী নিয়ে তাদের ছবি, নকশা, চার্ট আর নানাবিধ আলোচনা গুলিতে।

আঠেরো শতকে রেনেল (Rennell) লিখলেন *'Accounts of the Ganges and Brahmaputra'*. সেই সময় থেকে শুরু করে কুড়ি শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত Major Hirst, Willcocks, Addams - Williams, Fergusson এবং তাঁদের উৎসাহ উদ্বুদ্ধ বাঙালী লেখক সতীশ চন্দ্র মজুমদার[২০] — নদী নিয়ে লেখা তাঁদের কখনও ফুরোয়নি।

সতেরো শতক থেকে কুড়ি শতক পর্যন্ত, এদেশ থেকে ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত এঁরা ক্রমাগত নানা নকশায়, নদীর গতি এবং তার পরিবর্তনের ছবি এঁকে গেছেন।

এদেশে এসে, সমুদ্র উপকূলে প্রথম ঘাঁটি করলেও, ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত নদীর তীরের অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছিল তাদের প্রধান বসতি হিসেবে।

সমুদ্রের কাছাকাছি, জলপথবাহিত বাণিজ্য, তিনটি সম্পন্ন বাণিজ্যিক গ্রাম, একটি সমৃদ্ধ পণ্যশিল্প, ইংরেজদের আকৃষ্ট করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, নদীর অমোঘ আকর্ষণ, হয়তো বা ভাগিরথী, তাদের ফেলে আসা স্বদেশের, সমুদ্রের কাছাকাছি, আরেকটি নদীকে স্মরণ করাতো।

সে নদীর ধারের প্রিয় শহরের অনুকরণে, উপনিবেশের শহরটিকে তারা গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) বিপ্রদাস পিপলাই, *মনসাবিজয়* (১৪৯৫-৯৬)।

১খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী,* বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বিজিতকুমার সম্পাদিত, পৃ. ১৫৬, ১৮২।

২) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল,* ভল্যুম - ১।

J. W. Mccrindle, *Ancient India : As described by Ptolemy*, 1885 পৃ. ১০২.

৩) তদেব।

৪) রণবীর চক্রবর্তী, *Between Villages and Cities . Linkages of trade in India (c 600 -1300 A D.).* Essays in Honour of Dietmar Rothermund, eds. Georg Berkemer, Tilman Frasch and Jiirgen Liitt, New Delhi, 2001 পৃ. ১০৯-১১০।

৫) B. D. Chattopadhyay, *Urban Centres in Bengal*, Pratna Samiksha Vol-2, 3, 1993-94, P 169-187 (Journal of the Directorate of Archaeology and Museum); D. K. Chakraborty, Archaeology of Eastern India; Sima Roychowdhury, *Early Historical Terracotta from Chandraketugadh,* Pratna-Samiksha, Vol 4 and 5, 1993, P. 88; Uttara Chakraborty and Swati Biswas, *Archaeology of Calcutta; Evidence from Bethune College, Pura-ttata : Bulletin of the Indian Archaeological Society,* New Delhi, Number 29, 1998-99, পৃ. ৮৭।

৬) Kanan Bagchi, *The Ganges Delta,* University of Calcutta, উদ্ধৃতঃ C. S. Fox - Physical Geography for Indian Student দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পৃ. ৬-৯, চতুর্থ পরিচ্ছেদ পৃ. ৪৭।

৭) তদেব, পৃ. ৭-৯, ৪, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, উদ্ধৃত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, উদ্ধৃত; Thomas Oldham, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1870.

৮) Radhakamal Mookerjee, *The Changing Face of Bengal* : A Study in Riverine Economy : D. R. Bhandarkar Commemorative Volume পৃ. ৩৪১-৩৬৪।

৮ক) Kanan Bagchi, The Ganges Delta, পৃ. ৮-১৫, ১৬, অষ্টম পরিচ্ছেদ পৃ. ৮১।

৯) Raibahadur S. G. Chatterjee, *Romance of the Rivers of Bengal,* Kanan Bagchi, পৃ. ১০।

১০) C. Addams - Williams, *History of the Rivers in the Gangetic Delta, 1750-1918* (1919), Reprinted, Rivers of Bengal : A Compilation Vol II, Kumud Ranjan Biswas, West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, Kolkata, 2001, পৃ. ৩১-৩৫, পৃ. ২২৬, ২৪০।

১০খ এবং গ) Richard Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, OUP, 1993, পৃ. ৫, পৃ. ২০-১৩৪।

১১) Radhakamal Mookerjee, Changing Face of Bengal, উদ্ধৃত Kanan Bagchi, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৪, ১৫।

১২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুন্ডলা, প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬, সাহিত্য সংসদ, মাঘ ১৩৬৩, পৃ. ১৫৯।

১৩) তদেব।

১৪) H. G. Reaks, *Report on the Physical and Hydraulic Characteristics of the Rivers of Delta, 1919,* Rivers of Bengal, Vol. II, West Bengal District Gazetteer পৃ. ৩২, ৩২-৩৪।

১৫) A. Chitcharov, India : Changing Economic Structure in the Sixteenth to Eighteenth Century, পৃ. ১০৪।

১৬) Richard Eaton. The Rise of Islam and Bengal Forntier, পৃ. ২২-৭০।

১৬খ) C. R. Wilson, Early Annals of the English in Bengal, Vol. I, পৃ. ১২৭, ১২৮, ১৩৭, ১২৭।

১৭) Streynsham Master, Diarry 1677 : Memorandum of Service Done for East India Company by Streynsham Master in the year 1678 taken out of Diary and Consultation Booke from Fort St. George by S. Master. (from original : British Library, London) পৃ. ৫৮-৫৯।

b) C. R. Wilson, Early Annals of thc English in Bengal Vol. I, Asiatic Society (Reprint), Calcutta, পৃ. ৫৮-৫৯।

১৮) C. R. Wilson, Fort William Records Vol - I, London 1906, পৃ. ৪৭, পৃ. ৬৭, ১৩২, ১৬২, ১৬৩।

১৯) তদেব।

২০) মেজর জেমস রেনেলের (Major James Rennell, Surveyor - General) পরিদর্শনের কাজ শুরু হয় ১৭৬৪, তার সার্ভে রিপোর্ট বই হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৭৮১।

মেজর হার্স্ট (Major Hirst) ছিলেন ডিরেক্টর অফ সার্ভে (Director of Survey)। নদীয়ার নদী সমূহের ওপর বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের জন্য কমিটি তৈরী করেন, ও রিপোর্ট লেখেন। (১৯১৯)

গ) সি. এ্যাডামস-উইলিয়মস (C. Addams Williams) ছিলেন, পি ডব্লিউ, ডির সুপারিনটেডিন্ট ইঞ্জিনিয়র - তাঁর রিপোর্ট History of the Rivers in the Gangetic Delta - বই আকারে এই নামে প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে।

ঘ) জেমস্ ফারগাসুন (James Fergusson) ১৮৬৩ সালে জিওলজিকাল সোসাইটি অফ লন্ডন, এর কোয়ার্টিলি জার্নালে লিখেছিলেন "On Recent Changes in the Delta of the Ganges". পুর্ণপ্রকাশিত হয় পুস্তিকা হিসেবে ১৯১২ সালে।

ঙ) সার উইলিয়ম উইলকক্স (Sir William Willcocks) ঃ Lectures on the Ancient System of Irrigation in Bengal and its Application to Modern Problems, University of Calcutta 1930.

চ) সতীশচন্দ্র মজুমদার, Rivers of the Bengal Delta, অবিভক্ত বাংলার চিফ্ ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, কম্যুনিকেশন অ্যান্ড ইরিগেশন ব্রাঞ্চ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে যে বক্তৃতা দেন তাই গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১) অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, রিডার, ভূগোল বিভাগ, হাবড়া শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়

২) অধ্যাপক রাজকুমার রায়চৌধুরী, প্রধান অধ্যাপক, ফিজিক্স ও এ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিকস বিভাগ, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

৩) অধ্যাপক কেয়া দাশগুপ্ত, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস, কলকাতা।

# ইতিহাস সমাজ রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ

হাসি ব্যানার্জী

*মাননীয় সভাপতি মহাশয়, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ তাদের এই বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে আধুনিক ইতিহাস বিভাগে সভাপতির নিবন্ধ পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এজন্য তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রস্তাবিত নিবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাস, সমাজ ও রাজনৈতিক বিষয়ক কিছু চিন্তা ভাবনা উপস্থাপিত করার প্রয়াস করেছি।*

একথা সুবিদিত যে রবীন্দ্রনাথ কোন পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না, দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ণধারও ছিলেন না। তবে ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যে তার গভীর আত্মিক যোগ ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আপনারা সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনিষদ নিষিক্ত আধ্যাত্মিক ও উদারনৈতিক মতাদর্শে। রবীন্দ্রনাথ **জীবনস্মৃতিতে** এই পারিবারিক উদারনৈতিক পরিমণ্ডলের কথা পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করেছেন। আমরা জানি তার মধ্যে একাধারে উপনিষদ, বুদ্ধদেবের বাণী, বৈষ্ণব ভাব ধারা, কবীর, নানক ও বাউল চিন্তা এবং ইউরোপীয় লিবারেল কালচারের সংমিশ্রণ হয়েছিল। তাঁর ইতিহাস, সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এর প্রতিফলন দেখা যায়।

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়দের মধ্যে ইতিহাস বোধের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে প্রাচীন কাল থেকে ঘটনা পরম্পরার ইতিবৃত্ত অনেকাংশে অকথিত ও অপ্রকাশিত রয়েছে, ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ মানসিকতার অভাবে। ইতিহাস সমাজ ও সামাজিক প্রগতির দর্পণ, সমাজ বিজ্ঞানগুলির মুখ্য উপাদান ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাসের অনুপস্থিতি তাঁদের পার্থিব জীবন সম্বন্ধে অনীহারই ফলশ্রুতি। **শিবাজী ও মারাঠা জাতি** প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "ভারতবর্ষে যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবন বৃত্তান্ত দেশের ইতিহাস নহে। দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোন একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণ সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে

সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সেই দেশ যথার্থ ভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়"।[১]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসরণ করে দেখা যায় যে তাঁর মতে সারা ভারতে "মারাঠা জাতিই প্রথম একটি সংঘবদ্ধ স্পষ্টসত্তা অনুভব করিয়াছিল। তাহা এই ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে। মহারাষ্ট্রের বখরগুলিই তাহার নিদর্শন। রাজপুতানাতেও ইতিহাসের টুকরা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা একটি দলের, একটি খন্ড রাজ্যের ইতিহাস। সমস্ত রাজপুত জাতির ইতিহাস নহে। শিখ গুরুদের ইতিহাসের মধ্যে শিখদের জাতীয় ইতিহাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু মারাঠা ইতিহাসের মত এমন ব্যাপক ও সাঙ্গোপাঙ্গো হইয়া উঠে নাই। শিখের ইতিহাসে অনেক বীরত্বের ও মহত্বের পরিচয় আছে। কিন্তু তাহাতে সুপরিণত রাষ্ট্র গঠনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। মারাঠারা কেবলমাত্র বীরত্ব করে নাই তারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল।"[২]

বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে বঙ্কিম পরবর্ত্তীকালে ইতিহাস চর্চা চেতনায় রবীন্দ্রনাথ নতুন স্বাক্ষর রাখলেন **সাধনা** ও **ভারতী** ও পত্রিকার মাধ্যমে। **ভারতী**তে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র **সিরাজউদ্দৌলা** ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার সমালোচনা লেখেন এবং বাংলার ইতিহাস লেখায় অক্ষয় কুমার যে স্বাধীন প্রবৃত্তি দেখান তার প্রশংসা করেন। এই সময় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তা ঐতিহাসিকদের কাছে প্রনিধানযোগ্য। "শাস্ত্র পুরাণ জনসমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস না হইলেও তাহা ধর্ম সমাজের ইতিহাস। এই জন্য ঘটনার সত্যতা রক্ষা করা পুরাণের উদ্দেশ্য নহে তাহা কেবল ধর্মমত ধর্মবিশ্বাসের ইতিবৃত্ত। কিন্তু লোকেরা যখন ধর্মসম্প্রদায় বলিয়া নহে জনসম্প্রদায় বলিয়া আপনার ঐক্য অনুভব করে - কেবল ধর্ম রক্ষা নহে জনগত আত্মরক্ষা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে। তখন তাহারা কেবল বিশেষ মত বা বিশ্বাস নহে, পরন্তু আপনাদের ক্রিয়াকলাপ কীর্ত্তি সুখ, দুঃখ ও সাময়িক ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে থাকে"।[৩] এই প্রবন্ধে আরও লক্ষ্যনীয় যে এই ইতিহাস লেখায় তিনি দেশীয় লোকের দ্বারা দেশের ইতিহাস লেখাকে স্বাগত জানান। "যেমন করিয়াই হউক ভারতবর্ষীয়কে পরের চোখে দেখিয়া আমাদের সান্ত্বনা নাই .... বর্তমান ইউরোপের আদর্শ দ্বারা ভারতের ইতিহাস পরিমেয় নহে। একদেশের আদর্শ লইয়া আর একদেশের খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশীর লেখনী মুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতে শুভ হয় না।"[৪]

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার **রবীন্দ্রজীবনী** প্রথম খন্ডে লেখেন যে রবীন্দ্রনাথেরই উদ্যোগে অক্ষয় কুমার **সিরাজউদ্দৌলা** (১৮৯৭) ও রাজসাহী

জেলাশহর থেকে **ঐতিহাসিক চিত্র** (১৮৯৯) প্রকাশনা শুরু করে বাংলায় ইতিহাস রচনা ও গবেষনার নতুন প্রক্রিয়া সুচনা করেন। **ঐতিহাসিক চিত্র** প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করেছিলেন আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার গুরুত্বের কথা। "বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করে এবং বাংলার রাজবংশে পুরাতন দপ্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আছে" এই সব প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫]

ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তিনি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত একটি প্রাচীন পুঁথির তালিকা রক্ষিত আছে।[৬]

**ইতিহাস কথা** প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কথকতা, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে ইতিহাসকে লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলেন।[৭]

রবীন্দ্রনাথ গাথা ছড়া, উপকথা, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি এইগুলোকেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে পঠনপাঠনের উপর জোর দেন : "সমস্ত জনশ্রুতি লিখিত ও অলিখিত, তুচ্ছ ও মহৎ সত্য ও মিথ্যা, যাহা তথ্য হিসাবে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ ইতিহাস কেবল তথ্যের ইতিহাস নহে তাহা মানব মনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।"[৮] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন "আপনি ব্যক্তিগত অন্ধ সংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্য সন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আমাদের দেশের অনেকে যাহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য তাহাদের সাধনা এইরূপ বিশুদ্ধ নহে।" ওই একই চিঠিতে তিনি একথা বলছেন যে "বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমন মানি।"[৯] এর থেকে বোঝা যায় যে তিনি তথ্য ও ভাবুকতার মিশ্রণে ইতিহাস রচনার কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশ বিদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখা পড়তেন এবং ভারতীয় ইতিহাস সভ্যতা সংস্কৃতির উপর বেশ কিছু বই পড়েছিলেন। তিনি জেমস টড্ বর্ণিত Annals & Antiquities of Rajasthan, ক্যানিংহাম লিখিত শিখ জাতির ইতিহাস, **ভক্তমাল** গ্রন্থে বর্ণিত বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং চার্লস এ্যাকুয়ার্থ সংগৃহীত মারাঠা কাহিনী (Ballads of Marathas) অধ্যয়ন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালের বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠ করেন। এবং **ধম্ম পদের** উপর প্রবন্ধ লেখেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার একটি চিঠিতে উল্লেখ

করেছেন যে বুদ্ধগয়ায় থাকাকালীন তিনি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই Warren এর ***Buddhism in Transition*** এবং Edwin Arnold এর *Light of Asia* পড়তেন।[১০] রবীন্দ্রনাথের কথা কাব্যগ্রন্থে এর পরিচয় বহন করে। **কথার** অনেকগুলি কবিতাই বুদ্ধের **অবদান শতক** ভিত্তি। শিখ ইতিহাস ভিত্তি করে তিনি লেখেন **বন্দীবীর, গুরুগোবিন্দ ও প্রার্থনাতীত দান, শেষশিক্ষা**। রাজস্থানের ইতিহাস ভিত্তিক লেখা **নকল গড়, হোরি খেলা, বিবাহ** ইত্যাদি।

কিন্তু এ তো গেল ইতিহাস ভিত্তিক কাব্যকবিতা রচনার কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধগুলি আমাদের আলোচনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কয়েকটি প্রধান রচনা **ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা** (১৯১২), এবং **ভারত ইতিহাস চর্চা, স্বদেশী সমাজ** (১৯০৪)। **ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা** প্রবন্ধটি আচার্য যদুনাথ সরকার কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল, এবং যদুনাথ এটি ১৯১৩ সালে **My Interpretation of Indian History** এই শিরোনামে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ১০ বৎসর পরে এটিকে **A vision of Indian History** নামে অনুবাদ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **Modern Review** পত্রিকাতে, যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি ইতিহাস প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ করেন, যেমন **ভারতবর্ষের ইতিহাস (The Philosophy of Indian History)**, শিবাজী ও গুরুগোবিন্দসিং **(Rise & Fall of the Sikh Power)**, **নূতন ও পুরাতন (Impact of Europe in India)**, **স্বদেশী সমাজ (Communal life in India)**.

**ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা** প্রবন্ধে তিনি আর্যদের আদি বাসভূমি, আর্য অনার্য সংঘর্ষ এবং তাদের মিশ্রণ, ক্রম অন্তর্ভূক্তি বিষয় আলোচনা করেছেন। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ, মহাভারতে সামাজিক বিপ্লব এবং রামায়ণের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিবর্তনেরও আলোচনা করেছেন। বর্ণ বৈষম্যকে সমালোচনা করেছেন আবার এও দেখিয়েছেন যে সে যুগে জাতি ভেদ, বর্ণভেদ এক ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বাহক ছিল। রবীন্দ্রনাথ অশোকের আমল, শিখ এবং মারাঠা ও রাজপুত ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার ভাঙ্গন ও অবক্ষয় বিষয়ক আলোচনাও আছে।

ভারত ইতিহাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছোন তা হলো যুদ্ধ বিগ্রহ, সংঘর্ষ, সামরিক অভিযান, অধিকার সত্ত্বেও ভারত ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সকল বিপরীতমুখী সংগ্রামী শক্তিগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গুলিকে রক্ষা করেই তাদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করা।[১১] তাঁর আর

একটি সিদ্ধান্ত হলো যে কোন সভ্যতা কোন একটি বিশেষ মাপকাঠি দিয়ে বিচার হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে তৎকালীন বিচারের মাপকাঠি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল প্রকৃতিতে রাজনৈতিক। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাসের প্রকৃতি মূলত রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক নয়। ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতার মূল ভিত্তি সামাজিক, সমাজ প্রধান, রাষ্ট্র প্রধান নয়। তিনি **স্বদেশী সমাজ** (১৯০৪) প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মূলত সামাজিক বন্ধন, সহযোগিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছেন।[১২]

আর একটি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ হল বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ, ধর্মীয় গোড়ামী, ক্ষমতা ও অধিকারের অপব্যবহার এবং লোভ। এগুলি অমানবিক এবং সেজন্য ভারতীয় সমাজভিত্তিক সভ্যতা ও ইতিহাসের পক্ষে ক্ষতিকারক। এর ফলে ভারতীয় সমাজে ক্রমে ক্রমে অবক্ষয় হয় এবং ভারত রাজনৈতিক ভাবে পরাধীন হয়ে পড়ে। তার প্রতিপাদ্য ছিল এরকম যে মোটামুটি ভাবে ভারতীয় সভ্যতা কোনদিনই আগ্রাসী সামরিক অভিযানে বিশ্বাসী ছিল না এবং তার পথই ছিল শান্তি, ঐক্য ও সমন্বয় সাধন ও অহিংসার পথ। আর একটি কথা রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ জোর দিয়েছেন বিভিন্ন লেখায়; যে কোন সভ্যতাই বিচ্ছিন্ন ভাবে অপর সভ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগ বিহীন ভাবে চলতে পারে না। অপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কোন সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি, প্রসার, পূর্ণতা এবং অবক্ষয়ের মূল সূত্রগুলিকে তার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীল চিন্তাধারা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন শক্তির প্রভাবে ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় উত্থান এবং কোন কারণেই বা তার অবক্ষয় এবং বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায় - এইসব তার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল।[১৩] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন যে "His aim was thus creative and his method selective". সেই কারণেই তিনি ভারতীয় ইতিহাসের সেই সব ঘটনা বা পর্য্যায় বেছে নেন যা তার কাছে তাৎপর্য্যময় মনে হয় এবং সেই সব ঘটনার মানবিক, বিশ্বজনীন, উদারনৈতিক এবং প্রগতিশীল ব্যাখ্যা করেন।[১৪]

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নাও মনে হতে পারে। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজবিষয়ক চিন্তা যা **স্বদেশী সমাজ** প্রবন্ধে বিধৃত হয়ে আছে, বিশেষ ভাবে সমালোচিত হয়। **স্বদেশী সমাজ** প্রবন্ধটিতে একটা অতীত পুনরুজ্জীবনের ধ্বনি শোনা যায় যেমন যখন তিনি বলেন "হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে লড়াই করিয়া

মরিবে না। এইখানেই তাহারা একটি সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবেন.... সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষ ভাবে হিন্দু তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশ বিদেশের হউক তাহার প্রাণ তাহার আত্মা ভারতবর্ষের"।[১৫] আবার অন্যত্র তিনি যখন বলেন "আমাদের দেশে তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত। একদিন দারিদ্রকে শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল। আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বর্ধমকে অপমানিত করিব? আজ আমরা শুচি শুদ্ধ সেই মিত সংযত সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না?"[১৬] **স্বদেশী সমাজ** প্রবন্ধে যে চিরায়ত হিন্দু সমাজ বা জনসম্প্রদায়ের পুনরভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গ্রামে গিয়ে গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা সেই সময় সমালোচিত হয়। সেই সময় ব্রাহ্ম সমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী **স্বদেশী ধুয়ো, জাতীয় একতা, স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি** ইত্যাদি রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন। **স্বদেশ প্রেমের** ব্যাধিতে তিনি স্পষ্টই বলেন "যে স্বদেশ প্রেম আদর্শ হিসাবে অতীতকে গৌরবান্বিত করে, উন্নতি বিধানের কথা বলে না এবং যা ভবিষ্যত প্রগতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তা প্রেম নয় ব্যাধি"।[১৭] জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে বর্তমান ভারতে সামঞ্জস্য বিধান একটি আকাশ কুসুম কল্পনা মনে করেন এবং প্রমথ চৌধুরী ও পৃথ্বিশ চন্দ্র রায় প্রমুখ মোটামুটি ভাবে স্বদেশের প্রতি আত্মিক সংযোগ স্থাপনের আগ্রহে তৎকালীন সমাজের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেন।[১৮]

অধ্যাপক সুশোভন সরকার **প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ** (১৯৮২) গ্রন্থে স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তায় একধরনের পুররুজ্জীবন বাদ ও প্রাচ্যাভিমান লক্ষ্য করেছেন যা কিনা অগ্রগতি, প্রগতির পরিপন্থী। **স্বদেশী সমাজ** প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ইংরেজীতে যাহাকে ষ্টেট বলে আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার ভারতবর্ষের রাজশক্তির আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতে স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত সমস্ত কল্যাণ কর্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে - ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল...নিঃস্ব কে ভিক্ষা দান হইতে সাধারণকে ধর্ম শিক্ষা দান এসমস্তই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর। আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত - এই জন্য ইংরাজ ষ্টেট কে বাঁচাইলেই বাঁচে। আমরা ধর্মব্যবস্থাকেই বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।[১৯]

এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ ষ্টেট থেকে সমাজকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভেবেছিলেন। 'প্রথমটি শাসক সম্প্রদায় ভারত ইতিহাসে যাদের বার বার পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়টি

সংঘবদ্ধ আত্মশাসিত জনসমষ্টি প্রকৃতিগত ভাবে কাল পরম্পরায় যা অবিকল থেকেছে'। অধ্যাপক সুশোভন সরকার মন্তব্য করেছেন "ইংরেজ শাসনে নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় কালক্রমে এ ভেদরেখা লুপ্ত হতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ম্যানরের মত ভারতীয় ভিলেজ কমিউনিটির দিনও যে ফুরিয়েছে এ চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল না তাই স্বদেশী সমাজকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ ধারণা প্রগতি বা অগ্রগতির অনুকূল নয়"।[২০]

অধ্যাপক সরকার আরো একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাহল রবীন্দ্রনাথের নেশান ও নেশনালিজম্ সম্পর্কিত ধারনা। রবীন্দ্রনাথ তার নেশন্ কি এবং ন্যাশনালিজম্ বক্তৃতামালায় পাশ্চাত্য ন্যাশনালিজম্কে দেশাত্ম বোধ থেকে পৃথক করে উগ্র জাতীয়তাবাদ যা সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয় তার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন। ন্যাশনালিজমের পরিণতি তিনি দেখেছেন ইম্পিরিয়ালিজিমে। অধ্যাপক সরকার অভিমত প্রকাশ করেন যে এই সাম্রাজ্যবাদ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ কেন সাম্রাজ্যবাদ সেই সময় প্রবল হয়েছিল তার কোন সামাজিক, আর্থিক কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেননি। এর পেছনে মানুষের চিরন্তন রিপু লোভের আত্মপ্রকাশকেই চালিকা শক্তি হিসাবে দেখেছেন এবং প্রতিকার হিসাবে তিনি মানুষকে চিত্ত সংযম ও লোভ পরিহার করতে বলেন। এর সঙ্গেও অগ্রগতির চিন্তার কোন মিল নেই।[২১]

আমার মনে হয় এক্ষেত্রে **স্বদেশী সমাজ** এবং সমকালীন অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার প্রেক্ষিতটি যথাযথ আলোচনা করা দরকার। লক্ষ্যণীয় যে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা দুটি সমান্তরাল স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছিল। একদিকে সেই জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনার (১৮৮৫) পূর্ববর্তী সময় থেকে জাতীয় আন্দোলনে নরম পন্থীদের সাহেবীয়ানা, তাদের ব্যর্থ পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রবণতা এবং আবেদন নিবেদন রাজনীতি রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। তারও পূর্বে ১৮৭৭ সালেই রবীন্দ্রনাথ এদের তীব্র ধিক্কার দিয়ে লিখেছিলেন ঃ

তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি, ভারতে আজিকি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা কিসের হরষে গাহিছে গান?
বৃটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসোগো আমরা যে কজন আছি আমরা ধরিব আরেক তান।

তা তিনি আরেক তানই ধরলেন। একটি চিন্তাস্রোতে এরপর থেকে একাধিক

প্রবন্ধ লিখলেন নরম পন্থীদের মিথ্যা বাগাড়ম্বর, সাহেবীয়ানা ও কর্তাভজা নীতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ প্রকাশ করে। নরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে ও কর্মপদ্ধতিতে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অদ্ভুত এক দোলাচলের ভাব। **বঙ্গবিভাগ** প্রবন্ধে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন "আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি নাই। ....এই মুখে অবিশ্বাস প্রকাশ করা এবং আচরণে অবিশ্বাস না করাতে - এই দ্বিধা বিভক্তিতে কার্যত সকল দিকই নষ্ট হয়"। তাদের অসমপূর্ণতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ করে লেখেন ঃ "ভাবিয়া দেখ দেখি ইংরেজের উপর আমাদের কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়াছিলাম যে আমরা বন্দেমাতরম হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাদের সেই হাতের ন্যায়দন্ড কিছুমাত্র টলিবে না। সামান্য দু একটা মাথা ফাটা ফাটি হইলেই আমরা এমন করি যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত... আসল সত্য হইল ইংরেজের কোন ক্ষতি করিতে গেলে ইংরেজ প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই, এই কথাটা নেতারা বিচার করেন নাই।" নরমপন্থীদের মিথ্যা আস্ফালনকে বিদ্রুপ করে তিনি বলেন "কার্জন আমাদিগকে কেমন করিয়া মারিয়াছেন, মর্লি আমাদের কান্নার উপর কত বড় ধমকটা দিলেন সে কথা অনবরত একসভা হইতে আরেক সভায়, এক কাগজ হইতে আরেক কাগজে মুষলধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়া কোন লাভ নাই"। আবার অন্যত্র "আমরা ম্যানচেষ্টারের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব ইত্যাদি অথচ ভরসা তো ইংরাজের আইন মর্লির উক্তি"।[২২] এই ভৎর্সনা, ব্যঙ্গোক্তির বহু নিদর্শন তাঁর প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে আছে। আপনারা এই প্রসঙ্গে **চেঁচিয়ে বলা, আশ্‌ট্রা কনজারভেটিভ, কণ্ঠরোধ, মুখুজ্জে বনাম বাড়ুজ্জে, বঙ্গ বিভাগ, প্রসঙ্গ কথা** - এই প্রবন্ধগুলি স্মরণ করুন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বয়কট প্রসঙ্গে তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়। 'বয়কট করার ছেলেমানুষী স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণ নহে'। প্রধানতঃ এই কারণে তিনি শুরুতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলেও পরে নিজেকে বিযুক্ত করেন। "বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই, কাজের মধ্যে আমি তো আর নাই', এই কথা বলে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। এবং দেশকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পল্লী পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। পাশ্চাত্য সভ্যতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার এই তো সময়। অপর চিন্তার স্রোতে তাই তিনি পশ্চিমি সভ্যতায় মোহগ্রস্ত, আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মপরিচয়ের সূত্র পুনরুদ্ধারে নিজের সভ্যতা সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর তাগিদ দেন। তাই **স্বদেশী সমাজ** প্রবন্ধে একটি অপমানিত জাতির প্রতিভূ হিসাবে তিনি দ্বিখন্ডিত বাঙ্গালীর আহত

সত্তাকে অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তিনি তা **স্বদেশী সমাজ** পরিকল্পনা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে ব্যক্তও করেছিলেন যে গ্রাম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে এই কার্যক্রমের প্রচলন এবং অর্জিত সফলতা শাসিত জনসমষ্টিবে শাসকগোষ্ঠীর সমপর্যায়ে উন্নীত করবে।[২৩] আর কোন পরাধীন জাতির পক্ষে আপন সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা তো ইতিহাসের ধারা। আমার মনে হয় এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। যদুনাথ সরকার ১৯২৮ সালে মার্চ মাসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার উইলিয়াম মেয়ার বক্তৃতা দেন। এবং পরে তা **India Through Ages** নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। তাতে অধুনিক যুগে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ কৃত উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন। যদুনাথ বলতে চেয়েছিলেন যে রবীন্দ্র প্রবর্ত্তিত আন্দোলন উনিশ শতকে রাশিয়ার আন্দোলনের অসচেতন অনুকরণ। যদুনাথ বলেছেন “It is incorrect to call it a Hindu revival. It is really a cosmopolitan movement which aims at bringing all Humanity together.[২৪] রবীন্দ্রনাথের এই তথাকথিত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন ১৮৯০ এর দশকের কেল্টিক আন্দোলনকেও স্মরণ করায়। আইরিশ কবি W B Yeats তার Celtic Revival (1896) গ্রন্থে কেল্টিক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের কথা বলেন।

প্রয়াত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তার **ইতিহাস ও ঐতিহাসিক** গ্রন্থে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিও যে দেশকালের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হতে বাধ্য সেই কথা বলেন। ‘‘দেশ কাল মানুষের কাহিনী বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক তো কালেরই পুতুল। তিনিই কি দেশ কাল পাত্রের গন্ডী সমভাবে অতিক্রম করতে পারেন? দেশের শিকড় সহজে ছেঁড়া যায় না। জাতীয় সংস্কৃতি ভোলা যায় না, শ্রেণী স্বার্থের ওপরে ওঠা আরো কঠিন যুগ ধর্মের ওপরে ওঠা কঠিনতম’’।[২৫] ঐতিহাসিক একইসঙ্গে তন্ময় (ওবজেকটিভ্) এবং মন্ময় (সাবজেকটিভ্)। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে সমকালীন ইতিহাসকার এবং তাঁর অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল সেই যুগের আলোয়। আসলে দেশ কাল পাত্রের প্রেক্ষিতটি স্মরণ রাখলে বির্তকের অবকাশ হ্রাস পায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তনও করেন। তাঁর পরিকল্পনা লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জন না করাতে পরবর্তী কালে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন যে, তথাকথিত স্বদেশী ভাবাপন্ন ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা তিনি প্রতারিত, বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। তা ছাড়া, হিন্দু সমাজ সংগঠনে বর্ণ প্রথাগত বিধিনিষেধও কম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। এই শেযোক্ত

প্রতিরোধে তিনি এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে একটি পত্রে তিনি লেখেন, "হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দু সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে আইডিয়ালাইজ্ করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছা করে না"।[২৬] ১৯০৮ সালে প্রকাশিত গোরা উপন্যাসে গোরার উপলব্ধির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একধরনের আত্মসমালোচনা করেন।

সাম্প্রতিক কালে সমাজ বিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় **রাবীন্দ্রিক নেশান কি** (২০০৩) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজ রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ চিন্তা পুনরালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের মতে সামঞ্জস্য রক্ষাই ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থার মূল চরিত্র। আর এই সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সমাজকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজ বলে বর্ণনা করেছেন। যেখানে শুধু অনার্য নয়, বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খৃষ্টান সকলই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এবং তার বক্তব্য ছিল হিন্দু কোন বিশেষ ধর্মমত নয়। তা বহু জাতি ধর্ম আচারের সমাবেশে এক বিশেষ সমাজব্যবস্থা।" সুতরাং পার্থ চট্টোপধ্যায় বলছেন যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুত্বে কোন রাষ্টীয় বা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেন নি। "হিন্দুত্ব তার কাছে হিন্দু সমাজের আইডিয়া বা মানসরূপ আর এই মানসরূপের কোন রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞা হয় না"।[২৭] আসলে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র সংগঠিত ধর্মাচারে (Organized Religion) বিশ্বাস করতেন না।

সুশোভন সরকার লিখেছেন ধর্মের যে সংগঠিত মূর্তি সামাজিক রক্ষনশীলতার অঙ্গ রবীন্দ্রনাথ তারও বিরোধী ছিলেন। "ধর্ম প্রতিষ্ঠানে তার বিশ্বাস ছিল না। কোন সম্প্রদায় তাকে আকর্ষণ করতো না। কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ বা ক্রিডও তার ছিল না। Religion of Man রূপে মনুষত্বের সাধনা কি তিনি ধর্মের উৎস রূপে দেখেছিলেন।[২৮] **ব্যধি ও প্রতিকার** লেখাটি পড়লে বোঝা যায় যে তিনি হিন্দু মুসলমান বিরোধের কারণ দেখেছিলেন সামাজিক পরিকাঠামোগত ত্রুটির মধ্যে। কোন ধর্মীয় কারণ খোঁজেন নি। ধর্মব্যবস্থার থেকে তিনি সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।[২৯]

পার্থ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নেশান সম্পর্কিত ধারণা প্রসঙ্গে বলেন যে রবীন্দ্রনাথের মতে নেশান হলো একটি সংগঠিত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির উপায়। কিন্তু তিনি এই মত সমর্থন করেননি, রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে 'স্বদেশী যুগে তাঁর চিন্তায় স্বদেশ সৃষ্টির ধারনা নেশন নির্মাণের ধারণা থেকে অনেক

দূরে ছিল না। যেমন **সফলতার সদুপায়** প্রবন্ধে তিনি সমাজের সর্বস্তরে সাহিত্যের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে ঐক্য সৃষ্টির কথা বা **ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ** (১৩১২) বক্তৃতায় লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি নেশন নির্মাণের প্রক্রিয়াই সনাক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ এই নেশান নির্মাণের ধারণাকে আরো সংহত রূপ দেন। **সত্যের আহ্বান** (১৩২৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে সত্যের প্রতিভূ দেশ নেতা হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু গান্ধীর সাংগঠনিক রাজনীতির বাধ্যতা, একবৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভের প্রতিশ্রুতি যাকে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী যুগ থেকে বার বার কল বলে উল্লেখ করেছেন তা তিনি মানতে নারাজ"। তাঁর মতে চরকা, খদ্দর, গান্ধীটুপি তার সঙ্গে যুক্ত নানা আচার অনুষ্ঠান ভারতে নেশান কল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চরকার বিরোধিতা করলেন কারণ তার পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন নেই। তিনি আরো বলেন "সত্যের আহ্বান প্রবন্ধে বিজ্ঞান দিয়ে গড়া প্রকৃত স্বরাজে যে অর্থ ব্যবস্থার কথা তিনি বলেছেন সেও কিন্তু কলের যুক্তিতে চলবে। কাজেই চরকার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে দাঁড় করানোর কোন যুক্তি তিনি দেখেন নি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরো বলছেন রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ব্যবস্থা একেবারে সমর্থন করতেন না তা নয়। যেমন **লোকহিত** (১৩২১) প্রবন্ধে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। "কলেরও যে সম্মোহিনী শক্তি আছে নৈতিক আদর্শের দাবী আছে, মঙ্গল প্রতিষ্ঠার আশ্বাস আছে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ মনে আনেন নি।"[৩৩]

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের মূলত সৃজনশীল মানসিকতা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যান্ত্রিকতার আতিশয্যে বিচলিত হয়েছিল। সত্যের আহ্বান (১৯২২) প্রবন্ধে গান্ধী নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর নিজের চিন্তা ধারায় কিছু অসংগতি প্রকাশ পেলেও রবীন্দ্রনাথ **সমস্যা** (১৯২৪), **সমাধান** (১৯২৯) এবং **স্বরাজ সাধন** এই প্রবন্ধগুলিতে গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনের যে বিরোধিতা করেছেন, ঐতিহাসিক বিচারে তা নিঃসন্দেহে যুক্তিপূর্ণ ছিল তা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। "মানুষের মনের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। হিন্দু মুসলমানদের মিলন হোক বাইরের দিক থেকে এই পরওয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুরা খেলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে.......কিন্তু হিন্দু মুসলমান মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মনে চিরাগত সংস্কার পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানে ঠেকেছে"। কাজেই হিন্দু মুসলমানের এই 'ঠেকো মিলন'কে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই বরদাস্ত করেননি। একবছরে স্বরাজ পাবার প্রত্যাশা ও ছিল তাঁর

কাছে অবাস্তব। "অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে।....কিন্তু কোন একটি বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোন একটি বিশেষ মাসে কোন একটি তারিখে" স্বরাজ লাভ সম্ভব এ তিনি মানতে পারেননি। "চিত্তের বিকাশের উপরই স্বরাজ দাঁড়াতে পারে। তার জন্য বাহ্যফল নয়, জ্ঞানবিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্প কয়েকদিন আমরা চরকা কেটে পাবো এর যুক্তি কোথায়?" রবীন্দ্রনাথ গান্ধীনীতির বিরোধিতা করে অসহযোগ ও বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো সমর্থন করেননি। "বস্ত্রভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশিকৃত কাপড় পোড়ানো"-র তিনি বিরোধিতা করে বলেন "কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রে তত্ত্বের যোগ আছে। এ সম্বন্ধে সেই তত্ত্ব আগে জানা দরকার। নতুবা ম্যাঞ্চেস্টারের ফাঁস পরিমাণে ও পরিণামে আরো বেশি শক্ত হয়ে পড়বে।"[৩১] পরবর্তীকালে আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা সমভাবে প্রযোজ্য। "দেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই এই কথা আমি কখনই বলিনে। কিন্তু উন্মত্ত হয়ে কিছু একটা করাই কর্তব্য এ আমি মানতে পারিনে। সেই মাতামাতির একটা সুখ আছে তা জানি কিন্তু ফল না থাকতে পারে। দেশে আগুন লেগেছে এ কথা কিছুকাল শুনচি - আগুন বহু শতাব্দী থেকেই লেগেছে কিন্তু আড়ি আড়ি বলে চিৎকার করবার জন্য ছেলেরা লেখাপড়া এবং বুড়োরা কাজকর্ম ছেড়ে দিলে এ আগুন নিববে একথা বিশ্বাস করিনে। চরকা চালিয়ে খদ্দর পরে এ আগুন নিববে এটা এত বড় একটা ছেলে ভোলানো কথা যে এ কথায় দেশ শুদ্ধু লোক ভুলচে দেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হতে হয়।"[৩২] গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনগুলির বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র যুক্তি এই উদ্ধৃতির মধ্যে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস সমাজ রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় কিছু অসংগতি থাকতেই পারে, তবে সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে মনে হয় যে 'বিশিষ্ট কতকগুলো মতের থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় ছিলেন'। অধ্যাপক সুশোভন সরকার যথার্থই বলেছিলেন যে "তাঁকে তার স্বকীয় সামাজিক, রাষ্ট্রীক, রাজনৈতিক ব্যাখ্যার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত নয়।[৩৩] পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আমাদের যুগের সমস্যা আমাদেরই সামলাতে হবে আত্মশক্তির মন্ত্র চাই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই মন্ত্র নির্মাণ করতে হবে আমাদেরই"।[৩৪] একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যে চিন্তাধারাকে খাপ খাওয়ানো দরকার একথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে যে আর কেউই ভাল বুঝতেন না তা তারই একাধিক লেখায় প্রকাশ পায়। যেমন কর্মের উমেদার প্রবন্ধে তিনি দেশের লোকের মানসিকতা পরিবর্তনে অনীহার সম্বন্ধে বলেন

"যাহারা মান্ধাতার আমলে লাঙল চাষ করিতেছে, যাহারা মনুর আমলে ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে, যাহারা যেখানে পড়েঁ সেইখানেই পড়িয়া থাকাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় বলে গর্ব করে...কখনও বিদ্রোহী হইব না কখনও এমন স্বপ্নেও মনে করিব না যে স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা এ অবস্থার কোন প্রতিকার হইতে পারে"[৩৫]....ইত্যাদি। ভারতীয় ঐতিহ্যের সংস্কার তাঁর চিন্তায় থাকলেও তিনি অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তনকেই স্বাগত জানিয়েছেন। বাংলার নবজাগরণের যে দুটি বিপরীতমুখী ধারা সুশোভন সরকার যাকে 'প্রাচ্যাভিমান' এবং 'পশ্চিমী প্রত্যয়' বলেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার প্রকাশ হয়েছিল। স্বদেশী যুগের প্রাচ্যাভিমান থেকে (**প্রাচ্য পাশ্চাত্য, ভারতবর্ষীয় সমাজ, নববর্ষ ব্রাহ্মণ**) থেকে ক্রমান্বয়ে এক পশ্চিমী প্রত্যয়ের দিকে যাত্রা লক্ষ্য করা যায়। **ধর্মের অধিকার, লক্ষ্য ও শিক্ষা, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম** প্রবন্ধগুলিই তার প্রমাণ।[৩৬] ১৯০৫ সালের পূর্বে এবং ঐ বৎসর পর্যন্ত তাঁর প্রবন্ধাদিতে অতীত পুনরুজ্জীবন ও হিন্দু সত্তার উপর যে গুরুত্ব আমরা দেখি পরবর্ত্তীকালে তা অনেকটাই অনুপস্থিত। ডক্টর কালীদাস নাগকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলছেন "হিন্দু ধর্মকে ভারতবাসী প্রকান্ড একটা বেড়ার মতো করে গড়ে তুলেছিল.... এর প্রকৃতি নিষেধ ও প্রত্যাখ্যান...এই বাধা কেবল হিন্দু - মুসলমানের তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক বাধাগ্রস্ত সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে, য়ুরোপ সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে, হিন্দু - মুসলমানকেও তেমনি গন্ডীর বাইরে যাত্রা করতে হবে।.... আমাদের মানুষ প্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে হবে - ডানার চেয়ে খাঁচা বড় এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে - তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে"।[৩৭] তাঁর পরিবর্তিত চেতনা বিশেষ রূপ পায় **কালান্তরে** (১৯৩৩) এবং **সভ্যতার সংকট** (১৯৪১) প্রবন্ধে। সুশোভন সরকার দেখিয়েছেন যে **সভ্যতার সঙ্কট** প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'কশাঘাত করেছিলেন পশ্চিমী দৃষ্টিকে নয়, ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের বিকৃত রূপকে। তা নয়তো তিনি পশ্চিমের সৃষ্ট নবরাশিয়া ও জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের দুরবস্থার তুলনা করতেন না"।

বিংশশতাব্দীর মার্কসবাদী, ফ্রয়েডীয়, আইনস্টাইনিও চিন্তার ছোঁয়া বাচিয়ে চলার চেষ্টাও তিনি করেন নি। তাঁর জীবনে শেষ দশ বৎসরেই তিনি লিখেছিলেন **রাশিয়ার চিঠি** এবং **সভ্যতার সঙ্কট**।[৩৮]

বর্ণ বৈষম্য, অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য, সামাজিক বহুবিধ বৈষম্যকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে একাধিক লেখা তিনি লিখেছিলেন। আপনারা **স্বরাজ স্বাধন, রায়তের কথা, উপেক্ষিত পল্লী, পল্লীসেবা** সর্বোপরি রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা স্মরণ করুন। যেখানে তিনি বলেন, "আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্য সভ্যতার এই প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবে। আমার বহুদিনের স্বপ্ন যুগ যুগ ধরে শৃংখলিত গনমানব মুক্তি স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে আমায় যারা সাহায্য করলেন তাদের প্রতি অমি কৃতজ্ঞ"।[৩৯] এই সব কি শুধুই ঐতিহ্যের সংস্কার, না কি প্রগতিবাদী চিন্তারই প্রতিফলন?

সব শেষে আমি একটি সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের উল্লেখ করব। সেটি হল রনজিত গুহ লিখিত **History at the Limits of World History (Columbia University Press, 2002)** এই গ্রন্থের উপসংহার প্রবন্ধটি **The Poverty of Historiography - A Poet's Reproach.** আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধে রনজিত গুহ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে লিখিত একটি লেখার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেখাটি হল **সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা** (শান্তিনিকেতন, মে ১৯৪১)। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমরা যে ইতিহাস দ্বারাই চালিত এ কথা বার বার শুনেছি....কিন্তু আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোন ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ (পাব্লিক) সেখানে বৃটিশ সাবজেক্ট ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না, সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা বৃটিশ গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রীক আমদানী নয়। আমার অন্তরাত্মার কোন রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকাশিত হয়েছিল। এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানাভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল"।[৪০] রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন মানব জীবনের সেই সুখ দুঃখের ইতিহাস যা তারই কথায় "সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষি ক্ষেত্রে, পল্লী পার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ নিয়ে কখনো বা মোগল রাজত্বে, কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে"।[৪১]

রনজিত গুহ তাঁর প্রবন্ধে বলছেন যে রবীন্দ্রনাথ কথিত এই প্রাত্যহিকতার ইতিহাসের সঙ্গে ফরাসী ঐতিহাসিক হেনরী লেফেভ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য আছে। লেফেভ্র তাঁর **Critic of Everyday Life (1992)** গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ Knowledge of Everyday Life এ ঐতিহাসিকদের তিরষ্কার করেছেন 'for trivialising

everyday life' এবং তাদের বলছেন 'Historian of old School' লেফেভ্রা বলেছেন 'all we need is simply to open our eyes' যা কিনা রনজিত গুহর মতে 'not so different from Tagore's advice.[৪২]

সেই প্রাত্যহিক সুখ দুঃখের ইতিহাসই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর **গল্পগুচ্ছ** তে। তা কোন সামন্ততন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাস নয়। কোন পন্ডিতি ইতিহাস চর্চাও নয়। রনজিত গুহ বলছেন যে এই প্রাত্যহিকতার ইতিহাস চর্চার অভাবই পন্ডিতি ইতিহাস চর্চার ফাঁক কোথায়, কোথায়ই বা তার অসম্পূর্ণতা ও দারিদ্র তা গোচরে আনে।[৪৩] এখানে উল্লেখ্য যে গল্পগুচ্ছের কাহিনীগুলি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা দিয়ে শুরু হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সমাপ্তি ঘটেছে, "এক নৈর্ব্যক্তিক, কিছুটা বা উদাসীন বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতায়"।[৪৪] আর এখানেই কবির ইতিহাসানুভূতির একই সঙ্গে বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। ইংরেজ কবি T. S. Eliot তার Tradition and Individual Talent (1919) প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে কল্পনার স্থান না থাকলেও কবির ইতিহাস সচেতনতার প্রয়োজন আছে। আর তিনি বলছেন "This historical sense, which is a sense of the time less as well as of the temporal, and of the timeless and of the temporal together is what makes a writer traditional"[৪৫] অর্থাৎ কবিদের ঐতিহ্য একটা ইতিহাস বিষয়ক অনুভূতি যার মধ্যে অতীত ও বর্তমান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ইতিহাস অনুভূতি অচ্ছেদ্য অতীত ও বর্তমানকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের বিশালত্বে, বিরাটত্বে প্রসারিত। তাঁরই কথায় 'ইতিহাস হল সৃষ্টিকর্তা - মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় দীর্ঘ যুগ যুগান্তরে যাত্রা।" "সেইটেকেই বড় করে দেখো", রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা — মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে - ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে।"[৪৬]

এই ইতিহাস অনুভূতি একই সঙ্গে পার্থিব, ক্ষণকালীণ এবং চিরন্তন, কালজয়ী।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) **শিবাজী ও মারাঠা জাতি**, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ: ৪৪১।

২) তদেব।

৩) **ঐতিহাসিক চিত্র**, তদেব, পৃ: ৪৭৮।

৪) তদেব, পৃ: ৪৮১।

৫) তদেব, পৃ: ৪৮৩।

৬) দ্রষ্টব্য বিশ্বনাথ রায়, **প্রাচীন পুথি উদ্ধার ঃ রবীন্দ্র উদ্যোগ**, পুস্তক বিপণী, শ্রাবণ ১৩৯৯।

৭) **ইতিহাস কথা**, রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ১৩ পৃ: ৪৯০-৯১।

৮) **ঐতিহাসিক চিত্র**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৩।

৯) যদুনাথ সরকারকে লিখিত পত্র, **চিঠিপত্র** ১৫, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, পৃ: ২৮।

১০) তদেব, পৃ: ১৩২-৩৩।

১১) **রচনাবলী** ১৩ প্রাগুক্ত পৃ: ১৪৩-১৬৫।

১২) তদেব ১২ পৃ. ৬৮৩-৭০২।

১৩) তদেব।

১৪) নীহার রঞ্জন রায়, Rabindra Nath Tagore and The Indian Tradition প্রবন্ধ Rabindra Nath Tagore, A Centenary Volume, 1861-1961, সাহিত্য একাডেমি, নিউ দিল্লী ১৯৯২, গ্রন্থে লিখিত, পৃ: ২২৭।

১৫) **রচনাবলী**, ১২ প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০১।

১৬) তদেব, পৃ: ৭০২।

১৭) সুমিত সরকার, The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908 গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ৬০।

১৮) তদেব, পৃ: ৬০-৬১।

১৯) **রচনাবলী**, ১২ পৃ: ৬৮৪।

২০) সুশোভন সরকার, **প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ**, আনন্দ পাবলিসার্স, ২০০২, পৃ: ৪৭-৫৬ দ্রষ্টব্য।

২১) তদেব।

২২) **রচনাবলী** ১২, পৃ: ৮৯৭-৯০২।

২৩) সজনী কান্ত দাস, **রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য**, ১৯৬১, পৃ: ২৭-৩০।

২৪) চিঠিপত্র ১৫ পৃ: ১৪১।

২৫) অমলেশ ত্রিপাঠী, **ইতিহাস ও ঐতিহাসিক**, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ

২৬) অরবিন্দ পোদ্দার, **রবীন্দ্রনাথ ঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব**, প্রত্যয়, ১৯৯৯ পৃ: ১১৬।

২৭) পার্থ চট্টোপাধ্যায়, **রাবীন্দ্রিক নেশন কি?** শারদীয় **বারো মাস**, ২০০৩, পৃ: ৭-২৫।

২৮) সুশোভন সরকার, প্রাগুক্ত।

২৯) **রচনাবলী** ১২, পৃ. ৯০৫-৯১৪।

৩০) পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।

৩১) **স্বরাজ সাধন, রচনাবলী** ১৩।

৩২) **চিঠিপত্র**, ৭, এই **প্রসঙ্গে চরকা, রচনাবলী** ১৩ দ্রষ্টব্য।

৩৩) সুশোভন সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭-৯২।

৩৪) পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।

৩৫) **রচনাবলী** ১৩, পৃ. ১১৭।

৩৬) সুশোভন সরকার, প্রাগুক্ত।

৩৭) কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, **রচনাবলী** ১৩ পৃঃ ৩৫৭, অরবিন্দ পোদ্দার প্রাগুক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত।

৩৮) সুশোভন সরকার, প্রাগুক্ত।

৩৯) রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার স্টেনো রিপোর্ট, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০, দ্রষ্টব্য সুবোধ দেব সেন, **রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ**, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ· ৫৭।

৪০) **রচনাবলী** ১৪, পৃ ৫৩৬-৩৮।

৪১) তদেব।

৪২) রনজিৎ গুহ, **History at the Limits of World History,** Columbia University Press 2002, P-94.

৪৩) তদেব

৪৪) অমলেশ ত্রিপাঠী, **ইটালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি**, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃঃ ৯২

৪৫) T. S. Eliot, **Tradition And Individual Talent, in D. J. Euright and Ernst DE Chickra, English Critical Texts,** London, O.U.P. 1962 P. 293-394.

৪৬) **সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা**, রচনাবলী, ১৪ পৃঃ ৫৩৮।

# তক্মন বিভীষিকা : অথর্ববেদের অভিজ্ঞান

শুক্লা দাশ

Folke Henschen তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ The History of Human Diseases এ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে মানবসভ্যতা ও তার অগ্রগতির ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে নিরন্তর ব্যাধি ও তার নিরাময়ের প্রবহমান ইতিহাস।[১] ব্যাধি বা রোগ শব্দের ব্যাপ্তি যে বিশাল সে কথা বলা বহুলতা। তবে সীমিত অর্থে দেহ-মনই এর কেন্দ্রবিন্দু। ইতিহাস চর্চায় রোগের ইতিহাস নির্মাণ তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সংযোজন। ইতিহাসের পরিধি নিয়ত প্রসারণশীল তাই ইতিহাসের পরিমণ্ডলে আজ কোন কিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয়, রোগের রূপ রূপান্তরের সামাজিক ব্যঞ্জনা তো নয়ই।[২]

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও যে সব রোগ এখনও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি বা যারা আমাদের চিন্তা চেতনা ও সমাজ মননকে আচ্ছন্ন ও চিন্তাগ্রস্ত করে আছে তাদের প্রাচীনতা অনুধাবনের গুরুত্ব আজ ইতিহাসজীবীদের দ্বারা বিশেষভাবে স্বীকৃত। এই স্বল্প পরিসরে ম্যালেরিয়ার দিকে আমরা একটু দৃষ্টিপাত করতে পারি। The New Complete Medical Health Encyclopaedia র অভিমত পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে অধিক জননাশ আর কোন রোগের দ্বারা হয়নি।[৩] ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সমীক্ষাবলীতেও এ কথা স্পষ্ট যে আজ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়াই এদেশে সর্বাধিক মারণ রোগ এবং সঙ্গত কারণেই অন্যতম সামাজিক সমস্যা।[৪]

ভারতবর্ষে এই রোগের ঐতিহ্য যে সুপ্রাচীন, আমাদের সীমিত বা অপ্রতুল মৌল উপাদানের মধ্যেও তার ইঙ্গিত নিহিত। প্রত্ন নরকংকাল বিশ্লেষণের সঙ্কীর্ণ সুযোগের ভিত্তিতে প্রাচীন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু বলা সহজ সাধ্য নয়।[৫] তা সত্ত্বেও P.C. Datta[৬] K.A.R. Kennedy[৭] প্রমুখ গবেষক অস্থির পরিবর্তন ও বিকৃতির নিরিখে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যে ম্যালেরিয়া রোগের অস্তিত্ব (রক্তাল্পতা জনিত অস্থিক্ষয়) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই সংস্কৃতির পরবর্তী পর্যায়ে ঘন জনসতি, পৌর ব্যবস্থার অবক্ষয় ও নিরন্তর বন্যা জনিত পরিবেশ সম্ভবত এই রোগবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল বলে তাঁদের ধারণা।[৮] আশ্চর্য্যের বিষয়, অথর্ববেদ উত্তর পশ্চিমের কিছু অঞ্চলকে এক বিশেষ জ্বর (তক্মন) অধ্যুষিত এলাকা বলে চিহ্নিত করেছে[৯] (গান্ধার, বাহ্লিক) প্রত্ন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যা উপেক্ষার নয়।

সাহিত্যগত উপাদান রূপে অথর্ববেদকে শরীর ভাবনার প্রাচীনতম দলিল বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।[১০] মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যাবলী এখানে প্রতিবিম্বিত, শরীর সমস্যা, রোগ ও তার প্রতিকার অনুসন্ধান যার সিংহভাগ অধিকার করে আছে। দৈব-জাদুকরী চিকিৎসা চর্চার পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও প্যাথোলজিক্যাল ধারণাগুলির সূচনা এখানে সম্যক আভাষিত।[১১] ঋগ্বেদে আমরা অনেক রোগের নাম পেয়েছি যার অন্যতম যক্ষ্ম[১২] বর্তমান যক্ষ্মার সঙ্গে যার প্রতিতুলনা অনিবার্য। অথর্ববেদে আরো অনেক নতুন রোগের সংযোজন লক্ষণীয় এবং এখানেই আমাদের 'তক্মন' শব্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

সময়সীমার দিক থেকে ঋগ্বেদের অনেক পরে রচিত অথর্ববেদে ভৌগোলিক ধারণার প্রসার তাৎপর্যপূর্ণ।[১৩] এই সাহিত্যে পূর্বাঞ্চলের উল্লেখ আরও বেশি করে পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতের দিকে জনবিস্তার[১৪] (বিশেষত গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্যদের অনুপ্রবেশ) নতুন জনগোষ্ঠী (স্থানীয় উপজাতি) ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ও সংমিশ্রণ ইত্যাদির ফলে অর্থববেদে গ্রথিত হয়েছে অনেক নতুন ধারণা ও অভিজ্ঞতা।[১৫] এই পশ্চাৎপটে তক্মন শব্দের পৌনপুনিক উল্লেখ[১৬] আমাদের ভাবিত করে। প্রাণশক্তি নাশক ও রক্তশোষক তক্মন থেকে মুক্তির আকুতিতে অথর্ববেদ এতই সোচ্চার যে একথা অনুমান করা যেতে পারে যে এই নতুন রোগজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা তখন জনজীবন বিপন্ন করেছিল।

ঋগ্বেদকাল থেকেই বৈদিক সাহিত্যে প্রকার ভেদে নানা জ্বরের উল্লেখ পাওয়া গেছে তবে অথর্ববেদ তক্মন বিভীষিকার উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। তক্মন শব্দটিও শারীর তাপ বা জ্বর অর্থ বহন করে[১৭] কিন্তু অন্যান্য জ্বর বিকার থেকে এর স্বাতন্ত্র্য অথর্ববেদে স্পষ্ট বিবৃত। অথর্ববেদে উল্লিখিত তক্মন রোগের লক্ষণগুলির সঙ্গে ম্যালেরিয়ার আপাত লক্ষণগুলির সাযুজ্য আমাদের যথার্থই বিস্মিত করে।

অথর্ববেদের দৃষ্টিকোণ থেকে তক্মন জ্বরের উদয় দৈনিক, (সদন্দি) একদিন অন্তর (অন্যেদ্যু) বা দুদিন অন্তর (তৃতীয়ক) হয়।[১৮] রোগলক্ষণের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য প্রবল শারীর তাপ[১৯] শীতবোধ জনিত কম্পন[২০] পরবর্তী পর্যায়ে স্বেদাক্ত দশা[২১] প্রবল মাথার যন্ত্রণা[২২] পেশীতে বেদনাবোধ[২৩] প্রলাপের ঘোর[২৪] দৃষ্টিশক্তির আচ্ছন্নতা[২৫] দীর্ঘকালীন জ্বরদশা[২৬] এবং অবসাদবোধ।[২৭] অমিত শক্তিশালী[২৮] তক্মন আক্রমণের অন্তিম পরিণাম অবশ্যই মৃত্যু।[২৯] বেদে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার সম্যক বিশ্লেষণ করেছেন সুকুমারী ভট্টাচার্য[৩০] এবং এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রাণঘাতী রোগের বিভীষিকা।

মূল লক্ষণগুলি ছাড়াও তক্মন বর্ণনায় আরো কয়েকটি বিশিষ্টতা শনাক্ত হয়েছে

অথর্ববেদে। তক্মন আক্রান্ত রোগীর ত্বকের রঙ পরিবর্তন এখানে বিশেষভাবে আলোচিত, সময় বিশেষে যা গাঢ় অথবা বভ্রূ[৩১] বা ফিকে অথবা অরুণ রূপ[৩২] ধারণ করে। এই সঙ্গে তক্মন আক্রান্ত ব্যক্তি যে প্রায়শই পাণ্ডুরোগের শিকার হন,[৩৩] এ তথ্যও বাণীবদ্ধ হয়েছে। তথ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ত্বকের রঙ পরিবর্তন, প্লীহা (Spleen) ও যকৃতের (liver) ক্ষতির ফলে জন্ডিস রোগ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বর্তমান গবেষণায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।[৩৪]

দৈব জাদুকরী ভাবনা ও বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে তক্মনের কারণ অথর্ববেদে নির্ণীত হয়নি একথা বলা বাহুল্য। রোগ তখনও কোন শারীরিক প্রক্রিয়া নয়— রাক্ষস, অসুর বা অপশক্তির কার্যকলাপ রূপেই বিবেচিত। এই রোগ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জগতেও আতঙ্কের কারণ ছিল এবং W.H. Samuel Jones তাঁর Malaria and Greek History গ্রন্থে এই নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৩৫] প্রাচীন মিশর, গ্রীক ও রোমান উপাদানে এই বিশেষ জ্বরের কারণ রূপে দুষ্ট বায়ুকে (mal-air) চিহ্নিত করা হয়েছিল।[৩৬]

অথর্ববেদের সমীক্ষণ কিন্তু এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদে আমরা তক্কন[৩৭] ও তক্কর[৩৮] এই দুটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হই উড়ন্ত কোন কীট অর্থে[৩৯] অথর্ববেদের তক্মন শব্দে যার সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়।[৪০] আশ্চর্যের বিষয়, অথর্ববেদে কিন্তু আমরা ক্রমাগত মশক শব্দের উল্লেখ পাই[৪১] এবং সান্ধ্যকালীন মশক অভিযান ও দংশন-ভীতি।[৪২] Cyril Scott এর অভিমত, প্রাচীন ভারতীয়েরা মশকের সঙ্গে এই বিশেষ জ্বরের সংযোগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।[৪৩] অথর্ববেদে সম্ভবত তারই প্রারম্ভিক প্রয়াস। আদি বৌদ্ধ সাহিত্যে জ্বরের প্রেক্ষিতে কিন্তু বার বার উঠে এসেছে 'মশক কুটিকা' বা মশারী ব্যবহারের নির্দেশিকা,[৪৪] ত্রয়োদশ শতকেও মার্কো পোলো ভারতে এর ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করতে ভোলেননি।[৪৫]

পরবর্তী চরক-সুশ্রুত সংহিতায় তক্মন শব্দের উল্লেখ না থাকলেও তক্মন তুল্য জ্বর-লক্ষণের সঙ্গে 'প্রাণহর' মশক দংশনের সংযোগ আরো স্পষ্টভাবে উচ্চারিত।[৪৬] বাগভট্ট মাধব ও ভাবমিশ্রের রচনাতেও এই ভাবনারই প্রতিধ্বনি।[৪৭]

তক্মনের অনুকূল পরিমণ্ডল সম্পর্কেও অথর্ববেদের অভিজ্ঞতা মূল্যবান। অথর্ববেদের মতে মহাবৃষা বা প্রচুর বর্ষণ, মুঞ্জাবন্ত বা ঘন ঘাস জমি, জল জঙ্গল ও পূর্বাঞ্চল (অঙ্গ ও মগধ) তক্মন্-প্রবণ ক্ষেত্র।[৪৮] এই রোগের আক্রমণকাল রূপে বর্ষাকাল এবং বর্ষান্তে শরৎকালকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪৯] প্রসঙ্গত Companion Encyclopaedia of the History of Medicine (Vol. I)-এ অথর্ববেদীয় কালগত অভিমত সম্পূর্ণ

সমর্থিত। In India as monsoon fades into autumn, malaria recurs.[৫০] অথর্ববেদের প্রার্থনায় শত শরত অতিক্রমণের যে ইচ্ছা ধ্বনিত[৫১] তা প্রণিধান যোগ্য। বর্ষা অবসানে তক্মনের আবিভার্ব অনিবার্য এবং এই রোগের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেলেই জীবনের শরৎকাল অতিক্রম করা হয়ত বা সম্ভব। বৌদ্ধ সাহিত্যেও 'শারদিক রোগ' সম্পর্কে শঙ্কা সূচিত।[৫২] রোগ থেকে নিরাময়ের দিকে যাত্রার প্রার্থনায় অথর্ববেদের সূক্তগুলি যথার্থই জীবনবাদের প্রকৃষ্ট দলিল।

তক্মন চিকিৎসায় অথর্ববেদীয় বিধান দৈব-জাদুকরী চিকিৎসা চর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; অর্থাৎ যজ্ঞ প্রক্রিয়া, যাতু, অধিচার (Black magic / witch craft / Sorcery)[৫৩] ইত্যাদির দ্বারা বহুলাংশে আবদ্ধ। তক্মনকে বরুণের সন্তান রূপে কল্পনা করে তাঁর তুষ্টি বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথর্ববেদে,[৫৪] কারণ বরুণের সঙ্গে বৃষ্টির সংযোগের ধারণা তখন জনমানসে প্রতিষ্ঠিত।[৫৫] অপরপক্ষে তক্মনরূপে শরীরে প্রবিষ্ট অসুরনিধনও ভিষগের অন্যতম দায়িত্ব।[৫৬] অথর্ববেদের বহু ক্রিয়াকলাপই প্রতীকধর্মী।[৫৭] তক্মন চিকিৎসায় ভেক বা ব্যাঙকে তক্মনের কাছে প্রেরণ করার বিধান[৫৮] কৌতূহলের উদ্রেক করে। আমরা জানি যে মশকের শুককীট (larva) ব্যাঙের মুখ্য আহার। অক্মন প্রসঙ্গে ব্যাঙের এই প্রতীকী ব্যবহার তাই ব্যঞ্জনাধর্মী রূপেই প্রতীত হয়।

*একই সঙ্গে ওষধি প্রয়োগের উল্লেখও এখানে আছে। উত্তরের পর্বতাঞ্চল থেকে আহরিত সুগন্ধ ভেষজ 'কুষ্ঠ' দিয়ে বিশেষ প্রলেপ প্রস্তুত করে সর্বাঙ্গে লেপনের রীতি* পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল[৫৯] এ সংবাদ অথর্ববেদে আমরা পেয়েছি। এই ওষধির শক্তি ও উপযোগিতা সম্পর্কে অথর্ববেদ মুখর।[৬০] এখানে উল্লিখিত কুষ্ঠ ভেষজ যদিও শনাক্ত করা যায়নি, অনুমান করা যেতে পারে যে এর মশক নিরোধক শক্তি ছিল। তক্মন নির্মূলের প্রয়াসে সুগন্ধি বনৌষধি দিয়ে প্রস্তুত ধুনোর ধোঁয়া প্রয়োগও[৬১] (fumigation) বিশেষ তাৎপর্যময়। এছাড়া 'আঞ্জন' ভেষজের নির্যাস পান[৬২] ও 'জাঙ্গীড়' ভেষজের কবচ ধারণ[৬৩] তক্মনকে শক্তিহীন করার উপায় কৌশল রূপে বর্ণিত হয়েছে।

তক্মন আক্রান্ত রোগীর শরীরতাপ কমানোর বা আয়ত্তে রাখার জন্য শীতল জলে অঙ্গ সম্মার্জনার যে বিধান এখানে আছে[৬৪] তার সঙ্গে আধুনিক স্পঞ্জিং (Sponging) পদ্ধতির সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে। রোগীর পৌষ্টিকতার প্রতি চিকিৎসকের বিশেষ মনঃসংযোগও উল্লেখের দাবী রাখে। সহজপাচ্যতার কথা স্মরণে রেখে শস্যচূর্ণের অর্দ্ধতরল পানীয়ই তক্মন রোগীর পথ্যরূপে[৬৫] বিবেচিত হয়েছে যার প্রাসঙ্গিকতা এখনও অব্যাহত।

অথর্ববেদের অভিজ্ঞানে তক্মন বিভীষিকা বিশাল পরিসর জুড়ে আছে। দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা চর্চার পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও রোগ লক্ষণ অনুপুঙ্খ শনাক্ত করার যে পর্যবেক্ষণী মনন এখানে প্রকাশিত তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লক্ষণগত বিচারে তক্মন ম্যালেরিয়ারই সমতুল্য এবং সেই অর্থে একে ভারতের প্রাচীনতম ব্যাধি বলা চলে রূপ রূপান্তরে যার ধারাবাহিকতা এখনও অক্ষুণ্ণ।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) Folke Henschen, The History of Human Diseases, London 1966, p. 25.

২) F.W. Udwadia, Man and Medicine : A History New Delhi 2000, Preface VII.
K.F. Kiple, Cambridge World History of Human Diseases, Cambridge 1993, p. 463.
Deepak Kumar, Science and Society in Colonial India : Exploring an Agenda, Presidential Address Modern India Section Proceedings of the Indian History Congress Aligarh 2000 pp. 434-35.

৩) R.C. Wagon ed. The New Complete Medical Health Encyclopaedia Vol. 2. Chicago 1990, p. 590.

৪) Simkie Sarkar, Malaria in the 19th Century Bombay, Deepak Kumar ed. Disease and Medicine in India · A Historical Overview Delhi 2001 p. 142.
K.F. Kiple, op. cit. p. 467.

৫) Dilip Kumar Chakraborti, India : An Archaeological History - Paleolithic Beginnings to Early Historical Beginnings, New Delhi 1999, pp. 197-198.

৬) P.C. Dutta, Biological Anthropology of Bronze age Harappans : New Perspective, J.R. Lukacs ed. The Peoples of South Asia, New York 1984, pp. 59-75.
Suraj Bhan and K.C. Dahiya, Disease, Surgery and Health in the Harappan Civilization, Deepak Kumar ed. op. cit. p. 9.

৭) K.A.R. Kennedy, Trauma and Disease in the Ancient Harappan, B.B. Lal and S.P. Gupta ed. Frontiers of the Indus Civilization Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, New Delhi 1984, pp. 431-432.

৮) Ibid p. 434, R.E.M. Wheeler, The Indus Civilization, Cambridge 1968, p. 129.

৯) Atharva Veda, 5.22.7, 9, 14.

১০) S.K. Ramachandra Rao, Encyclopaedia of Indian Medicine, Vol. 1, Bombay 1985, p. 26

১১) Priyavrat Sharma, History of Medicine in India, Delhi 1992, p. 25.
১২) Rig Veda, I. 122. 9; 10.97.12; 10.161.5; 10.163.
১৩) D.N. Jha, Ancient India : An Introductory Outline, New Delhi 1993, p. 19.
১৪) R.S. Sharma, The State and Varna Formation in the Mid Ganga Plain: : An Ethno Archacological View, New Delhi 2001, p. 42 ff.
১৫) Sukumari Bhattacharji, In those days : Essays Vedic, Epic and Classical, Calcutta 2001, p. 56.
১৬) Atharva, I.25.4, 5.10.13, 5.22.2, 7.116.
১৭) Suresh Chandra Srivastava, Is Takman Malarial Fever? Vishveshvaranand Indological Journal Vol. 19, Parts 1-2, 1981, p. 284.
১৮) Atharva 1.25.4, 5.22.3, 13; 7.116.2; 19.39.10.
১৯) Ibid, 1.25.1, 5.22.2, 6.20.1, 7.116.2.
২০) Ibid, 1.25.4, 5.22.10, 13.
২১) Ibid, 1.25.4.
২২) Ibid. 5.4.10.
২৩) Ibid, 1.25.2, 5.26.6, 6.20.1.
২৪) Ibid, 1.25.1, 5.22.2; 6.20.3.
২৫) Ibid, 5.4.10.
২৬) Ibid, 1.25.4.
২৭) Ibid, 1.25.3.
২৮) Ibid,.5.22.6, 9.
২৯) Ibid, 1.25.1, 5.22.2, 6.20.1.
৩০) সুকুমারী ভট্টাচার্য, বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, কলকাতা ২০০০, পৃ. ৩৫-৩৮।
৩১) Atharva 6.20.3.
৩২) Ibid, 5.22.3, 6.20.3.
৩৩) Ibid, 1.25.22; 5.22.2; 6.20.3.
৩৪) R.B. Scott ed. Prices Text Book of the Practice of Medicine, London 1973, pp. 227, 229, 631.
৩৫) W.H. Samuel Jones, Malaria and Greek History, Manchester 1909, Preface vi, p. 132.
৩৬) Gordon Harrison, Mosquito, Malaria and Man, London 1978, p. 24.
৩৭) R.G. Veda, 1.66.2, 1.134.5.
৩৮) Ibid, 1.151.5; 10.91.2.
৩৯) Suresh Chandra Srivastava, op. cit p. 284.
৪০) Arabinda Samanta, Malarial Fever in Colonial Bengal 1820-1939, Social History of an Epidemic, Kolkata 2002 p. 236.
৪১) Atharva, 7.56.2-3.

৪২) Ibid, 7.6.10, 8.6.10.
৪৩) Cyril Scott, Doctors, Disease, and Health : A critical survey of Therapeutics, Modern and Ancient, London 1946, p. 212.
৪৪) Jyotir Mitra, Critical Appraisal of Ayurvedic Material in Buddhist Literature, Varanasi 1981, p. 131, Cullavagga, 5.13.3.
৪৫) B.L. Raina, Introduction to Malaria Problem in India, Bombay 1951, p. 3.
৪৬) Caraka Samhita, Cikitsasthana 3.34, 3.67; Susruta Samrita, Uttarasthana 39.69, 70, 71; B.L. Raina, op. cit. p. 2.
৪৭) B.L. Raina, op. cit. p. 3.
৪৮) Atharva, 5.22.9.
৪৯) Ibid, 5.22.9.
৫০) W.F. Bynum and Roy Porter ed., Companion Encyclopaedia of the History of Medicine Vol. 1. New York 1993, p. 187.
৫১) Atharva, 2.13.4, 8.2.2.
৫২) Priyavrat Sharma, History of Medicine in India, Delhi 1992, p. 26.
৫৩) G.U. Thite, Medicine, Its Magico-Religious Aspects according to the Vedic and Later Vedic Literature, Poona 1982. pp. 38, 53, 81, 156; Debiprasad Chattopadhyay, Science and Society in Ancient India, Calcutta 1979, p. 307.
৫৪) Atharva, 1.25.3.
৫৫) Ibid, 4.12.12.
৫৬) Ibid, 1.25.1-4; 6.20.1-3.
৫৭) V.W. Karambelkar, The Atharva Vedic Civilization : Its Place in the Indo-Aryan Culture, Nagpur 1959, p. 171.
৫৮) Atharva, 17.116.2.
৫৯) Ibid, 5.4.1-2, 4.
৬০) Ibid, 5.23.3.
৬১) Ibid, 7.6.11, 8.6.10, 12, 24. Kennteh G. Zysk, Medicine in the Veda : Religious Healing in the Veda, Delhi 1996, p. 34.
৬২) Atharva, 19.45.4.
৬৩) Ibid, 19.34.6, 10.
৬৪) Atharva, Kausika Sutra 25.26.
৬৫) Ibid, 5.22, Kausika Sutra 29.18-19.

# আখ্যান সাহিত্যে সমাজচিত্র : কথাসরিৎ সাগরের সাক্ষ্য

দূর্ব্বা আইন দাস

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের লিখিত উৎস হিসাবে 'কথাসরিৎ সাগর'-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গুনাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নামক আখ্যান সাহিত্য অবলম্বনে একাদশ শতকে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সোমদেব ভট্ট 'কথাসরিৎ সাগর' রচনা করেন।[১] গ্রন্থটির নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ। 'সরিৎ' শব্দের অর্থ নদী। 'কথা' অর্থে কাহিনী বা গল্প— গল্পের নদীর সাগর অর্থাৎ বিভিন্ন কাহিনী, উপকথা, উপাখ্যান সেখানে মিলিত হয়েছে তাই কথাসরিৎ সাগর।[২]

প্রশ্ন উঠতে পারে, আখ্যানসাহিত্য কিভাবে ইতিহাসের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং তার গুরুত্বই বা কতখানি? 'গল্প' বা 'কাহিনী' সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, আর সাহিত্য ত' সাজদর্শন। প্রাচীনভারতীয় সামাজিক ইতিহাসচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধর্মশাস্ত্র ধর্মসূত্র জাতীয় গ্রন্থগুলিতে জীবনে পালনীয় নিয়ম-রীতি-অনুশাসনগুলি বর্ণিত আছে। ফলে বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় চতুবর্ণভূক্ত সমাজের নির্দিষ্ট বা পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী এক জীবনযাত্রা বর্ণিত হয় যেখানে 'ঔচিত্যে' -র প্রশ্নটিই বড়। সেখানে বিভিন্ন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবিক জীবনযাপনের ছবি পাওযা দুষ্কর। অথচ সামাজিক ইতিহাসচর্চায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর কাছে প্রয়োজন সাধারণ জনজীবনের ছবি যা হবে মাটির কাছাকাছি অর্থাৎ বাস্তবানুগ। সে ছবি পুনরঙ্কনের জন্য প্রয়োজন সৃষ্টিশীল সাহিত্য অনুসন্ধান যেখানে ধরা বাঁধা নিয়মের বাইরে থাকা মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রেক্ষিতেই 'কথাসরিৎসাগর'-এর গুরুত্ব নিহিত।

এই গ্রন্থটি কাশ্মীরের পণ্ডিতের দ্বারা রচিত হলেও মূলতঃ সমগ্র উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা পাওয়া যায়, কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের বণিকদের কথা উল্লিখিত আছে যারা স্থানান্তরে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। ফলে তৎকালীন ভারতের সমাজের পরিস্থিতির একটি ধারণা করা যেতে পারে। এই সাহিত্য কর্মটিতে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় পাঠকচিত্তে অত্যন্ত কৌতুহল সঞ্চার করে। যেমন—

প্রথমত, সোমদেব ভট্ট নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তিনি যে কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানে বর্ণাশ্রম প্রথার ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না। বর্ণপ্রথার অনুশাসন অনুযায়ী তার অনুগামী বর্ণনাও করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য, একটি গল্পে দেখা যায় এক ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিপ্রার্থীদের তালিকায় বিভিন্ন বর্ণের নামোল্লেখ রয়েছে এবং সর্বাগ্রে সেই ব্রাহ্মণের বিশেষ গুণ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে মৃতা স্ত্রীলোককে দেবীর প্রসাদে পুনরুজ্জীবন দান।[৩] এটিকে কি বৈদ্যের বৃত্তি মনে করা যায়? অন্য একটি গল্পে দেখা যায় এক ব্রাহ্মণ রাজার দ্বারে কর্মপ্রার্থী এবং তিনি একজন দক্ষ শিকারী।[৪] পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তৃতীয় একটি কাহিনীতে যেখানে এক ক্ষত্রিয় নারীকে বিবাহে ইচ্ছুক এক ব্রাহ্মণ বলপূর্বক উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়ে নানা অপরাধমূলক কাজের আশ্রয় নেয়।[৫] এই গল্পটির অনুরূপ একটি গল্প বর্ণিত হয়েছে 'বেতাল পঞ্চবিংশতির' মধ্যেও।[৬]

দ্বিতীয়ত, বণিকদের প্রাধান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। বিভিন্ন গল্পে 'বণিক', 'বণিকপুত্র'-দের বহুল উল্লেখ আছে।[৭] বণিকগণ যে অত্যন্ত ধনবান ছিলেন তার বর্ণনা বারবার আছে।[৮] দূরবর্তীস্থানে বাণিজ্যযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে মথুরা, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী, শাকল এবং তাম্রলিপ্তের নাম বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। লক্ষণীয়, নগরগুলির মধ্যে কয়েকটি বন্দর-নগর। বলাবাহুল্য, তাম্রলিপ্ত-র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বণিকদের যে সমাজে ও রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল তার বহুল প্রমাণ আছে।[৯] রাজার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।[১০] ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের যাতায়াতের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১১] এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দ্বীপের (স্বর্ণদ্বীপ, সিংহল, কটাহ) নামোল্লেখ আছে।[১২] স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রপাড়ির কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে।[১৩] লক্ষণীয়, প্রথাগত 'কলিবর্জ্য' ধারণার এটি একটি বিপরীত চিত্র যেখানে সমুদ্রযাত্রাকে 'নিষিদ্ধ' বলা হয়েছে।[১৪] তবে লেখাগত উৎস ও বৈদেশিক বিবরণী কথাসরিৎ সাগরে প্রাপ্ত তথ্যকেই সমর্থন করে।[১৫] সামগ্রিক বিচারে বলা যায় কথাসরিৎসাগর দশম শতকে ভারতের প্রবহমান বাণিজ্যিক চিত্রকেই সমর্থন করে।

তৃতীয়ত, সমাজে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের কিছু চিত্র পাওয়া যায় যা তথাকথিত প্রথাসিদ্ধ নয়। এখানে দাম্পত্য প্রেম অপেক্ষা অবৈধ প্রেমের ছবি অনেক বেশী।[১৬] 'কথাসরিৎসাগরে' সনাতন সতীসাধ্বী ভারতীয় নারীর ছবি প্রায় দুর্লভ। তারা অত্যন্ত সাহসিনী এবং সকল বাধা বিঘ্ন জয় করে, নীতি-আদর্শ-ভ্রষ্ট হয়ে প্রেমাস্পদ লাভে সচেষ্টা।[১৭] পুরুষেরা কিন্তু প্রথাগত পদ্ধতিতে একাধিক পত্নীগ্রহণে সমর্থ।[১৮]

অনুশাসনমূলক গ্রন্থগুলির সাথে নারীদের স্বাধীনতার বিষয়টিই সদৃশ নয়; তবে তাদের মত একইভাবে নারীদের প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে।[১৯] একটি উক্তি যা দুটি ক্ষেত্রে একটু ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা অবশ্যই উল্লেখ্য— "স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করার চেয়ে গলায় বিষধর সাপ জড়িয়ে মরা অনেক ভালো।"[২০] বিভিন্ন গল্পে গণিকাদের উল্লেখ আছে।[২১] অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হলেও একটি গল্পে জনৈকা গণিকার প্রকৃত প্রেমের উল্লেখ আছে।[২২] একটি মাত্র ক্ষেত্রে দেবদাসীপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৩] জাতক কাহিনীর বর্ণনার মত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হলেও নারীবিদ্বেষী এই মনোভাবের প্রকাশ কি স্বতঃস্ফূর্ত সমাজজীবনে নারীর বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অঙ্গুলীনির্দেশ নয়? সোমদেবের লেখায় এখানেই দ্বিত্ত— একদিকে যেমন ধর্মীয় অনুশাসনের বশবর্তী না হয়ে বাস্তব জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে বাস্তবসত্যের প্রতি ধর্মীয় অনুশাসনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিও নিক্ষেপ করা হয়েছে। এখানে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ছবিও পাওয়া যায়— খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয়ের পাশাপাশি কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনায় শাশুড়ী বৌ-এর চিরন্তন বিবাদ, সপত্নী সমস্যা ইত্যাদির উল্লেখ আছে।[২৪]

বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের চিত্র ফুটে উঠেছে লেখার মধ্যে। মহাযান বৌদ্ধধমেমর পরের দিকে উদ্ভূত দেবদেবী ধৈর্য্যপারমিতা, শীলপারমিতার নাম উল্লিখিত।[২৫]

'কথা সরিৎসাগর' ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি সৃষ্টিশীল সাহিত্য। আগেই বলা হয়েছে, গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থটি। ফলে এটিতে দীর্ঘকালীন সামাজিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, কারণ কোন লেখকই সমাজ বহির্ভূত নন। ফলে সোমদেবের সমসাময়িক বৈশিষ্ট্যগুলি কিছুটা হলেও তাঁর লেখায় বর্তমান। তাই গ্রন্থটিতে অনুশাসনমূলক রচনাগুলিতে বর্ণিত সমাজ ও তার বাইরে থাকা সমাজের এক সহাবস্থান দেখা যায়।

খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলে দেখা যাবে কথাসরিৎসাগর-এ অধিকতর শক্তিশালী দ্বিতীয় প্রবণতাটি, কারণ স্বাভাবিকভাবেই সেটি বাস্তবানুগ এবং প্রকৃত জীবনচর্চার সাথে জড়িত। ফলে সামাজিক ইতিহাসচর্চার এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ। এই মত পোষণ করেছেন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর কথা দিয়েই শেষ করি যেখানে তিনি বলছেন যে প্রাচীন সমাজের একটি বিশিষ্ট রূপ এখানে দেখা যায় যা অন্যান্য কথাসাহিত্যে দুর্লভ।[২৬]

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) আনুমানিক ১০৬৩-৮২ খ্রীঃ কাশ্মীরি কবি সোমদেব কর্তৃক রচিত গ্রন্থে বর্ণিত গ্রন্থরচনার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, জলন্ধর রাজকন্যা কাশ্মীর রাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতির চিত্তবিনোদনের জন্য গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থের সার সংকলন করে কবি ২১৩৮৮ শ্লোকে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রবন্ধে 'কথা-সরিৎ সাগর'-এর চারটি অনুবাদ-যথাক্রমে সর্বশ্রী হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, তারাপদ রাহা, চিত্তরঞ্জন ঘোষাল এবং সি.এইচ.টনী-কৃত-গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২) চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, কথাসরিৎসাগর, কলকাতা ২০০৩, পৃ. কথাপ্রসঙ্গ, ৩।

৩) তদেব, পৃ. ১৩৮।

৪) তদেব, পৃ. ১৩৯।

৫) তদেব, পৃ. ১৪৭।

৬) তদেব, পৃ. ২৭৭।

৭) 'কথাসরিৎসাগর'-এর বিভিন্ন কাহিনীতে— 'বণিক', 'বণিকপুত্র' বাণিজ্যযাত্রার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গল্পের কথা বলা হচ্ছে— পৃ. ১০৬, ১৫০, ২১৬, ২৪২, ২৬৭।

৮) বণিকদের প্রচুর সম্পত্তি, প্রচুর অর্থ-সম্পদ, দান-ধ্যানের কথা, ক্ষেত্রবিশেষে বিলাসিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। সম্পদ-বর্ণনার ক্ষেত্রে জাতকে বহুলভাবে উল্লিখিত বণিকদের 'আশিতিকোটি' পরিমাণ ধনসম্পদ কথা স্মরণীয়।

৯) চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, কথাসরিৎসাগর, কলকাতা, ২০০, পৃ. ২১৯, ২৪২, ২৬৭।

১০) তদেব, পৃ. ১১০, ১২৫, ২১৮, ২২৬, ২৬৮, ২৭৩, ২৯৩।

১১) তদেব, পৃ. ১০৭, ২৪২।

১২) তদেব, পৃ. ১৫৭, ১৫৮, ১৬৮।

১৩) তদেব, পৃ. ১০৯, ১৫৭, ১৫৮, ১৭০, ২২০।

১৪) পি.ভি. কানে, হিস্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পুনা, ১৯৭৪, পৃ. ৯২৬-৯৬৮।

১৫) (প্রসেডিংস, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী কংগ্রেস), দূর্বা আইন, রেস্ট্রিকশানস্ অন সি ভয়েজঃ এ টেক্সটুয়াল স্টাডী, ২০০১, পৃ. ১৯৪।

১৬) চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, কথাসরিৎ সাগর, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০৬।

১৭) তদেব, পৃ. ৭৮।

১৮) তদেব, পৃ. ৮২, ১৭০, ১৮৮।

১৯) বিভিন্ন কাহিনীতে নারীদের প্রভূত নিন্দা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কামাতুরা, শঠ, প্রবঞ্চক, নতুন-নতুন প্রেমাস্পদ লাভে তারা এতটাই আগ্রহী যে স্বামীকে যেন-তেন ভাবে প্রবঞ্চনা করার তাদের এতটুকু বাধা নেই।

২০) চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, কথাসরিৎ সাগর, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২০৭, ২০৯, ২১৫, ২৪০।

২১) তদেব, পৃ. ১৬৮, ১৬৯, ১৮৭।

২২) তদেব, পৃ. ৮৮-৯০।

২৩) তদেব, পৃ. ১৬৬।

২৪) তদেব, পৃ. ৬৪, ২৫৮।

২৫) তদেব, পৃ. ৮৯, ১১০।

২৬) শ্রী হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, কথাসরিৎসাগর, কলকাতা, ১৯৭৫, মুখবন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

# শিলালেখর আলোকে অশোকের পরিবেশ ভাবনা

রাজেশ ঘোষ

পরিবেশ, তথা মানুষের আজ বড় দুঃসময়! আমাদের ধারক এই পরিবেশকে আমরা যেভাবে খুশি লুঠ করছি, ব্যবহার করছি, ধ্বংস করছি! সভ্যমানুষের ক্ষমতার মানদণ্ডে এই লুণ্ঠনের তারতম্য রয়েছে, তবুও আমরা সবাই এই পাপের ভাগিদার। পরিবেশের একটা ক্ষুদ্র অংশ হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র পরিবেশ ও জীবজগৎকে এক সঙ্কটের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছি। পরিবেশের এই সঙ্কট সম্পর্কে আমরা কমবেশী সকলেই জ্ঞাত। তাত্ত্বিক মহলে পরিবেশ নিয়ে আলোচনাও কম হচ্ছে না। পরিবেশ বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতেও জায়গা করে নিয়েছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবেও পরিবেশের গুরুত্ব অনুভূত হয়েছে; শুরু হয়েছে পরিবেশগত ইতিহাস চর্চা। আজ ইতিহাসের মানুষকে এবং তার সমাজকে পরিবেশ সৃষ্ট ও পরিবেশের অংশ হিসাবে দেখা হচ্ছে। ইতিহাস চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সমাজবিদ্যা, জৈব বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানান দিক। বর্তমান পরিবেশের প্রয়োজনেই পরিবেশগত ইতিহাস চর্চা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। এই বাতাবরণে মৌর্য সম্রাট অশোকের (খ্রী পূঃ ২৭৩-২৩২ অব্দ) পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অছে। অশোকের বিখ্যাত 'ধম্ম' নীতি কতটা পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার সহায়ক হয়েছিল, তাও বিচার করা প্রয়োজন।

পরিবেশ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে— প্রকৃতির পরিবেশ বা জৈব পরিবেশ (Natural or Biological environment) এবং মানসিক বা সামাজিক পরিবেশ (Mental or Social environment)। অশোকের শিলালেখর নিরিখে এই দুই ধারায় অশোকের পরিবেশ ভাবনার ওপর আলোকপাত প্রয়োজন। একে অপরের যে পরিপূরক তাও এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। পরিবেশের সংরক্ষণে এবং পরিবেশ বৈচিত্র (Bio-Diversity) ও ভারসাম্য (Biological balance) রক্ষায় পশু-প্রাণী-উদ্ভিদ সংরক্ষণের ওপর অশোক যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'ধম্ম' নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে 'অহিংস' আদর্শকে সার্বজনীন স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম ও নবম মুখ্য শিলালেখতে

অহিংস ও পশু সংরক্ষণ নিয়ে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চম স্তম্ভ লেখতেও পশু সম্পদের মূল্যের ওপর আলোকপাত হয়েছিল। বর্তমানেও এই নির্দেশগুলো সমান তাৎপর্যের দাবী রাখে।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে অশোকের 'ধম্ম' নীতি অহিংস নীতি— পরিবেশ ভাবনা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে পূর্ণাঙ্গিতালাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মে গৃহীত অহিংসনীতিকে অশোক তাঁর প্রশাসনিক নীতির মোড়কে উপস্থাপন করেন। তিনি এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ করে ছিলেন জীব বা প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'গোরক্ষা' আদর্শকে অশোক হাতছাড়া করেননি। তিনি সেই সব ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন যেখানে ব্যাপক হারে পশুবলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পশুসম্পদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অশোক উপলব্ধি করেছিলেন। অহিংস নীতিকে অশোক হিংসা বা ধ্বংসনীতির বিপরীত নীতি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে অশোক মৌর্য রাজপ্রাসাদেব রন্ধনশালায় ক্রমান্বয়ে পশুবলি সঙ্কোচন ও শেষ পর্যন্ত বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি তিনি নির্দেশ দেন যে সাধারণ মানুষও যেন এই 'অহিংস' মডেল অনুসরণ করেন। তবে খাদ্যের জন্য সীমিত পশুহত্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পশুসম্পদ অপচয় রোধ করে তিনি রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

পঞ্চম স্তম্ভ লেখতে একাধিক পশুপাখীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এগুলো 'লুপ্ত প্রায়' জীব তাই এদের হত্যা বা শিকার করা কোনভাবেই যাবে না। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টিয়া, ময়না, রাজহাঁস, পায়রা, বাদুড় কচ্ছপ, কাঠবেড়ালী, হরিণ, গণ্ডার সহ আরো অনেক প্রাণী। এখানে আরো বলা হয়েছে যে জৈবপদার্থ আছে এমন কোন জিনিস বা কৃষিবর্জ (agricultural waste/chaff) আগুনে পোড়ানো যাবে না। অশোক সম্ভবত জৈব অবক্ষয় রোধ করার জন্য এবং জৈবচক্র ও বাস্তুতন্ত্রকে (ecosystem) সক্রিয় রাখার জন্য এই নির্দেশ জারি করেছিলেন। অরণ্যে অগ্নি সংযোগ করা বা নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পশুহত্যা করার ওপর বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, যে অরণ্য সম্পদ ধ্বংসের ওপর বাধা নিষেধ আরোপিত হলেও কৃষির স্বার্থে বা জনপদনিবেশ নীতির কার্যকারিতার জন্য অরণ্য সঙ্কোচন বা বৃক্ষছেদন করা যেত। এর সাথে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। অরণ্য সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি, ঔষধী গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের চাষাবাদের ওপরও অশোক জোর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মুখ্য শিলালেখতে এর কথা বলা হয়েছে।

মানুষ তথা পশুসম্পদের চিকিৎসা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঔষধী উদ্ভিদের চাষ, সংরক্ষণ ও প্রসার দরকার। অশোকের মতে যে সব জায়গায় এদের অভাব রয়েছে বা এদের অস্তিত্ব নেই, সেখানে এই উদ্ভিদের চাষ প্রয়োজন। অশোক তাঁর সাম্রাজ্যে সুস্বার্থ বিধান করাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্যোগে এই ঔষধী উদ্ভিদ চাষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। সার্বিক চিকিৎসাকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ সত্যই অভিনব ছিল।

দ্বিতীয় মুখ্য শিলালেখতে জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, মৌর্য সাম্রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য তথা দূরবর্তী গ্রীক রাজ্যেও জনস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে অশোক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শিলালেখতে অশোক দুই শ্রেণীর চিকিৎসা পরিষেবার কথা বলেছিলেন। একটি মানুষের জন্য, অপরটি পশু-প্রাণীর জন্য। জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যপদ্ধতি সম্পর্কে অশোক এক প্রকার বৃহত্তর চেতনা ও দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে রাজনৈতিক সীমানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তাঁর মধ্যে সার্বিক বিশ্বচেতনা কাজ করেছিল। স্বাস্থ্যপরিষেবাকে রোগ ও পীড়ন দূরীকরণে কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। জীবন রক্ষার সাথে সাথে মৃত্যু হার কমানোর ওপরও তাঁর নজর ছিল। ভেষজ চিকিৎসাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। জরা-ব্যাধির হার কমিয়ে পরিবেশকে তিনি দূষণমুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

অশোক সাম্রাজ্যের পরিবেশ কল্যাণে 'ধম্ম নীতির' প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে চতুর্থ মুখ্য লেখতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথাও রয়েছে। জীবন ধারার আচরণ বিধি হিসাবে 'ধম্ম' জৈবিক ও সামাজিক পরিবেশ সংশোধন ও সংরক্ষণে সুফল দিয়েছিল। মানব আচরণ সংশোধনে 'ধম্ম' নীতি ব্যাপকভাবে সাড়া পেলে, সামগ্রিক পরিবেশগত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক ও জৈবিক পরিবর্তনকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানুষের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে অশোক যে সাফল্য পেয়েছেন তা তিনি শিলালেখতেই বলেছেন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার জন্য 'ধম্ম' নীতির দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। কর্মসূচীগত কৌশলকে ব্যবহার করে সহজেই জনগণের সামাজিক ও জৈবিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। অশোক পারলৌকিক জীবনের তত্ত্বকে সচেতন ভাবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বস্তুজীবনে সৎ ও ভালো কাজ করার মনোবল যুগিয়েছেন। 'ধম্মের' প্রধান লক্ষ্যই ছিল সামাজিক মঙ্গল ও সততার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেওয়া। শিলালেখ

জারি করার অন্যতম উদ্দেশ্য বা দিক মানুষের ভালোত্বকে উজ্জীবিত করা এবং তার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও জৈবিক পরিবেশকে সংরক্ষণ করা।

জৈবিক ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় জনচেতনার প্রসার জনউদ্যোগ ও জনশিক্ষার মধ্য দিয়েই কার্যকর করা সম্ভব ছিল। সামাজিক স্তরে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে, সমাজের অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে, সাধারণ মানুষকে পরিবেশ শিক্ষার মধ্য দিয়ে, প্রয়োজনে দান বা পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর প্রসঙ্গে প্রধান অষ্টম শিলালেখতে নির্দেশ দেওয়া আছে। একই লেখতে 'আলোকপ্রাপ্তির বৃক্ষ' বলতে অশোক সম্ভবত বৃক্ষ তথা অরণ্য রক্ষা এবং তারই মধ্য দিয়ে পরিবেশ বাঁচানোর প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব বলে জানাতে চেয়েছেন। মানবজীবনের আসল শিক্ষাই যে পরিবেশাশ্রিত তাও এই পরিভাষা থেকে বোঝা যায়। পরিবেশ সংক্রান্ত ভাববিনিময়ের আদান প্রদানের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মৌর্য রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। চতুর্দশ মুখ্য শিলালেখতে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য জুড়ে 'ধম্ম' প্রচারের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বহুমুখী ধম্মনীতির পরিবেশ সংক্রান্ত দিকটিও যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই বোঝা যায়। 'ধম্ম'কে গণসংযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে যুক্ত, রাজুক বা প্রদেশিকদের পরিবেশ তথা অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠানো হত। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটা বড় দায় ছিল সাধারণ মানুষকে সমাজ তথা পরিবেশ সচেতন করে তোলা। সময়ের ব্যবধানে এই চেষ্টার অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার মূল্যায়ন করা হত।

'ধম্ম' মহামাত্রগণ বিশেষ ক্ষমতা বলে পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা মাফিক 'ধম্ম' সম্পর্কে জনচেতনা ও জনসংযোগ বৃদ্ধির দিকটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। সাম্রাজ্যের ভেতর কিংবা বাইরে 'ধম্ম' তথা পরিবেশ চেতনা সম্প্রচার করার দিকে অশোক বিশেষ লক্ষ্য দিয়েছিলেন। গ্রীক, কাম্বোজ, গন্ধার সহ অন্যান্য জনজাতির মধ্যে এই চেতনার বার্তা পৌছে দিতে চেয়েছিলেন। জনচেতনা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোন রকম শ্রেণী প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন রকম তফাৎ না করেই সামাজিক ও জৈবিক পরিবেশগত চেতনা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিজ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে অপর গোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিরোধ করতে চাওয়ার মধ্য দিয়েই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল যা সামাজিক পরিকাঠামোকে করে তুলেছিল ভঙ্গুর। অশোক মৌর্য সমাজের এই ভঙ্গুর অবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য 'ধম্মের' মধ্য দিয়ে

শ্রেণী/গোষ্ঠী সংঘাত কমিয়ে সামাজিক পরিবেশকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একে অন্যের নীতি, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাকেই সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রধান পূর্বশর্ত বলে অশোক মনে করতেন। তাঁর দ্বাদশ শিলালেখ থেকে এই বার্তাই পাওয়া যায়। চতুর্দশ শিলালেখতে ন্যায় বিচারের সংরক্ষণ ও তার যথাযথ সার্বিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। নির্দোষ ব্যক্তিদের ওপর আইনী অপপ্রয়োগ যাতে না হয় বা তাদের ওপর শারীরিক উৎপীড়ন না ঘটে, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে জনচেতনার সম্প্রসারণের কাজ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর সেই দায়িত্ব পালনে ছিলেন রাজুকগণ।

জৈবিক পরিবেশ রক্ষার সাথে সামাজিক পরিবেশরক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমেই অশোক ব্রাহ্মণ্য উৎসব বা মঙ্গল অনুষ্ঠানের ক্ষতিকর দিকগুলো উপেক্ষা করে সামাজিক দূষণরোধের কথা বলেছিলেন। মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পবিত্রতার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল। তৃতীয় প্রধান লেখতে বলা হয়েছিল যে ভোগবাদী মানসিকতা থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে। সম্পদের যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারিণ শ্রেণী বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে। তীব্র কামনা, প্রতিযোগিতা, ধ্বংসবৃত্তি প্রভৃতিকে অশোক আর্থ-সামাজিক ও জৈবিক পরিবেশের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। অশোক এই সব কিছুর সমাধানে 'ধম্ম' কে ব্যবহার করে একটি মৌলিক জীবনবোধ তথা সংযুক্ত সাংস্কৃতিক বাতাবরণ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এব্যাপারে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ উন্নয়নের অনুকূল পদক্ষেপ বা কর্মসূচী তৈরী করতো। জনসাধারণও যাতে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে বা তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন সে দিকেও প্রশাসনিক তৎপরতার কোন ঘাটতি ছিল না। চতুর্থ প্রধান লেখতে অশোক দাবী করেছিলেন যে মানব আচরণ সংক্রান্ত 'ধম্ম' নীতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে সামাজিক মূল্যবোধ পুনরায় নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের নৈতিকতারও যথেষ্ট উন্নতি চোখে পড়েছে। পঞ্চম প্রধান লেখতে অশোক ভালো অথচ কঠিন এই কাজকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। সপ্তম প্রধান লেখতে তিনি আত্মসংযম, মানসিক পবিত্রতা, সততা ও দৃঢ় বিশ্বাসের আবশ্যিকতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সামাজিক শিক্ষাদান ও তার মাধ্যমে সামাজিক আচরণ নির্ধারণ করাকে অশোক সামাজিক দায় বলে মনে করেছিলেন। জীবিত সমস্ত প্রাণীর প্রতি সংযমী আচরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

একাদশ প্রধান লেখতে প্রকৃতি সৃষ্ট প্রতিটি জীবের প্রতি ভালো আচরণ করার কথা বলা হয়েছে। প্রাণী হত্যা বন্ধ করার পাশাপাশি অন্যের প্রাপ্য মর্যাদা দান করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। ত্রয়োদশ প্রধান লেখতে যুদ্ধ ও মানব সম্পদ ও প্রাণ অপচয়ের বিরুদ্ধে পরিষ্কার বক্তব্য রাখা হয়েছে। যেকোন রকম পাশবিক আচরণকে সমালোচনা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির মানসিক চাল বা আঘাতের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। মানসিক স্থিতি ও শান্তি স্থাপনই হল আসল— তা অশোক এই লেখতে দেখিয়েছেন। অশোকের কাছে সৎ ও ভালো কাজই ছিল 'ধম্ম' নীতির নামান্তর। এই নীতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে শুধু রাজকীয় আদেশ নামা জারি করার ওপর অশোক আস্থা রাখেন নি, বরং মানসিক পরিবর্তনের ওপর তিনি সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন। তিনি মানুষ তথা সমাজের একেবারে মূল থেকে এই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।

অশোক বা তাঁর পূর্ব্বের মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বাত্মক ও নিয়ন্ত্রণকারী চরিত্র ধারণ করে সম্পদের উৎপাদন ও তার যথার্থ পালন বা সংরক্ষণের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। অনেকটা সহনীয় উন্নয়ন (Sustainable development) নীতি বা কৌশলকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও চাহিদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সচেতন থেকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। অশোকের স্তম্ভগুলোতে বিভিন্ন প্রাণীর মূর্ত্তির উপস্থিতি প্রমাণ করে যে মৌর্য প্রশাসন প্রাণী সংরক্ষণকে জাতীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত করেছিল, পাশাপাশি এগুলো প্রাণী তথা পরিবেশ সংরক্ষণে জাতীয় চেতনাও গড়ে তুলতে চেয়েছিল। অশোকের সুদর্শন হ্রদ সংস্কার ও পরিবর্ধন নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য এনেছিল। একে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার অন্যতম কর্মসূচী হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়।

শিলালেখর ওপর নির্ভর করে অশোকের পরিবেশ ভাবনার ব্যাপকতা সহজেই বোঝা যায়, শুধু বোঝা যায় নয়, বর্তমান যুগেও তাঁর চিন্তাভাবনা এবং কর্মসূচী যে কতটা প্রাসঙ্গিক এবং অনিবার্য তাও অনুধাবন করা যায়। প্রাকৃতিক সঙ্কট ও পরিবেশ ধ্বংস প্রক্রিয়ার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অশোক 'ধম্ম' নীতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিধান ফলপ্রসু হওয়ার দাবী রাখতে পারেন, আর এখানেই পরিবেশগত ইতিহাসচর্চার সার্থকতা।

# প্রাচীন তাম্রলিপ্তের মুদ্রা

গৌরীশংকর দে

প্রাচীন ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্ত একটি সুপরিচিত নাম। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তটে অবস্থিত তমলুকের মৃত্তিকাগর্ভে সমাহিত হয়েছে অতীত তাম্রলিপ্তের ধ্বংসাবশেষ।

প্রাচীন ভারত ও সিংহলের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং গ্রীক, রোমান ও চীনা লেখকদের বিবরণীতে বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিংহলের ধর্মগ্রন্থ 'মহাবংশ' অনুসারে মৌর্য সম্রাট অশোকের ইচ্ছানুক্রমে পবিত্র বোধিদ্রুম শিশু নিয়ে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা সিংহলের উদ্দেশ্যে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন। একটি দেশ ও নগরী দুয়েরই নাম ছিল তাম্রলিপ্ত।

'কথাসরিৎসাগর' অনুসারে তাম্রলিপ্তের নগরী পূর্ব সমুদ্রের অদূরে অবস্থিত ছিল। হেমচন্দ্র রচিত 'অভিধানচিন্তামণি'তে তাম্রলিপ্তের বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে। যেমন— তামলিপ্ত, দাখলিপ্ত, তামলিপ্তি, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ ইত্যাদি। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের অন্য এক নাম বেলাকুল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি এবং দ্বিতীয় শতকে টলেমি এই নগরীর উল্লেখ করেছেন।

চীনদেশীয় গ্রন্থ 'শুই চিং-চু'-র এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে তাম্রলিপ্তের (তান্-সেই) এক রাজা পীত তোরণে দূত প্রেরণ করেছিলেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজ যোগে সিংহলে গিয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে অন্য এক চীনা পরিব্রাজক ঈ-ৎসিঙ তাম্রলিপ্ত থেকে সমুদ্রপথে সুমাত্রা দ্বীপের পূর্বাঞ্চল (শ্রীবিজয়) অভিমুখে যাত্রা করেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন—সাঙ তাম্রলিপ্তে (তান্-মো-লি-তি) আগমন করেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে, প্রসিদ্ধ বন্দর-নগরীটি একটি সংকীর্ণ খাড়ির তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৭০০ অব্দ পর্যন্ত এক হাজার বছরধরে বন্দর

রূপে তাম্রলিপ্তের অস্তিত্ব ছিল। তমলুকের (তাম্রলিপ্ত) ভৌগোলিক অবস্থানের তাৎপর্য ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় সংক্ষেপে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাম্রলিপ্ত এক দিক থেকে দেখলে নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গের একটি বন্দর-নগরী আবার রাঢ় অঞ্চলের সম্প্রসারিত একটি ভূখণ্ড। নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে তাম্র-প্রস্তর যুগ হয়ে ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে এর অবস্থান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা গেছে কুষাণ যুগ থেকে এখানে নগরায়ণের সূত্রপাত, যদিও বন্দর রূপে এর অভ্যুত্থান তার আগে থেকে।

চীন, সিংহল এবং পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে যাত্রার প্রাক্‌কালে জাহাজে আরোহণের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রূপে তাম্রলিপ্ত খ্যাতি অর্জন করেছিল। তমলুকের অদূরে রূপনারায়ণ ও নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা চলে যে এখানেই গড়ে উঠেছিল প্রচীন বন্দর নগরী তাম্রলিপ্ত যেখান থেকে বহু জাহাজ দেশ বিদেশে পাড়ি দিত এবং বিদেশের বহু জাহাজ এসে নোঙর ফেলত। ১৯৩৫ সালে বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ টি.এন. রামচন্দ্রন তমলুক থেকে আবিষ্কার করেন পত্র, তারকা ও মৎস্য অঙ্কিত দুটি মৃন্ময় পাত্র। এই আবিষ্কার থেকে অনেকে অনুমান করেছেন, সুদূর মিশর, গ্রীস ও রোমের সঙ্গে সমুদ্রপথে সম্ভবত এই অঞ্চলের বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, তমলুকের কাছাকাছি এবং রূপনারায়ণ কয়েকটি অঞ্চল, যেমন ইছাপুর, অমৃতবেড়িয়া, বাঁকা, নাটশাল ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও সাম্প্রতিককালে গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রাচীন তাম্রলিপ্তের ইতিহাসের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য। তমলুক থেকে পাওয়া গেছে বিশেষ ধরণের জলের ঝারি ও রুলেটড্ মৃৎপাত্র। রূপনারায়ণের তীরবর্তী ইছাপুরের প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক কালের একটি পাত্রে একটি নৌকা বা জাহাজের অবয়ব উৎকীর্ণ দেখা যায়।

তাম্রলিপ্ত যে কেবল একটি সামুদ্রিক বন্দর রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল তা নয়, স্থলপথেও এই নগরী ছিল মগধ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন নগর ও জনপদের সঙ্গে যুক্ত।

'দশকুমারচরিত' গ্রন্থে (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) তাম্রলিপ্তে 'যবন' বণিকদের আগমনের উল্লেখ আছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকেও যে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি ভারতীয় বণিকসমাজকে আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে হাজারিবাগ জেলায় অবস্থিত দুধপানি শিলালিপি থেকে।

তাম্রলিপ্ত থেকে মুদ্রা আবিষ্কারের দিক থেকে উনবিংশ শতক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলায় কয়েকজন সাহিত্যিকের অবদান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র তমলুক থেকে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কিত মুদ্রা (punch-marked) উদ্ধার করেন।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে) সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রকাশিত 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির চিত্র অঙ্কন করেন।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রূপনারায়ণ নদ পূর্ব খাদ পরিবর্তন করে নতুন খাদে প্রবাহিত হলে প্রাচীন খাদের ভূ-গর্ভ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলির অধিকাংশ স-ছিদ্র। কয়েকটির উপরে ছিল পদ্ম, চক্র, চৈত্য, হস্তী, মৃগ, সিংহ ইত্যাদি চিহ্ন ও প্রতিকৃতি। চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী জানিয়েছেন তাম্রমুদ্রা যে সব অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে বুঝতে হবে সেই সব অঞ্চল অতীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মচঞ্চল ও জন-অধ্যুষিত কেন্দ্র ছিল। এই মুদ্রাগুলি দৈনন্দিন কেনাকাটার কাছে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। মুদ্রাগুলি বন্দর তাম্রলিপ্তের গৌরবময় অতীতের অতি মূল্যবান উপকরণ।

১৮৮৮ সালে কবি মাইকেল মধুসূদনের অকৃত্রিম সুহৃদ গৌরদাস বসাক তমলুকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে অবস্থানকালে কয়েকটি আশ্চর্য পুরাদ্রব্য সংগ্রহের সুযোগ পান। রূপনারায়ণের নিকটে এক ডাকবাংলোয় তিনি অবস্থান করছিলেন। এই সময় নদীর ভাঙন চলছিল আর ভগ্ন নদীতট থেকে বেরিয়ে পড়ছিল বিচিত্র প্রত্ন-নিদর্শন— অতীত তাম্রলিপ্তের স্মৃতি। কয়েকটি বালক এই নিদর্শনগুলি কুঁড়াচ্ছিল। এই নিদর্শনগুলির মধ্য থেকেই গৌরদাস সংগ্রহ করেন এক অপূর্ব সালঙ্কারা মৃন্ময় প্রতিমা। পঞ্চচড়া এই প্রতিমাটিকে গৌরদাস এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন। তিনি তখন এই সোসাইটির সম্পাদক। পরবর্তীকালে এই প্রতিমাটি রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয় ও ইংল্যান্ডের এক সংগ্রহশালায় আবির্ভূত হয়। এই প্রতিমাটিই বিখ্যাত 'অক্সফোর্ড ফিগারিন'। অসাধারণ এই মৃন্ময় মূর্তির সঙ্গে গৌরদাস কিছু প্রাচীন তাম্রমুদ্রাও পেয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৮৮ সালের প্রসিডিংস-এ উল্লিখিত পুরাদ্রব্যগুলি বিষয়ে গৌরদাস একটি সচিত্র নিবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। তাম্রলিপ্তের ইতিহাসের দিক থেকে গৌরদাস বসাকের এই নিবন্ধটি অতীব মূল্যবান। নিবন্ধটি অবিলম্বে মুদ্রিত হওয়া জরুরী। কেন না উক্ত প্রসিডিংসটি ইতিমধ্যেই প্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছেছে।

১৯৫৫ ও ১৯৭৫ সালে তমলুকে উৎখননের ফলে চিহ্ন যুক্ত ও ছাঁচে ঢালাই কিছু তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়।

যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৮২ সালের বিবরণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন এই সালে তমলুকে প্রথম কণিষ্কের একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রার মুখ্যদিকে রাজমূর্তি, গ্রীক সফরে রাজার নাম ও উপাধি ছিল। এছাড়াও তমলুক থেকে বেশ কিছু কুষাণ তাম্রমুদ্রা পাওয়া গেছে। আমরা জানি কুষাণ

যুগ ভারতীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ। তাম্রলিপ্তের মতো বিখ্যাত বন্দর যে কুষাণ বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র থাকবে এতো একান্ত স্বাভাবিক।

গুপ্ত যুগেও আন্তর্জাতিক বন্দর রূপে তাম্রলিপ্তের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। তমলুকে আবিষ্কৃত গুপ্ত যুগের মুদ্রা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখান থেকে পাওয়া গেছে গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা, মুদ্রার প্রধান দিকে অশ্বারোহী রাজমূর্তি, গৌণ দিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মী। মেদিনীপুর জেলার অন্য একটি অঞ্চল থেকে গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ক আলোচনায় কেবল প্রাপ্ত মুদ্রা নয়, আরেকটি ভিন্ন ধরনের নিদর্শনের অবতারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে তমলুকে পুরাতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত মৃন্ময় পাত্রে চিত্রায়িত প্রাচীন মুদ্রার রূপায়ণ ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাস রচনায় একটি অতি মূল্যবান উপকরণ।

তমলুকের পার্বতীপুর থেকে প্রাপ্ত এক ভগ্ন মৃত্তিকাফলকে রূপায়িত গোরুর গড়ি বোঝাই করে আনা মুদ্রা নিয়ে গড়ে ওঠা বৌদ্ধকাহিনী জেতবণ দান-এর ছবি। ভারহুত ও বুদ্ধগয়ার পাষাণ ফলকে যে ছবি, এখানে তার ভগ্নাংশ পাচ্ছি মৃত্তিকাফলকে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তাম্রলিপ্ত ছিল বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই কারণেই ফা-হিয়েন, ঈ-ৎসিঙ ও হিউয়েন সাং এই তিনজন বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। তমলুকের মৃত্তিকা ফলকটি খ্রিস্টপূর্ব ২য়-১ম শতকের। এখানে প্রাপ্ত শুঙ্গযুগের অন্য একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে একটি পূর্ণ কলস থেকে উপচে পড়ছে মুদ্রারাশি। ফলকটি বর্তমানে ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। প্রথম ফলকটি রয়েছে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায়।

প্রাচীন মুদ্রার রূপায়ণ সম্বলিত মৃন্ময় ফলক সমগ্র বাংলার মাত্র দুটি প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর একটি চন্দ্রকেতুগড়, অন্যটি তাম্রলিপ্ত। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি অটুট মৃত্তিকাফলকে দেখা যাচ্ছে বেদীর উপরে দণ্ডায়মান ধনদেবী একটি পাত্র উপুড় করে মুদ্রা ঢেলে দিচ্ছেন আর ভক্ত তা পাত্র ভরে গ্রহণ করছেন।

চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপ্ত থেকে আবিষ্কৃত মৃত্তিকাফলকগুলি প্রাচীন কালের লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির উপরেও প্রখর আলোকপাত করে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) Artibus Asiae, vol. XIV, pp. 226-239, 1951, Ascona, Switzerland, T.N. Ramchandran : Tamralipti (Tamluk)

২) The Archaeological Treasures of Tamralipta : P.C. Das Gupta, Tamluk, 1975.

৩) Studying Early India : Brajadulal Chattopadhyay, New Delhi, 2002.

৪) Kusana coins and History : P.L. Gupta & S. Kulashreshtha, New Delhi, 1993.

৫) Chandraketugarh : A Lost Civilization : Gourisankar De & Shubhradip De, Calcutta-2004.

# নেপাল ও ভারতের ধাঙ্গরদের দ্রাবিড়ীয় উৎস একটি স্থান নাম নির্ভর ইতিহাস চর্চা

সুজিত কুমার আচার্য

বর্তমান কালে দুটি রাষ্ট্রে 'ধাঙ্গর' নামে পরিচিত মানুষদের অবস্থান রয়েছে। তার একটি হল নেপাল, সেখানে অর্দ্ধলক্ষাধিক ধাঙ্গরদের বাস।[১] এরা নেপালের আদিমতম জনজাতি[২] বলে বিবেচিত হলেও এরা দ্রাবিড়ভাষা গোষ্ঠীর সদস্য কুরুখ অর্থাৎ ওরাঁও-দের ভাষা[৩] ব্যবহার করে। ভারতের ধাঙ্গর অভিধাধারী মানুষেরা উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় এবং মহারাষ্ট্রের পুনে, আমেদনগর, সাংলী, সাতারা ও শোলাপুর জেলাগুলির পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। মহারাষ্ট্রের ধাঙ্গররা তাদের আদিম মাতৃভাষা ত্যাগ করে তাদের চতুর্দিকস্থ প্রচলিত ভাষা, মারাঠি বা হিন্দীভাষাকে গ্রহণ করেছে।[৪] আদম সুমারীতে এদের স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকৃত। তাই তাদের জনসংখ্যা সহজলভ্য নয়। কিন্তু ১৯৮১ সালের আদম সুমারী অনুসারে মির্জাপুর জেলার ধাঙ্গরদের জনসংখ্যা একুশ হাজারের মত। সুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী এরা ওরাঁও বলেও পরিচিত।[৫]

নেপালের ধাঙ্গরদের আদিম বাসভূমি ছিল তথাকার চুরে উপত্যকার বিভিন্ন নদীর ধারে এবং তারা জলনিয়ন্ত্রণে বিশেষ পারদর্শী ছিল।[৬] অর্থাৎ বর্তমানের মত সুদূর অতীতেও তারা কৃষিজীবী ছিল। মির্জাপুর জেলার ধাঙ্গররাও কৃষিজীবী।[৭] অপরপক্ষে মহারাষ্ট্রের ধাঙ্গর জনসংখ্যার সিংহভাগই পশুপালকের বৃত্তিতে নিযুক্ত।

মহারাষ্ট্রের ধাঙ্গরদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপক কোসাম্বী বলেছেন[৮] যে খ্রীষ্টিয় চতুর্থশতকের পূর্ব থেকেই সে অঞ্চলে তাদের অবস্থানের ইঙ্গিত রয়েছে। আবার সপ্তম শতকের একটি শিলালেখ[৯] থেকেও তাদের তৎকালে সে অঞ্চলে অবস্থানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। স্পষ্টতই ধাঙ্গররা অতি প্রাচীন কালেই সে এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। সঙ্গত অনুমান যে তাদের আগমনের পূর্বেই সে অঞ্চলের কৃষিযোগ্য সমস্ত ভূভাগই লাঙ্গলের আওতায় এসে গিয়েছিল। তার ফলে নবাগতদের পশু পালনের বৃত্তি গ্রহণ ছাড়া কোনও গত্যন্তর ছিল না। মহারাষ্ট্রের ঐ পাঁচটি জেলায় তাদের পত্তনিকরা গ্রামের মধ্যে ৯টি গ্রামের নাম 'তন্ডুলবাড়ী' ও ২টি গ্রামের নাম 'চাষ' প্রমাণ করা যে তারা কৃষিতে আগ্রহী এবং অভিজ্ঞ ছিল। এই তন্ডুল কথাটিও কিন্তু একটি দ্রাবিড় কথা।[১০]

ভারতে ওরাঁওদের সিংহভাগই বাস করে পূর্বতন বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলায়। ওরাঁওদের সঙ্গে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আর একটি দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীও সে অঞ্চলে বাস করে। তারা 'মালপাহাড়ী' নামে পরিচিত এবং তাদের মাতৃভাষাকে 'মালতো' ভাষা বলা হয়।[১১] এই দুই নরগোষ্ঠীই অতি প্রাচীনকাল থেকে ঐ অঞ্চলে অধিষ্ঠিত। তাই এদের দ্বারা সে অঞ্চলে পত্তনিকরা গ্রামগুলির নামে দ্রাবিড়চিহ্ন অবশ্যই থাকা স্বাভাবিক। আবার গ্রাম নামে এই দ্রাবিড় চিহ্নগুলি যদি নেপাল ও মহারাষ্ট্রের তথা মির্জাপুরের ধাঙ্গর অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও পাওয়া যায় তবে তর্কাতীত ভাবেই বলা যায় যে কোনও এক সুদূর অতীতে নেপাল ও ভারতের ধাঙ্গররা একই ভৌগোলিক তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করতো। পরবর্তীকালে কোনও কারণে তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ নেপাল ও মহারাষ্ট্রে অভিনিবেশিত হয়েছিল।

(২)

এখন আমরা নেপাল, মহারাষ্ট্র, মির্জাপুর ও সাঁওতাল পরগণার দ্রাবিড় চিহ্নযুক্ত স্থাননামগুলির সাযুজ্য বিচার করব। এই তুলনামূলক আলোচনায় একই রকমের দ্রাবিড়ীয় চিহ্নযুক্ত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত তিনটি ভৌগোলিক এলাকাকেও যুক্ত করতে চাই। এগুলি হলো, (১) জলপাইগুড়ি জেলা ও স্বাধীনতাপূর্ব সময় দিনাজপুর জেলা, (২) মেদিনীপুর, অবিভক্ত ২৪ পরগণা, নদীয়া ও স্বাধীনতা পূর্ব যশোহর জেলা, (৩) ব্রাহুইভাষী আবাসিত বালুচিস্তানের জেলাসমূহ।

যদিও সংযোজিত এই তিনটি অঞ্চলে একই জাতির দ্রাবিড় চিহ্নযুক্ত স্থান নাম বর্তমান, তবু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু কারণ রয়েছে। এই অঞ্চলের চারটি জেলাই প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত। বর্তমানে মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলে জঙ্গল নেই। কিন্তু যে আবহাওয়া ও ভৌগোলিক কারণে সুদূর নোয়াখালী থেকে ২৪ পরগণা পর্যন্ত ব্যাপ্ত জঙ্গলের জন্ম হয়েছিল, সেই একই আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে থাকা সমুদ্রোপকূলীয় মেদিনীপুরেও জঙ্গলটি বিস্তৃত থাকাটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই এলাকার জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশই হলো মাহিষ্য - যারা শতাধিক বছর আগেও কৈবর্ত বলে পরিচিত ছিল। কৈবর্তরা অনিবার্যভাবেই কৈবর্তভূমি বা কেবট্ট ভোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অন্যত্র প্রাচীন কয়েকটি পরোক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছি যে কৈবর্তভূমি বা কেবট্ট ভোগ কলিঙ্গ দেশের সমুদ্রোপকূলে ছিল।[১২]

পণ্ডিতদেয় মধ্যে এ ব্যাপারে মত পার্থক্য নেই যে ব্রাহুইভাষা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর

এক সদস্য। প্রয়াত অধ্যাপক এম.বি. এমেন্যু, যিনি দ্রাবিড়ভাষা সমূহে সুপণ্ডিত এবং বার্কেলী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন, তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলে গেছেন, "It has been noted previously and demonstrated to the hilt that Brahui joins the Kurukh and Malto in showing an unique phonological phenomenon within the Dravidian family."[১৩] এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ব্রাহুই, মালতো এবং কুরুখভাষীরা (ওরাঁওরা) সুদূর অতীতে পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বেশ কয়েক শতাব্দী বাস করেছিল; তা না হলে এই তিনভাষীদের মধ্যে উচ্চারণগত একাত্মতা দেখা দিতে পারে না। দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানের ফলে আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতির কতকগুলি ক্ষেত্রেও তারা একই শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। আলোচনায় আমরা সেই চিত্রটিই দেখবো।

(৩)

এবার এই ছয়টি স্থান নাম সমূহের উৎস সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক। বালুচিস্তান দিয়েই সুরু করা যাক। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্থান নাম যুক্ত বালুচিস্তানের আদম সুমারীর রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন যে সব সূত্র থেকে বালুচিস্তানের সাড়ে তিন হাজারের বেশী গ্রামের মধ্যে প্রায় একশত গ্রামের ও স্থানের নাম সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত স্থান নামগুলি লক্ষণীয়। নীচে সূত্রসমূহ ও তদন্তর্গত গ্রাম/স্থান নাম সমূহ দেওয়া হলো ঃ—

১। Baluchistan District Gazetteer Vol IX 1908-09 থেকে প্রাপ্ত স্থান নাম সমূহ ঃ— চুহারকোট, মুর্ঘীকোট, পাঠানকোট, সন্‌জওয়ারী এবং হেজীবাড়ী (শেষোক্ত দুটি উপজাতির নাম)।

২। Baluchistan District Gazetteer of Sarwan District, 1907 থেকে 'খাজুরী';

৩। Country of Baluchistan, by A. Hughes (1877) থেকে 'গাংগুড়', 'নরওয়ারী', 'শাল', 'নাল', 'পান্‌জগুড়', 'লোগুড়ি' ও 'সংগুড়ি' (শেষোক্ত দুটি উপজাতির নাম);

৪। MacMillan Centennial World Atlas থেকে -- খাজুরীকছ, রাণীকোট, ধানসার, চানকুন্ডি।

৫। Census Report of Baluchistan, of 1931-এর Vol IV (1934) এ সংযোজিত মানচিত্র থেকে — নকুন্ডি, দাব্বরকোট, নাহারকোট, মাছ, গলাঙ্গড়, মালচৌকী, কোট, জঙ্গল, কুন্ডলানে, মাস্তুঙ্গ, মুঙ্গাচর, ছাপ্পর, পাঙ্গজুর, ওরমাড়া ও এড়ি কলঙ্গ।

৬। Babur Nama edited by Wheeler M. Thackston (2002) থেকে দিনকোট, মুকুড়।

এছাড়া বালুচিস্তানের ১৯০১ এর সেন্সাস রিপোর্ট (Vol V & VI - 1902) থেকে তথাকার কতিপয় উপজাতির নাম পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলি হলো ঃ আচড়া, অঙ্গারিয়া, চান্ডিয়া, দাই, ডোম/ডোম্‌কি, ছুট্টা, গণ্‌জুরা, হরিপাল, ঝুগ্নি, কালমাট্টি, খুন্ডি, মোহানা ইত্যাদি। বালুচিস্তানের অনেক উপজাতির নাম ও তাদের আবাসিত এলাকার একই নাম হয়। যেমন, সারওয়ান, ঝালওয়ান, ডোম্‌কি, কালমাট্টি প্রভৃতি। উপরোক্ত তালিকার শেষ নাম মোহানা উপজাতিটি সম্বন্ধে ঐ রিপোর্টের ১৩৪ পাতায় আছে, "they constituted the fishing population of the coast", দেখা যাচ্ছে সমুদ্রোপকুলের মোহানা অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিটির নামও 'মোহানা'। তেমনি কালমাট্টি উপজাতিটির আবাসভূমি হলো কালমাটি। এসব বিচারেই উপজাতি নাম হেজিবাড়ী, সন্‌গুড়ি ও লোগুড়িকে স্থান নাম হিসাবে ধরা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে বালুচিস্তানেরও উত্তরে আফগানিস্তানে 'সূর্খ-কোটাল' নামক স্থানে কুষান যুগের এক শিলালেখ আবিস্কৃত হয়েছে।[১৪] সে দেশেরই আর একটি স্থানের নাম 'দেহ্‌-কুন্ডি'।[১৫] এটা নিশ্চিতই তর্কাতীত যে একই ভাষা-সংস্কৃতির মানুষেরা বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানের দ্রাবিড় চিহ্নযুক্ত স্থান নামগুলির জন্মদাতা।

নেপালের দ্রাবিড় চিহ্নভুক্ত স্থান নামের তালিকাটি সংগৃহীত হয়েছে তথাকার শ্রী জ্ঞানেশ্বর ভট্টরাই রচিত "Brihat Samanya Gnan (Kathmandu 2003) থেকে। সুবৃহৎ এই গ্রন্থের ৪৭১ পৃষ্ঠা থেকে ৫১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশে নেপালের অধিকাংশ জেলার অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ক্ষেত্র সমূহের অধীনস্থ গ্রাম-সমূহের নাম আছে। নেপালের দশ সহস্রাধিক গ্রামের মধ্যে ঐ গ্রন্থে সাড়ে তিন হাজারের মত গ্রামের এক তালিকা পাচ্ছি। সমগ্রের তুলনায় সংখ্যাটা এক তৃতীয়াংশ হলেও আমাদের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন তাতে মোটামুটিভাবে মিটবে।

আমাদের আলোচ্য অন্য চারটি গুচ্ছের স্থান নামের তালিকা সেন্সাস্ রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত। মির্জাপুর জেলা, বিভাগপূর্ব মেদিনীপুর জেলা ও ২৪ পরগণা জেলা, নদীয়া ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং মহারাষ্ট্র গুচ্ছের পাঁচটি জেলার স্থান নামের তালিকা সংগৃহীত হয়েছে ১৯৭১ বা ১৯৮১ সালের সেন্সাস থেকে। আর সাঁওতাল পরগণা, যশোহর এবং স্বাধীনতা-পূর্ব দিনাজপুর জেলা সমূহের স্থান নামের তালিকা সংগৃহীত হয়েছে ১৮৯১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট থেকে।

(৪)

এবার স্থান নামে যুক্ত এই দ্রাবিড় চিহ্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের[১৬] ৪২ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বঙ্গদেশের স্থান নামে যুক্ত দ্রাবিড় চিহ্নগুলির এক বিস্তৃত তালিকা দিয়ে গেছেন। তার কতকগুলি এরকম ঃ জোটা, জোলা, জোলী, জুলী, হিট্টি, ভিট্টি, ভিটি, বড়া, কুন্ড, কুন্ডী, চবটি, চটি, জুর, জোরা, গুড়ি, ড়া, কুঁড়, কুঁড়া ইত্যাদি। এছাড়া অন্যত্র জানিয়েছেন যে কোট্টোই, পুষ্কর এবং তন্ডুলও দ্রাবিড় শব্দ[১৭] এবং এগুলি স্থান নামের সঙ্গেও যুক্ত হয়।

এর সঙ্গে আমরা 'বাড়ী' এই কথাটিকেও দ্রাবিড়ীয় শব্দ হিসাবে নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণ করেছি। ওরাঁওদের গৃহসংলগ্ন একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং বিস্তৃত ভূখণ্ডকে তারা 'বাড়ী' নামে আখ্যা দেয়। এটি মুখ্যত সমষ্টি নাচের প্রাঙ্গন হিসাবে ব্যবহৃত হলেও এর কিছু ধর্মীয় ব্যবহারও আছে। ওরাঁও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ প্রয়াত শরৎ চন্দ্র রায় লিখে গেছেন যে কারো মৃত্যু হলে, "......untill Harbora ceremony the corpse either remains buried in village burial ground (masan) or, if death has taken place before the rains, is creamated and bones temporarily buried in bari land attatched to the house of the deceased ......"[১৮]

বোঝা যাচ্ছে 'বাড়ী' এই ধর্মীয়-সামজিক প্রতিষ্ঠানটি একান্তভাবেই ওরাঁও জনগোষ্ঠির নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। একটু পরেই আমরা দেখবো যে আলোচ্য এলাকাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রের ঐ অঞ্চলেই 'বাড়ী' উপান্ত শব্দযুক্ত গ্রামের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এরকম হওয়ার সম্ভাব্য কারণটা বিবেচনা করা যাক।

আগেই বলা হয়েছে যে মহারাষ্ট্রের ঐ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় করে ধাঙ্গররা যাযাবরী পশুপালনের বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। পশুপালকদের পশুর পাল নিয়ে ভ্রমণ করতে করতে মাঝে মাঝেই অস্থায়ী শিবিরের প্রয়োজন পড়ে। পৃথিবীর সর্বত্রই পশুপালকদের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছিল। তাই সঙ্গত অনুমান যে মহারাষ্ট্রের পার্বত্য অঞ্চলে অধিবাসিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধাঙ্গররা তাদের ধর্মীয় সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠান 'বাড়ী'র পক্ষে উপযুক্ত এমন কতকগুলি বিস্তৃত স্থান নির্বাচন করেছিল যে স্থানগুলি প্রবল বর্ষাতেও জলপ্লাবিত হত না। পার্বত্য অঞ্চলের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে পশুপালনরত ধাঙ্গররা এই সব বাড়ীগুলিকেই অস্থায়ী শিবিরে পরিণত করেছিল বলেই সঙ্গত অনুমান। আবার প্রতি

বৎসর বর্ষার চার মাস তারা পশুপচারণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হত। সেই চার মাসও বিভিন্ন দলে বিভক্ত ধাঙ্গররা এক একটি 'বাড়ী' অঞ্চলে আশ্রয় নিত। একাদিক্রমে বহু বছর ধরে ঐ সব 'বাড়ী' গুলি অস্থায়ী শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হতে হতে ক্রমে স্থায়ী শিবিরে, অর্থাৎ গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সেই গ্রামের নামকরণে উপান্ত শব্দ হিসাবে 'বাড়ী' কথটিকে যুক্ত করেছিল। তা ছাড়া ধাঙ্গড়দের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নতুন নতুন গ্রাম পত্তনের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে গ্রাম পত্তনের উপযুক্ত ডাঙ্গা জমির অভাবের জন্যই ঐ 'বাড়ী' অঞ্চলগুলিকেই গ্রামে রূপান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছিল। নতুন গ্রাম পত্তনে এরকম জমির অভাব সাঁওতালপরগণায় দেখা না দেওয়ার কারণেই ওরাঁওদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল সাঁওতাল পরগণা জেলায় 'বাড়ী' উপান্ত যুক্ত গ্রামের সংখ্যা মাত্র ৩২টি আর মহারাষ্ট্রে তার সংখ্যা সাড়ে তিনশতের মতো।

(৫)

এবার আলোচ্য ছয়টি বিচ্ছিন্ন ও দূরান্তে অবস্থিত ভৌগোলিক এলাকায় প্রাপ্ত দ্রাবিড়চিহ্নযুক্ত স্থান সমূহের নীচের সারণীটি দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে একই জাতীয় দ্রাবিড়চিহ্নযুক্ত স্থান নামের ব্যাপ্তি কত বিস্তৃত। সারণীর সুবিধার্থে আমরা এলাকাগুলির নাম সংক্ষেপ করছি। যেমন বালুচিস্তানের জেলাগুলির ক্ষেত্রে বলছি 'বালোচ গুচ্ছ', মহারাষ্ট্রের পাঁচটি জেলার ক্ষেত্রে বলছি 'মহারাষ্ট্রগুচ্ছ', নেপালের জেলাগুলির ক্ষেত্রে বলছি 'নেপাল গুচ্ছ', মির্জাপুর ও সাঁওতাল পরগণা জেলাগুলির ক্ষেত্রে 'পূ, ম, ভা (পূর্ব-মধ্য ভারত) গুচ্ছ', দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলার ক্ষেত্রে বলছি 'দ.ব.গুচ্ছ' ও উত্তরবঙ্গের দুটি জেলার ক্ষেত্রে বলছি 'উ.ব.গুচ্ছ'।

নীচের সারণীর প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে রয়েছে বিভিন্ন দ্রাবিড় শব্দ, যার নীচে বিভিন্ন গুচ্ছে ঐ শব্দযুক্ত স্থানের সংখ্যা দেওয়া হল।

| গুচ্ছের নাম | কলিঙ্গ | বাড়ী | কুড় | কুন্ড | ড়া | ভিট্টি | গুড়ি | জোর | কোট্টোই | জুলী | পুষ্কর | মোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বালোচ | ১ | ৩ | ১ | ২ | ১ | | ৫ | ২ | ৮ | | | ২২ |
| নেপাল | ৫ | ২৬ | ৪ | ১ | ৪৫ | ৪ | ৫ | ২৬ | ৯৮ | ৫ | ৪৯ | ২৬৮ |
| মহারাষ্ট্র | ১ | ৩৪৩ | ৪ | ৮ | | ২ | ৭ | ১৭ | ৩ | ৮ | ২ | ৩৯৫ |
| পূ.ম.ভা. | | ৪৬ | ৫৫ | ৫৪ | ১৩৬ | ৪১ | ১৬ | ২৪৫ | ২ | ১৮ | ৬১ | ৬৭৪ |
| দ.ব. | ৬ | ২১৯ | ৬০ | ৯৪ | ২৮৯ | ৪ | ৩৫ | ১২২ | ৬ | ১২ | ৯৬ | ৯৪৩ |
| উ.ব. | ১ | ২০১ | ৫৩ | ২০ | ২৫ | ১৭ | ৫৮ | ১৪ | ৭ | ৪ | ৩৯ | ৪৩৯ |

**স্তম্ভ শীর্ষের দ্রাবিড় শব্দগুলির বিবর্তিত রূপগুলি ঃ—**

কলিঙ্গ > কলঙ্গ, খলঙ্গ; বাড়ী > বাড়িয়া, বেড়্যা; কুড় > কুড়া, কুড়ি, কুড়িয়া; কুন্ড > খুন্ড, কুন্ডি, খুন্ডি, কুন্ডিয়া, কুন্ডু, খন্ড; ভিট্টি > ভিটি, ভিটা, ভিট; গুড়ি > গুড়া, গুড়িয়া, গুড়; জোর > জোরা, জুরা, জুরী, জুরিয়া, ঝর, ঝোরা; কোট্টেই > কোট, কোটা, কুট, কুটা, কোটাল, কোটলা; পুষ্কর > পুখর, পোখর, পুখুয়ি, পোখরী, পোখোরিয়া, পুকুরিয়া, পুকুরি।

প্রাপ্ত স্থান নামগুলিকে নিয়ে এবার তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। দ্রাবিড় চিহ্নযুক্ত স্থান নামের তালিকায় বালোচ গুচ্ছেই সর্বনিম্ন সংখ্যক নাম সংগৃহীত হয়েছে। তাই এই গুচ্ছে ব্যবহৃত দ্রাবিড় চিহ্নগুলির সঙ্গে অন্য পাঁচটি গুচ্ছের ঐ রকম স্থান নাম নিয়ে আলোচনা করা হবে। বালোচ গুচ্ছের 'এড়ি কলঙ্গ' গ্রামটি নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। দঃবঃ গুচ্ছের মেদিনীপুর জেলায় বর্তমান কালে কলিঙ্গ নামক স্থান অপ্রাপ্তব্য হলেও ষোড়শ শতকের শেষ পাদে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যোপাখ্যানে[১৯] মেদিনীপুর অঞ্চলে এক কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ আছে। ১৬৬০ সালে অঙ্কিত Van Den Broucke-এর মানচিত্রেও কাঁসাই ও ধামরা নদীর মধ্যে এক কলিঙ্গ[২০] বনের অবস্থান রয়েছে। দঃ বঃ গুচ্ছের ২৪ পরগণার জেলার মন্দির বাজার এলাকায় একটি এবং বাদুরিয়া এলাকায় আরো একটি 'কলিঙ্গ' গ্রাম আজও বর্তমান। ঐ গুচ্ছের নদীয়া জেলায় চাপড়া থানাতেও একটি কলিঙ্গ গ্রামের অবস্থান রয়েছে। আবার উঃবঃ গুচ্ছের দিনাজপুর জেলাতেও আছে 'কলিঙ্গজুরা' গ্রাম। দ্বাদশ শতকে রচিত বলে অনুমিত "গোবিন্দ চন্দ্রের গীতে" করতোয়া নদীর তীরে একটি কলিঙ্গ রাজ্য ও তার রাজার উল্লেখ আছে।[২১] নেপাল গুচ্ছে ঐ রাজ্যের মধ্যাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পাঁচটি 'খলঙ্গা' গ্রামের অবস্থান রয়েছে। আবার মহারাষ্ট্রগুচ্ছের সাতারা জেলায় রয়েছে 'কলঙ্গবাড়ী' গ্রাম।

বালুচগুচ্ছের পরবর্তী আকর্ষনীয় স্থান নামটি হলো 'খাজুরী'। দ্রাবিড়ীয় 'জোর' কথাটি থেকেই 'জুরী' কথাটি উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ জলধারা।[২২] ১৯০৭ সালের Baluchistan Gazette-এ আছে, "......Traces of ancient water channel is to be found in Khajuri and Zarakhi"। এখানকার আর একটি গ্রামের নাম 'খাজুর কছ'। উ.ব. গুচ্ছের দিনাজপুরে আছে খাজুরজুরী, খাজুর, খাজুরবন্দ ও খাজুরপুকুর গ্রাম। দ.ব.গুচ্ছের যশোহর জেলায় আছে ২টি খাজুরা গ্রাম, একটি খাজুরা সিংহের গ্রাম ও একটি খাজুরীপাড় গ্রাম। ঐ গুচ্ছেরই পাশ্ববর্তী নদীয়া জেলাতে আছে 'খাজুরী' গ্রাম। ২৪ পরগণা জেলায় 'খাজুরী' অনুপস্থিত হলেও

সেখানে জুরী ও জোর যুক্ত অন্যূন ছয়টি গ্রাম আছে। ঐ গুচ্ছের মেদিনীপুর জেলায় ২টি খাজুরী ও একটি করে খেজুরবাড়ী, খাঁজুরারী, খেজুরদা, খেজুরভেরী ও খেজুরকুঠি গ্রাম রয়েছে। পূ.ম.ভা. গুচ্ছের সাঁওতাল পরগণার জেলায় (১৮৮১ সেন্সাস) মোট ১৬টি এরকম গ্রাম আছে যার মধ্যে ২টি খেজুরী ও ২টি খাজুরী এবং ১২টি খাজুরিয়া গ্রাম। এই গুচ্ছের মির্জাপুর জেলায় ৮টি গ্রাম নামের উপান্তে আছে এই 'খাজুর' কথাটি। মহারাষ্ট্র গুচ্ছে খাজুরী অবর্তমান হলও সেখানে অন্তত ১৬টি গ্রাম নামের উপান্তে ঐ 'জুরী' কথাটি যুক্ত রয়েছে। সর্বশেষে, নেপাল গুচ্ছে আছে খাজুর চান্‌হো, খাজুরগাছি ও খাজুরা খুর্দ গ্রাম।

আগেই বলা হয়েছে যে বালোচগুচ্ছের 'গুড়ি' ও 'বাড়ী' উপান্তযুক্ত উপজাতির নামগুলিকে তথাকার স্থান নামের দ্যোতক হিসাবে ধরা হয়েছে। তার এই উপজাতির নামে স্থানের নামকরণ বালুচিস্তানের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল, তা কিন্তু নয়। আমরা বালুচিস্তানের একটি উপজাতির নাম 'অঙ্গারিয়া' রূপে পেয়েছি। আবার ওরাঁওদের মধ্যেও কিছু মানুষ 'ধাঙ্গর' বলে আত্মপরিচয় দেয়। (ওরাঁওদের একদল পুরোহিতকে ধাঙ্গর-পাহান বলা হয়। কুরুখ ভাষায় পাহান কথাটির অর্থ পুরোহিত/পূজারী। বোঝা যাচ্ছে 'ধাঙ্গর' অভিধাটি যথেষ্ট সম্মানব্যাঞ্জক) ওরাঁওদের সমাজজীবনে অবিবাহিতদের রাত্রিবাসের আস্তানাকে 'ধুমকুড়া' বলে! আঙ্গারিয়া, ধাঙ্গর এই দুটি উপজাতি বাচক শব্দ ও 'ধুমকুড়া এবং 'বাড়ী' এই উপজাতিয় প্রতিষ্ঠানের নাম। এদের সামগ্রিক অবস্থানের চিত্রটি একটু দেখা যাক।

দিনাজপুর জেলার ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত রংপুর জেলায় একটি গ্রামের নাম 'অঙ্গারিয়া' ও একটির নাম 'ধুমকুড়া'। এখানেই আছে তিনটি 'ধাঙ্গুড়া' গ্রাম ও একটি ধাঙ্গড়ী গ্রাম। উল্লেখ্য, এখানেও একটি খাজুরিয়া গ্রাম রয়েছে। আবার এ জেলাতেই ১২৬টি 'বাড়ী' যুক্ত গ্রাম রয়েছে। যে দ্রাবিড়ভাষী মানুষেরা দিনাজপুর জেলায় স্থান পেয়েছিল, সঙ্গত অনুমান তাদের এক বড় অংশই করতোয়া (মৌর্য রাষ্ট্রের সীমানা) নদী পার হয়ে রংপুরে আশ্রয় নিয়েছিল।

জলপাইগুড়ি জেলায় অভিবাসিত দ্রাবিড়ভাষীদেরও অধিকাংশ মানুষ আরো পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই মনে হয়। সে কারণেই জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাপ্তব্য ২১টি 'বাড়ী' উপান্তযুক্ত স্থান নামের তুলনায় ব্রহ্মপুত্র তীরের নগাঁও জেলায় এরকম গ্রামের সংখ্যা অন্যূন ৬৯টি। আর ঐ জেলাতেই 'কলঙ্গ' নদী আজও প্রবাহিত যার তীরের এক গ্রামের নাম 'কলঙ্গ মুখ'। অধিকন্তু নগাঁও জেলাতেও একটি 'ধুমকুড়া' গ্রাম রয়েছে।

দিনাজপুর জেলায় রয়েছে অঙ্গারিপাড়া ও অঙ্গারান গ্রাম। এই জেলার ঠিক উত্তরে অবস্থিত কোচবিহার জেলায় রয়েছে 'অঙ্গারকাটা খেতেরিবাড়ী' গ্রাম। ২৪ পরগণা (অবিভক্ত) জেলায় রয়েছে অঙ্গারবাড়িয়া, অঙ্গারপুকুরিয়া এবং অঙ্গারাগ্রাম। আর রয়েছে অন্যুন ৫৫টি 'বাড়ী' উপান্তযুক্ত গ্রাম। মেদিনীপুর জেলায় আছে অঙ্গারকুড়িয়া, অঙ্গারকুন্ডিয়া, অঙ্গারবেড়্যা ও দুটি অঙ্গারনালী গ্রাম। এ জেলারই চারটি গ্রামের নাম ধাঙ্গড়ী, একটির নাম ধাঙ্গকুড়ি ও একটির নাম ধাঙ্গড়ীবর। ঠিক উত্তরে লাগোয়া বাঁকুড়া জেলায় আছে ২টি অঙ্গারিয়া গ্রাম, আর আছে একটি ধাঙ্গড়ডুঙ্গরী, একটি ধাঙ্গড়া ও তিনটি ধাঙ্গড়ী গ্রাম। এ জেলাতেও দুটি 'খেজুরা' গ্রাম ও একটি 'খেজুরখন্না' গ্রাম সহ ২১টি 'বাড়ী' যুক্ত গ্রাম রয়েছে।

পূ.ম.ভা গুচ্ছের মির্জাপুর জেলায় একটি গ্রামের নাম 'ধাঙ্গরকুড়ি' আর মহারাষ্ট্র গুচ্ছে পুণা জেলাতে ২টি ও আমেদনগর জেলায় একটি 'ধাঙ্গর বাড়ী' গ্রাম রয়েছে।

বালুচিস্তানে 'মাল' অভিধাযুক্ত একটি স্থান আছে। পার্বত্য এলাকার সমতলীয় অঞ্চলকে মাল বলে। মালভূমি বলতেও তাই বোঝায়। তাই পর্বতময় বালুচিস্তানে 'মাল'-এর অবস্থান স্বাভাবিক। একই রকম ভূপ্রকৃতির দার্জ্জিলিং জেলায় একটি 'মাল ফরেস্ট' ও একটি 'মাল খাসমহল' গ্রাম রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার এরকম ভূখণ্ডেই 'মাল' ও 'মালচন্ডী' গ্রাম দুটি অবস্থিত। দিনাজপুর জেলায় রয়েছে মোলকোট'। সাঁওতাল পরগণায় রয়েছে 'মালভিটা', আর বাঁকুড়া জেলায় রয়েছে 'মালকোঁড়া' গ্রাম। নেপালগুচ্ছের একটি গ্রামের নাম 'মালকোট' ও অন্যটির নাম 'মালপোথরী'। আবার মহারাষ্ট্রগুচ্ছের পাঁচটি জেলার পার্বত্য অঞ্চলে 'মাল', 'মালা', 'মালে' যুক্ত ৭টি গ্রাম রয়েছে। তারও দুটি 'মালবাড়ী', দুটি 'মালাবাড়ী' আর দুটি 'মালেবাড়ী'। মহারাষ্ট্রের ধাঙ্গররা 'মাল' বলতে বোঝে 'mal (ran), that is elevated stony land, hilly tract ......'[২৩] অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তসংলগ্ন উড়িষ্যায় আছে 'মালকাণগিরি'। আরও দক্ষিণে গেলে পাই 'মালাবার'কে। 'মালাবার' নামটি প্রসঙ্গে Yule and Brunell সম্পাদিত Hobson Jobson-এর (৫৩৯ পৃষ্ঠায়) আছে "The substantive part of the name, Malai ...... is the Dravidian term for 'mountain'. আরব সাগরস্থিত 'মালদ্বীপ' এবং ভারতসাগরে মালয় উপদ্বীপ মনে হয় একই চিহ্ন বহন করছে।

বালুচিস্তানের 'নকুন্ডি' ও 'চানকুন্ডী' স্থান নাম দুটি ও 'কুন্ডি' এই উপজাতির নামটি দ্রাবিড় কোন্ড শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো, পাহাড়, প্রস্তর।[২৪] আবার এই 'নকুন্ডি' গ্রামটি মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারী থানায় এবং 'চানকুন্ডি' গ্রামটি নারায়ণগড় থানাতেও আছে।

পরিসরের সীমাবদ্ধতার জন্য বালোচ গুচ্ছের বহু স্থান নাম ও উপজাতির নামের সঙ্গে জড়িত দ্রাবিড়ীয় সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা গেল না। যেমন, সেখানকার একটি উপজাতির নামে 'আচ্‌ড়া', কুরুখ ভাষায় তার অর্থ 'আঁচল'। মেদিনীপুর জেলার বীণপুরে একটি গ্রামর নাম 'লাকড়া আচ্‌ড়া'। ওরাঁওদের একটি গোষ্ঠীর পদবী হলো 'লাকড়া' যার মানে বাঘ।[২৫] লাকড়া আচড়া-র অর্থ হল বাঘের আঁচল বা ব্যাঘ্রাঞ্চল। তেমনি সেখানকার 'নাল' স্থান নামটির কুরুখীয় অর্থ হল 'নীচু ধান জমি'। সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই ঐ 'নাল' অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থাযুক্ত কৃষি কাজের প্রচলন ছিল। প্রত্নসাক্ষ্য বলে যে সিন্ধু সভ্যতার দক্ষিণাঞ্চলে, যেখানে 'নাল' অবস্থিত, ধানের চাষ হতো।[২৬] বালোচগুচ্ছের 'শাল' স্থাননামটি মনে হয় ওরাঁওদের দেওয়া। ওরাঁওদের শ্রেষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠান 'করম পরবে' তারা শালগাছ পূজো করে। তাদের আবাসিত এলাকায় শাল গাছ অপ্রাপ্তব্য হালে তারা শালগাছ বপন করে নেয়।

একটা কথা বলা প্রয়োজন। বালোচগুচ্ছ বাদে অন্য সব এলাকাতেই মুন্ডারী চিহ্নের অবস্থান নিশ্চিত করে যে অভিবাসিত দ্রাবিড়ভাষীদের সঙ্গে বেশ কিছু মুন্ডারীভাষীও সহযাত্রী হয়েছিল। তার প্রমাণ পাই মহারাষ্ট্র গুচ্ছে চরটি মুন্ডাবাড়ী গ্রাম ও চারটি কোলবাড়ী/কোলগাঁও-এর অবস্থান থেকে। তেমনি নেপালেও গুচ্ছ গুচ্ছ 'ট্যার' ও 'ড্যাড়া' উপান্ত যুক্ত সথান নাম পাওয়া যায়। সাঁওতালী ভাষায় 'ট্যাঁর' কথাটির অর্থ 'উঁচু জমি' ও 'ড্যাড়া' কথাটির অর্থ 'লবণাক্ত জমি।[২৭] এই ট্যাঁর/টাঁরি উপান্তযুক্ত স্থান প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

দেখা যাচ্ছে যে আলোচ্য ছয়টি গুচ্ছের পাঁচটিতে সারণীতে প্রদত্ত ১১টি দ্রাবিড় শব্দযুক্ত স্থান নাম পাওয়া গেলেও কেবল বালেচ গুচ্ছেই এগারটির মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে দ্রাবিড় স্থান নাম পাওয়া যায়নি। তবে বালুচিস্তানের স্থান নামের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া গেলে ঐ তিনটি ঘরও আর শূন্য থাকবে না বলেই মনে হয়।

স্থানাভাবে বালুচিস্তানের যে সব স্তান নাম বা উপজাতির নাম নিয়ে আলোচনা করা গেল না সেগুলি হলো ঃ ধানসার, মাছ, জঙ্গল ও মাস্তুঙ্গ (এগুলি স্থান নাম) ও চাণ্ডিয়া, দাই, কছ ও গঙ্গা (এগুলি উপজাতির নাম)।

ভারতীয় উপমহাদেশের দূরদূরান্তে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশে একই রকমের দ্রাবিড়ীয় চিহ্নের অস্তিত্ব থেকে চিত্রটি সুপরিপুষ্ট হলো যে কলিঙ্গ দেশে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় বসবাসকারী একদল মানুষ সে সব অঞ্চলে অভিনিবিশ্ট হয়েছিল। আলোচ্য সব গুচ্ছেই কলিঙ্গ নামধেয় স্থান নামের অস্তিত্ব সেই সত্যটি তর্কাতীত করেছে। এরকম অভিবাসনের পেছনে কেবল মাত্র দুটি কারণই থাকতে পারে। তার একটা হলো স্বেচ্ছা অভিবাসন ও অপরটি হলো বাধ্যতামূলক অভিবাসন।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিবাসনের যুক্তি হাস্যকর। কোন কারণে সুস্থিত কৃষিজীবীরা শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে পাহাড়-মরুভূমি পার হয়ে ঐ সব কৃষি-অনুপযুক্ত হয় জঙ্গলাকীর্ণ নয়ত পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে যাবে?

কলিঙ্গের অধিবাসীদের মৌর্যরাষ্ট্রের জঙ্গলাকীর্ণ বা পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলে নির্বাসিত করার অনস্বীকার্য যে তথ্যরাজি রয়েছে তাকে উপেক্ষা করে কল্প কাহিনী রচনা করে সেই সব সীমান্ত অঞ্চলের বর্তমান কালের দ্রাবিড় ভাষীদের উপস্থিতি বা সে সব অঞ্চলে তাদের একদা বসবাসের চিহ্নগুলিকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিবাসনের ফল বলে সনাক্ত করার প্রচেষ্টাকে আর যাই হোক নিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চা বলা চলে না। সম্রাট অশোকের ত্রয়োদশ শিলালেখের জঙ্গলবাসীরা, যাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ না করলে মৃত্যুভয় দেখানো হয়েছে, তারাই হলো সেই কলিঙ্গ নির্বাসিতরা যাদের জঙ্গলে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। আবার দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কলিঙ্গ শিলালেখে সম্রাট অশোক মৌর্য রাষ্ট্রের সীমান্তের অন্তর্গত এবং মৌর্যরাষ্ট্রের সীমান্ত বহির্ভূত মানুষদের সম্বোধন করেছেন, তারাই সেই সব নির্বাসিত কলিঙ্গী, যাদের প্রধান অংশেই নির্বাসনের অল্পকালপরেই মৌর্য রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে রংপুর, গোয়ালপাড়া, কামরূপ বা নেপালের তরাই পার হয়ে চলে গিয়েছিল।

ভারতের সমগ্র ইতিহাসে অশোক ব্যাতীত আর কোনও সম্রাট বিজিত দেশের সাধারণ মানুষকেও এভাবে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন এমন একটাও পাথুরে প্রমাণ নেই। রাষ্ট্রীয় প্রথার ঐতিহ্যের এই ব্যতীক্রমী কার্যক্রম অশোক মনে হয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে বা তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রীয় প্রথা বিকৃত করে তার ব্যাপক প্রয়োগ করে থাকবেন। অধ্যাপক কাংলে সম্পাদিত ও অনুদিত অর্থশাস্ত্র সম্পর্কিত পুস্তকে 'Pacification of the conqured territory' - Section 176-এব ১৫ সংখাক অনুচ্ছেদে আছে, "And he should cause a change of residence, **not in one palce** ...... of Mleccha communities and of chiefs of forts, country and army. And he should cause ministers, chaplains ...... to reside on the enemy's frontiers, **not in one place.**[১৮] (গুরুত্ব সংযোজিত)। মনে রাখা প্রয়োজন যে কলিঙ্গযুদ্ধ ও পরাজিত কলিঙ্গীদের নির্বাসনে পাঠানোর সময়ও অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেননি। আর্যাবর্ত্তের বাইরে অবস্থিত কলিঙ্গদেশক আর্যরা প্রাচীন কাল থেকেই ম্লেচ্ছদেশ বলে গণ্য করে এসেছেন। অশোকেরও সেই মানসিকতায় প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক।

সীমান্তে পাঠানো নির্বাসিতদের পরিত্যক্ত স্থানগুলিতে কি করতে হবে সে ব্যাপারে উপরিউক্ত অংশের ১৮ সংখ্যক অনুচ্ছেদে আছে, 'In the places of those removed, he should establish men from his own country ......'।

অশোকের সমকালীন অর্থশাস্ত্রের এই দলিল তিনটে বিষয়কে সম্যক পরিস্ফুট করেছে। প্রথমত, কেন অশোক কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, কেন তিনি নির্বাসিন স্থান রূপে মৌর্যরাষ্ট্র সীমান্তের জঙ্গলাকীর্ণ বা পার্বত্য অঞ্চলগুলিকে নির্বাচিত করেছিলেন এবং তৃতীয়ত, নির্বাসিতদের পরিত্যক্ত স্থানগুলি সম্পর্কে তিনি কি কার্যক্রম অনুসরণ করেছিলেন।[২৯]

একটি সঙ্গত প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করব। প্রশ্নটা হলো ঃ প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের বাইরে যেখানেই দ্রাবিড়ভাষীদের পাওয়া গেল, সে সব এলাকাতেই এক বা একাধিক 'কলিঙ্গ' নামক স্থান বর্তমান, কিন্তু দ্রাবিড়ভাষী অধ্যুষিত সাঁওতাল পরগণা ও মির্জাপুর জেলায় 'কলিঙ্গ' নামক কোনও স্থানরই অস্তিত্ব নেই কেন? উত্তরটা সহজেই অনুমেয়। মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানীর ইট ছোঁড়া দূরত্বে বসে যদি কলিঙ্গ নির্বাসিতরা 'কলিঙ্গ' নামধেয় স্থান পত্তন করতো, তবে সেটা নিশ্চিতই মগধ কর্তৃপক্ষের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভবপর হতো না। নির্বাসিতরাও সেটা বুঝতো বলেই মনে হয়।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) নেপালের ১৯৯১ সালের আদমসুমারী।

২) Prem Khatri - Manjani System of the Danwar People - in C.N.A.S. Journal Jan 1995, Vol. 22 No. 1.

৩) Leo Troyer - Linguistic Development in Nepal - প্রাগুক্ত জার্নাল Vol No. 2, June 1974.

৪) D.D. Kosambi - The Culture & Civilisation of Ancient India - Rep. 1977, p. 42.

৫) K.S. Singh - The Scheduled Castes - 1993, p. 421.

৬) Prem Khatri - প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

৭) K. S. Singh - প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪২১।

৮) D. D. Kosambi - প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৩।

৯) Gunther Dietz Sontheimer - In A. Rao & M.J. Casimir (Ed) Nomadism in South Asia, 2003 p. 371.

১০) সুনীতি চট্টোপাধ্যায় — ভারত সংস্কৃতি - ১৪০০ সাল, পৃ. ১৯।

১১) ঐ - Origin & Development of Bengali Language (অতঃপর ODBC) Reprint 1970, p. 2।

১২) সুজিত আচার্য — প্রাচীন ভারতে খনিজ তেলের পরিপ্রেক্ষিতে কেবট্টভোগ— বিদ্যাসাগরিকা ২০০২।

১৩) M.B. Emenue - Brahui & Dravidian Comparative Grammar, 1962, p. 62।
১৪) H.C. Roy Chowdhury কৃত Political History of Ancient India গ্রন্থের Commentary অংশে (ব্রতীন্দ্র মুখার্জীকৃত) ১৯৯৭, পৃ. ৭১৫।
১৫) T.T.K. Atlas - Chennai, p. 33.
১৬) O.D.B.L. p. 64-67.
১৭) সুনীতি চ্যাটার্জী — ভারত সংস্কৃতি, পৃ. ১৯।
১৮) S.C. Roy-Oraon Religion & Customs - Rep. 1972, p. 22.
১৯) ক্ষুদিরাম দাস — কবিকঙ্কণ চণ্ডী — কলকাতা ১৯৯১, পৃ. ২০১।
২০) দুর্লভ মল্লিক কৃত ও শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত— গোবিন্দ চন্দ্র গীত-১৩০৮ সাল, পৃ. ১২৭।
২১) উপরোক্ত গ্রন্থ - পৃ. ১২৭ (১৫০ সংখ্যক পদটীকা)।
২২) O.D.B.L., p. 67.
২৩) Gunther Dietz Sontheimer - প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৭০।
২৪) O.D.B.L. p. 67.
২৫) তথ্যাদি কুরুখ সাহিত্যিক শ্রীমঙ্গরা কুজুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত।
২৬) D.K. Chakraborty - India : An Archaesological History - 1997, p. 367.
২৭) তথ্যটি সাঁওতালী ভাষা বিশেষজ্ঞ ডাঃ গুরুচরণ মুর্মুর নিকট প্রাপ্ত।
২৮) R.P. Kangle - Kautilya Arthasastra - 1965, p. 491-92.
২৯) সুজিত আচার্য — নির্বাসিত কলিঙ্গীদের ঠিকানা ২০০০ - গ্রন্থের 'কলিঙ্গ যুদ্ধের অনতি পূর্বাপর' নামক অধ্যায়ে এর অতি বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

# প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার পীঠস্থান-তাম্রলিপ্ত

জিনবোধি ভিক্ষু

প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব স্থাপত্য ও নানা ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের প্রভাব স্মরণাতীতকাল থেকে প্রতিভাত হয়। সেকালে ভারতের যে কয়েকটি পীঠভূমি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল তার মধ্যে তাম্রলিপ্তের স্থান অতি উচ্চে। এটি ছিল বাংলায় উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। স্বভাবতই এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই প্রভাব প্রতিপত্তির কথা চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ ও তাম্রলিপ্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়। গড়ে উঠেছিল অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ-মন্দির, অশোকস্তম্ভ, ভিক্ষু-সংঘের সংঘারাম, নানা শিল্প, ভাস্কর্য ও প্রত্নসম্পদ, যা ভারতীয় কৃষ্টি সভ্যতাকে করেছে সুসমৃদ্ধ। তদুপরি ভারতের শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্য বন্দর হিসেবেও এর খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। বর্তমান নিবন্ধটি প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার পীঠস্থান তাম্রলিপ্তের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তুলে ধরার প্রয়াসী।

**তাম্রলিপ্তের অবস্থান** : আধুনিক তমলুক অবিভক্ত বাংলার অন্যতম জেলা মেদিনীপুরের একটি মহকুমা শহর। এটি কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্তকে একটি রাজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে বর্ধমান ও কালনা, পূর্বে গঙ্গা, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে কলিঙ্গরাজ্য। এ রাজ্যের পরিধি ছিল ১৫০০ কিঃমিঃ বা ১২৫ ক্রোশ। ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইৎ সিং নামে এক বৌদ্ধ পর্যটক চৌ-নগর হয়ে তাম্রলিপ্তে আসেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় তখন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সীমা ছিল উত্তর-দক্ষিণে ৪০০ যোজন ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০ যোজন (*যাদুঘর* সম্পাদনা, সুহৃদ কুমার ভৌমিক, মেদিনীপুর, ১৯৮৭, পৃ. ৫৬)। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাম্রলিপ্ত রাজ্যের আয়তন বিশাল এবং জনবহুল ছিল। তিনি তাঁর গ্রন্থে আর একটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন তাম্রলিপ্তির রাজাগণ ক্ষত্রিয় ছিল। 'ময়ূরধ্বজ' ছিলেন আদি রাজা (*জ্যোতি*, সম্পাদক, বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম : পৃ. ২৬)। ঐতিহাসিক টলেমির মতে এটা বর্তমান মেদিনীপুর জেলার রাজধানী ছিল। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে রূপনারায়ণ নদের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল (*জ্যোতি*, প্রাগুক্ত : ২৩)।

মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় ইহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে এর সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। এ রাজ্যের রাজা তাম্রধ্বজ 'দ্রৌপদী'র স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩০ (ত্রিশ) একর জমির উপর তাম্রলিপ্তের রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে (*বোধিভারতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮)।

সাম্প্রতিক কালে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন এবং আশপাশ থেকে বহুমূল্যবান পুরাবস্তু সংগৃহীত হওয়ার ফলে আজকের এই তমলুকই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত-এ বিষয়ে একটা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে (*দেশ*, সম্পাদক, সাগরময় ঘোষ, ৯৯০, পৃ. ৬০), প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর যে আজকের মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতভেদ খুবই কম (*দেশ*, প্রাগুক্ত: পৃ. ৬০)। প্রাক ঐতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক যুগে তাম্রলিপ্ত যে ভারত সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা স্বীকৃত। (মাইতি, পি.কে. *প্রোটো-হিষ্টরিক সিভিলাইজেশন অফ তাম্রলিপ্ত অক্ষয়নীভী* (সম্পাদনায়) ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, দিল্লী ১৯৯১, পৃ. ৩৭-৪০)।

**নামকরণ ঃ** তাম্রলিপ্ত একটি সংস্কৃত শব্দ। তাম্রলিপ্ত শব্দের অর্থ তামা দিয়ে লেপা। লিপ্ত অর্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বোঝায়। অর্থাৎ সর্বত্র যেন তামার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হত। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তাম্রময় অঞ্চল অর্থাৎ তৎকালীন এ সব অঞ্চলে তামার খনি ছিল। উন্মুক্ত তামা পাওয়া যেত। নতুবা তামার ব্যাপক ব্যবহার যেমন তামার পাত্র, অস্ত্র, ছুরি, দা বা থালা ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত করা হত। এর প্রভাব বা গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তাম্রলিপ্ত নামের গোড়াপত্তন হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

সেকালে তাম্রলিপ্তের অনেক নাম ছিল যেমন তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, তমোলিকা, দামলিপ্তং, তমলিনী, বিষ্ণুগৃহং ও তমোলিপ্ত। আবার সাগর সৈকতের কাছে ছিল বলে অনেকেই 'বেলাকূল' (বেলাকূলং) ও বলতেন (*বোধিভারতী*, সম্পাদনা, সমর বড়ুয়া, কলিকাতা বার্তা পৃ. ২৮)। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন এ বন্দর দিয়ে তাম্র বা তামা রপ্তানী হতো।

লেখক বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর বর্ণনা থেকে জানা যায়— উপমহাদেশের বিভিন্ন তাম্র নির্মিত কুঠার, তরবারী, বর্শা, ছুরি ও নানাবিধ ছেদন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। (*জ্যোতি*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪)।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে ঝটিবান পরগণার তামাকৃয়

গ্রামেও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাজারীবাগ জেলার পচম্বা মহকুমায় তাম্র নির্মিত কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে সইস (Sais) বারাগুপ্ত তামার খনির নিকট বহু তাম্র নির্মিত অলংকার ও অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন (*জ্যোতি,* প্রাগুক্ত: পৃ. ৩৪)। বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের মানসে তৎকালীন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তামার পলকে লিপিবদ্ধকরণের প্রমাণ রয়েছে। সম্রাট অশোকের আমলে বুদ্ধবাণী পাথরে এবং তাম্রফলকে খোদাই করা হয়েছিল বলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সকল ঐতিহাসিক তথ্য থেকে তাম্রলিপ্ত নামকরণ হতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

**তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি** : স্মরণাতীতকাল থেকে তাম্রলিপ্তের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির কথা জানা গেলেও মৌর্যযুগ হতে খ্রিস্টীয় ১০ম (দশম) শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে এর ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। মহাভারত ব্রহ্মাণ্ড ও কয়েকটি পুরাণে তাম্রলিপ্ত নামে জনপদ ও স্বাধীন রাজ্যের নাম পাওয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর হিসেবেও খ্যাত ছিল। পালি সাহিত্য থেকে জানা যায় মহাজনক কুমার এই বন্দর দিয়েই চম্পা নগরী থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সুবর্ণদ্বীপ গমন করেন।

বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্তি উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়। অনেক চৈনিক পর্যটক তাদের বিবরণীতে তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট অশোকের সময় এটি উন্নত ছিল। অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর মেদিনীপুর জেলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন তাম্রলিপ্ত বন্দরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় (*জ্যোতি* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩)। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী থেকে জানা যায় সে সময়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর নগরী ও রাজ্যসীমা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানকার ভূমি সমতল ও জলীয় বায়ু উষ্ণ, ফল, ফুল-শস্য প্রচুর। মানুষ সাহসী তবে তাদের আচার ব্যবহারে আছে রূঢ়তা। তাছাড়াও এই বন্দর নগরীতে প্রচুর মুল্যবান রত্ন ও জিনিষপত্র আমদানী রপ্তানী ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আসত। স্থানীয় অধিবাসীগণ ছিল ধনী। বর্তমান তমলুকেও বহু ধনী রত্ন ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী বণিকের বাস (*যাদুঘর,* প্রাগুক্ত পৃ. ৫৫)। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ (৭ম শতাব্দী) তাম্রলিপ্ততে আগমন করেন। তাঁর মতে এর পরিমাণ ২৫০-৩০০ মাইল। ভূমি নিম্ন ও উর্বর। অধিবাসীগণ কষ্ট সহিষ্ণু, ক্ষিপ্ত ও চঞ্চল। রাজ্যটি উপদ্বীপ স্বরূপ, ভূমি নিয়মিতভাবে কষিত হত ও এতে প্রচুর ফুল ও ফল উৎপন্ন হত। অধিবাসীরা ব্যবসায়ে উন্নতি করেছিল এবং এখানে রত্ন ও বহু মূল্যবান পণ্য পাওয়া যেত। বিভিন্ন প্রাচীন তথ্য ও তত্ত্ব পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ যুগেই তাম্রলিপ্ত নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে

এবং স্থাপত্য শিল্পেও সমুন্নত ছিল। তখন সুদূর চীন, সুবর্ণদ্বীপ, মালয়, সুবর্ণভূমি, পারস্য, আরব এবং গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে বাণিজ্য স্থাপন করেছিল এবং এটা একটি আন্তর্জাতিক বন্দর নগরীতে পরিণত হয়ে যায়।

বৌদ্ধ শিক্ষার প্রভাব : বুদ্ধের সমসাময়িক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালেও রাজ্য মহারাজ্য ও শ্রেষ্ঠী বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এখানে ৪৪টি সংঘারাম বা বিহার ও অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু দেখেছিলেন। তাঁর মতে এটা ছিল বৌদ্ধ প্রধান দেশ। সপ্তম শতাব্দীতে আসেন হিউয়েন সাঙ। তিনি ১০টি বৌদ্ধ বিহার ও এক সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখতে পান। আর দেখতে পান শহরের প্রান্তে একটি অশোক স্তম্ভ। তাঁর পর আসেন ইৎ-সিং। তিনি এসে ৪/৫টি বিহার দেখতে পেয়েছিলেন। ( বোধিভারতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২)। তিনি ১০টি বৌদ্ধ বিহারে দশ হাজার সর্বাস্তীবাদী ভিক্ষু অবস্থানরত দেখেন। হিউয়েন সাঙ এবং সমসাময়িক চাং-তেং এখানে ১২ বৎসর অবস্থান করে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তাওলিন ৩ বৎসর অবস্থান করে সর্বাস্তীবাদী মতবাদের উপর জ্ঞান লাভ করেন। এতে স্পষ্ট বলা যায় বিহারগুলিতে অসংখ্য বৌদ্ধ ছাত্র বাস করে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সেই সঙ্গে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল 'শব্দশাস্ত্র'।

শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বঙ্গের খ্যাতির কথা বৈয়াকরণ পাণিনীও উল্লেখ করেছেন। সে যুগে চন্দ্রগোমী প্রণীত চান্দ্র ব্যাকরণ বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। অপর এক চীনা ছাত্র তা-চেং তেভ এখানে দীর্ঘদিন বাস করে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (*যাদুঘর*, প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬)। ইৎসিং ৬৭৩ শতকে তাম্রলিপ্তে আসেন এবং তা চেং-তেং এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। পোলো-পো (বরাহা) নামক বিহারে তিনি কিছুকাল সংস্কৃতি বৌদ্ধ সাহিত্য ও শব্দ বিদ্যা (বিজ্ঞান) অধ্যয়ন করেন। তারপর চীন দেশে ফিরে গিয়ে নাগার্জুনের বোধিসত্ত্বশ্রী লেখা গ্রন্থের অনুবাদ করেন (প্রবন্ধ সম্ভার, ১ম খণ্ড, সলিল বিহারী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম-১৯৯৯, পৃ. ৬৫)।

সুউচ্চ স্থানে দেবী বর্গভীমার মন্দির পরিলক্ষিত হয়। এই মন্দির প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন অশোক যে স্থানে স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন এ স্তূপ তার উপরই নির্মিত। কারণ এখানে এরূপ উচ্চভূমি আর নেই। অধিকন্তু এই মন্দিরের শিল্প শৈলীর সাথে প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে অনেক হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন পরে তা ধ্বংস হয়ে যায় (*জ্যোতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪)।

**তাম্রলিপ্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর** : প্রাগৈতিহাসিক যুগের ন্যায় ঐতিহাসিক যুগেও বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে তাম্রলিপ্তের বিশেষ খ্যাতির কথা দেশী-বিদেশী লেখকদের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। ঐ যুগে তাম্রলিপ্ত যে পূর্ব ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল তা দীপবংশ, মহাবংশ; প্লিনি ও টলেমির বিবরণ, অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখকের ' পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়াস সী' চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ, কথাসরিৎ সাগর, দশকুমার চরিত্র ইত্যাদি থেকে জানা যায়। ঐ যুগে তাম্রলিপ্ত বহির্জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্ম ও বাণিজ্যের বিনিময় কেন্দ্ররূপে ভূমিকা পালন করেছিল (অনন্য মেদিনীপুর, প্রদ্যোত কুমার মাইতি, কল্লোল, কলিকাতা-২০০১, পৃ. ৪৫)।

তাম্রলিপ্তের সঙ্গে নদী ও স্থলপথে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের যোগ থাকার ফলে বন্দর হিসেবে তার পশ্চাদভূমি ছিল বিশাল। স্থল ও জলপথের বিস্তার দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রলিপ্তের পশ্চাৎভূমি আসাম, বাংলাদেশ, বিহার,পূর্ব-উত্তরপ্রদেশে ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (কুণ্ড সম্পাদিত; প্রবন্ধ সংকলন : প্রসঙ্গ তাম্রলিপ্ত, পৃ. ৩৮)।

সমুদ্রপথে এর যোগ ছিল 'শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণ ভূমি (মায়ানমারের দাক্ষিণাংশ), তৌ-খুনি বা তেকোনা (মালয়েশিয়া উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এক বন্দর), কো-রিং (মালয়েশিয়া বা সুমাত্রায় অবস্থিত) এবং এমনকি বোধ হয় ফু-লাল দেশের (অর্থাৎ কম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম) অন্তর্গত ও-কিও এলাকার কোনও বন্দরের সঙ্গে। আরও জানা যায়, তাম্রলিপ্তর সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে চীনের যোগাযোগ ছিল (কুণ্ড, প্রাগুক্ত : পৃ. ১৬-১৭, পৃ. ১৭)। নীহার রঞ্জন রায় প্রাচীন সিংহলী পালি গ্রন্থ দীপবংস ও মহাবংস এবং বিভিন্ন জাতকে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে মন্তব্য করেছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে তাম্রলিপ্ত ও সিংহলের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল (বাঙালির ইতিহাস ১ম খণ্ড, কলিকাতা-১৯৪৮, পৃ. ৪৬০)।

প্রাবন্ধিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে বিশেষত বৌদ্ধযুগে এই গতানুগতিকতা প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তমলুকও তখন জগতে একটা বড় বন্দর বলিয়া গ্রাহ্য ও মান্য হইত। তমলুকের কল্যাণে বৌদ্ধকালের সকল সভ্য দেশের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতা, মানবতা প্রভৃতি সবই সর্বাগ্রে বঙ্গদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইত। বাঙালি সে সকলের রসাস্বাদন করিয়া লইলে "অনেক বিদ্যা এবং তত্ত্ব আত্মসাৎ করিলে পরে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ও প্রাদেশিক জাতি সকল তাহার ভাগ লইতেন।"

ঐতিহাসিক হান্টার সাহেবও তমলুককে বৌদ্ধ বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন এবং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সরকারী রিপোর্টে তমলুক সম্পর্কে বলা হয় — That Tamluk was originally a Buddhist town and a large emporium of eastern trades and many fine monasteries. (Hunter's Orissa, Vol, 1, p. 83)।

বৌদ্ধকাহিনী থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের কনিষ্ঠ ভাই রাজকুমার মহেন্দ্র জলপথে পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন এবং ওখান থেকে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন (বিনয় পিটক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮)।

আবার তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে যে নিয়মিত সিংহলের সঙ্গে নৌ-যোগাযোগ ছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান। বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তের প্রসিদ্ধি এবং এখান থেকে দূরবর্তী দেশে যাওয়ার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। এখন থেকেই ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহল এবং ইৎ-সিং সপ্তম শতাব্দীতে সুমাত্রায় শ্রীভোজে যাত্রা করেছিলেন। (অনন্য মেদিনীপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬)।

মহাবংস থেকে জানা যায় যে, সিংহল রাজ টিসসা অশোকের নিকট যে চারজন দূত পাঠান, তারা উত্তর সিংহলের জম্বুকোলা থেকে রওনা হয়ে সাতদিন পরে তাম্রলিপ্তে এসে পৌঁছান। (মহাবংস, অধ্যায় ৯, পৃ. ২০, ৩২)। মহাবংসের (খ্রিঃ ৫ম শতক) একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক জাহাজে বোধিবৃক্ষের চারাসহ মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই। এই গ্রন্থেই বাঙালি বীর বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বিজয় সিংহ এই বন্দর থেকেই তাঁর বাঙালি সৈন্য বাহিনী নিয়ে অর্ণবপোতে সিংহল যাত্রা করেন (যাদুঘর, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৫)।

এই জলপথে সে যুগে বহু ধর্ম প্রচারক ও বণিক শুধু দাক্ষিণ ভারত ও সিংহলে নয়, সুদূর চীন, জাপান, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে যাওয়া-আসা করত। আবার এই পথেই য়ুরোপেই গ্রীস ও রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগবন্ধন ঘটেছিল।

**বৌদ্ধ নিদর্শন** : প্রাচীন তাম্রলিপ্ত অধুনা তমলুকে অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন রয়েছে। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ একমত। তন্মধ্যে বৌদ্ধ বিহারসমূহ ছিল অন্যতম। তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা একটি প্রধান দর্শনীয় দেবী ও মন্দির। এই মন্দিরটি শহরের সমতল থেকে ৩০ ফুট উপরে। প্রকৃত অর্থে এটা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ। মন্দিরের চতুর্দিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শৈল্পিক ভাবধারা এখনও পরিলক্ষিত। মন্দিরটি সাত আটশ বছরের প্রাচীন বলে উল্লেখ করলেও আমার মনে হয় মহামতি

সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছে। অধুনা তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা এবং মন্দির হিসেবে পরিচিত। কিন্তু অনেক গবেষক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুভ্যুত্থানের সময় একটি বৌদ্ধ স্তূপের উপর এটি নির্মাণ করা হয়। এক দেবী বর্গভীমার মন্দির ছাড়া বর্তমানে তমলুকে আর সেকালের কোন কীর্তিই নেই। ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে— "বর্গভীমার মন্দির পূর্বে বৌদ্ধ মন্দির ছিল। ব্রাহ্মণ কর্তৃক উহা কালী মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল" (বোধিভারতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)। এই মন্দিরের চূড়া উড়িষ্যাঞ্চলের মন্দিরের মত। কিন্তু ভিতরের গঠন প্রণালী বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মত। দখল করবার পর এর পূর্বদিকের প্রধান দ্বার স্থায়ীভাবে বন্ধ করে পশ্চিমদ্বারী করা হয়েছে। এর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য দেখে সাধারণ লোক মনে করে এ বুঝি বিশ্বকর্মার তৈরি। ফা-হিয়েন গুপ্ত বংশে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসে ১৫ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্তিতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন, তাঁর বিবরণে জনসাধারণের চিত্রও ফুটে উঠেছে (বাংলার ইতিহাস, মোঃ আইয়ুব খান, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১১)। খ্রিস্টীয় সাত শতকে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৪ বছর (৬৩০-৬৪০ খ্রিঃ) অবস্থান করেন। তিনি বাংলার কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতল ও তাম্রলিপ্তি সফর করে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ তুলে ধরেন (বাংলার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)। আরো স্মরণীয় যে, সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয়ের স্মৃতিস্তম্ভ কলিঙ্গ রাজ্যে ও প্রান্তসীমা তাম্রলিপ্তে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সেই জায়গা কোথায় আজও তার নিদর্শন মেলেনি। বর্তমানে তমুলকের হ্যামিটন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যে ভগ্ন স্তম্ভটি রক্ষিত আছে, সেটিকে উক্ত স্তম্ভের ভগ্নাংশ বলে লোকে অনুমান করে। এটি রাজবাড়ির সীমানায় মাটি খননকালে রাজ সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় পেয়েছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ওখানে এটা পাওয়া গেল কি করে? আইন-ই-আকবরী'র মতে এটি একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গ ২৯৭ বিঘা পরিমাণ জমির মধ্যে অবস্থিত ছিল। এ স্তম্ভ হয়ত ঐ দুর্গের একটি স্তম্ভের অংশ। এ দুর্গটি গুপ্ত বা পাল যুগের তৈরি। এজন্য স্তম্ভ গাত্রে এ বৌদ্ধ ভাস্কর্যেও নিদর্শন পাওয়া যায় ( বোধিভারতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)।

১৮৮১ সালে রূপনারায়ণ নদ হঠাৎ পূর্বখাত পরিবর্তন করে নতুন খাতে বইতে থাকে। এর ফলে মাটির নিম্নস্তর হতে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎমূর্তি (Terracotta) বার হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে পুকুর খননকালে মাটির ১০/১৫ ফিট নিচে

কূপ ও প্রস্তর নির্মিত ভগ্ন স্তম্ভাদি এবং কিছু কিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। এ মুদ্রাগুলির উপর কিছু লেখা ছিল না। শুধু পদ্ম, চক্র, চৈত্য, আবার কোন কোনটাতে হাতি, হরিণ ও সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। তৎকালীন মেদিনীপুরের জেলা শাসক মি. উইলসন ও তমলুক মহকুমার প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বটব্যাল এগুলি এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেন। পরীক্ষান্তে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এ মুদ্রাগুলি চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপরবর্তী বৌদ্ধ রাজাগণেব। এ মুদ্রাগুলোর মধ্যে কতকগুলি ছিল বেহাটের (Behat) মুদ্রার ন্যায়। একটি ছিল গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রা এবং আর একটি ছিল মোগল যুগের।

এ সময়ে যে মৃৎমূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল 'মারের', একটি ছিল মায়াদেবীর শ্বেতহস্তী রূপে বোধিসত্ত্বের মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণের দৃশ্য। ইহা ছাড়া আর একটি ছিল গৌতম গৃহত্যাগের বাসনা যখন শুদ্ধোধনের কাছে প্রকাশ করেন তখন বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য যে সকল বিনাস চতুরা সুন্দরী নিযুক্ত করেছিলেন, তার মধ্যে দু'জনের মূর্তি ( বোধিভারতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)। এছাড়া এখানে আছে আরো অনেকগুলি প্রাচীন দেবালয় মহাপ্রভুর মন্দির, বিষ্ণুহরির মন্দিব, রামজী মন্দির ও জগন্নাথ মন্দির ও অনেকগুলো শিব মন্দির। প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ দর্শন মানসে পুরী যাওয়ার পথে তমলুকে উপস্থিত হন। তাঁর আগমন স্মরণীয় রাখার জন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহসহ পূর্বোক্তি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন তমলুকের তৎকালীন রাজা আনন্দ নারায়ণের পত্নী পরখা বৈষ্ণবী হরিপ্রিয়া দেবী। তমলুকে হরি, হর, জগন্নাথ, শ্রীচৈতন্য ও শক্তি দেবী ভীমার অবস্থিতির জন্য তমলুক আগমনে সর্বতীর্থে পুণ্যলাভ হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। প্রাচীন বন্দর ও শিক্ষাকেন্দ্র রূপে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি অবলুপ্ত হলেও মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত পুণ্যস্থানরূপে এর খ্যাতি কিন্তু অম্লান আছে (যাদুঘর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬)।

এই ধারণার সূত্র পাওয়া যায় প্লিনি ও টলেমির রচনা থেকে আর ইদানিংকালে তমলুক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাওয়া পোড়া মাটির গ্রীক দেবমূর্তি (জানুস)। বন্দুক অন্যান্য অলংকৃত জিনিস পত্র (ফুলদানি, পানপাত্র প্রভৃতি) সেই বিস্মৃত ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত করে। তমলুকের তাম্রলিপ্ত গ্রন্থশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত সেই প্রাচীন যুগের অসংখ্য নিদর্শন দেখে পর্যটক দর্শকগণ প্রাচীন তাম্রলিপ্তের হারানো গৌরবময় দিনের বহু বিষয় জানতে পারবেন (যাদুঘর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬)।

বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধি, প্রত্নতত্ত্ব-স্থাপত্য ও শিল্পকর্মেও খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত ছিল। শুধু আন্তর্জাতিক ও বর্হিবাণিজ্যেও নয় সে যুগে, তাম্রলিপ্ত ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্র, সংস্কৃতজ্ঞান, বিজ্ঞান ও শব্দশাস্ত্র শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ফা-হিয়েন এখানে দু'বছর থেকে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ, হিন্দু দেবদেবী ও বুদ্ধের প্রতিকৃতি নকল করে স্বদেশে নিয়ে যান। তিনি জানিয়েছেন সে সময় এখানে ছিল ২৪টি সংঘারাম বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দুদের দেবী মন্দির পঞ্চাশটি। এর দ্বারা বোঝা যায় এই স্থান ছিল বিভিন্ন ধর্মের মিলন ভূমি, এখানে ছিল না কোনরূপ ধর্ম বিদ্বেষ বা বিরোধ। তা ছাড়াও তাম্রলিপ্ত পূণ্যজন রূপে উল্লিখিত।

আরো উল্লেখ্য যে, পোড়া মাটির ফলকগুলি ছাড়াও কয়েকটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি তমলুক শহর থেকে পাওয়া গেছে। প্রাচীনত্বের দিক থেকে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের পোড়ামাটির ভাস্কর্যে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির কথা প্রথমেই উল্লেখ করা চলে। মূর্তিটির পাদদেশে ভগ্ন, পশ্চাৎ দেশে প্রভাবমণ্ডল বর্তমান। এটি শিল্পকলার এক সুন্দর নিদর্শন। এছাড়াও আর একটি পোড়ামাটির ভাস্কর্যে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির মাথা ও নিম্নাংশ ভগ্ন। এখানে বুদ্ধকে ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। এটি গুপ্ত যুগের (আনু: ৩০০-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ) শিল্পকলার নিদর্শন। ঐ যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যের একটি অনুপম বুদ্ধমস্তকও তমলুকে পাওয়া গেছে।

উপরোক্ত সবগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রেই রক্ষিত আছে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, অশোকের রাজত্বকালে তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধধর্মের যে প্রচার শুধু হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে অব্যাহত ছিল (অনন্য মেদিনীপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮) এমনকি ফা-হিয়েন লিখেছেন সমগ্র দেশটি বৌদ্ধ প্রধান (চীন-ভারত, ভারত-চীন পরিব্রাজক, কলিকাতা-১৯৭৭, পৃ. ৫৮)। তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধধর্মের এই খ্যাতি মোটামুটি সপ্তম শতকের শেষ অবধি যে অব্যাহত ছিল, তার পরিচয় পরবর্তী চৈনিক বৌদ্ধ পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়।

**পতন** : রাজনৈতিক আগ্রাসন, সমুদ্রের দুরগমন ও রূপনারায়ণের ভাঙ্গন ইত্যাদি কারণে তাম্রলিপ্তর পূর্ব গৌরব বিলুপ্ত হয়ে যায়। রূপনারায়ণের ভাঙ্গনের ফলে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্তর আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল, ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে হল অনেক প্রত্মতত্ত্ব সম্পদ। পুরাতন মুদ্রা ও মূর্তিগুলি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্থান পেল। প্রত্নতত্ত্ব সম্পদগুলির মধ্যে পদ্ম, চক্র, চৈত্য, হস্তী, মৃগ ও সিংহ প্রভৃতি দ্রব্য ও জীবনের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। মায়াদেবীর মূর্তিও পাওয়া যায়। এ থেকেও প্রমাণিত হয় এখানে বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

আরো উল্লেখ্য তাম্রলিপ্ত কয়েক শতাব্দীকাল ধরে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বাংলার গৌরব গাথা ঘোষণা করেছিল। পরে এটা উড়িষ্যার শাসনাধীনে আসলে এর স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যায়। তাম্রলিপ্তি থেকে সমুদ্র অনেক দূরে সরে যাওয়াতে বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তমলুকের প্রসিদ্ধ লবণ শিল্পটিও ব্রিটিশ শাসনামলে নষ্ট হয়ে যায়। তাম্রলিপ্তর সেই অতীত গৌরব বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। শুধু কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির কিছু নিদর্শনই আমাদের তা মনে করিয়ে দেয়।

বলাবাহুল্য তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি ছিল মৌর্যযুগ হতে খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ মেদিনীপুর জয় করার পর হতে তাম্রলিপ্তের দুর্দিন শুরু হয়। এদিকে সাগরও দক্ষিণে সরে যেতে লাগল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব ভারতের এ সমৃদ্ধ বন্দর নগরী পরিণত হয় নগণ্য শহর রূপে। আজ তার প্রাধান্য, সম্পদ ও প্রতিপত্তি সবই অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

# সৃষ্টির ইতিবৃত্ত ঃ বেদ বিবর্তন বিজ্ঞান

## কৌশিক সাহা

সৃষ্টির ইতিবৃত্তের এই প্রবন্ধে আলোচ্য দিকটি বিশ্বসৃষ্টিরহস্য ও ভারতীয় প্রাচীনসাহিত্যে বেদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে তার অস্তিত্ব ও বিবর্তনকে ঘিরে। বেদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যকে সাক্ষ্য করে আধুনিক বিজ্ঞান প্রণীত বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অনেকেই মনে করেন সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। আদি বা অন্তিম মুহূর্ত যদি বা সত্যিই কিছু থেকে থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র অনুমান বা কল্পনাই করতে পারি। সঠিকভাবে বিজ্ঞান সম্মতভাবে তার ইতিহাস অনুসন্ধান দুরূহকর্ম। লেমাইতর প্রণীত বিগব্যাং বা মহাবিক্ষোভ তত্ত্ব দ্বারা বিশ্বসৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেন। ১৯৭০-এর দশকে রজার পেন্‌রোজ এবং স্টিফেন হকিং বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যায় বিগব্যাং তত্ত্বকে প্রমাণের অকাট্য ও চূড়ান্ত উত্তর দেন। এ প্রসঙ্গে এই 'মহাবিক্ষোভ' জনিত সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা আলোচনা করা দরকার।

সুদূর অতীতে দু' থেকে তিন হাজার কোটি বছর আগে গেলে ব্রহ্মাণ্ডের আদি অবস্থায় পৌঁছনো যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন এক ভয়ানক বিস্ফোরক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তারকাপুঞ্জগুলো প্রায় আলোর গতিবেগে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। এই বিস্ফোরণকে অতীতের উৎসমুখে প্রসারিত করলে বলা যায় যে, এমন এক সময় নিশ্চয়ই ছিল যখন এই সমস্ত তারকাপুঞ্জগুলো এক জোটে এমনই স্তূপীকৃত হয়েছিল যে তাদের পারমাণবিক কেন্দ্রীনগুলো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে একটার ঘাড়ে একটা চেপে মিলেমিশে গিয়েছিল। বস্তুত এই যুগকেই বিজ্ঞানীরা আদি ব্রহ্মাণ্ড বলেন। সৃষ্টির সূচনা একটি বিস্ফোরণ বা মহাবিক্ষোভ দিয়ে। এই বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল সমস্ত 'দেশ' জুড়ে যুগপৎ একই মুহূর্তে— 'দেশ' কালের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কণাগুলি পরস্পর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র বেগে। বিজ্ঞানের তথ্যানুসারে এই আদিমুহূর্তের এক সেকেন্ডের এক শতাংশ কাল পরে ব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা ছিল দশ হাজার কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই অবস্থায় পরমাণু কেন্দ্রগুলোরও ভেঙে যাবার কথা। এই মিশ্র পদার্থের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চারশো কোটি গুণ বেশি ছিল এবং এই পদার্থের মধ্যে ছিল ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো ও ফোটন কনা। এই ফোটন কণার প্রবাহই আলো বলে প্রতিভাত হয়।

সম্প্রসারণের এক সেকেন্ড গেলে তাপমাত্রা ছিল এক হাজার কোটি ডিগ্রী ও প্রায় চোদ্দ সেকেন্ড পর তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় তিনশ কোটি ডিগ্রীতে। প্রথম তিন মিনিট পর তাপমাত্রা দাঁড়ায় একশো কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তিন মিনিটের শেষে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ছিল প্রধানত আলো, নিউট্রিনো ও অ্যান্টি নিউট্রিনো। একটি করে নিউট্রন ও প্রোটনের জোটে জটিল পারমাণবিক কেন্দ্রীণ সৃষ্টি শুরু হল — হাইড্রোজেন। দুটো করে নিউট্রন ও প্রোটন নিয়ে হিলিয়াম। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণুগুলো চার্জবিহীন। আলোকে শোষণ করা বা ছড়ানোর ক্ষমতা তাদের অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এই দুই গ্যাস মহাকর্ষের প্রভাবে ঝাঁক বাঁধতে শুরু করলো। বিশ্ব তাই হঠাৎ স্বচ্ছতা লাভ করলো। ক্রম তৈরী হল নীহারিকা, তারা ও গ্যালাক্সিগুলো। পরে এদের ক্রমবিবর্তনের নানান পর্যায়ে, ফেটে পড়ে নতুন ঝাঁক বেঁধে নতুন নতুন তারা সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল তাই বলেছেন, "We are all made off stardust". নিউটন ও আইনস্টাইন উভয়েই এই বিশ্বসম্প্রসারণকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ১৯১৫ সালে বিজ্ঞানী হাব্‌ল বিশ্বসম্প্রসারণ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করলে আইনস্টাইন মন্তব্য করেন যে, বিশ্বের হ্রাসবৃদ্ধিহীনতার তাঁর তত্ত্বটি ভুল ছিল। উল্লেখ্য যে বিশ্বসৃষ্টির সাথে সাথে চার রকমের বল সৃষ্টি হয়েছিল— তড়িৎ চুম্বকীয়, মহাকর্ষ, জোরালো এবং কমজোর। সৃষ্টির ক্রমপর্যায়ে তারাদের মধ্যে সূর্য নামক নক্ষত্র ও তার গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীরও সৃষ্টি হল।

জীবজগতের সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠার পর অ্যামাইনো অ্যাসিড সৃষ্টি হলে এক সময় প্রাণ সৃষ্টি হল। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সব জীবকোষ। আত্মঅণুলিপিকরণের ক্ষমতা থাকায় তারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল। একাধিক জীবকোষ সংযোজিত হয়ে শুরু হল জটিল থেকে জটিলতর, উন্নত থেকে উন্নততর জীবকোষের বিবর্তনের পালা। বিবর্তনের ধাপে ধাপে জলচর থেকে উভচর, সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী, বনমানুষ এবং একসময় আধুনিক মানুষ। এইভাবেই বিজ্ঞান থেকে বিশ্বসৃষ্টি ও প্রাণসৃষ্টির বিবর্তনের ধারণা মেলে।

প্রাচীন সাহিত্যগুলির মধ্যে কিভাবে বিশ্ব ও প্রাণ সৃষ্টি বিবৃত হয়েছে তার ধারার সাথে বিজ্ঞানীদের আধুনিক চিন্তনের সাযুজ্য লক্ষ্য করব।

(১)

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯নং সূক্ত, বা নাসদীয় সূক্ত অনুসারে—

"তখন কোন সত্ত্বা বা না-সত্ত্বা কিছুই ছিল না; মৃত্যুও ছিল না — অমরত্বও ছিল না। আদিতে ছিল শুধুই অন্ধকার— অন্ধকারে অন্ধকারে আবরিত। সবই ছিল

অপরিচ্ছন্ন সলিল মাত্র। ............ তখন ছিল শুধু রুদ্ধশ্বাস অচঞ্চল 'এক'।"

১২১নং সূক্তের ৭নং পংক্তিতে উল্লেখ হয়েছে—

"সকল কিছুর ভ্রূণ গর্ভে ধারণ করে যখন ঊর্ধ্বসলিল সঙ্গে অগ্নিকে নিয়ে নেমে এল— তা থেকে দেবতাদের শ্বাসরূপে তিনি আবির্ভূত হলেন।"

(২)

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ঋষির বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য—

"এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎ স্বরূপ ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ জাত হইল।"

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "History of Science and Technology in Ancient India" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। পার্থ ঘোষ তাঁর 'আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখা'-তে এই ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

(৩)

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রজাপতি পুরুষ সলিল তৈরি করে তাতে ডিম্ব আকারে নতুন জন্ম নেওয়ার জন্য প্রবেশ করলেন। তা থেকে ব্রাহ্মণ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। খ্রীঃপূর্ব তৃতীয় শতকের চৈনিক কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম মহাশূণ্যতায় একটি ডিম্ব ছিল। সেই ডিমের ভিতর বিশৃঙ্খলা ছিল। 'পান-কু' অপ্রকাশিত রূপে ঐশ্বরিক ভ্রূণের মত ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। মিশরের পুরাণকাহিনীতে আমোন কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টিতেও বিশ্বডিম্ব ভেঙে মহাশূণ্যতার নিস্তব্ধতা ভঙ্গের উল্লেখ মেলে। বিজ্ঞানকথিত "Cosmic egg" এর ভাবনার সাথে সাযুজ্য লক্ষণীয়।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে আদিতে বিশ্ব ছিল আত্মন মাত্র। দ্রষ্টা ছিল না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার অরন্ড উপজাতিদের পুরাণেও আদিতে চিরন্তন অন্ধকারের ধারণা প্রকাশিত। আমেরিকার আদি অধিবাসী কুইচি মায়াদের পুরাণেও অন্ধকার ও স্তব্ধতার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞানবর্ণিত 'Supervoid' এর কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে, আদিতে যে দ্বিতীয়বিহীন 'এক' ছিলেন, নিজেকে বহু করার বিকশিত করার তাঁর আত্মবিস্ফোরণ সৃষ্টি হল তাপ, আলো ও বিশ্বজগৎ। বিগব্যাং বা মহাবিক্ষোভ তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের ৭২নং সূক্তে ৬ ও ৭নং পংক্তিতে বলা হয়েছে যে— "হে দেবগণ তোমরা যখন সেই সলিলে

পরস্পর হস্তযুক্ত করে স্থান নিলে। তোমাদের মধ্য থেকে নর্তকের চরণসম্পাতে যেমন ধূলি উৎকর্ণ হয় তেমনই ঘন কুয়াশার মেঘ উঠে এলো" (৬নং) — "হে দেবগণ যাদুকরের মত তোমরা বিশ্বকে স্ফীত হতে সাহায্য করলে।" (৭নং)

John Boslough এর 'Masters of Time' থেকে ছায়াপথের এমনি ধারণা মেলে।

সৃষ্টিতত্ত্বের ধারায় ঘনীভূত শক্তি বা অপ, তেজ্ বা আলো, মরুৎ বা গতি, ব্যোম ও ক্ষিতির ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মৈত্রায়ণ উপনিষদের বক্তব্য যে, "বিশ্বলয় পেলে একমাত্র তিনিই জাগ্রত থাকেন। আবার তিনিই দেশের (space) গভীরের থেকে জীবনস্পন্দনে আত্মাকে জাগরিত করেন।'

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অনুসারে, "ঈশ্বর বহুবার দেশে জগৎ সৃষ্টি করে আবার তাকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। নতুন করে সৃষ্টি করবেন বলে"।

অত্যাধুনিক 'Pulsative Origin Theory' দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংস ও পুনর্সৃষ্টিকে এভাবেই বিজ্ঞানী W.B. Bonnor ব্যাখ্যা করেছেন; যা একাধারে Big Bang ও Big Crunch উভয়ের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জীবসৃষ্টির বিবর্তন ধারায় ৮৪ লক্ষ যোণির উল্লেখ প্রাণের প্রজাতি (Species) সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া অবতার তত্ত্ব দ্বারা জীব বিবর্তনবাদ সহজেই প্রতিষ্ঠা পায়। এই জীববিবর্তনে অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই ২০০০ সালে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত ইতিহাস সংসদের অধিবেশনে ব্যক্ত করেছি। এইভাবে বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সাযুজ্য নিঃসন্দেহে ইতিহাস বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'চঞ্চলা' কবিতাটিতে বিশ্বসৃষ্টির এই তত্ত্বকেই অন্তর্লীন করেছেন—

"হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল (void)
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূণ্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে।
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে

ধাবমান অন্ধকার হতে,
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে সরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদবুদের মত।"

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) ঋগ্বেদ সংহিতা; দ্বিতীয় খণ্ড; হরফ প্রকাশনী ২০০০

ঋগ্বেদ সংহিতা; নিউলাইট; রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত; ১৪০১ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় সংস্করণ।

২) উপনিষদ; অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত ও সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭২ অক্টোবর প্রথম প্রকাশ।

হিন্দুশাস্ত্র, রমেশচন্দ্র সম্পাদিত, বর্তমান সমপাদক-ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী; নিউলাইট, ১৪০১, দ্বিতীয় অখণ্ড সংস্করণ।

৩) ব্রাহ্মণ; অনুবাদক শ্রী যুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী; নিউলাইট,

কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহ্বর স্টিফেন ডব্লু হকিং, ভাষান্তর শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৩ জানুয়ারী।

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষ; আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখা— পার্থ ঘোষ, থীমা, ১৯৯২

Cosmos earl sagan, p. 212, 213, 1989

The Revealed Mystery of the world Divine, Sarkar, Navapatra, 1994.

# বঙ্গনারীদের সূর্যপূজা

বিজয় কুমার সরকার

ভারতের নারীগণ স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশানুক্রমে সুদীর্ঘকাল ধর্মীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাই বিভিন্ন ব্রত পালনের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সংস্কার পালনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতেন। ব্রত বলতে এমন লৌকিক অনুষ্ঠানাদিকে বোঝায় যা কাঙ্খিত ফল বা উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত অতিশয় পবিত্রতার সাথে শারীরিক ও মানসিক কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রমণীগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই সকল লৌকিক অনুষ্ঠানের উৎপত্তিকালে নির্ণয় করা তত সহজ নয়। ব্রতগুলি আদিমতম রূপে আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত ছিল এবং পরে তা পরিমার্জিত হয়ে সমাজের উচ্চশ্রেণীর নারীগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এই সকল লৌকিক সংস্কারের প্রতি পুরোহিতগণের স্বীকৃতি দানের প্রক্রিয়াও চলে বহুদিন ধরে।

কতিপয় সৌরব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিবের ব্যাখ্যার উল্লেখ মৎস্য পুরাণে পাওয়া যায়। শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে (বিশেষতঃ বাংলা মাঘ মাসে) সৌরব্রতগুলি পালনের উপরে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। মৎস্য পুরাণে কল্যাণ সপ্তমী, বিশোকা সপ্তমী, ফল সপ্তমী, শর্করা সপ্তমী, কমল সপ্তমী, মন্দার সপ্তমী, শুভ সপ্তমী ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।[১] প্রথম চারটি ও শেষোক্ত সপ্তমীটি সূর্যোপাসনার মাধ্যমে সকল প্রকার ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে সাধারণত করা হয়ে থাকে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও সূর্যব্রতের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। রোগমুক্তি ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ উদ্দেশ্যেও (যেমন সম্পদলাভ) সৌরব্রত পালনের নির্দেশও পুরাণে উল্লেখিত হয়েছে।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, সূর্যপূজার ক্ষেত্রে কোনো জাতিগত বিধিনিষেধ কিন্তু আরোপিত হয়নি।[৩] পুরাণ ছাড়া সমাজ-নৃবিজ্ঞানীদের নানান গবেষণা থেকেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের ব্রত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যায়। ব্রত-সম্পাদনে তেমন কোন মন্ত্রের ব্যবহার বা সুশৃঙ্খল পূজাপদ্ধতির ব্যাপার নেই বললেই চলে। সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর প্রতীকী উপস্থাপন এবং আবহমান কাল থেকে চলে আসা লোকগাথা, লোকগীতি ও ছড়ার মাধ্যমেই ভক্তগণ সাধারণত ব্রতসমূহ পালন করে থাকেন। যাইহোক, এবাব বঙ্গরমণীদের কতিপয় সৌরব্রতের

নাতিদীর্ঘ বিবরণের মাধ্যমে বাংলায় লৌকিক সূর্যপূজার স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা যাক।

মাঘ মণ্ডলব্রত[৪] সর্বাধিক জনপ্রিয় এই সৌরব্রত পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার কুমারী মেয়েরা বছরের পর বছর পালন করে থাকে। তিন-চার বছর বয়সেই এই ব্রত-পালন শুরু হয়ে যায়। সারা মাঘ মাস ধরে পর পর পাঁচ বছর মাঘ মণ্ডলব্রত পালন করতে হয়। সূর্যোদয়ের আগেই মেয়েরা নিকটবর্ত্তী পুকুরঘাটে জড়ো হয় এবং হাতে ফুল নিয়ে জলের কিনারে বসে স্থানীয় ভাষায় একজন বড় মেয়ে বা মহিলার তত্ত্বাবধানে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে। তারা সূর্যের শৈশব বয়ঃপ্রাপ্তি, বিয়ে, পুত্রের জন্ম ইত্যাদি বর্ণনা করে এবং এর মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতে বিয়ে হওয়া ও শ্বশুরালয় নিয়ে তাদের আশা ও আশঙ্কা, গৃহিনীজীবনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ে ভীতি ও স্বচ্ছল শ্বশুরবাড়ীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠার আকাঙ্খা।

বাড়ীর অন্তরাঙ্গনে পূর্ব্ব-গগন সূর্যের প্রতীক রূপে ক্ষুদ্রাকৃতি বৃত্ত সমন্বিত একটি অগভীর বৃত্ত খনন করা হয়; থাকে পশ্চিমাকাশী চন্দ্রের প্রতীক রূপে একটি অর্ধ-বৃত্তও। সূর্যের পাঁচালি শেষে মেয়েরা বাড়ী ফিরে বৃত্তের ধারে বসে সংক্ষিপ্ত একটি মন্ত্রোচ্চারণ করে অনুষ্ঠান শেষ করে। প্রতি বৎসর একটি নতুন বৃত্ত সংযোজন করতে হয় এবং ভিন্ন রং-এর চুর্ন দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে রং করতে হয়। পাঁচটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হলে বৃত্তসমুহের পাশে বসে বিশেষ ধরনের মিষ্টদ্রব্য খেয়ে ব্রতী-কুমারী চূড়ান্ত অনুষ্ঠান সাঙ্গ করে। মিষ্টদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ মাথার উপরে ছুঁড়ে দেওয়া হলে উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে তা সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এভাবেই শেষ হয় পঞ্চবার্ষিকী ব্রতপালন। মাঘ মণ্ডল ব্রত আদতে আগেকার দিনের সূর্য-আরাধনার এক 'জনপ্রিয় নারী-সংস্করণ মাত্র। হিমেল আবহাওয়া, বিশেষত মাঘ মাসের হাড় কনকনে ঠাণ্ডাকে অগ্রাহ্য করে কাকভোরে ওঠার মানসিক অভ্যাস গঠনই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

ইতুপূজা ঃ বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রচলিত লোকায়ত সূর্যোপাসনা সমুহের মধ্যে ইতুপূজা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।[৫] জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ইতুপূজার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রাচীন যুগের সূর্য-আরাধনা।[৬] মিতু অর্থাৎ মিত্র (অর্থাৎ সূর্য) থেকে ইতু শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। সূর্য মিত্র নামে অপরিজ্ঞাত না হলেও মিত্র-পূজার কোন ঐতিহ্য কিন্তু প্রবহমান নয় এবং মিত্র পূজা, যে অতীতে কখনও জনপ্রিয় ধর্মমত ছিল, এমন প্রমাণ কিন্তু নেই।[৭] তবে ইতুপূজা সংশ্লিষ্ট লোককাহিনী এবং এই লোকায়ত উপাসনার ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতি এই উভয় ক্ষেত্রেই

পূজিত দেবতা হিসাবে কিন্তু সূর্যই সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত।[৮] মাঘমণ্ডল ব্রত অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে ইতুপূজারই অধিকতর প্রচলন বলে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মনে করেন।[৯]

হিন্দু শাস্ত্র-বিধি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মহিলাগণ কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন থেকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই সময়কালে প্রতি রবিবার ইতুপূজার অনুষ্ঠান করে থাকেন। মাটি দিয়ে ভরা একটি বড় মাটির পাত্রে চারটি ছোট ছোট মাটির পাত্র রাখা হয় এবং মাটিতে ধান, যব, গম ও জল শষ্যের বীজ বপন করা হয়। প্রতি রবিবার উক্ত মাটিতে সামান্য জল দেওয়া হয় এবং বীজগুলির অঙ্কুরোদগম ঘটে। চারটি মাটির পাত্র সূর্য-সৃষ্ট চার ঋতু ও মৃত্তিকাপূর্ণ বৃহৎ মৃৎপাত্রটি সূর্যশাসিত পৃথিবীর প্রতীক। পুজোর দিনে ভক্তদের চুলের তেল, মাছ ও মাংস বর্জনীয়। পুজোপকরণ হিসাবে দেওয়া হয় ফুল, দুর্বা, চন্দনের লেই, তিল, রোদে শুকানো ধান, হরীতকী ইত্যাদি। জলপূর্ণ মৃৎপাত্রে রাখা হয় ধান্যশীষের গুচ্ছ এবং কয়েকটি গোলাকার মূল। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পুজো শুরু করে পূর্বোক্ত পাত্রের উদ্দেশ্যে পূজা-সামগ্রী প্রদান করলে বিবাহিতা ও কুমারী মেয়েরা সূর্যদের সম্পর্কিত ছন্দোবদ্ধ স্তবক ও লৌকিক উপাখ্যান আবৃত্তি করে এবং এর মাধ্যমে কতিপয় নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত লোকের ইতুপূজা সম্পাদনের প্রেক্ষাপট এবং পূজার পরিণাম স্বরূপ সুখসমৃদ্ধি লাভের কাহিনী বর্ণিত হয়। পূজা শেষে ইতুকে দেওয়া হয় 'সাধ' যার অর্থ সীমন্তোন্নয়ন। উপাখ্যান আবৃত্তির শেষে মেয়েরা একটি কবিতা আওড়ায়। এতেই উল্লেখ রয়েছে : এই কবিতা শ্রবণে নির্ধনের ধন, পুত্রহীনের পুত্র, কুমারীর স্বামী, নিঃসহায়ের ভগবৎ-সাহায্য, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি এবং মৃত্যুর পরে শ্রবণকারীর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং এই ব্রতের উদ্দেশ্য যে গার্হস্থ্য সুখ অর্জ্জন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ইতুপূজার বিশেষত্ব হল এই যে, এটি মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, পুজোর অন্তিম দিন ছাড়া পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এবং কেবলমাত্র অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারগুলিতেই তা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমোক্ত তথ্যদুটি থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে ইতুপূজার উৎস লোকায়ত এবং শেষোক্ত তথ্যের ব্যাখ্যা হল এই যে, সূর্যদেবের নিমিত্ত রবিবার বিশেষ পবিত্র দিন।

শীতকালীন ধান্য শষ্য কাটা এবং খাদ্যশষ্যের বীজ বোনার সময়ের সঙ্গে ব্রতরূপে অনুষ্ঠিত ইতুপূজার সাযুজ্য রয়েছে। পূজায় ব্যবহৃত সূর্যসৃষ্ট চতুর্ঋতুর প্রতীক রূপে কল্পিত ক্ষুদ্র পাত্রগুলি এবং মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে খাদ্যশষ্যের বীজ বপন এবং মাস ব্যাপী জলসিঞ্চন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইতুপূজা আদিতে সম্ভবত অনুকরণীয় ইন্দ্রজালের ধারণাভিত্তিক এক উর্বরতা বৃদ্ধি কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান ছিল।[১০]

**সূর্যের ব্রত** : মাঘমণ্ডল ছাড়াও পূর্ববঙ্গের নারীরা সূর্যের ব্রত নামক লৌকিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিন্নভাবে সূর্যের পূজা করে থাকেন।[১১] এই ব্রতের অনুষ্ঠান নিম্নরূপ ঃ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের কোন এক রবিবারে আঙিনায় একটি মাটির বেদী নির্মাণ করা হয় এবং ব্রতপালন কারীদের সংখ্যানুযায়ী ঘৃতপ্রদীপ তাতে রেখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সেগুলি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। সূর্য ওঠার আগেই পুন্যস্নান সেরে নারীভক্তগণ হাতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ নিয়ে পূর্ব্বমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি ভক্তদের উপবেশন নিষিদ্ধ : খাওয়া, আরাম করা বা চুল বাঁধাও তাদের চলবে না। যারা বসে ব্রত পালন করবেন, তাদের দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। দুপুরে পুরোহিত বেদীমূলে সূর্যের পূজা করেন। সূর্যাস্তের পরে ভক্তরা সঙ্গীত সাঙ্গ করে উপবাস ভাঙেন এবং প্রদীপ নিভিয়ে উপবেশন করেন।

চট্টগ্রামের অধিবাসীরাও বাংলা মাঘ মাসের শুক্ল চন্দ্র পক্ষের শেষ রবিবারে সূর্যব্রত পালন করেন।[১২] পূজানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনে সেখানে মেলা বসে, সেখানকার একটা উঁচু জায়গায় পূজার অনুষ্ঠান হয়। পূজোর দিন ভক্তসকল বিশেষত নারীভক্তগণ খুব সকালে উঠে পেতলের জলপাত্র নিয়ে নিকটবর্ত্তী পুকুরে যান এবং স্নান করেন। প্রত্যেক ভক্ত উক্ত পাত্রে জল ভরে একটি আম্রপল্লব তাতে স্থাপন করেন এবং সকলে মিলে এক সাথে উলুধ্বনি দেন। ইতুপূজার মত কোনো লৌকিক উপাখ্যান বা স্তবক এক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় না। হাতে জলভরা পাত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে তারা সেটিকে এমন জায়গায় রাখেন যেখানে সারাদিন সূর্যের আলো পড়ে এবং পাত্রের জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। রোদে জল ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের ইঙ্গিত বহন করে। পাত্রের জল সারা দিন রাদ না পড়লে এবং জল শুকিয়ে না গেলে ভক্তরা মনে করেন, তাদের আকাঙ্খা পূরণ হবে না।

সারাদিন উপবাসে থেকে ভক্তরা মেলায় গিয়ে একটি বড় চোঙাকৃতি ধুপদানি, দুই সেট ছোট ছোট মাটির পাত্র, রেকাবি ও প্রদীপ-দানিসহ প্রদীপ কেনেন এবং পূজার ভোগ সহ উক্ত সামগ্রীগুলি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেন। পূজোপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় ফুল, দুর্বাঘাস, চন্দনের লেই, তিল, রৌদ্রশুস্ক ধান, হরীতকী ইত্যাদি। প্রত্যেক পুরোহিত মাটির রেকাবিতে পূজা-সামগ্রীগুলিকে সাজিয়ে ধুপ-দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং পূজাকর্মে নিয়োজিত হন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা প্রভু বিষ্ণুকে ভোগ-সামগ্রী দিয়ে প্রথমে তুষ্ট করা হয়। তারপর আর ভোগসামগ্রী নিবেদিত হয় সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে। পূজোর সারাদিন ধরে যজ্ঞ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা হয় এবং সূর্যদেবকে

নিবেদনের উদ্দেশ্যে ভক্তদের আনীত পূজোপকরণগুলি তার সামনে রাখা হয়। যে স্থানে পূজা ও মেলা হয়, লোকেরা সেটিকে সূর্য-খলা বলে থাকে। সকাল থেকে শুরু হয়ে বিশাল মেলা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। ভক্তেরা শুধু এই বরটুকুই প্রার্থনা করেন যে, যে রোগে তারা ভুগছেন, তা থেকে তারা যেন আরোগ্যলাভ করেন।

সর্বপ্রকারে ব্যাধি থেকে মুক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে সূর্যব্রতের বিধান বৃহদ্ধর্মপুরাণেও দেখা যায়।[১৩] এবং এই বিধান সকল জাতির জন্য। সূর্যব্রত পালনের জন্য রয়েছে একাধিক পদ্ধতি। এক মতে, শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠদিনে ভক্ত খাদ্যগ্রহণে নিবৃত্ত হয়ে সপ্তম দিনে উপবাস করে সূর্যপূজা সম্পন্ন করেন এবং অষ্টম দিনে যথারীতি খাদ্যগ্রহণ করেন। আরেক মতে, রাতে উপবাস করে রবিবারে মার্ত্তণ্ড পূজা করা যেতে পারে। আবার, আদিত্যের নাম উচ্চারণ করে এবং শুধুমাত্র রাতে একবার ভোজন করে সংক্রান্তি তথা রবিবার ভগবান ভাস্করের পূজা করা যায়। এও বলা হয়েছে যে, অস্তায়মান সূর্যের প্রতি দৃঢ় মনসংযোগের পরে ব্রাহ্মণদের সন্তোষবিধানার্থে ভক্ত তাদের মিষ্টদ্রব্য খাওয়াবেন এবং নিজে মিষ্টান্ন দিয়ে দুধে সেদ্ধ ভাত খাবেন। সূর্যভক্তগণ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রবিবারে আদিত্য হৃদয়-মন্ত্র জপ করবেন। মন্ত্রজলের পরে ভক্ত পুন্যস্নান সেরে দান করবেন এবং কৃচ্ছ্র সাধনের পরে যজ্ঞ ও উপবাস পালন করবেন। ভগবান সূর্যের উদ্দেশ্যে নিবেদনীয় অষ্ট-উপকরণ হল কুশঘাস, ঘৃত, দধি, মধু, রক্ত করবী, ফুল, রক্তচন্দন ও জল।। পূজার এই সামগ্রীসমূহ দিতে হবে মৃৎ বা স্বর্ণনির্মিত পাত্রে। কোথাও কোথাও সূর্যব্রতে পুরোহিতও নিয়োজিত হন; তিনি মাটির পাত্রে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধুপ-দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ব্রত পালনকারীর পক্ষ থেকে পূজা সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত ব্রত বর্ণনা থেকে মনে হয়— ব্রত পালনকালে সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে শুধুমাত্র রোগমুক্তি নয়, নশ্বরীজীবনের সম্ভাব্য সব রকম আকাঙ্খা পরিতৃপ্তির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়।

**শ্রীহট্টের সূর্যব্রত** : লোকায়ত সূর্যোপাসনার নজির দেখতে পাওয়া যায় শ্রীহট্টেও।[১৪] পূজার নিমিত্তই গৃহপ্রাঙ্গনে খনন করা ক্ষুদ্র এক পুষ্করিণীর জলে সূর্যের প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে অন্তিম দিনে। মাঘ মাসের রবিবারে ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হয় পূজা। দিনভর ভক্তরা দাঁড়িয়ে থাকেন এবং খাদ্যগ্রহণ ও রৌদ্রসুরক্ষা থেকে বিরত থাকেন। আগেকার দিনে ভক্তরা হাতে প্রদীপ নিয়ে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নেমে যেতেন জলে। নাভিদেশ সমান জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে

নিজেদের মুখমণ্ডল পূব থেকে পশ্চিমে ক্রমশ ঘোরাতেন যেমনভাবে অস্ত না যাওয়া অবধি সূর্য তার আহ্নিক গতিতে করে থাকে। সূয়াস্তের পরে ব্রত পালনকারীরা জল থেকে উঠে এসে খাদ্যগ্রহণ করতেন। সম্প্রতি দেখা গেছে— ভক্তরা হাতে প্রদীপ নিয়ে সূর্যের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে স্থলেই দাড়িয়ে থাকেন। আজকাল অবশ্য ভক্তরা উপবেশন, খাদ্যগ্রহণ এবং বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং যারা এইটুকুতেও অসুবিধা বোধ করেন, তারা শুধুমাত্র উপবাসই করে থাকেন। তবে এখনও শীতকালীন সূর্যের গতি অনুসারে প্রদীপের শলিতার অগ্রভাগকে পুব থেকে দক্ষিণপুবে, দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পশ্চিমদিকে সরানো হয়। প্রদীপ এখন হাতে না রেখে পূজার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া হয় আঙিনায় খনন করা পুকুরের কাছে। আগেকার দিনে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে এই ব্রত পালন করলেও আজকাল পুরুষেরা প্রায়শ তা করেন না। সূর্যের দাঁত নেই এই বিশ্বাসবশতই তার খাবার তৈরী হয় চাল ও দুধ দিয়ে। সূর্যাস্তের পরে মেয়েরা সন্ধ্যে না হওয়া অবধি পুকুরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান করে এবং তারপর উপবাস ভাঙে। প্রায় প্রতি পূজানুষ্ঠানেই সূর্যের অর্ঘ হল ঘাস, চাল/ভাত ও জল। বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে ধর্মরূপী সূর্যদেবকে ভাল ফলনের আশায় নৈবেদ্য দেওয়া হয়।[১৫]

**চুঙ্গীর ব্রতঃ**[১৬] পূর্ববঙ্গের গৃহলক্ষ্মীরা এই ব্রত করে থাকেন। অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে নলের চোঙায় একুশটি দুর্বাঘাস ভরে এবং দুধ দিয়ে তা স্নান করিয়ে সূর্যদেবকে নিবেদন করা হয়। এই ব্রতে যে লৌকিক উপাখ্যান গাওয়া হয়, তা পশ্চিমবঙ্গের ইতু-পূজার উপাখ্যানের অনুরূপ। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ঢাকরী ব্রত[১৭] নামে একটি সূর্যব্রতের উল্লেখ করেছন। এটি বয়স্ক মহিলারা পালন করে থাকেন। মেদিনীপুর জেলাতেও ছোট ছোট উপাখ্যান গেয়ে গৃহলক্ষ্মীদের সূর্য-পূজা করার বেশ চল আছে।[১৮] রালদুর্গা ব্রতের লৌকিক অনুষ্ঠানেও প্রাগার্য সূর্যপূজার অস্তিত্ব বিদ্যমান।[১৯]

পরিশেষে সূর্যপূজা বা সৌরব্রত সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। বেদের এবং প্রাচীন ভারত তথা প্রাচীন বঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় দেবতা সূর্যের একক পূজা, মূর্ত্তি বা মন্দির নির্মাণ আজকাল আর নেই বললেই চলে, যদিও ভক্তিভরে সূর্যপ্রণাম আজও সগৌরবে বিদ্যমান। কিন্তু সেই প্রাগার্যকাল থেকে লৌকিক ব্রত বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সূর্যোপাসনায় আজও ছেদ পড়েনি। এবং এই প্রবহমানতায় নারীদের ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ব্রতের মাধ্যমে এবং বিবিধ মনোবাঞ্ছা নিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের আবালবৃদ্ধবনিতাদের সূর্য-আরাধনা লোকায়ত জীবনে সূর্যদেবের জনপ্রিয়তাকেই সূচিত করে। লোকায়ত এই সূর্যোপাসনায় মূর্ত্তির অনুপস্থিতি,

সংস্কৃত মন্ত্রের অব্যবহার, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের তেমন প্রয়োজন না থাকা এবং নৈবেদ্য হিসাবে মামুলী কিছু বস্তু সমুহের চলন মাটির সঙ্গে সূর্যপূজার নিবিড় সংযোগেরই দ্যোতক।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, খণ্ড ৫৭, সংখ্যা ১ ও ২, ১৩৫৭-১৩৫৮।

২) বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১০, ১৩, ১৪।

৩) ঐ, ৯.২৭ ইত্যাদি।

৪) নলিনীকান্ত ভট্টশালী, আইকনোগ্র্যাফী অফ বুদ্ধিস্ট এ্যান্ড ব্রাহ্মনিক্যাল স্কালপ্চারস, পৃ. ১৪৮-১৪৯ পাদটীকা।

৫) আর.কে. ভট্টাচার্য ও এস.সি. মিত্র, 'অন দি ওয়ারশিপ অফ দি সান ডিইটি ইন বিহার, ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইস্টার্ন বেঙ্গল', দি জার্নাল অফ দি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বোম্বে, খণ্ড ১৩, সংখ্যা ৪, ১৯২৭, পৃ. ৩১৫-৩১৬।

৬) জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩২০।

৭) ননীমাধব চৌধুরী, 'দি সান অ্যাস এ ফোক্ গড্', ম্যান ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড ২১, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৪১, পৃ. ৬-৭।

৮) ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি (বসুমতী প্রকাশন), খণ্ড ২, পৃ. ৭৮০।

৯) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১।

১০) তুলনীয় : 'গার্ডেন অফ অ্যাডোনিস', ফ্রেজারের গোল্ডেন বাউ, সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃ. ৩৪২ পাদটীকা।

১১) আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'দি পপুলার সান-কাল্ট অফ বেঙ্গল', অমৃত বাজার পত্রিকা, বার্ষিক পূজা সংখ্যা, ১৯৪৫, পৃ. ১৬৫।

১২) আর.কে. ভট্টাচার্য ও এস.সি.মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-৩১৭।

১৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ৯, কলিকাতা, ১৮৯৭।

১৪) পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, 'ফোক-কাস্টম অ্যান্ড ফোক-লোর অফ দি সিলেট ডিস্ট্রিক্ট ইন ইন্ডিয়া', ম্যান ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড ১০, সংখ্যা ২-৪, ১৯৩০; ননীমাধব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮।

১৫) এইচ.এইচ. রিসলে, দি ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল, খণ্ড ১, কলিকাতা, ১৮৯১, পৃ. ২৪১।

১৬) চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, 'বঙ্গে সূর্যপূজা ও সূর্যের নুতন পাঁচালী', সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সংখ্যা ১, ১৩৪০, পৃ. ১ পাদটীকা ৫।

১৭) প্রাগুক্ত।

১৮) যোগেশ চন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃ. ৬৯৪।

১৯) অতুল শুর, ভারতের আদিম মানব ও তার ধর্ম, পৃ. ৩১।

# ঋগ্বেদ-সংহিতার আলোকে প্রাচীন ভারতের অনার্য জনগোষ্ঠী

অশোক কুমার মাহাত

'অনার্য' শব্দটি একাধিক নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য অর্থের বাহক হওয়ায় এমন ধারণার জন্ম হতে পারে যে এই নামের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবচরিত্রের যাবতীয় অপগুনই রয়েছে। সর্বগুনাধার 'আর্য' শব্দের বিপরীত অর্থবোধক 'অনার্য' অভিধায় যাঁরা কলঙ্কিত তাঁরা আর্যদের ভারতবর্ষ অভিযানের বহু আগেই এদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রাগার্য ভারতীয়রা নৃতাত্ত্বিকভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন এবং বহির্ভারতীয় আর্যদের ভারত অভিযানে তাঁরা বাধা দেওয়ায় প্রচুর রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "About 2000 B.C., or a few centuries later, a new race of fair complexion, speaking Aryan language, and generally though not correctly, designated as Aryans or Indo-Aryans, gradually advanced from the north-west, across the Hindu Kush mountains, and entered India through Afghanistan".[১] যদিও আর্যরা সবাই একই ভাষায় কথা বলতেন তবুও তাঁদের সকলেই একই নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তাছাড়া তাঁদের সমস্ত গোষ্ঠী এক সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেনি, এদেশে তাঁদের অভিযান ঘটেছিল ক্রমে ক্রমে, দলবদ্ধভাবে এবং প্রচুর সংখ্যায়। ভারতবর্ষের আদিম অনার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যদের ভয়াবহ যুদ্ধের ঐতিহাসিক উপাদান ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে। এ বিষয়ে বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ভিনতারনিৎসের (M. Winternitz) অভিমত, "Aryan tribes had penetrated into the land of the five rivers', and in the songs of the Rigveda we still hear of the battles which the Aryans had to fight with the Dasyu, or the 'black skin', as the swarthy aboriginal inhabitants were called. Only slowly amidst continuous fighting against the hated 'non-Aryans' (anarya) — the Dasyus or Dāsas, who know no gods, no laws, and no sacrifices — do they press

forward towards the East upto the Ganges"[২] ঋগ্বেদ তথা সমগ্র বৈদিক সাহিত্য আর্যদের এক বিশাল কীর্তি। এখানেই লিপিবদ্ধ আছে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তৃত বিবরণ। অনার্য জনগোষ্ঠীর ইতিহাস জানতে গেলেও আমাদের সেই বৈদিক সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। তবে আমাদের আলোচনার পরিধি ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

'অনার্য' শব্দটি আদিতে নিকৃষ্ট অর্থবোধক ছিল না। প্রাচীন ভারতের আর্যভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তবে শব্দটি তত প্রাচীন নয়। ঋগ্বেদে 'অনার্য' শব্দের ব্যবহার নেই, এমনকি সমগ্র বৈদিক সাহিত্যেও শব্দটির প্রয়োগ বিরল। একমাত্র অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ সংহিতার (২/৩১/২) কাশ্মীরিয় পাঠপ্রণালীতে স্ত্রীলিঙ্গে 'অনার্যা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আচার্য যাস্ক নিরুক্তে (৬/৩২) শিষ্টাচারহীন জনগোষ্ঠী অর্থে শব্দটির ব্যবহার করেছেন (কীকটা নাম দেশোনার্যনিবাসঃ)। মানবশ্রৌতসূত্র (৭/২/১০) এবং সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্রে (২৬/৭) শব্দটি কালিমালিপ্ত তবে বিশেষ জনগোষ্ঠী অর্থে তা প্রযুক্ত হয়নি।[৩] বৈদিক যুগের বিভিন্ন আর্য জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক নাম থাকলেও তাঁরা নিজেদের আর্য বলেও অভিহিত করতেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত অনির্বাণ লিখেছেন, "যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন, তাঁরা অবশ্যই নিজেদের হিন্দু বলতেন না। বিভিন্ন বৈদিক জনের বিভিন্ন নাম ছিল, সেই সব নামেই তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন। অথচ ঋক্‌সংহিতাতেই দেখতে পাই, মন্ত্রকৃৎ ঋষিরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করছেন। আবার নিজেদের তাঁরা আর্যও বলছেন।"[৪] গমনার্থক ঋ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ন্যৎ প্রত্যয়ে 'আর্য' শব্দটি নিষ্পন্ন। শব্দটির আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে আর্যদের জীবনযাত্রার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। আর্যরা ছিলেন নিয়মিতভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনশীল অর্থাৎ যাযাবর। পরবর্তী সময়ে 'আর্য' শব্দের শ্রেষ্ঠ, পূজ্য, সাধু ইত্যাদি উৎকৃষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াইয়ে আদিম ভারতীয়দের পরাজয় ও পশ্চাদপসরণই ছিল পরিণতি। তবে উভয়ের সংঘর্ষ শুধুমাত্র রক্তক্ষয়ীই ছিল না, বরং তা ছিল দুটি সভ্যতার বহুমাত্রিক সংঘাত। 'আর্য' শব্দের নানাবিধ উৎকৃষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আর্যভিন্ন পরাজিতদের নামের কুৎসিত অর্থ এসে পড়ে। ফলে অনার্য' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় অনাচারী, দুশ্চরিত্র ইত্যাদি। অনার্যরা সমস্ত ক্ষেত্রেই আর্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁদের নামের হীনার্থক প্রয়োগ খুবই স্বাভাবিক।

বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত ঋগ্বেদে আর্যবিরোধীরা প্রধানত দস্যু ও দাস নামে

অভিহিত। বৈদিক 'দস্যু' শব্দের সঙ্গে প্রদেশবাচক ইরানীয় 'দন্হু' বা 'দক্যু' শব্দের সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারততত্ত্ববিদ্ সিমার (Zimmer) মনে করেন— আদিতে শব্দটির অর্থ ছিল 'শত্রু'। পরে ইরানীয় আর্যদের কাছে এর অর্থ দাঁড়ায় 'শত্রুদেশ', 'অধিকৃত দেশ', বা 'প্রদেশ' এবং ভারতীয় আর্যরা তাঁদের 'অমানুষিক শত্রু'-দের বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার শুরু করেন।[৫] দস্যু শব্দের পাশাপাশি যে 'দাস' শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে দেখা যায় তার সঙ্গে আবেস্তার 'দাহ' শব্দের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'দাস' শব্দটি আদিতে ভৃত্যবাচক ছিল না। সিমার (Zimmer) এবং মেয়ার (Meyer) উভয় ভারততত্ত্ববিদেরই ধারণা 'দাস' শব্দটিও শত্রুবাচক। পরে ইরানীয় আর্যরা কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী শত্রুদের বোঝাতে 'দাহ' এবং ভারতীয় আর্যরা ভারতের আদিম অধিবাসীদের বোঝাতে 'দাস' শব্দের প্রয়োগ করতেন।[৬] আর্য ও দাস দস্যুর সংঘাতে অনার্যরা সংখ্যায় অনেক থাকলেও সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়েছিলেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ব্যাসামের (A.L. Basham) অভিমত, ‘‘প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে তাদের সংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক বেশি এবং তাদের অধিকৃত অঞ্চল বর্তমানের তুলনায় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর্যদের আক্রমণ শুরু হওয়ার সময় থেকেই এরা তাদের সঙ্গে লড়াই করে যেতে থাকে— কিন্তু তা হারবার লড়াই।’’[৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে দাসরা পরাজিত হয়ে আর্যদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হত। অনেকক্ষেত্রে তারা আর্যদের ক্রীতদাসে পরিণত হত।[৮] এভাবেই 'দাস' শব্দ ক্রমশ ভৃত্যবাচক হয়ে একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করল (বশং নয়তি দাসমার্যঃ)।[৯] পরিচারক অর্থে 'দাস' শব্দের ব্যবহার দেখা গেল ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে।[১০] যে কোনও সংগ্রামে বিজয়ীদের উচ্চে এবং পরাজিতদের নিম্নে অবস্থানই অমোঘ পরিণতি।

পশুপালন আর্যদের জীবিকা হওয়ায় ঘাসের খোঁজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিচরণ তাঁদের করতেই হত। যাত্রাপথে অনার্য শত্রুর হাতে বিপদের আশঙ্কা ছিল প্রবল, কাজেই জীবনরক্ষার জন্যে দেবতার কাছে করতে হত আকুল প্রার্থনা।[১১] অপরদিকে অনার্য জনগোষ্ঠীগুলি ছিল কৃষিজীবী। কজেই কৃষিকাজের কৌশল তাঁদের কাছ থেকেই শিখতে হয়েছে আর্যদের। সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, ‘‘বৈদিক আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসে যাযাবর সময়ের পশুচারিতা, এবং পথে যেখানে যেখানে দু-এক বছর থেমেছিল সেখানে পেয়েছিল কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা। এদেশে এসে ক্রমে তারা সম্মুখীন হল কৃষিজীবী এক সুস্থিত নাগরিক সভ্যতার।’’[১২] আর্যরা কৃষিকাজ আয়ত্ত করার ফলে উর্বর চাষের জমির জন্যে অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে রচিত মন্ত্রে

দেখা যায়— শ্বেতবর্ণের আর্যরা আদিম দস্যুদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তাঁদের চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছেন।[১৩] চাষের জমির সঙ্গে জল নিয়ে বিরোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহে দেখা যায় দাস-দস্যুর পরাজয় অনিবার্য, আর্যের বিজয় অভিযান কার্যত বাধাহীন। আর্যদেবতার পরাক্রমে দাসরা জলের অধিকার হারিয়ে ফেলে সহজেই।[১৪]

সে যুগে গরু ছিল সম্পদ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাই গোধন অপহরণের ঘটনা ছিল বিস্তর। দাস-দস্যুদের গরু চুরি করা যে আর্যদেবতার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ তা স্বীকার করতে আর্যদের কোনও সঙ্কোচ নেই।[১৫] গুহার ভেতর লুকিয়ে রেখেও গরু নিজেদের অধিকারে রাখতে ব্যর্থ হতেন দাস-দস্যুরা।[১৬] তবে সুযোগ পেলে গরু ছিনিয়ে নিতে তাঁরাও যে পিছপা হতেন না এবং সেই গরু পুনরুদ্ধার করতে আর্যদের যে যথেষ্ট বেগ পেতে হত তা পণি-সরমা সূক্ত[১৭] থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

গরু ছাড়াও অনার্যদের ধনসম্পদ ছিল যথেষ্ট, তাই আর্যদের যত লোভ গিয়ে পড়েছিল সেগুলোর ওপর। অনার্যরা ছিলেন সভ্য নগরবাসী, শত্রুতাবশত আর্যরা তাঁদের পুর ধ্বংস করে ফেলতেন।[১৮] ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে[১৯] দস্যুদের ধনী বলা হয়েছে। দাসদের সংগৃহীত মণিমুক্তো, সোনাদানা প্রচুর থাকার ফলে ছলে বলে কৌশলে সেগুলো অপহরণ করাই ছিল আর্যদের উদ্দেশ্য। তাই ঋষিকবির মনে হয়েছে— কীকট নামক অনার্য দেশের অধিবাসীদের গরু রাখার কোনও দরকার নেই, কারণ তাঁরা যজ্ঞের কাজে দুধ ব্যবহার করেন না। তাই দেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা, সেই নীচবংশীয়দের ধন দেবতা যেন তাঁদের হস্তগত করার বাসনা পূর্ণ করেন।[২০]

ঋগ্বেদে পণি নামক মানবগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁরা ছিলেন আর্যসমাজের বহির্ভূত। পণিরা ছিলেন প্রধানত ব্যবসায়ী। তাই বিক্রয়কারী অর্থে 'পণিক্' বা 'বণিক্' এবং বিক্রয়যোগ্য পদার্থের নাম 'পণ্য' হয়েছে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। পণিরা দুগ্ধজাত সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা করতেন। দুধ থেকে তিন ধরণের বস্তু তাঁরা প্রস্তুত করতে পারতেন।[২১] বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে, এই তিন ধরনের বস্তু হল ক্ষীর, আজ্য (ঘি) এবং দধি। তবে এই সব বস্তু তৈরির কৌশল তাঁরা অন্যদের কাছে প্রকাশ করতেন না। পরে আর্যরা তাদের কাছ থেকে তা জেনে ফেলেছিলেন। ঋগ্বেদের মন্ত্র থেকে জানা যায় পণিরা দাস-দস্যুদেরই অন্তর্ভুক্ত।[২২] তাঁরা সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী ছিলেন বলেই আর্যদের চরম ঈর্ষার পাত্র হয়েছিলেন। দেবতার কাছে মন্ত্ররচয়িতারা পণিদের শক্তিহরণ, বুদ্ধিনাশ ও নিধন প্রাথনা করেছেন নিঃসঙ্কোচে। পণিগণকে তাঁদের কৃপণ ও আত্মকেন্দ্রিক বলেই মনে হয়েছে।[২৩]

ঋগ্বেদে আর্য ও অনার্য দাস-দস্যুর ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য ছিল বহু ধরনের। বস্তুত দাস-দস্যুরা ছিলেন ভিন্ন ধর্মের মানুষ। স্বাধীন ধর্মীয় জীবনযাপনের অপরাধে রকমারি গালিগালাজ জুটেছে তাদের কপালে। যেমন, দস্যুরা 'অকর্মন্'[২৪] অর্থাৎ আর্যপ্রথাবিহীন, 'অদেবয়ু'[২৫] অর্থাৎ আর্যদেবতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন। অনার্যদের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত 'অযজ্বন্'[২৬] ও 'অযজ্যু'[২৭] শব্দদুটি প্রমাণ করে দেয় তাঁদের জীবনে যাগযজ্ঞের কোনও স্থান ছিল না। 'অব্রত'[২৮] এবং 'অন্যব্রত'[২৯] শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে সহজেই জানা যায় আর্যদের মতো ব্রত তাঁদের নেই এবং তাঁরা হলেন ভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠানকারী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যাগযজ্ঞে অনার্যদের আস্থা ছিল না। বরং লিঙ্গোপসনার সঙ্গে তাঁদের যুক্ত থাকার প্রমাণ ঋগ্বেদেই সুলভ। ঋগ্বেদের 'শিশ্নদেব'[৩০] শব্দটি অনার্যদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ বিষয়ে পণ্ডিতদের মতপার্থক্য থাকলেও এই নামে যাঁদের বোঝানো হয়েছে তাঁরা যে যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। বেদভাষ্যকার সায়ন শব্দটিকে 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ' অর্থে ধরেছেন। অপরপক্ষে জার্মানি পণ্ডিত লুডভিগের (Ludwig) মতে 'শিশ্নদেব' বলতে লিঙ্গোপাসকদের বোঝায়।[৩১] পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্ লাসেন (Lassen) মনে করেন শিশ্নদেবরা শিবলিঙ্গের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত।[৩২] প্রসঙ্গত বলা যায়, লিঙ্গোপাসনা আর্যদের ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা অনার্যদের ধর্মাচরণের মধ্যেই পড়ে।

ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু উভয় গোষ্ঠীই যে আর্যদের শত্রু ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের সকলেই যে অনার্য ছিলেন সে ব্যাপারে পণ্ডিতেরা একমত নন। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা দস্যুদের অনার্যত্ব বিষয়ে যতখানি নিশ্চিত, দাসদের বিষয়ে ততটা নিঃসন্দেহ হতে পারেনিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাসদের দস্যুদের থেকে পৃথক বলে তাঁর মনে হয়েছে। তিনি আর্য ও দস্যুর সংঘর্ষকে যেভাবে দেখেছেন, আর্য ও দাসের লড়াইকে সেভাবে দেখেননি। আর্য ও দাসের যুদ্ধকে তিনি দুই আর্য জনগোষ্ঠীর সংঘাত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রীর 'বৈদিক কোষে'র ভিত্তিতে গণনা করে দাস ও দস্যুর পরাক্রমের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তাঁর মন্তব্য, " 'দাস' ও 'দস্যু' এই শব্দদুটির মধ্যে কোনটি কতবার এসেছে তার থেকে যদি কোন সিদ্ধান্ত টানা যায়, তাহলে মনে হবে সংখ্যায় অবশ্যই শক্তিশালী ছিলেন দস্যুরা। দস্যুদের উল্লেখ পাওয়া যায় চুরাশিবার, দাসদের একষট্টিবার।"[৩৩] একথা ঠিক যে 'দাস' ও 'দস্যু' এই দুটি নামই ভিন্নত্বের পরিচায়ক। আবার কখনও কখনও দুই আর্য গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠত। তাছাড়া অনেকে আর্যগোষ্ঠীভুক্ত হলেও যজ্ঞবিরোধী বলে গণ্য হতেন। এই সব ক্ষেত্রে এক আর্য

গোষ্ঠী অন্য আর্যগোষ্ঠীর প্রতি বিরোধী বোঝাতে 'দাস' শব্দের প্রয়োগ করতেন। কিন্তু ঋগ্বেদে এমনও দৃষ্টান্ত আছে যেখানে দস্যুরাই দাস নামে অভিহিত হয়েছেন,[৩৪] সেখানে দাস ও দস্যুর পার্থক্য করা হবে কীভাবে?

অনার্যেরা তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বত্র বহু সংখ্যায় বসবাস করতেন। আর্যদের আক্রমণের ফলে তাঁদের কোনও কোনও অংশ ক্রমশ দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। অনেকে নিজেদের জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণাকে রক্ষার জন্যে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোনও কোনও অনার্য গোষ্ঠী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তঃকলহে তাদেরই কোনও কোনও দল পরাজিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিল। আর্যসমাজের বিজয়ী অংশের কাছে আর্য ও অনার্য— এই উভয় পরাজিত অংশই হীন বলে গণ্য হয়েছিল। কখনও বা তাঁরা বাধ্য হয়ে দাসে পরিণত হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে সমাজে যখন বর্ণবিভাগের সৃষ্টি হল তখন এঁদের অবস্থান হল সর্বনিম্ন স্থানে। পরবর্তী সময়ের চতুর্বর্ণের সুস্পষ্ট রূপ ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত[৩৫] ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না। তবে বর্ণ বিভাগ যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ,[৩৬] ক্ষত্র[৩৭] বা ক্ষত্রিয়[৩৮] এবং বিশ্[৩৯]— এই শ্রেণিগুলির নাম থেকে। একটি সূক্তে[৪০] ব্রহ্মা (> ব্রাহ্মণ), রাজন্ (= ক্ষত্রিয়) এবং বিশ্ (> বৈশ্য)-এর স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় (তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবা নমন্তে যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি)। সুতরাং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ব্যতীত অন্যত্র বর্ণসমূহের উল্লেখ নেই— এই মত ভ্রান্ত। বর্ণসমূহের বিধিনিষেধের কাঠিন্যের প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বর্ণপ্রথার প্রচলন ছিল বলে অভিমত পাওয়া যায়।[৪১] ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তেই চতুর্বর্ণের এটি বর্ণ হিসাবে শূদ্রের নামোল্লেখ প্রথম দেখা যায়। সেখানে চতুর্বর্ণের সুস্পষ্ট রূপটিও প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগ শূদ্রের কাছে এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়। সেই থেকে আজও সর্বক্ষেত্রে অবিচার ও অস্পৃশ্যতার চক্রব্যূহ থেকে শূদ্রের বেরিয়ে আসার চেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে চলেছে।

## সূত্র-নির্দেশ :

১) Majumdar, R.C., Ancient Indian, Motilal Banarsidas, Delhi, 1988 (Reprint). pp. 29-30.

২) Winternitz. M., A History of Indian Literature, Vol. I, Part I, University of Calcutta, 1962, p. 55.

৩) Bloomfield, M., A Vedic Concordance, Motilal Banaraidas, 1990; Suryakanta, A Practical Vedic Dictionary, Oxford University Press, Delhi, 1981.

৪) অনির্বাণ, বেদ-মীমাংসা (প্রথম খণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা. ১৯৬১, পৃ. ৩৭।
৫) Macdonell, A.A. and Keith, A.B., Vedic Index of Names and Subjects (Vol. I), Motilal Banarsidas, Varanasi, 1958, p. 348.
৬) Ibid, p. 357.
৭) ব্যাসাম, এ.এল., অতীতের উজ্জ্বল ভারত (The Wonder that was India গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৬৮-২৬৯।
৮) Macdonell, A.A. and Keith, A.B., op. cit., Vol-II, p. 388.
৯) ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৫/৩৪/৬।
১০) তদেব, ৭/৮৬/৭।
১১) তদেব, ১/৪২/৪।
১২) সুকুমারী ভট্টাচার্য, বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩৪।
১৩) ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১/১০০/১৮।
১৪) তদেব, ৮/৯৬/১৮।
১৫) তদেব, ৬/৪৫/২৪।
১৬) তদেব, ৮/১৪/৮।
১৭) তদেব, ১০/১০৮।
১৮) তদেব, ১/৩১/৪; ৪/৩২/১০।
১৯) তদেব, ১/৩৩/৪।
২০) তদেব, ৩/৫৩/১৪।
২১) তদেব, ৪/৫৮/৪।
২২) তদেব, ৫/৩৪/৭; ৭/৬/৩।
২৩) তদেব, ৬/৬১/১; ১০/৬০/৬।
২৪) তদবে, ১০/২২/৮।
২৫) তদেব, ৮/৭০/১১।
২৬) তদেব, ৮/৭০/১১।
২৭) তদেব, ৭/৬/৩।
২৮) তদেব, ৯/৪১/২।
২৯) তদেব, ৮/৭০/১১।
৩০) তদেব, ৭/২১/৫; ১০/৯৯/৩।
৩১) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (প্রথম খণ্ড), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭।
৩২) তদেব।

৩৩) রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতে শূদ্র (Sudras in Ancient India গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ), কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৪।

৩৪) ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০/২২/৮।

৩৫) তদেব, ১০/৯০/১২।

৩৬) তদেব, ১/১৬৪/৪৫।

৩৭) তদেব, ৮/৩৫/১৭।

৩৮) তদেব, ৪/১২/৩; ৫/৬৯/১।

৩৯) তদেব, ৬/৮/৪।

৪০) তদেব, ৪/৫০/৮।

৪১) যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২১৯-২২০।

# প্রাচীন বঙ্গের উৎপন্ন শস্য— ফুল ও ফলের সমারোহের প্রতিচ্ছায়া

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

পাহাড় পর্বতে পরিবেষ্টিত দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ পরে তরঙ্গের জলরাশি ধৌত গঙ্গা, যমুনা, ভাগিরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, করোতোয়া, আত্রেয়ী, অজয়, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা, শীলাবতী, জলঙ্গী, মধুমতী, চন্দনা ইত্যাদি নামাঙ্কিত অগণিত নদ নদী প্লাবিত উর্বর বদ্বীপই পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ নামে পরিচিত।

নদীতীরে বা জঙ্গলের সন্নিকটে ও যোগাযোগের সংযোগস্থলে বসতি গড়ে ওঠে। জীবনধারণের প্রয়োজনে শিকার ও কাঠ সংগ্রহের সঙ্গে চাষবাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষিকার্যই প্রাচীন বঙ্গের জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা। লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে কৃষিজাত দ্রব্য ও ফুল-ফলের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষিজাত উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত যব, আখ, সরিষা, নারিকেল, সুপারি ও পান চাষের প্রভূত উল্লেখ আছে। বঙ্গের কাপাস বা তুলা চাষের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। উপরন্তু সুস্বাদু, সরস ফলের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। যথা- আম, জাম, ডালিম্ব, কলা, মধু, কাঁঠাল ইত্যাদি। আবার তরিতরকারির মধ্যে ঝিঙে, কুমড়া, কচু, বেগুন, ডুমুর, লাউ, লেবু ইত্যাদির নাম পাওঁয়া যায়। নানারকমের মাছ যেমন মৌরালা, বোয়াল ইত্যাদির সঙ্গে কাঁকড়ার উল্লেখও বিরল নয়।

প্রাচীন বঙ্গে ফুলেরও সমারোহ ছিল। বৃহৎ বৃক্ষরাজি ফুলে ফুলময় হয়ে দেশের সৌন্দর্য বর্ধন করতো। এ প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ কতিপয় ফুলের নামোল্লেখ করা হচ্ছে। যথা কেশর, কদম্ব, কণক, মাধবী, মল্লিকা, নাগকেশর, মালতী, পদ্ম, শিরিষ, কেতকী, কুমুদ, অশোক, প্রিয়ঙ্গু, বকুল, চুত, বঞ্জুল, লবঙ্গ ইত্যাদি।

লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে উপরিউক্ত শস্য, ফল ও ফুলের অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। সীমাবদ্ধ পরিসরে এই নিবন্ধ উপস্থাপনার জন্য কৃষিজাত বহুবিধ শস্য, তরিতরকারি, ফল ও ফুলের প্রাচুর্যের মধ্যে কেবলমাত্র ধান্য চাষ ও উৎপাদনের

ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। তাছাড়া জানা অজানা বিপুল ফুল সম্ভারের মধ্যে কতিপয় ফুলের কথা বলা হচ্ছে।

কৃষিজাত উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান চাষ ও ধান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বহুল নদ-নদী প্লাবিত বাংলার মাটির প্রভূত উর্বরতা, জলবায়ু ও বৃষ্টির প্রাচুর্যই ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনের সহায়ক। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিরিখে বঙ্গদেশ ও আদিপ্রস্তরযুগ (Paleolithic), মধ্যপ্রস্তরযুগ (Mesolithic), নব্যপ্রস্তরযুগ (Neolithic) সূক্ষ্মপ্রস্তরযুগ (Microlithic) ও তাম্র প্রস্তর যুগ (Chalcolithic) ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ধান্য উৎপাদনে বিষয়ে নিবন্ধকারের প্রোসিডিংস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের বোধগযায় ১৯৮১ সালে একটি প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধের শিরোণাম 'এ্যাম ইন্‌সাইট ইন্টু অ্যাগ্রোনমিক প্রোডাক্টস্ অব এ্যামসিয়ান্ট ইন্ডিয়া। তাছাড়া নিবন্ধকারের দি পিপল্ অ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল ঃ এ ষ্টাডি ইন ওরিজিনস্, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান, পৃ. ৮৮-৯১ এ বর্ণিত আছে।

যাই হোক ১৯৬২ সালে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে উৎখননের ফলে জানা গিয়েছে সেখানে কৃষিনির্ভর জনবসতি ছিল।[১] সেখানে মাটির পাত্রে ধানের তুষের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।[২] বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে যে উহা কৃষিজাত উৎপন্ন ধান্য। ঐ মৃৎপাত্রের তারিখ বি.সি. ১০১২ ± ১২১।[৩] আবার বীরভূমে মহিষদলে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত যে দগ্ধ চাল পাওয়া গিয়াছে তার তারিখ বৈজ্ঞানিক কার্বন বিশ্লেষণে নির্ধারিত হয়েছে বি.সি. ১৩৮০ ± ৮৫৫।[৪] এইভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসরে ধান চাষের নজির পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত রাজবাড়ীডাঙ্গায় প্রত্নতত্ত্ববিদ সুধীর রঞ্জন দাশের তত্ত্বাবধানে তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের ফলে জানা যায় যে, সেখানে সুবিশাল শস্যভাণ্ডারে পোড়া চাল ও গম মজুত ছিল। এই সুবিশাল শস্যভাণ্ডারে আগুন লেগে গিয়েছিল ও উহা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল।[৫] বৈজ্ঞনিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় জানা গিয়েছে সেখানে তিন রকমের চাল ছিল। যথা— মোটা, মাঝারি, খুব সূক্ষ্ম, সরু ও উন্নতমানের।[৬] গমের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ঐ গম উত্তর ভারতের গমের তুল্য ছিল। মনে হয় উত্তর ভারত থেকে গম চাষ পদ্ধতি বঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল।[৭] রেডিও কার্বন পদ্ধতির পরীক্ষায় নির্ধারিত হয়েছে যে, এই শস্যভাণ্ডার অষ্টম-নবম শতাব্দীর।[৮] উল্লেখনীয় এই যে,

চাল ও গম চাষের এই নির্ণীত তারিখ প্রথম প্রামাণ্য সাক্ষ্য।

লিখিত উপাদানেও ধান চাষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর বঙ্গ বিজয় পর্বের 'উৎখাত প্রতিরোপিত' শ্লোক ধান চাষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[৯] সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে কৃষিকার্যের অর্থাৎ ধান চাষের ও উৎপাদনের কথা উল্লিখিত আছে।[১০] আবার সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে ধান মাড়াই এর উঠান বা খামার, বলদের সাহায্যে ধান মাড়ানো বা ধানের গোলা বা মড়াই ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ ছবি একটি শ্লোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান।[১১] এই শ্লোকে বর্ণিত আছে— 'সস্ত্র খলো যদনুগমে বিত্তপেন গবাকৃত প্রবন্ধানাম বহুলকৃতে হিতফলঃ সঞ্চারো লোক ধান্যতো দৃষ্টাঃ খলোঃ ধান্য মর্দ্দনস্থানং খামারেতি।'[১২]

এইভাবে রামচরিতে প্রথম একটি বাংলা শব্দ 'খামারের' (অর্থাৎ যেখানে ধান মাড়াই করে রাখা হয়) উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩] সদুক্তিকর্ণামৃতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের ধান উৎপাদনের একটি চমৎকার দৃশ্য পরিস্ফুট। ('ব্রীহি স্তম্বকারিঃ প্রভূত পয়সঃ') অর্থাৎ প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে।[১৪] এতদ্ব্যতীত প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে বিশেষ করে সেন যুগের লেখতে ধান উৎপাদনের বহুল তথ্য উৎকীর্ণ আছে। এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বঙ্গের প্রাচীনতম মহাস্থানগড় লেখতে উল্লিখিত ধানের কথা বলা যেতে পারে। 'সংবঙ্গীয়ানম্ ...... ধানম্' উৎকীর্ণ লেখ থেকে ধানের গোলার কথা জানা যায়।[১৫] আরোও লক্ষণীয় এই যে প্রাচীন বঙ্গেও আজকের দিনের মতো নানা রকমের ধান উৎপন্ন হতো। অর্থশাস্ত্রে বহুবিধ ধানের নাম পাওয়া যায়। যেমন শালিধান্য, ব্রীথি, কদ্রয় ইত্যাদি।[১৬] এইসব ধান এখন উৎপন্ন হয় না বলেই অনুমিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কিছুদিন পূর্বেও সরু উৎকৃষ্ট সীতাশাল উৎপন্ন হতো। কিন্তু এখন প্রায় বিলুপ্ত। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে সরু সীতাশাল ধান পরিমাণে ফলন কম হওয়ায় ব্যবসার দিকে লক্ষ্য রেখে চাষী পরিমাণে যে বীজে ধানের ফলনের প্রাচুর্য দেখা যায়— তাহাই চাষ করে হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে সতের রকমের ধানের বীজের কথা পাওয়া যায়।[১৭] সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গে বহুরকমের অপূর্ব, সুন্দর ধানের বর্ণনা করেছেন।[১৮] রামচরিতে ও রঘুবংশে শালিধান্যের বিশদ বিবরণ আছে।[১৯] সদুক্তিকর্ণামৃতের শ্লোকে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙলার শালিধান্য সমৃদ্ধ অনবদ্য, মধুর বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। 'শালিচ্ছেদ সমৃদ্ধ হালিকাগৃহা ঃ - আঁটি আঁটি কাটা শালিধান্য আঙ্গিনায় স্তূপীকৃত হইয়াছে।[২০] রঘুবংশেও সেই একই ছবি চিত্রায়িত

হয়েছে। গাছের ছায়ায় বসে কৃষক শালিধান্য রক্ষার্থে পাহারা দিচ্ছে।[২১] চর্যাপদে 'কাগনী' নামে অন্য এক প্রকার ধানের বর্ণনা পাওয়া যায়। চর্যাপদে বর্ণিত আছে শবরজনগোষ্ঠী বাঁশের বেড়া দিয়ে শৃগালের হাত থেকে কাগনী ধান বাঁচাবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করছে।

'কঙ্গুচিনা পাকেলা রে
শবর-শবরী মাতেলা'।
কঙ্গুচিনাই কাগনী ধান।[২২]

সেন রাজত্বকালে সমতলভূমিতে কৃষিজমিতে শ্রেষ্ঠ ধান উৎপাদনের বহুল বর্ণনা পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর, শক্তিপুর ও কেশবসেনের ইদিলপুর ইত্যাদি লেখতে শালি ধান্যের ও শস্যক্ষেত্রের, কোথাও বা ধান উৎপাদনের জন্য মঙ্গলাচরণ বা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার শ্লোক উল্লেখনীয়।[২৩] এই 'শ্লোকে ধান্যোপজীবি বাঙালীর আন্তরিক আকুতি ধ্বনিত হয়েছে। ধান্য উৎপাদন একান্তভাবেই বারিনির্ভর। সেইজন্য দেখা যায় এই জনপদে খাল-বিল, নদ-নদী থাকা সত্ত্বেও ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে, নানা লোকায়ত ব্রত অনুষ্ঠানে, পূজা পদ্ধতিতে, চব্বিশ প্রহরে হরি সংকীর্তনে মেঘ ও আকাশের কাছে বারিপাতের জন্য প্রার্থনার উল্লেখ সর্বত্র বিরাজমান। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। বঙ্গদেশে প্রচুর বারিপাতের উল্লেখ লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে অসংখ্য লেখতে পাওয়া যায়। 'দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং'[২৪] তারই সাক্ষ্য বহন করে। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া ও তর্পণদীঘি তাম্রশাসনে প্রস্ফুটিত, সুপক্ক শালিধান্যের বর্ণনায় দেখা যায় 'হেমন্তর স্ফুটমেব ......... শালিশ্লাধ্য'[২৫] ......... এরই প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়েছে কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে।[২৬] এখন 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' প্রাচীন বঙ্গের লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে যে সকল ফুলের বর্ণনা ও নাম পাওয়া যায় তারই দু-একটির কথা বলছি। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে এসে বঙ্গদেশে প্রভূত ফল, ফুল, গুল্মলতা, ফুলের ঝোপ-ঝাড়ের কথা বলেছেন।[২৭] সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে, ধোয়ার পবনদূতে পূর্বে উল্লিখিত ফুলের সুন্দর বর্ণনা আছে। রামচরিতে কেশর ফুলের বর্ণনায় জানা যায়-- বরেন্দ্রীতে সারি সারি কেশর বৃক্ষ ও কেশর ফুলের সুগন্ধে মৌমাছি মধু আহরণের সন্ধানে গুণগুণ করে ঘুরে বেড়ায়। লাল আভাযুক্ত শুভ্র পদ্মের পাপড়ির মতন গোছা গোছা কেশরে মধু ভরা অপূর্ব এই কেশর ফুল।[২৮] রামচরিতে আরো বর্ণিত আছে বরেন্দ্রীর

সৌন্দর্য বহুরূপে সমৃদ্ধ আধফোটা কণক ফুলরাজিতে।[২৯] কণক ফুলকে ধুস্তুর বা চম্পকও বলা হয়েছে। চতুর্দিক ফুলে ফলময়। কেশর, কণক ও কেতক বরেন্দ্রের সৌন্দর্যের ছটা। ফুলের সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত চতুর্দিকে। তার মাঝে নানা ধরণের অসংখ্য লাল ও নীল পদ্ম প্রস্ফুটিত[৩০] ('endless varieties of lotuses - red and blue') বরেন্দ্রীর দিগ্‌ দিগন্ত মালতী, নাগকেশর ও শ্রেষ্ঠ সুন্দরতম বকুল ফুলের শোভায় ও সুগন্ধে আমোদিত হতো।[৩১] তদুপরি মধুক, অশোক, পারিজাত ও থোকা থোকা লবঙ্গলতার সৌন্দর্য ও সুগন্ধে চতুর্দিক সুশোভিত ছিল।[৩২] জয়দেবের গীতগোবিন্দে উল্লিখিত আছে বঙ্গদেশ তমাল, চুত, অশোক, বকুল, কিংশুক, বঞ্জুল বা অশোক, বাসন্তী, লবঙ্গ ফুলে চতুর্দিক মনোরম শোভা বর্ধন করছে।[৩৩] স্মরণ করিয়ে দেয় বিখ্যাত এই শ্লোক 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে।[৩৪] পাটলী কুসুমরাজি, মল্লিকা, লতিকা, মাধবীর ও বেতসলতা, পদ্ম, চন্দন বৃক্ষের উল্লেখও গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়।[৩৫] লক্ষণীয় বিষয় এই যে কবি বলছেন— 'মাধবীর আলিঙ্গনে সহকারতরু পুলকিত হইয়া মুকুলিত হইতেছে।[৩৬] এই প্রসঙ্গে রামচরিত উদ্ধৃত করে বলি প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, প্রিয়ালা ফুলে দেশ ভরপুর।[৩৭] প্রিয়ালা ফুলে দেশ ভরপুর লতার দ্বারা পুষ্করিনী বা জলাধার পরিবেষ্টিত।[৩৮] সে এক অমন্য সৌন্দর্য। দেশ করুণা, অশন ও নাগরঙ্গ বৃক্ষের শোভায় অলঙ্কৃত।[৩৯] এই সকল বৃক্ষের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেশের অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য বর্ধন করে।[৪০] প্রিয়ঙ্গু লতার কথা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। আরো বলা হয়েছে বরেন্দ্রীতে বিশাল, বৃহৎ সুমিষ্ট আমলকি বৃক্ষের উদ্যান বিদ্যমান ছিল।[৪১] এমন কি মহুয়া গাছের চাষের কথাও বলা হয়েছে।[৪২] শুধু মহুয়া নয় বরেন্দ্রীতে বা উত্তর বঙ্গে প্রচুর বাঁশ ঝাড় ও বাঁশ ঝাড়ের চাষের কথাও উল্লিখিত আছে।[৪৩] বড়ো বড়ো গাজরী, পর্কটী বা ডুমুর ও তাল গাছে তারি সঙ্গে বৃহৎ গজারি বৃক্ষের সারি বঙ্গের সৌন্দর্য বর্ধন করতো।[৪৪] এইভাবে বৃহৎ বৃক্ষের পাশাপাশি কতো রাশি রাশি গুল্মলতা ও ছোট ছোট সুন্দর নয়নভোলানো ফুলের চারাগাছেরও উল্লেখ আছে। সর্বোপরি তাৎপর্যপূর্ণ এই যে গীতগোবিন্দে তমাল[৪৫] গাছের অপূর্ব বর্ণনার প্রতিচ্ছায়া দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, বা দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা, গীতিময় তরুলতিকা[৪৬] ইত্যাদি কবিতায়। গীতগোবিন্দে মাধবীলতার বর্ণনায় যেখানে তরুলতা[৪৭] একে অন্য শাখাকে আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের প্রতিফলন হয়েছে, তারই অনুরণন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগণিত কবিতা ও সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে যেমন ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায় বা নীলাঞ্জম ছায়ায় ইত্যাদিতে[৪৮]। লিখিত উপাদান ছাড়াও প্রত্নতত্ত্বীয় লেখমালায়ও ফুলের কথা উৎকীর্ণ আছে। উল্লেখনীয়

এই যে নয়পালদেবের ইর্দা তাম্র শাসনে লিখিত আছে মেদিনীপুর জেলায় দাঁতন নামক অঞ্চলে দুত্তিবন্না গ্রাম মহুয়া চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল।[৪৯] আবার ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসনে পর্কটী অর্থাৎ ডুমুর গাছের কথা পাওয়া যায়।[৫০] তাছাড়া অজস্র লেখতে আম, জাম, কাঠাল, জামরুল ইত্যাদি সরস ফলের বৃক্ষের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে কেবলমাত্র পুষ্প বিকশিত বৃক্ষেরই অবতারণা করা হলো। প্রাচীন বঙ্গের উৎপন্ন শস্য ও ফুলের সমারোহের প্রতিচ্ছায় কেবলমাত্র ধান্য ও বহুল বিচিত্র বর্ণের, নানা গন্ধের ফুলের সমীক্ষার বিশ্লেষণে স্বভাবতই প্রশ্ন উত্থিত হয় এই কৃষিকার্য ও ধান্য নামক উৎপন্ন শস্য বঙ্গের কোন্ সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীর অবদান? এই প্রশ্নের সমাধানে ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের প্রত্নতত্ত্বীয় উৎখননের অবদানের সবিশেষ আলোচনা, ব্যাখ্যা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা রয়েছে নিবন্ধকারের প্রোসিডিংস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের বোধগয়া সেসনে অ্যান ইনসাইট ইন্টু এ্যাগ্রোনমিক প্রোডাক্টস্ নামক প্রবন্ধে। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মতে অস্ট্রিক ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কৃষিকার্য, কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি ও উৎপন্ন ফসল অস্ট্রিক ভাষার শব্দ থেকে উৎপন্ন ফসল অস্ট্রিক ভাষার শব্দ থেকে গৃহীত। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় লাঙ্গুল, তন্ডুল/চাল/চাউল ইত্যাদি।[৫১] কৃষিকার্য ও পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে যে চাষ করা হয় যাকে 'ঝুম' পদ্ধতি বলা হয় তা অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর অবদান।[৫২] আর এই কৃষকগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে ইন্দো-আর্য ভাষী জনগোষ্ঠী নয়। বঙ্গে আর্যীকরণের পর্যায়ে দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোতে এই কৃষকগোষ্ঠী নিম্নপর্যায়েই স্থান পেয়েছিল। এইভাবে ধান্য উৎপাদনের সঙ্গে বঙ্গে সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর বসতি ও সংস্কৃতি ওতোপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠী উর্ব্বরতন্ত্রে (fertility cult) বিশ্বাসী ছিল। কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরতার জন্য ঐ জনগোষ্ঠী নানারমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতো। যথা ক্ষেত্রপূজা, পৌষসংক্রান্তি, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি।[৫৩] ঐ সমস্ত লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে, পূজা পদ্ধতিতে ধান ও চাল একান্তই প্রয়োজন ছিল, আজও আছে। বর্তমানেও সমস্ত রকমের পূজা পদ্ধতিতে চাল ও ধান একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। এই কৃষিকার্য বিশেষ করে ধান বাঙালীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ধারক ও বাহক।

ফুলের সমারোহের উপরিউক্ত বিবরণী থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয যে, প্রাচীন বঙ্গের পরিবেশ দূষণমুক্ত করার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার সচেতনতা ছিল। গাছপালা পরিবৃত ভূখণ্ড একদিকে শস্যশ্যামলা, স্নিগ্ধ, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম পরিমণ্ডল গঠন

করে, অন্যদিকে শিল্প ও সৌন্দর্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে। শস্য উৎপাদনের জন্য যে বৃষ্টিপাত ও জলবায়ু প্রয়োজন তাতে গাছপালা, বনজঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। গাছপালা না থাকলে বায়ু দূষণমুক্ত হয় না। ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় বৃক্ষরাজির অবদান। বর্তমানে পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষ বাঁচানো নিয়ে নানা পরিকল্পনা ও আলোচনা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে তাই ধ্বনিত হয়েছিল 'দাও ফিরে সে অরণ্য'। সুশোভিত বৃক্ষ ও নয়নভোলানো পুষ্পকানন ছাড়া আমাদের সুস্থভাবে বাঁচার পথ নেই। গাছপালা, ফুল মানুষের মনকে স্নিগ্ধ সুন্দর, শান্তিপ্রিয় করে তুলতো। প্রাকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ নিবিড় যোগ স্থাপিত হতো। মানুষের মনকে চিন্তাশীল ও সৃজনশীল করে তোলে। মানুষের মনকে কল্পনা ও ভাবপ্রবণতায় ভরিয়ে সারল্য, স্বাচ্ছন্দ্য সুখ ও আনন্দমুখর করে তোলে। মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। হিংসা, দ্বেষ প্রশমিত করে। প্রাচীন বঙ্গে যে সুগন্ধ ফুলের বর্ণনা পাই তাও আজ বিরল। বিদেশী ফুলের শোভা ও সৌন্দর্য আছে কিন্তু সুগন্ধ নাই গন্ধের বৈচিত্রও নাই।

বাঙালীর সংস্কৃতিতে অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ধান ও ফুল অঙ্গাগীভাবে জড়িত। ধান ও ফুলের অবদান অনস্বীকার্য।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) পরেশ দাশগুপ্ত, দি এক্সাভেশন অ্যাট পান্ডুরাজার ঢিপি (কলিকাতা, ১৯৬৪), পৃ. ১৪, ১৬-২০।

২) তদেব, পৃ. ১৪।

৩) তদেব, পৃ. ১৯।

৪) এফ.আর. অলচিন, এ্যান্ড ব্রিজেট, দি বার্থ অব ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেন (পেনগুইন, লন্ডন, ১৯৬৮), পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৫) সুধীর রঞ্জন দাশ, রাজবাড়ীডাঙ্গা (কলিকাতা, ১৯৬৪), পৃ. ৪২।

৬) তদেব।

৭) তদেব।

৮) তদেব।

৯) রঘুবংশ, ক্যান্টো ফোর, পৃ. ৩৬-৩৭।

১০) টি. ওয়াটার্স (অনুবাদক), 'অন য়ুয়ান চোয়াংস ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া', ভল্যুম টু (লন্ডন, ১৯০৫, দিল্লী, ১৯৬১), পৃ. ১৮৪, ১৮৯, ১৯১, এস.বিল (অনুবাদক), সি.য়ু.কি, বুদ্ধিষ্ট রেকর্ডস অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ারল্ড, ভল্যুম টু, পৃ. ১৯১, ১৯৪ ১১৯-২০১।

১১) রমেশচন্দ্র মজুমদার, আর. জি. বসাক ও এম. জি. ব্যানার্জী (সম্পাদনা), রামচরিত অব সন্ধ্যাকরনন্দী (রাজশাহি, ১৯৩৯), কবিপ্রশস্তি ফাইভ, ১৩, পৃ. ১৮৯-১৯০।

১২) তদেব।

১৩) তদেব।

১৪) শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃত এডিটেড সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী (কলিকাতা, ১৯৬৪), ২/৮৪/৩, নীহার রঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (কলিকাতা, ১৯৮০), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

১৫) এস.কে মাইতি এ্যান্ড আর আর মুখার্জী, করপাস অব বেঙ্গল, ইন্সক্রিপসন্স্ বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এ্যান্ড সিভিলাইজেনসন অব বেঙ্গল, (কলিকাতা, ১৯৬৭), পৃ. ৩৯-৪১, দীনেশ চন্দ্র সরকার, সিলেক্ট ইন্সক্রিপসন্স্ বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন (কলিকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ৮২।

১৬) আর সামশাস্ত্রী (অনুবাদক) অর্থশাস্ত্র (মাইশোর, ১৯৬৭), বুক ফোর, পৃ. ১৩১।

১৭) হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণি, ফোর, ২৩৩; জার্নাল অব দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, ভল্যুম ৬১, ১৯৪১, পৃ. ১৬৬-১৭১।

১৮) মজুমদার, বসাক এ্যান্ড আদার্স, রামচরিত তৃতীয়, ভার্স ১৭বি, পৃ. ৯১।

১৯) নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ভল্যুম ওয়ান, পৃ. ১৭৬।

২০) শ্রীধরদাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৮৪/৩, ২/১৩৬/৫, নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

২১) নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬।

২২) চর্যাগীতি, শবরপাদ, নং ৫০, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১৭।

২৩) ননী গোপাল মজুমদার, ইন্সক্রিপসনস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম থার্ড (রাজশাহি, ১৯২৯), পৃ. ৮৫. ৮৯-৯০ আনুলিয়া কপার প্লেট অব লক্ষ্মণ সেন), পৃ. ৯৪ (গোবিন্দপুর লেখ), পৃ. ১০১ (তর্পণদিঘি লেখ), পৃ. ১১৬ (কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন)।

২৪) মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০ (রামগড় কপার প্লেট অব মহীপাল)।

২৫) ননী গোপাল মজুমদার. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫ (আনুলিয়া লেখ), ১০১ (তর্পণদীঘি লেখ)।

২৬) তদেব, পৃ. ১২৯ এফ.এফ.।

২৭) টি. ওয়াটার্স (অনুবাদক), পূর্বোক্ত ভল্যুম টু, পৃ. ১৮৪, ১৮৯-১৯১, বিল, পূর্বোক্ত ভল্যুম টু, ১৯১, ১৯৪, ১১৯-২০১।

২৮) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বসাক ও অন্যান্য, রামচরিত, থ্রি, ২১বি, পৃ. ৮৪।

২৯) তদেব, থ্রি, ফাইব, ২২বি, পৃ. ৯৫।

৩০) তদেব।

৩১) তদেব, দ্বিতীয়, ফাইব, ২২, পৃ. ৫৫।

৩২) তদেব।

৩৩) 'লক্ষ্মীনারায়ণ', গীতগোবিন্দ অব জয়দেব, পৃ. ২৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৭; সুকুমার সেন, গীতগোবিন্দ অব জয়দেব, পৃ. ১, ৮, ১২ এফ.এফ.।

৩৪) সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৩৫) সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯, ১০, ৩৩, ৪৯, ৪৪।

৩৬) তদেব পৃ. ১০।

৩৭) রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্যেরা রামচরিত, থ্রি, ফাইব, ১৮, পৃ. ৯২-৯৩, দুই, ভার্স ২২, পৃ. ৫৫।

৩৮) তদেব, থ্রি, ফাইব, ১৬, পৃ. ৯০, ফাইব, ১৯, পৃ. ৯৩, ফাইব, পৃ. ৮৮।

৩৯) তদেব।

৪০) তদেব, থ্রি, ফাইব, ১৩, পৃ. ৮৮।

৪১) তদেব, থ্রি, ফাইব, ১৬, পৃ. ১৯০।

৪২) তদেব, থ্রি, ফাইব, ২১, পৃ. ৮৪।

৪৩) তদেব, থ্রি, ভার্স ১৭, পৃ. ৯১।

৪৪) তদেব, ১, ফাইব, ২১বি, পৃ. ১৭; ৪, ভাস-৩৪ এ পৃ. ১৪১।

৪৫) 'লক্ষ্মীনারায়ণ, গীতগোবিন্দ অব জয়দেব, পৃ. ২৭, ৪২ তমালতরু।

৪৬) রবীন্দ্রনাথঠাকুর, গীতবিতান (বিশ্বভারতী, কলিকাতা-১৩৮৫), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।

৪৭) সুকুমার সেন, গীতগোবিন্দ অব জয়দেব, পৃ. ১০।

৪৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা-১৪০৪, পৃ. ৬১৯।

৪৯) এপিগ্রাফিয়া অব ইন্ডিকা, ভল্যুম ২১, পৃ. ১৫০ এফ.এফ.; নীহার রঞ্জন রায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৮৫।

৫০) মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, করপাস অব বেঙ্গল ইন্সক্রিপসন্‌স্‌, পৃ. ৮০-৮২।

৫১) প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, প্রি এ্যারিয়ান এ্যান্ড প্রি দ্রাবিড়িয়ান ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ১৯ (XIX), ২১-২৮ (XXI-XXVIII), ১০-১২, ১০৮ ইত্যাদি, সুনীতি কুমার চটোপাধ্যায়, দি ওরিজিন এ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যানগুয়েজ, ভল্যুম থ্রি (কলিকাতা-১৯৮৫) পৃ. ১৪ (বাগচী মহাশয় 'লাঙ্গুল' শব্দটির অস্ট্রো এশিয়াটিক উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন); অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশনে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস-ডাইভার্স এপ্রো কালচারাল ট্রেন্ডস ইন্টু এ্যানসিয়ান্ট বেঙ্গল ঃ এ স্টাডি অব প্রেসেসেস্‌ অব অ্যাকালচারেশন্‌স্‌ (কলিকাতা, ২০০৪) পৃ. ৪৫, রেফারেস ৪৫।

৫২) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ইন্দো অ্যারিয়ান এ্যান্ড হিন্দি (রিপ্রিন্ট, কলিকাতা, ১৯৬৯), পৃ. ৩৮; দি ওরিজিন এ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যানগুয়েজ, ভল্যুম থ্রি, পৃ. ১৪ (ঝুম, কার্যের জন্য); শরৎ চন্দ্র রায়, স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়ান এ্যানথ্রোপলজি (কলিকাতা, ১৯৬৬) পৃ. ৫১, ৫৩, টেরাস (terrace) কৃষিকার্যের জন্য।

৫৩) সুধীর রঞ্জন দাশ, ফোক রিলিজন অব বেঙ্গল এ ষ্টাডি অব দি ব্রত রাইটস পার্ট ওয়ান নং-১ (কলিকাতা, ১৯৫৩), পৃ. ১১-১৩, ২৬-২৭, ম্যান ইন ইন্ডিয়া, ভল্যুম ৩২, (১৯৫২) নং ৪, পৃ. ২২৬-২২৭, (বাংলার অসংখ্য ব্রত রীতি নীতি আলোচিত— উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্মীপূজা অ-লক্ষ্মীপূজা প্রাচীন কৃষি পূজা পদ্ধতি আর্যেতর শস্য দেবী); অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস অনুসন্ধান, ১৪ খণ্ড (কলিকাতা, ২০০০), মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অবদানের নিরীক্ষা, পৃ. ১৫৬ (উর্বরতন্ত্র fertility cult); নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৮০), পৃ. ৮৯৮-৮৯৯।

# প্রাক্—ইতিহাসের বীরভূম

বনানী ভট্টাচার্য্য

বীরভূম—রাঢ় বঙ্গের এই জেলাটি ভারতের পূর্ব মালভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানচিত্রে জেলাটিকে দেখতে অনেকটা উল্টানো ফানেলের মতন লাগে। দক্ষিণ সীমানায় প্রবাহিত অজয়, এই জেলাকে বর্ধমান জেলা থেকে পৃথক করেছে। এই জেলার পূর্বদিকে রয়েছে গঙ্গাবিধৌত সমভূমি অঞ্চল এবং পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার উষর পার্বত্য অঞ্চল, জেলার অধিকাংশ এলাকাই উচু-নীচু লাল মাটির অন্তর্গত। মূল প্রবাহিত নদীগুলি হল ময়ূরাক্ষী, হিঙ্গলা, বক্রেশ্বর, মাল-কোপাই, দ্বারকা এবং ব্রাহ্মনী। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত এই নদীগুলির অধিকাংশ সাঁওতাল পরগনার উচ্চভূমি থেকে উৎসারিত হয়ে, গঙ্গা-ভাগীরথীর 'মৃতপ্রায় বদ্বীপ' অঞ্চলে এসে মিশেছে।

বীরভূমের প্রাগৈতিহাসিক কালের রূপরেখা টানতে গেলে দেখা যায় যে শিকারী সংগ্রাহক জনগোষ্ঠী আদি পুরাপ্রস্তর যুগ (Lower Palaeolithic) থেকে এই অঞ্চলে বিচরণ করত এবং প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে বিবর্তনের ধারা বেয়ে তা ঐতিহাসিক পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্র প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে আদি ঐতিহাসিক পর্বের উত্তোরণের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

বীরভূম থেকে এখনও পর্যন্ত সব থেকে পুরানো যে সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তা আদি পুরাপ্রস্থর যুগের অ্যাশুলিয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। মূলত উত্তর-পশ্চিম বীরভূমের চিলা নালার সদর ঘাট থেকে এই নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইতিপূর্বে এই জেলার সিউড়ীর জীবধরপুর অঞ্চল থেকে পুরা প্রস্থর যুগের হাত কুঠার হিসাবে ব্যাখ্যায়িত কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে[১] বটে, তবে এর কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়নি, বা পরবর্তীকালে প্রত্মতাত্ত্বিক এক্সপ্লোরেশনেও এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

মলুটি সদরঘাটে— ৩টি প্রত্নাঞ্চল থেকে পাথরের ছাঁট (ওয়েস্ট মেটেরিয়াল) সহ হ্যান্ড এক্স, ক্লীভার, চপার, স্ক্র্যাপার, বোরার, ব্লেড, বিউবিনের নিদর্শন পাওয়া গেছে[২] যা এই অ্যাশুলিয় সংস্কৃতির শেষ পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তীপর্বে যে সংস্কৃতির সূচনা ঘটে তা হল মধ্যপুরা প্রস্তরযুগ বা Middle Palaeolithic যা একান্তভাবেই ছিল Flake based তথা শল্ক নির্ভর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় আজ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে ভারতে এর সূচনা ঘটে এবং কাল ব্যাপ্তি ছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত।

বীরভূমে চিলা নালার মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে এই সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৩] প্রাপ্ত পাথরের হাতিয়ারগুলি হল স্ক্রাপার, পয়েন্ট, বোরার নচ্‌চ প্রভৃতি। হাতিয়ারের ছাঁটের (ওয়েস্ট মেটেরিয়ালের) আধিক্য প্রমাণ করে এখানে মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার তৈরীর স্থান ছিল।

সিউড়ী থেকে ১২ কি.মি. উত্তর দিকে হাতগাছা মৌজার মহম্মদবাজার এলাকা থেকে এই পর্বের আরও কিছু পাথরের হাতিযার পাওয়া গেছে টার্সিয়ারী ভূস্তরে।[৪] যা প্রমাণ করে যে, এই জেলায় শিকারী সংগ্রাহক গোষ্ঠীর আগমন কতটা প্রাচীন। এই স্তর থেকে যে হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে তা হল মূলত স্ক্রাপার, বোরার, নচ্‌চ, বিউরিন, ফ্লেক-ব্লেড, ব্লেড এবং ওয়েস্ট মেটেরিয়াল। অবশ্য এই হাতিয়ারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মধ্যপুরা প্রস্তর সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এটি ছিল শেষপুরা প্রস্তর যুগ (upper Palaeolithic) ও মধ্যপুরা প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বিবর্তনের ধারা বেয়ে পরবর্তী যে যুগের সূচনা ঘটেছিল তা হল শেষপুরা প্রস্তর যুগ। এই সময়ের মানুষ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তা হল হোমোস্যাপিয়েন স্যাপিয়েন্স তথা প্রাজ্ঞ মানুষ। এই সংস্কৃতিতে হাতিয়ার তৈরীর ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্তী পর্যায়ের থেকে ব্লেডের ব্যবহার অনেক বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। নতুনভাবে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন রকম তীক্ষ্ণাগ্র বা Point। ভারতবর্ষে এই সংস্কৃতির কালসীমা ছিল ২০,০০০-১০,০০০ বছর আগে। পশ্চিমবঙ্গে ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সংস্কৃতির বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি এবং হাতিয়ারগুলি মূলত ফ্লেক ব্লেড প্রযুক্তিতে নির্মিত। বীরভূমে পারুলডাঙ্গা থেকে যে হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে যে এখানে এই সংস্কৃতিতে ফ্লেকের তৈরী হাতিয়ারগুলির ব্লেড নির্মিত হাতিয়ার প্রযুক্তিতে উত্তরণ ঘটেছিল।[৫] পারুলডাঙ্গার হাতিয়ার যা পাওয়া গেছে তাতে পাথরের পাশাপাশি হাড়ের তৈরী হাতিয়ারও রয়েছে। পাথরের ব্লেড, পয়েন্ট, নাইফ, বিউরিণ ছাড়াও অজস্র মাত্রায় পাওয়া গেছে পাথরের ওয়েস্ট মেটেরিয়াল। যে স্তর থেকে হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেটি আজ থেকে ১২,০০০ বছর আগের।

যুগ বিচারে পরবর্তী যুগ হল মধ্যপ্রস্তর যুগ বা Mesolithic। এই সময়ের শিকারী সংগ্রাহক জনগোষ্ঠী তাদের পূর্বজদের তুলায় অনেক সহজে ও স্বচ্ছন্দে পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল। এই সংস্কৃতির বিশেষত্ব হল ছোট পাথরের হাতিয়ার। মোটামুটিভাবে আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে এই সংস্কৃতির সূচনা ঘটেছিল। বীরভূমে এই সংগ্রাহক গোষ্ঠীর মানুষরা অজয়, বক্রেশ্বর, কোপাই অঞ্চলে খাদ্যসংস্থানের জন্য এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। শান্তিনিকেতন সংলগ্ন উচ্চভূমির পারুলডাঙ্গা, শ্যামবাটি, চীপকুটি, ডিয়ার পার্ক ও বল্লভপুর—অজয়, ময়ূরাক্ষী ও কোপাই বক্রেশ্বরের ১৫ কি.মি. অঞ্চলে। পারুলডাঙ্গায় পরীক্ষামূলক উৎখনন থেকে দেখা গেছে যে ৩টি পর্যায়ে এখানে বসতি গড়ে উঠেছিল।[৬] প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এটি ছিল হাতিয়ার তৈরীর অঞ্চল তথা Industry Site। হাতিয়ারগুলি হল ব্লেড, লুনেট, পয়েন্ট, বোরার, বিউরিণ, স্ক্র্যাপার, নট্‌চ, ফ্লেক। মধ্যপ্রস্তর যুগের পরবর্তী যুগটি হল নব্যপ্রস্তর যুগ। পশ্চিমবঙ্গে এই যুগে উত্তরণের পর্যায়টি যত না বিশ্লেষণধর্মী তার থেকে অনেক বেশী অনুমানভিত্তিক। নব্যপ্রস্তর যুগ হল সেই পর্যায় যখন বিভিন্ন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠনের দিকে এগিয়েছিল, শুরু করেছিল নিয়মিত চাষবাসের মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন। এই পর্যায়টি তামার যুগের সূচনা পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। বীরভূমে এই পর্যায়ের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনও পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয় (প্রাপ্ত প্রমাণের অভাব) বরং তাম্রপ্রস্তর যুগে কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে অনেক কিছু জানা গেছে। এই পর্যায়ে গ্রাম্যবসতির বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সময়ের মানুষরা নদী বিধৌত পলিমাটি গঠিত অঞ্চলে বিচরণ করত, তাদের পারস্পরিক গ্রামবসতির দূরত্ব ছিল প্রায় ৫ কি.মি. এর মধ্যে।[৭] এবং প্রতিটি গ্রাম ৪-৬ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। নানুর, মহিষদল, হরাইপুর, বাহিরী, হাতিকরা, কোটামুরে উৎখনন থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা এই জেলার প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনধারার এক চিত্র তুলে ধরে।

এই যুগের সব থেকে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে এই জেলার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল থেকে। এখানে দীর্ঘদিনের বসতিচিহ্ন পাওয়া গেছে যা একটির উপর আর একটি গড়ে উঠেছিল (ব্যতিক্রম মহিষদল)। বীরভূমের এই সংস্কৃতির দুটি পর্যায়ে দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে তামার উপস্থিতি লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তামার সঙ্গে লোহার ব্যবহারের প্রয়োগ ঘটেছিল।

দক্ষিণবঙ্গের নদী উপত্যকায় প্রথমদিকে কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর উদ্ভব কিভাবে হল

তা ঠিক স্পষ্ট নয়। এরা তামার পাশাপাশি পাথরের হাতিয়ারও ব্যবহার করত। বসতিগুলি থেকে অনতিদূরেই ছিল তামার উৎস কিন্তু প্রশ্ন আসে তৎস্বত্ত্বেও এই ধাতুর ব্যবহারিক প্রাচুর্য কিন্তু সেভাবে চোখে পড়ে না। সম্ভবত এই সময়ের বসতিগুলির মধ্যে আন্ত গ্রাম্য বস্তু আদান প্রদানের সম্পর্ক ছিল, যার মাধ্যমে এক গ্রামের জিনিস অন্য গ্রামে অন্য জিনিসের বিনিময়ে আমদানী করা হয়, প্রতিটি গ্রাম বসতির তাদের নিজস্ব কৃষিজমি ছিল। মূলত বন্যা প্লাবিত অঞ্চলগুলিতে এই বসতিগুলি গড়ে উঠেছিল যা উর্বর জমিকে কৃষির কাজে লাগানো যেতে পারে। মহিষদল উৎখনন থেকে পোড়া চালের নিদর্শন পাওয়া গেছে যার পরিমান ছিল প্রায় ৯০০ কে.জি.। অধ্যাপক ঘোষ দেখিয়েছেন যে বছরে প্রায় ১৮০ কুইন্টাল ধান উৎপন্ন করা হত এবং তার জন্য প্রয়োজন ছিল ৭২ একর কৃষি জমির এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০০ বর্গ মি. জায়গায় প্রায় ১৫০-৩০০, তবে সবকটি বসতিই যে সমান বড় ছিল তা নয়। গড় লোকসংখ্যা যদি গ্রাম প্রতি ২০০ও ধরা হয় তবে এই পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা ১০,০০০ এর বেশী ছিল না। বীরভূমের এই পর্যায়ের নিদর্শন যেহেতু তুলামূলকভাবে বেশী তাই সম্ভবত এর লোকসংখ্যা ছিল ৬০০০-৭০০০।[৯]

মহিষদলে উৎখননের ভিত্তিতে বলা যায় এই সময়ে এই অঞ্চলের লোকেদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। প্রাপ্ত পোড়া চালের নমুনা পরীক্ষা করে জানা গেছে তা মূলত বুনো Oryza Sativa গোষ্ঠীজাত। এছাড়া ছিল পশুপালন। পশুর পোড়া হাড় থেকে জানা গেছে যে এই সময়ে কুঁজ বিশিষ্ট ষাঁড়, মোষ, ভেড়া, শুয়োর, নীলগাই সম্ভবত বুনো বিড়াল, নেকড়ের অস্তিত্ব ছিল।[১০] মাছ, কচ্ছপ, শামুকও খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই জনগোষ্ঠীর লোকজন মাটির বড়িতে বসবাস করত। একটি বাড়িতে একটি পরিবারই থাকত এবং বাড়িগুলি ছিল আয়তনে ছোট। জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিজমির নিরীখে বলা যেতে পারে একটি পরিবারে অন্তত দশজন থাকত। মাটি পিটিয়ে মেঝে করা হত। বাড়িগুলি ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও অস্থায়ী।

তাম্রপ্রস্থর যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। হাতিকরা, মহিষদল প্রভৃতি প্রত্নাঞ্চলের দ্বিতীয় পর্যায়ে লোহার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, এরা তুলনামূলকভাবে উন্নত লোহার ব্যবহার জানা জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত ছিল, যা এই অঞ্চলের তাম্রপ্রস্থর সংস্কৃতিতে ব্যাপক

পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে যে কালসীমা পাওয়া গেছে তার থেকে বলা যায় এই সংস্কৃতি ৭০০ বছরের বেশী স্থায়ী হয়েছিল। এর পরবর্তী পর্ব হল আদি ঐতিহাসিক পর্বে উত্তরণের ইতিহাস, সেটি অন্য অধ্যায়।

### সূত্র নির্দেশ ঃ

১) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিক্যাল রিভিউ ১৯৬৯।

২) সুব্রত চক্রবর্তী ১৯৯৯ কোয়াটানরী এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড আর্কিওলজি ইন বীরভূম, অ্যাসোসিয়েশন অফ হিস্ট্রী অ্যান্ড আর্কিওলজি, কলকাতা, ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারী।

৩) সুব্রত চক্রবর্তী ২০০১ প্রিহিস্ট্রী ইন বেঙ্গল, প্রগ্রেস অ্যান্ড রিগ্রেস অ্যাট দ্য ক্লোজ অফ দ্য টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরী, দ্য প্রফেসর ধরণী সেন মেমোরিয়াল লেকচার, ৮ জুন ২০০১, কলকাতা, অ্যানথ্রোপলজিকাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া।

৪) ঐ

৫) ঐ

৬) সুব্রত চক্রবর্তী ১৯৯৯ দ্য কনটেক্স্ট, ক্যারাকটার অ্যান্ড ক্রোনোলজি অফ মাইক্রোলিথস ফ্রম পারুলডাঙ্গা, ব্যুলেটিন অফ ডেকান কলেজ পোস্ট গ্র্যাজুয়েন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৫৪-৫৯ (১৯৯৮-১৯৯৯) : ৩-১০।

৭) অরুণ নাগ

৮) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিকার রিভিউ ১৯৬৭, ৬৯, ৮২, ৮৪।

৯) আর.এন. ঘোষ ও এস মজুমদার ১৯৯১ জিওলজিকাল অ্যান্ড মরফোস্ট্র্যাটিগ্রাফি ওফ ওয়েস্টবেঙ্গল : এ ডাটা বেস ফর আর্কিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন, স্টাডিও ইন আর্কিওলজি (এ. দত্ত এডিঃ) পৃ. ৭-৩৭, নিউদিল্লী : বুক্স অ্যান্ড বুকস।

১০) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিকাল রিভিউ, ১৯৬১।

# সারাংশ

## সভ্যতার ইতিহাস ও লোহা

**বলরাম মজুমদার**

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বহু পুরাতন। প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে, দিনে দিনে নব্য প্রস্তর যুগ পার হয়ে এসেছে। ধাতব পদার্থের আবিষ্কার ও ব্যবহার তার জীবনে দিয়েছে গতি। সম্পদ ও সুরক্ষা যে ধাতব পদার্থটি তাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে সেটি হল - লোহা।

খনিজ পদার্থ থেকে লোহা নিষ্কাশন ও তাকে নির্দ্দিষ্ট আকারের অস্ত্র তৈরী করা সভ্যতার ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। কুড়ুল ও তরবারী নগরায়ন এবং জীবন রক্ষায় ছিল সহায়ক।

আর্কিয়োলজিস্টরা মাটির নিচে থাকা বিভিন্ন যুগে লোহার তৈরী সরঞ্জাম পুংখানুপুঙ্খ রূপে বিচার করে নানা রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধুসভ্যতার যুগে লোহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। নৃতত্ত্ববিদরা পুরাতন গ্রন্থ মহাভারত, রামায়ণে লোহার ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছে অনেক।

সুলতানী ও মোঘল আমলে লোহা হয়ে ওঠে সাধারণের সামগ্রী। বাবরের ইস্পাত তৈরী কামান ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়ক। পরবর্ত্তীকালে আকবর ইস্পাতের তৈরী কামানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেন।

পর্তুগীজ ও ইংরেজদের আগমনে ভারতবাসীর দৃষ্টি পড়ে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের দিকে। শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক লোহা ও ইস্পাত উৎপাদন। বিদেশীদের লোহা ও ইস্পাতের চাহিদা ছিল অনেক।

বিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞানীরা জানতে পারে লোহার প্রয়োজন যেমন শিল্পে তেমনি প্রয়োজন মানুষের সুস্থ শরীরে বাঁচার তাগিদে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে মানুষকে। গড় পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বলা চলে - মানুষের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে লোহা এক বিশেষ উপাদান।

# সমাজ সংস্কারক তথাগত

সঙ্গীতা ঝা

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কপিলাবস্তুর এক অভিজাত পরিবারে সিদ্ধার্থের জন্ম। গৌতম গোত্রজাত বলে তাঁর আর এক নাম গৌত্র। অতি সংবেদনশীল সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তুর রাজপথে সৌম্যকান্তি এক সন্ন্যাসী দর্শন করে উপলব্ধি করেন সন্ন্যাসেই দুঃখমুক্তি। তাই ২৯ বছর বয়সে স্ত্রী-পুত্র সংসার ত্যাগ করে প্রথমে সফল না হওয়ায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করে গয়ায় অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে তিনি সত্যজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ বা তথাগত নামে খ্যাত হন।

যে যুগে বুদ্ধের জন্ম সে যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান ধর্মাচার্য্যের প্রয়োজন ছিল। সে সময় পুরোহিতগণ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য নিজেদের অনুমোদিত উপাসনা পদ্ধতি তৈরী করে। তিনি দেখলেন কিভাবে জনসাধারণ পুরোহিতদের ভুলপথে চালিত হচ্ছেনা এবং পুরোহিতগণ কিভাবে ক্রমশ শক্তিমত্ত হয়ে উঠছেন। তিনি এর বিহিত করতে উদ্যত হলেন। কারও উপর কোনরকম আধিপত্য বিস্তার না করে তিনি মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সবরকম বন্ধন চূর্ণ করতে উদ্যত হলেন।

মহান বুদ্ধ ছিলেন একজন নীতিবিদ ও সংস্কারক। তিনি সমস্ত তাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার করে মানবজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করেন, মানুষকে দুঃখ নিবৃত্তির পথের সন্ধান দেওযাই ছিল তার লক্ষ্য।

বুদ্ধদেব ছিলেন মহামানব, তিনি মানুষে মানুষে অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেন সবপ্রাণী সমান। তিনি প্রথম মদ্যপান বন্ধ করার নীতি উপস্থাপন করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে তার মত হল যদি ঈশ্বর থাকেন তবে সততার মাধ্যমেই তাকে লাভ করা যায়। তাই তিনি তাঁর পঞ্চশীলের মাধ্যমে মানুষকে সৎ হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

গৌতমবুদ্ধ অহিংসাকে কায়মনোবাক্যে পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা অহিংসার দ্বারাই সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। মিথ্যাভাষণ, পরদ্রব্য হরণ ও ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি হল হিংসার প্রকাশ যা সমাজকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই সুস্থ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে তিনি অহিংসা,

সৎ আচরণ ও সৎ জীবনের কথা বলেছেন। তার অহিংসার এক সামাজিক তাৎপর্যও ছিল। কারণ সে যুগে যাগযজ্ঞের কারণে প্রচুর পশুহত্যা করা হত। তাই তিনি দরিদ্র কৃষকদের দিকে চেয়েই অহিংসার কথা বলেছেন।

বেকারী নষ্ট করাকে প্রকৃত যজ্ঞ বলে বর্ণনা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চক্রবর্তী ব্রত বলে একটি ব্রতের উল্লেখ করেছেন।

সমাজে নারীদের সর্ম্পকে বুদ্ধেব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। নারীদের গৃহকোণ ছেড়ে সবরকম কাজে যোগদানের অধিকার তিনি স্বীকার করেন। তিনি নারীদের ভিক্ষুণীসংঘ গঠনের অনুমোদন দেন। বুদ্ধের ধর্ম মার্গে নারীদের স্থান পুরুষদের সমান ছিল।

বর্তমানে ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ, ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ নিধন, নারীদের প্রতি অশালীন আচরণ, নারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধ, ধর্ষণ ও খুন, বাজার অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নারীদের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা- এইগুলি সামাজিক অবমূল্যায়নের পরিচায়ক। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র বুদ্ধের নির্দেশিত পথই সঠিক পথ, কারণ বৌদ্ধ ধর্মই জগতের সার্বভৌম ধর্মের প্রথম অভিব্যক্তি যেখানে রয়েছে মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সমাজে সকলের সমানাধিকার।

# জৈন মননশীল চেতনায় কেবলীন মানব ইতিহাস বীক্ষা — একটি বিশ্লেষণাত্মক সন্ধানের অভিযাত্রা

**অভিষেক অধিকারী**

জিনের ধূলোটে ক্যানভাসকে কিছুটা আলোকিত করণের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রবন্ধের সুলুক সন্ধান। জৈনচিন্তাধারা সুপ্রাচীন কাল হতে ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। ইহা কোন নবীন প্রতিবাদী ধর্ম নয়, বেদ, পুরাণ মতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋষভনাথ থেকে এই অহর্তা ধারার উৎপত্তি। অন্যান্য তীর্থঙ্করদের বর্ণনাও যজুর্বেদ, পুরাণাদিতে উল্লেখিত হয়। .ঋষভের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এবং প্রাচীন অসুর শ্রমণ - যাজ্ঞিক আর্য বিরোধের পটভূমি ব্যাখ্যা তো হল। প্রাক মহাবীর পর্বে দেশীয় মনস্তত্ব, মহাবীরের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, মহাবীরের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব ও ধর্মগ্রন্থ সহ গণতন্ত্রের প্রাচীনত্ব ব্যাখ্যা তো হল। মহাবীরের পরিব্রাজনের সারণি, ধর্মে গণধরপ্রথা

সহ ভবিষ্যত বিভাগ বর্ণিত হল। মহাবীরের সাথে আজীবিক, হস্তি উপাসক, বহুরত সম্প্রদায় বিরোধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জৈন প্রভাবে ব্যাখ্যাত হল। আদি জৈনধর্ম ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তারের প্রমাণ কাশ্মীর সহ উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্যে সিংহল পর্যন্ত দেখানো হল। এছাড়া বর্হিভারতে চীন-মধ্যএশিয়া, মিশর, সুমের অঞ্চলে জৈনধর্ম বিস্তারের প্রমাণ দেখিয়ে বর্তমান দেবদেবী ও শ্রাবক জাতিতে জৈন প্রভাব দেখানো হল। তিব্বত, বাশিয়ায় ও ফিনল্যান্ডে জৈনপ্রভাব দেখিয়েও ঋষভ থেকে অসুর বংশ উৎপত্তি, মধ্যপ্রাচ্যে তীর্থঙ্করদের পূজা, আসীরীয় সংস্কৃতির জৈন প্রতিষ্ঠাতা প্রামাণ্য হল। রাক্ষস, বানর, নাগ জাতির মধ্যে জৈন প্রভাব ও আর্যপূর্ব ভারতে ও বিশ্বে জৈন অবস্থান ব্যাখ্যা করে বঙ্গদেশে জৈন নিদর্শন দেখিয়ে সেখানে আর্য অনার্য সম্পর্কে জৈন মাধ্যম দেখানো হল। উপরি উল্লিখিত জৈনদের সুমেরু বিস্তার কথা মৎস্য পুরাণে ও জৈনমুনি সুব্রতনাথের কুর্ম প্রতীকে বিবরণ কুর্ম পুরাণে স্থান পেয়েছে। সুতরাং পরবর্তী এষণা প্রকাশের ইচ্ছায় বীক্ষণে পূর্ণচ্ছেদ টানা হল।

# সাতবাহন সাম্রাজ্যে গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন (২৩৫ খ্রিঃ পূঃ - ২২০ খ্রিঃ) - একটি অনুসন্ধান

**তপন কুমার মন্ডল**

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন বলতে 'স্বশাসন' বা নিজেদের শাসনকে বোঝায়। বৃহৎ সাম্রাজ্য থেকে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলির শাসন কার্য পরিচালিত হয় স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা বা তাদের মনোনীত বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এরূপ স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা বলা হয়। এর তাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতে খৃঃ পূঃ ২৩৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত সাতবাহন সাম্রাজ্যে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কিনা বা গড়ে উঠলেও তাকে আদৌ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কিনা তার সামগ্রিক দিক নিয়ে অনুসন্ধান করাই হচ্ছে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য যখন ক্রমশঃ পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন দাক্ষিণাত্যে যে কয়টি নতুন রাজবংশের উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে সাতবাহন বংশ ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

খৃঃ পূঃ ২৩৫ অব্দে যখন সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠা হয় তখন দাক্ষিণাত্যের গ্রামীণস্তরে জনবসতি খুব অল্প ছিল। জনবসতি বিরল সুদূর বিস্তৃত অঞ্চল অরণ্য ভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল। কৃষিকাজের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সমসাময়িককালে উত্তর

ভারতের থেকে দক্ষিণ ভারতের এটাই ছিল মৌলিক পার্থক্য। সাতবাহনদের রাজত্বকাল শুরুর আগে পর্যন্ত বলা যায় যে কিছু গ্রাম গড়ে উঠলেও কৃষিকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন গ্রাম গড়ে উঠেনি। ফলে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল অস্বচ্ছ এবং অনিশ্চিত।

কিন্তু সাতবাহনদের রাজত্বের শুরুর সময় থেকে গ্রামীণ জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কৃষিভিত্তিক গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। কৃষি কাজে লাঙলের ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে এবং কিছু কিছু স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে ওঠে।

কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা শৃংখলা ও নিশ্চয়তা ফিরে এলেও রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হওয়াব চেতনা তখনও বিকশিত হয়নি। অথবা গ্রামীণ মানুষ তখনও রাজনৈতিক সংঘবদ্ধ হওয়ার তাগিদ অনুভব করেনি। অথবা তাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা রাজতন্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের মোড়কে আবদ্ধ ছিল।

সাতবাহন শাসনব্যবস্থায় সমগ্র সাম্রাজ্য প্রধানত দুটিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা (১) রাজার প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল (২) সামন্ত শাসিত অঞ্চল। রাজা সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শাসিত ও সামন্ত শাসিত অঞ্চলের সর্বময় কর্তা ছিলেন তথাপি সামন্ত শাসিত অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

সাতবাহন রাজারা কখনো 'স্বর্গীয় অধিকার' দাবী না করলেও ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ দেশাচারকে অস্বীকার করতেন না। যাহোক শাসনব্যবস্থা নানা স্তরে বিন্যস্ত ছিল। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসনকর্তা গ্রামিক নির্দ্দিষ্ট বেতনভুক্ত না হলেও সরকারী কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হতেন। সম্ভবতঃ গ্রামের বিভিন্ন খবরাখবর সরকারী উচ্চতর বিভাগে পৌঁছে দেওয়া ছিল তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

যাহোক, সাতবাহন সাম্রাজ্যে গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যদিও সুশাসন প্রবর্তনের জন্য সাতবাহনরা মৌর্যদের শাসন নীতির ভাল দিকগুলি অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন তথাপি সার্বভৌম ক্ষমতা সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিব্যপ্ত করার বিষয়টি স্বযত্নে পরিহার করেছিলেন। ফলে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর গ্রামীণ ক্ষেত্রে এক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছিল।

# প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোগলমারীর প্রাচীন ইতিহাস

**বিমল কুমার শীট**

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান মোগলমারী। দাঁতন থেকে দু মাইল উত্তরে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ইহা অবস্থিত। ১৫৭৫ খ্রীঃ আফগান ওমরাহ সুলেমান কররানীর পুত্র দায়ুদকররানীর সঙ্গে আকবরের যে যুদ্ধ হয় তা মোগলমারীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। কিন্তু এর প্রাচীন ইতিহাস আমরা জানি না।

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১ মাস ব্যাপী খনন কার্য চালানো হয়। পাওয়া গেছে চওড়া ইটের দেওয়াল। প্রদীপ, মাটির পাত্র, গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপির সন্ধান মোগলমারী গ্রামটিতে যেখানে সেখানে ইটের স্তূপ, ইটের দেওয়াল, ইটের থামও পাওয়া গেছে। ছোট্ট গ্রাম। গবেষকরা মনে করেন এখানে গুপ্ত যুগেও সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে। বৌদ্ধ বিহার, মন্দির বা প্রাসাদের মতো স্থাপত্য মাটির নীচে চাপা থাকতে পারে। এর পূর্বে ১৮৭৩ খ্রিঃ বালেশ্বরের অনতিদূরে রাজঘাট রোড নির্ম্মাণে এই মোগলমারী এবং সাতদৌলা নামক গ্রাম দুটির প্রাচীন ভগ্নস্তুপ হতে প্রায় ২৬ লক্ষ প্রস্তর ও ইঁট খনন করা হয়েছিল। সেই সময় অনেক প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীগণ অনেকেই ঐ সকল মূর্ত্তি ও মুদ্রা সংগ্রহ করে রেখেছেন। এই সমস্ত ধ্বংসস্তুপগুলি বিগতের প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু স্থপতিদের অমর কীর্ত্তি বলে অনুমিত হয়। ঐ সকল স্তুপগুলি খনন করে আরো অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি প্রকাশ পেতে পারে। একথা ভারতের প্রত্নতত্ত্ব রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

# কুমারী পুজো

চন্দ্রাণী ব্যানার্জী

প্রাচীন ভারতে কুমারী পুজোর স্থান ছিল অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। ভারতীয় সভ্যতার প্রারম্ভিক কাল থেকে কুমারী কন্যাদের সসম্মানে পুজো করা হতো। সেই সময় ভারতীয় পরিবারে পুত্র এবং কন্যার মধ্যে কোনো বিভেদ করা হত না, সুতরাং তারা সমদৃষ্টিতে দৃষ্ট হতো। প্রাচীনকালে শুভ অনুষ্ঠানে কুমারী কন্যার দর্শন ও পূজন একটি নৈতিক ও সম্মানীয় কার্যরূপে বিবেচিত হত।

প্রাচীন ভারতে আটটি বস্তু শুভরূপে চিহ্নিত হতো। যেমন, দর্পন, জলপূর্ণঘাট, কুমারী কন্যা, মানসিক প্রফুল্লতা, সারিবদ্ধ প্রদীপ, ধার্মিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ধানের শীষ, লাজ (খই) ও পতাকা। হিন্দুরীতি অনুসারে বিবাহকালে কন্যাদান একটি পবিত্র ধর্মরূপে পরিগণিত হয়।

রামায়ণ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসের চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করে অযোধ্যায় পুনরাগমন করেছিলেন, তখন তাঁকে কুমারী কন্যারা সাদরে বরণ করেছিল।[১] রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় আটটি কুমারী সুন্দরী কন্যা উপস্থিত থেকে শ্রীরামচন্দ্রের উপর পবিত্রবারি সিঞ্চন করেছিল।

মহাভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুমারী পূজনের উল্লেখ আছে। তখন মনে করা হতো যে, প্রত্যেকটি অবিবাহিতা নাবালিকার মধ্যে দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান।[২] তৈতরীয় আরণ্যকে কন্যাকুমারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] এই প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে. এই নামকরণ প্রারম্ভিক কাল থেকে প্রচলিত ছিল। কুমারী পূজার স্পষ্ট উল্লেখ হরিবংশ এবং সমগ্র পুরাণে দৃষ্ট হয়।

তন্ত্র সাধনায় কুমারী পুজোর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। একবর্ষীয়া কন্যাদের পুজো করা যায় না।[৪] দ্বিতীয় বর্ষিয়া কন্যা হইতে দশমবর্ষীয়া কন্যা পর্যন্ত বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, কুমারী, ত্রিমূর্ত্তি, কল্যানী, রোহিনী, কালিকা, চন্ডীকা, সম্ভারী, দুর্গা এবং সুভদ্রা নামে পরিচিতি দেওয়া হত। একথা বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে, বিভিন্ন বর্ষের কন্যাদের পূজন বিভিন্ন সুফল প্রদান করবে।[৫]

পুরাণে উল্লেখ আছে যে, যে সব কুমারী কন্যারা বিকলাঙ্গ, কুবংশের, অত্যন্ত ক্ষীণকায়া, বিধবা মায়ের এবং অবিবাহিত মহিলার সন্তান তাদের পুজো করা হত না।[৬] কেবলমাত্র সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সুলক্ষণা, শ্রীময়ী ও মাধুর্য্যপূর্ণা কন্যাদের পূজনের জন্য চয়ন করা হতো।

যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ক্ষত্রিয়বর্ণের কুমারী কন্যাদের, ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের জন্য বৈশ্যবর্ণের কুমারী কন্যাদের, সামগ্রিক উন্নতির জন্য শূদ্র বর্ণের কুমারী কন্যাদের পূজন করা হতো।[৭] কিন্তু সর্ব্বদাই বিপ্রবর্ণের কুমারী কন্যাদের পূজনের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হতো।

সর্ব্বভারতে এখনও কুমারী পুজোর প্রচলন আছে। একথা এখনও বিশ্বাস করা হয় যে, কুমারী পুজো সর্ব্বপাপ খণ্ডন করে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) রামায়ণ, ৬, ১২৮, ৩৮, গোরখপুর, গীতা প্রেস।
২) মহাভারত, ১৩, ১১, ১৪, গোরখপুর, গীতা প্রেস।
৩) তৈতরীয় আরণ্যক, ১০,, ১, ৭-৮, আনন্দআশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পুনা, ১৯২৬।
৪) দেবী ভগবৎ পুরাণ, ৩, ২৭, ৪, ৩৫, ১৭-১৮, বিবলোথিক, ইন্ডিকা, ১৯০৩।
৫) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩, ২৬, ৪০-৪৩।
৬) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩, ২৭, ২-৩।
৭) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩, ২৭, ৫।

# পুরুলিয়ার কুরমী মাহাত সম্প্রদায়ের আদি নিবাস সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান

**দেবাশিস বক্সী**

পুরুলিয়া জেলার একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী হল কুরমী মাহাত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আদি নিবাস নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য আছে। যেমন, নৃতত্ত্ববিদ রিজলীর মতে এরা সাঁওতালদের একটি হিন্দুভাবাপন্ন শাখা। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে এদের আদি নিবাস ভারতবর্ষে ছিল, আবার কারো মতে ভারতবর্ষের বাইরে।

আলোচ্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক পণ্ডিতের মতে এদের আদি নিবাস সুনিশ্চিতভাবে ভারতের বাইরে ছিল। এগুলির মধ্যে হয় মধ্য এশিয়ায় বা ব্যাবিলন বা মিশরে।

আবার বেশীরভাগ পণ্ডিত অভিমত দিয়েছেন যে, এদের আদি বাসভূমি ভারতেই

ছিল। যদিও ভারতের বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করেছেন বিভিন্ন পণ্ডিত। একটি সূত্র অনুযায়ী এটি হল মধ্যভারত, আবার অন্য একটি সূত্র অনুযায়ী মহারাষ্ট্র, আবার অপর একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মগধ সন্নিহিত অঞ্চল। আবার আরও একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদের আদি বাসস্থান হল ছোটনাগপুর অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর সন্নিহিত এলাকা ও উড়িষ্যা।

উপরোক্ত অভিমতগুলি সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার করে বলা যায় যে এরা বহিরাগত নন কোনও ভাবেই। ভারতবর্ষেরই কোন অঞ্চল থেকে এরা এখানে আসে। ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চল থেকে এরা এখানে আসে সেটিও সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করে বলা যায় যে এদের আদি বাসভূমি ছিল বর্তমান বিহারের পরেশনাথ পাহাড় সংলগ্ন স্থান। যেখানে এরা এদের নিকটাত্মীয় সাঁওতালদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করত। তার পর কোনও কারণে তারা ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করে পুরুলিয়া জেলা সন্নিহিত অঞ্চলে চলে আসে।

# মুঘলযুগে মেদিনীপুরের কৃষি ও কৃষক

রাজর্ষি মহাপাত্র

ভারতীয় জনজীবনের ইতিহাস রচনায় গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের উল্লেখ ইতিহাসে অপরিহার্য। কারণ জমির সঙ্গে যাদের স্বত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তারাই গ্রামে বাস করতো। আবার ভূমি রাজস্ব নিরূপণ ও তা সংগ্রহের জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এই গ্রামই ছিল সেই কর্মকৃতির পটভূমি।[১] মুঘলসাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি ছিল কৃষক এবং তাদের অধিকার আর কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ করা নিয়ে মুঘল শাসকশ্রেনীর চিন্তার অন্ত ছিল না। তবে কৃষকদের শ্রমই ছিল মুঘলযুগের শাসকশ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস।[২] মেদিনীপুর জেলাও এই অবস্থার বাইরে ছিল না।

প্রধানত পলিমাটিগড়া বিশাল বঙ্গদেশের সমতলভূমি উর্বর হওয়ায় মেদিনীপুরের অনেক অঞ্চল ছিল খুবই উর্বর ও শস্যশালী। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে হান্টার ১৮৭২ বা তার সমসাময়িক অবস্থায় প্রধান কৃষি উৎপাদনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন : ধান,আখ,হলুদ,তুঁত,সর্ষে,শাকসবজী (বর্ষা ও শীতকালীন) ইত্যাদির চাষ হত।[৩] হান্টার সবজীর নামোল্লেখ করেন নি। তবে মধ্যযুগের খাদ্য তালিকার উপাদান হিসেবে যেসব আনাজের কথা বলা হয়েছে সেগুলির উৎপাদন হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, *শিবায়ন, চন্ডীমঙ্গল* কাব্যের সৃষ্টি মোটামুটি এই পরিমন্ডলে। পাটের চাষ এই অঞ্চলে বহু কাল থেকেই হয়ে আসছে।[৪] স্থানীয় কবিদের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা থেকে জানা যায় এসময় পান, আদা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, শস্য ও ফুলের চাষ ছিল। ধান ও তুলার চাষ হত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ করে *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে অজস্র কাব্যিক নাম ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীর ধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। আবুল ফজল বলেছেন, বঙ্গদেশের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বছরে তিনবার ধানের চাষ হত। মধ্যযুগে বাংলাদেশ থেকে আফিম রপ্তানি হত। সুতরাং পোস্তগাছের আবাদও হত বাংলাতে। চাষের যন্ত্রপাতি হিসেবে ব্যবহৃত হত জোয়াল, লাঙল, ফাল, কোদাল, দা, কাস্তে, উথুন, পাশী ইত্যাদি।[৫] অধিক বর্ষণে বন্যায় শস্য হেজে যেত। খরার সময় জলসেচের জন্য জলাশয় ও বাঁধের ব্যবহার ছিল। ইবন বতুতার বিবৃতির সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ ছিল খুবই উর্বর এবং অর্থনীতিতে বেশ উন্নত। ফসলের দামও ছিল খুব সস্তা। সপ্তদশ শতকে বার্ণিয়েরের মতে বাংলাদেশে ছিল

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শস্যশালী দেশ। এক চিনা পর্যটক বলেছেন যে, বাংলাদেশে বছরে তিনবার ফসল ফলে। লোকেরা খুবই পরিশ্রমী এবং খুব কষ্ট স্বীকার করেও জঙ্গল কেটে জমি চাষের উপযোগী করে তোলে। একটি পুঁথিতে দেখা যায় যে আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে কৃষিই প্রশস্ত ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ হয়েও চাষ দ্বারাই জীবিকা অর্জন করতেন। বাংলার তথা মেদিনীপুরের অতুলনীয় কৃষি-সম্পদের কথা সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত হয়েছে।[৬] মিশর সম্পর্কে লোকে যেমন ভাবে বাংলাও তেমনি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে-একথা দৃঢ়প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছিলেন বার্ণিয়ের। রবার্ট ওর্ম -এর মতে, "The Province of Bengal is the most fertile land of any in the Universe, more than Egypt, and with greater certainty."[৭] মন্তব্যটি সম্পূর্ণ উচ্ছ্বাসহীন নয়। আলেকজান্ডার ডাউ-এর মতে, মুঘলযুগের বাংলার জনসংখ্যা ছিল দেড় কোটি।এদের বেশির ভাগই যে কৃষি নির্ভরশীল ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য।[৮] আমাদের আলোচিত অঞ্চল এর মধ্যে পড়ছে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ১৬৫৬ থেকে ১৬৬৮-র মধ্যে পর্যটক বার্ণিয়ের ভারতে ভ্রমণ করেন। বঙ্গভূমির শস্যশ্যামলতা ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রশংসায় মুখর তিনি- "The Soil was luxuriant and agriculture through not raised by improvements was not also hurt by any blameable neglect or in attention."

অবশ্য রূপরামের *মঙ্গল* কাব্যেও কৃষির দীর্ঘ প্রশস্তি বা চাষের বিস্তৃত বিবরণ পাই না। তবে বঙ্গদেশের সুজলা সুফলা রূপটির আভাস মেলে। তিনি প্রধান কৃষিজ সম্পদ অবশ্যই ধান সে কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিল, সরিষা, ধনে, জিরা, মৌরি, হিং, লঙ্কা, পালং শাক, বেগুন, কুমড়ো সবই খেতজ ফসল। পান ও সুপারিও উৎপাদন হত। রন্ধনশালায় উঁকি দিলে বোঝা যেত রসনালোভন খাদ্যসামগ্রী সবই ছিল খেতজ ফসল সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ফসল সংরক্ষণের ব্যাপারটিও উপেক্ষিত হয়নি। দেশের মাটিতে কৃষিকাজ মধ্যযুগের রোজগেরে বাঙালির ছিল একটি প্রধান পথ।[৯]

মেদিনীপুরে জমির মালিক অথবা তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি ছিল তা সঠিকভাবে বলা খুবই মুশকিল। বিভিন্ন নথিপত্র অনুসারে মনে হয় কৃষকরা তাদের জমিতে কতকগুলি সুযোগসুবিধা ভোগ করত। যুবরাজ শাহ সুজার সময়ে বঙ্গদেশে শাসনকালে দেখা যায় তিনি তাঁর কর্মচারীদের বিশেষভাবে জমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথাসম্ভব পরিবর্তন না করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। মনে হয় ভূস্বামীগণ এবং জায়গীরদারগণ সামন্ত প্রভুদের ন্যায় অধিকাংশ জমির নিয়ন্ত্রণ করলেও

আসলে যারা জমি চাষ করতেন তারা ছিলেন মোটামুটি ভূমিহীন। জমির মালিকগণ এদের জমি বিতরণ করতেন এবং তাদের প্রতি অধিকাংশ সময়ই কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতেন। এমনকি অনেক সময় তাদের বলপূর্বক বেগার খাটতে বাধ্য করা হত। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিরা অধিকাংশই ভূস্বামী বা জায়গীরদারদের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই ভূস্বামীরা চাষিদের কাছ থেকে নির্ধারিত পরিমাণের বেশি কর আদায় করতেন এবং এর জন্য নৃশংসভাবে বলপ্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। একদিকে ভূস্বামী অন্যদিকে কৃষকদের মধ্যে কাজের তদারকি করবার জন্য একদল পরিদর্শক তদারককারী গোষ্ঠী সমৃদ্ধশালী অঞ্চলগুলিতে দেখা যেত।[১০]

চর্তুদশ শতকে ইবন বতুতা তাঁর বিবরণে বঙ্গদেশে প্রচুর ধান উৎপাদনের কথা বলেছেন। তবে মেদিনীপুরে রোপন করা ধানচাষের বেশি প্রচলন ছিল। আবুল ফজলও বঙ্গদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে বছরে তিনবার ধান চাষের কথা বলেছেন। *শূন্যপুরাণ* ও *শিবায়ন* কাব্যে বঙ্গদেশে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরণের ধানের তালিকা আছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের ফল যেমন আম, নারিকেল, কলা, শসা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত অঞ্চলে উৎপন্ন হত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধরণের আম কোনো কোনো মুঘল সম্রাটদের প্রিয় ছিল।[১১] *আইন-ই-আকবরী*'র মতো ইতিহাসগ্রন্থে এখানে কুসুমফুল, তিসি, তিল, সরিষা ও তোরিয়া এই পাঁচপ্রকার তৈলবীজের নাম লিপিবদ্ধ আছে। বিদেশীদের মধ্যে কৃষি সম্পর্কে খুব বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম সার্ভেয়ার জেমস্ রেনেল। তাঁর লেখা 'Journals' থেকে নবাবি আমলের শেষদিকে বাংলার কৃষিজাত পণ্যের একটি চেহারা পাওয়া যায়।[১২]

মুঘল শাসিত বাংলার অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল কৃষি এবং অতি সহজেই বাংলার মাটিতে চাষ করা যেত। মোরল্যান্ডের মতে মুঘল আমলে সমস্যাটি ছিল জমির নয় বরং কৃষকদের। তখন লোকসংখ্যার তুলনায় কর্ষণযোগ্য জমির প্রাচুর্য ছিল।[১৩] আবুল ফজল প্রণীত *'আইন-ই-আকবরী'*, *'নিগরনামা-ই-মুন্সি'* মুহম্মদ হাসিমের প্রতি আওরংজেবের *ফারমান* ও সমকালীন সাহিত্যাদি থেকে তৎকালীন কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে মেদিনীপুরের কিছু কিছু তথ্য জানা যায়।[১৪] সপ্তদশ শতাব্দীর *ধর্মমঙ্গলের* কবি রামদাস আদক বংশানুক্রমিক কৃষি-জীবিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে) মেদিনীপুরে জঙ্গল হাসিল করে সদগোপরা গোরক্ষণ থেকে কৃষিকার্যে মন দেয় এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়। যারা প্রথম আবাদ করতো, অনেকসময়ে তাদের জমিদারি-অধিকারী দেওয়া হতো। শাহজাহানের আমলে নিয়ম ছিল,যেসব রায়ত বন কেটে জমি হাসিল করবে সেই জমি তাদের জমিদারি-স্বত্বের আওতায় পড়বে। 'বনকাটি জমিদার' বলেও তাঁদের পরিচিতি ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশ ও অষ্টাদশের প্রথমার্ধের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, কিছুকাল ধরেই বাঙালির যোদ্ধা-সম্প্রদায় যারা বাংলার সেনাবাহিনীকে পরিপুষ্ট করে এসেছে, তারা বৃত্তিচ্যুত হয়ে ক্রমে কৃষির দিকে মন দিচ্ছে; ফলে, অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। এইসব সৈনিকবৃত্তিধারীরা বৃত্তিচ্যুত হয়ে প্রথমে লুটপাট করে বেড়াত এবং পরে ক্রমে চাষবাস করতে বাধ্য হয়। বিশেষত মেদিনীপুরে এই লক্ষ্য ছিল খুবই প্রকট। বারবার উড়িষ্যা ও বাংলার লড়াই হয়েছে এখানে, পাঠান-মুঘলের দ্বন্দ্ব চলেছে, শোভা সিংহের বিদ্রোহ ঘটেছে। ক্রমে ইংরেজ এসেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঐসব শ্রেনী মধ্যে মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালের চোয়াড় বিদ্রোহ-ই তার অন্যতম নিদর্শন। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে, 'শূল ভেঙে হাল করার' মধ্যে সৈনিকদের চাষবাসের প্রতি মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া এই কাব্যে আলোচিত অঞ্চলের কৃষি পদ্ধতিও বর্ণিত আছে। সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্য থেকে আহারের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয়, মেদিনীপুরে নানাপ্রকার শাকসবজী, ফল ও ফুলের উৎপাদন ছিল।[১৫]

সাধারণভাবে আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে দুটি বিধি অনুসারে জমির ওপর কৃষকদের ভোগদখলের অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল। উত্তরাধিকারী থাকলে কৃষক জমি পরিত্যাগ করতে বা চাষ বন্ধ করতে পারত না। তবে যদি কৃষক জমি চাষ করতে অপারগ হত সেক্ষেত্রে জমির ওপর তার দাবি সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ হত এবং সেই জমি অন্যের কাছে হস্তান্তরিত হত। কৃষকদের উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে রাজস্ব অদায় করার নীতি গ্রহণ করা হত। জমি বিক্রয় অথবা বন্ধক দেওয়ার কোনো অধিকার কৃষকের ছিল না -কৃষকের দখলি স্বত্ব জমির ওপর থাকুক বা না থাকুক। মনসবদার ও জায়গিরদার এবং তাদের কর্মচারীরা নানাভাবে কৃষকদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে খাজনা আদায় করত। মেদিনীপুরে গ্রামীণ সমাজে কৃষকদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের মূলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেনী ছিল- এটি 'মহাজন' নামে খ্যাত। অবশ্য সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে জর্জরিত ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। এটা নিঃসন্দেহে যে কৃষক বিদ্রোহের মূলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক। জমিদার ও কৃষকদের সম্মিলিত বিদ্রোহের নিদর্শন হিসেবে মেদিনীপুরের শোভা সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহকে ধরা যায়। মুঘল আমলে কৃষক বিদ্রোহের কথা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। এই বিদ্রোহগুলির চরিত্র এক ছিল না। কারণ স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে এই বিদ্রোহগুলির রূপ বিভিন্ন ছিল এবং সংগঠন ও নেতৃত্বও ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছিল।[১৬]

এই যুগে খাদ্য শস্যের দাম কম থাকাতে কৃষকের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না।[১৭]

অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কৃষক সম্পর্কে অনেক সমকালীন পর্যবেক্ষক বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[১০]

মুঘল আমল থেকেই কৃষির প্রতি কৃষকের বিরাগ ও অনীহা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্ষতির মাত্রা হিসেব করে অন্য ব্যবসার দিকে সে মন দেয়। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন সেই ক্ষয়িষ্ণু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মানুষ, যখন কিনা কৃষিকে পরিত্যাগ করে বেশিরভাগ মানুষের দৃষ্টি ধাবিত হয়েছে বাণিজ্যের দিকে। হয়তো মানুষের চিন্তাবিবর্তনের এই চোরাপথেই একদিন নগরকেন্দ্রিক বণিকসভ্যতা ও পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। নবাব আলিবর্দী ও সিরাজের সময় কৃষির অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায় এবং বর্গীর হাঙ্গামার ফলে দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে কৃষির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশে বাংলার তথা মেদিনীপুরের শস্যসম্ভারের প্রসন্ন স্বচ্ছলতার ছবিও চিরতরে হারিয়ে যায় ইতিহাসের ধূসর দিগন্তে।

## সূত্র নির্দেশ ঃ

১) এন এ সিদ্দিকী, *মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা*, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১।

২) গৌতম ভদ্র, *মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৪১০,পৃ. ৩৮, ৫১।

৩) W.W.Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, London, 1876, P. 195-96.

৪) তদেব।

৫) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, *রামেশ্বর রচনাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ২০০।

৬) রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২২৫।

৭) Robert Orme, *Historical Fragments of the Moghal Empire*, London, 1803, P. 26.

৮) সনৎকুমার নস্কর, *মুঘলযুগের বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৯৫,পৃ. ২১২।

৯) Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal*, Vol. II, Dacca University, 1948, P. 19, 20, 63, 82, 205, 28; অন্তরা মিত্র, *রূপরাম চক্রবর্তীর অন্নদামঙ্গল-অর্থনীতির সূত্র সন্ধান* (প্রবন্ধ), সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, মধ্যযুগের *বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (ফাল্গুন-শ্রাবণ, ১৪০৯), কলকাতা, ২০০২, পৃ: ৬৮-৬৯।

১০) কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, *দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৩-০৪।

১১) তদেব, পৃ. ১০৫।

১২) নস্কর, তদেব, পৃ. ২১৭।

১৩) W.H. Moreland, *The Agrarian System of Moslem India Allahabad*, 1968, P. 144-145.

১৪) কবিতা ঘোষ, *সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪০।

১৫) J.N.Das Gupta, *India in the Seventeenth Century*: As depicted by European Travellers, Calcutta, 1916. P. 212.

১৬) গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়, *দক্ষিণ-পশ্চিমবাংলার ইতিহাস*, মেদিনীপুর, ১৯৮৬, পৃ. ২৭২-২৭৫।

১৭) A.C. Banerjee, *The Agrarian System of Bengal*, 1st Vol. Calcutta, 1980, P. 218.

১৮) বিনয়ভূষণ চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলার কৃষিসমাজের গড়ন*, (দ্বিতীয় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৬।

# বৈদেশিক পর্যটক ও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বিবরণে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে কোচবিহার-ভূটান বাণিজ্য

পার্থ সেন

কোচবিহার রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গের সাথে ভূটানের বানিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। স্মরনাতীত কাল থেকেই ভূটানী ও তিব্বতী ব্যবসায়ীরা বর্তমান রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন জেলায় তাদের পণ্য সম্ভার নিয়ে আসত। ঐ সমস্ত জেলা থেকে তারা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সম্ভার নিয়ে ভূটান তিব্বতে ফিরে যেত। ষোড়শ শতকে উত্তরবঙ্গের প্রায় সমগ্র অংশ, ভূটান আসাম সহ বর্তমান কাছাড়, জয়ন্তিয়া, মণিপুর, ত্রিপুরা, কোচবিহার রাজ্যের অন্তগর্ত ছিল।[১] ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজা নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচ রাজ্য ভেঙে কোচ-হাজো এবং কোচবিহার নামে দুটি রাজ্যের সৃষ্টি হয়। কোচবিহার রাজপরিবারের একটি শাখা রায়কত উপাধি নিয়ে বৈকুণ্ঠপুর শাসন করতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই বৈকুণ্ঠপুর জলপাইগুড়ি জেলা হিসাবে পরিচিত হয়।[২] কিন্তু বর্তমান আলিপুরদুয়ার মহকুমা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বৈকুণ্ঠপুরের সাথে যুক্ত ছিল না। বর্তমান আলিপুরদুয়ার মহকুমা পশ্চিম দুয়ার্স নামে পরিচিত ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গো-ভূটান যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার পশ্চিম দুয়ার্স ভুটানের কাছ থেকে লাভ করে এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-দুয়ার্সকে জলপাইগুড়ি জেলার সাথে যুক্ত করা হয়।[৩]

পশ্চিম দুয়ার্স কোচবিহার রাজ্যের অংশ হলেও এই অংশের দখল নিয়ে কোচবিহার ও ভূটানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। এই অংশের মধ্য দিয়ে ভূটানে যাবার রাস্তা ডালটন লিখেছেন "There were no doubt conflicts between the Kuch and the Butrtiyas about three or four hundred years ago but there were struggles for supremacy in the Duars"[৪] মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সময় (১৭১৪-৬৩) ভূটান এই অঞ্চল দখল করে নিতে সমর্থ হয়।[৫] ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন টার্ণার যখন ভূটানে যান তখন পশ্চিমদুয়ার্স অঞ্চল ভূটানের দখলে ছিল এবং ভূটান তার জন্য কোচবিহারের রাজাকে বার্ষিক কর দিত।[৬]

পশ্চিমদুয়ার্সের এই অঞ্চল দিয়েই ভূটানের সাথে কোচবিহার রাজ্যের তথা উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য চলত।

পশ্চিমদুয়ার্স দিয়ে ভূটানে প্রবেশের ১১টি রাস্তা ছিল। তাই পশ্চিমদুয়ার্সের অপর নাম ছিল ভূটানদুয়ার্স। দুয়ার গুলির অবস্থান ছিল তিস্তা নদীর পশ্চিম পাড় এবং মানস নদীর পূর্ব পাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। দুয়ারগুলির মোট আয়তন ছিল ১,৯৬৮ স্কোয়ার মাইল।[৭] দুয়ার গুলির নাম হলো ডালিম কোট, জামির বা ময়নাগুড়ি, চামুর্চি, লক্ষ্মীদুয়ার,বকসা দুয়ার, ভুলকা, বড়, গুমার, রিপো, সিডলী এবং বামদুয়ার।[৮] ডালিমদুয়ার তিস্তা ও ধরলা নদী, ময়নাগুড়ি ধরলা ও জলঢাকা নদীর, বকসাদুয়ার তোর্ষা ও রায়ডাক নদীর এবং ভুলকাদুয়ার রায়ডাক ও তোরষা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[৯] তবে সবকটি দুয়ার দিয়ে ভূটানে প্রবেশের রাস্তা ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডি, এফ রেনী।[১০] এই দুয়ারগুলি ধরেই ভূটানী ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য সম্ভার নিয়ে উত্তরবঙ্গে আসত। ১৫৮৩ বণিক পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ লিখেছেন "There were merchants which (who) come out of China and they sary out of Muscovia and Tartary"[১১] ফিচ আরও লিখেছেন যে পশমজাত বস্ত্র এবং মুগা সিল্ক আসাম ও কোচবিহার থেকে বাংলাদেশ, ভূটান, তিব্বত, এবং মোঘল ভারতে রপ্তানি হত।[১২] দুয়ারগুলি দিয়ে ভূটানী ব্যবসায়ীরা টাঙ্গন ঘোড়া, কম্বল, মৃগণাভি, কমলালেবু, এক প্রকার রং এবং অন্যান্য পণ্য সম্ভার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিলি করতে আসত। আবার উত্তরবঙ্গ থেকে শীতবস্ত্র, নীল, চন্দনকাঠ, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার গাছের ছাল, লবঙ্গ, মোটা কাপড় ইত্যাদি পণ্য নিয়ে ভূটানী ব্যবসায়ীরা ফিরে যেত।[১৩] কোচবিহার এবং আসাম থেকে ভূটান, বর্মা এবং বাংলাদেশে ক্রীতদাস রপ্তানি করা হত।[১৪] ক্রীতদাসের বিনিময়ে ভূটানী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাঙ্গন ঘোড়া সংগ্রহ করা হত।[১৫] ভূটানী ব্যবসায়ীরা রংপুর, দিনাজপুর থেকে চিনি, তামাক, সুপারি, পান, মশলা, শুঁটকি মাছ, মেষশাবক নিয়ে যেত।[১৬]

রংপুর ছিল কোচবিহার, ভূটান বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র। প্রতি বছর রংপুরে ভূটিয়া মেলা অনুষ্ঠিত হত। মাহীগঞ্জের নিকট যে স্থানে মেলা বসত ঐস্থান দীর্ঘদিন 'ভূটিয়া মহাল' নামে পরিচিত ছিল।[১৭] ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মেলা চলেছিল।[১৮] রংপুরের ডেপুটি কালেক্টর স্মিথ এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ভূটানী ব্যবসায়ীরা রংপুরের মেলায় আসত এবং মে-জুন মাসে পণ্য কেনা বেচা করে চলে যেত।[১৯] ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত রংপুরের মেলায় ব্যবসা করার

জন্য ভূটানী ব্যবসায়ীদের কর দিতে হত।[২০] রংপুরের মেলায় বার্ষিক দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার পণ্য ভূটানী ব্যবসায়ীরা আদান প্রদান করত।[২১] কোচবিহার রাজ্যের নাজীর গঞ্জ এবং ভূরচঙ্গমারি স্থান দুটি একসময় ভূটানী পণ্যের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।[২২] পাহাড়ের নীচে বহু ছোট ছোট বাজার ছিল যেখানে ভূটানী ব্যবসায়ীদের সাথে সমতলের বাণিজ্য চলত। ঐ সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে ভোটহাট বলা হত।[২৩] বর্তমান ময়নাগুড়ির অন্তগর্ত জল্পেশে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে বড় মেলা বসত। জল্পেশের মেলাতে দিনাজপুর-রংপুরের বণিকদের সাথে ভূটানী ব্যবসায়ীরাও তাদের পণ্য সম্ভার নিয়ে আসত।[২৪] দিনাজপুর জেলার আলুয়া খাওয়ায় প্রতি বছর অক্টোবর মাসে রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে বৃহৎ মেলা বসত। এই মেলাতেও ভূটিয়া ব্যবসায়ীরাও ঘোড়া বিক্রি করার জন্য আসত।[২৫] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কামরূপের কোচ-হাজোতে প্রতি বছর মে মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বড় মেলা বসত। এই মেলাতেও ভূটানী ব্যবসায়ীরা টাট্টু ঘোড়া, খচ্চর, শীতবস্ত্র এবং পাহাড়ী লবণ বিক্রীর জন্য নিয়ে আসত। এই মেলাতে তিব্বতের দক্ষিণ পূর্বের খাম অঞ্চল থেকে তিব্বতী বণিকরা গাধার পিঠে করে পাহাড়ী লবণ বিক্রীর জন্য নিয়ে আসত।[২৬] তবে কোচ-হাজো মহারাজা নরনারায়ণের মৃত্যুর পর পূর্ব কামতা-কোচ রাজ্যের অধীনে চলে যায়।

আসামও কোচবিহার রাজ্যের সাথে মোঘল-ভারতের বাণিজ্যে বানিজ্য উদ্বৃত্ত কোচবিহার রাজ্যের অনুকুলে না থাকলেও ভূটানের সাথে কোচবিহার রাজ্যের বানিজ্যে উদ্বৃত্ত কোচবিহার রাজ্যের অনুকুলেই ছিল। বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের সুবাদে ভূটান থেকে কোচবিহার রাজ্যে সোনা এবং রূপা আসত।[২৭] কোচবিহার-ভূটান বানিজ্যে নারায়ণী মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। ভূটানের নিজস্ব মুদ্রা ছিল না। ভূটানের ব্যবসায়ীরা রূপা নিয়ে এসে কোচবিহার রাজ্যের টাকশাল থেকে নারায়ণী মুদ্রা প্রস্তুত করত। কোচবিহার রাজ্যে কোন রৌপ্য খনি ছিল না। তাই ভূটান এবং তিব্বতের সাথে বানিজ্যের সুবাদে কোচবিহার রাজ্যে রূপার আমদানী হত।[২৮] তবে নারায়ণী মুদ্রার অপ্রতুলতার কারণে কোচবিহার ভূটান বানিজ্যের বড় অংশই দ্রব্য বিনিময় প্রথায় হত।[২৯] বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য নারায়ণ ঠাকুর গোকুলচাঁদকে ভূটানী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয় টাঙ্গন ঘোড়ার বিনিময়ে।[৩০]

ভূটানের দেবরাজা, মন্ত্রীবর্গ এবং প্রাদেশিক শাসন কর্তাগণ কোচবিহারের সাথে বানিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। এঁদের প্রতিনিধিরাই টাঙ্গন ঘোড়া করে ভূটান থেকে কোচবিহার, রংপুর, কোচ-হাজো প্রভৃতি মেলায় পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসত। আবার প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে নিয়ে ভূটানে চলে যেত। রংপুর, কোচবিহার থেকে ক্রীত পণ্য দেবরাজা

এবং অপরাপর প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তিব্বতে রপ্তানি করতেন।[৩১] ভূটানের আইন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী ছাড়া অপর কেউ বিদেশের সাথে বাণিজ্য করার অধিকারী ছিল না।[৩২] পার্শ্ববর্তী কোচবিহার রাজ্যেও কিছু কিছু পণ্য দ্রব্যের উপর রাজপরিবার এবং উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ছিল। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্শী-শোভেট প্রতিবেদনে অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে কোচবিহার রাজ্যের বাণিজ্যের উপর সমস্ত প্রকার এক চেটিয়া অধিকার তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।[৩৩] তবে ষোড়শ শতকে বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রা অর্থনীতির সুবাদে কোচবিহার রাজ্যে বড় বণিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এঁরাও কোচবিহার-ভূটান বাণিজ্যে অংশ নিতেন। ভবানন্দ কলিতা এবং সাতজন বণিক যৌথভাবে বাংলাদেশে গারো পাহাড়, আসাম এবং ভূটানের সাথে বাণিজ্য করতেন। ভবানন্দ কলিতার পুঁজির পরিমান ছিল চারলক্ষ টাকা।[৩৪]

ভূটানী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন স্থানে দোভাষী সম্প্রদায় থাকত। দোভাষীরা স্থানীয় এবং ভূটানী ভাষা জানত। বকসা দুয়ার থেকে যে সমস্ত ভূটানী ব্যবসায়ী রংপুর ও কোচবিহার যেত তাদের সাহায্য করত দোভাষীরা। বিনিময়ে তারা ভূটানের ধর্মরাজার কাছ থেকে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য জমি পেত। পশ্চিম দুয়ার্সে মোট ৬২টি দোভাষী পরিবারের বসবাস ছিল। এদের বসতি ছিল বকসা দুয়ারের নীচে মিনাগ্রাম, সন্তরাবাড়ী, ময়নাওড়ি, মাঝের ডাবরী, ঢালকর এবং ভেলারডাররীতে। উল্লেখ্য এই অঞ্চল দিয়েই সড়ক পথে বর্তমান বকসা দুয়ার, চেচাখাতা, হয়ে কোচবিহার রংপুর যেতে হত। দোভাষীদের ভূটিয়া ব্যবসায়ীদের দেখভাল করা এবং মাল পরিবহনের দায়িত্ব বহন করতে হত।[৩৫] পথ নিরাপত্তার জন্য ভূটান স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে ছিল। চিচখাডা দুর্গ, ডালিমকোট দুর্গ, জামিরকোট দুর্গ, প্রভৃতি বহু দুর্গের নাম পাওয়া যায়। পথ এবং বণিকদের সুবিধার্থে কোচ রাজগণ রাস্তার ধারে দীঘি খনন করেছিলেন। রাজা নীলাম্বর (১৪৮০-৯৮) গোসানী মারী থেকে ময়নাওড়ির জল্পেশ মন্দির পর্যন্ত যে রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন তার প্রতি দুই এক মাইল অন্তর একটি করে জলাশয় খনন করেছিলেন।[৩৬]

সেই সময় কোচবিহার এবং ভূটানের মধ্যে যে বিপুলাকারে ব্যবসা বাণিজ্য হত তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্যাপ্টেন টার্নারের বিবরণ থেকে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে টার্নার রংপুর থেকে ভূটানে যান। টার্নার রংপুর থকে সড়ক পথে পাল্কী করে মোঘল হাটে পৌছান। ধরলা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মোঘলহাটকে তিনি শিল্প-সমৃদ্ধ শহর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ধরলা নদী ছিল কোচবিহার এবং রংপুরের সীমানা। মোঘল-

হাটের রাস্তাগুলিকে তিনি বেশ চওড়া বলে উল্লেখ করেছেন। ফেরীতে করে ধরলা নদী পার হয়ে টার্নার কোচবিহারের গীতালদহে পৌঁছান। ধরলা নদীতে টার্নার ভুটানী ব্যবসায়ীদের নৌকা করে মোটা কাপড় নিয়ে আসতে দেখেছিলেন।[৩৭] কোচবিহার থেকে চিচখাডা হয়ে টার্নার বকসাদুয়ার দিয়ে ভূটানে যান।[৩৮] ভূটানের প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ প্রজাদের কোচবিহারের সাথে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদানের বিনিময়ে অর্থ আদায় করতেন।[৩৯] তবে ভূটানী আধিকারিকগণ দুয়ার অঞ্চলে বসবাসকারীদের প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন না।[৪০] কোচবিহার রাজ্যে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হাট কর, জলকর এবং বিক্রয় কর আদায় করা হত। ঐ সমস্ত কর আদায়ের দায়িত্ব ছিল চাকীদারদের উপর। প্রয়োজনে চাকীদাররা ব্যবসায়ীদের জিনিষপত্র তল্লাশী করতে পারত।[৪১]

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গ, ভুটান এবং তিব্বতের মধ্যে উন্নতমানের বানিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্য বিস্তারে এবং বাণিজ্য পথ সুরক্ষায় কোচবিহার রাজ এবং ভূটান প্রশাসন যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। ভূটানী ব্যবসায়ীরা কোচবিহারের মহারাজার অতিথি হিসেবে গণ্য হতেন। অতীত ঐতিহ্য ধারা অনুযায়ী শীতের সময় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভূটানী ব্যবসায়ীদের শীতবস্ত্র বিক্রী করতে দেখা যায়।

## সূত্র নির্দেশ ঃ


১) এইচ. এন. চৌধুরী. *দি কোচবিহার ষ্টেট এ্যান্ড ইটস ল্যান্ড রেভিনিয়্যু সেটেলমেন্ট,* কোচবিহার, ১৯০৩, পৃ. ২৩২

২) *জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ* জলপাইগুড়ি, ১৯৭০,পৃ-৩৮।

৩) *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স,* জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮১, পৃ-৬২।

৪) ই. টি. ডালটন, *ডেসক্রিপটিপ এথনোলজি অব বেঙ্গল,* কলিকাতা ১৮৭৩, পৃ-৯৬।

৫) জয়নাথ মুন্সী, *রাজোপাখ্যান,* বিশ্বনাথ দাস সম্পাদক, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ-৪১।

৬) ডি. এইচ. ই. সান্ডার্স. *সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অব দি ওয়েষ্টার্ন ডুয়ার্স,* জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট, ১৮৯৫, পৃ-১৯।

৭) অরবিন্দ দেব, *ভূটান এ্যান্ড ইন্ডিয়া, এ ষ্টাডি ইন ফ্রন্টিয়ার পলিটিকাল রিলেশনস (১৭৭২-১৮৬৫),* কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ-১১২

৮) বিক্রম-জীত-হর্ষৎ, হিষ্ট্রি অফ ভূটান, ভূটান, ১৯৮০, পৃ-৯৫।

৯) খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, ***কোচবিহারের ইতিহাস,*** পুণর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ-৩৫১।

১০) ডি, আর, রেণী, *ভোটান এ্যান্ড দি ষ্টোরী অব দুয়ার ওয়ার,* পৃ-৪৮।
১১) অরবিন্দ দেব, পূর্বোক্ত, গ্রন্থ থেকে উল্লিখিত, পৃ-৫৫।
১২) এস, কে, ভুঁইয়া, *এ্যাংলো আসামিস রিলেশনস,* গৌহাটি, ১৯৭৪, পৃ-৫২ এফ।
১৩) *পিটার কলিষ্টার, ভুটান এ্যান্ড দি বৃটিশ,* নয়া দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ-৪৮।
১৪) অমলেন্দু গুহ, 'দি মিডিয়ভেল ইকোনমি ইন আসাম', *দি কেমব্রিজ ইকোনমিক হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* প্রথম খন্ড, সম্পাদক তপন রায় চৌধুরী, ইরফান হাবিব, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ-৫০৩।
১৫) এম নিয়োগ, *শঙ্কর দেব এ্যান্ড হিজ টাইমস,* গৌহাটি, তৃতীয় সংস্করন, ১৯৯৮, পৃ-৭৭।
১৬) বিক্রম জিৎ হর্ষৎ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৪।
১৭) খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫৮।
১৮) ঐ, পৃ-৩৫৮।
১৯) সূপর্ণা সেন, 'ইন্দো-ভূটান টেড ডিওরিং দি প্রিয়িওড, ১৮৩৭-১৮৬৫', *দি হিমালয়ান মিসলেনী,* সম্পাদক বি. বি. মিশ্র, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ-১৯৮৯, পৃ-৩৮।
২০) সূপর্ণা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮।
২১) খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪৫।
২২) শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন ঘোষ 'কোচবিহারের ইতিহাস, *কোচবিহারের হিতৈষিনী সভা বক্তৃতামালা,* সম্পাদনা, ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ-১৩৭,
২৩) এম নিয়োগ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯।
২৪) সান্ডার্স, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯।
২৫) এফ ডব্লু ষ্ট্রং, *ইষ্টার্ন বেঙ্গল গেজেটিয়ার্স,* দিনাজপুর, পুনমুদ্রণ, শিলিগুড়ি, পৃ-১৬০।
২৬) সুপর্ণা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯।
২৭. অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৯২।
২৮) নিকোলাস রোডস ও শঙ্কর কুমার বোস, *দি কয়েনস অব কোচবিহার,* ধুবড়ী, ১৯৯৯, পৃ-৬৮।
২৯) ডি, নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৮।
৩০) এম নিয়োগ (সম্পাদক), 'কথা গুরু রচিত' গৌহাটি, ১৯৯৯, পৃ পৃ-১৫০-১৫১।
৩১) পিটার কলিষ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ-২০।
৩২) বিক্রমজিৎ হর্ষৎ, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৮।
৩৩) **মার্শী-শোভেট রিপোর্ট,** *কোচবিহার,* ১৮৬৯, পৃ-১৯৭। কোচবিহার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধানের জন্য মার্শী-শোভেট কমিশন বসে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু রিপোর্ট পুস্তকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে।
৩৪) ডি. নাথ পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৫।

৩৫) সান্ডার্স, পূর্বোক্ত, পৃ পৃ-৬১-৬২।
৩৬) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৬।
৩৭) সামুয়েল টার্নার, ***এমব্যাসী টু টিবেট,*** লন্ডন, ১৮০০, পৃ পৃ-৭-৮।
৩৮) পিটার কলিষ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৬।
৩৯) অরবিন্দ দেব, পূর্বোক্ত, পৃ-৭।
৪০) ঐ, পৃ-৭।
৪১) এম নিয়োগ (সম্পাদক), পূর্বোক্ত, পৃ পৃ-১৫৭-১৫৮।

[ এই নিবন্ধে ষোড়শ শতক থেকে প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত কোচবিহার ভূটান বানিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ]

# সুফী, সুফীসাহিত্য ও সমকালীন ইতিহাস : একটি আলোচনা

**প্রদীপ্ত আচার্য**

ভারতবর্ষে তুর্কো-আফগান মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হবার সময় থেকেই অনেক সুফী সন্তরা ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুফী ধর্মের বিভিন্ন শাখার যেমন- চিস্তি, কাদরি, সুহারবর্দী, সুরতারী, মাদারি, ফিরদৌসি, নক্সবন্দী ইত্যাদি। সুফীরা অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। কিছু কিছু সুফী সন্তরা যেমন সুহারবর্দী গোষ্ঠীর সুফীরা সম্রাট তথা অন্যান্য শাসকদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু অন্যান্য সুফীরা সম্রাট তথা অন্যান্য শাসকদের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রক্ষা করা পচ্ছন্দ করতেন না। সম্রাট কিছু অন্যায় করলে সেটাও সুফীরা পচ্ছন্দ করতেন না। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনসাধারণ সুফীদের কাছে যেতেন বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য। চিস্তি সুফীরা জনসাধারণের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করতেন।

ভারতবর্ষে সুফীদের সম্পর্কে অনেক লিখিত সাহিত্যিক উপাদান পাওয়া যায়। এই সমস্ত সাহিত্যিক উপাদানগুলির মধ্যে এমন অনেক সংকলনই আছে যেখানে সুফীদের কথা, তাঁদের বাণী, তাঁদের জীবনাদর্শের কথা, তৎকালীন সম্রাটদের কথা এবং সমকালীন বহু ঘটনার কথা জানা যায়। বেশ কিছু সুফী সাহিত্য যেমন, সিয়ার-উল-ওয়ালিয়া, ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ, খোয়ারুল-মজালিস, সকিনা-তুল-ওয়ালিয়া, তস্‌করাতুল-ওয়ালিয়া, খালেহ-পুর্ণেমত, মক্তুবাতে - সদী, তথা মক্তুবাতে দোসদী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে তৎকালীন কিছু উল্লেখযোগ্য সুফীদের জীবন তথা তাঁদের বানী ও তৎকালীন যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি সম্পর্কে একটি আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলিমদের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো কোরাণ এবং হাদিস। এখানে মুহম্মদের বাণী ও মুসলিমদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তারা মুহম্মদের বাণী বা কথা অনুযায়ী সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে ভালবাসেন। তারা তাদের

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু হিজরার প্রায় একশ বছর পর কোরাণ এবং হাদিসের বাহ্যিক ব্যাখায় সন্তুষ্ট না থেকে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু মুসলিম নিজেদের আরো গূঢ়, রহস্যমুলক চিন্তাভাবনায় নিয়োজিত করেন। এই আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যের মাধ্যমে তারা আল্লার সঙ্গে নিজেদের এক করতে চেয়েছিল। কিন্তু এর জন্য ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক দিকটিই তাদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। তারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে চেয়েছিল এবং তাদের এই প্রচেষ্টার পথ ধরেই ইতিহাসে সুফীবাদের উদ্ভব হয় যা ইতিহাসে তার প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

সুফীবাদ ইসলামের উদ্ভবের প্রায় সমসাময়িক সময় থেকেই উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এমন কি স্বয়ং হজরত মুহম্মদের মধ্যেও এই সুফীবাদের বীজ লুকিয়ে ছিল বলে বলা হয়ে থাকে এবং তা পরবর্তীকালে মুসলিম ধর্মের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবাহিত হয়েছিল বলা চলে। "ইল্ম-ই-সিনা" নামক হজরতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের বা কোন বিষয় ব্যক্ত করার এক বিশেষ পদ্ধতি থেকেই সুফীবাদের ধারণা আসে। কারণ এই ইল্ম-ই-সিনা ছিল রহস্যময় বা অতীন্দ্রিয়বাদের আলোচনা যা সুফীরা শিক্ষা নিতেন। সুফীবাদ সত্যের পথ এবং সঠিক পথ-এই ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুফীবাদ আল্লার কাছে প্রার্থনা, আল্লার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজন, পার্থিব জগতের মিথ্যা চাকচিক্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা বা ঔদাসীন্যতা, সুখ ও সম্পদ পরিহার, অধিকার পরিহার, দুঃখ বেদনা গ্রহণ, অপরের দুঃখে দুখী হওয়া, মানুষকে সেবা করা, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের দুঃখ মেটানো ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইসলামের অনেক ব্যাখ্যা থেকেই ইসলাম ধর্মে সুফীবাদের যে অস্তিত্ত্ব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাখ্যায় অনেক ক্ষেত্রেই পাপের প্রতি সতকর্তা, চূড়ান্ত. বিচারের সময়, নরক যন্ত্রনা ভোগ, কবরে যন্ত্রনা পাওয়ার মতো অনেক কথাই বলা আছে যা মুসলিমদের ভীত করে তুলেছিল এবং তারা পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে, তাদের সম্পত্তি ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে দান করে সর্বস্ব হারিয়ে দুঃখ-দারিদ্র ইত্যাদি গ্রহণের মধ্য দিয়ে গর্ব অনুভব করেছিল। এক কথায় এঁদেরই ইসলামে সুফীবাদের আদিম বাহক বলা যায়।

হজরতের শিষ্যরা খুবই সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন এবং তাঁরা আল্লা ও তাঁর বিচারকে ভয় পেতেন। মুহম্মদের সঙ্গী তথা "আহ্লস্-সুফা" এর সদস্য আবুদারদা প্রভৃতির কথায় মুসলিমদের বিলাসবর্জিত জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শুধুমাত্র

ঈশ্বর ভীতি ও শাস্তির ভয়েই অনেক মুসলিম বা সুফী তপস্বীররা যোগীরূপ গ্রহণ করতেন বা পার্থিব জগতের প্রতি ঔদাসীন্যতা দেখাতেন তাই-ই নয় এর পিছনে অর্থনৈতিক অবস্থাও দায়ী ছিল। উম্মায়িদ বংশের বংশানুক্রমিক শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু ধর্মীয়, শান্তি প্রিয় ব্যক্তি নিজেদের আল্লার কাছে সঁপে দেওয়ার এবং নিঃসঙ্গতা বা নির্জনতায় বসবাস করার নীতি নেন এবং এইভাবেই একধরনের যোগী বা তপস্বী এবং পার্থিব জগতের সুখ আহ্লাদ থেকে বিরত জীবন ধারার সূত্রপাত হয় যা সুফীবাদ নাম পরিচিত এবং যার কিছু উল্লেখযোগ্য সদস্য ঃ-আবুল-হাসান-অলবাসির আবুজর অল গিফারী এবং হুজাইফাকে ইসলামে সুফীবাদের প্রকৃত পূর্বপুরুষ বলা যেতে পারে। এছাড়াও এই সময় ইব্রাহিম-বিন আদম ফুজাইল-বিন আয়াজ, বসরার রাবিয়া ইত্যাদি সুফীরা ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুফীবাদ মুলত ভালোবাসার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুফীবাদ ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লার সঙ্গে মানুষকে এক করতে চেয়েছিল এবং এখান থেকেই সুফীবাদের ভালোবাসার নীতি স্থান পায় যা পরবর্তীকালের সুফীদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল এবং সুফী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

সুফীরা ও তাঁদের শিষ্যরাও বহু সাহিত্য রচনা করেছিলেন যা থেকে আমরা তৎকালীন ইতিহাসের একাধিক কথা জানতে পারি। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে সুফীবাদের ইতিহাস রচনা করার কাজ খুবই কঠিন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুফী সাহিত্যিক উপাদান কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা অনেক সময় সমকালীন ঐতিহাসিকেরা ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তথা দূরদৃষ্টির অভাবহেতু সুফীদের রচিত সাহিত্যিক উপাদানগুলির গুরুত্ব বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই ভারতে সুফীদের ও তাদের সমকালীন ইতিহাস রচনায় অনেক বিতর্ক আছে। কালের অনিবার্য কষাঘাতে এই সমস্ত লেখাগুলিতেও অনেক পরিবর্তন সাধন বা সংযোজন হয়েছিল অথবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সুফীদের তথা তাঁদের সমকালীন ইতিহাসের সম্যক ধারণা অনেক সময়ই আমরা পাই না তাই তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন এবং ঐতিহাসিক তথ্যের যথার্থতা নির্ণয়ের কাজে মাঝে মধ্যেই ভারতে সুফী ও তাঁদের সমকালীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছু তৎকালীন সুফী সাহিত্যিক উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ-

(১) **সৈয়দ মুহম্মদ বিন মুবারক কিরমানি** এবং আমীর খুর্দ এঁদের লেখা আত্মজীবনীমুলক সাহিত্য ''সিয়ার-উল-ওয়ালিয়া''

(২) **মৌলনা-আব্দুল-হক্-দেহলভী** এঁর লেখা " আখবারুল-আখিয়ার" যা থেকে আমরা সুফীবাদের কাদিরিয়া নীতির কথা জানতে পারি।

(৩) **আব্দুল-হাসিম** এবং পীর ইমামুদ্দিন রাজগিরির লেখা "মানাহিজ-উস্-সুত্তার।

(৪) **আব্দুর-রহমান-চিস্তি** এঁর লেখা দুটি সাহিত্যিক গ্রন্থ "(ক) মিরাত-উল-তসরার (খ) মিরাতে মাদারী"

(৫) **মুহম্মদ গেঁউতি-বিন-হাসান-বিন-মুসা-সত্তারি** এঁর লেখা তজকিরাহ্। এটা আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে তাঁর অনুরোধে লেখা এবং জাহাঙ্গীরের নামে উৎসর্গীকৃত সাহিত্য। এটি ৫টি চমনে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। যার প্রথম চমন থেকে হিজরার পরবর্তী সপ্তম শতকে সুফীদের কথা জানা যায়। দ্বিতীয় চমন থেকে অষ্টম শতকের সুফীদের কথা, তৃতীয় চমন থেকে নবম শতকে সুফীদের কথা, চতুর্থ চমন থেকে দশম শতকে এবং পঞ্চম চমন থেকে আমরা সুফীদের সাত্তারিয়া নীতির কথা পাই। এছাড়াও এই গ্রন্থটি থেকে আমরা গুজরাটের ইতিহাস ও ভারতের তৎকালীন ইতিহাস জানতে পারি। এছাড়াও এখান থেকে মুহম্মদীয় ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের কথাও জানা যায়।

(৬) যুবরাজ দারাসিকোর লেখা গ্রন্থ **"সফিনা-তুল-ওয়ালিয়া"**

এই সমস্ত আত্মজীবনীমূলক রচনা ছাড়াও বেশ কিছু মালফুজাত থেকে আমরা ভারতে তৎকালীন সুফীদের এবং তাদের সমসাময়িক ইতিহাসের কথা জানতে পারি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ- (১) **কবি আমীর হাসান সিজ্জি**-এঁর লেখা "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ"।

(২) হামিদ কালান্দার এঁর লেখা "খোয়ারুল মজালিস"।

(৩) **মুহম্মদ কাশিম-বিন-হিন্দুখানের** লেখা "গুলসন-ই-ইব্রাহিমি বা তারিখী ফরিস্তা।

(৪) **মালফুজাত-এ-রুখনি**।

(৫) **আবুল ফজলের আইনী আকবরী** ইত্যাদি রচনা থেকে ভারতে সুফীদের কথা ও সমকালীন ইতিহাস জানা যায়।

এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে অনেক সুফীসন্ত ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু সুফী ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন্ ঃ সেখ হুসেন জঞ্জানি, সেখ আবু তোরাব, সেখ মুহম্মদ, সেখ ইসমাইল ইত্যাদিরা ছিলেন বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য।

সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সুফী ধর্মেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যথা:-

চিস্তি সুহারবর্দী, কাদরি, ফিরদৌসী, নক্সবন্দী ইত্যাদি। এখানে চিস্তি এবং সুহারবর্দী গোষ্ঠীর সুফীদের ও তাদের সমকালীন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হলো।

## চিস্তি সম্প্রদায়

### খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি

ভারতে চিস্তি সুফীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি। জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে এবং ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হন। এই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে মুহম্মদ ঘুরী উত্তর ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ''ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ'', ''সিয়ারুল-ওয়ালিয়া'', প্রভৃতি মালফুজাত ও সাহিত্যিক উপাদান থেকে জানা যায় যে মুহম্মদ ঘুরী উত্তর ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করলে তা চৌহান বংশীয় শাসক পৃথ্বীরাজ চৌহানকে যথেষ্ট ভীত ও শঙ্কিত করে তুলে ছিল। শুধুমাত্র তাঁর কাছে নয়, এই ঘটনাটি দিল্লী ও আজমীরের শাসকের কাছেও অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১খৃঃ) মুহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের হাতে পরাজিত হন, কিন্তু ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। এই সময় খাজা মৈনুদ্দিন মুহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে ভারতে আসেন বলে মনে করা হয়, যদিও এটা নিয়ে বিতর্ক আছে।

মীরখুর্দ এঁর লেখা ''সিয়ারুল-ওয়ালিয়া'' থেকে জানা যায় যে, পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে হিন্দুরা মুসলিমদের ঘৃণার চোখে দেখতো। এমনকি খাজা মৈনুদ্দিন পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজত্বকালে আজমীরে গেলে তাঁকে খেতে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছিল এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দু পুরোহিতগণ তাঁকে আজমীর থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। এটা থেকে বোঝা যায় যে এই সময় মুসলিমদের সঙ্গে হিন্দুদের যে কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন অপবিত্র বলে মনে করা হতো। যদি ''সিয়ারুল-ওয়ালিয়া''র লিখিত এই তথ্য সত্য হয় তাহলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খাজা মৈনুদ্দিন পৃথ্বীরাজ চৌহানের জীবিতাবস্থায় ভারতে এসেছিলেন। এছাড়াও আব্দুল হকের লেখা ''আখবারুল-আখিয়ার'' থেকে তরাইনের যুদ্ধের সময় ভারতে খাজা মৈনুদ্দিনের আগমন সমর্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এই সময় খাজা মৈনুদ্দিনের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বাণীতে আকর্ষিত হয়ে অনেক হিন্দু জনগণই মুসলিম ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

খাজা মৈনুদ্দিন জনসাধারণের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। তিনি শান্তি, একতা ও জনগণের মধ্যে মৈত্রী, সৌহার্দমূলক সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিতেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মের লোকদের সহানুভূতির চোখে দেখতেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন মনুষ্যত্বের

সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে ধর্ম হলো গরীব দুঃখীদের সেবা করা, তাদের চাওয়া পাওয়ার কথা, তাদের ক্ষুধাকে অনুভব করা অর্থাৎ মানুষকে সেবা করাই হলো প্রকৃত ধর্ম। তিনি তাঁর শিষ্যদের "দিল-দরিয়া" হতে অর্থাৎ নদীর মত বিশাল মনের অধিকারী হতে পরামর্শ দিতেন। তাঁর কাছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণ আশীবার্দ গ্রহণ করতেন।

**খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী**

ইনি ছিলন সুফী ধর্মের চিস্তি সম্প্রদায়ের অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি দিল্লীতে ছিলেন এবং জনসাধারণের কাছে অসম্ভব প্রিয় ছিলেন। তিনি উপনিষদীয় দর্শনে তথা মুহম্মদের চিন্তা ভাবনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি যদিও প্রচন্ড জাঁকজঁমকের মধ্যে থাকতেন কিন্তু তিনি কখনোই সরকারী কাজ বা সম্রাটের কাছ থেকে কোন প্রকার উপহার পছন্দ করতেন না। তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের সমসাময়িক ছিলেন। ইলতুৎমিস তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান আধ্যাত্মিক গুরু বলে স্বীকার করতে চাইলেও খাজা কুতুবউদ্দিন সেই পদ গ্রহণ করেন নি। বরং উল্টে সুলতানকে তিনি গরীব দুঃখী জনসাধারণের সেবা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে " ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" প্রভৃতি মালফুজাত থেকে জানা যায়। এই সমস্ত মালফুজাত থেকে এটাও জানা যায় যে, কোনো কারণবশত খাজা কুতুবউদ্দিন দিল্লী থেকে চলে যেতে উদ্যোগী হলে জনসাধারণ তাঁকে বাধা দান করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং সুলতান ইলতুৎমিস। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে খাজা কুতুবউদ্দিন দিল্লীর মেহেরৌলী নামক স্থানে মারা যান এবং এখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। পরে সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর উদ্দেশ্যে কুতুবমিনার করেন বলে মনে করা হয়।

**বাবা ফরিদউদ্দিনগঞ্জে সকার**

ভারতবর্ষে চিস্তি সুফীদের মধ্যে ইনি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতের সুফী ধর্মকে একটি চিরস্থায়ী শক্ত ও বলিষ্ঠ আসন দানের পিছনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাবা ফরিদ কুতুবউদ্দিন বফতিয়ার কাকীর বানীতে বিবেশভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাবা ফরিদউদ্দিন তাঁর শিষ্যদের বলতেন আল্লা সর্বত্রই এবং সবার মধ্যে বিরাজমান। তিনি ছিলেন প্রকৃতই জ্ঞানী এবং তাঁর বাণী শোনার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে রাজনীতিজ্ঞ ইত্যাদি শ্রেণীর প্রচুর লোক আসতেন। তিনি সহজ পাঞ্জাবী ভাষায় তাঁর দোঁহা রচনা করেছিলেন যা শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আদি গ্রন্থতে পাওয়া যায়।প্রায় ১১২টি মতান্তরে ১৩৪টি দোঁহা এখানে স্থান পেয়েছে বলে মনে করা হয় যা থেকে বোঝা যায় তিনি হিন্দুদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বাবা ফরিদ

বলতেন যে সুফীবাদের মূল পথ হল মনোনিবেশ এবং আল্লাকে আরাধনা করা। দিল্লীর সুলতানীর দুই বিখ্যাত শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এবং সুলতান আলাউদ্দিন খলজী তাঁর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শোনা যায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাবা ফরিদকে চারটি গ্রামে মুক্তা দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি কারণ বাবা ফরিদ বলতেন সরকারী কাজ ও জায়গীর মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণমনা এবং আত্মাকে অপবিত্র করে তোলে। বাবা ফরিদ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন তাঁরা হলেন সাধুসন্ত মানুষ এবং তাঁদের মূল সাধনাই হলো অমর আত্মার উপাসনা ও তাঁর জগতে বিচরণ, কোনো পার্থিব জগৎ নয়। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলন যথেষ্ট উদার এবং উচ্চ-নীচ, সাদা-কালো ভেদে প্রত্যেকেই আল্লার সন্তান বলে তিনি মনে করতেন। তৎকালীন ভক্তি আন্দোলনকারীরাও তাঁর আদর্শের দ্বারা কতকাংশে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ‘‘আসরাউল-ওয়ালিয়া’’ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বাবা ফরিদ বাগদাদ, বুখারা, কান্দাহার, গজনী ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং এটাও মনে করা হয় যে বাবা ফরিদ বাংলাদেশের ফরিদপুর নামক স্থানে গিয়েছিলেন এবং এই ‘‘ফরিদপুর’’ নামকরণটিও তাঁর নামানুসারে হয়েছিল। যদিও ‘‘ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ’’, ‘‘খোয়ারুল-মজালিস’’ প্রভৃতি সুফী সাহিত্যিক উপাদান এব্যাপারে কোনো সঠিক তথ্য প্রদান না করায় যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

**সেখ নিজামুদ্দিন-আউলিয়া**

চিস্তি সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত সুফী ছিলেন সেখ নিজামুদ্দিন-আউলিয়া। আজুধানে তাঁর সঙ্গে সেখ ফরিদের দেখা হয় যাঁর কথা .ও বাণীতে আকৃষ্ঠ হয়ে তিনি চিস্তি সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এক উল্লেখযোগ্য সুফী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন বলে ‘‘সিয়ারুল-ওয়ালিস’’, ‘‘ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ’’ প্রভৃতি সুফী সাহিত্য থেকে জানা যায়।

‘‘সিয়ারুল-ওয়ালিয়া’’ থেকে জানা যায় যে সেখ নিজামুদ্দিন তাঁর জীবনকালে দিল্লীর সিংহাসনে সাতজন সুলতানের রাজত্বকাল দেখেছিলেন। তবে ‘‘সিয়ারুল-ওয়ালিয়া’’ থেকে জানা যায় যে তিনি কোনো সম্রাটের দরবারে যান নি। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের বংশধর কাইকোবাদ কিলুঘেরীতে তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করায় সেখানে লোক সমাগম ঘটতে থাকলে সেখ নিজামুদ্দিন গিয়াতপুর যেতে মনস্থির করেন। কিন্তু পরে তাঁর মতের পরিবর্তন হয়।.সুলতান জালালউদ্দিন খলজী সেখ নিজামুদ্দিনের ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়ে তাঁর ‘‘জমায়েতখানা’’ (আশ্রম) চালাবার জন্য একটি গ্রাম দান করতে চাইলেও সেখ নিজামুদ্দিন তা নিতে অস্বীকার করেন। এছাড়া সুলতান

আলাউদ্দিন খলজীর সময় কিছু উলেমা সেখ নিজামুদ্দিনের জনপ্রিয়তায় হিংসাবোধ করে আলাউদ্দিনের কানভারী করলে তিনি তাঁর পুত্র খিদির খানকে দিয়ে সেখ নিজামুদ্দিনর বিরুদ্ধে পত্র পাঠালে সেখ বলেন তিনি ফকির এবং রাষ্ট্রীয় কাজে হস্তক্ষেপ করার তাঁর কোন ইচ্ছা নেই। ''ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ'', ''সিয়ারুল-ওয়ালিয়া'' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সুলতান কুতুবউদ্দিন-মুবারক-খলজী তাঁকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর ছেলে খিদির খানকে সাহায্য করার অপরাধে তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হন। এছাড়াও এই সময় সুলতান মুবারক-খলজী সেখের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্য মুলতান থেকে সেখ রুকনুদ্দিনকে নিয়ে আসলেও রুকনুদ্দিনও সেখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

সুলতানি যুগের অপর এক শাসক গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সঙ্গে সেখ নিজামুদ্দিনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেখ কর্তৃক অবাধে গরীবদের মধ্যে ধন বিতরণ 'সমা' নামক এক সুফী গানবাজনা শোনার ব্যাপার সহ আরো কিছু বিষয়ে সেখ নিজামুদ্দিনের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল বলে জানা যায় যদিও এই তথ্যের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। সেখ নিজামুদ্দিনের ব্যক্তিত্বের ফলেই সমগ্র ভারতে সুফীবাদ বিকাশিত হয়েছিল বলা চলে। তিনি ''রাহাতুল-কুলুব'' নামক একটি সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেখ নিজামুদ্দিনের সঙ্গে জনসাধারণের ভাল সম্পর্ক ছিল। তাঁর খানকা বিদ্যাচর্চার একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন বহু বিদগ্ধ পন্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে ''চিরাগে-দিল্লী' নামে পরিচিত নাসিরউদ্দিন মামুদ, বাংলার আখী সিরাজুদ্দিন উৎমান, দক্ষিণাত্যের বুরহানুদ্দিন গহরিব, ''ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ'' এর লেখক আমীর হাসান সিজ্জী ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে সেখ নিজামুদ্দিনের মৃত্যু হয় এবং ''সিয়ারুল-ওয়ালিয়া'', ''ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ'' প্রভৃতি সুফী সাহিত্য থেকে জানা যায় যে সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলক সেখের কফিন বহন করেছিলেন।

## সুহারবর্দী সম্প্রদায়

### সেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মূলতানি

সুফী ধর্মের চিস্তি শাখার মতো সুহারবর্দী শাখাও ভারতে সুফী ধর্ম ও সাহিত্যের উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। সুহারবর্দী ভাবধারার প্রবর্তক ছিলেন পারস্যের সেখ শিহাবুদ্দিন সুহারবর্দী। তাঁরই এক উল্লেখযোগ্য শিষ্য সেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মূলতানি ভারতে সুহারবর্দী ভাবধারা বহন করে নিয়ে আসেন। ''ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ'' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া বাগদাদে

সেখ শিহাবুদ্দিন সুহারবর্দীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেখ শিহাবুদ্দিন বাহাউদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে "খিরকা-এ-খিলাফত" বা আল্লার হয়ে ধর্ম প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে মুলতান ও ভারতে সুহারবর্দী ভাবধারা প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। "'আখবারুল-আখিয়ার" নামক সুফী সাহিত্য থেকে জানা যায় যে ভারতে সুফীরা প্রথমে সেখ বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করলেও পরে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেন। তাঁর খানকায় তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রচুর লোক সমাগম হতো এবং এঁদের অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তাঁর বানী খুব শীঘ্রই সিন্ধু, মুলতান, বালুচিস্তান ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ছড়িয়ে পরেছিল।

সেখ বাহাউদ্দিন ভারতে পর পর আট জন মামেলুক সুলতানের রাজত্বকাল দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তিনি অনেক সুলতানের ও সরকারী কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন কুবাচা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান এবং ইলতুৎমিস তাঁকে "সেখ-উল-ইসলাম" নামক পদ দান করেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদের সময় মোঙ্গলরা তাদের মুলতান আক্রমণের মাধ্যমে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং দ্বিতীয়বার তাদের মুলতান অভিযানকালে সেখ বাহাউদ্দিন স্বয়ং মোঙ্গলদের কাছে যান এবং ১ লক্ষ দিরহাম অর্থদানের মাধ্যমে মোঙ্গলদের মুলতান আক্রমণ থেকে বিরত করেন। "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেখ বাহাউদ্দিন নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা না করলেও নিম্ন শ্রেণীর তথা সাধারণ লোকের দুঃখ দারিদ্রে প্রচুর অর্থ দিয়ে এবং কখনো কখনো সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাহায্য করতেন। এছাড়াও মুলতানে একবার দুর্ভিক্ষ হলে তিনি প্রচুর অর্থ দিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখ বাহাউদ্দিন শ্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং চাষবাস, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকে রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলকর বলে মনে করতেন। তিনি কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য জঙ্গল জমি কেটে উর্বর ক্ষেত্র তৈরী এবং মুলতানের জলধারা, কুয়ো ও নদনদীগুলির সংস্কারের উপর জোর দিয়েছিলেন যা থেকে তাঁর সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। যাইহোক তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ফলে যে প্রচুর পরিমাণে সুফীদের জীবন হানি হয়েছিল তার ফলে ভারতে সুহারবর্দী গোষ্ঠীর সুফীদের প্রভাব কমে যায়, যদিও জালালউদ্দিন-তাব্রেজী বাংলায় সুহারবর্দী ভাবধারার প্রচার করেছিলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে যত সুফী সাহিত্য আছে যেমন ফুয়ায়েদ-উল-

ফুয়াদ, খোয়ারুল মজালিস ইত্যাদি থেকে আমরা ভারতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সুফী তথা তাঁদের কার্যকলাপের এবং সমকালীন ইতিহাসের একটি চিত্র পাই। এর থেকে দেখা যায় যে, এই সমস্ত সুফী সাহিত্যগুলি শুধুমাত্র প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গুণাবলীর ইতিহাসই নয় - এখান থেকে তৎকালীন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদিরও কথা জানতে পারি। সুতরাং যদি এই সমস্ত উপাদানগুলি খুব সচেতনভাবে অনুধাবন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই সমস্ত উপেক্ষিত সাহিত্যিক উপাদানগুলি থেকেও আমরা তৎকালীন যুগের বিভিন্ন ঐতাহাসিক তথ্য পাই - যা আমাদের পুনরায় ভাবিয়ে তোলে এবং এটাই প্রমাণ করে যে এই সমস্ত উপাদানগুলিকে পুনরায় ইতিহাসের এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন আছে।

# সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সম্রাট শাহ্ আলমের রাজত্বকালের
# দু''টি শিলালিপি

মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন শাহজাহান

সাধারণ ভাবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান সর্বজন গৃহীত ও স্বীকৃত বলে প্রমাণিত, তার মধ্যে অন্যতম হল শিলালিপির ভাষ্য। শিলালিপি থেকে লিপির কাল, শিলালিপি যিনি উৎকীর্ণ করেছেন তার নাম ও পদবী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। শিলালিপি ঘোষণা করে থাকে সমকালীন সময়ের রাজত্বের কথা, রাজা অথবা বাদশাহর কথা, সমকালীন ইতিহাসের ইতিকথা। শিলালিপি কালের করাল গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যাবলী নিখুঁতভাবে বক্ষে ধারণ করে। শিলালিপি থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসেরই নয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্থাপিত হয়েছিল মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সময়ের স্থাপত্য বেশীরভাগ ধ্বংস হয়ে গেলেও শিলালিপিগুলো ধ্বংস হয়নি। স্থাপত্য বিশারদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকরা অনেক ক্ষেত্রে শিলালিপিগুলো পাঠোদ্ধার করেছেন, এবং এগুলোর মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুনর্গঠন করেছেন। একথা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক আমলের আগ্রাসনে মধ্যযুগে উপমহাদেশে মুসলিম সুলতানাতের ঐতিহাসিক অনেক সূত্র হারিয়ে গেলেও শিলালিপি, মুদ্রা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জীবনবৃত্তান্ত ইত্যাদি থেকেই আধুনিক ঐতিহাসিকরা ইতিহাস পুনরুদ্ধারে যথেষ্ঠ সফলতা অর্জন করেছেন।

এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানদের অধীন বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে। যদিও কোন কোন সময় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেছেন বাংলার প্রশসকরা কিন্তু সফলকাম হননি। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেছেন বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শের শাহ্ তৎকালীন বাংলার রাজধানী দখল করে নিলে বাংলাদেশ আবারও দিল্লীর সালতানের অধীন চলে যায়। তারপর ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শের শাহের মৃত্যুর পর ১৫৪৬/১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে

আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন কিছু সংখক ভূস্বামীগণ শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন এবং স্বাধীন ভুস্বামীদেরকে পরাজিত করে ১৬০৮ খ্রীষ্টব্দের মধ্যে বাংলার প্রায় সাকুল্য অঞ্চলেই মোগল আধিপত্য কায়েম করেন।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহুসংখক মসজিদ, মাদ্রাসা, খানাকা, দুর্গ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর বাংলার স্বাধীন নবাবী আমল শুরু হলে বাংলার স্থাপত্যিক উৎকর্ষের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বৃটিশ বর্ষনীয়া গোষ্ঠী এই অঞ্চল অধিকার করে নেওয়ার পরও বাংলার এই অঞ্চলে মসজিদ মাদ্রাসা সহ আখড়া ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে বহুসংখক স্থাপত্য। ঐ সকল স্থাপত্যে শিলালিপি ও উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের শিলালিপিগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আরবি ভাষায় লিখিত। মোগল আমলের শিলালিপিগুলো আরবি-ফারসি মিশ্রিত ভাষায় অথবা শুধুমাত্র ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার স্বাধীন সুলতানী আমল এবং মোগল আমলে যে সকল মলজিদ স্থাপিত হয়েছিল সেই মসজিদগুলোর মধ্যে সুলতানী আমলের মসজিদ সমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। শিলালিপিগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ধ্বংস স্তুপের মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অপসারিত হয়েছে। মোগল আমলে বেশ কয়েকটি মসজিদ বিভিন্ন ভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে মেরামতের পরেও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে অনেক মসজিদেরই উৎকীর্ণ শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। যেগুলো পাওয়া গেছে সেই শিলালিপিগুলো সম্বন্ধে শামস আহমেদ,আহমদ হাসান দানী, ওয়াই.কে.বোখারী, এইচ.ই.স্টেপেলটন, এইচ ব্লখম্যান প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ব বিশারদগণ আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই নিবন্ধে আলোচিত দুটি শিলালিপি সম্পর্কে কোন আলোচনা অথবা প্রকাশনা ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। শিলালিপি দুটি প্রত্নতত্ত্ব বিশারদদের দৃষ্টির অগোচরে থাকার কারণ সম্পর্কে বলা যায় যে, শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান দুটি একসময় নীলকরদের অত্যাচারে জনহীন ভূমিতে পরিণত হয়।[১] ফলে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায় মসজিদ ও তার আশপাশ স্থানগুলো।[২] সম্ভবত এর ফলেই প্রত্নতত্ত্ববিদদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় দুটি মসজিদের এই দুটি শিলালিপি। পরবর্তী সময় এই এলাকাগুলো আবার বসতিপূর্ণ হয়। ফলে মসজিদগুলো আবাদ হয়, উন্মোচিত হয় শিলালিপিগুলো।

## স্থান নামের উপর ভিত্তি করে শিলালিপির পরিচিতি

(১) হরশি শিলালিপি

(২) কাতিয়ারচর শিলালিপি

হরশি শিলালিপি সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। কাতিয়ারচর শিলালিপি সম্রাট শাহ্ আলমের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ।

## হরশি শিলালিপি

**ভৌগোলিক অবস্থান ঃ**

কিশোরগঞ্জ জেলায় পাকুন্দিয়া থানার অন্তগর্ত "হরশি" একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। পাকুন্দিয়া সদর থেকে হরশি গ্রামের দূরত্ব প্রায় দু কিলোমিটার। কিশোরগঞ্জ জেলা সদর থেকে হরশি গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৯ কিলোমিটার। বাংলার মধ্যযুগের প্রাচীন নদীবন্দর ও দূর্গনগরী এগারসিন্দুর, মিরজাফরপুর ইত্যাদি গ্রামগলো হরশি গ্রামের আশে পাশে অবস্থিত।

**শিলালিপির প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ**

কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাপ্ত সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক মাত্র শিলালিপি। শিলালিপিটি হরশি গ্রামের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে। মসজিদটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালেই নির্মিত হয়েছে।

**প্রাসঙ্গিক বিবরণ ঃ**

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে হরশি মসজিদটি "বাবুন" নামে একজন নির্মাণ করে ছিলেন। "বাবুন" তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কোন দায়িত্বে ছিলেন এ সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য এখন আর পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি রয়েছে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে এই স্থানটিতে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল।[৩] ফলে ভারত সম্রাটের কোন উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে "বাবুন" এই স্থানে আগমন করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। তিনি এখানে বেশ কিছু দালান ও কোঠা নির্মাণ করেছিলেন।[৪] খনন করেছিলেন ১০টি বড় পুকুর। পুকুর গুলোর মধ্যে বেশিরভাগ পুকুরের অস্তিত্ব এখন না থাকলেও আজও এলাকার লোকজন পুকুরগুলোর বিচিত্র নাম বলতে পারেন। নেয়ামত উল্লার পুকুর, খন্দকার পুকুর, বালাখানা পুকুর, পিলখানা পুকুর, অন্দরের পুকুর ইত্যাদি।[৫] পুকুর গুলোর নাম থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, "বাবুন" মোগল সালতানাতের একজন আঞ্চলিক প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্রের প্রয়োজনেই দালান-কোঠা এবং পুকুরগুলো খনন করিয়েছিলেন।[৬]

শিলালিপির ভাষ্য অনুযায়ী "বাবুন" ছিলেন মিয়া খন্দকার নামে একজন সুফীসাধকের মুরিদ (শিষ্য)। প্রশাসনিক কোন পদের দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত ছিলেন, এই প্রসঙ্গটি শিলালিপিতে উল্লেখিত হয়নি। শুধু মাত্র তার পীর মিয়া খন্দকারের নামটি লিপিবদ্ধ করার থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে আলোচ্য মসজিদটি মিয়া খন্দকারকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল। খন্দকার পুকুরটি সম্ভবত মিয়া খন্দকারের অবস্থানকে

কেন্দ্র করে খনন করা হয়েছিল। পুকুরগুলোর অবস্থানগত দিক পর্যালোচনা করলে অনুমান করা যায় যে, মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল তার প্রশাসনিক কেন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থানে।

মোগল স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন মসজিদটির সম্মুখের দেওয়াল এবং মেহ্‌রাবে সুলতানী আমলের মসজিদ স্থাপত্যের ব্যবহৃত টেরাকোটা অলংকরণ বিষয়টি খুবই চমৎকার। কিশোরগঞ্জ জেলার সুলতানী আমল অথবা মোগল আমলের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে এই মসজিদের গম্বুজটি বেশ বড় ধরনের গম্বুজ বলা চলে। মসজিদটিকে বার বার মেরামত ও সংস্কারের ফলে নির্মাণকালীন আলংকারিক সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছে।

**শিলালিপির বিবরণ**

শিলালিপিটি মূল্যবান কালো কষ্ঠি পাথরে উৎকীর্ণ। শিলালিপির আয়তন ২'x১'-২"। ৩ পঙ্‌ক্তিতে লেখা শিলালিপির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে তসমিয়া এবং কলেমা তায়্যেবা লিখিত। ২য় এবং ৩য় পঙ্‌ক্তিতে ফারসি ভাষায় লিখিত রয়েছে শিলালিপির মূল বক্তব্য। শিলালিপিটি কবিতার ছন্দে প্রাচীন নাস্তালিক পদ্ধতিতে লিখিত। শব্দ ও বর্ণের রূপায়ণে লেখার ভাব চমৎকার ভাবে প্রস্ফুটিত একথা বলা যাবেনা। মোগল আমলের লিখন পদ্ধতিতেই লিখিত এই শিলালিপিটি অক্ষর ও শব্দগুলো গোলায়িত ও ঢালু।

**শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ**

بسم الله الرحمن الرحيم    لا اله الا الله محمد رسول الله

بر دور شاه عادل اورنگ زیب    بنا کرد خوش مسجد دلفریب

ببون آن مرید میان خوندکار    بتاریخ هشتاد و شش بر هزار

অনুবাদ ঃ

(১) *শুরু করছি দয়ালু এবং দয়ার দাতা আল্লাহ্‌র নামে*
*আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই হযরত মোহম্মদ (সাঃ) আল্লহ্‌র রসুল।*

(২) *ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের সময় এই মনমুগ্ধকর মসজিদটি নির্মাণ করেন।*

(৩) *বাবুন যিনি মিয়া খন্দকারের মুরিদ। মসজিদের নির্মানকাল ১০৮৬ হিজরী (১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)।*

**লিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার ও সাধারণ আলোচনা ঃ**

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই শিলালিপিটি ছাড়া আরো যেসকল শিলালিপি বাংলাদেশে আবিস্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে চট্রগ্রামে ২টি, ঢাকা শহরের লালবাগ দূর্গে ১টি অন্যতম। এই তিনটি শিলালিপির বিবরণ শামসউদ্দিন আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭] কিন্তু আলোচ্য শিলালিপির কোন তথ্য তিনি উপস্থাপন করেননি। মসজিদটি সম্পর্কে আহমদ হাসান দানী আলোচনা করেন।[৮] সম্ভবত তিনি এই মসজিদটি ১৯৬১ সনের পূর্বে পরিদর্শন করেছিলেন। শিলালিপিটি তিনি দেখেছিলেন বলে তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেছেন। শিলালিপির উৎকীর্ণের তারিখ তিনি বলেছেন ১০৮০ হিজরি মোতাবে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।[৯] শিলালিপিটি যখন আমি পাঠোদ্ধার করি তখন সুস্পষ্ট দেখতে পাই যে লেখা রয়েছে تاریخ هشتاد و شش بر هزار তারিখ হাজারের উপর আট ও ছয়। অর্থাৎ ১০৮৬ হিজরীতে নির্মিত।

শিলালিপিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ন্যায় বিচারক বাদশাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ঐ সময় দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

শিলালিপিতে বর্ণিত বাবুন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারনা করা যায় না। তবে মসজিদের আশেপাশে বিভিন্ন প্রত্নত্তাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ এবং পুকুরগুলোর নাম থেকে অনুমান করা যায় যে বাবুন তৎকালীন সুবা বাংলার অধীনে এই অঞ্চলের এক জন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট শাহ জাহানের রাজত্বকালে এগারসিন্ধুর সহ এই অঞ্চল অধিকার করেছিলেন আসামের তৎকালীন রাজা। এই শিলালিপি থেকে অনুমান করা যায় যে, সম্রাট অওরঙ্গজেবের সময় আসামের রাজা এই অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিলেন।

**ভাষা ও লিপি বিশ্লেষণ ঃ**

এই উৎকীর্ণ লিপিটি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই লিপিটি কোন সুদক্ষ লিখন শিল্পীর দ্বারা লিখিত হয়নি। ভাষা কিংবা বাক্যগত কোন ভুল পরিলক্ষিত না হলেও শিলালিপিটির অলংকরণ কৌশলটিকে চমৎকার বলা যাবে না। শিলালিপিটির উৎকীর্ণ কাল ভারতীয় উপমহাদেশে সুহস্থ লিখন শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও আলোচ্য শিলালিপিটির ক্ষেত্রে তেমন কোন শৈল্পিক সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় না।

# কাতিয়ারচর শিলালিপি

**ভৌগোলিক অবস্থান ঃ**

কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মারিয়া ইউনিয়নে প্রাচীন নদী সুন্ধনার তীরে কাতিয়ারচর গ্রামটি অবস্থিত। কিশোরগঞ্জ শহর থেকে কাতিয়ারচর গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২ কিলোমিটার পশ্চিমে। কাতিয়ারচর গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে শিলালিপির প্রাপ্তিস্থানে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি সাধারণত হযবর নিজাম উদ্দিন আহমদ শাহের দরগা মসজিদ বলে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

**প্রাসঙ্গিক বিবরণ ঃ**

ষোড়শ শতকের বাংলার ভাটির জমিদার ঈসা খান মসদন-ই-আলার ৭ম অধস্তন দেওয়ান হয়বর দাদ খান কৃর্তক প্রতিষ্ঠিত হয়বত নগর হাভেলীর পশ্চিম দিকে এক গম্বুজ বিশিষ্ঠ প্রাচীন এই মসজিদের সম্মুখ দেওয়ালের দরজার উপরে শিলালিপিটি উৎকীর্ণ রয়েছে। সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালে কিশোরগঞ্জ জেলায় যে কয়টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো এগুলোর মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর থানার অন্তর্গত কাতিয়ারচর গ্রামের এই মসজিদটি অন্যতম।

কথিত আছে ষোড়শ শতকের পূর্বে কাতিয়ারচর গ্রামটি কয়েকটি বিলের সমষ্টিতে জনবসতির অনুপযুক্ত ছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঈসা খানের ৭ম অধস্তন হয়বত দাদ খান জঙ্গলবাড়ী থেকে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলা সদর শহরের পশ্চিম দিকে এসে একটি বিশাল "হাভেলী" নির্মাণ করেন। হয়বত দাদ খানের নামেই স্থানটির নামকরণ হয় "হয়বতনগর"। হয়বতনগর হাভেলীর পশ্চিম প্রাচীর থেকে ঐ দিকে প্রায় ১ কিলোমিটার স্থান জুড়ে হয়বতনগর ষ্টেটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ জেলে, নাপিত, ধোপা, কামার-কুমোর, মুচি, পালকী বাহক, হাকিম-কবিরাজ প্রমুখ পেশাজীবি মানুষের বসতি গড়ে ওঠে।

প্রাচীন নদী সুন্ধনার দক্ষিণ তীরে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্বলিত এই এলাকাটির প্রথমে যে স্থানটিতে জনবসতি গড়ে উঠে সেই স্থানটিকে "কাতিয়ারচর" অর্থাৎ চরের অংশ নামকরণ করা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই স্থানে একজন সুফী দরবেশ আগমন করেছিলেন। জনবসতি বিহীন এই স্থানটিতে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতো এবং আশপাশ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতেন।

বলা হয় যে হয়বত দাদ খান যখন হাভেলী নির্মাণ করেন তখন এক রাতে তিনি

ঐ সুফী দরবেশকে স্বপ্নে দেখেন। সুফী দরবেশ তাকে বলেন "তোমার নব নির্মিত হাভেলীর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে নদীর তীরে একটি উচ্চ স্থান দেখতে পাবে। সেখানে রয়েছে একটি বিশাল বটবৃক্ষ। ঐ বটবৃক্ষের নীচে কয়েকটি ইট বিছানো অবস্থায় রয়েছে। ঐ স্থানটিকে তুমি হেফাজত করবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতি জ্বালাবে।"

স্বপ্নে প্রদত্ত এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে ঐ স্থানে দেওয়ান হয়বত দাদ খান প্রতি দিন সন্ধ্যায় বাতি জ্বালাতে থাকেন এবং জায়গাটিকে হেফাজতের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কথিত আছে একদিন প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টিতে দেওয়ান হয়বত দাদ খান ঐ স্থানে যেতে না পেরে তার হাভেলীর নিজাম উদ্দিন আহমদ নামের একজনকে বাতি জ্বালানোর জন্য প্রেরণ করেন। নিজাম উদ্দিন আহমদ তাঁর দায়িত্ব পালন করার পর পরই তাঁর সম্মুখে হযরত খিজির (আঃ) আর্বিভূত হন এবং নিজাম উদ্দিন আহমদকে কামালিয়াত প্রদান করেন।

এদিকে দায়িত্ব পালন শেষে নিজাম উদ্দিন আহমদ হাভেলীতে প্রত্যাবর্তন না করায় দেওয়ান হয়বত দাদ খান পর দিন খবর নিয়ে জানতে পারেন নিজাম উদ্দিন আহমদ ঐ স্থানে গভীর ধ্যানে এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল। এর পর থেকেই হজরত নিজাম উদ্দিন ঐ স্থানে অবস্থান করে এক সময় ওয়াফাত প্রাপ্ত হন। মসজিদটি সম্ভবত তাঁর জীবিত কালে তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল। কারণ শিলালিপিতে নিজাম উদ্দিন আহমদের নামটি উৎকীর্ণ থাকায় এই অনুমান করা যায়। অনেকের মতে মসজিদটি হয়বতনগর দেওয়ান সাহেবদের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল। তবে এই বিষয়টি সত্য নাও হতে পারে। কারণ তারা যদি এই মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করতেন তাহলে তাদের নাম অবশ্যই শিলালিপিতে থাকতো। তবে এমন হতে পারে হযরত নিজাম উদ্দিন আহমদ্ হয়বতনগর দেওয়ান সাহেবদের আত্মীয় অথবা তাদেরই পরিবারেব একজন হতে পারেন। ফলে এই শিলালিপিতে অন্য কারো নাম লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেওয়ান সাহেবরা অনুভব করেননি। তবে এ বিষয়টিও সত্য যে, হয়রত নিজাম উদ্দিন আহমদ যদি হয়বতনগর দেওয়ান সাহেবদের বংশের হতেন তাহলে তাঁর নামের শেষ "খান" শব্দটি অবশ্যই লিখিত থাকতো। কারণ তাদের কুরসী নামায় দেখা যায় প্রত্যেকের নামরে শেষে "খান" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হয়বতনগর হাভেলীতে বসবাসরত ঈসা খানের অধস্তনদের কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন যে, নিজাম উদ্দিন আহমদ হয়বতনগর ষ্টেটের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন।[১১]

এক গম্বুজ বিশিষ্ঠ অনিন্দ্যসুন্দর এই সমজিদটি মোঘল স্থাপত্যকলায় এবং বর্গাকারে নির্মিত। এই মসজিদের ভিতরের প্রত্যেক বাহুর পরিমান ১০'- ০"। মসজিদের গম্বুজটি খুবই চমৎকার।

**শিলালিপির বিবরণ ঃ**

শিলালিপিটি ফারসি ভাষায় কবিতা ছন্দে লিখিত রয়েছে। শিলালিপিটি নাস্তালিক পদ্ধতিতে লিখিত। দুটি লাইনে বিন্যস্ত এই শিলালিপিতে কোরাণ এবং হাদিসের কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি। অক্ষরগুলো গোলায়িত ও ঢালু। শব্দ ও বর্ণের রূপায়ণে লিপির গতিশীলতা চমৎকার ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। সুন্দর লিখন পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি মোঘল আমলের লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

কালো পাথরে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিটি উৎকীর্ণ তারিখ ১১৯০ হিজরী (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। শিলালিপিটি দুই পঙ্‌ক্তিতে ফারসি ভাষায় লিখিত। শিলালিপির আয়তনঃ ১ ফুট ৭ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৯ ইঞ্চি প্রশস্থ।

**শিলালিপির পাঠ ঃ**

**বাংলা অনুবাদ ঃ**

(সম্রাট) শাহ আলমের সর্বোত্তম রাজত্বকালে খলিলের (হযরত ইব্রাহীম আঃ) অনুরূপ মসজিদটি নির্মাণ করেন সহায় সম্বলহীন ফকির নিজাম উদ্দিন আহমদ। আর এটি হচ্ছে মানুষকে ধ্বংসকারী ছয়টি রিপু দমনের কেন্দ্রস্থল। (মসজিদ নির্মাণের তারিখ) ১১৯০ হিজরী (১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে)।

**লিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার ঃ**

এখানে উল্লেখ্য যে, যে সময়কালটিতে এই শিলালিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে ঐ সময়কালে মীরজাফরের বংশধরদের পক্ষ থেকে নবাব মোবারকদৌলা বাংলার

নিজামতের দায়িত্ব থাকলেও প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ঐ সময় বাংলার গভর্ণর ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। দুটি কারণে হেস্টিংসের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানী নিজের হাতে দেশের শাসন ভার গ্রহণ করে, দ্বিতীয়তঃ বাংলার বাইরে যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য ছিল তাদের শত্রুতা ও সংঘর্ষের ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণী ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ শক্তিতে পরিণত হয়।

ঠিক ঐ সময় কিশোরগঞ্জের একটি গ্রামে মসজিদ নির্মাণে শিলালিপিতে সম্রাট শাহ্ আলমের গৌরব ঘোষণার বিষয়টি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে আমরা মনে করি। এতে অনুমান করা যায় যে, যদিও রাজধানীর ক্ষমতা ইংরেজ বেনিয়ারা কুক্ষিগত করেছিল, তথাপি প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনমানুষের শ্রদ্ধা ছিল ভারত সম্রাটের প্রতি। ফলে শিলালিপিতে ইংরেজ শাসক অথবা ইংরেজদের অধীন বাংলার নবাবদের নাম উৎকীর্ণ হয়নি।

শিলালিপি থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময় ইংরেজরা বাংলার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে নিলেও সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বোত্তম রাজত্বকাল বলতে বোঝা যায় যে, ইংরেজরা তখন পর্যন্ত এই অঞ্চলের মানুষের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করেন নি অর্থাৎ নীলকরদের অত্যাচার তখনও শুরু হয়নি। তাই শিলালিপিতে ঐ সময় কালটিকে সর্বোত্তম রাজত্বকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) আশেপাশের বেশ কয়েকটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ থেকে এর সত্যতা নিরূপন করা যায়।

২) এই মসজিদ দুটি এতকাল গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল বলে এলাকার বয়োবৃদ্ধ ব্যাক্তিগণ জানিয়েছেন।

৩) এই অঞ্চলের শিক্ষাবিদ আবু তাহের এই তথ্যটি জানিয়েছেন। ওর সঙ্গে সাক্ষাতকার ১৭-১০-২০০৪ খ্রিঃ।

৪) বাবুনের বালাখানা অর্থাৎ প্রাসাদবাটির ধ্বংসাবশেষ এখনো পরিলক্ষিত হয়। জায়গাটি মসজিদের উত্তর দিকে একটি মজাপুকুরের পাড়ে অবস্থিত।

৫) পুকুরগুলো সম্পর্কে তথ্য জানিয়েছেন হরশি গ্রামের বাসিন্দা। ৮৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ মোঃ আব্দুল হাকিম, পিতা মরহুম আমান উল্লা। তিনি তার পিতা এবং পিতামহ থেকে পুকুরের এই নাম গুলো জেনেছেন।

৬) দালানগুলোর ধ্বংসস্তুপের অস্তিত্ব এখন আর বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে সর্বত্রই ছোট ছোট ইট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

৭) এ প্রসঙ্গে দেখুন, Shams Uddin Ahmed, *Inscription of Bengal,* Vol - IV, Varendra Research Museum, Rajshahi, 1960, pp-286, 290, 291.

৮) এ প্রসঙ্গে দেখুন, Ahmad Hasan Dani, *Moslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1961, pp. - 253.

৯) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

১০) ক্ষেত্র সমীক্ষা, ১৭/১০/২০০৪ খ্রিঃ।

১১) হয়বতনগর হাভেলীতে বসবাসরত ঈসা খানের ১৭তম অধস্তন দেওয়ান রউফ দাদ খান এই তথ্য জানিয়েছেন। তথ্য গ্রহণের তারিখ ০৩/১২/২০০৪ খিঃ।

# প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষ্যে বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ঃ একটি অনুসন্ধান

মোঃ আতাউর রহমান

মানুষ নিজেকে যেভাবে সংস্কার করতে চায়, সেই সংস্কার ব্যক্তিগত বা সমাজগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ, কল্যাণ বা মানসিক উৎকর্ষতার জন্য। আর মানুষ যেভাবে স্বভাবগতভাবে অতীত আত্ম-বিমুখ, বর্তমানের সৌকর্যে বিভোর হয়ে ভুলে থাকতে চায় ফেলে আসা অতীতের জীবনালেখ্য। অথচ অতীতের পদচিহ্ন ধরেই বর্তমানের পথ চলা, অতীত আর বর্তমানের রূপরেখা নিয়েই ভবিষ্যতের মহাপরিকল্পনা। তাইতো ঐতিহাসিকগণ বলেন, "Understanding of man's past is an important aid to understanding people today" - অর্থাৎ মানুষের বর্তমানকে বুঝতে হলে তার অতীতকে খুঁজতে হবে। আর অতীতকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের হতে হবে ঐতিহ্য সচেতন এবং ইতিহাসের উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এর জন্য দরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি যত্নশীল। কারণ এসকল প্রত্ননির্দশন সমূহ আমাদের জাতিসত্ত্বার অন্যতম পরিচায়ক।

আলোচনায় সুবিধার্থে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে শুরুতেই সংক্ষিপ্ত ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ অর্থে প্রত্নতত্ত্ব হলো মানুষের অতীত দিনের ব্যবহৃত নিদর্শন নিয়ে যেখানে আলোচিত হয়। এর অপর একটি সুন্দর প্রতিশব্দ হচ্ছে পুরাতত্ত্ব, যাকে ইংরেজিতে Archaeology[১] বলে। ঐতিহাসিক ফিলিপ র‍্যাজ বলেন, "Today's garbage is tomorrow's archaeology" - অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিবর্তনে ব্যবহৃত পুরনো, ঐতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক সকল দ্রব্য - যা মানুষের স্বনির্মিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, অথবা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে এমন সবই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়।

বরেন্দ্র বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের নাম[২]। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র হচ্ছে মধ্যযুগীয় গৌড়-বঙ্গ রাজ্যের অন্যতম জনপদ বরেন্দ্র ভূমি। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুর

ভাষ্য থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলে মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে নানান উপাচার ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। বরেন্দ্র অঞ্চল ২৩-৪৮'-৩০" উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬-৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮-০২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯-৫৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। কর্কট-ক্রান্তিরেখা সমান্য দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে। ৮৮°২' ও ৮৯°৫৭' দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী পূর্ব গোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিধায় এই অঞ্চেলের জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ ও মোটামুটি আদ্র। বরেন্দ্র অঞ্চলের বেশ কিছু স্থান বাংলাদেশের সবচেয়ে চরমভাবাপন্ন এলাকাগুলির ভেতর পড়ে। এখানকার বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫°, সর্বনিম্ন ২৫° সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাতের পরিমান ৬৬"।[৩] পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে করতোয়া, দক্ষিণে পদ্মা, উত্তরে কুচবিহার ও তরাইয়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি।[৪] বরেন্দ্র অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ১৫,৬০০ বর্গমাইল। বর্তমানে জেলার সংখ্যা ১৬টি। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।[৫] উল্লেখ্য প্রাচীন কালে অনেক জনপদ নিয়ে বাংলাভাষাভাষী জনগণের এই দেশ গঠিত। জনপদগুলির উত্তরাংশে ছিল গৌড়, পুণ্ড্র বরেন্দ্র,[৬] - যেখানে বিপুল পরিমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে হচ্ছে গৌড়দেশান্তর্গত প্রসিদ্ধ জনপদ।[৭] দশম শতকের বরেন্দ্র কবি সন্ধাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে, গয়ারতুঙ্গ দেবের তালচের পট্টোলিতে বরেন্দ্রকে পালরাজাদের পিতৃভূমি বলে ইঙ্গিত করেছেন।[৮] গঙ্গার ধারে লক্ষণাবতী রাজ্যের দুটি পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশে 'রাল' (রাঢ়), পূর্বাংশে 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র) নামে অভিহিত।[৯]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনায়, রামচরিত, দিগ্বিজয় প্রকাশ, ভবিষ্য-বহ্মাখণ্ড হতে জানা যায় বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা এই কয়েকটি জেলার অধিকাংশ এবং রংপুর, ময়মনসিংহের কিয়দংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।[১০] "The capital cities of Lackhnuati, Devkot, Gour, Pandua and Ikdalah during the Turko-Afgan rule were within the territorial limits of the Barind."[১১]। এই বরেন্দ্র ভূমি সমতল নহে-উচ্চ নীচ; এবং ইহার মৃত্তিকা অনেক স্থানে রক্তবর্ণ; বৃক্ষ অতি কম, কেবল স্থানে স্থানে তাল বৃক্ষ দেখা যায়।[১২] অর্থাৎ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলও জনপদ হতে বরেন্দ্র অপেক্ষাকৃত উচুঁ ও শুষ্কভূমি। বরেন্দ্র কবি সন্ধ্যাকার নন্দী করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে বরেন্দ্রর নাম নির্দেশ করেছেন।[১৩] উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের এই বিস্তৃত বরেন্দ্রভূমির বিভিন্ন স্থানে ঐতিহাসিক কীর্তিসমূহ ছড়িয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্য নিদর্শন ইতিহাসের পরিধিকে প্রসারিত করেছে। এবং

মধ্যযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক হতে বরেন্দ্র ভূমি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার উত্তরাঞ্চল তথা বরেন্দ্র ভূমি তার ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে জনপরিচিত ও প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত।[১৪] এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন গুলিকে হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলিম আমলের কীর্তি বলে চিহ্নিত করা যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের কীর্তিগুলি ছিল দুর্গনগরী, দুর্গ, নগর, বৌদ্ধ বিহার, স্তম্ভ, জঙ্গাল, জলাশয়, প্রভৃতি। মুসলিম আমলের কীর্তিগুলিকে মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার ও খানকাহ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা যায়।

উল্লেখ্য যে, এই প্রবন্ধের সময়সীমা মধ্যযুগীয় হওয়াতে নিম্ন বর্ণিত অধিকাংশ প্রত্নক্ষেত্র ও নিদর্শনাদি মুসলিম বৈশিষ্ঠ্য মন্ডিত অর্থাৎ বরেন্দ্র অঞ্চলে মধ্যযুগে গড়ে ওঠা স্থাপত্যের প্রায় সবগুহি মসজিদ। বিশেষভাবে বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলা এতদ্দৃষ্ট বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৪ খ্রিঃ বাংলা বিজয়ের সূচনা থেকে পরবর্তী ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত মুসলিম শাসনের এই ছয়'শ বছর ধরে প্রশাসক সুলতান এবং রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা এই বরেন্দ্র অঞ্চলে যে অসংখ্য ইমারত হয়েছিল তা প্রাপ্ত শিলালিপির সাক্ষ্য প্রমাণ হতে জানা যায়।[১৫] এছাড়া বিজিত অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।[১৬] এবং মসজিদ হচ্ছে ইসলামের বলীয়ান স্থাপত্যরূপ।[১৭] নিম্নে এ অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো —

১. **মাহিসন্তোষ ঃ** বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানার অন্তর্গত একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধস্থান। প্রায় ৪ থেকে ৫ মাইল ব্যাপী উঁচু টিলা ও ধ্বংসের চিহ্ন এর প্রাচীনতা ঘোষণা করছে। এ স্থানের স্থাপত্য ইমারত প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের সাক্ষ্যে বলা যায় যে, খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ষোড়ষ শতাব্দী পর্যন্ত এটি সামরিক ও প্রশাসনিক এলাকা হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানে একটি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল যার অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা তাকীউদ্দিন আল আরাবী।[১৮] ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে এটি দেশি-বিদেশি শিক্ষানুরাগীদের আকৃষ্ট করতে থাকে। এছাড়া সুলতান বারবাক শাহের সময় (১৪৫৯-৭৪ খ্রিঃ) এ স্থানে বারবাকাবাদ টাঁকশাল স্থাপিত হয়।[১৯] উল্লেখ্য, বরেন্দ্র তথা সমগ্র উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বারবাকাবাদ টাঁকশালই একমাত্র টাঁকশাল - যেখান থেকে বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে মুদ্রা প্রণীত হয়েছে। মুঘল শাসনকালে বাংলায় জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা), ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) ও মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের নাম অবগত হওয়া গেলেও, বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত অন্য কোনো টাঁকশালের অস্তিত্বের

কথা জানা যায় না।[২০] এছাড়া মাহিসন্তোস প্রাপ্ত শিলালিপি ভাষ্যে জানা যায়, বাংলার মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় সুলতানি আমলে মসজিদ হয়েছিল; কিন্তু কতগুলি হয়েছিল - তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবে প্রাপ্ত সন-তারিখ যুক্ত একাধিক লিপি থেকে অনুমান করা যায়, মাহিসন্তোষে বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তৎকালে একাধিক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[২১] প্রত্নতত্ত্ববিদ আহমদ হাসান দানী বলেন, মাহিসন্তোষের দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে এবং এর বাইরে দু'টি মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।[২২] অধিকন্তু, বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পর থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত মাহিসন্তোষ একটি সমৃদ্ধ জনপদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করায়, সেখানে একাধিক মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল - একথা বলাই বাহুল্য। যদিও গবেষকগণ এখন পর্যন্ত সেখানে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। ৮৬৫ হিজরি সনে (১৪৬০-৬১ খ্রিঃ) সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের শাসনামলে উৎকীর্ণ শিলালিপি - যা ই. ভি. ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব কর্তৃক আবিস্কৃত,[২৩] শামসুদ্দীন আহমেদ[২৪] আ. কা. মো. যাকারিয়া[২৫] এবং এ কে এম ইয়াকুব আলী[২৬] প্রমুখগণ মসজিদটি পরিমাপ ও পরিকল্পনা বিন্যাস প্রদান করেছেন। কিন্তু ঐ মসজিদের উৎকীর্ণ শিলালিপি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

২. **দরসবাড়ী মসজিদ ও মাদ্রাসা ঃ** গৌড়ের শহরতলী এবং মাহদীপুর ও ফিরোজপুরের মাঝামাঝি (বর্তমান শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত) একটি জায়গা দরসবাড়ী নামে পরিচিত। 'দরস' শব্দের অর্থ পাঠ। দরসবাড়ী মসজিদের ধ্বংসস্তুপ থেকে সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের শাসনামলের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীঃ) একটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়। তাতে ১৪৭৯ খ্রীঃ একটি জামে মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[২৭] এই মসজিদের পূর্বদিকে দু'তিনশত গজ দূরে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ইমারতের ভিত্তিস্তর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উন্মোচিত হয়েছে। এর ভূমি পরিকল্পনা একটি মাদ্রাসা - ইমারতের পরিকল্পনা হিসেবে পন্ডিতগণ সনাক্ত করেছেন।[২৮] ১৯৭৩ খ্রীঃ এই ধ্বংসস্তুপ থেকে একটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে এবং তাতে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ কর্তৃক ১৫০৩ খ্রীঃ একটি মনোরম ও পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯] সুতরাং দরসবাড়ী মসজিদ ও মাদ্রাসাটি অত্যন্ত সম্পদশালী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এই মাদ্রাসাটি তৎকালীন বাংলার সুলতানী আমলে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিরাট অংশজুড়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল - যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশ লাভ করেছিল।

৩. **বাঘার মসজিদ, মাদ্রাসা ও মাজার ঃ** রাজশাহী শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে চারঘাট থানাধীন বাঘা একটি ঐতিহাসিক স্থান। এই মসজিদ পোড়ামাটির নকশা খুবই বিখ্যাত।[৩০] এ থেকে এদেশে সুলতানী আমলে পোড়ামাটির নকশামুদ্রার (motif) একটা ধারণা পাওয়া যায়। এটি ১৫২৩-২৪ খ্রীঃ সুলতান নসরৎ শাহের আমলে নির্মিত হয়।[৩১] উল্লেখ্য যে মসজিদের পোড়ামাটির নকশার বিষয়বস্তুগুলি স্থানীয় ফল-ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত। উল্লেখ্য যে, বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহ্ কর্তৃক যখন বাঘার মসজিদটি তৈরী হচ্ছিল তখন হামিদ দানেশমন্দ-র পিতা শাহ্ মুয়াজ্জেম দানেশমন্দ (যিনি শাহ্ দওলা নামে সমদিক পরিচিত) বাঘায় এসে সুফী প্রশিক্ষণের জন্য একটি খানকা ও একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।[৩২] বাঘার এই মাদ্রাসায় কোরাণ, হাদিস, আরবী-ফার্সী, ফেকাহ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হতো। এখানে ইসলামিক গ্রন্থাদির একটি গ্রন্থগার ছিল।[৩৩] মন্তব্য, প্রখ্যাত আলিম ও ইসলামী অভিজ্ঞানে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মাওলানা শের আলী এই বাঘা মাদ্রাসার প্রধান মুদাররিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩৪] মসজিদের প্রাঙ্গণে হজরত শাহ্ মৌলানা মোয়াজিজমদৌল্লা দানিশমন্দ এর মাজার অবস্থিত।[৩৫] বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিক বাঘা সুলতানী আমলে একটি বড় প্রশাসনিক কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করে এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে উক্ত মাদ্রাসা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক কথায় মধ্যযুগে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলের এই বাঘা অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৪. **কুসুম্বা মসজিদ ঃ** রাজশাহী শহর থেকে ৩০ মাইল দূরে এই কুসুম্বা মসজিদ অবস্থিত। স্বাধীন শূরবংশের গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের আমলে (শাসনকাল ১৫৫৬-১৫৬০ খ্রীঃ) সুলেইমান নামক একব্যক্তি কর্তৃক ১৫৫৮ খ্রীঃ এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।[৩৬] বিশাল পুকুর পাড়ে এই বিখ্যাত কুসুম্বা মসজিদটি অবস্থিত। এটি বরেন্দ্র অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর ও পুরাতন। এ মসজিদটি ইষ্টক নির্মিত কিন্তু উপরে পাথরের আবরণ দেখা যায়।[৩৭] মধ্যযুগে এ স্থানটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এতদ্অঞ্চলের ইসলামের প্রচার কার্য এই স্থানটি যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল।

৫. **ছোট সোনা মসজিদ ঃ** বৃহত্তর রাজশাহীর শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত মধ্যযুগের সুলতানী আমলে গৌড়ের দক্ষিণ শহরতলীর ফিরোজপুর মৌজায় এই ছোট সোনা মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের অলংকরণ প্রক্রিয়ার সোনার প্রলেপ

থাকায় এটি সোনা মসজিদ নামে প্রচারিত হয়েছে।[৩৮] মসজিদের লিপিসূত্রে জানা যায় যে, (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মদ কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[৩৯] অর্থাৎ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে উক্ত মসজিদটি নির্মিত। ইহা সত্য সত্যই বৃহৎ এবং সুন্দর।[৪০] উল্লেখ্য, মসজিদের সম্মুখে যে সুবৃহৎ রাজকীয় সরোবর এবং চতুঃপার্শ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্ননিদর্শণের ভাষ্যে সহজেই অনুমান করা যায় যে মধ্যযুগে এটি ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং এ স্থানের আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

৬. **চাটমোহরের শাহী মসজিদ (পাবনা) ঃ** ১৫৮১ খ্রীঃ তুঈ মোহাম্মদ খাঁ কাকশালের পুত্র সুলতান মাসুম খাঁ কাবুলী কর্তৃক শাহী মসজিদটি নির্মিত হয়।[৪১] উল্লেখ্য যে সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলার বার ভুঁইয়াগণ বিদ্রোহী হলে ১৫৭৯ খ্রীঃ মাসুম খাঁ চাকুরী পরিত্যাগ করে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে। একসময় চাটমোহরে স্বাধীন সুলতান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ঐ সময়ই উক্ত মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪২] এখানকার প্রত্নধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় মধ্যযুগে এখানে একটি ছোটখাট রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। যার আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এ অঞ্চলের মানুষের উপর পড়ে ছিল।

উপরোল্লিখিত বরেন্দ্র অঞ্চলের কয়েকটি মসজিদের স্থাপত্য বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করা জরুরি।[৪৩] গবেষকদের বিচারে মধ্যযুগের কিছুটা সম্প্রসারিত স্থান লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন যুক্তিতে তারা এই স্থানগুলি মহিলাদের নামাজের জায়গা (জেনানা গ্যালারী) বলে চিহ্নিত করেছেন। পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের দসসবাড়ী মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, নওগাঁতে কুসুম্বা মসজিদ এবং রাজশাহীর বাঘা মসজিদ এ জাতীয় নামাজের স্থান থাকার চিহ্ন রয়েছে।[৪৪] উপরোক্ত স্থানগুলি ছাড়া আরো যে সকল স্থান যেমন - মহাস্থানগড়, পাবনার নবগ্রাম, চাটমোহর, শাহ্‌জাদপুর, রাজশাহী সুলতানগঞ্জ, প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এক সময় বাংলার জীবনধারাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বরেন্দ্র অঞ্চলের কয়েকটি মন্দির স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

১. **কান্তজীর মন্দির ঃ** দিনাজপুর শহর হতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ১৭০৪-২২ খ্রীঃ নির্মিত কান্তনগরের বিচিত্র কারুকার্য-খচিত নবরত্ন মন্দির দেশি ও বিদেশির লেখকগণের প্রশংসা অর্জন করেছে।[৪৫] ইটের এই মন্দির গাত্রে পোড়ামাটিফলকে যেসকল মূর্তি ও দৃশ্য খোদিত আছে তাতে মধ্যযুগীয় গোড়ায় বাঙলার জীবন

যাত্রা বা ধারা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হয়েছে।[৪৬] কান্তজীর মন্দিরটি সে দিক থেকে বাংলাদেশে প্রায় অনন্য বলা যায়। 'আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত পোড়ামাটির চিত্রফলক শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন দিনাজপুরের কান্ত নগরের কান্তাজীর নবরত্ন মন্দির উপমহাদেশের স্থাপত্য ও পোড়ামাটির শিল্পের এক অনবদ্য নির্দশন'।[৪৭]

২. **পাবনা জোড়বাংলা মন্দির ঃ** এখানে রাধাগোবিন্দের 'জোড়বাংলা' - শৈলীর মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের আয়তন খুব বড় না হলেও দেওয়ালে টেরাকোটা ফলকগুলি আকর্ষনীয়। টেরাকোটা মূর্ত্তিগুলির মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য ও অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আছে বিভিন্ন জীবজন্তুর চিত্র। সামাজিক চিত্রগুলির মধ্যে নর্তক-নর্তকী, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যভান্ড নিয়ে বাদ্যকার, শোভাযাত্রা, শিকার দৃশ্য, মৃত ঝুলন্ত শিকারকে নিয়ে শিকারীর গমন ইত্যাদি দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৮] আর এ সকল প্রত্ননিদর্শনই ঐ সময়ের বরেন্দ্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাক্ষ্য বহন করে।

৩. **জগন্নাথ মন্দির ঃ** প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ চাটমোহর থানার হান্ডিয়ালের জগন্নাথদেবের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের লিপি দৃষ্টে ১৫৯০ খ্রীঃ জনৈক ভাবানী প্রসাদ দাস কর্তৃক এই মন্দিরের সংস্কার করা হয়।[৪৯] অনুমান করা হয় এ মন্দিরটিই বাংলার প্রাচীনতম বৃহৎ মন্দির।

৪. **পুঠিয়ার মন্দির ঃ** এখানে অনেকগুলি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে 'পঞ্চরত্ন' মন্দির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য। পোড়ামাটির চিত্র দেখে ধারণা করা হয় যে, এটি উনিশ শতকে নির্মিত।[৫০] পুঠিয়ার অপর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল শিবের। এখানে দেওয়ালে অনেকগুলি পৌরাণিক দেবদেবরীর কাহিনী চিত্র আছে। রাজশাহীর পাঁচআনি জমিদার বাড়ির রাণী ভুবনময় এটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে ভুবনেশ্বরী মন্দির নামে ও পরিচিত। এছাড়াও বরেন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্যান্য স্থান সমূহের মধ্যে মহাস্থান, পাহাড়পুর, নাটোর পুতাজিয়া, তারাশ, হাটিকুমরুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**উপসংহার ঃ** প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষ্যে বরেন্দ্র অঞ্চলের জীবনধারায় বিস্তারিত আলোচনা এই একটি মাত্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে শুধু প্রাথমিক ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। কারণ প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম উপদান হচ্ছে মুদ্রা ও শিলালিপি - যা এই প্রবন্ধে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। এর পরও আমরা বরেন্দ্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারাতে প্রত্নতাত্ত্বিক অন্যান্য উপাদানের ভাষ্যের

ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি - যা বাংলার ইতিহাস পুর্নগঠনে একটি উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে এবং যার উপর নির্ভর করে মধ্যযুগের বা সুলতানী আমলের শাসন পর্বের বরেন্দ্র অঞ্চলে তথা গোটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের পূণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন সম্ভব হবে।

এছাড়া এই প্রবন্ধে বর্ণিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও নিদর্শন সমূহ নিয়ে অনুসন্ধান করে গবেষণা করলে বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যযুগের ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকচার প্রভৃতি সম্বন্ধে আরো সৃষ্টিধর্মী জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে যা বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাসের ধারা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) প্রত্নতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে দেখুন, ADELINE's Art *Dictionary*, London, 1891, P. 24.

২) এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য*, ঢাকা, ২০০৩, পৃঃ১১৪।

৩) *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস ঃ রাজশাহী বিভাগ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ৩-৭।

৪) A. Cunningham, *A tour in Bihar and Bengal in 1879-80*, Archaeological Survey of India, Calcutta, 1882, pp. 40, 116.

৫) *বরেন্দ্রী*, কাকনহাট উন্মুক্ত পাঠাগার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০১ পৃ. ৪৩।

৬) Bhasakar Chattopadhya, *Culture of Bengal Through the ages*, Introduction, P. 3.

৭) নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ*, অষ্টাদশ ভাগ কলিকাতা, ১৩২০, পৃ.-৩৯৭।

৮) নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ১১৬।

৯) Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-I-Nasiri*, Vol. I, Persian Text (Kabul : Historical Society of Afganistan, 1963), pp. 437-439.

১০) নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ*, কলিকাতা,১৩২০, অষ্টাদশ ভাগ, পৃ. ৩৯৬।

১১) A. K. M. Yaqub Ali, *Aspect of Society and Culture of the Varendra*, Rajshahi, 1998, p. 363.

১২) কালীনাথ চৌধুরী, *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, হুগলী, ১৯০১, পৃ. ৫।

১৩) সন্ধ্যাকার নন্দী, *রাম চরিত*, (রাজশাহী ঃ বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯৩৯), পৃ. ৩০।

১৪) Amitabha Bhattacharjya, *Historical Geography of Ancient and Early Medieval Bengal*, PP. 41-45.

১৫) মোঃ আতাউর রহমান, *বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম শিল্পকলা: একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক সমীক্ষা ইতিহাস অনুসন্ধান*-১৭, ২০০৩, পৃ. ৬৬৬।

১৬) *The District of Rajshahi its Past and Present,* IBS, Vol. 4. 1981, P. 67.

১৭) এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিপি লিখন শিল্প,* বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ২৪৬।

১৮) মুহম্মদ মোখলেসুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ,* ১৯৯৬, পৃ. ১৫।

১৯) নির্মল ঘোষ, *ভারত শিল্প,* কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১।

২০) *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস,* রাজশাহী বিভাগ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ৪৫৪।

২১) *আই বি এস জার্নাল,* ১০ম সংখ্যা, ১৪০৯, রাজশাহী, পৃ. ২।

২২) A. H. Dani, *Bibliography of Muslim Inscription of Bengal, 1957,* p. 23.

২৩) H. Blochmann, "Geography and History of Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. XL. III (Pt. 1), Calcutta, 1874, PP. 295-96.

২৪) Shamsuddin Ahmed, *Inscription of Bengal,* Vol. IV, VRM, Rajshahi, 1960, p. 74.

২৫) আ. কা. মো. যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ ২৬৭।

২৬) এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম,* ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৮২-৮৩।

২৭) A. H. Dani, *Bibliography of Muslim Inscription of Bengal,* 1957, p. 31.

২৮) এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম,* পৃ. ৪৯।

২৯) *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, Vols. XXIV-VI, 1979-81. Dacca, P. 32.

৩০) এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা,* বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ. ১০১।

৩১) S. Ahmed, পূর্বোক্ত, p. 212.

৩২) *Islamic studies,* 101, XXIV, 4, Islamic Research Institute, Islamabad, 1985, p. 427.

৩৩) *রাজশাহী পরিচিতি,* বরেন্দ্র একাডেমী, রাজশাহী, ১৯৮০, পৃ. ২০৮-২০৯।

৩৪) *রাজশাহীতে ইসলাম,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

৩৫) *রাজশাহী পরিচিতি,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮।

৩৬) S. Ahmed, *IB*, pp. 242-244.
৩৭) *রাজশাহী পরিচিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।
৩৮) *রাজশাহীতে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।
৩৯) S. Ahmed, *IB*, pp. 199-202.
৪০) অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়ের কথা*, কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ. ২২।
৪১) *মুদ্রা ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১২৯।
৪২) A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* 1961, pp. 109, 139, 164, Abid Ali, *Memoirs of Gaur and Pandua,* Calcutta, 1924, pp. 77-82; M R Tarafdar, *Husain Shahi Bengal,* pp. 304 : S. Ahmad. *IB* IV, pp. 105, 200.
৪৩) *বাঙলার রেল ভ্রমণ*, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তক ১৯৪০ খ্রিঃ, পৃ. ১১৫-১১৬।
৪৪) এম এ হামিদ টি কে, *চলনবিলের ইতিকথা*, ১৯৬৭, পৃ. ২০৮-২০৯।
৪৫) রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, পৃ. ৪৫৭।
৪৬) James Ferguson, *History of Indian and Eastern Architecture,* Vol - II, p. 161.
৪৭) রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের মন্দির*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৪৩।
৪৮) প্রণব রায়, *বাংলার মন্দির ঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য*, কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২২৪।
৪৯) রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ১৩৩৩, পৃ. ৯২।
৫০) রতনলাল চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯।

# মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে আধুনিক কালের সাদৃশ্যতার কিছু ঝলক

**অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়**

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পৌরাণিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকাশ্রিত সংস্কৃতির সমন্বয়ে উৎপন্ন বিভিন্ন দেবদেবীর মহিমা, তাঁদের মঙ্গলকারী শক্তির প্রদর্শন— নিজ পূজা প্রচারের জন্য দেবতায় মানুষে সংঘাত, ভক্তিহীন ভক্তের প্রতি তাঁদের অমঙ্গলকারী শক্তির প্রদর্শন প্রভৃতি কাহিনীকে অবলম্বন করে যে সব রচনার সৃষ্টি হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাকেই মঙ্গলকাব্য বলা হয়েছে। মঙ্গল মানে শুভ, যাঁরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মঙ্গলকারী দেবদেবীর মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরাই এই রচনাকে মঙ্গল নামে অভিহিত করেছেন। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'যে কোন অর্থেই হোক না কেন মঙ্গল শব্দটির সঙ্গে শুভ ও কল্যাণের অর্থ সাদৃশ্য আছে।''[১]

মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা সকলেই মঙ্গল কাব্য রচনার কারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে হয় তাঁরা তাঁদের বর্ণিত দেবদেবীর প্রত্যক্ষ আদেশ পেয়েছেন বা স্বপ্নাদেশ। যেমন "কবিকঙ্কন চন্ডী"র রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মুঘল রাজ্যকালে ডিহিদারের অত্যাচারে বাস্তুভিটা দামুন্যা ছেড়ে কুচট্যা নগরে উপস্থিত হলেন, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন ঃ—

তৈল বিনা কৈলু স্নান          করিলু উদকপান<br>
শিশু কাঁদে ওদনের তরে<br>
ক্ষুধাভয়ে পরিশ্রমে          নিদ্রা যাই সেই ধামে<br>
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।[২]

স্বপ্নাবস্থায় মুকুন্দরাম দেবী চণ্ডীর কাছে মহামন্ত্র লাভ করে চণ্ডীর মাহাত্ম্য গীত রচনা করার নির্দেশ পেলেন। ঠিক একইভাবে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ লিখেছেন যে জগন্নাথ পুরে বসবাস করার সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় খড় কাটতে গিয়ে মুচিনী বেশ

ধারিনী মা মনসার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং দেবীর আদেশ অনুসারেই তিনি কাব্য রচনা করেন।[৩] ভূদেব চৌধুরীর অনুমান যে "প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ সব দৈবাদেশের কাহিনী জনমানসের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার কৌশল হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে।"[৪]

সে যাইহোক পৌরাণিক সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতিকে আধার করে যে সব কাব্য রচিত হয়েছে তা সাধারণত বাংলার গ্রামীণ সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানের এক অনবদ্য রূপায়ণ। এই কাব্যগুলি দেবদেবীর লীলা-মাহাত্ম্য প্রচারক হলেও সমষ্টি চেতনাশ্রিত গ্রামীণ সমাজের বিবর্তন ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। কাব্যগুলি মূলত ব্যক্তির সৃষ্টি হলেও তা সমাজ-মানসেরই প্রতিফলন। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য "যে পুঁথি যখন লিখিত হইত কিংবা গীত হইত, সেই পুঁথি সেই যুগেরই সমাজের মনোদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে"।[৫] বস্তুত সমাজ জীবনের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ দ্বারা মঙ্গল কাব্যের কবিরা তাঁদের শিল্প রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কবিরা যে সব সামাজিক প্রথার উল্লেখ করেছেন তা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।

জঙ্গলে ঘেরা গ্রামকেন্দ্রিক বাংলাদেশ— যেখানে বাঘেরও বাস। আবার নদীমাতৃক হবার দরুণ কুমীরেরও ভয়— অর্থাৎ ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর— আর সাপ তো সর্বত্র। তাই অসহায় মানুষেরা বাঘ, কুমীর ও সাপের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় ভয়ে ভক্তিতে লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা করে গীত রচনা করতেন। যেমন রচিত হয়েছে সাপের দেবী মা মনসার গীত, ব্যঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের, কুম্ভীর বাহন দেবতা বা কুমীরদেবতা কালুরায়ের গীত আর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধানের প্রার্থনায় রচিত হয়েছে চণ্ডীর গীত।

আলোচ্যকালে মঙ্গল কাব্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তবে এই কাব্যগুলির মধ্যে বহু প্রচলিত কাব্য হল, 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্ম্মমঙ্গল', 'সারদাঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি। প্রধান প্রধান কাব্যগুলি থেকে দুটি মাত্র কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'মনসামঙ্গল' এই নিবন্ধের মুখ্য অবলম্বন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হয়েছে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' বা 'চণ্ডীমঙ্গল' আর সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'। এই দুটি কাব্যে তৎকালীন সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আধুনিককালের সামাজিক রীতি নীতির কতটা সাদৃশ্য আছে তারই কিছু ঝলক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণত চার অংশে বিভক্ত-প্রথম অংশে সকল দেব-দেবীর

বন্দনা, দ্বিতীয় অংশে কবির আত্মপরিচয়, তৃতীয় অংশে দেবলীলা ও চতুর্থ অংশে নরলীলা। দেবলীলা অংশে লক্ষণীয় বিষয় হল যে দেবতাদের চরিত্র ও ঘটনার কিছু অংশ পুরাণ থেকে কিছুটা বা বাংলাদেশের লোকজীবনাশ্রিত আদর্শ থেকে নেওয়া। দেবলীলায় মূল বক্তব্য হল যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিষ্ঠাযুক্ত দেব-দেবীরা আপন মহিমা ও পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গের কোন নর্ত্তকী বা দেবকুমারকে তাদের ক্ষণিকের ভুলের জন্য মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিতেন। অভিশাপগ্রস্তরা ঐ বিশেষ দেব বা দেবীর পূজা প্রচারের জন্য দেবদেহ পরিত্যাগ করে মানবদেহ ধারণ করে মর্ত্ত্যে জন্ম নিতেন। অতএব বলা যেতে পারে যে, মঙ্গলকাব্যে মানব কাহিনীর আধার হল মূলত দেবশাপগ্রস্ত কোন স্বর্গবাসী দম্পতির মর্ত্ত্যজীবনের কাহিনী। কিন্তু মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করার পর তাঁরা স্বর্গের কথা ভুলে যেতেন। নরলোকে বহু দুঃখ, কষ্ট-ভোগের পর সেই দেব-দেবীর নির্দেশে বা স্বপ্নাদেশে মর্ত্ত্যে তাঁদের পূজা প্রচারে সফলতা লাভ করে শাপমুক্ত হয়ে আবার সশরীরে স্বর্গে গমন করতেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' লোকজীবন সম্ভূত এক অনন্য কাব্য যা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণের ধারক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, 'মুকুন্দরামের কাব্য হইতে সমকালীন সমাজ জীবনের স্বচ্ছন্দ লীলায়িত গতিছন্দে ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্ম্মস্পন্দন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে'।[৬]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মর্ত্ত্যকাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম আখ্যান ভাগে আছে ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে তারা শাপগ্রস্ত ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও তার পত্নী ছায়া,[৭] দেবী চণ্ডী চেয়েছিলেন জগতে তাঁর পূজার প্রচার হোক। সেই ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য মহাদেব শাপ দিলেন নীলাম্বরকে। তাই হরকোপানলে নীলাম্বরকে ব্যাধকুলে ধর্মকেতু ও তার পত্নী নিদয়ার ঘরে কালকেতু রূপে জন্ম নিতে হল। আর ছায়াকে সঞ্জয়কেতু হীরাবতীর ঘরে ফুল্লরা রূপে।

দ্বিতীয় আখ্যানভাগে আছে ধনপতি সদাগর, লহনা, খুল্লনা ও শ্রীমন্ত সদাগর। ধনপতির দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনাও শাপভ্রষ্টা স্বর্গের নর্ত্তকী রত্নমালা। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য ইছানী নগরে লক্ষপতি সদাগর ও তার পত্নী রম্ভাবতীর ঘরে জন্ম নিল। উজানী নগরের ধনপতি সদাগর তাকে বিবাহ করেন। খুল্লনার গর্ভে জন্ম নিল শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব্ব কুমার মালাধর যে ছিল ইন্দ্রের সভার প্রধান নর্ত্তক।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন যে "বস্তুত মধ্যযুগে বাস্তবজীবন চিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরামের সমান প্রতিভাশালী কবি আর একজনও পাওয়া যায় না...... চারশো বছর আগে আবির্ভূত এই কবির চরিত্র পরিকল্পনায় আধুনিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়।"[৮]

তাই দেখি অভিশপ্ত নীলাম্বরের মাতৃগর্ভে স্থান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর প্রেক্ষাপট বদলে যায়। কাহিনী স্বর্গ থেকে নেমে আসে মর্ত্যে, বাঙালী সমাজের সাংসারিক রীতিনীতি, ব্যবহার, আচার অনুষ্ঠানের এক পুর্ণায়ত ছবি তিনি তুলে ধরেন। কালকেতুর জন্মের পর নবজাতকের মাঙ্গল্য কর্ম অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কবি লিখছেন ঃ

"ছয়দিনে ষাটিয়ারা কৈল জাগরণ
অষ্টদিনে অষ্টকলাই কৈল ধর্মকেতু।
নয়দিনে নবনত্তা কৈল শুভ হেতু।
আনরূপ ব্যাধসুত বাড়ে দিবসে দিবসে
ষষ্ঠীপূজা কৈল তার একত্রিশ দিনে।"[৯]

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীতে ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তের জন্মের পর ষষ্ঠী পূজোর বর্ণনায় একুশ দিনের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"সপ্তদিনে সপ্তঋষি করিয়া বন্দনা।
আটদিনে আট কলাই করিল লহনা।
নর্ত্যা কৈল নয়দিনে মনের হরিষে।
একুস্যা করিল তার একুশ দিবসে।।[১০]

মুকুন্দরাম অবশ্য দুটি সমাজজীবনের চিত্র এঁকেছেন— ব্যাধগোষ্ঠি ও বণিক গোষ্টী, ব্যাধকুল যে অস্পৃশ্য তা কালকেতুর একটি উক্তিতেই সুস্পষ্ট। দেবী চণ্ডী যখন ষোড়শী কন্যা রূপে তার ঘরে এলেন কালকেতু তাঁকে বললো "আমি নীচ জাতি লোকে আমাকে স্পর্শ করে না।" দুই সমাজের ষষ্ঠী পূজো পালনের বর্ণনায় নিয়ম কানুনের পার্থক্য থাকলেও "জাতকর্ম বা বিবাহের আচার অনুষ্ঠানেও তিনি ব্যাধপরিবারে ভদ্রঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কলাপের আড়ম্বর ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজের নিখুঁত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন।"[১১]

সে যাইহোক, আজও বাঙালীর ঘরে বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর আটকলাই ও ষষ্ঠী পুজো পালন করা হয়। এরপর ব্যাধ সন্তানের নামকরণের বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় আধুনিক কালের শিশুর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের কথা, যদিও শতাব্দীর কিছু ব্যবধানে রকম ভেদ থাকা স্বাভাবিক।

কবি লিখেছেন ঃ—

"চারি পাঁচ মারা গেল ছয় পরবেশ
ওজন করাল্যো বলি দিয়া ছাগ মেষ।

দৈবজ্ঞ আনিয়া নাম হইল কালকেতু
গণকে দক্ষিণা দিল কল্যাণের হেতু।[১২]

কালকেতুর বিবাহ উদ্যোগের বর্ণনাতেও সেই সব অনুষ্ঠানের চিত্র পাই যা আজও বাঙালী সমাজে প্রচলিত। বরের বাড়ী থেকে কনের বাড়ীতে অধিবাস যাবে তারই এক ঝলক ঃ—

"নানা বস্তু মেজে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুজন
লিয়া অধিবাস ডালা কিরাত নগরে গেলা
বন্ধু মেলি সোমাই ব্রাহ্মণ"।।[১৩]

তারপর ফুল্লরার গন্ধ অধিবাস ঃ—

"ছায়া মণ্ডলের মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে
হীরাবতীর হৃদয়ে উল্লাস
পরিয়া হরিদ্রা বাসে ফুল্লরা বাহিরে আসে
দেখি সুখী সব বন্ধুজনে"।[১৪]

এর পরে দেখা যায় কালকেতুর বিবাহ যাত্রা ঃ—

"গমননার শুভ বেলা বাউরী যোগায় দোলা
তথি বীর কৈল আরোহণ
বরযাত্রা পড়ে সাড়া বাজারে ঢেমচা কাড়া
চারিদিকে বাজয়ে বাজন"।[১৫]

কন্যাদান সম্বন্ধে ঃ—

"বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জয় কেতু
কুশ হস্তে করে কন্যাদান।
যৌতুক ধনুকখানি দিল খর তিন বাণ
জামাতারে করিল বহুমান্য"।[১৬]

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীতে দেখি যে ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্তরও দুটি পত্নী ছিল। প্রথমটি সিংহল রাজ শালিবাহনেব কন্যা সুশীলা আর দ্বিতীয়টি উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরীর কন্যা জয়াবতী।

সুশীলা ও শ্রীমন্তের বিবাহ উপলক্ষ্যে কবি লিখছেন ঃ—

"পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভক্ষণে দুজনে ছাবুনি।
দিলেন সাধুর গলে আপনার কণ্ঠমালে
বামাগণ দেয় জয়ধ্বনি।"[১৭]

সাতপাকে ঘোরার পর গাঁটছড়া বাঁধা ও অগ্নি প্রদক্ষিণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"বাজায় দুন্দভি পড়া দ্বিজে বাঁন্দে গাঠিছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতি।
বন্দিয়া রোহিনী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোঁহে কৈল অনচল প্রণতি'।।[১৮]

বিবাহান্তে নবদম্পতি ঘরে প্রবেশ করার পর কবি লিখছেন ঃ—

মাথাতে মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দিলা সকল যুবতী।।
কেহ নেত কেহ শ্বেত দেন পাটশাড়ী।
কুমকুম চন্দন দেহো বাটাভরি কড়ি।
আনন্দে যৌতুক দেয় যত বন্ধুজন।
কনক রতন হিরা বসনভূষণ।।[১৯]

সিংহল থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীমন্তর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় উজানী নগরের রাজকন্যা জয়াবতীর সঙ্গে, সেই বিবাহের বর্ণনায় দেখি যে বিয়ে বাড়ীর পবেশদ্বারে আমপাতা দিয়ে সাজানো ও মঙ্গলঘটে কলাগাছ লাগানো যা সচরাচর আজও বাঙালী পরিবারের বিয়ে বাড়ীতে দেখা যায়। তার পরের বর্ণনায় কপালে চন্দন চর্চিত শ্রীমন্ত টোপর মাথায় দিয়ে বর বেশে বেরোলেন — সঙ্গে অনেক বরযাত্রী। কবির লেখনীতে ঃ

"গোধূলি হৈল বেলা সাধু চাপে দোলা
গলাতে দিল রত্নমালা।
মুকুট শিরে রোপে চন্দন অঙ্গে লেপে
শোভয়ে হেমতাড় বালা।।"[২০]

এর পরের বর্ণনায় কবি যে চিত্র এঁকেছেন তাতে বাস্তবতার ছোঁয়া এত বেশী যে মনে হয় যেন তিনি আধুনিক কালের বিবাহের বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন রাজা বিক্রম

কেশরীর অন্তঃপুরে স্ত্রী আচার পালনের সময় বরের প্রতি কৌতুকাবহ ব্যবহার— বর-বধূর বিদায়কালে জয়াবতীর মা'র চিরন্তন মায়েদের মতো চোখের জল ফেলা, ধনপতির গৃহে বর-বধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কুলনারীদের উলুধ্বনি দেওয়া ও শঙ্খধ্বনি করা তারপর স্বর্ণশিবির থেকে বর-বধূকে লহনা ও খুল্লনার কোলে করে নামানো— যথারীতি বরণ করে আসনে বসিয়ে প্রথামত কড়ি খেলানো, তারপর নবদম্পতিকে ধান দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ ও যৌতুক প্রদান প্রভৃতি।[২১] এইসব বিশদ বর্ণনায় মনে হয় কবি যেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে বাঙালী জীবনের বিবাহের আনুষ্ঠানিক ছবি তুলে ধরেছেন।

মুকুন্দরামের মানুষের কাহিনীর প্রতি আগ্রহ বেশী। তাই দেব-দেবীর চরিত্রগুলিকেও যথাসম্ভব মনুষ্য ধর্মের দ্বারা জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁদের চরিত্রে কোনো প্রকার মহিমা আরোপ করা হয়নি। দেব কাহিনীতে মা মেনকার আক্ষেপের মধ্যে ঘরজামাই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। মা মেনকা কন্যা গৌরীর কাছে অভিযোগ করলেন ঃ

"রান্ধি বাড়ী আমার কাঁকাল্যে হইল বাত
ঘর জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।"[২২]

এতে গৌরী রাগে ফুঁসে উঠে বললেন ঃ

"এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন।
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন।।
জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ষা ধান।
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তুমার দুয়ারে দিনু কাঁটা।।
মৈনাক তনয় লইয়া সুখে কর ঘর।
কতনা সহিব খোঁটা যাব দেশান্তর।।"[২৩]

ঘর জামাই শিবের দুর্দ্দশা থেকে অনুমান করা যায় যে তদানীন্তন বাঙালী সমাজে ঘরজামাইয়ের কতটা আদর ছিল।

ফিরে আসা যাক মর্ত্ত্যকাহিনীতে। মনসা মঙ্গলের মানব খণ্ডে তিনটি চরিত্র প্রধান চাঁদসদাগর, লখীন্দর ও বেহুলা। বণিক সমাজের শিরোমণি চাঁদসদাগর শিবের উপাসক

কিন্তু সে শিবের মানস কন্যা মনসাকে পূজা করতে রাজী নয়। তাই তার দুঃখের অবধি ছিল না। দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছেও সে মাথা নত করেনি।

"মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা"।[২৪]

বেহুলা ও লখীন্দর অভিশাপগ্রস্ত দেবলোকের উষা ও অনিরুদ্ধ। উষা দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নর্তকী ছিল। মনসা দেবী তার পূজা প্রচারের অভিলাষে একদিন কৌশলে বিষ নয়নে চেয়ে তার নৃত্যের তাল ভঙ্গ করালেন। ফলে ইন্দ্রের অভিশাপে উষাকে জন্মগ্রহণ করতে হলো ইছানী নগরে সায় বণিকের ঘরে বেহুলা রূপে। আর অনিরুদ্ধ জন্ম নিল চম্পক নগরে চাঁদ সদাগরের ঘরে লখীন্দর রূপে। মনসার পূজা প্রচারের জন্যই তাদের মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। মনসা মঙ্গলের কবিরা চাঁদ সদাগরের দুর্দ্দশা ও বেহুলার শোকার্ত্ত হৃদয়ের বেদনাকে তাঁদের কাব্যে অনেক বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন তবুও তারই মধ্যে তৎকালীন সমাজের সাংসারিক রীতিনীতির অনেক কিছুর আভাস পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক লখীন্দরের বিদ্যারম্ভের কাহিনী। লখীন্দর পাঁচ বছর বয়েসে উপনীত হবারপর শুভদিনে দেবী সরস্বতীর পূজা করে তার হাতে খড়ি দেওয়া হলো। কবির বর্ণনায় ঃ

"চন্দ্রের দোসর বাড়ে লখীন্দর
দিনে দিনে আন জ্যোতি
খড়ি হাতে দিতে পরম পীরিতে
পূজা কৈল সরস্বতী।"[২৫]

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত সরস্বতী পুজোর দিনে হাতে খড়ি দিয়ে শিশুর বিদ্যারম্ভের প্রথা অনেক বাঙালী পরিবারই মেনে চলতেন। কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগে সেই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। পাঁচপূর্ণ হবার আগেই শিশুর বিদ্যারম্ভ হয়।

এরপর আসা যাক লখীন্দরের বিবাহ বিবরণে। এখানে দেখা যায় যে, আত্মীয় কুটুম্বদের মাঝে যথারীতি গাত্র হরিদ্রার অনুষ্ঠান হলো। তারপর লখীন্দর রাজবেশে সজ্জিত হয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে জনক জননীর চরণ বন্দনা করে যাত্রা করলো ঃ

বহুত বর্ণিক আল্য চম্পাই নগর
বর সাজে সাজে হেথা বর লখীন্দর।।
হরিদ্রা মাখিয়া হৈল কাঞ্চনের জ্যোতি।
পরিধান করিল পবিত্র পীত ধুতি।।

চাপিয়া পাটের দোলা. লখীন্দর চলে।
চাঁদের প্রকাশ যেন গগন মণ্ডলে।।
জনক জননী বন্দে বর লখীন্দর।[২৬]

বিবাহের মঙ্গল চিহ্ন হিসাবে বরের হাতে একখানি স্বর্ণখচিত দর্পণ ও সোনার জাঁতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেহুলার মা'র পুরনারীদের নিয়ে বরকে বরণ করার বর্ণনায় দেখি

অমলা হরষিতে বরণ করিতে
লইয়া ঔষধের ডালা
গন্ধ চন্দন অনেক আয়োজন
রমণী বেষ্টিত গেলা।।
প্রথমে গিয়াতথা বরিতে জামাতা
নিছিয়া ফেলিল পান।
চরণে দধি ঢাল দিলেন অঞ্জলি
মানিক অঙ্গুরী দান।।[২৭]

এরপর কন্যা সম্প্রদান ও অন্তঃপুরের স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠানগুলির যে চিত্র কবি এঁকেছেন তা এক বাঙালীর সার্বিক ঐতিহ্যের রূপায়ণ। সাহিত্য যেহেতু জীবন সম্ভূত সেহেতু সমসাময়িক জীবনের সামাজিক প্রথা সাহিত্য ভাবনায় ছায়াপাত করে। মঙ্গল কাব্যের কবিরা মনে হয় বাঙালী সমাজের বিভিন্ন সংস্কার দ্বারা চালিত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দুই কবি তাঁদের কাব্যে তৎকালীন গ্রামীণ বাংলার সমাজ জীবনের রীতিনীতির যেমন শিশুর জন্মের পর মাঙ্গল্য কর্ম অনুষ্ঠান. তার নামকরণ. বিদ্যারম্ভ ও বিবাহের যে চিত্র তাঁদের বর্ণনায় তুলে ধরেছেন তা শতাব্দীর ব্যবধান থাকলেও আজও গ্রাম বাংলায় বহুলাংশে অব্যাহত রয়েছে। কালের গতির সঙ্গে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী তবুও নগরকেন্দ্রিক বাংলাতেও সামাজিক প্রথার কিছু পার্থক্য থাকলেও সেকালের রীতিনীতি বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানের নিয়মপালনে অনেকাংশে তা মেনে চলা হয়।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩. পৃ. ৬০

২)

৩) পঞ্চানন মণ্ডল, *পুঁথি পরিচয়,* ২য় খণ্ড, ভূমিকা
৪) ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা,* ১ম পর্য্যায় পরিবর্দ্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ১৯৪
৫) *বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা 'বাইশা',* সম্পাদিত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, ভূমিকা ৪৯০
৬) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, 'কবিকঙ্কন চণ্ডী', সম্পাদিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ ভূমিকা
৭) তদেব, পৃ. ১৫৩
৮) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৬৯
৯) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, 'কবি কঙ্কন চণ্ডী' পৃ. ১৬৯
১০) কবিকঙ্কন চণ্ডী (ধনপতি আখ্যান) সম্পাদিত, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬
১১) মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, তদেব, প্রথম ভাগ, ভূমিকা পৃ. ৩৪
১২) তদেব, পৃ. ১৭০
১৩) তদেব, পৃ. ১৭৬
১৪) তদেব, পৃ. ১৭৬
১৫) তদেব, পৃ. ১৭৮
১৬) তদেব, পৃ. ১৭৯
১৭) কবি কঙ্কন চণ্ডী (২য় ভাগ ঃ ধনপতি উপাখ্যান), সম্পাদিত বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৪৫৫
১৮) তদেব, পৃ. ৪৫৬
১৯) তদেব, পৃ. ৪৭৪
২০) তদেব, পৃ. ৪৯৬
২১) তদেব, পৃ. ৪৯৮-৪৯৯
২২) কবিকঙ্কন চণ্ডী (১ম ভাগ), সম্পাদিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ. ১১২
২৩) তদেব
২৪) *বাইশা,* পৃ. ১২৫
২৫) তদেব, পৃ. ১৭৬
২৬) তদেব, পৃ. ১৮৯
২৭) তদেব, পৃ. ১৯৩
২৮) তদেব, পৃ. ১৯৩-১৯৪

## সারাংশ

# আবদুল করিমের ইতিহাসচর্চা

শামসুল হোসাইন

প্রফেসর ইমেরিটাস আবদুল করিম বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের স্বনামখ্যাত গবেষক। নিরলস নিষ্ঠায় ও শ্রমে বাংলার সুলতানি ও মুঘল আমলের ইতিহাসকে উপাদানের আলোকে পরিস্ফুট করার কাজে তিনি একজন সফল পণ্ডিত। গবেষক হিসেবে শুধু অপরের সংগৃহীত উপাদান ব্যবহার করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, স্বয়ং নতুন উপাদান সন্ধান ও আবিষ্কার করে বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণতার সঙ্গে। সংগৃহীত উপাদান যাতে ভবিষ্যৎ গবেষকগণ ব্যবহার করতে পারেন সে লক্ষ্যে উপাদানের *করপাস* প্রকাশ করে ইতিহাস গবেষণাকে করেছেন আয়াসসাধ্য।

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস সারা মুসলিম বিশ্বের নিরিখে একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। ইসলাম ধর্মের উদ্ভব-কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে বিচ্ছিন্নভাবে কী করে এই অঞ্চলে মুসলিম সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিকাশ সম্ভব হলো এই ঘটনা ইতিহাসবিদদের কাছে গভীর সমীক্ষার বিষয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হলেও বাংলাদেশেই এর গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক। ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায় যে. বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত লাভ করে এই দেশ। বিশাল এক জনগোষ্ঠীর ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ছিল এই পরিচিতির পেছনে। বাংলার জনমানবের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মৌল এই প্রসঙ্গ ইতিহাস-গবেষণায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

সপ্তম শতাব্দী থেকে হরিকেল বন্দরের মাধ্যমে আরব বণিকদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় থাকলেও তৎকালীন মুসলিম সমাজ বিস্তারের বিষয়টি অস্পষ্ট। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর লখনৌতে মুসলিম বসতির সূচনা হয়। এর পরবর্তী সাড়ে পাঁচ শত বছর প্রায় ধারাবাহিকভাবে সারা বাংলা মুসলিম শাসনাধীন থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিধিতে বিচিত্রভাবে বিকশিত হয়, এ-নিরিখে উল্লেখযোগ্য ক. ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সীমানা পরিচিহ্নিতকরণ এবং বাংলার সুলতানের *শাহ-ই-বাঙ্গালিয়া* পরিচিতি লাভ; খ. প্রশাসনে যোগ্যতার নিরিখে নিয়োগের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ; গ. জনকল্যাণে যোগাযোগ ও পূর্ত কার্যক্রমের বিস্তার; ঘ. বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা এবং ঙ. বঙ্গীয় মুসলিম স্থাপত্যের উন্নয়ন। কিন্তু ইতিহাস বিমুখ

বাঙালির দীর্ঘকাল ধরে কোন তাগিদ ছিল না আত্মপরিচয় অন্বেষণের। তাই আবদুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেও বিশেষ কিছু জানতেন না বাংলার সুলতানদের সম্পর্কে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দু'খণ্ড বাংলার ইতিহাস ছাত্রাবস্থায় তাঁদের ব্যবহারে আসলেও যদুনাথ সরকার সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস পাওয়া যায় অত্যন্ত সীমিত আকারে। তাঁর মতে, এই পুস্তকে ইতিহাসের রূপরেখা পাওয়া যায়, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ কারণে আহমদ হাসান দানী তাঁকে 'ইন্ডিপেডেন্ট সুলতানস্ অব বেঙ্গল' সম্পর্কে থিসিস রচনার নির্দেশ দেন।

# ইছামতী নদীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব

## শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এককালে নদীকে কেন্দ্র করেই শহর, নগর, ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। নদী, পরিবহন ব্যবস্থায় একসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ভূমিকা নিয়েছে। নদী কোন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খ্যাত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লিখিত কোন নদীর নামে নদী হলে অথবা মধ্যযুগের কোন মঙ্গল কাব্যের কোন ঘটনার সঙ্গে, কোন নদীর নাম যুক্ত হয়ে গেলে, সেই নদী জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, ভাগীরথী নদীর শাখা উত্তর ২৪-পরগণা জেলার যমুনা, পদ্মা ও হুগলী জেলার সরস্বতী নদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে, এরকম কোন কিছুই ইছামতী নদীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। সেই জন্যই, ইছামতী নদী নিকাশি ব্যবস্থায়, নদী হিসাবে যত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করুক না কেন, সে কোন দিনই খ্যাতির পাদপ্রদীপে আসার সুযোগ পায়নি। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল, আঞ্চলিক ক্ষেত্রে স্মৃতি-ছিন্ন কাহিনীর প্রেক্ষাপটে ইছামতী নদীর গুরুত্ব বিচার করা।

ইছামতী নদীর নামকরণের মধ্যেই নদীর লৌকিক পরিচয় রয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া, নাম নিয়ে কিছু অতিশয়োক্তি খণ্ডন করাও আবশ্যক। দু'জন আঞ্চলিক ইতিহাস লেখক নদীতে ঝিনুকে মুক্তা বা মোতি পাওয়া যেত বলে মন করতেন। তার থেকেই নদীর নাম ইছামতী হতে পারে বলে মনে করেন। অবশ্য যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়, নদী ইচ্ছামত গতিপরিবর্তন করেছে বলে ইছামতী নাম হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর বক্তব্যে কিছু যুক্তি থাকলেও নদীতে মুক্তা বা মোতি পাওয়ার কাহিনী মানা যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে ইছামতী নাম লৌকিক নাম। ব্যবহারিক

জীবনের সূত্র ধরে ইছামতী নাম হয়েছে মনে করা অনেক বাস্তব সম্মত। ইছামতী নামের সঙ্গে কি ব্যবহারিক সম্পর্ক মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়ের রয়েছে দেখা আবশ্যক।

ইচলা বা ইচলি শব্দের অর্থ চিংড়ি মাছ।[১] ইচলা, ইচলি, ইচিলা, ইচা (পূর্ববঙ্গে ব্যবহার) শব্দের অর্থ চিংড়ি মাছ।[২] 'ইচা' শব্দ সংস্কৃত শব্দ 'ইঞ্চাক' থেকে কথার ফেরে উদ্ভব হয়েছে। নোয়াখালি, চট্টগ্রামে চিংড়ি মাছ অর্থে 'ইচা' শব্দই ব্যবহার করা হয়। ভাগীরথী নদীর পূর্বপারের ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলা ও পূর্ব মুর্শিদাবাদ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের মধ্যেই পড়ে। চট্টগ্রামের একটা নদীর নাম 'ইচামতী'। চট্টগ্রামের রাঙ্গনীয়া উপজেলার ঘাটচেক গ্রামের পাশ দিয়ে ঐ নদী বয়ে চলেছে। ঐ নদীতেও প্রচুর পরিমানে 'ইচা' বা চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে চিংড়ি মাছকে 'ইচা' বলা হয়।

ইছামতী নদী, পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর মত আর একটি দক্ষিণ বাহিনী নদী। পদ্মার দক্ষিণ পাড় দিয়ে দক্ষিণে নিষ্ক্রান্ত নদী, মথাভাঙ্গা-ভৈরব-ইছামতীর মিলিত স্রোত একে একে বিভক্ত হয়ে নানা নামে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। মাথাভাঙ্গা নদী পদ্মা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে জলঙ্গীকে মুক্ত করে, মাথাভাঙ্গা-ভৈরবের যুক্ত স্রোত সুলতানপুরের নিম্নে ভৈরবকে মুক্ত করে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের কাছে চূর্ণী ও ইছামতী নদীতে বিভক্ত হয়ে যায়। অবশেষে হাড়িয়াভাঙ্গা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। যশোহর খুলনার ইতিহাসের মানচিত্র অনুসারে ইছামতী নদী ২৪-পরগণার হাসানাবাদ, দমদমা পার হয়ে কালীগঞ্জের আগে এক অংশ কালিন্দী নদী নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়ে রায়মঙ্গল নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অপর অংশ পূর্ব দিকে কালীগঞ্জের নিম্ন দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, শীতলপুরের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে কদমতলী নামে প্রবাহিত। পরে সুন্দরবনের ১৭১ নং লাটের দু'পাশ দিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে প্রবাহিত। তারপর ১৭৪ ও ১৭৫ নং লাটের মধ্য দিয়ে যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে রায়মঙ্গলে মিশেছে। বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে এই যমুনা নদীরও গুরুত্ব রয়েছে।

যমুনা নদীয়া জেলায় ভাগীরথী নদীর মুক্তবেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে কাঁচড়াপাড়ার কাছে বাগের খাল ভেদ করে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। নদী সোনাখালি, বীরন্ট, চৌবেড়িয়া, জলেশ্বর, ধর্মপুর, শ্রীপুর, মাটিকুমড়া, নাইগাছি, মল্লিকপুর, গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, গয়েশপুর, চারঘাট হয়ে, মোল্লাডাঙ্গার মধ্য দিয়ে টিপিতে ইছামতী নদীর সঙ্গে মিলে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই পথেই প্রতাপাদিত্য রায়ের রাজধানীতে পৌছান যেত।

ষোড়শ শতক বা পরবর্তী কয়েক শত বর্ষ, নদীবহুল বঙ্গে দীর্ঘ যাত্রায় নদী পথের উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হত। তাছাড়া, কিছুপথ জলপথে আবার কিছুপথ স্থলপথে

অথবা বার কয়েক নদী পার হয়ে স্থল পথে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যেত। সুতরাং প্রতাপাদিত্যের যশোর রাজধানীর সঙ্গে বাইরের দূর দরান্তের ভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়ও অভিন্ন ছিল না।

মোগল বাদশা, আকবর প্রতাপকে শাসন করার জন্য মানসিংহকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। মানসিংহ ১৬০৩ খ্রীঃ প্রথম দিকে বিরাট বাহিনী নিয়ে যশোর অভিমুখে অগ্রসর হন। মানসিংহ রাজমহল থেকে গঙ্গার ধার দিয়ে জঙ্গীপুরের মধ্য দিয়ে ভাগীরথী নদীর পূর্বপাড় দিয়ে বাদশাহী পথ ধরে রানাঘাটের কাছে চূর্ণী পার হয়ে চকদহে এসে জাগুলিয়ায় পৌঁছান। তারপর মানসিংহ অন্য রাস্তা ধরে যশোরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। মানসিংহ জাগুলিয়া থেকে হাবড়ার দিকের একটি ক্ষুদ্র রাস্তা ধরে, কৃষ্ণপুরের মধ্য দিয়ে হাবড়াকে ডান দিকে রেখে মসলন্দপুর হয়ে রাজবল্লভপুর পৌছে 'মসলন্দপুর ছাড়িয়া তাহাকে (মান সিংহকে) সিমুলিয়া ও কোলসূরের মধ্যে পদ্মা নদী পার হইতে হইয়াছিল'। নদীপাড় হয়ে মোগল সৈন্য বাদুড়িয়া পৌঁছাল। মোগল-সৈন্য বাদুড়িয়া থেকে, বসিরহাট ও টাকী অতিক্রম করে হাসনাবাদে বুড়নহাটি দুর্গের সম্মুখে এসে পৌছাল। এখানে প্রতাপের সৈন্যদের সঙ্গে মোগল-সৈন্যের প্রথম সংঘর্ষ হল। ইছামতী নদীর পশ্চিম পাড় ধরে মোগল-সৈন্য বসন্তপুরের নিকটস্থ হলে, প্রতাপের বাহিনীর সঙ্গে এখানে যুদ্ধ হয়। প্রতাপ পরাজিত ও বন্দী হন। পরে, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়।

মধ্যযুগের শেষভাগে মোগল আমলে নিম্নবঙ্গের ইছামতী নদীর নিম্ন অববাহিকা রাজনৈতিক কারণে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ইছামতী নদী প্রাচীন বা মধ্যযুগে খ্যাতির পাদপ্রদীপে আসতে পারেনি। অথচ, প্রতাপাদিত্যের যশোর রাজ্য ও রাজধানী নিম্ন প্রবাহে ইছামতী নদী ও তার শাখা নিয়েই গড়ে উঠেছিল।

# পাণ্ডুয়া মিনার, হুগলী, পশ্চিমবাংলা
# হিঃ ৮৮৭-১৪৭৭ খ্রীঃ

**রাশেদা ওয়ায়েজ**

**অবস্থিতি ঃ**

পাণ্ডুয়া একটি প্রাচীন শহর, ইহা কলকাতা এবং বর্ধমান শহরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সাতগার পশ্চিমে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। এটি সুলতানী আমলের

একটি বন্দর শহর— এটিকে ভালভাবে স্বতন্ত্র দেখাবার জন্য যেটি আরও বিখ্যাত হযরত পান্ডুয়া নামে মালদাহ শহরে পরিচিত। ছোট পান্ডুয়া বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এখানে চারটি পুরাতন কীর্তি বিদ্যমান, যেগুলো অত্যন্ত প্রাচীন গৌরবের বস্তু। (১) একটি মিনার, (২) একটি আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট স্থানযুক্ত লম্বা মসজিদ, (৩) শাহ শফির সমাধি (৪) একটি ছোট চারকোণাকৃতি মসজিদ। তার মধ্যে ছোট পান্ডুয়া মিনার হচ্ছে সবচেয়ে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি বড় মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১৭৫ ফুট দূরে অবস্থিত।

**স্থাপত্যিক বর্ণনা ঃ**

*ছোট পান্ডুয়ার বৃহদাকার পাঁচতলা মিনারটি আটত্রিশ মিটার উঁচু বড় মসজিদের ৫০ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। এটি দেখতে গোলাকৃতির। প্রতিটি তলা ৬০ ফুট* থেকে কমে আসছে। এটি দেখতে গোলাকৃতির। প্রতিটি তলা ৬০ ফুট থেকে কমে আসছে। এটির বিভিন্ন তলা মিনারের উচ্চতা জরিপের পর এরূপ ঃ নিচ ২৫ ফুট - দ্বিতীয় তলা ২৫ ফুট - তৃতীয় তলা ৩০ ফুট - চতুর্থ তলা ১৮ ফুট।

প্রতিটি তলার ডায়মিটার নিম্নে দেওয়া হল ঃ

নীচ - সর্বনিম্ন তলা ৬০ ফুট

নীচ - ৫৮ ফুট ২ ইঞ্চির উপর

দ্বিতীয় তলা - ৪৮ ফুট ১ ইঞ্চি উপর, ৪৭ ফুট ৬ ইঞ্চি উপর

তৃতীয় তলা - নীচ ৩৭ ফুট ৫ ইঞ্চি উপর, ৩৪ ফুট ৮ ইঞ্চি উপর

চতুর্থ তলা - ২৬ ফুট নীচ - ২৩ ফুট ১০ ইঞ্চি উপর

সর্ব উচ্চ তলা - ১৫ ফুট নীচ, ১২ ফুট উপর।

মিনারটির মধ্যখানে একটি ঘোরানো-প্যাঁচানো সিঁড়ি দেখা যায় যা নীচ তলা থেকে উপর তলা পর্যন্ত চলে গেছে। মিনারটি গোলাকৃতি বিশিষ্ট ৫ তলা। প্রতিটি তলা কমে এসে ৬০ ফুট তলায় এবং ১৫ ফুট সর্বোচ্চ তলায়। প্রতিটি তলার সোপান শ্রেণী সমতল ছাদে উপনীত হয় — যা চারদিকে প্রতিটি তলায় বেষ্টন করে আছে। মিনারটির দরজা পশ্চিম দিক মুখ করে মসজিদটির দিকে অবস্থিত। দরজাটি কাল পাথর ফ্রেমে তৈরী এবং লিন্টাল যুক্ত দরজা স্থাপত্যিক অলংকরণ উভয় দিকে বক্র ফিলার অ্যার্কট্রাভকে ধরে রেখেছে। দরজার পিলারগুলো বক্র চারকোণা নিচের অংশে, কিন্তু উপরে বহুভূজ ক্ষেত্র। বহুভূজগুলিকে ভাংগা ও মোল্ডিং কারুকার্য দ্বারা ও বেল ও চেইন মোটিভ যা সাধারণত গিয়াসউদ্দিন আযম শাহর কবরে দেখা যায়, পশ্চিম

বাংলায় একলাখী সমাধি ও পীর বাহারামের সমাধি, বর্ধমান, এই বেল ও চেইন মোটিভ বিদ্যমান। নীচের তিনটি তলা গোল খাঁজ। পূর্বে এনামেল টাইল মিনারের ভিতরের দেওয়ালগুলোতে ব্যবহার করা হয়। মিনারের ফিনিইলটি কলস এক হয়েছে মোটিভ দ্বারা আবৃত ছিল। যদিও এটি এখন নতুন করে প্যাষ্টার দ্বারা আবৃত।

**তারিখ ঃ**

যে উৎকীর্ণ লিপিটি খোদাই অবস্থায়, বড় বেসল্ট পাথরে শাহসুফি উদ্দী আস্থানায় অবস্থিত। বড় মসজিদ তৈরী হয় হিঃ ৮৮২-১৪৭৭ খ্রীঃ উলুঘ মাজলিস-ই-আযম দ্বারা তৈরী সুলতান ইউসুফ সাহেব রাজত্বকালে। মিনারটি যেহেতু মাজিনা হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাই বড় মসজিদের নির্মাণ কালের সময় সাময়িক।

বেগলার বলেছেন, গোল বেস যেটির তলদেশে অবস্থিত বৌদ্ধ স্তূপ হতে গৃহীত কারণ এটি তৈরী বড় বড় ইটের সাহায্যে। যেটি তিনি মনে করেনে বৌদ্ধ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য— কিন্তু আবার বিরোধিতা করে মত দেন যে বিখ্যাত মসজিদটি বড় ইটের দ্বারা তৈরী সেগুলো নিকটবর্তী পুরানো মন্দির থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। এ এইচ দানী মনে করেন যে মিনারটি কখনই মাজিনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি— এর প্রকৃতি, সাইজ যেটি সর্বোতি প্রমাণ করে বিজয় মিনার। খুব সম্ভব কুতুব মিনারের সঙ্গে ছোট পাণ্ডুয়া তিনি তুলনা করেছেন যেটি ঠিক নয়।

**পুনর্নির্মাণ মেরামত ঃ**

মিনারের সর্বোচ্চ তলাটি পড়ে যায় হিঃ ১৩০৩ বা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের দরুণ ১৯০৭ খ্রীঃ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটিকে পুণঃস্থাপিত করে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আরো সিঁড়িগুলোর নীচ তলা থেকে মিনারের উপর তলা পর্যন্ত মেরামত করে। ভূমিকম্পের জন্য মিনারের আরও মেরামত করা হয় হিঃ ১৩৫৩ বা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। মিনারের দেওয়াল ও মিনারের কিছু ক্ষতি হলে এগুলো মেরামত করা হয় পরের বছর।

# উনিশ শতকের বেনারস — বিদেশী ও দেশীয় প্রতিফলন

মৌমী ব্যানার্জী

উনিশ শতকের বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশী লেখাপত্রের মধ্যে বেনারস বা কাশীর যে বহুস্তরীয় চিত্র প্রতিভাত হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে-তা আলোচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে দেশীয় ঐতিহ্য ও স্মৃতিতে এই শহরের একটা নিজস্ব স্থান রয়েছে। এই ঐতিহ্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণাশ্রিত, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার তা গুরুত্বপূর্ণ কোন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর স্মৃতিতে অবিস্মরণীয় রেখাপাত করেছে। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বেনারসের এরূপ চিত্রাঙ্কনের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা কাশীর একটি বহুস্তরীয় পরিচিতিকে তুলে ধরে। এই প্রতিফলনের এক দিকে আছে দু'জন ইউরোপীয় তথা ইংরেজ মিশনারির লেখা, যথাক্রমে ১৮২৪-এ রচিত বিশপ রেজিনাল্ড হেবারের 'Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825' (volume-I)[১], এবং লন্ডন মিশনারি সোসাইটির জেম্‌স্ কেনেডি কর্তৃক রচিত 'Life and work in Benares and Kumaon, 1839-1877'।[২] অপর দিকে দুটি ভারতীয় তথা বাঙালি রচনা, যথাক্রমে ১৮০৯ সালে লেখা কলকাতার ভূকৈলাসের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশী পরিক্রমা'[৩] এবং উনিশ শতকের মধ্য ভাগে রচিত বাঙালি ভ্রমণকারী যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর 'তীর্থ-ভ্রমণ'[৪] আলোচিত হবে।

অষ্টাদশ শতকের প্রান্ত ভাগে ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে এবং তা সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছায় উনিশ শতকে। বিবিধ জটিল ব্রিটিশ মনোভাবের প্রতিফলন এ সময় থেকে বেনারসের অস্তিত্ব ও ধারণাটি গড়ে তোলায় বিশেষ কার্যকরী হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে অবশ্য কালে কালে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে। উনিশ শতক থেকে এ ধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতায় এ দেশের নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিক প্রবৃত্তির প্রতি কিছুটা সহানুভূতিসুলভ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচ্যবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করে ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা এ দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনুধাবন করে ইংরেজ সভ্যতার সাংস্কৃতিক কাঠামোতে তাকে পুনঃস্থাপন

করার প্রচেষ্টা করেন। এর পুরধা ছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্‌। এই যে দেশজ সংস্কৃতিকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সংস্পর্শে আনার প্রয়াস, তাকে ডেভিড কফ্‌ 'acculturation' (সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ) বলেছেন।[৫] এর তত্ত্বগত উদ্দেশ্য হয়ত ছিল ঔপনিবেশিকতার তীব্র সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতা কিছুটা প্রতিহত করা। এতে করে হয় তো ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। এদিকে সাথে সাথে উনিশ শতকের ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদের চূড়ান্ত সময়েই আবার ইউরোপ থেকে ক্রমাগত খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন ছিল অব্যাহত। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে যখন থেকে ব্রিটিশের ভারতীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ধারণাটি ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের জনমানসে প্রবেশ করেছিল, তখন থেকে বেনারসকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার ফলে মিশনারিদের দৃষ্টিকোণ থেকে বেনারসের বর্ণনা বহুমুখী ও বিভিন্নতার স্বাদ আনে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই ইউরোপীয় মিশনারিদের দৃষ্টিতে বেনারসের চিত্রটি এক একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে বারবার বদলে গিয়েছে।

হেবার ও কেনেডির বেনারস বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এই প্রাচীন শহরটিকে ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মের পীঠস্থান রূপে দেখা গিয়েছে,[৬] যদিও তাঁদের বেনারস সংক্রান্ত দুটি রচনার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। হেবারের রচনায় প্রতিফলিত হয় সেই ব্রিটিশ মানসিকতা যেটি বেনারসের প্রাচীনতা ও ঐতিহ্যের রদবদল না করেও তাকে আধুনিক নগরে পরিণত করার সম্ভাবনার কথা বলেছে। কিন্তু কেনেডির রচনাকাল অপর একটি পালাবদলের সময়। ১৮৩০ পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক রাজের প্রতিনিধিরা বেনারসের স্থবির পশ্চাদপদ সমাজের আলোচনার প্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসনের প্রগতিশীল দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

তাই আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই এ্যাঙ্গলিকান খ্রিস্টধর্মে প্রভাবিত এবং উনিশ শতকের রোমান্টিকতাবাদে আপ্লুত হেবার বেনারসের ঐতিহ্যময় রূপটিকে প্রাচ্যের প্রতীক রূপে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর ভাষায় — "Benares is a very remarkable city, more entirely and characteristically Eastern than any which I have yet seen ........।"[৭] বিশেষতঃ বেনারসের প্রাচীন নগরায়ণের উন্নত ধারাটি দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন।[৮] তিনি এই প্রাচীন প্রগতির ধারাটিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উন্নতির ধারায় সহজে মিলে যেতে দেখে উল্লসিত হন। এর অপর একটি দৃষ্টান্ত তিনি দেখেন শিক্ষা ক্ষেত্রে। ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র বেনারসে পাশ্চাত্য কাঠামোর ভিত্তিতে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং তাদের সাফল্য তাঁকে অত্যন্ত

অভিভূত করেছিল। এক বাঙালি ভদ্রলোক কালীশঙ্কর ঘোষালের মুক্তহস্তে দান ও শিক্ষা ব্যবস্থার উদার সমর্থনের জন্য তাঁকে হেবার 'liberal benefactor' বলে অভিহিত করেছেন।[৯] হেবারের বক্তব্যে তিনটি জিনিস স্পষ্ট। প্রথমত, তাঁর মনেই হয় নি যে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসে তিনি বেনারসে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজব্যবস্থার সম্মুখীন হন। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের পক্ষে লাভজনক হবে কারণ তাতে পার্থিব উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। তৃতীয়ত, হিন্দুধর্মের সমালোচনায় তিনি দানের ক্ষেত্রে অসম বন্টনের প্রবণতাকে নিন্দা করেছেন যা এই পূণ্য তীর্থে তাঁকে ব্যথিত করেছে।[১০] এখানে তাঁর মনে হয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে এবং খ্রিস্ট ধর্মের শুদ্ধ মূল্যবোধের প্রভাবে এক সময়ে ভারতীয়দের মানসিকতা সংকীর্ণতামুক্ত হবে।[১১] উল্লেখযোগ্যভাবে হেবার কিন্তু মিশনারি হয়েও হিন্দুধর্ম অপসারণ করে খ্রিস্ট ধর্ম প্রসারের কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত রাখেন নি।

এরপর যখন কেনেডির রচিত বেনারসের বর্ণনা লক্ষ্য করি, তাতে রোমান্টিকতা ও প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে উচ্ছ্বাস উপস্থিত থাকলেও, এই সুরটি ছিল অবধারিতভাবে সমালোচনাত্মক এবং বিদ্রুপাত্মক। সূচনাতেই তিনি ইংরেজ ও বেনারস তথা ভারতের সমাজের অস্তিত্বের মূলেই যে এক ব্যাপক দূরত্ব রয়েছে (great difference), তা স্পষ্ট করে দেন।[১২] বেনারসের স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যে ব্রিটিশদের জাতিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্য বিদ্যমান, তা তিনি সূচনাতেই উল্লেখ করেছেন।[১৩] তাঁর হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম উভয়ের প্রতিই তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে এবং খ্রিস্ট ধর্মকে তিনি একমাত্র যথার্থ সর্বজনীন ধর্ম বলে দাবি করেছেন।[১৪] তিনি এই পবিত্র নগরীর নিজস্বতাগুলিকে অদ্ভুত (peculiarity) বলে ব্যঙ্গ করেছেন এবং এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যেমন ওঁর ভাষায় — 'sacred monkeys', 'well fed lazy bulls', 'idle vagabonds' প্রমুখ।[১৫] তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেছেন যে ব্রিটিশ শাসকরা বেনারসের নিশ্চিত কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি করবেন যা এই নগরকে আধুনিক করে তুলবে।[১৬] এখানে কেনেডির বর্ণনা মেকলেবাদের প্রতিধ্বনি করে যার দ্বারা বেনারস সম্পর্কে ইউরোপীয় ধারণাটি জোরদার হয়। এর ফলে বেনারসের পরিবর্তনবিমুখ স্থবির চরিত্রটির বিপরীতে ইউরোপীয় প্রগতির ছবিটি তাদের পারস্পরিক ভিন্নতাকে আরো বেশি প্রকট করে তুলেছে।[১৭]

এই দুটি মিশ্র ব্রিটিশ অবস্থানের বর্ণনা থেকে যে মূল ধারণাটি বেরিয়ে আসে, তা কতখানি ভারতীয় বা দেশজ চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল, তা অনুমান করা যায় বেনারস সংক্রান্ত দুজন বাঙালি ভদ্রলোকের রচনা থেকে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য

রাখা গুরুত্বপূর্ণ— তা হল এই বাঙালিদের মানসপটে বেনারসের অবস্থান কতখানি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার অবচেতন থেকে উৎসারিত হয়েছিল; বা যদি দুটি ভিন্নমুখী ধারণারই সমন্বয় বা দোলাচলতা তাঁদের রচনায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তার অনুপাত আন্দাজ করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

উনিশ শতকের গোড়ায় রচিত জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশী পরিক্রমা'র মধ্যে দিয়ে বাঙালির কাশী সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ধরা পড়ে। এই রচনায় বেনারস সম্পর্কিত বিবিধ ধারণার দোলায়িত (shifting) প্রবাহের মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের স্ববিরোধী (ambivalent) মানসিকতার পরিচয় পাই। একদিকে বাবু জয়নারায়ণ কোম্পানীর কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর পরিচর্যার বিনিময়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন।[১৮] এছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদ ও খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সর্বপ্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] এরই সঙ্গে তাঁর অবচেতন মনে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অনিশ্চয়তাবোধ জেগে ওঠে। এক দিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য, অপর দিকে ঔপনিবেশিকতার আঘাতে দেশীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করার তাগিদে জয়নারায়ণ উনিশ শতকের ভদ্রলোকের মনের দোলাচলতায় ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে আক্রান্ত। তাই যেন কাশীর গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নবরূপ প্রদান করার দুরূহ আকাঙ্ক্ষা ছাপিয়ে ওঠে তাঁর এই অনিশ্চয়তাবোধকে। তাঁর 'পরিক্রমা' রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐ তীর্থস্থানের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা। এদিকে এই পরিক্রমা কাশীর পৌরাণিক ঐতিহ্যের ধারাকে তুলে ধরে। অপর দিকে বৈষ্ণব ধর্মে নিহিত 'কাশীবাস'-এর ধারণা জয়নারায়ণের রচনার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত অনুভবের পর্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে তীর্থভ্রমণকারী যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর রচনায় এই প্রাচীন শহরের আধুনিক বিবর্ত্তনের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়েছে। বেনারসে দীর্ঘদিন তীর্থবাসের ফলে বৈষ্ণব যদুনাথের ধর্মীয় চেতনা আত্মতৃপ্তিতে পর্যবসিত হয়। তাঁর রচনায় এই তীর্থক্ষেত্রের ধর্মীয় গুরুত্বের সঙ্গে তার আধুনিকীকরণের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই কাশীতে দৈনিক কার্যাবলীর স্মৃতিকে যদুনাথ ধরে রেখেছিলেন ঘড়ির কাঁটার হিসেবে নতুন কালের নিরিখে তাঁর 'রোজনাম্‌চা'-র পাতায়। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে রচিত এই গ্রন্থে যদুনাথ ১৮৪৭-এর মহাবিদ্রোহের সময়ের কাশীর বিবরণ দিয়েছেন।[২০] এই লেখা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে এই বিদ্রোহের সময়ে বেনারসের ভদ্রলোক শ্রেণীর অন্তর্গত বাঙালি ও অবাঙালি বাবুরা বিদ্রোহী সিপাইদের 'দস্যুগণ'[২১] বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষিত দেশজ ভদ্রলোক শ্রেণী বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের

কাছে তাঁদের আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন। এমন কি, এই তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম রক্ষা ও তার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজদের কাছে তাঁরা বিশেষ ঋণ স্বীকার করেন।[২২] তা থেকে বলা যায় যে উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকেই দেশীয় ভদ্রলোকেরা কাশীর ধর্মীয় পরিচিতির সঙ্গে আধুনিক ঔপনিবেশিক রাজনীতির সংমিশ্রণকে গ্রহণ করে নেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে এই নির্দিষ্ট চারটি বিদেশী ও দেশীয় লেখাপত্রের মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের বেনারসের একটি বহুমাত্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিশনারি হেবার ও কেনেডির রচনাকে ভিত্তি করে বলা যায় যে উনিশ শতকের গোড়ায় প্রাচ্যবাদের রঙীন বিচ্ছুরণে চিত্রিত বেনারসের আমুল রূপান্তর ঘটে এই শতকের মধ্য ভাগে। তখন কট্টর সাম্রাজ্যবাদের আদর্শকে সমর্থন করেই কেনেডির লেখায় এই শহরটির স্থবির পরিবর্তনবিমুখ দিকটি ভেসে ওঠে। এরই পাশাপাশি দুটি দেশীয় রচনার মধ্যে উনিশ শতকের আধুনিকীকরণের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংস্কৃতির সংকটময় অস্তিত্বের ইতিহাস বেনারসের বিবিধ চিত্রণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

পরিশেষে, বলা বাহুল্য, বেনারসের চরিত্র চিত্রায়ণ অবশ্য এত সামান্য ও আংশিক বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অজস্র পর্যটক, বণিক, সরকারি কর্মচারী প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ ও অপর দিকে দেশীয় সাহিত্যিক, জমিদার, বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদীদের রচনায় বার বার যে বেনারস ফুটে উঠেছে, তা কেবলমাত্র প্রাচীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বা ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ মোহ— কোনটিই নয়। কখনো তা এই দুই-এর আধাআধি সংমিশ্রণ, কখনো বা তা এ দুটিকে অতিক্রম করে মানবিক যুক্তির প্রেক্ষিতে বেনারসের বহু সংস্কৃতির সমন্বয় খোঁজার প্রয়াস।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) বিশপ রেজিনাল্ড হেবার, Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825, Volume I, 2nd edition, London, n.d.।

২) জেমস্ কেনেডি, Life and work in Benares and Kumaon, 1839-1877, London, 1884।

৩) জয়নারায়ণ ঘোষাল, কাশী পরিক্রমা (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত), কলকাতা ১৩১১।

৪) যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, তীর্থ-ভ্রমণ (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত), কলকাতা ১৩২২।

৫) ডেভিড কফ্, British Orientalism and the Bengal Renaissance. The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835, Calcutta, 1969, p.4।

৬) হেবার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪; কেনেডি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।
৭) হেবার, তদেব, পৃ. ৩৭১।
৮) তদেব, পৃ. ৩৭২।
৯) তদেব, পৃ. ৩৬৯-৩৭০।
১০) তদেব, পৃ. ৩৭৪।
১১) তদেব, পৃ. ৩৮০।
১২) কেনেডি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।
১৩) তদেব, পৃ. ৩৫।
১৪) তদেব, পৃ. ১৭-১৮।
১৫) তদেব, পৃ. ৭১।
১৬) তদেব, পৃ. ৬৯।
১৭) তদেব, পৃ. ৭৫।
১৮) জীবনীকোষ, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ৬৩৩।
১৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৭, পৃ. ৩৫।
২০) সৰ্ব্বাধিকারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬০-৫১২।
২১) তদেব, পৃ. ৪৭৫।
২২) তদেব, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬।

# কলকাতা কর্পোরেশনে প্রধান কর্মকর্তা পদে বসু-শাসমল বিতর্ক

## প্রভাত রায়

১৯২৪ সাল বাঙলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। কারণ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে স্বরাজ্য দল ঐ বছর কলকাতা পৌর সভার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু নির্বাচনোত্তর পর্বে প্রধান কর্মকর্তার পদ নিয়ে স্বরাজ্য দলে অন্তঃবিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা কি ছিল তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হবে আলোচ্য প্রবন্ধে।

১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধীর এই সিদ্ধান্ত ১২ ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস কমিটিতে অনুমোদিত হয়।[১] গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় সুভাষচন্দ্র বসুর রচনা থেকে— "আমি তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম, এবং মহাত্মা গান্ধী যেভাবে বার বার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে ক্রোধে ও দুঃখে তিনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন, আমি দেখেছিলাম।"[২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দেশবন্ধু তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর সহবন্দী। এই সময় দেশের জনমানসে যে উত্তেজনার (ব্রিটিশ বিরোধী) সৃষ্টি হয়েছিল, এমনকি আন্দোলন প্রত্যাহারের পরও তা বিদ্যমান ছিল, তা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারকে ভীত করার জন্য দেশবন্ধু বিকল্প কোন কর্মপন্থার কথা ভাবতে থাকেন— "বারদোলীর পশ্চাদপসরণকে একটি অনিবার্য ঘটনারূপে মেনে নিয়ে, দেশবন্ধু কৌশল পরিবর্তন করে জনসাধারণের উৎসাহ আরও একবার জাগিয়ে তোলার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেন। এই সূত্রে তিনি তাঁর আইনসভার মধ্যে অসহযোগের পরিকল্পনা গড়ে তুললেন।"[৩] নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়লাভের মাধ্যমে আইনসভায় প্রবেশ এবং পরবর্তীকালে সর্বক্ষেত্রে অসহযোগের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রশ্নে গান্ধী-দাশ মতবিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং এরই ফলস্বরূপ উদ্ভব হয় স্বরাজ্য দলের।

বঙ্গ প্রদেশের দেশবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বরাজ্য দল শক্তি সঞ্চয় করে এবং আইনসভার নির্বাচনে (১৯২৩) অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। অল্পকিছু দিন পরেই অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন। এই নির্বাচন প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, "সব দিক দিয়ে আশাপ্রদ পরিবেশের মধ্য দিয়ে ১৯২৪ সালের আবির্ভাব হল, কিন্তু স্বরাজ্যপন্থীদের বিশ্রামের সময় ছিল না। ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা পৌর সংস্থার নির্বাচন মার্চে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।"[৪] এই নির্বাচনে স্বরাজ্য দল সাফল্য লাভ করে এবং পৌর সংস্থার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বরাজ্য দলের সফল প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন।[৫] নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রথম সভায় চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র এবং শহীদ সুরাহবর্দী ডেপুটি মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন।[৬] উক্ত পদ দুটিতে প্রার্থী পদে স্বরাজ্য দলে কোন বিরোধের সৃষ্টি না হলেও অপর গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্থাৎ প্রধান কর্মকর্তার (Chief Executive Officer) পদ নিয়ে বিরোধের আবির্ভাব ঘটে। এক্ষেত্রে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।[৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এঁরা দুজনেই ছিলেন দেশবন্ধুর দুই প্রধান সেনাপতি (চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং কলকাতার সুভাষচন্দ্র বসু এঁরা সকলেই চিত্তরঞ্জন দাশের প্রধান সেনাপতি হিসাবে পরিচিত)।[৮]

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে কলকাতা পৌর সংস্থার প্রধান কর্মকতার পদ দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি পরে ঐ পদে সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়োজিত করেন।[৯] পদ পেলেন না বলে তিনি (শাসমল) মাত্র যে দেশবন্ধুর উপর হাড়ে হাড়ে চটেছিলেন তা নয়, যে সুভাষকে তিনি বড় স্নেহ করতেন, সে সুভাষচন্দ্রও তাঁর চোখের বিষ হয়েছিল।[১০] যা হোক প্রশ্ন জাগে যে চিত্তরঞ্জন দাশ কেন তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত করেন। শ্রী দাশের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ হিসাবে রজতকান্ত রায় অভিযোগ করেছেন যে, কলকাতার কায়স্থ দলপতিদের নিম্নবর্ণ ও গ্রামীণ মেদিনীপুরের কেওট-এর বিরুদ্ধে দলাদলির ফল।[১১] একই ধরনের অভিযোগ পরিলক্ষিত হয় বিমলানন্দ শাসমলের লেখায়। তিনি হেমন্ত কুমার সরকারের 'দেশবন্ধু স্মৃতি' বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে মাত্র ৫০০ টাকা মাসিক মাসোহারার বিনিময়ে বীরেন্দ্রনাথ ঐ পদে নিযুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দেশবন্ধু প্রথমে তাঁকে সমর্থন করেন। কিন্তু কৈবর্ত বলে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়।[১২] কিন্তু অভিযোগগুলো কতদূর সঠিক অথবা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। সম্ভবত অভিযোগগুলি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ বিদ্যার দিক থেকে তো

তুলনাই চলে না। ত্যাগের দিক অন্তত সমান সমান। তাছাড়া মুসলীম ও বিপ্লবী দল (যুগান্তর) বসুকে সমর্থন করে। শাসমল মেদিনীপুরের জেলা বোর্ডে ভাল কাজ দেখালেও কলকাতার ইউরোপীয় গোষ্ঠীর চক্রান্তের সঙ্গে পেরে উঠতেন না।[১৩] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সুভাষচন্দ্র বসু পৌর নির্বাচনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়োগের বা সমর্থনের পিছনে সম্ভবত অন্যবিধ একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল। সুচতুর, রাজনীতিবিদ শ্রী দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপীয় গোষ্ঠী সহজে পৌর সংস্থার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে রাজী হবে না। বস্তুত স্বরাজ্য দলের জয়লাভে ইউরোপীয় গোষ্ঠী মোটেই খুশি হয়নি। কারণ এতদিন পর্যন্ত কর্পোরেশন ছিল তাদের স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্র।[১৪] স্বাভাবিক কারণেই প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে তারা সুভাষচন্দ্রের নিয়োগের বিরোধিতা করেন। ১৯২৪ সালের ২৩শে এপ্রিল কর্পোরেশনের বিশেষ অধিবেশনে রাই রত্নরাম ব্যানার্জী বাহাদুর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আই.সি.এস. পরীক্ষায় সফল প্রভৃতি উল্লেখ করে প্রধান কর্মকর্তা পদে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম প্রস্তাব করেন এবং আব্দুর রাজ্জাক তা সমর্থন করেন।[১৫] শ্রী ব্যানার্জীর প্রস্তাবের সমর্থনে সকল যুক্তি মেনে নিলেও W.B.J. Willson বিরোধিতা করে বলেন যে, প্রধান কর্মকর্তার মত এমন গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ— যে কর্পোরেশনের সকল প্রকার কার্যাবলী ও সকল বিভাগের প্রধান— তাকেই নিয়োগ করা উচিত যে সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারবে এবং যার এরূপ কার্য পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।[১৬] সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে Mr. Stuart Williams বলেন যে ঐ পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে।[১৭] শুধুমাত্র ইউরোপীয়রাই নন, ভারতীয়রাও শ্রী বসুর বিরোধিতা করেছিলেন। বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক কর্পোরেশনে বিপুল ব্যয়ের (৫,৬৬,৪৩,০০০ টাকা) উল্লেখ করে বলেন যে ২১ বছর ধরে কমিশনার হিসাবে কর্মরত এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছেন হরিধন দত্ত বাহাদুর। তিনি বর্তমানে অস্থায়ীভাবে তিন মাসের জন্য প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত, তাঁকেই প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত করা হোক।[১৮] উপরোক্ত বিরোধী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ব্রজগোপাল গোস্বামী বলেন যে, নির্বাচনের প্রচারে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নিজেদের দ্বারা শাসিত হবার ব্যবস্থা করব। সুতরাং এমন একজনকে ঐ পদে বসানো কর্তব্য বলে মনে করেন, যিনি একজন কংগ্রেসকর্মী এবং কংগ্রেসীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর অপেক্ষা যোগ্যতম কেউ নেই। স্বভাবতই শ্রী বসুকে তারা প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করতে অগ্রসর হয়েছেন।[১৯] সুতরাং একথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে খুব সহজে সকলেই বিশেষত, ইউরোপীয়রা প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে

কংগ্রেসীদের মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। সম্ভবত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দেশবন্ধু একথা পূর্বেই অনুধাবন করে এমন একজনের নাম ঐ পদের জন্য প্রস্তাব করেন যাকে নিয়ে সকল প্রকার বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব। তাছাড়া সকলের মতামত গ্রহণে আগ্রহী চিত্তরঞ্জনের সামনে বিকল্প কোন উপায়ও ছিল না। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় ও বিপ্লবী গোষ্ঠী বসুকে সমর্থন করে (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) এবং কলিকাতার প্রভাবশালী গোষ্ঠী বসুর নিয়োগে সক্রিয় ছিলেন (অভিযোগ মেনে নিলে)। স্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবীকে প্রাধান্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকেই শ্রী দাশ প্রধান কর্মকর্তার পদে সমর্থন করেন। প্রসঙ্গত সুভাষচন্দ্র বসু ইতিমধ্যেই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন সহযোগীতে পরিণত হয়েছিলেন এ কথা বলাই বাহুল্য। বসুর প্রতি বয়ঃজ্যেষ্ঠ দাশের প্রগাঢ় স্নেহ ও বিশ্বাস অমূলক ছিল না।[২০] কারণ সুভাষ ইতিমধ্যেই তাঁর সংগঠনী শক্তি, প্রতিভা ও কার্য পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর সংগঠনী দক্ষতার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর। এই দিন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস ভারতে (বোম্বাই-এ) পদার্পণ করেন এবং সেই উপলক্ষে দেশজুড়ে হরতাল পালিত হয়। কলকাতায় এই হরতাল পুরোপুরি সফল হয় এবং বসু ছিলেন সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম।[২১] এ প্রসঙ্গে হিউ টয়ে লিখেছেন, "প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দেখা দিল সুভাষচন্দ্র হল তার একজন পাণ্ডা এবং কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা।"[২২] এই হরতাল কতটা সফল হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা থেকে "১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর কলকাতায় হরতাল একেবারে অজ্ঞাতপূর্ব অবিস্মরণীয় ঘটনা— শহরের কর্তৃত্ব সেদিন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে, ইংরেজ শাসন যেন অন্তর্হিত।"[২৩] তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে যুবরাজের কলকাতায় আগমনের দিনও (২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২১) কলকাতায় আরেকটি সফল ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এক ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ত্রাণ কার্যের জন্য কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক যান যার মধ্যে সুভাষচন্দ্রও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বসুর নের্তৃত্বেই ত্রাণ কার্য সম্পন্ন হয়। বন্যা প্লাবিত উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তিনি রিলিফের কাজে ভার নিয়ে গেলেন; সেখানে ছ' সপ্তাহ ধরে তাঁকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হল। যেখানে দুঃখকষ্ট সেখানে কাজ করার অদম্য উৎসাহ এবং সংগঠন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ফলে লোকের কাছে তিনি পেলেন অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রদেশ জুড়ে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বেড়ে গেল।[২৪] স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর উপর চিত্তরঞ্জন দাশের বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি

পেয়েছিল। বস্তুতঃ এই সকল কারণে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা পদে যোগ্য এবং সকল প্রকার বিরোধিতার উপযুক্ত জবাব হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু অপেক্ষা যোগ্য প্রার্থী শ্রী দাশের হাতে আর কে ছিলেন?

তবে সুভাষচন্দ্র বসু নিজে প্রধান কর্মকর্তা পদ পেতে কতটা আগ্রহী ছিলেন এবং পদ প্রাপ্তিতে তাঁর ভূমিকা কতটা সে বিষয়টিও আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বাসন্তীদেবী তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন যে, সুভাষকে প্রধান কর্মকর্তার পদ নিতে বললে তিনি দেশবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "উনি বললেন কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার হতে হবে। শুনে তার কি কান্না। বলে আমি কি এই জন্য আই.সি.এস. ছেড়ে দিয়ে এলাম।"[২৫] শেষ পর্যন্ত বাসন্তী দেবীর অনুরোধে তিনি রাজী হন। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে তিনি ঐ পদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। শুধু তাই নয়, তিনি বেতন হিসাবে যে টাকা পেতেন তা বিভিন্ন সেবামূলক কাজে ব্যয় করতেন। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায় যে তাঁর বেতনের অর্থ তিনি দান করতেন দক্ষিণ কলকাতার একটি সেবামূলক সমিতিকে। এছাড়াও তিনি বহু ছাত্রকে অর্থ সাহায্য করতেন এই বেতনের টাকা থেকে।[২৬] বস্তুত প্রধান কর্মকর্তার পদ প্রাপ্তিতে তাঁর আগ্রহ এবং ভূমিকা কোনটাই ছিল না।

সুভাষচন্দ্র বসু যখন ১৯২৪ সালের ১৪ই এপ্রিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের লাল বাড়ীতে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে প্রবেশ করেন তখন কর্পোরেশনের কর্মচারীরা তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৌতুহল উদ্দীপক দৃষ্টিতে দেখেন। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে তিনি কি পারবেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে?[২৭] এ প্রসঙ্গে প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে বসুর কাজের সফলতাব সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যেতে পারে।[২৮]

১) কর আদায়ের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন ৪১,৭০,০৯৮ টাকা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

২) ১৭২টি নতুন পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যার জন্য ধার্য্য করা হয় ৩,৭৩,০০০ টাকা এবং ২১৭ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য।

৩) লাইসেন্স বাবদ কর্পোরেশন ১৮,৬৬,৭৫৪ টাকা আদায় করে।

৪) শহরে বেশ কিছু গ্যাসের বাতি ও অন্যান্য আলোর ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বরাজ্য দল সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য নিয়ে কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব পেলেও তাদের বিরোধী সদস্যও কম ছিল না। প্রতি মুহূর্তে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। বস্তুতঃ স্বরাজ্য দল নির্বাচনে সাফল্য লাভ করলে বিরোধীদের বিশেষ করে পরিবর্তন বিরোধীদের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ আনতে থাকেন।[২৯] এই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে স্বরাজ্য দল বিভিন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঠিকা দেওয়ার বিনিময়ে পার্টি তহবিলে অর্থ আদায় করছে।[৩০]

সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে সুভাষচন্দ্র বসু নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রধান কর্মকর্তা হননি বা ঐ পদ লাভে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। একই সঙ্গে বলা যায় যে, চিত্তরঞ্জন দাশের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট একটি কারণ দায়ী ছিল না। বস্তুত সুভাষচন্দ্র বসুর যোগ্যতা, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর (ইংরেজ) উপযুক্ত জবাব, বিভিন্ন গোষ্ঠীর (মুসলীম সমাজ, যুগান্তর গোষ্ঠী এবং কলকাতার প্রভাবশালী অংশ) সমর্থন শ্রী দাশকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি সমর্থন এবং প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগে প্রভাবিত করেছিল।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য; কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী; কলকাতা, ১৯৯৪; পৃ. ১৫৭

২) সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৯, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪২

৩) উপরিল্লিখিত, পৃ. ৪৫

৪) উপরিল্লিখিত, পৃ. ৫৪

৫) উপরিল্লিখিত, পৃ. ৫৪

৬) উপরিল্লিখিত, পৃ. ৫৪

৭) অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আনন্দ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১২৮

৮) Rajat Kanta Roy, Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927, Oxford, 1984, p. 330

৯) ibid, p. 330

১০) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুভাষ', মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩, পৃ. ১৫৩

১১) Rajat Kanta Roy, Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927, Oxford, 1984, p. 331

১২। বিমলানন্দ শাসমল, স্বাধীনতার ফাঁকি, নতুন গতি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৯

১৩। অমলেশ ত্রিপাঠী, 'নেতা থেকে নেতাজী', স্বাধীনতার মুখ, আনন্দ পা.লি., কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৪

১৪। অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

১৫। Netaji Birth Day Commemorative Volume Centenary eve tribute, Calcutta Municipal Corporation, Kolkata, 1996, p. 3

১৬। ibid, p. 4

১৭। ibid, p. 4-5

১৮। ibid, p. 5

১৯। ibid, p. 6

২০। অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

২১। Leonard A. Gordon, Brothers Against the Raj : A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose, Viking, 1990, p. 88

২২। হিউ টয়ে, ব্যাঘ্রকেতন (অনুবাদক - সুভাষ মুখোপাধ্যায়), এলায়েড পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৩৬৭, পৃ. ৩৬-৩৭

২৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ৭৯

২৪। হিউ টয়ে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

২৫। কৃষ্ণা বসু, প্রসঙ্গ সুভাষচন্দ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৮

২৬। সহকর্ম্মী. 'কৌপীন থেকে কৃপাণ', মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩, পৃ. ১৫৪

২৭। The Calcutta Municipal Gazatte, Subhas Chandra Bose Birth Centenary Number, 'When Netaji was in the Corporation', p. 19

২৮) Netaji Birth Day Commemorative Volume Centenary eve tribute-এ সরকারী পরিসংখ্যান রয়েছে, পৃ. ২৫

২৯) ibid, p. 17

৩০) ৩রা জুলাই, ১৯২৪ তারিখে দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত সংবাদ।

# "শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং এই শিল্পে মহিলাদের অংশ গ্রহণ" (আধুনিক পর্ব)

দেবশ্রী মুখার্জ্জী

বাংলার তাঁত বস্ত্রের খ্যাতি দীর্ঘ দিনের। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে ৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্লিনি তাঁর বিবরণে বাংলার মসলিনের চাকচিক্যের উল্লেখ করেছেন। এই খ্যাতি পরবর্তীকালেও অটুট ছিল।[১] বাংলার বস্ত্র শিল্প বলতে প্রথমেই পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের উল্লেখ করা যায়। শান্তিপুরে বস্ত্র বয়ন বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে সঠিক সময় নিয়ে সংশয় থাকলেও এটুকু বলা যায় চৈতন্যদেবের বহু আগেই শান্তিপুরে বয়ন শুরু হয়েছিল। সম্ভবত সুলতানী যুগের সূচনা থেকেই। তখনও অবশ্য শান্তিপুরের কাপড় 'শান্তিপুরী' হয়ে ওঠেনি। প্রধানত মোটা সুতোর কাপড় বোনা হত সে সময়, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'শান্তিপুর পরিচয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়— ঢাকার ধামরাই থেকে লক্ষ্মণ সেনের সময় প্রধানত তারই আগ্রহে বয়নক্ষম ও সূক্ষ্মতন্তু শিল্প নিপুণ কয়েকঘর তন্তুবায় এবং তার সঙ্গে কয়েকঘর হিন্দু দরজী বা ওস্তাগর শান্তিপুরে আসে। তার আগে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ মোটা সুতোর বস্ত্র বয়ন করত। ধামরাই-এর তাঁতীরা প্রধানতঃ মসলিনেরই তাঁতী। শান্তিপুরে এসে তাঁরা মসলিন বয়নই শুরু করেন যা অনেক পরে নকশাদার পাড়ের শাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে 'শান্তিপুরী' নামে খ্যাত হয়। মসলিন থানের পাড়ে কালী করে হয় ধুতি।[২] মোঘল আমলে এই মসলিনেরই খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। কোম্পানীর আমলেও শান্তিপুরে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিবাস ও সরকারী কতিপয় বৃহৎ বস্ত্র কারখানার স্থান ছিল বলে বস্ত্র ব্যবসা ক্রমশঃ শান্তিপুরেই কেন্দ্রীভূত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অষ্টাবিংশ বৎসরে সরকার ১,২০,০০০-১,৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যের শান্তিপুরী মসলিন ক্রয় করতেন।[৩] এর পূর্বে ১৭৫৮ খৃঃ এর সরকারী রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) কিঞ্চিৎ আগে ও পরে সরকার গোমস্তাদের সহায়তায় শান্তিপুর থেকে তন্তুবায়দিগকে দাদন দিয়ে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে নিয়ে যায় এবং স্থায়ী ভাবে

বসতি স্থাপন করে। সম্ভবতঃ এই কারণেই জোব চার্নক কোলকাতা নগরীর পত্তন করেন (১৬৯০)।[৪] শান্তিপুরের পাশেই ফুলিয়া গ্রাম। বয়সের দিক থেকে শান্তিপুরী শাড়ির তুলনায় ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়ি নিতান্তই শিশু। শ খানেক বছর আগে বাংলার তেরশ সালের গোড়ায় তার উদ্ভব পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইল নামক স্থানে, অবিভক্ত ভারতে বিশেষত বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর (ইংরেজ) অনুপ্রবেশ এবং ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঢাকার তাঁতীদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার বা শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বেশীর ভাগ চলে আসেন ঢাকার ধামরাই ও চৌহট্ট গ্রামে। পরে- দেশদুয়ার, সন্তোষ ও খারিজার জমিদারদের আমন্ত্রণে ধামরাই ও চৌহট্ট গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজন তাঁতী টাঙ্গাইলে চলে আসেন। টাঙ্গাইলের তাঁতীদের পদবী বসাক। পরে দেশ ভাগের পর টাঙ্গাইলের বসাক তাঁতীদের পুনঃস্থাপন করা হয় নদীয়ার ফুলিয়া অঞ্চলে।[৫] বর্তমানে ভারতের তাঁত বস্ত্র শিল্প বলতে প্রধানত নদীয়ার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার তাঁত ও সিল্ক বস্ত্রকেই বোঝায়। এই সামগ্রিক বস্ত্র শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ কিরূপ, তাদের মজুরীর স্বরূপ কি প্রকৃতির, এ বিষয়ে শ্রেণী বৈষম্য আছে কিনা — বিষয়গুলি আলোচনার দাবী রাখে।

নদীয়া জেলা সম্পর্কিত আলোচনায় জেলাটির ভৌগোলিক রূপরেখা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। নদীয়া জেলা ২২°৫৩ ও ২৪°১১ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৮°০৯ ও ৮৮°৪৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত গাঙ্গেয় সমভূমি। ব্রিটিশ আমলে, ভারতে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখের সভায়, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নদীয়া নামের একটি স্বতন্ত্র জেলা এবং তার কালেক্টারের পদ সৃষ্টি করবার সিদ্ধান্ত নেন। তখন থেকেই কৃষ্ণনগর জেলার সদর শহর। নদীয়ার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন এফ্ রেডকার্ন। দেশ বিভাগের সময় (আগষ্ট ১৯৪৭) নদীয়া জেলাও বিভক্ত হয়। বর্তমানে এ জেলার দুটি মহকুমা — কৃষ্ণনগর (সদর) এবং রানাঘাট। নদীয়ার আয়তন ১,৫১৪.৯ বর্গমাইল (৩,৯২৬ বর্গ কি. মি.)। বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর-পূর্বে কুষ্টিয়া জেলা (বাংলাদেশ), দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে চব্বিশ পরগণা জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভাগীরথীর অপর তীরবর্তী বর্ধমান ও হুগলী জেলা।[৬]

ডঃ শমিতা সেন তাঁর গ্রন্থে দেখাচ্ছেন বড় বড় শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সংখ্যা খুবই কম।[৭] তিনি ১৮৯০-১৯৪০ এই সময়টির উপর আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে নদীয়ার বস্ত্র শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণের ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বলা যায় মহিলারা এগিয়ে না আসলে হয়ত এই শিল্প শেষ হয়ে যেত। কারণ সুতার

নলী পাকানো থেকে ড্রামিং পর্যন্ত সমস্ত রকম কাজই করছে মহিলারা। তবে ডঃ সেন প্রণীত সময়কালে নদীয়ার তাঁত শিল্পেও মজুরী প্রাপ্ত মহিলা শ্রমিক প্রায় ছিল না বললেই চলে। কারণ বস্ত্র শিল্প মূলত এখানে কুটির শিল্প। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বা নিচ্ছে ঘরের মেয়েরা। তবে বর্তমানে মহিলারা জীবিকা হিসাবে এই কাজকে বেছে নিচ্ছে। যেহেতু শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় জীবিকা হিসাবে বস্ত্র শিল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাই পরিবারে উন্নতির জন্য বাড়ির মেয়েরা তাদের গৃহস্থালীর সকল কাজ করে পুরুষের প্রধান সহযোগী হিসাবে তাদের অবসর সময় অতিবাহিত করছে তাঁতের কাজ করে। বাড়ির গৃহবধূরা এক একদিন আটঘণ্টা কাজ করে এক একটি মাঠা কাপড় বুনছেন। এছাড়াও তারা জ্যাকার্ড পাড় কাপড় বোনার জন্য পুরুষদের সকল রকম সাহায্য করছে। আবার অনেক মহিলা তাদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য বা নিজের স্বনির্ভরতার জন্য বাইরে সমবায়ে যুক্ত হচ্ছে। আবার ব্যক্তিগতভাবে কোন মহাজনের আড়ৎ-এ কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। এককথায় শান্তিপুর বা ফুলিয়ায় বস্ত্র শিল্পে অংশ গ্রহণকারী মহিলারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বনির্ভর।

এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক দিক অর্থাৎ মজুরীর দিকটি চলে অসে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমানে শান্তিপুর ও ফুলিয়া শ্রমিক ইতিহাসে কিছুটা ভিন্নধর্মী চরিত্র স্থাপন করতে পেরেছে। গৃহে কাজ করার ফলে মহিলারা যে আলাদাভাবে কোন মজুরী পায় না— ডঃ সেন এই সামগ্রিকতার উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। নদীয়ার তাঁত শিল্পেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে বলা যায় এভাবে শ্রমিক হিসাবে যৌথভাবে পুরুষ ও মহিলা গৃহে কাজ করছে। কেউই আলাদাভাবে মজুরী পায় না। ডঃ নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের মজুরীগত বিভেদের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন।[৮] এক্ষেত্রে মহিলাদের শারীরিক দুর্বলতা ও দক্ষতা কম থাকায় বিষয়টি একটু অন্যভাবে প্রাধান্য পায়। কারণ শান্তিপুর ফুলিয়ায় শাড়ি বা কাপড় পিছু মজুরী। তাছাড়া ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মজুরীর বিভেদের জন্য গ্রাম বাংলার মেয়েদের অশিক্ষার বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন— শান্তিপুর বা ফুলিয়ায় পুঁথিগত শিক্ষা সেভাবে মজুরীর উপর প্রভাব ফেলেনি। কারণ এই শিল্প পূর্ব থেকেই ছিল কুটির শিল্প, বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা যৌথভাবে কাজ করায় মজুরী বা পৃথক মজুরীর প্রশ্ন এখানে ছিল না। তবে বর্তমানে শান্তিপুর বা বিশেষত ফুলিয়ায় মহিলাদের কার্যগত দক্ষতা তেমন ভাবে পিছিয়ে না থাকায় মজুরীগত বিভেদ এখানে দেখা যায় না। ডঃ ব্যানার্জী ১৯৮১-এর রিপোর্ট উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন গ্রাম বাংলায় ২৮% মেয়ে অবিবাহিত। এক্ষেত্রে বিবাহিত জীবন ও সংসারের দায়িত্ব মহিলাদের পিছিয়ে দিচ্ছে। শান্তিপুর বা ফুলিয়ায়

আজও বিবাহিত শ্রমিকের তুলনায় মজুরী প্রাপ্ত অবিবাহিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হলেও একথা অনস্বীকার্য যে এখানে অবিবাহিত শ্রমিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁত বুনছে বিবাহিতা মহিলারা। বিবাহিতা মহিলাদের জীবনে বিনোদনই হল তাঁত বয়ন বা বয়নে সাহায্য করা। শান্তিপুরে বা ফুলিয়ায় মজুরী দিন পিছু, পুরুষ ও মহিলা পিছু নয়। এখানে একজন মহিলা শ্রমিক যদি পুরুষ শ্রমিকের সমান কাপড় বুনতে পারেন তবে তিনি পুরুষের সমান মজুরী পাবেন। যেমন— শান্তিপুরের অন্তর্গত কুটিরপাড়া সমবায় সমিতিতে পুরুষ ও মহিলা এমনকি স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে তাঁত বুনছেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই এই বিষয়টি বিবেচ্য যে মহিলাদের কর্মক্ষমতা পুরুষের থেকে কম হওয়ায় বা অবিরত সমভাবে চার হাত পা ব্যবহার করতে না পারায় মেয়েরা জ্যাকার্ড পাড় কাপড় পুরুষের তুলনায় কম বুনছেন। কিন্তু বুনলে তাঁরা সম মজুরীই পাবেন।

স্বাধীনতা উত্তর কালপর্বে মহিলা শ্রমিকদের এই শিল্পে অংশ গ্রহণের সংখ্যা যে ক্রমশ বাড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে অবশ্যই ফুলিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শান্তিপুর বিশেষত ফুলিয়ায় বর্তমানে বিদেশে রপ্তানী যোগ্য প্রধান দ্রব্য হল ছোট মাপের ওড়না। সেগুলি বিদেশে প্রধানতঃ ফ্যাশন দ্রব্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এই কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ নজরে কাড়ার মত। কেবল ওড়না তৈরী নয়, এর একটি বিশেষ দিকের— ওড়নার প্রান্তের সুতা পাকানো এবং বিনুনি গাঁথা — সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মহিলারা। এক্ষেত্রে ডঃ নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণ করে অবশ্যই বলতে হয় মহিলারা এমন কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে কায়িক পরিশ্রম কম এবং যেখানে পুরুষের অংশ গ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে।

এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে এর জন্য মহিলারা কোনভাবেই কম মজুরী পায় না। কারণ এখানে যে যত কাজ করবেন— পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে তিনি তত মজুরী পাবেন। এক বিনুনির ওড়নার ক্ষেত্রে একটি ওড়নার দুপ্রান্ত বুনলে একজন মহিলা পাচ্ছেন আড়াই টাকা। আর একাধিক বিনুনির দ্বারা ওড়নার দুই প্রান্ত শেষ করলে একজন মহিলা ওড়না পিছু পান ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা। একজন মহিলা যত দ্রুত যত ওড়না শেষ করবেন তিনি তত বেশী মজুরী পাবেন। ফলে একজন মহিলার সাধারণত এ কাজে মাসের লাভ ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা। মহিলা শ্রমিক সমবায়ে বসেও এই কাজ করতে পারেন। আবার অতিরিক্ত মজুরীর জন্য তিনি বাড়ি নিয়ে গিয়েও কাজ করতে পারেন।

এ ব্যাপারে আর একটি বিষয় নজরে পড়ার মত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর নানা প্রান্তে দেখা গিয়েছে ইউনিয়নের ভাগীদার বেশিরভাগ

ক্ষেত্রেই পুরুষেরা, মহিলারা নন। শান্তিপুর বা ফুলিয়ায় তেমন কোন ইউনিয়ন নেই। পুরুষ ইউনিয়নই যখন নেই তখন মহিলাদের আলাদাভাবে প্রাধান্য হ্রাসের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। এখানে ইউনিয়ন নেই অথচ বিশাল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা তাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত— এর কারণ এখানে মজুরীগত কোন পার্থক্য নেই। এবং শ্রেণী শোষণের চিহ্ন বর্তমানে তেমন ভাবে নেই। শ্রমিক যত কাজ করবে— তা পুরুষ বা মহিলা হোক তারা তত মজুরী পাবে। অর্থাৎ কাজ বেশী করলে শ্রমিকেরই লাভ, ফলে মজুরী বা অন্যান্য সুবিধার জন্য ইউনিয়ন করার দরকার হয় না। তবে কাপড় পিছু মজুরী বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে বলা যায় যে, মহাজন বা সমবায় সমিতি শ্রমিক শ্রেণী— পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে— যথেষ্ট যত্নবান।

মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে সমবায় সমিতিগুলির সহায়তার কথা স্বীকার করা উচিত।[৯] শান্তিপুর বা ফুলিয়ায় যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবাহিত ও পাঠরতা মহিলারা এ কাজে অংশগ্রহণ করেন তাই বাড়ির মত কাজের সময় নিয়ে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য সমিতির কাজ শুরু হয় দুপুর একটা থেকে। পুরুষরাও অবশ্য কাজ সেরে ঐ সময় এ কাজে যোগ দেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য নজরে পরে না।

পরিশেষে বলা যায়, ডঃ সেন ও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের গ্রন্থে শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার পুরুষদের তুলনায় কম, মহিলা শ্রমিকদের মজুরীগত সমস্যা, তাদের নানা রকম প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। নদীয়ার তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রেও একথাগুলি প্রযোজ্য তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এক্ষেত্রে মজুরী বা অন্যান্য সুবিধা দানের ব্যাপারে পুরুষ মহিলা বিভাজন দেখা যায় না বললেই চলে। তাছাড়া বর্তমানে কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কেবল নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মহিলারা নন, উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলারা কেবল অর্থ নয়, স্বনির্ভরতার জন্য একাজে এগিয়ে আসছে। অর্থাৎ উচ্চ ঘরের মহিলাদের মহিলা শ্রমিক হিসাবে (Wage Labour) কাজ করার যে সংকীর্ণতা ছিল তা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। এটি নারী সচেতনতার একটি বিশেষ নিদর্শন বলা যায়।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) শান্তিপুর ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঃ ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

২) পশ্চিমবঙ্গ ঃ নদীয়া জেলা সংখ্যা ১৪০৪

৩) শান্তিপুর পরিচয় ঃ প্রথম খণ্ড ঃ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, সম্পাদনা ঃ শান্তিপুর লোক সংস্কৃতি পরিষদ।

৪) শান্তিপুরের লোক সংস্কৃতি পরিচয় ঃ ডঃ অশোক কুমার দত্ত।

৫) পশ্চিমবঙ্গ ঃ নদীয়া জেলা সংখ্যা ১৪০৪।

৬) Samita Sen : Women and Labour in Late Colonial India : The Bengal Jute Industry. Cambridge Studies in Indian History & Society.

৭) Nirmala Banerjee : Indian Women in a Changing Industrial Scenario/ edited by Nirmala Banerje, New Delhi- Sage-1991.

৮) সাক্ষাৎকার ঃ

১। শান্তিপুর কুটিরপাড়া সমবায় সমিতি, স্থাপিত ১৯৪৪ এর ১৬ ডিসেম্বর 'Shantipur Kutirpara Weavours Cooperative Society Limited'.

২। Tangail Fulia Shari Bayan Silpa Samabay Samity Ltd. 373, dated 14.05.1977

৩। Nutan Fulia Tantubay Samabay Samity Ltd., 254 dated 17.03.1976

৪। অনন্ত কুমার ঘোষ — শান্তিপুর, লক্ষ্মীতলা পাড়া

৫। প্রফেসর ব্রজ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় — শান্তিপুর, কাশ্যপ পাড়া

৬। হরিপদ বসাক — ফুলিয়া (বিখ্যাত তাঁতী এবং মহাজন)।

# মৌখিক ঐতিহ্যের খুঁটিনাটি ও উপস্থাপনা
# স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনার প্রধানতম উপাদান

**অঙ্কুর রায়**

ইতিহাস চর্চায় জাতির বা অঞ্চলের ইতিহাস চর্চা করা হয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ধারাও বর্তমানে বেগবান। কিন্তু কোন জনগোষ্ঠীর একটি শাখা বা কোন ভৌগোলিকক্ষেত্রে বসবাসকারী জনগণের ইতিহাস রচনার ধারাটি তত পুষ্ট নয়। মূলধারার বৃহৎ ইতিহাসচর্চার পাশে এই ধরনের ইতিহাস অনুসন্ধান প্রান্তিক তথা অপাংক্তেয় বিবেচিত হলেও, ইতিহাসের সামগ্রিক পাঠ নিতে গেলে প্রতিটি জনপদের তথা প্রতিটি জনপদের অভ্যন্তরস্থ প্রতিটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর নিজস্ব ইতিহাস আলোচনা করতে হবে।

প্রচলিত ইতিহাস চর্চা হল একটা পিরামিডের মত। যার একেবারে তলার ধাপে থাকে প্রান্তিক মানুষ এবং স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলি। মূলধারার ইতিহাসে স্থান পায় কেন্দ্রীয় চরিত্ররা এবং বৃহৎ ঘটনাগুলি আর স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলি থেকে যায় অনালোচিত। কিন্তু এদের ইতিহাস— এদের জীবন, জীবনের পরিবর্তন বৃহৎ ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত নানান সামাজিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় টানাপোড়েন থেকে যায় আলোকবৃত্তের বাইরে। আবার মুলধারায় আলোচ্যগুলির সংঘঠনে বা অনুঘটকরূপে এদের ভূমিকাও থাকে অন্ধকারে। কিন্তু ইতিহাসের পাঠ যদি তৈরী হয় পিরামিডের তলার দিক থেকে তবে একদিকে যেমন কোন সময়ের সামগ্রিক ইতিহাস পাওয়া যাবে তেমনি অন্যদিকে স্বতন্ত্র গৌষ্ঠীগুলিরও আত্মদর্শনের ফলে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উজ্জীবন হবে।

কোন সঙ্ঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীতে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত গল্প, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গান হল ঐ জনগোষ্ঠীর মৌখিক ঐতিহ্য। এই মৌখিক ঐতিহ্যের স্রষ্টার নাম বা সৃষ্টিকাল জানা যায় না। এই মৌখিক ঐতিহ্যে প্রতিফলিত হয় সমাজমনটি। কারণ কথকের সমসময় ও অভিজ্ঞতা মৌখিক ঐতিহ্যে ছাপ ফেলে যায় সংযোজন ও বিয়োজন পদ্ধতিতে। ফলে মৌখিক ঐতিহ্যে আদিমতম সময় ও সমসময় পাশাপাশি স্থান করে নেয়। এই মৌখিক ঐতিহ্যের উপাদান ও উদ্দেশ্যে— লোকজীবনের বিশ্বজনীনতা এবং উপস্থাপনা ও খুঁটিনাটিতে— জনগোষ্ঠীর নিজস্বতা চিত্রিত হয়।

মৌখিক ঐতিহ্য, লোকবিশ্বাস ও লোকাচার হল কোন অঞ্চলের বা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উপাদান বা উপাদানের ছায়া, যা সুনির্দিষ্ট উপাদান অবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মুখ্যত আদিবাসীদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এবং কোন ক্ষুদ্র প্রাচীন জনপদ বা জনপদস্থ কোন বর্ণ বা শ্রেণীর ইতিহাস রচনায় এগুলিই মুখ্য উপাদান। আফ্রিকা বা অন্য যে কোন দেশের আদিবাসী সমাজ যারা আজও বাস করে আধুনিক পৃথিবী হতে আলোকবর্ষ দূরে তাদের ক্ষেত্রে এই মৌখিক ঐতিহ্য শুধু ইতিহাসের উপাদান নয়, বরং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, যার সামাজিক মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে। শুধু আদিবাসী সমাজই কেন ভারতের মত ঐতিহ্যমগ্ন দেশ যেখানে পরম্পরা ও আধুনিকতার অবস্থান প্রতীপে, সেখানে সুপ্রাচীন প্রবাদ, ছড়া, ব্রতকথাগুলি আজও উচ্চারিত হয় সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে সমান তাৎপর্য নিয়ে।

যেখানে মৌখিক ঐতিহ্য প্রাথমিক উপাদান আর যেখানে মুখ্য উপাদান দুটি ক্ষেত্রেই এর ভূমিকা বৃহৎ ইতিহাস নির্মাণের উপকরণ হিসাবে। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রতিটি গোষ্ঠীরই নিজস্ব আকর্ষণীয় ইতিহাস আছে। এবং তা আবিষ্কারের চাবিকাঠিও এই মৌখিক ঐতিহ্য।

কোন আদিবাসী. উপজাতি, জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী যারা কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে যারা ভাষাগত, পেশাগত বা সংস্কৃতিগতভাবে আবদ্ধ এবং যারা মূল গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশীদার হয়েও ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক বা পরিবেশগত কারণে জীবনচর্যায়, আচারে, ধর্মীয় রীতিতে, উৎসবে, শৈল্পিক প্রকাশে, ভাষা ব্যবহারে, বা সামাজিকতায় স্বতন্ত্র— তাদেরই বলা হচ্ছে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী।

এই সংজ্ঞাটি কিছুটা শিথিল করলে একই পেশায় নিযুক্ত মানুষের গোষ্ঠী, যারা এসেছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষার বলয় থেকে কিন্তু পেশাসুত্রে একই ভৌগোলিক স্থানে যাদের দীর্ঘ বসবাস, তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আর অর্থের পরিসর কিঞ্চিৎ প্রসারিত করলে গ্রামগুলিকে বিশেষত গ্রামের বর্ণভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক বা পেশাভিত্তিক যে পাড়াগুলি আছে, যেমন— বামুনপাড়া, বাগদিপাড়া, তাঁতিপাড়া ডোমপাড়া ইত্যাদি, এগুলোর অধিবাসীদেরও আওতাধীন করা যায়।

এই রকম একটি গোষ্ঠী কোন অঞ্চলে কবে বসতি স্থাপন করেছে, তার জীবন কি কি সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, কোন্ সময় ও কেন তার উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখাগুলির সঙ্গে এই গোষ্ঠীটির বর্তমান সম্পর্ক গড়ে উঠার ইতিহাস— ইত্যাদি কিছুরই সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। এই জনগোষ্ঠীটি যে বৃহত্তর জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায় অন্তর্গত তার

অন্যান্য শাখাগুলির সঙ্গে এই গোষ্ঠীটির সামাজিক অভিজ্ঞতার অনেক পার্থক্য থাকতেই পারে, এবং থাকেও— যে অভিজ্ঞতা কিনা গোষ্ঠীটির নিজস্ব। এর ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে থাকে সেই গোষ্ঠীটির নানান সামাজিক অভিব্যক্তিতে— ধর্মাচারণে, প্রথায়, বিশ্বাসে, শৈল্পিক প্রকাশে, মৌখিক ঐতিহ্যে।

এর মধ্যে মৌখিক ঐতিহ্যেই সর্বোচ্চ পরিমাণে ও সুস্পষ্টতমভাবে ইতিহাসের বিশেষত সামাজিক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। ধর্মাচারণ, প্রথা, বিশ্বাসে একদিকে ধরা পড়ে লোকসংস্কৃতির বিশ্বজনীনতা, অন্যদিকে ঐ জনগোষ্ঠীটি যে বৃহত্তর গোষ্ঠীর অংশ তার সাথে সাযুজ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র গোষ্ঠীটির নিজস্ব ইতিহাস রচনার উপাদান মেলে অল্পই। কিন্তু মৌখিক ঐতিহ্য পুরুষানুক্রমে সেটাই লালন করে যার সাথে সেই গোষ্ঠীটির মানুষ একাত্মতা অনুভব করে। আবার চলমান জীবন তার নতুন অভিজ্ঞতা, সময়ের বিবর্তনসহ ছাপ ফেলে যায় মৌখিক ঐতিহ্যে।

মৌখিক ঐতিহ্যের কোন রূপের একটি উদাহরণের মধ্যে ইতিহাস সামগ্রিকভাবে বিধৃত থাকতে পারে। অথবা ইতিহাস তার ছায়া ফেলতে পারে, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্রের ঐতিহাসিকতা বিলুপ্ত হয়ে থেকে যায় ইতিহাসের অণুরণন।

প্রথমে দেখা যাক ইতিহাস কেমন তার ঐতিহাসিকতা নিয়ে মৌখিক ঐতিহ্যে বিধৃত থাকে তার উদাহরণ।

মধ্যভারতের মান্ডালা জেলার ধোবা আদিবাসীদের একটি লোকপুরাণে তারা সামাজিক বিবর্তনের পথে যে স্তরগুলি পার হয়ে এসেছে তার নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে : 'আগে আগুন ছিল না, হঠাৎ প্রচণ্ড খরায় দাবানল জ্বলে উঠলো। মানুষ দাবানলে দগ্ধ পশুর মাংসের স্বাদ পেল। কাঁচা আর খেতে চাইল না। মানুষ তখনও আগুন জ্বালাতে শেখেনি, আগুন তাই জ্বালিয়েই রাখতো। সুর্যের তাপে পায়ের কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া দেখে পাত্র তৈরী করে রোদে পোড়ান শিখলো। সেই পাত্রে মাংস সেদ্ধ করতে যাওয়াতে পাত্রটা আগুনের তাপে ফেটে গেল। তখন পাত্র শক্ত করার জন্য আগুনে পোড়ানো শিখলো।'[১] শুনলে মনে হয় যেন কোন নৃবিজ্ঞানী গল্পের মাধ্যমে সভ্যতার বিবর্তনের কথা বলছেন। এখানে গোষ্ঠীটি নিজস্ব প্রাযুক্তিক বিবর্তন ধরে রেখেছে মৌখিক ঐতিহ্যে।

একটি দীর্ঘ মৌখিক ছড়ায় বাংলার বারমাস্যা পার্বণগুলির কথা বলা হয়েছে। আশ্বিনে অম্বিকাপুজায় পাঁঠাবলি দিয়ে উৎসব শুরু, কার্তিকে কালিকা পুজা, অগ্রাণে নবান্ন, চৈত্রে চড়ক ইত্যাদি হয়ে শেষ হচ্ছে 'ভাদ্র মাসে পচা পান্তা খান মনমা বুড়ি'। যে গোষ্ঠীটি থেকে এই ছড়াটি সংগৃহীত হয়েছে নিঃসন্দেহেই তারা বছরের বারমাসে এই পরবগুলি

সাড়ম্বরে পালন করত। এই ছড়াটি তাদের সামাজিক ধর্মীয় জীবনের দলিল।

মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে কখনও কখনও ইতিহাস ছায়া ফেলে যায়— যার ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণ্য হলেও ইতিহাস সন্দেহাতীত।

হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকার প্রতিটি গ্রামের আছে নিজস্ব দেবতা। প্রতিটা গ্রামে সেই গ্রাম দেবতার স্থান সর্বোচ্চ। কিন্তু বছরে একবার-দশেরার সময় সব দেবতা কুলুর ঢোলপুর ময়দানে রঘুনাথজিকে সম্মান জানাতে আসেন। কুলু উপত্যকার মালানা গ্রাম হল বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক গ্রাম। এই মালানা গ্রামের আরাধ্য দেবতা জমলু কিন্তু আসেন না। উপত্যকার অন্যান্য গ্রামগুলির সঙ্গে মালানার অধিবাসীরাও এক অদ্ভুত দুরত্ব বজায় রেখে চলেন। লোককথা অনুযায়ী ঃ 'জমলু দেবতা একবার সমস্ত দেবতাদের বাক্সবন্দী করে চন্দ্রখানি গিরিপথের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। আচমকা দমকা বাতাসে বাক্সের ঢাকনা খুলে যায়। ফলে বন্দী দেবতারা মুক্ত হয়ে উপত্যকার কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েন।'[২] এই লোককথাটির মধ্যেই নিহিত আছে জমলু দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মালানাবাসীর অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে দুরত্ব বজায় রাখার কারণ। লোককথাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কোন একসময় মালানার সঙ্গে অন্যান্য গ্রামের যুদ্ধ হয় এবং বিজয়ী মালানাবাসী অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীদের বন্দী করে। পরে কোন অসম্মানজনক শর্তে মুক্তি দেয় বা বন্দীরা পালিয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় মালানার দেবতা জমলুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৃষ্টি হয় মালানাবাসীর বিজয়ীসুলভ দুরত্ব রাখার প্রবণতা। পরবর্তী কালে এই যুদ্ধের কথা তারা ভুলে যায় কিন্তু মনে থেকে যায় তাদের বিজয়ীসুলভ অহঙ্কার। যা ছাপ ফেলেছে এই লোককথায়।

আগেই বলা হয়েছে ঐতিহাসিকতা প্রামাণ্য না হলেও ইতিহাসের অমোঘ সুনিশ্চিত শিলমোহর থেকে যায় মৌখিক ঐতিহ্যে ধরা পড়া ছায়ায়। বাংলার একটি লৌকিক ছড়ায় বলা হয়েছে ঃ

'চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে
জোনাক জ্বালে বাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফার্সি পড়ে তাঁতি।'[৩]

সুলতানি আমলে সরকারি ভাষা হওয়ায় ব্যাপকভাবে ফার্সি চর্চা শুরু হয়। যে গোষ্ঠীতে এই ছড়াটি সৃষ্টি হয়েছে সেটিও এর ব্যতিক্রম নয় এমনকি হতেই পারে যে সেখানকার তাঁতি সম্প্রদায় সোৎসাহে ফার্সি চর্চা শুরু করেছিল।

আবার 'ইকির মিকির চামচিকির' এই খেলার ছড়ায় ভবানন্দ সমাদ্দারের প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে দেশদ্রোহী সাহায্যের ইতিহাস ধরা পড়েছে গভীর ঘৃণায়।[৪]

যেখানে সে অর্থে ইতিহাসের ছায়া পড়েনি, সেখানে ছায়া পড়েছে প্রাত্যহিকতার—প্রাত্যহিক জীবন, আচার, বিশ্বাস। যেগুলি অতীতকে জানার অসাধারণ উপকরণ। বাঙালির সংসারের অন্দরমহল সবচেয়ে বেশী ছায়া ফেলেছে মুখে মুখে তৈরী ছড়ায় ও প্রবাদে। তাৎক্ষণিকতায় এগুলির সৃষ্টি এবং বক্তব্যে স্থায়িত্ব। একটি সুন্দর ছেলে ভুলানো ছড়ায় আছে :

'তারা করেন ঝিকিমিকি
চাঁদ করেন আলো
যে ঘরেতে পুত্র নেই
তার ঘর কালো।'[৫]

ছড়াটির স্রষ্টা সমাজের গৃহকোণে পুত্র সন্তানের মূল্য কন্যা সন্তানের চেয়ে বেশী। আবার এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে যেখানে শেষ সন্তান হিসাবে কন্যা চাওয়া হয়েছে। সংসারে কনিষ্ঠতম সন্তান কন্যা হওয়া শুভঙ্কর আর পুত্র হওয়া অমঙ্গলজনক :

'শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে লাগে ভূত
শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে শিকে বেয়ে।'[৬]

নিশ্চিতভাবেই এটি অন্য স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর।

বহু বর্ণের নারীকেন্দ্রিক, নারীকে উদ্দেশ্য করে রচিত অসংখ্য প্রবাদে ধরা পড়েছে সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্যই তা একমাত্রিক নয়। একই উপাদান দিয়ে তৈরী প্রবাদে অঞ্চল ভেদে বা অবস্থাভেদে বা অভিজ্ঞতাভেদে বিপরীত বক্তব্যও পাওয়া যায়। এই সমস্ত ছড়া প্রবাদে যে সমাজমনটি প্রতিফলিত হয় সেটিই তৎকালীন সময়ের ছায়া যা আজকে সেই সময়টিকে বুঝতে সাহায্য করে।

যেমন বাঙালি পরিবারে শাশুড়ি বৌয়ের সম্পর্কে একটা চিরকালীন শত্রুতা আছে। সাধারণতঃ শাশুড়িই অধিক শক্তিশালী, বৌকে জব্দ করতেও দড় ঃ

'বড় ঘড়াটি ভেঙেছ ছোট ঘরাটি আছে
নাচ আর কোঁদ আমার হাতে আটকল আছে।'[৭]

যাই হোক না কেন শাশুড়ির মাপ জানা আছে, বউ একই পরিমাণ ভাতই পাবে তার বেশী এতটুকুও নয়। আবার এরই উল্টো চিত্র ঃ

কলির কথা কইগো দিদি কলির কথা কই
গিন্নির পাতে টক আমানি বউয়ের পাতে দই।[৮]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পিতৃ পরিবারের সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার নিয়ে প্রবাদ প্রচলিত। সেদিন এক আধুনিকা যখন তার নিজস্ব অবস্থান থেকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই প্রবাদটা গভীর নিশ্চয়তায় উচ্চারণ করলো ঃ

'বাবার থাকলে রাজার ঝি
দাদার থাকলে বোনের কি?'[৯]

তখন বোঝা গেল মৌখিক ঐতিহ্যে চিত্রায়িত সময় ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানও বটে। অর্থাৎ বর্তমানের মৌখিক উপকরণ দিয়েই অতীত নির্মাণ সম্ভব।

অনেক সময় মৌখিক ঐতিহ্যের কোন রূপ যেখানে কোন প্রাচীন ঘটনা বা চলমান সময় ধরা নেই বা তার ছায়াও পড়েনি সেরকম কোন ছড়া, প্রবাদও হয়ে উঠতে পারে ইতিহাস নির্মাণের হাতিয়ার। কি ভাবে? কোন একটি ছড়া বা প্রবাদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র অংশ যাকে খুঁটিনাটি বলা যায় সেটিই হতে পারে ইতিহাস নির্মাণের উপকরণ। সামগ্রিক উচ্চারণ বা পাঠে যা খুঁটিনাটি বলে থেকে যায় নজরের বাইরে তাকেই মূল লক্ষ্য করলে তার থেকে পাওয়া যায় সামাজিক জীবন, দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ইত্যাদি।

ছেলেবেলায় একটা প্রবাদ শুনেছিলাম : "তুই কথা চাষাভুষা, তুমি কথা ভালবাসা।"[১০] এটি একটি শিক্ষামূলক প্রবাদ। "তুমি" করে কথা বলার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি এবার "চাষাভুষা" শব্দটিকে তুলে আনি আর বিচার করি "তুই" করে কথা চাষাভুষারা বলে, তাহলে শ্রমজীবি মানুষের প্রতি বক্তা যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। বলে রাখা যাক বক্তা পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিক্রমপুরের উচ্চবংশীয় মহিলা।

ভিতরে যা আছে সেই ভাবই বেরিয়ে আসে কথায় ও আচরণে। এমনই বলা হয়েছে এই প্রবাদে ঃ "যার মনে যা, ফাল দিয়ে উঠে তা।"[১১] এই প্রবাদটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্গে পড়বে। কিন্তু যখন "ফাল" শব্দটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে তখন একথা, অনুমান করা নিশ্চয় ভুল হবে না যে প্রবাদটি যখন সৃষ্টি হয় তখন স্রষ্টা গোষ্ঠীটির জীবিকা ছিল কৃষি। জানানো যাক বক্তা কিন্তু আদ্যন্ত শহুরে।

এবার মৌখিক ঐতিহ্যের একটি উদাহরণের একাধিক পাঠ নিয়ে আলোচনা করা যাক। মৌখিক ঐতিহ্যের জনপ্রিয়তার কারণে এর প্রসারের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা

যায়। আবার লোকমানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক হওয়ার কারণে স্বাধীনভাবেই সমজাতীয় মৌখিক ঐতিহ্য বিভিন্ন স্থানে তৈরী হয়। ফলে দেখা যায় এক অঞ্চলে প্রচলিত গল্প, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদের অঞ্চলভেদে মূল কঠামোটি অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু সংযোজিত হয়েছে কোন চরিত্র বা উপাদান অথবা বিয়োজিত হয়েছে কোন চরিত্র বা উপাদান। মূল কাঠামোটির সামান্য পরিবর্তনও হতে পারে। মূল কাঠামোটি বিশ্লেষণে যেমন মেলে ইতিহাসের উপাদান তেমনি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলি হতে সংগৃহীত প্রতিটা পাঠের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে মেলে ঐ গোষ্ঠীটির নিজস্ব ইতিহাসের উপাদান।

খুঁটিনাটির পার্থক্যে যে সূচিত হয় দুটি অঞ্চলের বা দুটি গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার পার্থক্য তা ধরা পড়ে বাংলায় বহুল প্রচলিত একটি ছেলেভুলানো ছড়ায় ঃ—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
পান নেই সুপারি নেই খাজনার উপায় কি
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।"[১২]

পাঠান্তর ঃ

"মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গোরকী আইল দেশে
গুলগুলিয়ে ধান খাইছে খাজনা দিব কিসে।[১৩]

ছড়ার প্রথম পাঠটি সংগৃহীত হয়েছে বাঁকুড়া থেকে। প্রধানত বঙ্গদেশের পশ্চিমভাগই বর্গী আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। রাজকোষের ঘাটতি মেটাতে আলিবর্দি খাঁ খাজনা বাড়িয়ে দেন। এই দ্বিমুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত জনগণের দুশ্চিন্তা ছড়ার প্রথম পাঠটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। অপরদিকে দ্বিতীয় পাঠটি সংগৃহীত হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে, যেখানে বর্গী আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। প্রথম পাঠের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই দ্বিতীয় পাঠে ছন্দ রাখতে "গোরকী"-র (সামুদ্রিক ঝড়) কথা এসেছে। অর্থাৎ খুঁটিনাটি বিশ্লেষণেই বেঝায় যায় কোন জনগোষ্ঠীটি কি পথ পার হয়ে এসেছে।

প্রতিটি স্বতন্ত্র পাঠে চিত্রিত হয় স্বতন্ত্রগোষ্ঠীগুলির নিজস্ব ভূগোল— যা বাহ্যিক পরিবেশ হিসাবে স্বতন্ত্র ইতিহাস গঠনে ভূমিকা নেয়। বোধহয় বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে ভুল্লানো ছড়া হল ঃ

"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর।।" ইত্যাদি।[১৪]

আর এরই সমতুল্য একটি ছড়ায় আছে :

"সদাগরের মামাবাড়ী
কাঁসাই নদীর তীরে।" ইত্যাদি[১৫]

দুটি ছড়ার সম্পূর্ণ পাঠেই দেখা যায় বসার জন্য পিঁড়ে দেওয়া হয় এবং জলপানে শালিধানের চিঁড়ে না বিন্নিধানের খই এবং "মোটামোটা সব্‌রি কলা, কাগ্‌মারে দই" দেওয়া হয়। দুটি ছড়ার ছন্দও এক। পার্থক্য হল শিব সদাগর গেছেন শ্বশুরবাড়ী আর সদাগর গেছেন মামাবাড়ী। অতি পরিচিত প্রথম ছড়াটি প্রচলিত গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলে। আর যারা মামাবাড়ী নিয়ে ছড়া বেঁধেছেন বেশ বোঝা যায় তাদের দেশগাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাঁসাই নদী।

বাংলা ছড়া প্রবাদের অধিকাংশ সংকলন গ্রন্থেই সেগুলি কোন অঞ্চলে এবং বিশেষত কাদের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার উল্লেখ থাকে না। তাই সংকলন গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে কোন একটি অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর ইতিহাস রচনা করা যায় না।

তাই মৌখিক ঐতিহ্যকে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে নিঁখুত ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই এটি জনগোষ্ঠীর মুখ হতে সরাসরি সংগ্রহ করতে হবে এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে নমুনাটির উপস্থাপনের উপর।

নমুনাটিকে জনগোষ্ঠীর মুখ হতে সরাসরি সংগ্রহ না করলে বোঝা যাবে না নমুনাটি প্রক্ষিপ্ত বা প্রভাবিত নাকি তার মূল জনগোষ্ঠীর জীবনের গভীরে প্রোথিত। আর উপস্থাপনেব উপর নির্ভর করে মৌখিক ঐতিহ্যের কোন একটি ধারাকে বা নমুনাকে কোন জনগোষ্ঠী কতটা গুরুত্ব দেয়। অন্যভাবে বললে উপস্থাপনেই প্রতিফলিত হয় বক্তব্যর প্রতি জনগোষ্ঠীর মানসিকতা।

উপস্থাপন প্রক্রিয়াটি সংগঠিত হয় কয়েকটি উপাদান নিয়ে— উপস্থাপক ও তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য শ্রোতা, উপস্থাপনের সময় এবং অবশ্যই উপস্থাপন ভঙ্গিমা। এই প্রতিটা উপাদান বিশ্লেষণ করেই বোঝা যায় জনগোষ্ঠীটি উপস্থাপন প্রক্রিয়াটিকে তথা মৌখিক ঐতিহ্যের কোন ধারা বা একটি উপাদানকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তাদের জীবন ইতিহাসের কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই ধারায় বা নমুনায় প্রকাশ পাচ্ছে।

উপস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয় উপস্থাপককে দিয়ে। উপস্থাপকের পরিচয়, তার সামাজিক অবস্থান, তার পেশা, উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক, কেন সে উপস্থাপন করছে— ইত্যাদির উপর উপস্থাপন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব নির্ভর করে। একটা তুলনামূলক

আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা দেখা যাক— আমাদের বাংলায় সাধারণত লোককথা বলেন প্রবীণা ঠাকুমা দিদিমারা। তারা বহুদর্শী, অভিজ্ঞ; কিন্তু জীবনযুদ্ধে তারা বর্তমানে আর সংগ্রামরত নন। তাদের গল্পে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষাও হয়, কিন্তু তাদের মুল উদ্দেশ্য হল শিশুদের মনোরঞ্জন। আবার উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে লোককথা বলা হয় জমিতে "হাউলি" দেবার সময়।[১৬] বলেন কর্মরত এক কৃষকই, তার উদ্দেশ্যও মনোরঞ্জন করে কাজের চাপ লাঘব করা। কিন্তু উপস্থাপক এখানে স্বয়ং জীবনযুদ্ধের সেনা বলে তার উপস্থাপণে সম্পূর্ণ মনোরঞ্জনের পাশাপাশিই থাকবে জীবনের ছাপ। আবার মেঘালয়ের জয়ন্তীয়া পাহাড়ে বসবাসকারিদের মধ্যে দেখা যায় কিছু কিছু লোককথা বলার অধিকার শুধু একজনের, যাকে বলা হয় "পারোম"।[১৭] অর্থাৎ ঐ জনগোষ্ঠীর কাছে কথাটির অত্যাধিক গুরুত্ব আছে। এই কথার নিহিত উপাদানের গুরুত্ব ঐ গোষ্ঠীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনন্য।

উপস্থাপকের পরই আসে লক্ষ্য শ্রোতা। শ্রোতার বয়স, সামাজিক অবস্থান, উপস্থাপকের সঙ্গে তার নৈকট্য বা দুরত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে উপস্থাপিত বিষয়ে জীবন কতটা প্রতিফলিত হবে।

পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া বিষয়ের অর্থ সম্পূর্ণতা পায় না। উপস্থাপনের সময় ও কারণ হল সেই পরিপ্রেক্ষিত। কোন সময়ে, কোন অনুষ্ঠানে, মৌখিক ঐতিহ্যের একটি ধারা বা একটি নমুনাকে উপস্থাপন করা হয় তার মধ্যে নিহিত থাকে বিষয়টির গুঢ়ার্থ। যেমন আমাদের বাংলায় যে অসংখ্য ব্রতকথা, পাঁচালি, ছড়া বিশেষ বিশেষ পুজায়, অনুষ্ঠানে বলা হয় সেগুলি ঐ সময়ের প্রেক্ষিতেই সম্পূর্ণার্থ পায়।

পরিপ্রেক্ষিতের পাশাপাশিই রাখতে হবে একটি বিশেষ সংস্কৃতি বা পরিবেশে কোন একটি উপস্থাপিত নমুনার নিহিতার্থকে। যেমন "আলোর নিচেই অন্ধকার"— এই প্রবাদটি ভারতের দক্ষিণ ও উত্তর দুপ্রান্তেই প্রচলিত "কন্নড়ে এর মানে অন্যান্য মানের সঙ্গে, যে দীপ্ত আলোর মত এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির স্বভাবে লুকানো থাকতে পারে পাপ।" কিন্তু কাশ্মীরে এর ব্যাখ্যা রাজনৈতিক। "তা হল, এক প্রজাবৎসল রাজার নিষ্ঠুর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী থাকতে পারে।"[১৮]

উপস্থাপনের যে উপাদানটির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন সেটি হল উপস্থাপন ভঙ্গিমা। যেহেতু কোন একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সামাজিক অভিজ্ঞতার দর্পণ হল মৌখিক ঐতিহ্য তা ঐ গোষ্ঠীর কথকের উপস্থাপন ভঙ্গিমাই বলে দেয় উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি গোষ্ঠীর মনোভাব। অর্থাৎ নির্ণিত হয় সঠিক মূল্য। ডঃ দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর লোকসমাজ ও পশুকথা গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে

তিনি বিহারের বেনিয়াডিতে এক বৃদ্ধ সাঁওতালের কাছে এক শেয়ালের একটা কুকুরকে ঠকানোর গল্প শুনেছিলেন। "গল্প বলবার সময় তাঁর চোখ ও মুখের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করি তা ভুলবার নয়। কুকুরের ক্ষুধা ও অপমান যেন তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ও ক্ষোভ দিয়ে প্রকাশ করছেন।" ঐ উপস্থাপন ভঙ্গিতেই নিহিত আছে ঐ সাঁওতাল কথক যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তাদের কাহিনীটির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা।

আবার অভিজ্ঞতার পার্থক্যে মৌখিক ঐতিহ্যের একই নমুনার উপস্থাপন রূপ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন শেয়ালের কুমীরছানা ভক্ষণ গল্পটি বাংলায় শেয়ালের ধূর্ততায় শেষ হয় আর আদিবাসী সমাজের উপস্থাপনে শিয়ালের ধ্বংসে শেষ হয় — অর্থাৎ কিনা অত্যাচারী প্রবঞ্চকের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের প্রতিরোধের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়।

এইভাবে মৌখিক ঐতিহ্যকে লোক মানুষের মুখ হতে সরাসরি সংগ্রহ করে তার খুঁটিনাটি ও উপস্থাপন বিশ্লেষণ করলে মূলধারার ইতিহাসের বিপ্রতীপে কোন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর জীবনের আকর্ষণীয় ইতিহাস সংগ্রহ করা যাবে।

এই প্রবন্ধটি প্রস্তুত করার সময় আমার ফোকলোরের Historical Reconstruction Theory-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না যদিও জ্যাকব গ্রিমের Teutonic Mythology এবং Finish Method সম্বন্ধে অল্প বিস্তর জানা ছিল। অবশ্য এই না জানা শাপে বরই হয়েছে। কারণ জানা থাকলে, "কে, কি, কেন" বলছেন এর ওপর জোর পড়ত আর জানা না থাকায়, 'কি ভাবে'-র উপর জোর দিয়েছি এবং দিতে গিয়ে অজান্তেই মার্কসবাদী পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি ইত্যাদি এবং খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের এক নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। সম্ভবত বাংলা ভাষায় 'কি ভাবে' নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয় নি। অন্যত্র হলেও এই প্রবন্ধ মৌলিক—কারণ শুধুমাত্র মৌখিক ঐতিহ্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর ইতিহাস রচনায়।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১। আদিবাসী লোককথা — দিব্যজ্যোতি মজুমদার
২। ভ্রমণ ট্রেকিং — সম্পাদক — অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
৩। চিরকালের ছড়া — সংকলন ও সম্পাদনা — সুনীল জানা
৪। বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস — ডঃ অসীম দাস
৫। চিরকালের ছড়া — সংকলন ও সম্পাদনা — সুনীল জানা

৬। প্রবাদের গল্প — বাসুদেব ঘোষ
৭। ঐ
৮। ঐ
৯। বক্তা — সৌমী চ্যাটার্জী
১০। নিজস্ব সংগ্রহ
১১। নিজস্ব সংগ্রহ
১২। বাংলার লোকসাহিত্য — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য — দ্বিতীয় খণ্ড
১৩। ঐ
১৪। লোক সাহিত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫। চিরকালের ছড়া — সুনীল জানা
১৬। রাজবংশী লোককথা — তপন রায় প্রধান
১৭। 'লোকসংস্কৃতি স্থান — কাল — পাত্র : পরিবেশ — প্রসঙ্গ বিচার' — সৌমেন সেন — লোকসংস্কৃতি গবেষণা — লোকসংস্কৃতি : পদ্ধতিবিদ্যা বিশেষ সংখ্যা
১৮। ভারতের লোককথা — ডঃ এ. কে. রামানুজন

# মধ্যভারতে ভূমিস্বত্বাধিকারীর পরিচয় বিভ্রাট

নন্দিতা ব্যানার্জী

১৮১৮ থেকে ১৮৬১-এর মধ্য ভারতের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কতকগুলি বিশেষ ধারা বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

সমসাময়িক ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যবহৃত উইগিশ ধারণাকে একবার বিজিত ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে ব্যবহার করার যথেচ্ছ সুযোগ পেয়ে তাৎক্ষনিক তার সদ্ব্যবহারের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। অতএব ভিক্টোরিয়ান যুগের উদারনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক প্রসূত ইংলিশ জেন্ট্রি ক্লাসের আদলে এক ভারতীয় জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়, যারা কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ধনী ও প্রভাবশালী।

এ বিষয়ে ব্রিটিশদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে বিধ্বস্ত ভারতীয় অর্থনীতিকে এক স্থিতিস্থাপক অবস্থায় পৌঁছোনোর জন্য ও ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিজেদের প্রতি আস্থাভাজন রাখার জন্য জমি থেকে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ চড়া হারে ধার্য করা এবং এই খাজনা আদায়ের দায় নতুন সৃষ্ট মালগুজার শ্রেণীর হাতে দেওয়া, যারা জমিতে যথেষ্ট মূলধন লগ্নী করে কৃষির উন্নতি ঘটাবে এবং এইভাবে জমি থেকে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায়ীকৃত হলে সহজেই দেশীয় সম্পদের বহির্গমন ও ঔপনিবেশিকতাবাদের মূল স্বার্থ চরিতার্থ করা সম্ভব হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ উদ্দেশ্য সফল হয় না। মালগুজার কখনোই ভারতে ইংল্যান্ডের জেন্ট্রির বিকল্প হয়ে ওঠে না। ১৮৬১-র ভূমি বন্দোবস্তে মালগুজারকে Absolute proprietorship বা জমিতে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হলেও সে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। অতএব জমির প্রকৃত মালিক কে সে সম্পর্কে অবচেতনে এক প্রশ্নচিহ্ন রয়েই যায়, যার প্রকৃত সমাধানের জন্য আরো দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রয়োজন হয়।

মূলত ১৮১৮ সালের পর থেকেই মধ্যভারতের কৃষি সমাজ সদ্য ব্রিটিশ অধিকৃত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলগুলিতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার গতিবিধি ও পরিবর্তন অনুভব করে। নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মধ্যপ্রদেশের প্রতিটি প্রদেশেরই পৃথক রাজনৈতিক পরিচিতি স্বীকৃত ছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ ব্রিটিশরা সিন্ধিয়া ও পেশোয়ার শাসনভুক্ত সাগর

ও দামো অঞ্চল জয় করে। ১৮১৮ খ্রীঃ আপ্পাসাহেবকে পরাজিত করে মন্দলা, বেতুল, সিওনি এবং নর্মদা অঞ্চল জয়যুক্ত হয়। ১৮১৮ থেকে একের পর এক নিমার প্রদেশ ভুক্ত এলাকা সিন্ধিয়ার হস্তচ্যুত হয়। ১৮১৮ য় কানপুর, বেরিয়া এবং কুসরাউদ পেশোয়ার কাছ থেকে লাভ করা হয়। ১৮১৯শে অসিরগড় দুর্গ জয় করা হয়, ১৮২৩শে সিন্ধিয়া আরো পাঁচটি পরগণা ব্রিটিশদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ১৮২৫শে সিন্ধিয়া ব্রিটিশ দাবী মেটাতে অপারগ হলে নিমারের বাকী অংশ ব্রিটিশ রাজত্বভুক্ত হয়। ১৮৪৪শে সিন্ধিয়ার মন্ত্রীমণ্ডলীর সাথে চুক্তির পর নিমার গোয়ালিয়র অঞ্চলের সমস্ত ব্যয়ভার ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৮৬০ খ্রীঃ জৈনাবাদ ও মন্‌জ্‌রোদ পরগণা হস্তান্তরিত হবার পরে নিমার প্রদেশ অধিকার সম্পূর্ণ হয়।

সিতাবল্ডিতে আপ্পাসাহেব পরাজিত হবার পরে ভোঁসলা রাজকুমার তৃতীয় রঘুজীর নাবালকত্বের অজুহাতে ১৮১৮ খ্রীঃ নাগপুর ও ছত্তিশগড় অঞ্চলটিতে ইংল্যান্ড থেকে স্যার রিচার্ড জেন্‌কিন্‌স রেসিডেন্ট হিসেবে এসে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। ১৮৩০ খ্রীঃ রঘুজী শাসন ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৪ এর আগে সম্পূর্ণ নাগপুর অঞ্চল ব্রিটিশ দখলীকৃত হয় না। ১৮৬১-র ২রা নভেম্বর ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল সমূহ একজন চীফ কমিশনারের অধীনে পুনর্গঠন করা হয়। গভঃ জেনারেল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ইলবার্টের মতে বিভিন্ন সময়ের বিজয়ীকৃত এবং নানারকম প্রাকৃতিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও (যেমন— হোসঙ্গাবাদ, জব্বলপুর এবং নরসিংহপুর গম উৎপাদনে, বেতুল আখ উৎপাদনে, ছত্তিশগড় ধান এবং ভান্ডারা, চান্দা, ওয়ার্ধা এবং নাগপুর কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তুলা উৎপাদনে বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও) এরা একটি জায়গায় এক ও অভিন্ন ছিল— এই প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো সময়ে মারাঠা শাসন প্রত্যক্ষ করেছে। "The Maratha harrow had passed over the whole of these territorties and had gone a long way towards reducing them, for revenue purposes, to one dead level of uniformity"[১]

১৮০৩ সালে দেওগাঁও এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ভোঁসলা রাজকুমার রঘুজী আদায়ীকৃত রাজস্বের অর্ধেক নিজাম ও ব্রিটিশদের দিতে বাধ্য হলে মারাঠা শাসন এই অঞ্চলগুলিতে কঠোরতর হয়। সমগ্র অবস্থাকে স্থিতিস্থাপক রাখার জন্য তৎকালীন মারাঠা কামাবিশদাররা (রাজস্ব সংগ্রাহক), প্যাটেল বা মালগুজারের (রাজস্ব প্রদায়ক) কাছ থেকে অল্প সময়ে যতটা সম্ভব অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ১৮১৮-র প্রদেশগুলি ইংরেজ অধিকৃত হলে এবং রিচার্ড জেন্‌কিন্‌স রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেও অবস্থার অবনতি বই উন্নতি হয় না, এর কারণ ব্রিটিশরা চলতি হারেই নতুন

করে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করে, যে অবস্থা সামান্য কিছু কিছু মারাঠা ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও বৃহদ্‌সংখ্যাক মালগুজার ও পত্তনদার প্যাটেল গোষ্ঠীর পক্ষে ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। ক্রমশ মালগুজারের দপ্তরে পরিবর্তন দেখা যায়, রাজস্ব হার এত বেশী পরিমাণে ধার্য করা হয় যে, এতদিন যাবৎ কৃষি ও তার উৎপাদনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত প্যাটেল গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পায়। এবং নতুন এক মহাজন গোষ্ঠী তাদের জায়গা নেয়। এরা মূলত সুবিধেবাদী ও তাৎক্ষনিক মোটা লাভের কথা ভেবে বিশাল এলাকার উপর রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে প্রভুত্ব স্থাপন করে ও চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া শুরু করে। এরা গ্রামোন্নয়নের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে, ফলস্বরূপ কৃষির চরম অবনতি ঘটে। কৃষিযোগ্য জমিগুলি পতিত জমিতে পরিণত হয় ও বহু গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ে। ঘটনার ভয়াবহতার ব্রিটিশ সরকার চমকিত হয় তখন, যখন তারা আর নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব লাভ করতে সমর্থ হয় না এবং বহু মালগুজার নিজেদের নিঃস্ব বলে প্রমাণ করে। এ সময়ে মালগুজারদের জমিতে সম্পূর্ণ মালিকানা দিয়েও অবস্থার উন্নতি হয় না। চতুর ব্রিটিশ শাসকেরা এবার অপেক্ষকৃত ধনী ও সমাজের উচ্চপদস্থ কৃষিজীবী শ্রেণীর অনুসন্ধান করে। এ বিষয়ে তাদের যুক্তি ছিল— এদের হাতে যে কোনো সময় জমিতে লগ্নি করার মত যথেষ্ট অর্থ মজুত থাকে, কাজেই একমাত্র এরাই চাইলে ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সার্বিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

১৮৩৪ খ্রীঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সরকার লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর R. M. Bird কে সাগর ও নর্মদা এলাকার উৎপাদন ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ চিন্তা ভাবনার পর বার্ডের মনে হয় আশানুরূপ পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা কখনোই সেই লোকেদের দিয়ে সম্ভব নয় যাদের নিজেদেরই জমিতে কোনো বিশেষ অধিকার স্বীকৃত নেই। "To prop up by temporary expedients a revenue confessedly excessive"[২] অতঃপর ১৮৩৩-এ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ রেগুলেশন অ্যাক্ট ৯ অনুসারে সরকার তার রাজস্ব দাবী কমিয়ে ৬৬ শতাংশে নিয়ে আসে এবং ১৯৩৫-এ সাগর ও নর্মদা প্রদেশ এলাকার মালগুজারের সাথে ২০ বছরের চুক্তিতে মালগুজারদের কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তার ফলে তাৎক্ষণিক জমিতে মালগুজারের অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু বার্ড রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় হলেও, মালগুজার শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত বহিরাগত অকৃষিজীবীদের প্রাধান্য ছিল তাদের সংযত রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। ফলস্বরূপ কৃষকদের দুর্দশার অবধি থাকে না। তারা একাধারে সরকার, মালগুজার ও সুদখোর মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে চলে।

পরিস্থিতির চাপে উদ্‌বিগ্ন ও হতাশ বার্ড ১৮৪৭ এর মার্চ মাসে তাঁর রিপোর্টে লেখেন— ব্রিটিশ সরকার কখনোই ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে দেশীয় রাজাদের সমান উৎসাহ উদ্দীপনা ও গঠনমূলক কার্যক্রম দেখাতে পারেননি, এবং অনিশ্চিত সরকার ও সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন কোন গোষ্ঠীর কাছে এটা কখনোই আশা করা উচিত নয় যে, তারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে, নিজস্ব মূলধনের বিনিয়োগে জমি কৃষির উন্নতি ঘটাবে। "The government ceases to have that immediate and evident interest in the advancement of cultivation which stimulates a good native government to cause the extension of cultivation by the expenditure of its own capital and the extention of its own agents" -- the extent of their rights ...... was left very indefinite"[৩]

অতঃপর ১৮৫৪ খ্রীঃ সাগর ডিভিশন প্রোক্ল্যামেশন অনুযায়ী মালগুজারদের জমিতে সম্পূর্ণ অধিকার (absolute proprietorship) স্বীকৃতি হল, এবং নিজ নিজ অঞ্চলের উন্নতিকল্পে তাদের প্রয়োজন হলে জমি বিক্রি করার বা বন্ধক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হল। এই সব কিছুর পিছনে উদ্দেশ্য মূলতঃ একটাই ছিল, অধিক থেকে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায়। ১৮৫০-এর শুরু থেকে মধ্য ভারতের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে মালগুজার এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল যে নির্দিষ্ট সময়ে, যে কোনো উপায়ে এক বিশাল পরিমান অর্থ সরকারের হাতে তুলে দেবে। ১৯৩০ এর দশকে স্লিম্যান এক এমন শ্রেণীর কথা কল্পনা করেন যারা কৃষিজীবী সমাজে কৃষকদের থেকে উচ্চে অবস্থান করবে, সরকার ও প্রজাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্রকারী হবে, এবং যাদের উপব নির্ভর করেই সমাজে ক্রমশ মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠবে। "Above the grade of a peasant, ..... might contribute to the formation of the middle and higher classs of the society"[৪]

১৮৫৪ খ্রীঃ গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য কর্নেল জে. লো ও তাঁর রিপোর্টে এমনই কিছু পরিকল্পনা নিয়ে মালগুজার গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। তাঁর মতে — সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতায় এদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে এরা সরকারের প্রতি একনিষ্ঠ হবে ও নিজেদের প্রয়োজনেই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন বা বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা — জাতীয় কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবে। "There shall be numbers of men in every large district, ...... so prosperous and wealthy and so thoroughly satisfied with their condition, that they shall be sincerely attached to our Govt. and be both able and willing for their own interests to afford important aid to us, by the exertion of their influence in the event of our Indian possessions

being invaded by powerful foreign foes or endangered by any internal insurrection of want or fidelity in our native army"[৫]

১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ব্যর্থতাকেই আরো একবার দৃষ্টিকটু ভাবে প্রকট করে। এই সময় মালগুজরেরা আঞ্চলিক নেতা হিসাবে বিদ্রোহী বা পীড়িত অসহায় মানুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রায় ত্রাতার ভূমিকা পালন করে, যা সরকারকে আরো একবার তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে। অবশেষে ১৮৬১ সালে মালগুজারদের জমিতে স্থায়ী ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চীফ কমিশনার স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের মতে, সামান্যতম সময় ও যারা খামার মালিক বা প্যাটেল হিসেবে জমির সঙ্গে যুক্ত ছিল, অথবা বহু দিন পূর্বে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া প্যাটেল বংশের কোন উত্তরসূরীকেও খুঁজে বের করে, মালগুজার হিসেবে জমিতে পুনর্বাসিন দেওয়া হয়। "Where there was the smallest shadow of claim on the ground of holding, as a farmer or patel, for any considerable time, and in many other cases where failing such a claim, the descendant of some old patel, long out of possession, was dug up and rehabilitated as malgoozar"[৬]

ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতিরিক্ত করের বোঝা না এড়াতে পেরে মালগুজার জমি বিক্রি করে দিতে থাকে এবং পুঁজিবাদী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভুক্ত এমন লোকেরা সেগুলি কেনে যাদের কৃষি সম্পর্কে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আগ্রহ ছিল না। এরা আন্তঃবাণিজ্যে লগ্নীকরণ অসুবিধেজনক থেকে সরাসরি জমিতে মূলধন লগ্নী করতে চায়, এভাবে ক্রমশ ব্রিটিশদের আদর্শগত জেন্ট্রি বা জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে নব্যগঠিত মালগুজার শ্রেণীর চূড়ান্ত ফারাক ধরা পড়ে।

পূর্বে অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল মন্তব্য করেন, ভারতে ভূমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সমস্ত কেন্দ্রগুলি অনিশ্চিত ও তরল অবস্থায় বিচরণ করছে, আমরা তাদের যে পাত্রে রাখব তারা সে পাত্রেরই আকার ধারণ করবে। "We found all the interests in land throughout most of India in a sort of fluid state, to be moulded much as we thought expedient and just"[৭]

কিন্তু তাঁর ধারণা যে প্রকৃত পক্ষে ঠিক নয় তা বুঝতে শাসক শ্রেণীকে আরো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। ব্রিটিশরা তাদের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বহুদিন ধরে প্রচলিত যে ঐতিহ্য ও সাবেকী প্রথাগুলিকে আগ্রহ্য করেছে সেগুলি বিনা প্রশ্নে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তারা আইনের সাহচর্যে ব্যাখ্যা সহ যে প্রথাগুলির

প্রচলন করেছে সেগুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য হল সে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এ বিষয়ে ১৮৬০ খ্রীঃ চার্লস উইংফিল্ড যথার্থই মন্তব্য করেন যে, পূর্বে জমিদারের জমি সংক্রান্ত চাহিদা ও সময়মত খাজনা আদায় ছাড়াও কৃষকের সঙ্গে তার এক ব্যক্তিগত সহজ বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল যা একজনের দয়া-দাক্ষিণ্য ও অপর জনের একনিষ্ঠ প্রভু ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু ব্রিটিশ আইন প্রণীত হবার পরে কৃষকদের ও জমিদারদের পৃথক অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে এককে অন্যের থেকে বহু দূরেই শুধু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এই দূরত্ব বা ফারাক থেকেই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে শত্রুতা তথা হিংসার। “The demands of the landlord are fair, and observed with good faith and innumerable little kindnesses, so dear to the natives of this country, are shown, which cease when our laws, by creating rights on the part of the peasantry, set the two classes in antagonism. I firmly believe that half the bickering and bad blood that prevails between landlord and tenant ..... have been caused by our ill- judged interference”[৮]

ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ গুলি ও সেখানকার দরিদ্র কৃষকের শ্রমকে নিজেদের মুনাফা লাভে কিভাবে কাজে লাগিয়ে ছিল এবং একই উদ্দেশ্যে নিত্য নতুন পন্থার আবিষ্কার করে চলেছিল তা লক্ষণীয়। মালগুজারি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু মালগুজার আর যাই হোক না কেন, কখনোই ভারতে ইংল্যান্ডের জেন্ট্রির বিকল্প হয়ে ওঠে না। এবং দীর্ঘ ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত সময় ভূমি সংক্রান্ত একের পর এক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত শাসকশ্রেণী এই সহজ সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, এদেশের কৃষি অর্থনীতিতে ‘proprietor’ বা জমির আদি মালিকের বিশেষ ভূমিকা সন্ধান করার কেনো অর্থ হয় না, কারণ এখানে জমিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের পৃথক অধিকার স্বীকৃত। দু দেশের মধ্যে গঠন, কাঠামো ও প্রণালীগত পার্থক্য প্রকট। অতএব ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় কৃষি জগতের অভাব, অভিযোগ তথা বিপর্যয়কে যে ধৈর্য্য ও বোঝাপড়ার সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রয়োজন ছিল সে জায়গায় উপনীত হতে শাসক শ্রেণীর দীর্ঘ সময় লাগে। তারা একনিষ্ঠভাবে জমির প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধান করে, কিন্তু কৃষি জমিতে কৃষকের যে আদি অকৃত্রিম অধিকার তাকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হয় নি। অতএব বিভ্রান্ত শাসক শ্রেণীর এই সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করতে আরো দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) Speech of Ilbert, member of the council of the Governor-General of India in Abstract of the proceedings of the council of the Governor-General of India assembled for the purpose of making laws and regulations under the provisions of the act of Parliament, 24 and 25 in Revenue Department Compilations, File No. 190 (b) 1882-83.

২) Sleeman, "Rambles and Recollections" of an Indian official (184) PP-152, 53; Notes on the Sagar Narmada Territories by R.M. Bird, 31 October, 1834.

৩) Minute by the Lieutenant Governor of the NWP 25 March 1847, para 4 in Grant of Proprietary Rights in the Central Provinces, 1847-1860, Selection No. 17.

৪) Sleeman, "Rambles and Recollections" of an Indian official (184) PP-61, 64;

৫) Minute by Col. J. Low 28 June, 1854, Para-8 in Report on the Administration of Nagpur Province by M.G. Plowden, Commission (1859).

৬) Minute of Chief Commissioner, 4 April 1868, Para-14, Foreign Revenue 4 April 1868 National Archives of India.

৭) Campbell, 'Memoris' (P-44)

৮) Wingfield to Maine, 3 November, 1868, enclosure in Maine to Wood, 20 November, 1864, Wood Papers.

# উদারনৈতিক মূলধনী বাজার ঃ গত দুই দশকের খুঁটিনাটি ও একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ

সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

## ভূমিকা

মূলত ১৯৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় অথনীতি ধীরে ধীরে উদারনৈতিক বিশ্বায়নের পথে হাটতে শুরু করেছে। বিশ্বায়নের ডাক জোরদার শোনা যায় ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ঘোষিত প্রথম দফার সংস্কার কর্মসূচীতে। এই সংস্কার কর্মসূচীর অন্যতম হলো আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার যা কোনো দেশের মেরুদণ্ড। কারণ অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, কোনো দেশে যত মূলধনী কারবার বা যৌথ সংগঠন (corporate organisation) বাড়বে, তত শিল্পায়নের নিরিখে এই আর্থিক ক্ষেত্রের বৃদ্ধি মূল উৎপাদন ক্ষেত্রকে (Real Section) প্রভাবিত করবে। ফলে সেটাও গড়ে উঠবে ও ক্রমশ বেড়ে উঠবে। এভাবে যদি আর্থিক ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করা যায় এবং তার উন্নয়ন বহমান হয় এবং সেই সমৃদ্ধিতে কোনো ফাঁকফোকর না থাকলে মূলক্ষেত্রকেও বহুতা উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই নিবন্ধে মূলত মূলধনী ক্ষেত্রের উদারীকরণ ও তার দক্ষতা সমপর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সমগ্র আলোচনাটি পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নিবন্ধের গতি-প্রকৃতি আলোচিত হবার পর দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে নয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ বিশ্বায়নকে সামনে রেখে যে সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে তার পিছনে উদ্দীপকগুলি কি ধরনের তার আভাস দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার সংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বোঝা যাবে সংস্কারের বিভিন্ন ধাপগুলি কেন ও কিভাবে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু নয়া নির্মিত উদারনৈতিক মূলধনী বাজার। এখানে এই বাজারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও বর্তমান ক্রিয়াকলাপ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অর্থাৎ সমাপ্তি পর্যায়ে এই ধরনের উন্নয়নে ভারতের মত দেশ কতটা উন্নতি করবে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

**উদারনৈতিক সংস্কার ঃ প্রেক্ষাপট**

একটু পিছনের দিকে আশির দশকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় যে আর্থিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার বা প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে যে পরিমান উৎপাদন কাম্য ছিল তা সম্পাদন করা হয়ে ওঠেনি। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় যে, কৃষিক্ষেত্র এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্ষেত্রে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হার ছিল ১.৫ শতাংশ। শিল্পক্ষেত্রের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। কিন্তু সেবাক্ষেত্র, অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন এবং ভূসম্পত্তি এই সব ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ উন্নতি হয়েছে।[১] এবার যদি আর্থিক সম্পদের যথোচিত বন্টন যথাযথ উৎপাদন ক্ষেত্রে না হয় এবং আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির মধ্যে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি দেখা যায় তাহলে এক মারাত্মক বিশৃঙ্খল অবস্থার সূচনা ঘটে, যার থেকে যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। তেমনটি ঘটেছিল আশির দশকের শেষভাগে ও নব্বই-এর গোড়ায়। এই দূরবস্থাকেই বলে প্রাকসংস্কার দূরবস্থা।

**দূরবস্থাগুলি এরূপ ঃ**

১) দেশীয় মুদ্রাস্ফীতি তার সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছায় যা ছিল ১৭ শতাংশ।

২) বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং ১.২ লক্ষ কোটি হয়ে দাড়ায়। তা দিয়ে মাত্র দুসপ্তাহের আমদানীর খরচ চালনো যায়।

৩) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ঘাটতি[২] মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৮.৪ হয়ে পড়ে যা এর সর্বোচ্চ স্তর।

৪) চলতি ক্ষেত্রে ঘাটতি[৩] মোট দেশজ উৎপাদনের ২.৬ লক্ষ কোটি থেকে ১৯৯১ সালে মোট দেশজ উৎপাদনের ৮ লক্ষ কোটি হয়ে দাড়ায়।[৪]

এখন এককথায় অর্থভাণ্ডারের মূল উৎপাদন ক্ষেত্রে চলন ও বন্টনের অসামঞ্জস্য প্রকট হয় ১৯৯১ সালে। এই অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি সংস্কার নেওয়া হয় ১৯৯১ সালে অর্থ, বাণিজ্য শিল্প ও সরকারী রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষেত্রে। এই সংস্কারগুলি একত্রীকরণ করে নাম দেওয়া হল নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচী।

মূল আলোচনাটি যেহেতু আর্থিক সংস্কার নিয়ে সেহেতু সেই সংস্কারের একটি ছোটরূপ দেওয়া যাক। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার সংস্কার কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল বাজার ভিত্তিক অর্থনীতির দক্ষতা। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যত বাজারে অংশ গ্রহণকারী ক্রেতা ও বিক্রেতা বাড়বে এবং বাজার ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বা Transaction Cost কমবে তত সেই বাজার দক্ষ উন্নত হবে। এর জন্য প্রয়োজন বাজার নির্বাহির বা

পরিচালনার ধরণে ও প্রকৃতিতে সরলীকরণ ও স্বচ্ছতা। যদি ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত সময়কাল ধরা হয় তবে দেখা যায় অনেকগুলি মূলধনী সূচক যেমন household sector বা গৃহস্থের সঞ্চয়ের ধরণ তার শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনার ঝোঁক, তার সঞ্চয়ের পরিমাণ, গঠনগত পরিবর্তন। (লক্ষ্য করা যায়)। আমার গবেষণায় গাণিতিকভাবে দুটো মাত্রাগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করা গেছে ঃ

১) অর্থের বাজারে দুটো ভাগ আছে মূলধনী বাজার বা মূলত দীর্ঘ মেয়াদী স্বত্ব বা ধার নিয়ে কারবার করে এবং টাকার বাজার বা মূলত স্বল্পমেয়াদী স্বত্ব নিয়ে কারবার করে। এর মধ্যে প্রথম বাজারটি অপেক্ষাকৃত দ্রুত উন্নতি করছে। ২) যে সব নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, অংশগ্রহণকারী বাড়ছে, শেয়ারের কেনাবেচাও বাড়ছে কিন্তু এই জমাকৃত অর্থের উন্নয়ন বা সচলতা যতটা, ততটা শিল্পক্ষেত্রে মোটেই বণ্টিত হচ্ছে না। এর আবার কারণ দুটো। ১) ইকুইটি বাজার বা শেয়ার বাজারের গঠন আমাদের দেশে তখনও সুসংবদ্ধ ছিল না যাতে করে ফাঁকফোকর (leakage) বা ফাটকাবাজীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা এই অর্থ শিল্পে ববহার করা যায়। ২) যে কোনো ব্যবসা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয়কে কমানো যাচ্ছিল না। ফলে ব্যবসার লাভ ততটা হয় না।

যে কোনো একটি শেয়ার কেনা বেচা বা বিনিময়ের তিনটি ধাপ ঃ— ১) লেনদেন বা trading বলতে বুঝি যে— যেকোনো শেয়ার বাজার সাধারণত যে শেয়ার কিনতে চায় তার কাছে খুব একটা সহজগম্য থাকে না। সে একজন দালালের কাছে যায় যার মাধ্যমে শেয়ারের হস্তান্তর হয়। Clearing এ শেয়ার বাজার এই দালালের অবস্থা পরীক্ষা করে এবং তারপর তার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে শেয়ারের কেনাবেচা হয়। Settlement এর পর্বে শেয়ারের নতুন মালিকের নামে শেয়ারটি হস্তান্তর হয় অর্থাৎ Title-transfer হয়। এখন প্রথম দফার সংস্কারের আগে বহুকাল যাবৎ এই তিনটে ধাপে প্রচুর মধ্যবর্তী দালাল (Sub-broker) ছিল এবং এক একটি ধাপ শেষ হতে প্রচুর দেরী হত। বাজার পরিচালন ব্যয় বাড়ার এটি একটি কারণ। ১৯৮৮ সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শেয়ার বাজার সংস্থা বা নিয়ন্ত্রক যেমন SEBI, NSE, NSCC এগুলি প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এই সমস্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে স্পট (Spot) এর বাজার অর্থাৎ যে বাজারে শেয়ারের বা দ্রব্যের তৎক্ষণাৎ কেনাবেচা হয় সেই বাজার পরিচালন ব্যবস্থায় উন্নতি করা যায়।

কিন্তু একটা সমস্যা দেখা গেল যে এই স্পট ব্যবসায় ভবিষ্যৎ লেনদেনের যে নিষ্পত্তি পদ্ধতি তা অনুসৃত হচ্ছে। অর্থাৎ শেয়ারের বা দ্রব্যের হস্তান্তর যা তৎক্ষণাৎ বা দ্রুত হবার কথা তা হল না এবং ভবিষ্যতের নিষ্পত্তির জন্য পড়ে রইল। একে

বলে স্পটের বাজারে ভবিষ্যৎ নিস্পত্তির ধরণ (future trading style settlement in the spot)। অপর দিকে শেয়ারের ভবিষ্যৎ বাজার (future market) এর গঠন ও উন্নত হয়নি। এর ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন ফাটকাবাজীর ঘোটালা (scam)। এতে বাজারের দক্ষতা কমে। এই ভবিষ্যতের বাজারকে (দক্ষ করার জন্য বা) সুগঠিত করার জন্য দ্বিতীয় দফার কর্মসূচী নিয়ে এল এক নতুন ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ বাজার যাকে বলা হয় ডেরিভেটিভ বাজার বা derivative market।

এই ডেরিভেটিভের ব্যবসার ব্যাখ্যা হল এই যে— যে সম্পদ এর ডেরিভেটিভ হবে তার মূল্যের নিরিখে বা ভিত্তিতে এর মূল্য নির্ধারিত হবে। ধরা যাক একটা ট্রেজারি বন্ড এর ডেরিভেটিভ লেনদেন হবে। ট্রেজারি বন্ড একটি debt security বা ধারপত্র। এখন ডেরিভেটিভ ট্রেডিং-এ এই ঋণপত্রটির কোনো ভবিষ্যৎ তারিখে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে যে দাম এই ঋণপত্রটির দামের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত, সেই দামে দুই পার্টির মধ্যে বিনিময় হবে। যদি ঋণপত্রটির দাম বাড়ে তবে এই ডেরিভেটিভ চুক্তিটির দাম ও বাড়বে। এর স্বপক্ষে বলা যায় যে এই ব্যবসায় লোকসানের ঝঁকিকে কমানো যায়।

উদাহরণ হিসাবে একটি future contract বা ভবিষ্যৎ চুক্তির কথা ধরা যাক, একজন চাষী এপ্রিল মাসে ধান বুনলো যা তুলবে জুলাই-এ। এখন যদি যোগান কম থাকে তবে সে জুলাই মাসে বেশী দাম পাবে বা যোগান বেশী থাকলে কম দাম পাবে। অতএব তার ভবিষ্যৎ লাভ সম্পর্কে যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয়। এবার এক ব্যবসায়ীর কথা ধরা যাক যার এই ফসলটির দরকার আছে। অধিক যোগান থাকলে সে অপেক্ষকৃত কম দামে বা প্রতিযোগিতামূলক দামে ফসলটি কিনতে পারবে কিন্তু যদি যোগান কম থাকে তাহলে অনেক বেশী দাম দিতে হবে। অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই দাম সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকায় তারা আইনত একটা বাধ্য চুক্তিতে আসে যেখানে ফসলটির কেনাবেচার দাম, পরিমাণ এবং কেনাবেচার দিন লিখিত থাকে। এরকম আরো চার ধরনের ডেরিভেটিভ উপকরণ আছে।

১) ফরোয়ার্ড উপকরণ ঃ (Forwards) দুজন ব্যবসায়ীর মধ্যে বর্তমানে পুর্বনির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত প্রথাভিত্তিক চুক্তি।

২) ফিউচার চুক্তি (Future) ঃ এক্ষেত্রে ফরোয়ার্ডের মত চুক্তির আঞ্চলিক কেন্দ্র বা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কেনাবেচা হয়।

৩) অপশন ঃ এক্ষেত্রে যার কাছে অপশন আছে তার সম্পদ কেনার অধিকার থাকে কিন্তু কেনার বা বেচার দায় থাকে না।

৪) সোয়াপ ঃ এক্ষেত্রে অর্থের বা ফান্ডের বিনিময় ঘটে ব্যাঙ্কের বা মাধ্যমের সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ধরা যাক UK-র এক কোম্পানীর ডয়েশ মার্ক ধার করার জন্য স্টারলিং ধার দিতে চাইল। এখন জার্মানের যদি উল্টো প্রয়োজন থাকে তখন এই মুদ্রা দুটি বিনিময় কোনো ব্যাঙ্কের সাহায্যে সংঘটিত হয়।

ডেরিভেটিভ কেনাবেচা কেন্দ্র মূলত চারটি বিষয় নিয়ে তৈরী হয়।

১) দ্রব্য ঃ এক্ষেত্রে যে দ্রব্যটির ডেরিভেটিভ লেনদেন হবে তার ব্যবসায়ের ধরণ ও গুনাগুন সম্পূর্ণ মনোপযোগী হতে হবে। ব্যবসা সংক্রান্ত দ্রব্যের ধরন সম্পূর্ণ কেন্দ্রর নির্দেশানুগ হবে। চুক্তিটিতে কি ধরণের চুক্তি, তার সংঘটিত হবার ও শেষ হবার তারিখ, দ্রব্যের মান ও পরিমান ইত্যাদি লিখিত থাকবে।

২) লেনদেন ঃ আঞ্চলিক কেন্দ্রে লেনদেনের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা থাকবে। একটি ব্যবস্থা যার নাম হলো 'Open electronic limit order book market' থাকবে এবং সেখানে ব্যবসা হবে সম্পূর্ণ পরিচয়হীনতায় বা অনামীতে, সমস্ত দেশ জুড়ে ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করার জন্য সমান সুবিধা ভোগ করবে।

৩) ছাড়পত্রদান ঃ ডেরিভেটিভ ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতা, বিক্রেতার পরিচয় জানেনা ও বিক্রেতাও ক্রেতার পরিচয় জানে না। এটা ঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় যদি লেনদেনের ঝুঁকি (credit risk) দূর করা যায়। ছাড়পত্র দানের স্থলে উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ঝুঁকি কমানে যায়।

৪) নিষ্পত্তি ঃ ডেরিভেটিভে অর্থ ও দ্রব্যের বিনিময় হয়। যেমন যার কফি ক্রয়ের অপশন আছে, সে অর্থের বিনিময়ে কফি পেতে পারে এবং নিষ্পত্তি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, এক্সচেঞ্জ তা পরীক্ষা করে।

নয়া নির্মিত ডেরিভেটিভ বাজারের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ঃ—

বহির্বিশ্বে বহুকাল পূর্বে এই ব্যবসার কিছুটা চল ছিল। পরবর্তীকালে নবজাগরণের সময়ে ভেনেসীয় মশলা ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ চুক্তি সংক্রান্ত ফরোয়ার্ড ডেরিভেটিভের চল শুরু করে। একশ বছর ধরে জাপানী ধানচাষীরা তাদের উৎপাদনে ভবিষ্যৎ মুল্যের ওঠাপড়ার ঝুঁকি সামাল দেওয়ার জন্য এর ব্যবহার চালায়। আমেকিার বড় খামারের মালিকেরাও ফিউচার চুক্তিতে লেনদেন করেছিল।[৬]

যখন ব্রিটেনে উড স্থির মুদ্রা বিনিময় হারের প্রথা ভেঙে পড়ে, ডলারের সোনার পরিবর্তন হওয়ার অবস্থা অচল হয়ে পড়ে তখন থেকে ডেরিভেটিভের প্রচলন বাড়তে

শুরু করে। এই প্রসঙ্গে এই ব্রেটেন উড ব্যবস্থা সংক্ষেপে বলি। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বলতে বোঝায় যে হারে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় সেই হারকে। বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার দুপ্রকার ঃ— একটি স্থির বিনিময় হার এবং অপরটি পরিবর্তনশীল বিনিময় হার। এক দেশের মুদ্রার সঙ্গে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার যখন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন তাকে স্থির বিনিময় হার বলে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর স্বর্ণমানের যুগ শেষ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নিয়ম অুসারে সোনার সমতা মূল্যের ভিত্তিতে দুটি দেশের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারিত হতে থাকে। তদানিন্তন এই সমতা মূল্য ছিল মার্কিন ৩৫ ডলার = ১ আউন্স আন্তর্জাতিক সোনা অর্থাৎ এক ডলার = $^{১}/_{৩৫}$ আউন্স সোনা। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সোনার আন্তর্জাতিক দাম ঘোষণা আবশ্যিক ছিল। এই দেশগুলি সোনার সমতা মূল্য থেকে ১% বেশী বা কম রেখে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করত। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে নিউ হ্যামসায়ারের ব্রিটেন উড্সে ৪৪টা দেশের এক সভা হয় যারা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের চুক্তি ও শর্তে সাক্ষর করেন। এর মূল কারণ ছিল শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ, দামের স্থায়িত্ব অর্থাৎ যুদ্ধকালীন ও পরবর্তী মুদ্রাস্ফিতি ও মুল্যের ওঠাপড়া রোধ। একটা উদাহরণ দিলে মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্যটা বোঝা যাবে। এটা হল জার্মানীর মূল্যবৃদ্ধি। এখানে মুদ্রাস্ফীতির সূচক ১৯১৯ সালের ২৫২ থেকে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ১২৬,০০০,০০০ অর্থাৎ ৫ লক্ষ গুণ হয়। ফলে বহির্বাণিজ্যে সমতা রক্ষা ও ঝুঁকি কমানোর জন্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিধি নিষেধ না স্থাপন করে মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শর্তাবলী স্থাপন করা হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে সমতা রক্ষা করা এই নিয়মে করা যাচ্ছে না। ফাটকা বাজারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সম্ভাবনা আরও প্রবল হয় যদি দেশের লেনদেনের হিসাবে বিপুল ঘাটতি থাকে। এই ঘাটতি আগামী দিনে বাজার থাকলে মুদ্রার বহির্বিনিময় হারের হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ফাটকা ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে দেশীয় মুদ্রা বিক্রয় করবে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমতার হার বর্জন করে। বিনিময় হার হ্রাস করতে বাধ্য হবে। ফাটকা ব্যবসায়ীরা তখন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিনিময় হার হ্রাসপ্রাপ্ত দেশী মুদ্রা কিনে লাভবান হয়। এভাবে ক্রমশ এই নিয়ম ভেঙ্গে পড়ে ও পরিবর্তনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তৎকালীন মার্কিন সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নিয়মনীতি ৬০-এর দশকের ভাগে ব্রেটন উড প্রথার পতনের একটা কারণ। পরিবর্তনশীল বিনিময় হারে ব্যবস্থায় একটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার

বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ পরবর্তীকালে মূলত ব্রেটন উড স্থির বিনিময় মুদ্রার প্রথা যখন ভেঙ্গে গেল তখন অর্থের বাজারের অনিশ্চয়তা থেকে বিস্তৃতি লাভ করে এই ডেরিভেটিভ প্রথা। যত বেশী বিশ্বের অর্থের বাজারের একত্রীকরণ ও ঋণপত্রদানের প্রথা, বন্ধকী কারবার ইত্যাদি বাড়ছে, এক ধরনের বাজার আর এক দেশের বাজারে সম্পদের লেনদেন বাড়ছে এবং বিদেশী ফার্মের প্রবেশ ও লগ্নীকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তত বেশী ঝুঁকি ও দাম লাভের ওঠাপড়ার অনিশ্চয়তাও বাড়ছে। ফলত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচার কেন্দ্রে ডেরিভেটিভের প্রচলন চালু হল। ১৯৭২ সালে ইন্টারন্যাশনাল মানি মার্কেট অনং শিকাগো মার্কিনটাইল এক্সচেঞ্জ, ক্যানাডিয়ান ডলার, ডয়েশ মার্ক, জাপানের ইয়েন ও সুইস ফ্রাঁ-এর ভবিষ্যৎ চুক্তিতে কেনাবেচা শুরু হয়। ইতিমধ্যে যেভাবে ডেরিভেটিভের উৎপত্তি শুরু হয়, তার উদ্দীপকসহ একটি সারণী দেওয়া হোলো।[৮]

**ডেরিভেটিভের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্দীপক**

| বছর | উন্নয়ন | উৎপত্তি |
|---|---|---|
| ১৯৮২ | রেগন পুনঃপ্রাপ্তি | ফিলাডেলফিয়া এক্সচেঞ্জ, মুদ্রার অপশন, মুদ্রাভিত্তিক সোয়াপ |
| ১৯৮১ | ফেডারেল রিজার্ভ (Reserve)-এর | লন্ডন ইন্টারন্যাশনাল ফিউচার |
| ১৯৮০ | লক্ষ্য হল অর্থ, সুদের হার নয়। | এক্সচেঞ্জ বিগব্যাঙ (Big Bang) |
| ১৯৭৯ | | নিউ ইয়র্ক ফিউচারস এক্সচেঞ্জ |
| ১৯৭৮ | ইওরোপীয় মানিটারি সিস্টেম এবং | নিউ ইয়র্ক মার্কেনটাইল এক্সচেঞ্জ, |
| ১৯৭৭ | বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আনার জন্য পুনঃপ্রচেষ্টা জামাইকা এ্যাকর্ড | এনার্জি ফিউচার্স। |
| ১৯৭৬ | মন্দা | |
| ১৯৭৫ | অস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সুদের হার | সুদের হারভিত্তিক সোয়াপ |
| ১৯৭৪ | দ্রব্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতা | দ্রব্যের ফিউচারে আগ্রহ |
| ১৯৭৩ | নিয়ন্ত্রিত ভাসমান সুদের হার | |
| ১৯৭২ | সোনার রূপান্তরের সমাপ্তি | |
| ১৯৭১ | ব্রেটন উডসের পরিসমাপ্তি | শিকাগো মার্কেনটাইল এক্সচেঞ্জ, মুদ্রাভিত্তিক ফিউচারস |

এছাড়া ১৯৮৩ সালে সিঙ্গাপুর মানিটারি এক্সচেঞ্জ (SIMEX), ১৯৮৫ ফ্রান্সের মাটিফ ডেরিভেটিভ কেনাবেচা শুরু করে। ভারতে ১৯৮৮ সালে এল.সি. গুপ্তা কমিটি ৯-এর প্রচলনে উদ্যোগী হয়। এখানে ৯ই জুন ২০০০ সালে প্রথম ঐতিহাসিক ৫টি চুক্তি সাক্ষরিত হয় এম/এস কাফি এবং মৌলিক সিকিউরিটি প্রাইভেট লিমিটেড ও এম/এস এমকে শেয়ার এবং স্টক ব্রোকার লিমিটেডের মধ্যে।

ভারতে মূলত মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ ও ন্যাশানাল স্টক এক্সচেঞ্জ— এই দুই কেন্দ্রে ডেরিভেটিভের কেনাবেচা চলে। উন্নত দেশে এর ব্যবসায়িক আয়তন ভারতের চেয়ে অন্তত পক্ষে তিনগুণ বেশী। ভারতে সমগ্র টাকার বাজারের মাত্র ২০ শতাংশ ডেরিভেটিভের বাজার। তার মধ্যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, সত্যম কম্পিউটার এবং ইনফোসিস টেকনোলজির ভাগ মোট উৎপাদনের ৪২ শতাংশ ছিল ২০০২ সালে।[৯] মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এই দুই কেন্দ্র মিলিয়ে মোট লেনদেন ২০০১-০২ সালে ছিল ২০৩,৮৪৮.৭১ কোটি টাকা যা ২০০৩-০৪ এর ডিসেম্বর, মাসে ১,৫৮৯,৩৫০. ১০ কোটি টাকায় উপনীত হয়। অর্থাৎ বৃদ্ধি পায় ৭.৭৯ গুণ। ভারত সরকার দ্রব্যেয় ফিউচার কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে অনুমোদন করেন, যেমন গোলমরিচ, হলুদ ও রেড়ির তেল। সর্বপ্রথম যে বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কেনাবেচা চালু হবে তা হোলো সুতিবস্ত্র শিল্প।[১০]

**উপসংহার ঃ**

ভৌমিক[১১] ও সুব্রামনিয়েমের মতে[১২] যেহেতু বাইরের দেশে ডেরিভেটিভ অনেক উন্নত হয়েছে সেহেতু চুক্তিগুলি যদি ভারতে না আসে বা ডেরিভেটিভের লেনদেনের জন্য আবশ্যক পরিবেশ সঠিকভাবে তৈরী না হয় তাহলে এই বাজারের প্রসার সীমিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ডেরিভেটিভ বেচাকেনার কতগুলি ঝুঁকি আছে। ১৯৯১-৯৭ সালের মধ্যে লেভিন এমনই কতকগুলি ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল জুয়াচুরি (fraud), চুক্তি বা প্রথাগত নয় বা কার্যকরী করা সম্ভব নয়, অধিকার ভেঙে পড়া, অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ, কার্যকলাপে ভুলভ্রান্তি ইত্যাদি। যদি এই ব্যবসায়ে স্বচ্ছতা না থাকে তবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে লেনদেনে যে সম্পদ প্রাপ্তির আশা থাকে তা পাওয়া যাবে না। অধিকতর ঝুঁকির ভয়ে বহির্বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা ভারতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেনা।

তবে সবধরনের ডেরিভেটিভের উপকরণ কতটা সত্যিকারের বিনিয়োগকারীর উপকারে আসবে তা বলা কঠিন। বিশ্বের যে সব বাজারে ডেরিভেটিভের প্রচলন চলছে তাদের অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে যদি নিয়ন্ত্রিত এবং সতর্ক তত্ত্বাবধানে এই বাজার পরিচালনা করা যায় তাহলে এই বাজার মূলধনী বাজারকে সমৃদ্ধ করবে।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) ইকনমিক সার্ভে : গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯৪-৯৫।

২) ফিসক্যাল ঘাটতি : রাজস্বপ্রাপ্তি (নীট কর রাজস্ব + কর বহির্ভূত রাজস্ব) + মূলধন প্রাপ্তি (শুধুমাত্র ঋণের পুনরুদ্ধার এবং অন্যান্য প্রাপ্তি)-মোট ব্যয় (পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়) অথবা বাজেট ঘাটতি + বাজার ঋণ ও অন্যান্য দেনা।

৩) চলতি খাতে ঘাটতি : সরকারের বাৎসরিক আয়— বাৎসরিক ব্যয়।

৪) গঙ্গোপাধ্যায় এস : স্ট্রাকচারাল শিফ্‌টস ইন ক্যাপিট্যাল মার্কেট এ্যান্ড ইটস সাসটেইনেবেলিটি ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি বেসড অ্যানালিসিস, পি.এইচ.ডি. ডিসার্টেশ্যান, অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

৫) শাহ্. এ এবং টমাস এস : ডেভেলপিং দ্যা ক্যাপিটাল মার্কেট, হ্যনসন এন্ড কাঠুরিয়া (এড) ইন্ডিয়া অ্যা ফিনানশিয়াল সেন্টার ফর দ্যা টুইনটিএথ সেঞ্জুরি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৩।

৬) ক্রুগম্যান ও অবস্টফিল্ড : ইন্টারন্যাশন্যাল ইকনমি, পিয়ারসন এডিসন, ২০০৪, পৃ. ৫৪৩।

৮) গার্ডনার : পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

৯) মাদাপাত : ইন্ডিয়ান ডেরিভেটিভ মার্কেট, এ পারস্পেকটিভ, এন ভেঙ্কটেস (এড) ইন্ডিয়ান ফিনানশিয়াল মার্কেট এ্যান ইনট্রোডাকশান, আই.সি.এফ.এ.আই ইউনিভার্সিটিস ২০০৪, পৃ. ১৭৯।

১০) বালসুব্রামনিয়াম ডি: প্রসপেক্ট ফর কটন ফিউচারস ইন ইন্ডিয়া, ইন টমাস (এড) ডেরিভেটিভ মার্কেট ইন ইন্ডিয়া ইনভেস্ট ইন্ডিয়া — টাটা ম্যাকগ্রহিল, ১৯৯৮, পৃ. ১১৩-৩৪।

১১) ভৌমিক এস : স্টক ইনডেক্স ফিউচারস ইন ইন্ডিয়া, ডাস দ্যা মার্কেট জাস্টিফাই ইটস ইউস? ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল ইউকলি, ভল ৩২, নং ৪১, অক্টোবর ১২, ১৯৯৭।

১২) সুব্রামনিয়াম : "ফাইন্যানশিয়াল ডেরিভেটিভস ফ্যাক্টার এফিশিয়েন্সি এ্যান্ড গ্রোথ" ইন কুমার (এড) রিসার্চ প্রেপারস ইন অ্যাপ্লায়েড ফাইন্যান্স, আই.সি.এফ.এ.আই ১৯৯৯।

১৩) লেভিন : 'ডেরিভেটিভ ডিস্যাস্টারস, দ্য লিগ্যাল পারস্পেকটিভ' ইন টমাস (এড) ডেরিভেটিভ মার্কেট ইন ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত, ১৯৯৮।

# ব্রহ্মবিদ্যা আন্দোলনের উৎস সন্ধানে

**শিবাজী কয়াল**

পাশ্চাত্য সভ্যতার একরূপ সামাজিক ধার্মিক প্রতিবাদের মধ্যে ব্রহ্ম বিদ্যা আন্দোলনের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ব্রহ্ম বিদ্যা যখন ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে থাকে তখন তা তৎকালীন ইয়োরোপীয় ও মার্কিনী জীবন ও সভ্যতার সমালোচনায় ব্যবহার করতে থাকে মিশরীয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধারণা ও প্রতীক সমূহ। দুই অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব হেলেনা পেত্রোভ্‌না ব্লাভাৎস্কী ও হেনরী স্টীল অলকট্‌ ১৮৭৫ খৃঃ সূত্রপাত করেন ব্রহ্মবিদ্যা আন্দোলনের।

১৮৩১ সালের ৩১শে জুলাই রাশিয়ার 'হ্যান' বংশ নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে হেলেনা পেত্রোভ্‌নার জন্ম হয়। ১৭ বছর বয়সে General Blavatsky নামে রাশিয়ার এক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি হেলেনা পেত্রোভ্‌না ব্লাভাৎস্কী নামে পরিচিত হন (H.P.B.)। শৈশব থেকে হেলেনার জীবন, নানা রূপ অত্যাশ্চর্য্য, অলৌকিক বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ ছিল এবং তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারিনী। আশৈশব হেলেনা অনুভব করতেন যে কোন অদৃশ্য পুরুষ তাঁর সহায় ও জীবনের পথ নির্দ্দেশক রূপে অলক্ষিতভাবে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। এই মহাপুরুষ ছিলেন সৌম্যমূর্ত্তি সম্পন্ন। এটা স্বপ্ন না সত্য হেলেনা বুঝতে পারতেন না।

১৭ বছর বয়সে হেলেনা স্বামী সঙ্গ ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৮৫১ সালে দ্বিতীয়বার লন্ডনে উপস্থিত হলেন এবং একদিন তিনি পরিস্কার দেখলেন সেই অদৃশ্য চিরসঙ্গীকে একজন রক্তমাংস পঠিত মানুষ রূপে। তিনি একটি শোভাযাত্রায় আরো কয়েকজনের সঙ্গে অশ্বারোহণে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখেই হেলেনা তাঁর দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি কিন্তু ইশারায় হেলেনাকে বারণ করলেন। পরের দিন হেলেনা Hyde Park-এ বসে ছিলেন এমন সময় তাঁর সেই অদৃশ্য চিরসঙ্গীকে দেখলেন তাঁর সামনে দাড়িয়ে। তিনি বলেন তিব্বতে তাঁর আশ্রম এবং সেখানে হেলেনাকে তিন বছর অতিবাহিত করতে হবে বিশেষ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। এই বলে সেই মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার পর হেলেনা ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন এবং মনে মনে তাঁর সেই

মহাপুরুষ ও তিব্বতের কথা চিন্তা করতেন। ১৮৬৭ থেকে ১৮৭০ পর্য্যন্ত হেলেনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন। এই তিন বছর তিনি তাঁর অদৃশ্য চির সঙ্গীর আশ্রমে ছিলেন। তাঁর নাম মহাত্মা মরুদেব বা Master M। হেলেনা তাঁকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করে নিলেন। হেলেনার মতে তাঁর আশ্রম ছিল তিব্বতের অন্তর্গত "কলাপগ্রাম" নামক নিগূঢ় একটি স্থানে। মহাত্মা মরুদেব বা Master M-এর পরম বন্ধু ছিলেন মহাত্মা কুথুমিদেব বা Master K.H. যাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে ও বিভিন্ন পুরাণে।

হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাৎস্কী (H.P.B.) ও হেনরী স্টীল অলকট্ যে Theosophical আন্দোলনের সূত্রপাত করেন সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। Theosophical কথাটির মূল উৎস 'Theosophy'। Theosophy-র অর্থ আদি বিদ্যা বা দিব্যজ্ঞান এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে এই কথাগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১]

মহাত্মা মরুদেবের ইচ্ছা ছিল পাশ্চাত্যে জড়বাদের অবসান ঘটিয়ে ব্রহ্ম বিদ্যার পুনঃস্থাপনা। এই ব্রহ্মবিদ্যা কোন নতুন ধর্ম নয় এবং তার উদ্দেশ্যও নয় কোনও বিশেষ ধর্মকে প্রচার করা। প্রত্যেক ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের অন্তরালে যে সত্য গোপন হয়ে থকে তাকে প্রকাশ করে ধরাই হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। তাই ব্রহ্মবিদ্যা আন্দোলনের motto বা আদর্শবাণী হচ্ছে There is no religion Greater than truth — নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মঃ।

তিব্বত ত্যাগ করে হেলেনা ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হলেন এবং স্থির করলেন সেখান থেকেই তাঁর মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করবেন। কিন্তু তিনি কিভাবে করবেন তা স্থির করতে পারলে না। পরে ১৮৭৫ সালে Master M তাঁকে আমেরিকায় যেতে বলেন ও সেখানে তাঁহার কার্য সম্পাদনের জন্য একটা সমিতি বা কেন্দ্র স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। হেলেনার মৃত্যুর পর তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁর নিজ হাতে লিখিত একটি প্রবন্ধ (১৮৮৬) পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, Sent to the U.S. of Americs in 1873 for the purpose of organising a group of workers on a psychic plane, two years later the writer received orders from her Master and Teacher to form the nucleus of a regular society (একটি সমিতির কেন্দ্র স্থাপন)।[২] এর পূর্বে ১৮৭১ সালে কাইরো শহরে প্রেততত্ত্বের বা Seance এর দ্বারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখানকার মানুষদের প্রেততত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহ ছিল কিন্তু এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানবার জন্য তেমন আগ্রহ ছিল না।

এইভাবে কাইরো শহরে ব্যর্থ হবার পর ১৮৭৩ সালে হেলেনা প্যারিসে তাঁর

আত্মীয়ের কাছে গেলেন। প্যারিসে দুমাস তিনি ছিলেন। এই সময় তাঁর মনে একটি চিন্তাই ঘোরা-ফেরা করছিল— কোন দেশে এবং কিভাবে গুরুদেবের কাজ শুরু করবেন। এই সময় হেলেনা গুরুদেবের আদেশ পেলেন নিউ ইয়র্ক শহরে যেন তিনি যান। 'One day she received from the "Brothers" a peremtory order to go to New York and await further orders'.[৩]

১৮৭৩ সালে ৭ই জুলাই হেলেনা নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও অলৌকিক শক্তির অভূতপূর্ব ক্রিয়ার দ্বারা বিদ্বগ্ধ সমাজকে স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করেন। 'In October 1874, She was ordered to go to Chittenden, Vermont and find the man who was to be her future colleague in a great work.[৪] অর্থাৎ চিটেনডেন গ্রামে গিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ মহৎ কাজের সহযোগীকে খুঁজে বার করতে আদেশ পেলেন।

তখন চিটেনডেন গ্রামে Eddy নামে এক কৃষকের গৃহে রোজ ভৌতিক কাণ্ড ঘটছিল— কিছু মৃত ব্যক্তি জীবিত মানুষের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়ে তাদের জীবিত আত্মীয়দের সঙ্গে বাক্য আদান প্রদান করছিল। বিভিন্ন দিক থেকে লোকেরা Eddy-র গৃহে আসছিল। এঁদের মধ্যে ছিল Henry Steel Olcott নামে এক ব্যক্তি যাঁর প্রেততত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার খুবই আগ্রহ ছিল। Eddy-র গৃহের ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। অলকট নিজেও এ বিষয়ে লিখেছিলেন।

হেলেনা ১৪ই অক্টোবর (১৮৭৪) Eddy-র গৃহে গিয়েছিলেন উল্লেখিত ভৌতিক দৃশ্য দেখার জন্য। আসলে কিন্তু H.P.B. Chittenden-এ উপস্থিত হয়েছিলেন প্রথমত Col. H.S. Olcott-এর সঙ্গে পরিচয় করার জন্য এবং তাঁর দুই গুরুজন বা Masters তাঁকে যে শিক্ষাদান করেছিলেন Col. Olcott কে সেই শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করানো এবং তাঁদের সম্মুখে যে কাজ সে বিষয়ে বলা; দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা সমন্ধে অবগত হওয়া।[৫] তাঁদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে Col. H.S. Olcott পরে লিখেছিলেন, "A strange concatenation of events brought us together and united our lives for this work, under the superior direction of a group of Master, specially of the One, whose wise teaching, noble example, benevolent patience and paternal solicitude have made us regard him with the reverence and love that a true father inspires in his children. I am indebted to H.P. Blavatsky for making me know of the existence of these Masters and their Esoteric philosophy, and later for acting as my mediator before I had come into direct personal contact with them."[৬]

কিছুদিন পরে হেলেনা তাঁর নতুন গৃহে ৪৬ নং আরডিং প্লেসে, নিউ ইয়র্কে বসবাস করতে শুরু করলেন। এখানে বহু জ্ঞানী-গুনী, বিদ্বান ব্যক্তি, প্রেততত্ত্ব, গুহ্যবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদা ও তার পিছনে যে সুক্ষ্ম বিজ্ঞান ও দর্শন আছে তা নিয়ে আলোচনা ও বুঝবার জন্য আসতো।

হেলেনের ব্যক্তিত্ব ও গুহ্যবিদ্যায় গভীর জ্ঞান বিভিন্ন তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে তাঁর গৃহের আলোচনা সভা। প্রথম আসেন Willium Quan Judge নামক ২৪ বছর বয়সের এক যুবক। তারপর George Hevry Felt নামে এক পণ্ডিত এলেন যিনি মিশরের প্রাচীন Khem নগরের ধর্ম যাজকদের কছে যে সব তান্ত্রিক যন্ত্র ছিল তার শক্তি সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করে অনেক তথ্য জানতে পেরেছিলেন। হেলেনের গৃহে যে সব জ্ঞানী-গুনীদের সভা হত সেই সভায় (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫) এই বিষয়ে George Henry Felt "The lost canon of Proportion of the Egyptians' নামে একটি বক্তৃতা দেন।[৭] উপস্থিত ১৭ জন স্ত্রী পুরুষ G.H. Felt কে ধন্যবাদ দেন তাঁর এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার জন্য। এই বক্তৃতা চলাকালীন অলকট্ W.Q. Judge-এর মাধ্যমে এক টুকরো কাগজ হেলেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কাগজটিতে লেখা ছিল 'Would it not be a good thing to form a society for this kind of study? হেলেন অলকটের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাঁর সম্মতি জানালেন। হেলেনের সম্মতি পাওয়ার পর অলকট্ সুযোগ বুঝে উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সমক্ষে প্রস্তাব করলেন যে এইরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা বা অনুশীলনের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করা যাক। এইভাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি সমিতি স্থাপন করা হল। জাজ প্রস্তাব করলেন যে অলকট এই সমিতির সভাপতি হবেন এবং স্থির হল জাজ সম্পাদকের কাজ করবেন। আলকট্ লিখেছেন "One movment of great importance has just been inaugurated in New York under the lead of Col. Henry Steel Olcott in the organisation of a Society to be known as the Theosophical Society.[৮]। এভাবে Theosophical Society-র বীজরোপিত হয় যা সদস্য সংখ্যা ও শংখা বৃদ্ধি পাওয়ার পর একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়।

১৮৭৭ সালে মাদাম ব্লাভাটস্কী অবগুণ্ঠনমুক্তা আইসিস বা Isis Unveiled নামে দুই খণ্ডের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবারপর ব্রহ্মবাদী জ্ঞানতত্ত্ব প্রসারিত হতে থাকে। প্রথম খণ্ডটিতে থাকে পরলোকতত্ত্ব (Spiritualism), আধুনিক বিজ্ঞান, অলৌকিক তত্ত্ব (Phychic Phenomena), Mesmerism (সম্মোহন), কাবালা (ইহুদী পরলোকতত্ত্ব), আদিম মানবের জ্ঞানসমূহ ও অতীন্দ্রিয় কীর্তিকলাপের বিবরণ।

দ্বিতীয় খণ্ডে সমালোচিত হয় তথাকথিত খৃষ্ট ধর্ম, পেশ করা হয় সেই ধর্মের অজানা নিগূঢ় ব্যাখ্যা এবং তাকে তুলনা করা হয় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে।[৯] যাঁরা পরলোকতত্ত্বে আগ্রহী তাঁদের কাছ থেকে অবগুণ্ঠনমুক্তা আইসিস লাভ করে উচ্চ প্রশংসা ও সমাদর আর গোঁড়া খৃষ্টানদের থেকে লাভ করে তীব্র সমালোচনা। সমালোচকদের বিনা প্রতিরোধেই মাদাম ব্লাভাটস্কী ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে পদার্পণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১০]

পৃথিবীর যে কোনও ধর্মমতে বিশ্বাসী অথবা কোনও মতে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু অনুশীলনে যত্নবান এইরূপ ধারণা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা পরিকল্পিত। অপর ভাষায় সকল ধর্মের এবং হেলেনের মহাত্মার esoteric philosophy (গুঢ় দর্শন)-র ভূমিকা ছিল ব্রহ্মবিদ্যার ধর্মতাত্ত্বিক উৎস।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে জাতিগত বিদ্বেষের উপস্থিতির কথা নিঃসন্দেহে শোনা যায়। কিন্তু এই বিদ্বেষকে ব্রহ্মবাদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব আদর্শ অতিক্রম করেছিল সহজেই। যাঁরা Theosophical Society-র উদ্দেশ্য এবং আদর্শ দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিল তাঁরা এই সংস্থাতে একত্রিত হয়েছেন নানা ধর্মমতের বিরোধ অপসারিত করতে, বিভিন্ন ধর্মমতের শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন মানুষের মধ্যে মিলনসেতু তৈরী করতে এবং ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যগুলিকে উপলব্ধি করে সমভাবে অন্যের সাথে তার ফল লাভে অংশগ্রহণ করতে।

স্মরণ রাখা উচিত যে মাদাম ব্লাভাটস্কী ও তাঁর পরম বন্ধু অলকট্ ভারতবর্ষে তাঁদের সংগঠনের তিনটি মূল উদ্দেশ্য মনোনীত করেন। প্রথমত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের একটি পরমানু কেন্দ্রের গঠন, দ্বিতীয়ত তুললনামূলক ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের অধ্যয়ন; ও তৃতীয়ত প্রকৃতির অবর্ণনীয় ক্ষমতা ও মানুষের সুপ্ত শক্তির জাগরণ। হেনরী অলকট তাঁর The Theosophist নামক পত্রিকায় এই তিনটি উদ্দেশ্যকে প্রতিপাদন করতে থাকেন।

এই নিবন্ধটির সমুচিৎ উপসংহার রূপে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হল "........ The Society has discovered a new aspect of Freedom, a new pleasure in Tolerance, a more understanding application of Brotherhood" (Ransom, Josephine).[১১]

**সূত্র-নির্দেশ :**

১) Bruce, F. Campbell, Ancient Wisdom Revised, A History of the Theosophical Movement, Berkeley, University of California Press, 1980, p. 28.

২) The Original Programme of the T.S. by H.P.B. from the 'Theosophist' -- H.P.B. Centenary Number, p. 56.

৩) Olcott, H.S., Old Diary Leaves, Vol-I, p. 20

৪) Olcott, H.S., Old Diary Leaves, Vol-I, p. 20

৫) ·Ranson, Josephine, A Short History of the Theosophicla Society, p. 57, Madras, 1938.

৬) Ransom, Josephine, A Short History of the Theosophical Society, p. 57-58, Adyar, Madras.

৭) থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মিত্র, বীরেশ রঞ্জন, T.B.T.F. Cal-12, p. 11.

৮) Olcott, H.S. Old Diary Leaves, Vol.-I, p. 11.

৯) Campbell, Ancient Wisdom, p. 34-39.

১০) Farquhar, J.N. — Modern Religious Movements in India, New York, Macmillan Company, 1919, p. 226, also Campbell, Ancient Wisdom, p. 78.

১১) Ranson, Josephinc, A Short History of the Theosophical Society, Adyar, Madras, p. 544.

# প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন— অংশ গ্রহণে জনসাধারণ— একটি সমীক্ষা

দীপক মণ্ডল

১৯৬০ সালের মধ্যে আমাদের দেশের চোদ্দ বছর বয়স্ক সমস্ত শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে এই ছিল সংবিধানের নির্দেশ। আজ ২০০৫ সালে দাঁড়িয়ে সেই কাজ সুনিশ্চিত করা যায়নি। এর পিছনে খুঁটিনাটি কারণ বিশ্লেষণ না করে তৃণমূলস্তরে চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পনা না করতে পারাটা সব থেকে বড় কারণ বলা যেতে পারে। এ পর্যন্ত যে অগ্রগতিটা ঘটেছে তা রাষ্ট্রীয় ও বিক্ষিপ্তভাবে জনসাধারণের অংশ গ্রহণে মূলত অ্যাডহকইজমের ভিত্তিতে। চাহিদা ও তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে নয়।

সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে একটি গ্রামের উপর চোখ রাখলে একটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক এসবের অবস্থান গ্রামে প্রায় পাশাপাশি। সুতরাং গ্রামে কত শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, কত শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী, কত শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে, কতজন বিদ্যালয় ছেড়েছে, কতজন শিশুর জন্য শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে, কতজন শিশু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে, শিশু পিছু ও বিদ্যালয় পিছু কতজন শিক্ষক আছেন, শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে কতজন অভিভাবকের অনীহা আছে। এসব তথ্য সেখানকার মানুষের কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা যায়।[১] এই সব তথ্যের বিশ্লেষণ করে এখানকার মানুষের উদ্যোগেই গ্রাম ভিত্তিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে এটা হবে একটা কার্যকর ইনস্ট্রুমেন্ট। (নিম্নে বিদ্যালয় ছুট ও পুনরাবৃত্তের নমুনা দেওয়া হলো)।

## SOUTH 24 PARGANAS DROPOUT RATE - 1997-98

| Class | Enrolment 1997 | Enrolment 1998 | Repeaters | Repetition Rate % | Promotion Rate % | Dropout | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5466 | 5067 | 1250 | 22.87 | 68.97 | 8.16 | |
| II | 3483 | 4354 | 584 | 16.77 | 81.69 | 1 (adjusted) | |
| III | 2844 | 3379 | 255 | 8.97 | 90.33 | 0.7 | |
| IV | NA | 2824 | - | | | | |

## RR, PR and DR : 1998-99

| Class | Enrolment 1998 | Enrolment 1999 | Repeaters | Repetition Rate % | Promotion Rate % | Dropout | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5067 | 5508 | 1128 | 22.26 | 70.24 | 7.5 | |
| II | 4354 | 3850 | 291 | 6.68 | 80.89 | 12.43 | |
| III | 3379 | 3763 | 241 | 7.13 | 77.31 | 15.56 | |
| IV | 2824 | 2867 | 355 | 9.3 | | | |

## RR, PR and DR : 1999-2000

| Class | Enrolment 1999 | Enrolment 2000 | Repeaters | Repetition Rate % | Promotion Rate % | Dropout | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4508 | - | 780 | 17.30 | 76.31 | 6.39 | |
| II | 3850 | 3624 | 184 | 4.78 | 89.58 | 5.64 | |
| III | 3763 | 3689 | 240 | 6.38 | 87.22 | 6.41 | |
| IV | 2867 | 3523 | 242 | 8.41 | - | - | |

Girls' RR, PR and DR : 1997-98

| Class | Enrolment 1997 | Enrolment 1998 | Repeaters | Repetition Rate % | Promotion Rate % | Dropout Rate % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2742 | 2469 | 598 | 21.81 | 69.44 | 8.75 |
| II | 1777 | 2249 | 345 | 19.41 | 79.73 | 1.0 (Adjusted) |
| III | 1453 | 1751 | 121 | 8.32 | - | |
| IV | - | 1418 | .. | - | - | |

Girls' RR, PR and DR : 1998-99

| Class | Enrolment 1998 | Enrolment 1999 | Repeaters | Repetition Rate % | Promotion Rate % | Dropout Rate % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2469 | 2316 | 527 | 21.34 | 69.58 | 9.08 |
| II | 2249 | 1867 | 149 | 6.63 | 77.95 | 15.42 |
| III | 1751 | 1853 | 110 | 6.28 | 87.95 | 5.77 |
| IV | 1418 | 1661 | 121 | 8.53 | - | - |

Girls' RR, PR and DR : 1999-2000

| Class | Enrolment 1999 | Enrolment 2000 | Repeaters | Repetition Rate % | Promotion Rate % | Dropout Rate % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2316 | | 369 | 15.63 | 74.05 | 10.32 |
| II | 1867 | 1798 | 83 | 4.45 | 94.55 | 1 (adjusted) |
| III | 1853 | 1980 | 112 | 6.04 | 92.79 | 1 (adjusted) |
| IV | 1661 | 1922 | 110 | 6.62 | | |

Report on Drop outs and Repeater's in the District of South 24-parganas - NIAS.

EMIS Data Supplied by Ed-CIL (New Delhi)

| | | | | Bankura | | | | | 24 Parganas (South) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total |
| Year-I | 2000-01 | Enrolment | Boys | 56405 | 40864 | 35090 | 37840 | 170199 | 172606 | 97183 | 93051 | 84516 | 447356 |
| | | | Girls | 53891 | 36008 | 29988 | 32590 | 152477 | 167212 | 96045 | 91499 | 83159 | 4347915 |
| | | | Total | 110296 | 76872 | 65078 | 70430 | 322676 | 339818 | 193228 | 184550 | 16775 | 885271 |
| | | Repeaters | Boys | 8229 | 969 | 665 | 586 | 10440 | 38583 | 3576 | 2941 | 2276 | 47376 |
| | | | Girls | 8666 | 875 | 600 | 550 | 10691 | 37119 | 3527 | 2963 | 2100 | 45709 |
| | | | Total | 16895 | 1835 | 1265 | 1136 | 21131 | 75702 | 7103 | 5904 | 4376 | 93085 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Year-II | 2001-02 | Enrolment | Boys | 52939 | 43627 | 38499 | 34664 | 169729 | 146574 | 94894 | 84955 | 79096 | 405519 |
| | | | Girls | 50681 | 39648 | 34020 | 28988 | 153337 | 142489 | 94990 | 85016 | 79232 | 401727 |
| | | | Total | 103620 | 83275 | 72519 | 63652 | 323066 | 289063 | 189884 | 169971 | 158328 | 807246 |
| | | Repeaters | Boys | 11985 | 2637 | 2050 | 1877 | 18549 | 36742 | 7657 | 6991 | 5241 | 56631 |
| | | | Gls | 11491 | 2545 | 2237 | 1744 | 18017 | 35317 | 7411 | 6530 | 4849 | 54107 |
| | | | Total | 23476 | 5182 | 4287 | 3621 | 36566 | 72059 | 15068 | 13521 | 10090 | 110738 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year-I-II | Difference | Promotees | Boys | | 40990 | 36449 | 32787 | 37254 | | 87237 | 77964 | 73855 | 82240 |
| | | | Girls | | 37103 | 31783 | 27244 | 32040 | | 87578 | 78486 | 74383 | 81059 |
| | | | Total | | 78098 | 68232 | 60031 | 69294 | | 174816 | 156450 | 148238 | 163299 |
| | | Repeaters | Boys | | 11985 | 2637 | 2050 | 1877 | | 36742 | 7657 | 6991 | 5241 |
| | | | Girls | | 11491 | 2545 | 2237 | 1744 | | 35317 | 7411 | 6530 | 4849 |
| | | | Total | | 23476 | 5182 | 4287 | 3621 | | 72059 | 15068 | 13521 | 10090 |
| | | Dropout | Boys | | 3430 | 1778 | 253 | | | 48627 | 11562 | 12205 | |
| | | | Girls | | 5297 | 1680 | 507 | | | 44316 | 10148 | 10586 | |
| | | | Total | | 8727 | 3458 | 760 | | | 92943 | 21710 | 22791 | |
| Year-I-II | Rates | PR | Boys | | 72 67% | 89.20% | 93.44% | 98.45% | | 50.54% | 80.22% | 79.37% | 97.31% |
| | | | Girls | | 68.85% | 88.27% | 90.85% | 98.31% | | 52 38% | 81.72% | 81.29% | 97.47% |
| | | | Total | | 70 80% | 88 76% | 92.24% | 98.39% | | 51.44% | 80.97% | 80.32% | 97 39% |
| | | RR | Boys | | 21.25% | 6 45% | 5 84% | 4.96% | | 21 29% | 7.88% | 7.51% | 6 20% |
| | | | Girls | | 21.32% | 7.07% | 7 46% | 5.35% | | 21.12% | 7.72% | 7 14% | 5.83% |
| | | | Total | | 21 28% | 6 74% | 6 59% | 5 14% | | 21.21% | 7 80% | 7 33% | 6 02% |
| | | RR | Boys | | 6 08% | 4 35% | 0 72% | | | 28.17% | 11.90% | 13.12% | |
| | | | Girls | | 9 83% | 4 67% | 1 69% | | | 26 50% | 10.57% | 11.57% | |
| | | | Total | | 7 91% | 4 50% | 1 17% | | | 27 35% | 11 24% | 12 35% | |

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজের গুণগত মান ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কাজে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ আবশ্যক— এই নীতি ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। পূর্বে সরকারী পরিকাঠামো ও পরিষেবায় নিযুক্ত উপরতলার আধিকারিকরাই নীতি নির্ধারণ করতেন। জনসাধারণের সরাসরি অংশ গ্রহণের সুযোগ কমই ছিল।

শিক্ষার উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর স্থায়িত্বের লক্ষ্যে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। নইলে উন্নয়নের কাজ রূপায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্য মুখ থুবড়ে পড়বে।

বিগত কয়েক বছর ধরে উন্নয়নমূলক কাজে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের জন্য সরকারি পরিকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা, স্থবিরতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব সত্ত্বেও জনসাধারণের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করা গেছে এবং এই উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে পাথেয়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মূল কথা হলো নিচের স্তরের উপর ক্ষমতা অর্পণ। কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কে বা কোন স্তর কতটা ক্ষমতা পাবেন এবং কে বা কোন স্তর ক্ষমতা কতটা ছাড়বেন, এই টানাপোড়নের মধ্যে সরকারী নীতি স্পষ্ট হওয়া দরকার।[২]

উন্নয়নমূলক কাজে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ নির্ভর করবে সেই কাজের বিষয়ে তাদেরকে জ্ঞাত ও তথ্য সমৃদ্ধ করার উপর। কারণ ঐ কাজ সম্বন্ধে মানুষ অন্ধকারে থাকলে তাদের অংশ গ্রহণ কম হবে। অপর দিকে পরিকাঠামোগত উদ্যোগ সুস্পষ্ট হলে তবেই জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জনসাধারণের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কত বেশী পরিমাণে তথ্য আমরা সকলের সামনে তুলে ধরতে পারছি সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে— (১) সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত দিক থেকে তার স্থান নির্বাচন করা, সরকারী সাহায্যের পরিমাণ, ঘরের মাপ, হিসাব রক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জনসাধারণকে জানাতে হবে। (২) প্রাথমিক স্তরে যে মূল্যায়ণ ব্যবস্থা আছে তার খুঁটিনাটি অভিভাবক/অভিভাবিকাদের জানাতে হবে। (৩) গুণগতমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের হাজিরা, ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি, পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষণে শিক্ষকদের দক্ষতা বিষয়ে অভিভাবক/জনসাধারণের সঙ্গে তথ্য বিনিময় ইত্যাদি।[৩]

উপরিউক্ত বিষয়গুলি যেমন জনসাধারণকে জানানো প্রয়োজন, তেমনি অন্যভাবে দেখলে এগুলি জনসাধারণের অধিকরের মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন আসে আপামর সাধারণের মধ্যে অধিকাব বোধ আছে কিনা? না থাকলে কি কৌশলে তা সৃষ্টি করা যাবে?

জনসাধারণ / অভিভাবকদের জানাতে হলে প্রচারমূলক বা বিজ্ঞাপনমূলক কর্মসূচী নিতে হবে। প্রচারে চারটি গণমাধ্যমই যথেষ্ট—

(১) পারস্পরিক আলোচনা মাধ্যম, (২) বৈদ্যুতিন মাধ্যম, (৩) লোকসংস্কৃতি মাধ্যম, (৪) ছাপার মাধ্যম।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পর্যায়ে DPEP কয়েকটি জেলা নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে একজন ছাত্রের পিতা মন্তব্য করেন তার ছেলে 'ঙ' পেয়েছে এবং সে ভাল ফল করেছে। কারণ ক, খ, গ, ঘ কে ডিঙিয়ে গিয়ে 'ঙ' পেয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে তথ্য চলাচলে অসুবিধা, স্থবিরতা থাকার জন্য এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

গণমাধ্যমের মাধ্যমে যাতে ভুল তথ্য জনগণের কাছে না পৌঁছায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। গণমাধ্যম ছাড়া গ্রাম বা সংসদ ভিত্তিক ব্যবস্থা হলে অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। প্রতিটি গ্রাম সংসদে প্রতিনিধিত্বমূলক মঞ্চ (Forum) তৈরী করতে হবে এবং তাদের হাতে আর্থিক ক্ষমতা, পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের অধিকার দিতে হবে।

আমাদের রাজ্যে সরকারীভাবে গ্রাম সাংসদ, ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম ও ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রথমে ১০টি জেলা ও পরবর্তীকালে আরো ৯টি জেলায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা শুরু হয়েছে।[৮] DPEP, সর্বশিক্ষা অভিযান-র এ কাজ সুচারুভাবে করছে।

প্রতিটি জেলায় 'গ্রাম/ওয়ার্ড' কমিটির হাতে ন্যূনতম আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর বিদ্যালয় পিছু ২০০০ টাকা, TLM বাবদ ৫০০ টাকা (শিক্ষক-শিক্ষণ উপকরণ), গ্রন্থাগারের জন্য অনুদান, গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে কমিটিগুলিকে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে নিম্নের বিষয় গুলিতে— (১) রেজিষ্টারের ভিত্তিতে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে হবে। (২) বিদ্যালয় নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ দেখভাল করতে হবে। (৩) প্রতিটি গ্রাম সংসদে ১-১৪ বছরের শিশুদের নিয়ে রেজিষ্টার বানাতে হবে। (৪) প্রতিবন্ধী সহ তপশিলী জাতি/উপজাতি শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে হবে। (৫) শিক্ষক/ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা সংক্রান্ত বিষয় দেখভাল করতে হবে। (৬) অর্থ সংক্রান্ত

সমস্ত কাজের প্রতি নজর দেওয়া ও তা জনসাধারণ কে অবহিত করা। (৭) গ্রাম/ওয়ার্ড কমিটির সভা নিয়মিত করা। (৯) এলাকা ভিত্তিক প্রচার মূলক কাজ করা।[৫]

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভা কর্তৃক গ্রাম ও ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সদস্য মনোনয়নের সময় কিছু নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি কমিটির সদস্য হয়েছেন। আগামীদিনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে সক্রিয় ব্যক্তিদের সাধারণ সভার মাধ্যমে নির্বাচন করতে হবে এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে কৌশলগত ও পরিকাঠামোগত দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। তবেই প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন সম্ভব।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) District Primary Education Programme-এর Dropout Project এবং Repeater Project এ দীর্ঘদিন Supervisor হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।

২) State Research and Study Cell (PBRPSUS) -র Report-2001-04

৩) Report on Dropouts in the District of South 24-Parganas - 2001-2002.

৪) Study on School Efficiency - July 2001, West Bengal District Primary Education Programme - p. 16.

৫) ইতিহাস অনুসন্ধান-১৮, পৃ. ৩৫৭।

# ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট ও পশ্চিমবঙ্গের লোধা সম্প্রদায়

সুতপা ঘোষ দস্তিদার

পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে বিশেষত অরণ্য অঞ্চলে লোধাদের বাস। লোধা শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত 'লুব্ধক' শব্দ থেকে এসেছে।[১] লুব্ধক কথার অর্থ ব্যাধ। ১৯০১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এরা মূলত এসেছিল মধ্যপ্রদেশ থেকে।[২] মধ্যপ্রদেশে এক শ্রেণীর কৃষিজীবী অধিবাসীর দেখা পাওয়া যায় যাদের বলা হয় 'লোধ' বা 'নোধ' বা 'লোধি'। জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনে এরা বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আদমসুমারী আধিকারীক আন্দাজ করেছিলেন যে রিজলে তার গ্রন্থে যদের শবর বলে উল্লেখ করেছেন এরা তাদেরই স্বজাতি। কিন্তু ময়ূরভঞ্জে লোধাদের শবরদের থেকে উঁচু জাত বলে মনে করা হয়। অনেকক্ষেত্রেই লোধারা নিজেদের শবর বলে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং রামায়ণের শবরীর প্রতীক্ষার কাহিনীটিকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে। লোধারা কোন জাতিভুক্ত তা নিয়ে নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাদের প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। লোধাদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই তবে তাদের কথ্য ভাষায় বাংলা, ওড়িয়া ও মুন্ডারী ভাষার প্রভাব স্পষ্ট।[৩] লোধারা নয়টি গোত্রে বিভক্ত ঃ ভক্তা বা ভুক্তা, কোটাল, নায়েক বা লায়েক, দিগার, পরামাণিক, দণ্ডপাট বা বাঘ, আড়ি বা আহরি এবং ভুঁইয়া। এরা গোত্রের নামে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ (Taboo) মেনে চলে। লোধাদের মধ্যে ভুক্তা গোত্রের জনসংখ্যাই বেশী।জঙ্গলের ধারে লোকালয় থেকে বেশ কিছু দূরে সাধারণত লোধা গ্রাম দেখা যায়। অরণ্যের কোলে বেড়ে ওঠা এই লোধা সম্প্রদায়ের কাছে যুগ যুগ ধরে অরণ্যই জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উৎস। তারা প্রধানত কাঠ কুড়িয়ে, ফল-মূল মধু সংগ্রহ করে বা দিন-মজুরী খেটে দিন কাটায়। ১৯১৬ সালের মে মাসে এই লোধারা Criminal Tribe বা অপরাধ-প্রবণ জাতি বলে চিহ্নিত হয়।[৪] এই একই সালে ৮ই সেপ্টেম্বর লোধাদের ক্রিমিন্যাল রেজিস্টার চালু করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে হত্যা, চুরি ও ডাকাতির

অপরাধে ধৃত লোধা সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের নির্বিচারে সরকারী কর্মচারীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়।

১৮৭১ সালে বৃটিশ সরকার ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ অ্যাক্টের প্রবর্তন করে। এই আইনের সাহায্যে স্থানীয় সরকার যে কোন সম্প্রদায় বা জাতির মানুষকে 'অপরাধ প্রবণ' জাতি বলে চিহ্নিত করার ক্ষমতা লাভ করে। ১৮৭১ সালে এই আইন পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমের রাজ্য সমূহে প্রবর্তিত হয়। ১৮৭৬ সালে এই আইন বাংলার দক্ষিণাংশে প্রচলিত হয়। ১৮৯৭ সালে এই আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্তির কঠোরতা বর্ধিত হয়। ১৯১১তে এই আইনটি সংশোধিত হয় এবং এরপর থেকে অপরাধীদের নাম ও বংশপরিচয় ক্রাইম রেজিস্টারে নথিভুক্ত করে রাখা হয়। ক্রাইম রেজিস্টারে নথিভুক্ত অপরাধী পুলিশের সন্দেহের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমগ্র জীবন দিয়েও সে এবং তার পরিবার অপরাধের কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পেতে বিফল হয়। অপরাধ-প্রবণ জাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি সাধারণ আইনের আওতার বাইরে চলে যায়। তার এলাকায় কোন অপরাধ সংঘটিত হলে কোন বিচারের অপেক্ষা না রেখে কেবলমাত্র সন্দেহের বশে সে অপরাধীর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়। পুলিশের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ তার গতানুগতিক জীবনযাত্রার ধারাকে ব্যাহত করে এবং প্রতিমুহূর্তে সে অপরাধ জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। ১৯২৪ সালে এই আইন সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। স্বাধীনতার পাঁচ বৎসর পর এই আইন রদ করা হয়। এই আইন রদ করার পূর্বমুহূর্তে মেদিনীপুর জেলার মোট অপরাধীর সংখ্যা ছিল ১৬০০ এবং এদের মধ্যে ৫৯১ জন ছিল লোধা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।[৫] এই অপরাধীদের মধ্যে ৮২% ভূমিহীন এবং কিছু সংখ্যক এক বা দুই একর জমির মালিক। এরা প্রায় প্রত্যেকেই অশিক্ষিত এবং নেশাসক্ত। এদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। লোধা যুবকদের এই অপরাধ-প্রবণতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের এক রূঢ় ইতিহাস।

ইতিহাস অনুসন্ধানে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে শিল্প বিপ্লবের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে ব্রিটেনের নিজস্ব বনসম্পদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। স্বভাবতঃই তখন ভারতবর্ষের চির সবুজ বনাঞ্চল বৃটিশ নজর কাড়ে। ভারতবর্ষের বনারণ্যের অপসারণ কেবলমাত্র ভাল কাঠের সরবরাহ নিশ্চিত করেনি অপসৃত বনাঞ্চলে কৃষিজমির বিস্তার বৃটিশ সরকারের তহবিলে কৃষিকর বর্ধিত করেছে। ১৮৫৩র পর রেলপথের বিস্তার বনাঞ্চলের অপসারণ ত্বরান্বিত করে। তবে বেসরকারী হাতে বনাঞ্চলের ক্রমক্ষয় বৃটিশ সরকারকে সচেতন করে তোলে। ১৮৬৪ সালে বৃটিশ

সরকার সরকারী বনবিভাগ (Imperial Forest Department) চালু করে এবং ১৮৬৫-এর ভারতীয় অরণ্য আইনের মাধ্যমে অরণ্যের উপর রাষ্ট্রীয় অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করে। ১৮৭৮-এর ভারতীয় অরণ্য আইন এই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই আইন ভারতবর্ষের বিস্তৃত বনভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করে ঃ সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved Forests), সুরক্ষিত বনাঞ্চল (Protected Forests), গ্রামীণ বনাঞ্চল (Village Forests)। বনাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে অরণ্য নির্ভর অরণ্যবাসী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের অরণ্যের উপর অধিকার খর্ব হতে থাকে। অরণ্যে তাদের অবাধ গতিবিধি ও বনসম্পদ আহরণের অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অরণ্য নির্ভর অর্থনীতিও ভেঙে পড়ে।[৬]

বৃটিশ সরকারের স্বার্থ প্রণোদিত অরণ্য নীতির প্রকোপে লোধা সম্প্রদায়ের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। Ribbentrop দেখিয়েছেন যে বাংলার অরণ্য অঞ্চলগুলি প্রথমে পতিতজমি বা 'waste land' হিসাবে পরিগণিত হয়ে বিভিন্ন জমিদারের জমিদারীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭] ১৮৬০-এর দশকে বাংলার অরণ্য অঞ্চলগুলি বৃটিশ সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে দেখা দেয়। যে সকল অরণ্য অঞ্চল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ছিল তা জমিদারী শাসনের অধীনে রাখা হয়। ১৯০৫-এর মধ্যে বাংলায় ৬০০০ বর্গমাইল অরণ্য অঞ্চল সংরক্ষিত হলেও প্রায় সমপরিমাপের বনাঞ্চল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাখা হয়। এইভাবেই উত্তরবঙ্গের প্রায় সমগ্র বনাঞ্চল এবং পুরুলিয়ার বনাঞ্চলের এক অংশ সংরক্ষিত অরণ্যের আকার নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় থাকায় মেদিনীপুর অঞ্চলের বনাঞ্চল ১৯৪৫-এর প্রাইভেট ফরেষ্ট অ্যাক্টের পূর্বে সংরক্ষিত হয়নি। এই অঞ্চলগুলি জমিদাররা Watson and Co. -এর মত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানীর হাতে ইজারা দেয় এবং তারা ঠিকাদার নিয়োগ করে বনসম্পদের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে এবং একের পর এব বনাঞ্চল উজাড় করে নেয়। বনাঞ্চলের অপসারণ অরণ্য নির্ভর লোধাদের অসহায় করে তোলে। তারা কখনই কৃষি নির্ভর নয়। অরণ্য অপসৃত হওয়ার ফলে জীবিকা নির্বাহের আর কোনও পথ না পেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় তারা হত্যা, চুরি, ডাকাতির অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধ প্রবণ জাতির অভিধা লাভ করে। অবস্থার চাপে পড়ে তারা একের পর এক অপরাধ ঘটায় এবং অবহেলা ও ঘৃণার পাত্র হয়ে তারা সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। জাতিগতভাবে বংশ পরম্পরায় তারা অপরাধের গ্লানি নিয়ে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে।

ভারতীয় সমাজের বংশগত অপরাধীদের দমন করার জন্যই বৃটিশ সরকার ১৮৭১

এর ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ অ্যাক্টের প্রবর্তন করে। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই সমগ্র ইউরোপেই এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়ে যায় যে অপরাধ প্রবণতা একটি বংশগত ধারা যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।[৮] ফ্রান্সিস গ্যালটনের ইউজিন (Eugene) বা ভাল জীনের ধারণা এই বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের সর্বত্র ইউজীনিক সংগঠনগুলি শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের বলপূর্বক নির্বীজিত করে 'অপরাধপ্রবণ জীণ'গুলির বংশগত সঞ্চারণ রোধ করার প্রচেষ্টা করে। নৃবিদ্যা ও নৃবিজ্ঞানের উন্নতি এই ধাবণার প্রসার ঘটায়। ভারতবর্ষে ডালটন, রিজলে প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদরা বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনধারার চর্চা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাদেরকে তথাকথিত সভ্য সমাজের বহির্গত একটি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ পৃথক জগতের অধিবাসী বলে চিত্রিত করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ক্রিমিন্যাল ট্রাইব হিসাবে চিহ্নিত হয়ে লোকসমাজ থেকে আরও দূরে সরে যায়। তবে ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার ধারণায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।[৯] ইংরেজদের মতে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা জিনের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়নি বরং তা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বংশগত বৃত্তির মত গৃহীত হয়েছে। তাই কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ যখন বার বার অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তখন তার সমগ্র সম্প্রদায়কে অপরাধপ্রবণ জাতির আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভারতবর্ষে যেমন বর্ণপ্রথা অনুসারে পুত্র তার পিতার বৃত্তি গ্রহণ করে তেমনই একজন অপরাধীর উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তার পূর্বসূরীর অপরাধপ্রবণ সত্ত্বা ও দুষ্কর্মের ভার তার জীবনভোর বয়ে বেড়ায়। U.P. Criminal Tribes Act Enquiry Committee (1948) -এর রিপোর্টে একথা গ্রথিত আছে যে ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে Stephen নামক বৃটিশ সরকারের একজন প্রতিনিধি মন্তব্য করেছেন[১০] — "Criminal Tribe means a tribe whose ancestors were criminals from time immemorial, who are destined by the usage of caste to commit crime, and whose descendants will be offenders against law until the whole tribe is exterminated or accounted for......" অপরাধপ্রবণ জাতির সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন জীবনভোর অপরাধ জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা ভোগ করে। সমগ্র বৃটিশ শাসনকাল জুড়ে তারা অবহেলিত হয়। এইভাবেই ১৯১৬-এর ৮ই সেপ্টেম্বর ক্রিমিন্যাল রেজিস্টারে নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে লোধা সম্প্রদায়ের মানুষজনের সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে দাড়ায় তাদের অপরাধপ্রবণতা।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার এই আইন রদ করে। বৃটিশ সরকার 'অপরাধপ্রবণ'

লোধা সম্প্রদায়ের উন্নতির বিষয়ে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পরও স্বাধীন ভারতের সরকার তাদের উপর অপরাধপ্রবণ জাতির যে অপবাদ ছিল তা তুলে নিতে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়ে দেয়। অরণ্যের কোলে বেড়ে ওঠা লোধা সম্প্রদায়ের মানুষজন বনসম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। অরণ্যের অপসারণ ও বৃটিশ সরকারের অরণ্যনীতি তাদের জীবিকা নির্বাহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুধার তাড়নায় তারা চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধে লিপ্ত হয়। তাদের পুনর্বাসনের জন্য ভারতীয় সরকার কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়। ভারত সেবা সঙ্ঘের মত কিছু সংগঠন তাদের উন্নয়নে এগিয়ে আসে। খড়গপুরের কাছে বিদিশায় ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৫ সালে লোধাদের উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে আজও লোধারা সমাজের অনুন্নত শ্রেণী বলেই পরিগণিত। লোধা সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজন সহানুভূতিসম্পন্ন কর্মী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সরকারের সুচিন্তিত বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ঃ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, ১৯৭০।

২) বি.সি. এ্যালেন ঃ সেন্সাস্ অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট, ১৯০১।

৩) পি.কে. ভৌমিক ঃ দ্য লোধাস্ অফ ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৬৩।

৪) বেঙ্গল হোম পলিটিকাল ফাইল, জুন, ১৯১৬।

৫) প্রবোধ কুমার ভৌমিক ঃ দ্য লোধাস্ অফ ওয়েস্টবেঙ্গল-১৯৬৩।

৬) রামচন্দ্র গুহ ঃ ফরেস্ট্রি ইন ব্রিটিশ এ্যান্ড পোস্ট ব্রিটিশ ইন্ডিয়া - ১৯৮৩।

৭) রিবেনট্রপ ঃ ফরেস্ট্রি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া - ১৯০০।

৮) ক্লাইভ এমস্‌লি ঃ ক্রাইম অ্যান্ড সোসাইটি ইন ইংল্যান্ড - ১৯৮৭।

৯) মীনা রাধাকৃষ্ণ ঃ ডিসঅনার্ড বাই হিস্ট্রি ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ অ্যান্ড ব্রিটিশ কলোনিয়াল পলিসি - ২০০১।

১০) রিপোর্ট অফ্ ক্রিমিন্যাল ট্রাইব এনকোয়ারী কমিটি, ইউ.পি. - ১৯৪৮।

# কলকাতার নগরায়নের বিভিন্ন স্রোত ঃ একটি সমীক্ষা

শুভদীপ মজুমদার

সম্রাট আকবরের 'সুবা-ই-বাঙ্গালা" (১৫৭৬-৮২), ঔরঙ্গজেবের "স্বর্গের দেশ" অথবা রিয়াস-উস্-সালাতিনের লেখকের "জীন্নাত-উল-বিলাদ"— যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, 'বাংলা' বহু বিচিত্র বিশেষণে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণটি খুবই স্পষ্ট, বাংলার অন্তর্নিহিত স্তরেই তার নগরায়নের বীজ ছিল, যা ইতিহাসের আলোয় ক্রমশ আলোকিত হয়ে আধুনিক কালে নগরায়নের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সাতগাঁও,[১] হুগলী ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একসময় বাংলায় মোগলদের প্রধান বন্দর হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই বন্দরই ভবিষ্যতের কলকাতার ভিত গড়ে দেয় অনেকাংশে। বাংলার বাণিজ্য ইতিহাসের সূত্র যদিও সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়, সপ্তম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত বাংলার প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। তার বহু পরে ১২০৪ সালে সাওগাঁও (সপ্তগ্রাম) খ্যাতি লাভ করে। এর পরবর্তীকালে পর্তুগীজদের হাতে জন্ম হয় হুগলীর,[৩] যা বাংলাকে সমগ্ররূপে এক পূর্ণতা দেয়। ১৫৭৯ সালে হুগলীর পত্তনের পর একে একে আসে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজরা।[৪] হুগলীর উত্থান ও উন্নতির মাঝেই, নগরায়নের উপাদান যথার্থ প্রকাশ পায় - যার যোগ্য উত্তরসুরি কলকাতা।[৫]

"গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদের পর ষষ্ঠ রাজধানী (বাংলা) কলকাতা। হুগলীর পতনের পর বসাকের চারটি পরিবার ও শেঠদের একটি পরিবার নদীপথ ধরে নীচে নেমে এসে পূর্বপাড়ে 'গোবিন্দপুর' গ্রামের জন্ম ঘটায়, (শেঠদের দেবতা গোবিন্দজীর নাম থেকেই 'গোবিন্দপুর' নামের উৎস)। উত্তরে তারা 'সুতানুটি হাট' বসায় তুলা বিক্রীর জন্য, এবং গোবিন্দপুর ও সুতানুটির মাঝেই গড়ে ওঠে আর একটি গ্রাম, কলিকাতা।

সি.আর. উইলসনের মতে পূর্বে চিৎপুর, কালীঘাট এবং পশ্চিমে সালকিয়া এবং বেতোড়ও ব্রিটিশ কোম্পানির ঘাঁটি হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় যদিও একথা প্রমাণিত যে কলকাতার কোনো নির্দিষ্ট জন্মদিন নেই, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ২৪ আগষ্ট ১৬৯০তে, কলকাতা প্রথম ব্রিটিশদের দখলে আসে। ক্রমে ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার (সুতানুটির) শেঠ ও বসাক পরিবারেরও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১২] জোব চার্নক হিজ্‌লী, উলুবেড়িয়ায় অসফল হয়ে কলকাতায় এসে এ অঞ্চলের বাণিজ্য সম্ভাবনা দেখে রীতিমত চমকিত হন। অবশেষে এখানেই তিনি স্থায়ী হন।

চার্নকের ১৬৯০ সালে প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাকে তাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র করা। সুতানুটি, সে সময় তুলার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৬৮৬, ১৬৮৮ সালে দুইবার চার্নক সুতানুটি দখলও করেন, এর সাথেই ১৬৮৮ সালে চার্নক, চার্লস আয়ার এবং রজার ব্র্যাডীলের কাছ থেকে চিঠি পান ইব্রাহিম খানকে প্রাসাদ নির্মাণের অনুমতির জন্য।

সাম্প্রতিক গবেষণায়, একথাও জানা যায় যে ইংরেজদের আগে, বেহালা-বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবারের দখলেই ছিল গোবিন্দপুর—সুতানুটি—কলিকাতা—এই তিনটি গ্রাম, যা পরে চালর্স আয়ার মাত্র ১৩০০ টাকা ও ১৮৭৫ কাঠা জমির পরিবর্তে কিনে নেন।

এরকম মালিকানা হস্তান্তরের উদাহরণ আরো বহু পাওয়া যায় কলকাতার ইতিহাসে। ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণের জন্য যখন ১৭৫৭ সালে বিশাল জায়গা জুড়ে জঙ্গল কেটে বাসযোগ্য জমি গড়ে তোলা হয় তখন ইংরেজদেরও, শোভাবাজারের দেবদের, পাথুরিয়াঘাটা-জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের, খিদিরপুরের ভূকৈলাসদের থাকার জন্য জমি দিতে হয়।[১৩] এভাবেই ইউরোপিয়ানরা ক্রমশ শহরের সঙ্গে ছেয়ে যায় শহরতলিতেও। এভাবেই চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, রস-পাগলা (টালিগঞ্জ), গার্ডেনরীচ, চিৎপুরের মত বড় গ্রাম খ্যাতি লাভ করে এবং শহরের সীমানাও বাড়তে থাকে।

এখানে 'কলকাতা' নামের উৎপত্তির বিভিন্ন দিক ও মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। অতি স্বাভাবিক মতামত বা সময়ের সাথে কথোপকথন ও উচ্চারণের বদলের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে তা হল 'কাল-কাটা' থেকে 'কলকাতা'। 'কলকাতা' শব্দের উৎপত্তি আবার প্রাচীন 'কিলকিলা' (অথবা ২১ পরগণা) থেকেও আসতে পারে। একথা বিশ্বাসযোগ্য যে কলকাতা ক্রমশ গড়ে উঠেছিল পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে সরস্বতী এবং হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, ভাটপাড়া, খড়দহ, শিয়ালদহ, গোবিন্দপুর ইত্যাদি শহর ও গ্রাম নিয়ে। 'আইন-ই-আকবরীতেও' রাজা তোডরমলের খাজনা তালিকায়

কলকাতার নাম পাওয়া যায়। এছাড়া আরো যে কটি উৎসের কথা জানা যায়, তাহল 'কল-কা-হাতা' ('কল'দের বাসস্থান), 'কালি-কাতা' (মা কালীর গৃহ) এবং কালীঘাটা, অথবা 'খাল-কাঁটা' থেকে 'কলকাতা'।

কলকাতার নগরায়ন ক্রমশ রূপ বদল করছিল। 'Writer's Building Archive' থেকে আমরা জানতে পারি শহরের নগরভিত্তিক পরিবর্তন—

| বছর | বড়গলি | গলি | ছোটগলি |
|---|---|---|---|
| ১৭০৬ | ২ | ২ | ০ |
| ১৭৪২ | ১৬ | ৪৬ | ৭৪ |
| ১৭৫৬ | ২৭ | ৫২ | ৭৪ |

বাসস্থানভিত্তিক পরিবর্তনে—

| বছর | পাকাবাড়ি | কাঁচাবাড়ি |
|---|---|---|
| ১৭০৬ | ৮ | ৮,০০০ |
| ১৭৪২ | ১২১ | ১৪,৭৪৭ |
| ১৭৫৬ | ৪৯৮ | ১৪,৪৫০ |

কলকাতা ক্রমশ হয়ে উঠছিল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় রপ্তানি তালিকা (বার্ষিক) দেখলেই বোঝা যায়—

| বছর | পরিমান (£) |
|---|---|
| ১৬৮৪/৮৫ | ২১০,০৬৩ |
| ১৭০০/০১ | ২৮০,৬৭২ |
| ১৭১৯/২০ | ৩৩৬,৯৭৩ |

কলকাতার নগরায়ন তাই এই সামগ্রিক পরিবর্তন থেকে আমরা মোটামুটি ধরতে পারি।

নগরায়নের যে বিভিন্ন স্রোত কলকাতার ক্ষেত্রে আমাদের চোখে পড়ে তা হল—

(১) কলকাতার নগরায়ন অনেকাংশেই শর্মা-যাদব তত্ত্বের সমান্তরালেই চলে। বৈদেশিক বাণিজ্যই নগরের সূচনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

(২) কলকাতা তথা বাংলার নগরায়ন— ডব, পিরেন প্রবর্তিত বাণিজ্যের প্রসার ও সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়— এই তত্ত্বের অন্তর্গত নয়।

(৩) সুলতানি যুগে ইক্তা প্রথা চালু হওয়ার পর যে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন বাড়াতে— নগরায়নের সূচনা — যা মহম্মদ হাবিবের মতে 'দ্বিতীয় নগর বিপ্লব' — সেই সূত্রও কলকাতা তথা বাংলার ক্ষেত্রে বহুলাংশেই প্রয়োজ্য নয়।

(৪) অধ্যাপক ইরফান হাবিব এই মতকে কিছুটা পরিবর্তিত করে বলেছেন, শাসক শ্রেণীর শোষণের ফলে কৃষি সম্পর্কের নবগঠন ও বড় শহরের সঙ্গে ছোট শহরের জন্ম—ইক্তাভিত্তিক এই তত্ত্বটিও কলকাতার নগরায়নের ক্ষেত্রে মানা যায় না।

বরং পরিশিষ্টে এ কথা বলা যায়—

(১) কলকাতার উত্থান এবং নগরায়ন প্রধানত বাণিজ্যের জন্যই।[১৫/১৬] এই সুগঠিত বাণিজ্যের উপরই পরবর্তীকালে ইংরেজদের বাংলা জয়ের সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয়।

(২) ঐতিহাসিক আর.এম.ইটন (Eaton)[৯] বাণিজ্য ছাড়াও, বাংলায় গঙ্গা নদী ও শাখা-নদী, ভাগীরথী-হুগলী ও পদ্মা নদীর আবহমান বয়ে চলাকে কলকাতা তথা বাংলার নগরায়নের একটি মুখ্য কারণ হিসেবে বলেছেন। নবদ্বীপ, কাটোয়া, ত্রিবেণী, কালীঘাট, গঙ্গাসাগর— প্রভৃতি স্থানগুলো কিছুটা নগরায়ন ও কিছুটা নদীর জন্যই হিন্দুধর্মের পবিত্র পীঠস্থান হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছে।

(৩) সপ্তগ্রাম, হুগলীর ভিতেই কলকাতার জন্ম। তাই কলকাতা যথার্থরূপে নগরায়নের Legacy কে বয়ে নিয়ে চলেছে।

সপ্তগ্রাম, হুগলীর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নদীর সরে যাওয়া ও পলি পড়ে পড়ে স্রোত শ্লথ হয়ে যাওয়া। বর্তমানে, কলকাতার হুগলী নদীরও সেই একই অবস্থা। প্রশ্ন এই, কলকাতার 'Cosmopolitanism' এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে পারবে কিনা? কলকাতার কাছাকাছি নতুন বন্দর গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, হলদিয়া গড়ে উঠেছে। কলকাতার নগরায়ন আজও চলছে কলকাতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই। ভবিষ্যতে আশঙ্কা থাকলেও, আশাবাদী হওয়াই যায়। কারণ সপ্তগ্রাম, হুগলীর স্রোতে যে স্রোত মিশে কলকাতার জন্ম হয়েছে, তা আজ নগরভিত্তিক পরিচয় ছাড়িয়ে লাভ করেছে 'আন্তর্জাতিকতা', (Internationalism) কলকাতার নগরায়নের সার্থকতা এখানেই।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) Rakhaldas Bandopadhyay - 'Saptagram or Satgaon' in Journal of the Asiatic Society, Bengal, 1909, Vol.-V, Pt.I, NS, No. 7, pp. 245 ff.

২) B.D. Chattopadhyay - 'Urban Centres in Early Bengal' - Archaeological Perspectives in Pratna - Samiksha, 1993-94, Vol.-2-3, pp.- 169-192.

৩) Sushil Choudhury, 'The Rise and Decline of Hugli' in Bengal Past and Present, Vol. - LXXXVI, Pt.I, Serial No. 161, Jan-June 1967, pp. 33-67.

৪) 'A Historical Survey' in Irfan Habib (ed.) Essays in Indian History, New Delhi, 1995 (reprint).

৫) Abul Fazal - Ain-i-Akbari (tr. by H.S. Jarett and ed. by Jadunath Sarkar) - 3 Vols, Delhi, 1978 (reprint).

৬) R.C. Majumdar (ed.) - The History of Bengal, Vol. I, Dacca University, 1963.

৭) R.M. Eaton - The rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, Oxford India Paperbacks, 1997, pp. 18-20.

৮) অনিরুদ্ধ রায় - মধ্যযুগের ভারতীয় শহর - ১৯৯৯ - আনন্দ পাবলিশার্স পৃ. ১১৮, ১২১, ১৩৯-১৪০।

৯) নীহাররঞ্জন রায় - বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব, ১৯৯৩ (reprint) প্রথম সংস্করণ - ১৯৪৯।

১০) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী - চণ্ডীমঙ্গল, কলকাতা-১৯৯২ (reprint)

১১) রাধারমণ মিত্র - কলিকাতা দর্পণ ১৯৯০, পৃ. ৩০-৩৫, ১৮-২৫, ৫০-৬৫, ৭০-৭১, ৮০-৮১, ৩৬-৩৭।

১২) Sukanta Chaudhurı (ed) - Calcutta - The living city (2 Vols. - 1990)

১৩) রীণা ভাদুড়ি - মধ্যযুগে বাংলার নগর বিন্যাসের ধারা - সুলতানি আমল ( অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চ্যাটার্জী সম্পাদিত) পৃ. ৩১-৬০, ১৯৯২, কলকাতা।

১৪) R.C. Majumdar (ed.) The History of Bengal, Vol. I, Dacca University, 1963.

১৫) Simon Digby - 'The Maritime Trade of India, in Tapan Roy Choudhury and Irfan Habib (ed.) - The Cambridge Economic History of India (Vol. I), 1984, p. 125-162.

১৬) H.K. Naqvi - Agricultural, Industrial and Urban Dynamism under the Sultans of Delhi - 1986.

## সারাংশ

# উনবিংশ-বিংশ শতকের কোলকাতার মেসজীবনের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অমিয় কুমার বাউল

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাৎপট এই ব্রিটিশ যুগ। Discovery of India গ্রন্থে নেহেরু বলেছেন, "Nearly all our problems today have grown up during British rule and as a direct result of British policy".

ব্রিটিশ শাসনকালে স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য তৎকালীন সময়ে রাজধানী শহর কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে মেস বা বোর্ডিং ব্যবস্থা নিঃশব্দে গড়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইসব বোর্ডিং বা মেসগুলি পরিচালনা করত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা — দেশকে ব্রিটিশ শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করাই ছিল যাদের মহান আদর্শ।

ব্রিটিশ শাসনকালে কোথায় প্রথম মেস বা বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য তখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে একথা ঠিক যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে পরিচালিত হচ্ছিল, ঠিক সেইসময়ে মেস বা বোর্ডিং ব্যবস্থা প্রসর লাভ করে। অতিসহজে পুলিশ প্রবেশ করতে পারত না। বিপ্লবীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনায়াসে মেসগুলি থেকে পালিয়ে যেতে পারত।

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল - এই দুটি বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যাদের সিংহভাগই মেসে থাকত। মেসে আত্মগোপন করে থাকায় এই দলের সদস্যারা অতিসহজে লেঃ গভর্নর ব্যাসফিল্ড ফুলার ও বাংলার গভর্ণর স্যার এ্যান্ড্রু ফ্রেজার কে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ কলকাতার বিভিন্ন মেসের মধ্যে বিপ্লবী কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করতেন। ব্রিটিশ সরকার আলিপুর বোমার মামলায় যে সমস্ত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের বেশীরভাগ আস্তানা ছিল কোনো না কোনো মেসে। ইংরেজ সরকার ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের দমন করার জন্য কলকাতার এইসব মেসগুলিতে হানা দিত।

উনবিংশ শতকে পাশ্চত্যশিক্ষার বিস্তারলাভ ঘটতে থাকায় তৎকালীন ছাত্রসমাজ কলকাতার মেস্‌গুলিতে থেকে শিক্ষালাভ করত। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরী ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু ছাত্র তাঁর ইয়ংবেঙ্গল দলে নাম লেখান। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীরা মধ্যকলকাতার মেসগুলিতে থেকে পড়াশোনা চালাত।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় কংগ্রেসে অনেক সক্রিয় সদস্য মধ্যকলকাতার মেসগুলিতে বসবাস করত এবং কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করত।

উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ, স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, হিন্দুমেলা, ভারতসভা, ইয়ংবেঙ্গল দল প্রভৃতি বিষয়ে কলকাতার মেসজীবনকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রণিত করেছিল। দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে এই মেসগুলির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মেসগুলি কোনো বাণিজ্যিক লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হত না, স্বদেশ প্রেম ছিল এই সময়ের মেসমালিকদের মূলমন্ত্র। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মেসজীবনের ইতিহাস আজও ব্রাত্য বিষয়।

# বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

**স্বদেশরঞ্জন মণ্ডল**

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ভূমিকা ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ণ একান্ত প্রাসঙ্গিক বলে এই সন্দর্ভে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে বীরেন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনের স্পষ্ট ছবি এখনো তুলে ধরা যায়নি। জেলে বসে তাঁর লেখা 'স্রোতের তৃণ' বা 'স্বরাজ আশ্রমে আটমাস'[১] তাঁর পরিণত বয়সের লেখা। এই গ্রন্থটি অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হয় নি। স্বাভাবিক কারণে বাঙালী ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় এই গ্রন্থটির স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আবার কোন বাঙালী ঐতিহাসিক বা গবেষক এই গ্রন্থটি মন দিয়ে পড়েছেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁরা প্রধানত পড়েছেন প্রমথনাথ পালের 'দেশপ্রাণ শাসমল' গ্রন্থটি। দেশপ্রাণের জীবনী বা দেশপ্রাণের উপর যাঁরা আলোকপাত করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রহ্লাদ প্রামাণিক, মন্মথনাথ দাস, ড. শচীন কুমার মাইতি, ড. প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি, বসন্ত কুমার দাস, হিতেশ রঞ্জন সান্যাল প্রমুখ সকলেই প্রমথনাথ পালের 'দেশপ্রাণ শাসমল'-কেই অনুসরণ করেছেন। তাই প্রমথ নাথ পালের গ্রন্থে যে ত্রুটি থেকে গেছে সেই ত্রুটি অন্যদের লেখায়ও সংক্রামিত হয়েছে। এই যেমন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনে দেশপ্রাণের ভূমিকার কথা যথাযথভাবে লিখিত হয়নি। ধরেই নেওয়া হচ্ছে ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর দেশপ্রাণ শাসমল এই বাঙলায় ছিলেন। প্রমথনাথ পালের গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে— '১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করিতে আরম্ভ করেন।'[২] ড. শচীন কুমার মাইতির গ্রন্থে,[৩] ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার মাইতির গ্রন্থে,[৪] হিতেশ রঞ্জন সান্যালের গ্রন্থে,[৫] এঁরা সকলেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দকেই তাঁর লন্ডন থেকে দেশে ফিরে আসার সময় চিহ্নিত করেছেন। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল লিখেছেন - '১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তবে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল প্রধানত মেদিনীপুর শহর ও কোলকাতা কেন্দ্রিক'।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে হলে যে ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে এদেশে থাকতেই হবে তার কোনো মানে নেই। তাছাড়া, এটা যেহেতু একদিনের আন্দোলন নয় এবং যেহেতু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এই বঙ্গবিভাগ রদ হয়েছিল— তাই সেই সময় পর্যন্ত বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনের সময়কাল নির্দ্ধারিণ করা যেতে পারে। ড. সুমিত সরকারের 'বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন' ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত টানা হয়েছে। তিনি অবশ্যই সঙ্গত কারণে এই সময়ের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে টেনে আনেননি। তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে তিনি লিখেছেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী বিক্ষোভের কথা। ''মেদিনীপুরের সংখ্যাগুরু প্রধানত মাহিষ্য স্বত্বভোগীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২১-এ খুব ফলদায়ী করবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এর ফলে সরকার জেলা থেকে নতুন নিয়ম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।[৬] ড. রজত কান্ত রায়[৭] বা ড. বিদ্যুৎ চক্রবর্তী-র[৮] মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের ভূমিকার ব্যাপারে এঁরা সঙ্গত কারণেই নীরব। বসন্ত কুমার দাস, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত 'মেদিনীপুরের বিপ্লবী ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, কাঁথিতে ধন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার বয়ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য একদিনের উপার্জ্জন দানের প্রস্তাব বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও মুন্সী মহিউদ্দিন কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়েছিল।[৯] ক্ষুদিরাম ও এগরা মেলার ঘটনা প্রসঙ্গে রামনগর থানার কালিন্দি, বালিসাই, দেউলীহাট প্রভৃতি কেন্দ্রে স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী বর্জন খুব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এই থানাতে শাসমল মহাশয়ের জমিদারী থাকায় বীরেন্দ্রনাথ তাঁদের পরিবারের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে মাঝে মাঝে গিয়ে স্বদেশী প্রচারের কাজ করতেন। কৈলাশচন্দ্র মাইতি, যদুনাথ শাসমল, বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত দেউলীহাটের জনসভায় যোগদান করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন।[১০] মোট কথা, বীরেন্দ্র নাথ 'সক্রিয়ভাবে স্বদেশী অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন' .....। 'এঁদের চেষ্টায় কাঁথি বাজারে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি 'ছাত্র ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল'[১১] মেদিনীপুরে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ১৯০৭ সালের ২১শে এপ্রিল স্থানীয় বেলী হলে একটা জনসভার অধিবেশন হয়। আহ্বানকারীদের মধ্যে দেবদাস বাবুর নাম ছিল। এবং অনেকের সঙ্গে ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল দেবদাসবাবুর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। দুই দলের মধ্যে বিরোধ ও মতান্তর ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। ৩রা অক্টোবর বেলী হলে একটি সভা হল। সুরেন্দ্রনাথকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিপুল অভার্থনা জানানো হল। বেলীহলের মিটিং-এ স্থির হল যে আগামী ৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে জেলা সম্মেলনীর অধিবেশন হবে। সেই জন্য একটি

কার্য্য নির্বাহ সমিতি গঠিত হল। এর জন্য বি.এন. শাসমল একজন অন্যতম সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। বিরোধ আপাতত মিটে গেলেও নবীন ও প্রবীণ-এর মধ্যে নীতিগত পার্থক্য দূর হল না। বরং আরও বাড়তে লাগল। পরে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দল বলে যা খ্যাতি লাভ করেছিল তার অঙ্কুর মেদিনীপুর জেলা সম্মিলনীতে উদ্ভুত হল।[১১]

বাঙলায় বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলায় কোন কোন স্থানে এই আন্দোলন শক্তিশালী ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং কোন কোন নেতৃবর্গ এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এই সর্ন্দভে সেই সব আলোচনায় যাওয়ার অভিপ্রায় আমার নেই। কাঁথি থেকে তখন 'নীহার' সাপ্তহিক পত্রিকা এবং তমলুক থেকে 'তমালিকা' পত্রিকা (১৯০৩-১৯০৮ পর্যন্ত) নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হত। দুঃখের বিষয় আমি এই সময়ের 'নীহার' পত্রিকার কোন কপি এখনও খুঁজে পাইনি। আমার নিজের স্থির বিশ্বাস বীরেন্দ্রনাথ কবে বিলেত থেকে এদেশে ফিরে এলেন সে সংবাদ অবশ্যই এখানে আছে। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে অবশ্যই বীরেন্দ্রনাথ শাসমল স্বদেশে ফিরে এসেছেন। এবং সেটা কোন সময় তা নির্ধারিণ করা প্রয়োজন এবং অন্ততঃ মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলনের প্রকৃতি তখন কেমন ছিল এবং বীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিবা কি ছিল তা একান্তই প্রাসঙ্গিক।

প্রথমে এব্যাপারে সময় নির্দ্ধারিণের ক্ষেত্রে তাঁর ইংলণ্ডে পড়াশোনা ও ব্যবহারজীবী হিসাবে কার্যকালের যে সময় জানতে পারা যাচ্ছে তা উল্লেখ করছি। ইংলণ্ডে প্রাপ্ত তাঁর সার্টিফিকেট থেকে জানতে পারা যায় যে, ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় তিনি তখনকার মিড্ল টেম্পল-এর ছাত্র ছিলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই পর্যন্ত। আর ঐ বছরের ৬ই জুলাই তারিখে ট্রিনিটি সিটিংস্-এ কিংস্ বেঞ্চ ডিভিশনে হাইকোর্টের বিচার বিভাগে ব্যারিষ্টার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেন।[১২] সেখানে যে তিনি ব্যবহারজীবী হিসাবে কাজ করেছিলেন সে খবর আমরা বিভিন্ন সূত্রে জেনেছি। ইতিমধ্যে বীরেন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য বিলেতে থেকে আমেরিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন— তার বর্ণনাও 'স্রোতের তৃণ' গ্রন্থে দিয়েছেন এবং প্রমথপাল-এর গ্রন্থে তার পুর্নউল্লেখ আছে। এরপর বীরেন্দ্রনাথ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং জাপান পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। খুব সহজেই বোঝা যায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে তাঁর বেশ সময় লেগেছে এবং আমার মনে হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফেরেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের একেবারে অন্তিম লগ্নে হলেও হতে পারে। তবে কোন ক্ষেত্রেই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নয়। ইতিমধ্যে নীহার পত্রিকা খুঁজে খুঁজে জানতে পারলাম ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ তারিখের পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগত হইয়াছেন। বস্তুতপক্ষে ভুলটা করে গেছেন প্রমথনাথ পাল ১৯০৪ খৃঃ ভারতে প্রত্যাগমনের কথা উল্লেখ করে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে এবং মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে তা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। লর্ড কার্জন প্রশাসনিক অসুবিধার কারণ দেখালেও বস্তুতপক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীতে ক্রমাগত বেশী সোচ্চার হয়ে ওঠা রোধ করার জন্য এযাবৎ সরকার কর্তৃক অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়কে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন। মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ লিখেছেন, 'এই দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের সব কয়টি জিলা, দার্জিলিং জিলাকে বাদ দিয়ে সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং চীফ কমিশনার শাসিত আসামকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছোট নাগপুর ও ওড়িশাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল বঙ্গদেশ। আসাম প্রদেশ যখন বহু পূর্বে গঠিত হচ্ছিল তখন তার লোক সংখ্যা বড় কম ছিল বলে বাঙলা দেশ হতে বাঙলাভাষী সিলেট, কাছাড় এবং রংপুর জিলার একটি অংশ কেটে নিয়ে আসামে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে যে বঙ্গদেশ থেকে গেল তাতে বঙ্গভাষী লোকেরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যত হয়ে দাঁড়াল বঙ্গ-সংস্কৃতিরও ব্যবচ্ছেদ। তাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেল যে তাতে সমগ্র ভারতবর্ষ কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠল উভয় বাঙলায়। পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানাল। পূর্ববঙ্গে তাঁরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে পড়ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বড় বড় হিন্দু জমিদাররা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার এটাও এটা কারণ ছিল। জমিদাররা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে মুসলিম কৃষক-প্রজা প্রধান পূর্ববঙ্গে না জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে যায়।[১৩]

মহারাজ নামে খ্যাত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী একজন বিখ্যাত বিপ্লবী তাঁর গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের চারজন বড় জমিদারের কথা উল্লেখ করেছেন— যাঁরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এঁরা হলেন— রাজশাহীর জমিদার সুরেন্দ্রমোহন সেন, ময়মনসিং-এর গোলকপুরের জমিদার কুমার উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, ময়মনসিং-এর মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এবং ময়মনসিং-এর হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।[১৪] পূর্ববঙ্গে বিত্তবান জমিদাররা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। বিভক্ত বঙ্গে

নিজেদের সংখ্যালঘু বনে যাওয়টা সামাজিক রাজনৈতিক দিক থেকে অসুবিধা জনক বিবেচনা করে তাঁরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মদত জুগিয়েছেন।

ড. বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী উল্লেখ করেছেন মেদিনীপুরে চারটি আখড়া— শক্তি সমিতি, স্বদেশী সমিতি, সন্তান সমিতি ও বসন্তমালতী ছাড়াও মহিষাদল, তমলুক ও কাঁথিতে তিনটি আখড়া (সন্ত্রাসবাদী) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং এই আখড়ার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল মেদিনীপুরের দুই প্রধান জমিদার— নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন এবং মুগবেড়িয়ার জমিদার দিগম্বর নন্দের আর্থিক সাহায্য।[১৫] খাঁন এবং নন্দ দু'জনেই বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী বলে ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহভাজন ছিলেন। নাড়াজোলের রাজা হেমচন্দ্র দাশ কানুনগোকে প্যারিসে বোমা তৈরী শেখার জন্য এবং দিগম্বর নন্দ তাঁর জমিদারীর এক অংশে সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র শেখার জন্য অর্থ সাহায্য করতেন।[১৬] ওয়েস্টন নরেন্দ্রলাল খাঁনকে বিব্রত ও বিদ্রুপ করার চেষ্টা করে গেছেন। খাঁনের আচরণ খুব খারাপ ছিল, বুদ্ধিও কম ছিল এবং তিনি গাঁজাখোর ছিলেন। তিনি স্বদেশী দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর অঞ্চলে তাঁকে প্রায়ই বিব্রত করার অভিযোগ পেতেন।[১৭]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা তুলে ধরা যেতে পারে। 'রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা। সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট ব্যাপারটাকে এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া ছিলাম, যে কোন প্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশি মাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে বঙ্গ বিভাগের যে পরিমাণ আশংকা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়া ছিলাম, সেই পরিমাণকেই অগ্রসর হইতে আময়া সহায়তা করিলাম। আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণ-এর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা বিচার মাত্র না করিয়া, বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার সাধনের কাছে আর কোনো ভালো-মন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না।...... আমরা নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়া ছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।...... এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরাজী সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল— এ কী ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথা বাথা হইল কেন? বস্তুতই তাহাদের জন্যই আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো এক মুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, 'দেশি

কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে' এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।''[১৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্যিক কল্পনা নিয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বাঙালী বাবুদের অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। এর জাজ্বল্যমাণ প্রমাণ আমরা পাব যখন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব সংশোধনী আইন প্রনয়ণ কালে ল্যাণ্ড লর্ড ফি (কোন প্রজা জমি বিক্রয় করলে বিক্রয় লব্ধ পণ মূল্যের এক চর্তুথাংশ জমিদারকে দেবে— পুরোনো প্রজার নাম খারিজ ও নতুন প্রজার নাম সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডটির মালিক হিসাবে নথিভুক্ত করার জন্য) সংক্রান্ত প্রস্তাব কংগ্রেসীগণ সোৎসাহে অনুমোদন করেছিলেন। এই আইনে প্রজা এবং কৃষকের উপর অবাধ শোষণের অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল। এই উপলক্ষে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ আইন সভার কংগ্রেসী সদস্যদের তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করেছিলেন— প্রজার স্বার্থ হানী করে জমিদারদের স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য। নিজে জমিদার হয়েও তিনি এই কাজটি করেছিলে। এই আইন পাশ করার সময় সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি বাঙলার কংগ্রেস নেতারা বাঙলা গর্ভমেন্টের সঙ্গে বিয়াল্লিশ বার ভোট দিয়েছিলেন।[১৯] তাছাড়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ফজলুল হকের মন্ত্রী সভা যখন ঋণ-খালাসী আইন প্রনয়ণ করেন তখন কংগ্রেস পক্ষের আইন সভার সদস্যরা দাঁতে দাঁত দিয়ে এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন জমিদার ও তেজারতি মহাজনদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। উভয় ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কৃষক শ্রমিকের দৈনন্দিন সমস্যাকে কী চোখে দেখতেন।

আর বীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তথাকথিত শোষিত কৃষক শ্রমিকের পাশে তিনি বরাবরই ছিলেন। এদের নিয়েই তিনি পরবর্তীকালে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন নিজের জেলায় সফল করে তুলেছিলেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চেষ্টায়, কংগ্রেসের সাহায্যে নয় বরং কংগ্রেস যে প্রতিকূলতার চেষ্টা করেছিলেন, বরিশাল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে পরবর্ত্তী কলকাতার বিশেষ অধিবেশনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে, এমনকি নাগপুরের অধিবেশনে যা স্পষ্ট করে তোলা হয়নি—সে সব কথা তিনি 'স্রোতের তৃণ'-তে উল্লেখ করতে ভোলেননি।[২০] মেদিনীপুর জেলা থেকে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারটা কতটা স্থানিক বা বৃহত্তর চরিত্রের ছিল এখানে তা আলোচনা করার অবকাশ নেই।

বীরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় দুই-দুইবার মেদিনীপুর জেলাকে বিভক্ত করে এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ওড়িষার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা ইংরেজ সরকার করেছিল প্রধানত এই জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য। ওড়িষার কিছু লোক এই উদ্যোগকে সমর্থন যুগিয়েছেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের জনসাধারণের মধ্যে

ধারাবাহিক প্রচার অভিযান চালিয়ে মেদিনীপুরকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত রাখার সপক্ষে বলিষ্ঠ জনমত গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের প্রথম পর্ব এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তবু বীরেন্দ্রনাথ জেলা বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে নিজের অংশ গ্রহণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ বলে গণ্য করেননি। 'স্রোতের তৃণ' গ্রন্থে এই ঘটনার কথা তিনি উল্লেখই করেননি।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেশপ্রাণের অংশ গ্রহণের যে কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে সেই কাহিনীগুলোর অনুকূলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমি এ যাবৎ সংগ্রহ করতে পারিনি। বিলেত যাওয়ার আগে ১৯০১ সালে মেদিনীপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি যোগদান করেছিলেন। ১৯০৭ সালের ৭ই ডিসেম্বরে মেদিনীপুরের কংগ্রেস অধিবেশনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ড. এস. কে. মাইতি[২১] এবং প্রমথ নাথ পাল[২২] ১৯০৬ সালের মেদিনীপুরের এই অধিবেশনের যে কথা লিখেছিলেন তা সঠিক নয়। যোগেশ চন্দ্র বসু-র[২৩] কথাই ঠিক। যাই হোক এই দু'টি অধিবেশনে তাঁর যোগদানের কথা মনে রাখলে বলা যায় যে তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল তখন তিনি এদেশে ছিলেন না। যখন ফিরে এলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চলছে। আন্দোলনকারীদের একাংশ সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে চলেছে। নরম ও চরমপন্থীদের বিভেদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সুরাটের তাপ্তি নদীর তীরে দেশপ্রেমীদের মধ্যে যে লড়াই ঘটতে চলেছে তার পূর্বাভাস মেদিনীপুরের কংসাবতী নদীর তীরে পৌঁছে গেছে। বীরেন্দ্রনাথ নিজেই সন্ত্রাসবাদ পছন্দ করতেন না কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক সমর্থন ছিল তার প্রমাণ হল ভ্রান্ত পথগামী সন্ত্রাস আশ্রয়ী দেশপ্রেমী যুবকগণকে বিদেশী শাসকের পীড়নমূলক আদালতে সমর্থন করার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে ভিন্ন মতাবলম্বীর প্রতি বিরূপ মনোভাব তিনি পোষণ করতেন না। মেদিনীপুর বোমা মামলায় তিনি অংশ নিয়েছিলেন। নারায়নগড় বোমা মামলায়ও তিনি জড়িয়েছিলেন।[২৪] পরবর্ত্তীকালে বীণা দাশ (ভৌমিক) মামলায় শান্তি ও সুনীতির (মিঃ স্টিভেনকে হত্যা করার জন্য) পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁদের ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। তারকেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলায়ও তিন অপরাধীর পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনজনকেই বাঁচিয়ে ছিলেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বন্দী হলে তাঁকেও মুক্ত করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসের হত্যার কারণে প্রদ্যোত ভট্টাচার্য্যের পক্ষেও তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু প্রদ্যোৎ-এর দাদা ডঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের

হাত থেকে ফাইল নিয়ে নিলে বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে তখন আর কিছু করার থাকেনি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায়ও গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং অনন্ত সিংহকে ফাঁসি কাঠ থেকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন।[২৫] মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলায় একুশজন অপরাধীকে বাঁচানোর দায়িত্ব বীরেন্দ্রনাথকে নিতে হয়েছিল গান্ধীজীর অনুরোধ।[২৬] এইসব মামলায় প্রায়শই তিনি বিনা পারিশ্রমিকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমরা জানি তিনি সারা জীবন অহিংস আন্দোলনের অনুসারী ছিলেন।

'স্রোতের তৃণ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন— 'শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ মহাশয়ের সুখ্যাতি শুনে আমি হৃদয়ে সত্যই গৌরব অনুভব করেছিলাম...... এই দ্বীপান্তর ফের্‌তা নরদেবতাগুলির (বাঙলার স্বদেশী যুগের বোমাওয়ালাদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের যে কক্ষে রাখা হত সেই 'ইয়ার্ড'-কে বম্‌ইয়ার্ড বলা হত) ত্যাগ ও আত্মবির্সজনের তুলনায় আমি আমারই কাছে এত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম যে, সে শিক্ষার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। এঁদের একজনের গায়ে ছটা গুলির চিত্র এবং একটা আস্ত গুলি বর্তমান ছিল— নিজের চোখে দেখেছি। এঁদের কারু কারু জীবনের কোনও কোনও ঘটনার দু-একটা ইশারা ইঙ্গিতে শুনতে শুনতে মনে হতো— আমাদের মধ্যে অনেকেই ছাগলের ঠ্যাং ভেঙে কিংবা মুরগীর ছানা চুরি করে এবারে জেলে এসেছিলাম।[২৭] তাঁর অনুভূতির এই গভীরতা ও উদারতাকে ব্যাখ্যা করার ভাষা আমার নেই। দেশকে যাঁরা ভালোবাসতেন— তাঁদের দুঃখে তিনি ব্যাথিত না হয়ে পারতেন না। তাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে— "প্রকৃত স্বরাজ সত্যই আত্মার বস্তু এবং সেই প্রকৃত স্বরাজ লাভ হবার যার সম্ভাবনা হয়েছে, তাঁর কাছে রাজনীতি কখনই সর্বোচ্চ আদর্শ হতে পারে না।"[২৮]

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আজীবন ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণের নামই 'স্রোতের তৃণ'। তিনি নিমিত্ত মাত্র। পরমপুরুষ যেদিকে স্রোতে তাঁকে নিয়ে চলেছেন তিনি তৃণের মতই ভেসে চলেছেন। জীবনে তিনি কখনো মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করেননি। মাথানত করেননি কারুর কাছেই। তাঁর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী উর্দ্ধশির রেখে তাঁকে দাহ করা হয়। তিনি তার গ্রন্থে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসকেই তাঁর জীবনের উদ্যোগ পর্বের সূচনা কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং গোড়াতেই অকপট চিত্তে লিখে ফেলেছেন— "তৎপূর্বে এদেশে ছুটির অবকাশেই রাজনৈতিক নেতা হওয়া যেত। নিজের সুখ-শান্তিকে ষোল আনাই বজায় রেখে এমনকি, নিজের ঐশ্বর্য ও সুনাম বৃদ্ধির জন্যই, দেশভক্ত সাজা অসম্ভব ছিল না।"[২৯] এই গ্রন্থের অন্য একস্থানে তিনি লিখেছেন, দেশের কাজের জন্যই গান্ধীজীর ডাকে

তিনি আইনি ব্যবসা ছেড়ে দেন। যে সব ছাত্র তাঁর বাড়ীতে থেকেই স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করত তাদের অন্যত্র বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করতে বলেন। "ক্রমে স্বদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দিকে নজরও পড়তে থাকে।"[৩০] তাহলে তো ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের ঘটনাগুলোতে তাঁর স্বদেশী আন্দোলনে উপস্থিত বা অংশগ্রহণকে তিনি নিজেই আমল দিচ্ছেন না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষের আলোকে তাঁকে আমরা কোথায় খুঁজে পাবো?

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) শালমল, বীরেন্দ্রনাথ— 'স্রোতের তৃণ', কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯২৯, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৭২।
২) পাল, প্রমথনাথ— 'দেশপ্রাণ শাসমল', কোলকাতা, প্রকাশ-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৮।
৩। মাইতি, ড. এস.কে.—'ফ্রিডাম মুভমেন্ট ইন মিডনাপুর', কোলকাতা, প্রকাশ-১৯৭৫, পৃ-১৯।
৪) মাইতি, ড. প্রদ্যোৎ কুমার— 'অনন্য মেদিনীপুর', কোলকাতা, প্রকাশ-২০০১, পৃ-৯৯।
৫) সান্যাল, হিতেশরঞ্জন— 'স্বরাজের পথে', কোলকাতা, প্রকাশ-১৯৯৪, পৃ-৯৫।
৬) সরকার, সুমিত— 'আধুনিক ভারত', কোলকাতা, প্রকাশ-১৯৯৫, পৃ-২২২।
৭) রায়, রজতকান্ত— সোস্যাল কনফ্লিক্ট এণ্ড পলিটিক্যাল আনরেষ্ট ইন বেঙ্গল—১৮৭৫-১৯২৭', দিল্লি, প্রকাশ-১৯৮৪।
৮) চক্রবর্ত্তী, বিদ্যুৎ— লোক্যাল পলিটিক্স এণ্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, মিডনাপুর, ১৯১৯-১৯৪৪' নিউদিল্লি. প্রকাশ-১৯৯৭।
৯) দাশ, বসন্তকুমার— 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১ম খণ্ড, প্রকাশ-১৯৮০, পৃ-৯৬।
১০) দাশ, বসন্তকুমার— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-১৯৯-১২০।
১১) তদেব— পৃ-১৭৩-১৭৪।
১২) দু'টি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত কপি আমার কাছে আছে।
১৩) আহ্মদ, মুজফ্ফর— 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি', ১ম খণ্ড, কোলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ-১৯৯৬, পৃ-২৫।
১৪) চক্রবর্ত্তী, ত্রৈলোক্যনাথ— 'জীবন স্মৃতি', পৃ-১৫।
১৫) চক্রবর্ত্তী, বিদ্যুৎ— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-৭১।
১৬) ঘোষ, বিনয়জীবন— 'অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র', পৃ-৫৩, ৭৪-৭৫।
১৭) দাশগুপ্ত, স্বপন— 'লোক্যাল পলিটিক্স ইন বেঙ্গল', পৃ-৭১।
সরকার, সুমিত - 'স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল', পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।

১৮) ঠাকুর, রবীন্দনাথ— রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পঞ্চমখণ্ড, প্রবন্ধ 'সমূহ'-এর অন্তর্গত 'সদুপায়', প—৭১৪-৭১৫।

১৯) লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস, শাসমল, বিমলানন্দ— 'ভারত কী রে ভাগ হলো', কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৫, পৃ-৮৪-৮৫।
শাসমল, বিমলানন্দ— 'স্বাধীনতার ফাঁকি', কোলকাতা, প্রকাশ-১৩৭৪, পৃ-১২৬-১২৭।
চক্রবর্ত্তী, বিদ্যুৎ— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-১১০।
আই.ও.আর.এল./পি.জে./২২/৪৭, বেঙ্গল এফ.আর.(২) মার্চ-১৯৩৬।

২০) শাসমল, বীরেন্দ্রনাথ— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-৮-১০।

২১) মাইতি, ড. এস.কে.— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-২০।

২২) পাল, প্রমথনাথ— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৯।

২৩) বসু, যোগেশচন্দ্র— 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', কোলকাতা, প্রকাশ-১৩২৮, পৃ-৩০১।

২৪) বিজয়া প্রেস, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় স্বরাজ সম্পর্কে বীরেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় এর উল্লেখ আছে।

২৫) ঘোষ, গণেশ লিখিত— 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল' প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ, প্রকাশ-২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১।

২৬) এ ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে ১৬.১২.৩৩ তারিখে লিখিত অপ্রকাশিত গান্ধীজীর চিঠি এবং ১৭.১২.৩৩-এর সম্বমূর্ত্তি লিখিত চিঠি আমার কাছে আছে।

২৭) শাসমল, বীরেন্দ্রনাথ— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-১২৮-১২৯।

২৮) তদেব, পৃ-৪৪।

২৯) তদেব, পৃ-১।

৩০) তদেব, পৃ-৬।

# শতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ

শ্যামলিকা দাস

বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি বিশেষ অধ্যায়। জাতীয় কংগ্রেসের ও জাতীয় আন্দোলনের পীঠভূমি বঙ্গদেশের জনশক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রিজলে লিখিত একটি সরকারী প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ উল্লেখ করা যায়। প্রতিবেদনে রিজলে লিখেছেন, "সম্মিলিত বাংলাদেশ একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। ঐ প্রদেশ ভেঙে দিলে এই শক্তি আর থাকে না। বিভিন্ন স্বার্থের টানে তা দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। আমাদের উদ্দেশ্য হল বিভেদ জাগিয়ে তোলা এবং আমাদের শাসনবিরোধী ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করা"। উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালের ৫ই জুলাই সরকারীভাবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং ১৬ই অক্টোবর ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। শুনিয়েছিলেন— "বাংলার মাটি, বাংলারজল .........." আর "আমার সোনার বাংলা....." ইত্যাদি। বঙ্গভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করার চক্রান্তকে মুছে ফেলতে ও হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। এই রাখিবন্ধন উৎসবে সামিল হয়ে বঙ্গবাসী সেদিন প্রমাণ করেছিল তারা এক ও অভিন্ন।

বঙ্গবিভাজনের কারণ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত রয়েছে। একটি সরকারী অভিমত অপরটি জাতীয়তাবাদী অভিমত।

প্রথমত : পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারত বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বিশাল আয়তন বিশিষ্ট এই প্রদেশটির প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গবিভাজন অপরিহার্য ছিল।

দ্বিতীয়ত : সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাঙালী জাতীয়তা খর্ব করার জন্য ব্রিটিশ রাজ বাংলার বিভাজন ঘটিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে জে.আর. ম্যাকলেন তাঁর "Indian Economic and Social History Review (July 1965)" তে প্রকাশিত "The Decision to Partition Bengal

in 1905" প্রবন্ধে জোরের সঙ্গে বঙ্গবিভাজনের সিদ্ধান্তের পিছনে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু তৎকালীন ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা তাই বঙ্গদেশের আয়তন ছোট করে লর্ড কার্জন কলকাতার ভার কমিয়ে শাসনব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন।

আবার অপরদিকে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্জনের ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় বঙ্গভঙ্গের পিছনে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলা। এক কথায় বলা যায়, শাসনতান্ত্রিক অভিমতটি ছিল তুচ্ছ অজুহাত মাত্র।

ব্রিটিশ সমর্থিত সংবাদপত্র 'The Statesman'-এর ২১শে জুলাই ১৯০৫ এর প্রকাশনা থেকে আমরা একটি নতুন কারণও খুঁজে পাই। সেদিন Statesman বঙ্গভঙ্গের তৃতীয় উদ্দেশ্য হিসাবে দেখিয়েছিল যে পূর্ববঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র গড়ে তোলা যাতে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করা যায়।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সময় থেকেই বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের মুখ্যভগে শিক্ষিত সমাজ, জোতদার, জমিদাররা ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষেরাও যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ রাজ পাশবিক দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী হয়। ঐ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। সম্ভবতঃ কলকাতার সেইসব বাবুভায়া শ্রেণীর মানুষেরা যাদের প্রকৃত খুঁটি ছিল পূর্ববঙ্গ—জোতদারি, জমিদারী পূর্ববঙ্গে থাকার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় পেয়েছিলেন। সেজন্য তারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো বহু ব্যক্তিরাও বাঙালী জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত উপস্থিত হওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, শুধু ভূখণ্ড ভাগ নয় বা ভাগ শুধু ভূখণ্ডের নয়, বাংলার সংস্কৃতি বিপন্ন প্রায়।

পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকশ্রেণী এবং কিছু নিম্নবর্ণীয় হিন্দু কৃষকরা কার্জনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এবং দলিতদের অবিসংবাদিত নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে এই সব কৃষক বঙ্গভঙ্গ রদ না করার দাবিতে সমানতালে সংগ্রাম করেছিলেন। পূর্ববঙ্গ অনুপস্থিত এবং কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের শোষন অত্যাচারে কৃষককুল হয়তো বঙ্গভঙ্গের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছুটা স্বস্তির অবকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। তাছাড়া এমনও হতে পারে.উচ্চবর্ণ শ্রেণীর দাম্ভিকতা এবং অর্থনৈতিক শোষনের তীব্রদহনের ফলে হিন্দুমুসলমান প্রজাকৃষকদের মধ্যে জাতিসত্তা

ও ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবোধ গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। ঐতিহাসিক John. R. Mclane তাঁর 'History of Bangladesh' গ্রন্থে বলেছেন, 'বঙ্গভঙ্গের আগে পর্যন্ত হিন্দু-মুসলীমদের মধ্যে তেমন উত্তেজনা থাকার প্রমান পাওয়া যায় না।' এ কথাই প্রমান করেছে যে বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই হিন্দুমুসলমানে সম্প্রীতি ভঙ্গ হয়েছিল। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার মূল কারণ ছিল বঙ্গভঙ্গ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত সাময়িক ভাবে ১৯১১ সালে রদ হয়ে গেলেও ১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ১৯০৫ সালের ৪২ বছর পর ১৯৪৭ সালে বাঙালীদের কাছে ঐ প্রশ্ন হাজির হয় এবং এই বিষয়টি বঙ্গভঙ্গ রূপে কার্যকর হওয়ার উদ্দেশ্যে আইন সভায় উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ২০শে জুন এই ভোটাভুটি হয়। বাংলার আইন সভায় ১৪১ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেন ১০৬ জন। ৭৯ জন হিন্দু সদস্যের মধ্যে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেন ২২ জন — যাঁরা যোগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অধিকাংশই ছিল তপশিলী সদস্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাঙলা ভাগের পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু শর্তানুযায়ী, হিন্দু ও মুসলমান উভয়পক্ষের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যরা বাঙলা ভাগের বিরুদ্ধে ভোট না দেওয়ায় বাঙলা ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে বাংলার জনমানসে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সারা দেশজুড়ে ১৬ই অক্টোবরকে জাতীয় শোকদিবস হিসাবে পালন করা হয়। হরতাল, ধর্মঘট, অনশন, পিকেটিং, জনসভা, বিভিন্ন সভাসমিতির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে জন জাগরণ ঘটেছিল তা কার্জনের পক্ষে রোধ করা সম্ভব হয়নি। শুধু পিকেটিং, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, সভা সমিতির মাধ্যমে জোরকদমে এগিয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সংবাদপত্র, বিভিন্ন জাতীয় স্কুল কলেজের ভূমিকা কম ছিল না। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন যুগের 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'যুগান্তর', 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শন', 'বেঙ্গলী', 'বন্দেমাতরম', 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার নাম করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃথ্বিশচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতারা 'বেঙ্গলী', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালিয়ে ছিলেন, ১৯০৫ সালের ১৩ই জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ব্রিটিশপন্য বয়কটের আবেদন জানিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বাংলায় রায়তদের ক্ষোভ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ চিঠি প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু মাহাত্ম্য প্রচার হত। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সম্পাদিত 'নবশক্তি' পত্রিকা চরমপন্থী মতাদর্শ প্রচার শুরু করে এবং বৈপ্লবিক

সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস আন্দোলনের কথা সবচেয়ে জোরালো ভাষায় বলেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'যুগান্তর' পত্রিকাটি ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকাটি। আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্বিক সার্থক করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নেন হীরেন্দ্রনাথ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতির ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে বরিশালকে আন্দোলনের দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত করেন। কারিগরী শিক্ষনের দাবী ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তি নিকেতন', 'শ্রীনিকেতন' এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঁচমেশালি 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দোলন তীব্রভাবে সংগঠিত হতে থাকে ফরিদপুরের 'ব্রতী', ময়মন সিংহের 'সুহৃদ' ও 'সাধনা' এবং ঢাকার সোনার স্কুল ও 'অনুশীলন' সমিতির মাধ্যমে। ১৯০৭ সালের মধ্যভাগ থেকেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সুর ধ্বনিত হয় পুস্তিকায়। 'মুক্তি কোন্ পথে', 'বর্তমান রণনীতি', প্রভৃতি এর প্রমাণ। তৎকালীন স্বদেশী পত্রিকাগুলি লেখনীর মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ঘোষণা করতেও ক্ষান্ত হয়নি। মুখ্যতঃ কার্জন চেয়েছিলেন বঙ্গ-ভঙ্গ হোক কিন্তু নিজের অজান্তে বঙ্গকে ভঙ্গ করার বদলে বঙ্গকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

কার্জন ভেবেছিলেন আন্দোলনের অস্তিত্ব হবে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু অচিরে অনুভব করেছিলেন তার এই অনুমান ভ্রান্ত। সেদিনের সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে আর সুদৃঢ় করেছিল এবং আরও কয়েক পদক্ষেপ এগিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯০৫ সালে ক্ষণিকের জন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়েছিল তা ১৯১১ সালে রদ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িকতার বীজবপন করেছিল তা শতবর্ষ পরেও আমরা নির্মূল করতে পারিনি এবং তার ফল হিসাবে হিন্দু মুসলীমের মধ্যে তিক্ততার চরম প্রতিক্রিয়া ১৯০৬-০৭ সালের বিভিন্ন দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৬ সালে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ, ১৯০৭ সালে মার্চ মাসে কুমিল্লায়, ১৯০৭ সালে এপ্রিল, মে মাসে জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বক্সীগঞ্জ, প্রভৃতি এলাকায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বদেশী আন্দোলনকেও মসীলিপ্ত করেছিল। কার্যত এখানেই ইংরেজদের জয়। সেই সূত্র ধরে আজও স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত কোণে কোণে শুরু হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র। দাবী উঠেছে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সরে গিয়ে স্বাধীন হওয়ার। এতে ভারতের জাতীয় সংহতি ধীরে ধীরে বিপন্ন হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষাভাষি, বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর দেশ এই ভারতবর্ষ বহুবার

বহিঃ শত্রুর দ্বারা হয়েছে আক্রান্ত, অত্যাচারিত, জর্জরিত। এসেছে শক-হূন-পাঠান-মোগল এবং সবশেষে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী। এসেছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আদায় করল শাসনক্ষমতা। 'বনিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে'। পরাধীন হয়েছে মাতৃভূমি। শত শত বীর সন্তানের আত্মবলিদানের বিনিময়ে দেশ মাতৃকা হয়েছে মুক্ত।

১৯১১-এর ১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁর রাজ্যাভিষেকের দরবারে বাংলাকে গভর্ণর শাসিত 'প্রদেশ' বলে ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ পুনরায় বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তখনকার মতো বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। ধর্মের এবং সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ লর্ড কার্জন তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একবার বপন করে দিয়েছিল, সেই বিষবৃক্ষ ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে পরিণামে গ্রাস করে নিল বাংলার সৌভ্রাতৃত্বকে। মুসলীম লীগ তথা জিন্নার মতো স্বার্থমগ্ন ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধিতে শেষ পর্যন্ত পার্টিশন হল। পাকিস্তানে পড়ে রইল পূর্ব বাংলা আর পশ্চিমবঙ্গ রইল পশ্চিমবঙ্গতে। প্রথমটির রাজধানী ঢাকা, দ্বিতীয়টির কলকাতা। পরে পাকিস্তান থেকে পূর্ববঙ্গের জনগণ নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছিল পাকিস্তানের সে সময় প্রধানমন্ত্রী আয়ুব খান তাদের ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করায়। সে সময় পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশেও মাতৃভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে বহু মানুষ শহীদ হয়েছেন। এই ভাষা আন্দোলন সমস্ত বাঙালী জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে বেঁধেছে। ভারতবর্ষের মতো সুবিশাল দেশ যার ভূখণ্ড কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারী এবং গুজরাট থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত অর্থাৎ এই আসমুদ্রহিমাচল ভারতে দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিটি ভারতবাসীকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত ভেদ ভুলে গিয়ে একই সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

আজ শতবর্ষের দোরগোড়ায় উপস্থিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। যুক্তবঙ্গ আজ দ্বিখণ্ডিত। আমরা পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গ, অপরদিকে বাংলাদেশ হয়েছে স্বাধীনরাষ্ট্র, মাতৃভাষা বাংলা, বাংলা মাটি, বাংলার জল এক হওয়ার উপায় নেই। ভাগ হয়েছে অনেক কিছুই, ভাগ হয়নি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভ্রাতৃত্ব। একদিন যে জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বঙ্গ তথা ভারতভূমিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, আজ আসুন— সেই জাতীয়তাবাদ, সেই সাহিত্য, সেই সংস্কৃতিকে পুনরায় উজ্জীবিত করে দুই বাংলার বাঙালীসত্তাকে এক করে বিশ্বের দরবারে স্থাপন করি। এরজন্য নয় সাম্প্রদায়িকতা, নয় কায়েমী স্বার্থ, চাই দেশপ্রেম, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব।

**সূত্র-নির্দেশ :**

১) অমলেন্দু দাশগুপ্ত সম্পাদিত দ্য স্টেটস্‌ম্যান অ্যানথোলজি ১৯৭৫।

২) সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৫৮-১৯৬৪)।

৩) সুমিত সরকারের মর্ডান হিস্ট্রি (১৮৮৫-১৯৪৭)।

৪) সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস ও শান্তি রঞ্জন বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

৫) অধ্যাপক সমর মল্লিকের আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮-১৯৪৭)।

৬) রামানন্দ চক্রবর্তী, অনাদিকৃষ্ণ নন্দী ও দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক কয়েকটি আর্টিক্যাল।

# ১৯০৬-বরিশাল কনফারেন্স একটি সমীক্ষা

## কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেছেন। সুশাসনের অজুহাতে বাংলাদেশকে দু টুকরো করা হল। বাংলার জনগণ এই বিচ্ছেদ সহজে মেনে নিল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্জনের কাছে আপিল করলে তিনি বলেন— "it is a settled fact", সুরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন যে তিনি ইহাকে 'unsettle' করবেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার চিন্তা নানা স্তরে প্রবাহিত হচ্ছিল। বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলাদেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির সহায়তায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী দ্রব্যের একটি আড়ত খোলা হয়। শতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ডন সোসাইটি' নামে একটি 'স্বাদেশিকতা উদ্বোধক' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের উৎসাহে একদল তরুণ এই সময়ে শক্তিচর্চার ক্ষেত্রে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। অমৃতলাল গুপ্ত ও আরো কয়েকজন মিলে 'বেঙ্গল ষ্টোর্স' নাম দিয়ে স্বদেশী দ্রব্যের একটি দোকান খোলেন। যোগেশ চৌধুরীও 'ইন্ডিয়ান ষ্টোর্স' নামে আর একটি দোকান খোলেন। সরলাদেবী 'বীরাষ্টমী' মেলার আয়োজন করে শক্তিচর্চার প্রসার করেন।[২]

যোগেশচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'Association for the advancement of industrial and scientific education' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়।

ভারতী, ডন প্রভৃতি পত্রিকা যে নবতত্ত্ব প্রচার করে এদেশে এক ভাববন্যার সৃষ্টি করল, বিপিন পালের নতুন ইংরাজী সাপ্তাহিক New India সেই ভাববন্যায় জোয়ার বইয়ে দিল।

বিপিন পাল যখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য অক্সফোর্ড যান সেই সময় তিনি লণ্ডনের স্বাধীনচেতা সাংবাদিক স্টেড-এর সংস্পর্শে এসে তাঁর সাহায্যে লণ্ডনে থাকাকালেই ভারতের রাষ্ট্রীক দাবি নিয়ে আন্দোলন তোলেন। দেশে ফিরে New India পত্রিকা স্থাপন করে তার মারফৎ স্বাদেশিকতা বিস্তারে সচেষ্ট হন।

এইভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যখন স্বাদেশিকতার স্রোত জাতির জীবনে বইছিল ঠিক সেই সময় কার্জন জনমতের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেন। কার্জন শাসিত আমলাতান্ত্রিক এই অন্যায় জিদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হল তার মধ্যেই জাতির মুক্তিকামনার প্রথম প্রবলতম বিকাশ দেখা দেয়। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন নীতি দেশময় প্রসারিত হল, তা ব্যাপ্তি লাভ করে আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তায়-কল্পনায়, 'স্বদেশী' গ্রহণ মন্ত্রে রূপান্তরিত হল।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখলেন— "ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয় তবে সেই বিচ্ছেদ-বেদনায় উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে.......... আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখিনা।........ আমরা প্রশ্রয় চাহিনা-প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে।........ জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে আঘাত, অপমান ও অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে"।

এরপরের ঘটনা প্রায় সবার জানা। ১৯০৫, ২০শে জুলাই সঞ্জীবনী পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখলেন, "বঙ্গের অঙ্গছেদ উপলক্ষ্যে আমাদের স্বদেশ ভক্ত, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁদের আর বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীতে জীবনবীমা করিবেন না। আমাদিগকে নিজেদের পা'র উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ঠেকনা দিয়া কোন দিন কোন ব্যক্তি বা জাতির কেহ কখনও দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে না"।[৩]

সঞ্জীবনী পত্রিকায় আরও প্রকাশিত হল; "আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোন বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরা করিয়াই ক্ষান্ত হইব না। বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সঙ্কল্পে সহায় হউন।"[৪]

৩রা আগস্ট "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় লেখা হল যে, "স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইংলন্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিব না। স্তব-স্তুতি অনেক হইয়াছে, আর নয়। এখন আইন, আমরা নিজের পদভরে দন্ডায়মান হই। বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। এবার সকলে মাতৃভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করি— ইংলন্ড জাত বস্ত্র ক্রয় করিব না। আমরা আবার বলি, যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহারও

সাধ্য নাই যে, বাঙ্গালীকে হীন করিতে পারে। যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে বঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় জোড়া লাগিবে। এস ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সকলে সপরিবারে প্রতিজ্ঞা করি স্বদেশ জাত দ্রব্য পাইতে বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিব না।"

উৎসাহের প্রাবল্যে জাতির জীবনে জোয়ার এল। কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, সন্দর্ভে স্বদেশী কথা প্রচারিত হল। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, প্রমথ রায়চৌধুরী, কামিনীকুমারি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির গানে গানে বাংলার আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, অক্ষয় মৈত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীগণ দেশাত্ববোধক রচনার দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বোধিত করে তোলেন।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানগণ বিশেষ সুবিধা পাবে এরূপ যুক্তি দেখিয়ে মুসলমান সমাজকে প্রলুব্ধ করার আপ্রাণ প্রয়াসে বাংলা সরকার যে চেষ্টা করে তার প্রধান সহায়ক ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে মুসলমান জনসাধারণকে হিন্দু রাষ্ট্রনায়কদের প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। তিনি প্রচারের জন্য যখন কুমিল্লা যান তখন সেখানে উত্তেজনাপূর্ণ "লাল ইস্তাহার" প্রকাশ্যে বিতরণ করেন।

তখনকার ইউরোপীয় ক্লাব মহাসমারোহে নবাবকে গ্রহণ করে। ইউরোপীয়দের এই সম্বর্ধনায় বিভ্রান্ত হয়ে গুন্ডাশ্রেণীর মুসলমানগণ হিন্দুদের বাড়ীঘর লুটপাট শুরু করে।

এরূপ কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ইতস্তত ঘটা সত্ত্বেও বাংলার মুসলিম নায়কদের অনেকেই এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে।

"সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নবাব আমীর হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার পক্ষ এই দেশ বিভাগ বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু সরকার পক্ষ সেরূপ কোন প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করতে পারেন নি।"

দেশীয় খৃষ্ঠান সমাজও পিছিয়ে ছিল না। "ভারতীয় খৃষ্ঠান সমিতির" এক অধিবেশনে আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতি দেখান হয়। জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করার জন্য দুই জনকে খৃষ্টান সমাজের মুখপাত্র রূপে নেতৃসম্মেলনে যোগ দেবার জন্য এই সভা অনুরোধ করে।

নারীগণও পেছনে পড়ে থাকেন নি। কলকাতার এক নারী সভায় নাটোরের রাণী সভানেত্রী হয়ে বর্জ্জন নীতি সমর্থন করেন। এরপর নদীয়ার জমিদার পত্নী, জলপাইগুড়িতে অম্বুজা সুন্দরী দাশগপ্তা ও ময়মনসিংহে পুণ্যলতা গুপ্তার প্রযত্নে সভা হয়।

বাংলার জমিদাররাও এই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়েননি। বিশেষ করে উত্তরপাড়া,

ময়মনসিংহ, নাটোর, শ্যামপুকুর, টাকী, কাশিমবাজার ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের সুবোধ চন্দ্র প্রভৃতি এদের মধ্যে অন্যতম।

ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯০৫ সালের কংগ্রেস 'বয়কট প্রস্তাব' গ্রহণ করেনি, কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সমর্থন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৬ সালে ইংলন্ডের মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে বলা হয় যে অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে আসছে। সেজন্য পুর্নবিবেচনার প্রয়োজন নাই।

মন্ত্রিসভার এই উত্তরে দেশনায়কগণ দেশে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করলেন। প্রকাশ্যে গোলদিঘীতে বিদেশী বস্ত্রের বহ্নুৎসব হয়। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনীয় বলে ঘোষণা করলেন। পরদিন বিডন উদ্যানেও বিরাট বহ্নুৎসব সম্পন্ন হয়। এইভাবে চতুর্দিকে আবার প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল।[৬]

এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের একটি অধিবেশন হবার আয়োজন হয়। এই সম্মেলন সম্বন্ধে কৃষ্ণকুমার মিত্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "পূর্ব বাঙলা কে পশ্চিম বাংলা হইতে পৃথক করা হইয়াছে কিন্তু বাঙালী পৃথক হয় নাই ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বরিশালে কনফারেন্স করিবার প্রস্তাব ধার্য্য করা হইল। হাইকোর্টের ব্যরিষ্টার আব্দুল রসুলকে সভাপতি করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল"।

এই সময় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি পূর্ববঙ্গে বিশেষ বিধির বলে নিষিদ্ধ হয়। এর বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ছোট ছোট বালক-বালিকারাও দণ্ডের ভয় অগ্রাহ্য করে বন্দেমাতরম বলতে লাগলেন। ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল বরিশালে কনফারেন্সের দিন স্থির হয়। কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য বরিশাল জেলার নানা স্থান থেকে দলে দলে লোক জমায়েত হতে থাকেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নানা জায়গা থেকে বহুলোক বরিশাল যাত্রা করে।

সুরেন্দ্রনাথ কয়েকদিন আগে ঢাকা গিয়ে ছিলেন তাই সেখান থেকে আনন্দ চন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ, যাত্রামোহন দেব প্রভৃতির সঙ্গে বরিশাল পৌঁছান। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, মিঃ হালিম গজনভী, কৃষ্ণ কুমার প্রভৃতি সভাপতি আব্দুল রসুলের সঙ্গে রবিশাল পৌছান।

এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যবৃন্দ বুকে 'বন্দেমাতরম' অঙ্কিত ব্যাজ পরে উপস্থিত হয়। এরপর প্রতিটি স্টীমার ষ্টেশনে স্টীমার দাঁড়িয়ে জনগণের অভিবাদন গ্রহণ করল। সন্ধ্যায় বরিশাল পৌঁছাইলে জনগণ ও তীরস্থ বহু ব্যক্তি বন্দেমাতরম ধ্বনিসহ তাদের আপ্যায়ন করেন।

নেতৃবর্গ জমিদারের বাড়ীতে সমবেত হয়ে স্থির করেন যে নির্দ্ধারিত দিনে দ্বিপ্রহরের পর কনফারেন্সের প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাদুরের হাভেলী নামক স্থানে সমবেত হবেন। সেখানে প্রতিনিধিগণ বন্দেমাতরম ধ্বনি সহযোগে কনফারেন্স মণ্ডপে যাবে।

প্রতিনিধিরা দলবদ্ধভাবে হাভেলী নামক স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে বহু সংখ্যক পুলিশ নিয়ে জেলা সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ কেম্প শোভাযাত্রায় বাধা দেয় ও লাঠির দ্বারা একজনকে আঘাত করে। কৃষ্ণ কুমার মিত্র কেম্পকে জিজ্ঞাসা করেন এর কারণ কি? উত্তরে তিনি জানালেন মিছিল করে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু পরে সকলেই ভিতরে গেল।

এরপর অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ হাভেলীতে প্রবেশ করে 'বন্দেমাতরম' সংগীত শুরু করেন। প্রায় তিন হাজার লোক নতমস্তকে দণ্ডায়মান হলেন। স্থির ছিল রসুল প্রথমে ও তার পেছনে সুরেন্দ্র নাথ, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্র বসু ও তাঁর পেছনে তিন জন করে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হবে। এর পেছনে থাকবে এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ। তারা রাজপথে বের হলেই তাদের পথ অবরোধ করে বলা হয় বন্দেমাতরম ব্যাজ খুলে ফেলার জন্য। অন্যথায় তাদের উপর লাঠি চালনা করা হয়। অবিশ্রান্ত লাঠির আঘাতেও তারা বিচলিত হলেন না।[৭]

চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল। পুলিশ লাঠি পেটা ক'রে তাকে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু পাছে তার মৃত্যু হয় সেইভয়ে পুকুর থেকে তুলে আনে। পরে পুলিশ যোগেশ চৌধুরীকে আঘাত করে। হাবেলী থেকে রাজপথ পর্যন্ত প্রতিনিধি ও দর্শকে পূর্ণ ছিল।

সুরেন্দ্র বাবু মিঃ কেম্পকে বললেন "তুমি কি করিতেছ? যদি কেহ কোন বেআইনী কাজ করে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পার। কিন্তু কাহাকেও প্রহার করিবার অধিকার তোমার নাই। আমি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু কাহাকেও প্রহার করিও না।" কেম্প সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করল।

এদিকে চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে কৃষ্ণকুমার প্রমুখেরা থানায় ডায়েরী করতে গেলেন। ডায়েরী গ্রহণ না করে সাদা কাগজে লিখে রাখা হয়। অতঃপর ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করে তাদের সভায় আনা হয়। এতে সভা উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

সভার প্রথম প্রস্তাবের আগেই ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচিত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, "আজ যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আজ ভারতে ইংরেজ শাসন শেষ হইল"। সহস্র কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে সভা উচ্চকিত হল।

মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব উত্থাপন ও সুরেন্দ্র নাথ সমর্থন করেন। মিঃ রসুল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মতিলাল ঘোষ ঘোষণা করেন, "যেহেতু পূর্ব বাংলা ও সমাজের বহুলোক স্বদেশ সেবা করাতে প্রহৃত ও নিগৃহীত হইয়াছেন তজ্জন্য এই সভা ঘোষণা করিতেছেন, এ দেশে আর আইন সংগত শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। সুতরাং আত্মশক্তির উপরে যে সকল কার্য নির্ভর করে বর্তমান কনফারেন্স সেই সকল কার্যের বিষয় আলোচনা করিবেন। বর্তমান দায়িত্বশূণ্য গর্ভনমেন্টের উপর যে সকল কার্য নির্ভর করে কনফারেন্স কক্ষে আলোচনা করিবেন না।"

পরদিবস দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। প্রথম দিন প্রায় দুইশত নারী উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয়দিন তা বেড়ে পাঁচশতে দাঁড়ায়। অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রস্তাব করলেন— 'গতকল্য যে স্থানে যুবকদের রক্তপাত হইয়াছে এবং সুরেন্দ্রবাবু বন্দী হইয়াছিলেন সেস্থানে এক স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন করা হউক"। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের প্রস্তাব গৃহীত হল। পুলিশ জোর করে সভা ভেঙ্গে দেয়। যোগেশ চৌধুরী বলেন যে, "এই কনফারেন্স ভাঙ্গিল বটে, গ্রামে গ্রামে যাও, বিলাতী জিনিষ নির্বাসন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণ কর। আজ আমাদের আনন্দের দিন। যেদিন বিলাতী বর্জনের লাঠি ইংরেজদের পৃষ্ঠে পড়িবে সেদিন এ অপমানের প্রতিশোধ হইবে। সকলেই সভা ত্যাগ করলেও কৃষ্ণকুমার মিত্র সভা ত্যাগ করেন নি। কারণ পুলিশের আদেশ তিনি মানেন না।[৮]

বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেটের অবৈধ আদেশ, পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার বাংলাদেশে দু দল লোকের সৃষ্টি করে। নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও একদল লোক আইনসঙ্গত আন্দোলন করে স্বদেশে যে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আর একদল লোক ইংরাজ হত্যা করে দেশ থেকে না তাড়ালে দেশ স্বাধীন হবে না এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের সৃষ্টির পশ্চাদপট রচনা করেছিল বরিশাল কনফারেন্স।

এরপর ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা, কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা, আলিপুর বোমার মামলা ইত্যাদি ঘটনা সবারই জানা। এই চরমপন্থী ও নরমপন্থী আন্দোলন এমন পর্যায়ে যায় যে পরের বছর ১৯০৭ সালে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।[৯] এরপরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। বাংলায় বামপন্থীর বা সমাজতন্ত্রের সূত্রপাত এর মূল কিন্তু এই চরমপন্থীদের থেকেই শুরু হয়ে পরে মহীরুহে পরিণত হয়।

**সূত্র-নির্দেশ :**

১) প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, কলিকাতা, ১৩৭২। পৃঃ-১৩৩
২) তদেব। পৃঃ-১৩৪
৩) সঞ্জীবনী, ১৯০৫
৪) প্রাগুক্ত
৫) প্রভাত চন্দ্র, তদেব, পৃঃ-১৪০
৬) ঐ, পৃঃ-১৫২
৭) কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত', কলিকাতা ১৩৮১ সংস্করণ, পৃঃ-২১৪
৮) প্রাগুক্ত, পৃঃ-২২৪
৯) প্রাগুক্ত, পৃঃ-২২৭

# গান্ধীজীর মহিষাদলে শুভ আগমন

## দিগন্ত কর

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলার মেদিনীপুর জেলার সংগ্রামী জনগণ যে অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের চরমতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তারই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি জানাতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতির জনক মহাত্মাজীর মহিষাদলে শুভাগমন ঘটেছিল।

মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা অহিংস আন্দোলনের বদলে হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে এবং তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ও চারিদিকে অরাজকতা ছড়াচ্ছে— এই ছিল বাংলার ছোটলাটের অভিযোগ।[১]

এই অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য গান্ধীজীর আগমন। ১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ভোর ৫টায় কলিকাতার প্রিন্সেপ ঘাট থেকে 'ন্যান্সী' নামক লঞ্চে চেপে হুগলী নদী বরাবর ডায়মন্ডহারবার হয়ে মহিষাদলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[২]

পথিমধ্যে বেলা ১২টায় ডায়মন্ডহারবারের এগজিবিশন গ্রাউন্ডে প্রায় ৫০০০০ জনগণের সামনে তাদের অনুরোধে গান্ধীজী কিছুক্ষণের জন্য সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এরপর ডায়মন্ডহারবার হতে রূপনারায়ণ নদীর মোহনা পর্যন্ত তিনি বড় লঞ্চে এসে সেখান থেকে ছোট লঞ্চে চেপে হিজলি টাইডাল ক্যানেল পথে মহিষাদলে পৌঁছান সন্ধ্যে ৭টায়। গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন তার সচিব শ্রী প্যারারেলাল, ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীযুক্তা আভা গান্ধী, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী (জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী), শ্রী রামকৃষ্ণ বাজাজ, মিস্ আমতুস সামন্ত, শ্রী অন্নদাপ্রকাশ চৌধুরী, শ্রী মনিলাল গান্ধী, শ্রী কালু গান্ধী, শ্রী সতীশ দাশগুপ্ত, শ্রী সুধীর ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।[৩]

গান্ধীজীর আগমনের উদ্দেশ্যে তাঁর সফর সূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য গঠিত হয়েছিল মহাত্মাজী অভ্যর্থনা কমিটি। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর সর্বাধিনায়ক শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত মহাশয়। কংগ্রেস নেতা নীলমণি হাজরা ছিলেন সম্পাদক এবং রমেশ চন্দ্র কর ছিলেন সহ-সম্পাদক। এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ সময় জাতীয় সরকারের অন্যতম নেতা শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়া, গোপী নন্দন গোস্বামী তখন বৃটিশদের হাতে বন্দী। গান্ধীজীর থাকবার ব্যবস্থা করা হয় এক্তারপুরে। বর্তমানে যার নাম 'গান্ধীকুটীর'।[৪]

গান্ধীজী এখানে ২৫ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচীতে ছিল ভোর বেলায় প্রার্থনা। এরপর প্রাতঃকালীন ভ্রমণের সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা, দুপুরে কর্মীসভা এবং কর্মীসভা শেষে বিকাল বেলায় চরকা কাটা। এরপর সন্ধ্যাবেলায় কংগ্রেস নেতা ও কর্মীবৃন্দের সাথে ঘরোয়া বৈঠক করা।[৫]

২৫শে ডিসেম্বর গান্ধীজী নির্বিঘ্নে রাত্রি যাপন করলেন। ভোর থেকেই শুরু হয় তাঁর প্রাত্যহিক কর্মসূচী। ২৬শে ডিসেম্বর বুধবার ক্যানেলের পাড় দিয়ে প্রাতঃ ভ্রমণের সময় অনাথ ছাত্রীদের আবাসস্থল 'শিশুসদন'-এ এসেছিলেন। এখানে ঐ শিশুদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন এবং মুগ্ধ হলেন। শিশু সদনের সম্পাদিকা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর কাছে তিনি শুনলেন যে এখানে ছাত্রীদের কিভাবে ওয়াধা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে তিনি খুবই খুশি ও অভিভূত হলেন।

দুপরে খাওয়া দাওয়ার পর খানিক বিশ্রামের ফাঁকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক শ্রী সতীশ সামন্ত মহাশয় গান্ধীজীর কাছে অবিভক্ত তমলুক মহকুমার আগষ্ট আন্দোলনের সমস্ত বিবরণ, ব্রিটিশ সরকারের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বিশেষতঃ নারী নির্যাতনের করুণ কাহিনী শোনালেন। এমনকি ১৯৪২ সালে অক্টোবর মাসে ভয়ঙ্কর বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র গান্ধীজীকে অবগত করালেন।

বিকেল বেলায় গান্ধীজী প্রায় ৬০০০০ নরনারীর সামনে তাঁর মহিষাদলে আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন— 'আপনারা এতদিন কি করেছেন তা জানার জন্য এবং আপনাদের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তা দুরীকরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য আমি এখানে এসেছি। আমি এখানে বক্তৃতা দিতে আসিনি। সমগ্র জীবনে আমি বহুবার বক্তৃতা দিয়েছি। এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার জীবনেও একটা পরিবর্তন এসেছে। আমার মনে হয় বক্তৃতা দিয়ে আমি আপনাদের কল্যাণ সাধন করতে পারব না। মেদিনীপুরের জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে এখানে আসবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম। আজকে সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। এখানে অবস্থান কালে আমি আপনাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করব"। এরপর মহাত্মাজীর অন্যতম সহযাত্রী শ্রী ভারতন কুমার আপ্পা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।[৫]

তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গান্ধীজী সতীশ চন্দ্র সামন্তের কাছে জাতীয় সরকারের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। গান্ধীজী সতীশ বাবুর কাছে জানতে চান তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার তার কার্যকালে কোন হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল কিনা। সতীশবাবু সমস্ত ঘটনা গান্ধীজীর কাছে নির্ভয়ে স্বীকার করেন। এবং সেই সঙ্গে

তিনি গান্ধীজীকে বোঝাতে সক্ষম হলেন কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জাতীয় সরকারের সমর্থিত 'গরমদল'কে হিংসার পথ অনুসরণ করতে হয় (যদিও দলের অন্যেরা একথা তাকে অস্বীকার করতে বলেন)।[৭]

এরপর সতীশ বাবু ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের কাহিনী বললেন। ১৯৪৩ এর ৯ই জানুয়ারী মাশুড়্যা, ডিহি মাশুড়্যা ও চন্ডীপুর এই তিনটি গ্রামকে ঘেরাও করে ব্রিটিশ সৈন্য একই সঙ্গে ৪৯ জন মহিলার ওপর গণধর্ষণ চালায়। এদের মধ্যে কেউ সধবা, বিধবা, কুমারী, গর্ভবতী কেউবা রোগী ছিল। এদের বয়স ছিল ১৪ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। গান্ধীজী এই কাহিনী শুনে বললেন যদি প্রমাণ দিতে পার তাহলে তাদের উপস্থিত কর'।[৮]

গান্ধীজীর নির্দেশমত ৫ জন ধর্ষিতা মহিলার জবান বন্দি নিলেন আভা গান্ধী ও সুশীলা নায়ার। সেই ৫ জনের ১ জন হলেন শ্রীমতী ক্ষুদিরাম বালা পণ্ডিত। তাঁর জবান বন্দিটি ছিল এইরূপ— "আমার বয়স ২১ বছর, আমি ৩টি সন্তানের জননী। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী বেলা ৯টার সময় জনৈক সার্জেন্ট কয়েকজন সৈন্য লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। ঐ সার্জেন্টের নির্দেশে দুইজন সৈন্য কাপড় দিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া পরপর আমাকে ধর্ষণ করে। আমি সঙ্গাহীন হইয়া পড়ি। জ্ঞান ফিরিলে আমি দেখি আমার স্বামীর শরীরের নানা স্থান হইতে রক্তপাত হইতেছে"। প্রসঙ্গত ঐ স্ত্রী লোকটি ঐ পাশবিক অত্যাচারের সময় গর্ভবতী ছিলেন।[৯]

স্বীকারোক্তিটি হিন্দিতে আভা গান্ধী তর্জমা করে গান্ধীজীকে শোনান। বিবরণ শুনে তিনি বলেন, 'বর্বর'। মহিলদের স্বীকারোক্তি থেকে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হল।

গান্ধীজী সমস্ত কিছু উপলব্ধি করে মন্তব্য করলেন, "১৯৪২ সালের মহিষাদলের আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাহসীপূর্ণ। তোমাদের সাহস ও বীরত্বের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তোমরা অহিংসার পথে থাকলে আমি আরও খুশি হতাম"।

২৮শে ডিসেম্বর শুক্রবার তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক শিবির, অস্থায়ী শিশু সদন প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

২৯শে ডিসেম্বর শনিবার তিনি মহিষাদল ছেড়ে চলে যান। হিজলি ক্যানেল হতে তিনি কাঁথি গেলেন। পথিমধ্যে কিছুক্ষণের জন্য খোদামবাড়িতে বক্তৃতা দেন। এখন প্রতিবছর তাঁর আগমনের দিনটিকে স্মরণ করে 'গান্ধী কুটির' সংলগ্ন মাঠে ২৫-২৯শে ডিসেম্বর 'গান্ধী মেলা' বসে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১। আমাদের মহিষাদল ঃ- হরপ্রসাদ সাহু, বঙ্গকৃতি জানুয়ারী ২০০৫ পৃষ্ঠা-১০২
২। জিলা মেদিনীপুর স্বাধীনতার আন্দোলন ঃ- ডঃ কমল কুণ্ডু, পৃষ্ঠা-১৩৪
৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরে (তৃতীয় খণ্ড), হরিপদ মাইতি ও রাসবিহারী পাল, পৃষ্ঠা-২৬০
৪। আমাদের মহিষাদল ঃ- হরপ্রসাদ সাহু
৫। জিলা মেদিনীপুর স্বাধীনতার আন্দোলন ঃ- ডঃ কমল কুণ্ডু
৬। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর (তৃতীয় খণ্ড) ঃ- হরিপদ মাইতি ও রাসবিহারী পাল, পৃষ্ঠা-২৫৯
৭। শতাব্দীর আলোকে সতীশচন্দ্র সামন্ত ঃ- সম্পাদনা অধ্যাপক ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতি ও অধ্যাপক বিমলেন্দু চক্রবর্তী, পরিবেশক পুস্তক বিপনি কলিকাতা-৯। ১৭ই ডিসেম্বর ২০০১ পৃষ্ঠা-১৪৬
৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর ঃ- হরিপদ মাইতি ও রাসবিহারী পাল পৃষ্ঠা-১৬২
৯। বাংলার হলদিঘাট তমলুক ঃ- গোপী নন্দন গোস্বামী, তাজপুর, রাজারামপুর মেদিনীপুর ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ পৃষ্ঠা-৬৪

<u>এছাড়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার হিসাবে নেওয়া</u>

ক। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী কমঃ রাসবিহারী মিশ্র।
খ। স্বাধীনতা সংগ্রামী, কুমুদিনী ডাকুয়া, আগষ্ট আন্দোলনের সময় অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় গড়ে ওঠা 'ভগিনী সেনা'-র সদস্যা।
গ। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধীবাদী নেতা অমূল্যচরণ মাইতি, তমলুক থানার অধিনায়ক।

# কলকাতায় মহিষবাথানের (চব্বিশ পরগণা) লবণ সত্যাগ্রহের প্রভাব

পুষ্পরঞ্জন সরকার

বিগত শতকের তিরিশের দশকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম উপরণ ছিল লবণ সত্যাগ্রহ, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও বণিক স্বার্থে ভারতে দেশীয় মানুষের লবণ তৈরি ব্রিটিশ সরকার আইন বিরুদ্ধ করে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে (১৯৩০) বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কাঁথির মতো তৎকালীন অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার মহিষবাথান গ্রাম সাড়া জাগায়। মহিষবাথান গ্রামটি কলকাতার নিকটবর্তী লবণ হ্রদ সংলগ্ন। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণায় অবস্থিত। এই লবণ হ্রদকে কেন্দ্র করে Salt Lake City বা বিধাননগর গড়ে উঠেছে।

লবণ হ্রদের নোনাজল ছিল লবণ তৈরির উপকরণ। স্থানটি কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের এখানে সহজে এবং স্বল্প সময়ে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। মেদিনীপুর জেলা বাংলার লবণ সত্যাগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হলেও মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহের বিশেষ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়।[১]

চব্বিশ পরগণা কংগ্রেস কমিটি মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৫ সালে ৭ই মার্চ গান্ধীজী ডান্ডীতে লবণ আইন ভঙ্গ হলে এখানেও লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সেই সময়ে বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে উপদলীয় বিরোধ থাকায় গান্ধীজী বাংলায় তাঁর একান্ত অনুগামী সতীশ দাশগুপ্তকে মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার মুল দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিতে সাহায্য করেছিলেন স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক ও স্থানীয় 'চারণ কবি' বলে পরিচিত অভিমন্যু মণ্ডল।[২]

লবণ সত্যাগ্রহের ডাকে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলী থেকে দুটি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী দল মহিষবাথানে উপস্থিত হয়। লবণ হ্রদের নোনাজল ফুটিয়ে ও ফিল্টার করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির মধ্যে 'বেআইনী' লবণ প্রস্তুত করা শুরু হয়।[৩]

কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। একটি এলগিন রোড-উডবার্ন পার্কে শরৎ চন্দ্র বসুর বাড়ি, অপরটি কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের নিকটে কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন স্থানে। মহিষবাথানের তৈরি লবণ কলেজ স্ট্রিটে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের কেন্দ্রে জমা হত।

মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হলে প্রথম দিনেই পুলিশ লবণ সত্যাগ্রহী লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক ও রাইচাঁদ দুগারকে গ্রেপ্তার করেন। এরাই বাংলার প্রথম লবণ সত্যাগ্রহী যাদের ব্রিটিশ সরকার লবণ আইন ভঙ্গে প্রথম গ্রেপ্তার করেন।

মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হলে কলকাতায় প্রচণ্ড উদ্দীপনা শুরু হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। উল্লেখ আছে যে, সুভাষচন্দ্র বসুও গোপনে এই স্থানটি পরিদর্শন করেন ও সত্যাগ্রহীদের উৎসাহিত করেন।

কাশীপুর-বরাহনগর অঞ্চলের সৎচাষি পাড়া থেকে কংগ্রেসের তরুণ স্বেচ্ছাসেবী দল মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা দমদম রোড, যশোহর রোড হয়ে শ্যামনগর রোডের মধ্য দিয়ে মহিষবাথান অভিমুখে রওনা হন। কৌতূহলী জনতার কাছে মহিষবাথান গ্রামের নাম ও মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহের কথা ছড়িয়ে পড়ে। কেষ্টপুরের পথিপার্শ্বে জনতা বন্দেমাতরম ধ্বনি ও মাল্যদানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধিত করে। মহিলারা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তাদের সম্বর্ধিত করেন। উত্তরের সোদপুর অঞ্চল থেকে গান্ধীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সতীশ দাশগুপ্তের অনুগামী একটি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী দল মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে যাত্রা করেন।

কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের একাংশ মহিষবাথানের তৈরি লবণ শ্যামবাজার-শোভাবাজার অঞ্চলে 'পুরিয়া' করে প্রকাশ্যে বিক্রয় করে গ্রেপ্তার বরণ করতেন। জাতীয় সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কলকাতাবাসী অনেকেই মহিষবাথানের লবণের 'পুরিয়া' সঙ্গে রাখতে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

কলেজ স্ট্রিটের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের দপ্তরে মহিষবাথানের তৈরি লবণ জমা হত। এখানে সের দরে বা 'পুরিয়া' হিসাবে ক্রয় করে বিভিন্ন জেলার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীরা মহিষবাথানের লবণ তাদের জেলায় নিয়ে যেতেন।[৪]

বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া. বীরভূম এমন কি পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুরের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা কলেজ স্ট্রিট কংগ্রেস ক্যাম্প থেকে মহিষবাথানের তৈরি বে-আইনী লবণ ক্রয় করে তাদের জেলায় লবণ আইন ভঙ্গ করতেন। লবণ বিক্রয়ের মাধ্যমে তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিতেন ও গ্রেপ্তার বরণ করতেন।

আইন অমান্য আন্দোলনে কলকাতায় মহিষবাথানের লবণ আন্দোলন এক অতি পরিচিত উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা নিয়মিতভাবে মহিষবাথানে এসে বে-আইনি লবণ তৈরি করতেন। কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মহিষবাথানের তৈরি লবণের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। আনন্দবাজার, যুগান্তর, লিবার্টি ও অন্যান্য স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় মহিষবাথানের লবণ সত্যাগ্রহের ঘটনাবলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হত।[৫]

সর্বভারতীয় লবণ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা ছিল অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার মধ্যে কলকাতা ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। পিকেটিং, সরকার নিষিদ্ধ পুস্তক, ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতি কলকাতায় আইন অমান্যের উপকরণ হলেও মহিষবাথানের তৈরি বে-আইনি লবণ বিক্রয় করে ব্রিটিশ আইন ভঙ্গ করা কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের মুখ্য উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাশীপুর, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, কলেজ স্ট্রিট, ভবানীপুর, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কংগ্রেসসেবীদের কাছে মহিষবাথানের তৈরি লবণের যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। অখ্যাত গ্রাম মহিষবাথানের এটা ছিল এক বড়ো সার্থকতা।[৬]

লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে অখ্যাত মহিষবাথান জাতীয়তাবাদী/আইন অমান্য আন্দোলনে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।[৭] ধীবর-কৃষক অধ্যুষিত অনুন্নত ও অবহেলিত মহিষবাথান স্বাদেশিকতার এক নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। মহিষবাথানকে অনুসরণ করে নিকটবর্তী তে-ঘরিয়া, অর্জুনপুর ও রাজারহাটে আইন অমান্য আন্দোলন বা লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল। মহিষবাথানের গণচেতনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কালিকাপুর (ক্যানিং), নীলা, ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। ওই সব অঞ্চলে লবণ সত্যাগ্রহের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক আইন অমান্য আন্দোলনে মহিষবাথানের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে কলকাতার আইন অমান্য আন্দোলনকে সচল রাখতে বা তীব্রতা বৃদ্ধি করতে মহিষবাথান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

### সূত্র-নির্দেশ ঃ

১। ভুপেশ কুমার প্রামাণিক, লবণ হ্রদের উপকথা, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ-৩৫।

২। বসন্ত কুমার বিশ্বাস, অগ্নিগর্ভ মহিষবাথান, মহিষবাথান, ১৯৮৩, পৃঃ-২০।

৩। Liberty (Daily Newspaper) Calcutta. March 8, 27.28. April 2, 6, 8, 9, 1, 25, 1930.

৪। সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ১ম খণ্ড, কলকাতা, এন.বি.এ. ১৯৮৫।

৫। মনোরঞ্জন রায়, পরায়ত্তপরগনা কথা ঃ চব্বিশ পরগণা জেলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ডায়মন্ড হারবার, ১৯৯৪, পৃঃ ২৭৬।

৬। The Mussalman (Weekly Journal), Calcutta, 8th April, 1930,5p

৭। কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ-২৭।

# স্বাধীনতা আন্দোলনে আমতা থানা

## শান্তনু করাতি

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছে। এই আন্দোলনে আমতা থানার মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমতা থানার দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী মানুষ যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন তার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস কোথাও নেই। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা তথ্য, ঘটনা ও আন্দোলন সংক্রান্ত বিবরণ সংকলিত করলে এ ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মুক্তি আন্দোলনের দিনগুলিতে আমতা থানার মানুষও তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন।

বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সর্বভারতীয় নেতা ও পলিটব্যুরো সদস্য সমর মুখাজ্জী আমতা থানায় স্বাধীনতা আন্দালন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ১৯৩৮ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে হাওড়া টাউন হলে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সমর মুখাজ্জী হাওড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি আমতা থানা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন।[১] আমতা থানায় অনুষ্ঠিত আইন অমান্য ও অসহযোগ এবং মাদক বর্জন আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ এই সময়ের মধ্যে আমতা থানার কৃষক সম্প্রদায় কুৎ প্রথার বিরুদ্ধে, তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে, পান ও পাটের নায্যদাম বেঁধে দেওয়ার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। সমর মুখার্জী এই সমস্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং বে-আইনী সমাবেশ করার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।[২] মুক্তি পাবার পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২ সালে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং পরে সর্বসম্মতি ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টির হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩] শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। দীর্ঘদিন তিনি হাওড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে ভারতের পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে আমতা থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের নিতাই লাল ভাণ্ডারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর কলকাতার আশুতোষ কলেজে আই.এস.সি.তে ভর্ত্তি হন। এই সময় আন্দামানের বন্দীদের মুক্তির দাবীতে কলেজে ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে ছাত্র ফেডারেশন ও কংগ্রেসের সদস্য হন। ১৯৩৮ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে সুভাষ চন্দ্র বসুকে সংবর্ধনা জানানোর দাবী আদায়ের আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে আই.এস.সি.সি. পাশ করার পর বি.এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি অনেকের সঙ্গে গোপনে বিভিন্ন স্থানে পোস্টার দিয়ে যুদ্ধে সহযোগিতা না করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। ফলে ১৯৪০ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে টালিগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে বৃটিশ গভর্নরের সই করা এক আদেশ পত্রে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া, হাওড়ায় অন্তরীণ থাকা ও স্থানীয় থানায় মাঝে মাঝে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ জারী করা হয়। পড়াশুনা ছেড়ে গ্রামে আসার পর খোশালপুর ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করেন। প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্র ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ফলে ১৯৪৭ সালের পর কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত তে-ভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কংগ্রেস সরকার ১৯৪৯ সালে বিনাবিচারে গ্রেপ্তার করে। ১৯৫১ সালে মুক্তি পাবার পর ১৯৫৩ সালে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষা আন্দোলন সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে আমতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন।[৪]

আমতা থানার অন্যতম স্বীকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী বানেশ্বরপুর গ্রামের বিপিনবিহারী সেনাপতির পুত্র কার্ত্তিক চন্দ্র সেনাপতি ছোট বেলাতেই পড়াশোনার জন্য কলকাতায় যান এবং সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় দর্জিপাড়ায় লাঠি খেলা শিখতেন এবং এই সূত্রে অনুশীলন সমিতির নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। আত্মগোপন করে থাকা অবস্থাতেই

১৯৩৫ সালে এপ্রিল মাসে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয় এবং তাঁদের নামে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। দুবছর পরে মামলার রায় অনুযায়ী কার্ত্তিকবাবুর ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ডের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা জেলে পরে সেখান থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে ডঃ নারায়ণ রায়ের প্রভাবে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মুক্তি লাভের পর হাওড়া জেলা কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৫]

এছাড়াও আরও অনেক মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে নানাভাবে আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন যাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যেমন— রসপুর গ্রামের শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবু মিত্র রডা কোম্পানীতে চাকরী করতেন। তিনি এই কোম্পানীর অস্ত্র লুঠ করে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং পরে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন করেন।[৬] কেশবচন্দ্র সরকার আমতা থানা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। আমতার পাটের দাম বাঁধার দাবীতে একটি বেআইনী সমাবেশ করার জন্য গ্রেপ্তার হন এবং এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন।[৭] রসপুরের ভোলামাল হাওড়া জেলার যে সব সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমরাগড়ীর পুলিন বিহারী রায় (পিতা উপেন্দ্রনাথ রায়) কলকাতার বড় বাজারে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে পিকেটিং করে কারাবরণ করেন।[৮] অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশের দশকের শুরুতেই আমতার বিভিন্ন গ্রামে যুবকেরা স্বদেশী বস্ত্র প্রচারে নেমে পড়েন। বেতাই গ্রামের বাসুদেব বেরা জয়ন্তী গ্রামের সূর্যচরণ মাজী, রবীন্দ্রনাথ মাজী প্রমুখ কর্মীরা চরকা কাটা, তাঁত বসানো, খদ্দরের জামা কাপড় বিক্রি করা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হন।[৯] গোপাল মুখার্জীর নেতৃত্বে ছাত্ররা মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে এক দোকানের সামনে এসে তাঁর দোকানের বিলাতী কাপড় টেনে বের করে রাস্তায় জড়ো করে নিকটবর্তী দোকান থেকে কেরোসিন তেল এনে তাতে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১০] বুদ্ধদেব মুখার্জীর নেতৃত্বে শঙ্কর চ্যাটার্জী, বারীন্দ্রলাল মুখার্জী, দুর্গাপদ মজুমদার প্রমুখ মাদক বর্জন আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। সকলের এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।[১১] খড়দহ গ্রামের সুফলচন্দ্র মান্না আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত হন এবং ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।[১২] উদং গ্রামের সতীশচন্দ্র পট্টনায়ক বিভিন্ন জায়গায় নিষিদ্ধ বুলেটিন ও পত্র পত্রিকা বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩০ সালে নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকা সমেত গ্রেপ্তার হন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেন।[১৮] জীবনমাজি, নবনীকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র সামন্ত প্রমুখরা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

তাঁদের প্রেরণায় আমতা থানার মানুষ বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে মুক্তি আন্দোলনে আমতা থানার ভূমিকাকে এক গৌরবোজ্জ্বল স্তরে উন্নীত করেছিলেন।

ইতিহাস খুঁজলে আরো অনেক তথ্য ও ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা আগ্রহী হলে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমতা থানার ভূমিকা ও সঠিক মূল্যায়ন আগামী দিনে সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১। হাওড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস— অমিতাভ চন্দ্র।
২। হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর— জয়কেশ মুখার্জী।
৩। হাওড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস— অমিতাভ চন্দ্র।
৪। নিতাই লাল ভাণ্ডারীর সঙ্গে শান্তনু করাতির সাক্ষাৎকার।
৫। স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা — দুঃখ হরণ ঠাকুর চক্রবর্তী।
৬। বাংলায় বিপ্লববাদ— নলিনী কিশোর গুহ।
৭। হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর— জয়কেশ মুখার্জী।
৮। পাঁচশো বছরের হাওড়া— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। পাঁচশো বছরের হাওড়া— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। হাওড়া জেলার ইতিহাস— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১। হাওড়া জেলার ইতিহাস— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। হাওড়া জেলার ইতিহাস— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। হাওড়া জেলার ইতিহাস— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

# বাবু তারাপদ মুখার্জী ও ডাক কর্মচারী আন্দোলনের গোড়ার যুগ

অনুরাধা কয়াল

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল এদেশের মূলত বাংলার ডাক কর্মচারী আন্দোলনের গোড়ার কথা। স্বতঃস্ফূর্ততার স্তর থেকে সংগঠিত আন্দোলনের স্তরে অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস। দীর্ঘ সময় ধরে ডাক কর্মচারীরা নানা ধরনের প্রতিকূলতার স্বীকার হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই কর্মচারীরা এমন একজন মানুষকে খুঁজছিল যে তাদের দূর্দশার লাঘব করতে সক্ষম হবে। ডাক কর্মচারী আন্দোলনের জনক বাবু তারাপদ মুখার্জী এমনই একটা সময় ডাক বিভাগে যোগদান করেন। ডাক কর্মচারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি এই আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

ভারতবর্ষে ডাক ব্যবস্থার এখনও ১০০ বছর পূর্ণ হয়নি (১৯৩২)। কিন্তু চতুর্দশ শতকেও ভারতবর্ষে ডাক ব্যবস্থা ছিল। মুঘল সম্রাটের সময় নিয়মিত ডাক ব্যবস্থা ছিল ও তার নামও ছিল ডাক। সেই থেকে 'ডাক' কথাটা চালু হয়ে গেছে। শেরশাহ ১৫৪১-১৫৪৫ পাঁচ বছরের স্বল্পকালীন রাজত্বে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন। সম্রাট আকবর সেই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ব্রিটিশ শাসকেরা আমাদের দেশে যখন রাজত্ব বিস্তার করতে শুরু করেছিল তারা তখন কোন সংগঠিত ডাক ব্যবস্থা দেখতে পায়নি। ১৭৫৬ লর্ড ক্লাইভ এক ধরনের ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। রানারগণ চিঠি নিয়ে বিভিন্ন দিকে যেত কিন্তু চিঠির জন্য কোন মাশুল নেওয়া হত না।[১] ১৭৮৪-এ ওয়ারেন্ট হেস্টিং-এর সময় ব্যক্তিগত চিঠির জন্য ডাক মাশুল নেওয়া শুরু হয়। ১৮২৭ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চিঠি আদান প্রদানের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করে। দূরত্ব অনুযায়ী মাশুল নেওয়া শুরু হয়। তার আগে বহু বেসরকারী লাইন ছিল ডাক আদান প্রদানের।[২] ১৮২৭ সালের আইন সেগুলিকে আঘাত করে। কিন্তু সরকারী ডাক ব্যবস্থা বেসরকারী লাইনের পরিবর্তন করেনি। তার ফলে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেক জেলায় বেশ কিছু ডাকঘর খোলে। ১৯০৪ সালে এইসব ডাকঘর (Dist Post Office) তুলে দিয়ে Sub Post Office ও Branch Post Office খোলা হয়। ১৯০৪ সালের এই ব্যবস্থা এখন চলছে।[৩]

টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। Lord Dalhousie-র সময় এই ব্যবস্থার পত্তন হয়। প্রথম কলকাতা ও ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৪ থেকে ডাক ঘরের মাধ্যমে বহু শহরে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু টেলিগ্রাফ দপ্তরটি পৃথক দপ্তর হিসাবে আলাদা ডাইরেক্টর জেনারেল-এর অধীনে ছিল। ১৯১৩ সালে ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও ওয়ারলেস ব্যবস্থা এক Director অধীনে হয়।[৪]

ডাক বিভাগের প্রসারের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী নিয়োগ হতে শুরু হয়। কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত অসন্তোষজনক। তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। এবং কাজের সময় অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং তাদের ছুটির দিন বলে কিছু ছিল না একথা Postal Enquiry Report-এ পাওয়া যায়।[৫] এছাড়া তাদের ইউরোপিয়ন অফিসারদের দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হত। এই পরিস্থিতিতে ডাক কর্মচারীরা এমন একজন মানুষকে খুঁজছিল যে তাদের দুর্দশার লাঘব করতে সক্ষম হবে। এমনই একটা সময় তারাপদ মুখার্জী চাকরীতে যোগ দেন।

বাবু তারাপদ মুখার্জী ছিলেন ডাক কর্মচারী আন্দোলনের জনক। তারাপদ মুখার্জীর সার্ভিস বই থেকে জানা যায়[৬] যে তিনি ১৮৯৫-এর ১লা ফেব্রুয়ারী বৌবাজার ডাকঘরে ক্লার্ক-এর পদে ডাক বিভাগের কাজে যোগ দেন মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে। সেই দিনই ডাকঘরে ৩০ টাকা বেতনে যোগ দেবার অস্থায়ী নিয়োগ পত্র পান। ১৮৯৫ মার্চ নাগাদ তারাপদ মুখার্জী ৩০ টাকা বেতনের করণিক পদে প্রমোশন[৭] পান ও ভবানীপুর ডাক ঘরে যোগ দেন এবং এরপর বিভিন্ন পোস্ট অফিসে বদলি হন। ইন্টালি ডাক ঘরে কাজ করার সময় বাবু তারাপদ কর্মচারীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি সভা করেন ইউনিয়ন গঠনের জন্য। এই ধরনের সভা করার জন্য তাকে পূর্ণিয়ায় বদলি করে দেওয়া হয় এবং তিনি ১৯০৪ সালে কাজে যোগ দেন। সেখান থেকে হাজারিবাগ এবং ১৯০৯ সালে কৃষ্ণনগর এবং এরপর তিনি কলকাতার জি.পি.ও, বিডন স্ট্রিট, ধর্মতলা প্রভৃতি ডাক ঘরে কাজ করেন। ঐ সময় বৌবাজার ডাক ঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কেউ সেখানে পোস্ট মাষ্টারের দায়িত্ব নিতে রাজি হচ্ছিল না। যদিও প্রশাসনের চোখে বাবু তারাপদ ভাল লোক ছিলেন না কিন্তু তার কর্মক্ষমতার প্রতি প্রশাসনের যথেষ্ট আস্থা ছিল এবং ঐ সঙ্কটময় সময় তারা মনে করেছিল যে বাবু তারাপদ মুখার্জীর পক্ষেই বৌবাজার ডাক ঘরের অবস্থা স্থিতিশীল করা সম্ভব। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ডাক ঘরের বিভিন্ন অংশের কাজের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন।

বাবু তারাপদ যখন ডাক বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন তখন ক্লার্কের বেতন ছিল মাসে ১৫ টাকা এবং বেশির ভাগ কর্মচারীকে অবসর নিতে হত ৬০ টাকায়।[৮] প্রত্যেক কর্মচারীকে অফিসারদের দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হত। সামান্য ভুলের জন্য কঠিন শাস্তি

দেওয়া হত। দুর্নীতি চলত ব্যাপকভাবে। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রমোশন পেতে হলেও যাদের হাতে ক্ষমতা তাদের অন্তত ৫০ টাকা দিতে হত। কোন ছাপানো গ্রেডেশন লিস্ট থাকত না। যা থাকত তা কোন অফিসে পাঠানো হত না।কলকাতায় দু-ধরনের গ্রেডেশন লিস্ট থাকত। একটি লোক দেখানো অন্যটি সঠিক। দুটি কপিই পেনসিলে লেখা হত। যাতে যে কোন কর্মচারীর স্থান বদলে দেওয়া যেত। টাকা খরচ করে একজন জুনিয়র কর্মচারীর স্থান অনেক উপরে উঠে যেত। এর ফলে সৎ ও ধর্মভীরুদের কখনও প্রমোশন হত না। এইসব দরিদ্র কর্মচারী তাদের সততার জন্য ৩০ টাকা বেতনে অবসর নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হত। এইসব অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কেউ বিক্ষোভ করতে সাহস[৯] করেনি। তারাপদ বাবু ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীকে ঐ ধরনের ব্যবহারের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের বিক্ষোভের পরামর্শ দেন। কিন্তু অফিসারদের নির্দয় ব্যবহারের ফলে তারা এতটাই সন্ত্রস্ত ছিল যে প্রতিবাদের কথা তারা কল্পনা করতে পারেনি।

বাবু তারাপদ চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের অবস্থা ও কিভাবে তারা নিজেদের উন্নতি ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইংল্যান্ড ট্রেড ইউনিয়ন-এর ধাঁচে ডাক কর্মচারীদের ইউনিয়ন গঠনের ইচ্ছা তাঁর ছিল।[১০] কিন্তু সেই সময় ইউনিয়ন গঠন অসম্ভব ছিল। তিনি ইউনিয়ন গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে কিছু সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। সেই সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী সংবাদপত্র ইংলিশম্যান কর্মচারীদের কিছু সমস্যার কথা প্রকাশ করেছিলেন। এই ধরনের প্রকাশনা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করেছিল। তখন অনেক কর্মচারী ছিল যারা প্রশাসনের কাছে অন্যায় ব্যবহার পেয়েছিল। বাবু তারাপদ এইসব কর্মচারীদের প্রতিবাদ করতে বলেছিলেন। প্রতিবাদের ফলে চাকরিচ্যুত কর্মচারীরাও পুনর্বহাল হয়েছিল। ১৯০৪ সালে বাবু তারাপদ কলকাতার ডাক ঘরে কর্মরত কর্মচারীদের বেতনহার পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে মহামান্য ভাইসরয় এর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন এবং এই কাজে জি.পি.ও ক্লার্ক বাবু অমূল্যনাথ মুখার্জীর প্রভূত সহায়তা পেয়েছিলেন। এই স্মারকলিপি প্রেসিডেন্সি পোস্ট মাষ্টার জন ওয়েনের কাছে প্লেস করা হয়। তিনি ঐ স্মারকলিপি পেয়ে অবাক হয়ে যান। প্রশাসনের মতে ডাক কর্মচারীরা নীরব কর্মী, কারণ তাদের উপর নির্যাতন, বাড়তি কাজের বোঝা চাপান হলেও কম বেতনে নীরবে কাজ করত। প্রশাসন কর্মচারীদের প্রভাবিত করে স্মারকলিপি প্রত্যাহারের চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত জানতে পারেন যে বাবু তারাপদ ছিলেন এই স্মারকলিপির রচয়িতা। স্মারকলিপি দেওয়ার ফলে কর্মচারীদের বেতন ও চাকরির শর্ত কিছুটা হলেও উন্নত হল। বাবু তারাপদ মুখার্জী উপলব্ধি করেন যে কর্মচারীদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ইউনিয়ন গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কর্মচারীদের সমস্যা ও চাহিদার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকল।

ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে ডাক কর্মচারীদের প্রথম সভাটি হয় ১৯০৬ সালে মিত্র ইনস্টিটিউট-এর বাড়িতে। যদিও কর্তৃপক্ষ ঐ সভার আয়োজনকে বিদ্বেষের চোখে দেখেছিল তবুও সভাতে ১৫০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিল। বাবু তারাপদ নিজেই ওই সভাতে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ডাক ইউনিয়ন গঠন করা। ইংল্যান্ড কর্মচারীদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার মেনে নিয়েছিল এবং ভারতেও সেই নীতি কার্যকরী করতে কোন বাধা নেই। তিনি সভাতে ব্যাখ্যা করেন যে ইংল্যান্ড শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠনের জন্য কি দারুণ পরিশ্রম করেছিল। কর্মচারীরা ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই উদ্যোগের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ছিল। এরপর আরো একটি সভা হয় পষ্টীর ময়দানে। ওই সভায় সভপতিত্ব করেন কালিঘাট ডাক ঘরের সাব পোস্ট মাষ্টার বাবু রামরঞ্জন রায়। ওই সভার সভাপতিত্ব করেন জি.পি.ওর ক্লার্ক বাবু চারুচন্দ্র মিত্র। ওঁর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাসোসিয়েশন গঠনের ক্ষেত্রে এই সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাবু তারাপদ মুখার্জী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পোস্টাল ক্লাব গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কিছুদিন প্রস্তাবটি স্থগিত রাখা হয়। ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে ডাক আন্দোলনের নেতারা বৌবাজার ডাক ঘরে মিলিত হয়ে প্রেসিডেন্সি পোস্টাল মাষ্টার-এর মাধ্যমে ডাইরেক্টর জেনারেল-এর উদ্দেশ্যে চিঠি দেন। পোস্টাল মাষ্টার জেনারেল ডাইরেক্টরকে না পাঠিয়ে ৬ই জুলাই ১৯০৭ সালে ২২-২৬ নম্বর চিঠিতে জানান যে ক্লাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশাস'নর কোন আপত্তি নেই।[১১]

১৯০৮ সালের মে মাসে পোস্টাল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাবু তারাপদ মুখার্জী পূর্ণিয়াতে বদলি হওয়ার ফলে ক্লাব কাজকর্মে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। বাবু অশ্বিনী কুমার চৌধুরী, জ্যোতিন্দ্র বসু, শরৎ নন্দী প্রমুখের ঐকান্তিক উদ্যোগের ফলে পোস্টাল ক্লাব-এর কাজকর্ম চালু ছিল।[১২] প্রেসিডেন্সি পোস্ট মাষ্টার সি.এইচ. স্টুয়ার্ট-এর আমলে পোস্টাল ক্লাবের পদাধিকারী ও সদস্যরা প্রশাসনের সুনজরে ছিল না। তাদের নানা সমস্যায় পড়তে হত। পুর্ণিয়া থেকে বাবু তারাপদকে ১৯০৯, ডিসেম্বরে কৃষ্ণনগরে বদলি করা হয়। তারাপদবাবুর কৃষ্ণনগরে বদলি হওয়ার ফলে ক্লাবের সুবিধা সহায়ক হয়। এই সময় গ্রেডেড পে চালু হয়। পুরাতন কর্মচারীদের উচ্চপদে প্রমোশন দেওয়ার বদলে হঠাৎ দেখা যেত উচ্চপদে বহিরাগতদের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে আগে হতে কর্মরত কর্মচারীরা উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। তারাপদবাবু বিলম্ব না করে সমাধানের উদ্যোগ নেন। ডাক কর্মচারীদের দুর্দশার কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তাদের সাহায্য করার জন্য সংবাদপত্রগুলি এগিয়ে আসে। ডাক কর্মীদের সম্পর্কে অমৃত বাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে বাবু তারাপদ আর একটি

স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন। এই স্মারকলিপির ব্যয় বৃদ্ধির হওয়ার কারণে বেতন কাঠামো সংশোধনের দাবি করা হয়েছিল। অমৃত বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলি ও স্টেটস্‌ম্যান-এ ঐ স্মারকলিপির দাবিকে সমর্থন করা হয়।[১৩] অমৃত বাজার পত্রিকাতে ২২, ২৬, ২৭ ও ৩০শে জুলাই-এর ১৯১৪ "ডাক বিভাগের সত্য উদ্‌ঘাটন"[১৪] শীর্ষে প্রতিবেদন উত্থাপিত হয় এবং সরকার এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পোস্টাল ক্লাব-এর কাজে অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯১৬-১৯১৭তে বাবু তারাপদ পোস্টাল ক্লাব-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৪-১৯১৮ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের কারণে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ডাক কর্মচারীদের জীবনযাপন অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ডাক কর্মীদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ইউনিয়ন গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালের ৬ই মার্চ সমস্ত প্রতিনিধিদের একটি সভায় সর্বসম্মতভাবে সর্বভারতীয় ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ডাক ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে বাবু তারাপদ মুখার্জী ডাক কর্মচারীদের সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১৬]

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-১
২। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-২
৩। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-৩
৪। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-৩
৫। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-৩
৬। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-৩
৭। বমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-৬
৮। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-১০
৯। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-১১
১০। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-১৫
১১। রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৩২ কলকাতা, পৃঃ-১৮
১২। অমৃত বাজার পত্রিকা জুলাই ১৯১৪, ২২, ২৬, ২৭
১৩। অমৃত বাজার পত্রিকা জুলাই ১৯১৪, ২৭, ৩০
১৪। অমৃত বাজার পত্রিকা জুলাই ১৯১৪, ২৮-৩১
১৫। বেঙ্গলি, জুলাই ১৯১৪, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
১৬। রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বাবু তারাপদ মুখার্জী জীবন ও সংগ্রাম ১৯৩২ কলকাতা।

# মাটিয়াবুরুজের শ্রমিক আন্দোলন এবং কমরেড মণি সিংহ ঃ পশ্চিমবঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এর গুরুত্ব বিষয়ক একটি পর্যালোচনা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন নেতাদের নেতৃত্বে বেশ কিছু শ্রমিক, মেথর ও ঝাড়ুদার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে ছিল লিলুয়া শ্রমিক ধর্মঘট, মাটিয়াবুরুজের শ্রমিক ধর্মঘট, ঢাকেশ্বরীর শ্রমিক ধর্মঘট, বম্বের সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট এবং কলকাতার বিভিন্ন এলাকার মেথর ও ঝাড়ুদারদের আন্দোলনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনগুলিতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মোজাফ্‌ফর আহমেদ, কমরেড মণি সিংহ, অমল সেন, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্র সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কমরেড মণি সিংহ ছিলেন অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিং জেলার বাসিন্দা। তিনি ১৯২৮ সালে মাটিয়াবুরুজের শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং সে সময়কার অনেক ব্যর্থ আন্দোলনের মধ্যে এই আন্দোলনটি সফল হয়েছিল। নিম্নে এই আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হলো।

**কমরেড মণি সিংহের পরিচয় ঃ** কমরেড মণি সিংহ ১৯০১ সালের ২৮শে জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল কালী কুমার সিংহ এবং মাতার নাম ছিল সরলাদেবী।[১] তার মাতামহী ছিলেন বর্তমান নেত্রকোণা জেলার সুসং-দুর্গাপুরের জমিদার বংশের মেয়ে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার মায়ের সাথে সুসং-দুর্গাপুরেই থাকতে শুরু করেন। সুসংয়ে লেখাপড়া শেষে ১৯০৯ সালের দিকে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যান। ১৯১৩ সালের দিকে কিশোর মণি সিংহ মাত্র তের বৎসর বয়সে তৎকালীন বাংলার বিপ্লবীদল অনুশীলন দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে শুরু করেন।[২] ১৯২১ সালের খেলাফত আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু খেলাফত আন্দোলন সম্পর্কে অনুশীলন

দলের নীতি মণি সিংহের তেমন একটা পছন্দ না হওয়ায় তিনি উপেন সান্যাল নামক এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে সরাসরি কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। ১৯২৫ সালে তিনি তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা গোপেন চক্রবর্তীর মাধ্যমে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি মাটিয়াবুরুজে একটি সফল শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ব্রিটিশ সরকার গণহারে গ্রেফতার শুরু করলে ১৯৩০ সালের ৯ই এপ্রিল তিনি কলকাতার বৈঠকখানা এলাকা হতে গ্রেফতার হন। ১৯৩৭ সালে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ময়মনসিং এলাকার টঙ্কের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকদের পক্ষে টঙ্ক আন্দোলন শুরু করেন। মোট তিনটি পর্যায়ে এই আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং আন্দোলনের ফলে ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটে। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর পর থেকে তাঁর আত্মগোপন জীবনের শুরু হয় এবং একটানা ২৪ বছর তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৬০-এর দশকে আইয়ুব সরকার তাকে ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৯৬৭ সালে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তিনি গ্রেফতার হলেও ১৯৬৯ সালে প্রবল আন্দোলনের মুখে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর তিনি আবার গ্রেফতার হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অন্যান্য বন্দীদেরকে সাথে নিয়ে রাজশাহী জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েন এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন, পাশাপাশি যুদ্ধের প্রতি বৈদেশিক সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পযন্ত তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সকাল ১০টায় মৃত্যুবরণ করেন।

**আন্দোলনের সূত্রপাত ঃ** গোপেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে তিনি রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনতে পান যা তার মনে বিপ্লব সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটায়। অন্যদিকে এ সময় বিপ্লবের তথ্যসমৃদ্ধ 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকা বাংলায় পাওয়া যেত, যা তিনি নিয়মিত পড়তেন, এসব ঘটনা তার বিপ্লবী চিন্তাভাবনাকে আরো বিকশিত করে তুলেছিল ফলে তাঁর মনে ধারণা হয় শ্রমিকরাই সবচেয়ে বিপ্লবী; কাজেই তাদের মধ্যেই প্রথমে কাজ আরম্ভ করতে হবে, পরে কৃষকদের মধ্যে এবং তিনি কলকাতায় গিয়ে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩]

১৯২৬ সালের প্রথম দিকে তিনি তার সকল কাজ গুটিয়ে কলকাতায় যান এবং

তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্ফর আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কলকাতায় আসার পর মণি সিংহ ক্লাইভ স্ট্রীটের গুপ্ত ম্যানসনে একটি ঘর ভাড়া করে ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং নাম দিয়ে একটি অফিস খুলে বসেন।[৪] এসব ছিল ১৯২৬ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মণি সিংহ কলকাতায় গেলেও প্রথম দিকে সে সুযোগ পাননি, এসময় তিনি কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন এবং একে অপরের অফিসে যাতায়াত করতেন বলে প্রমাণও পাওয়া যায়।[৫] কলকাতায় আসার পর মণি সিংহের সাথে গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্র সেন প্রমুখের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা সকলেই কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে মণি সিংহ তাঁর বহু কাঙ্খিত সেই শ্রমিক আন্দোলনের সাক্ষাৎ পান।

১৯২৮ সালের প্রথম দিকে লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ধর্মঘট শুরু হয়, এই ধর্মঘট পরিচালনা ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল। এই সুযোগে ধরণী গোস্বামী ও গোপেন চক্রবর্তী লিলুয়াতে আসেন। একদিন সন্ধ্যায় মণি সিংহ বাসায় উপস্থিত থাকা অবস্থায় গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী তাঁর বাসায় আসেন এবং আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তাঁরা পরের দিন তাঁকে আন্দোলনের জন্য লিলুয়াতে যেতে বলেন। মণি সিংহ সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় চাইলেও তাঁরা এতে আন্দোলনের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হতে পারে ভেবে পরের দিনই যাওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অবশেষে মণি সিংহ রাজী হন এবং পরের দিনই লিলুয়াতে গিয়ে হাজির হন।[৬] লিলুয়া ওয়ার্কশপের নেতা ছিলেন জটাধারী বাবা ওরফে কে.সি. মিত্র (কিরণ চন্দ্র মিত্র)। যতদূর জানা যায় তিনি ছিলেন রেলওয়ের একজন কর্মচারী, পরে সাধু হয়ে যান এবং জটা বেঁধে যায় এবং এ থেকেই তিনি জটাধারী বাবা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। শ্রমিক আন্দোলনে জটাধারী বাবা বেশ পরিচিতিও লাভ করেছিলেন। লিলুয়াতে মণি সিংহসহ সকলেই লিলুয়া রেলওয়ে ইউনিয়ন অফিসে ওঠেন। লিলুয়ার শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে আসার পর তাঁরা ইউনিয়ন অফিসের বারান্দায় বসে থাকা অবস্থায় মাটিয়াবুরুজ থেকে রহমান নামক একজন শ্রমিক এসে উপস্থিত হন। অবাঙ্গালী এই শ্রমিক এসে বলেন, "হামলোগ মাটিয়াবুরুজ কটন মিলমে হরতাল করদি, হাম জটাধারী বাবাকো লেনে আয়া।" গোপেন চক্রবর্তী বলেন, "কেয়া হুয়া?" উত্তরে রহমান বলেন, "হামলোগ কেশোরাম কটন মিলমে হরতাল করদিয়া, কেউভি হামলোগকে পাউন্ডকা হিসাবসে মজদুরী মিলতা থা, লেকিন আভি নয়া কানুন ইয়াডসে মজদুরী মিলেগা,

ইস্‌সে কভি ১০/১২ রুপায়া মাহিনা ঘাটতি হোগা।"[৭] এসময় জটাধারী বাবা অফিসে উপস্থিত ছিলেন না, তাই সুযোগ বুঝে গোপেন চক্রবর্তী ঐ শ্রমিককে বলেন, "জটাধারী বাবা অফিসে উপস্থিত নেই, আমরা তাঁর লোক, চলুন মেটিয়াবুরুজে আমরা যাই।"[৮] গোপেন চক্রবর্তীর এই কথায় মণি সিংহ একরকম অবাক হয়ে যান। বিষয়টি বুঝতে পেরে গোপেন চক্রবর্তী মণি সিংহকে নিয়ে একুট আড়ালে যান এবং বলেন, "জটাধারী সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদী একজন লোক, তার উপর কেশোরাম মিল হচ্ছে বিড়লার। সুবিধা পেলে জটাধারী বাবা কি করবে না করবে বলা যায় না, উদ্যোগ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে পরিচিত হওয়া দরকার।"

মাটিয়াবুরুজের দুরত্ব ছিল কলকাতা থেকে আট মাইল এবং এটা ছিল একটি শ্রমিক প্রধান এলাকা। এখানে কাপড়ের কল, চটকল, জাহাজ মেরামতের কারখানা, ম্যাচ ফ্যাক্টরিসহ ছোট বড় অনেকগুলি কারখানা ছিল। পাশাপাশি বেশ কিছু রেডিমেড জামা তৈরির কারখানাও ছিল। স্থানীয় লোকদের বেশিরভাগই ছিল মুসলমান শ্রমিক, হস্ত শিল্পে কর্মরত দর্জিদের সকলেই ছিল বাঙ্গালী, কিন্তু কল-কারখানার শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী, বিহার ও ইউ.পির বাসিন্দা। মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার, যার মধ্যে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার শ্রমিকও ছিল।[৯] মাটিয়াবুরুজের আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, এটা ছিল চোরাকারবারীদের ভূস্বর্গ। কোকেন থেকে আরম্ভ করে দেশী-বিদেশী এমন কোন জিনিস ছিল না বা সেখানকার চোরাবাজারে পাওয়া যেত না। পুলিশের সহযোগিতায় চোরাকারবারীরা ছিল এখানে জমজমাট। বহুলোক চোরাকারবারেও নিযুক্ত ছিল।[১০]

মাটিয়াবুরুজে পৌঁছাবার পর মণি সিংহ ও গোপেন চক্রবর্তী শ্রমিক বস্তিতে উপস্থিত হলে শ্রমিকরা তাদেরকে দেখে চরম উৎসাহিত হন। শ্রমিকরা তাদের চারিদিকে ঘিরে ধরে উর্দ্দুতে হরতালের কারণ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। একদিকে ভাষা ভিন্ন অন্যদিকে বস্ত্রকল সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় তারা শ্রমিকদের কথার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাদের ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা দেখে শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা তাদের বক্তব্য বুঝতে পারছে না। তাই তারা তাদেরকে সেক্রেটারীর নিকট নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[১১] প্রকৃতপক্ষে সেক্রেটারী ছিলেন ঐ মিলের ম্যানেজার, শ্রমিকরাও তাকে সেক্রেটারী বলে সম্বোধন করত। যেহেতু মণি সিংহ ও গোপেন চক্রবর্তী শ্রমিকদের আন্দোলন ও তাদের ভাষা সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তাই তারা সেক্রেটারীর নিকট যাওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করলেন। সেক্রেটারীর নিকট যাওয়ার পর মণি সিংহ ও গোপেন চক্রবর্তী তাদের পরিচয় দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন সম্পর্কে জানতে চাইলে

সেক্রেটারী বলেন, "এই মিলের তাঁতীদের আগে পাউন্ড হিসাবে (ওজনে) মজুরী দেওয়া হত, কিন্তু এখন ইয়ার্ড বা গজের হিসাবে মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই পদ্ধতি এখন পৃথিবীর সর্বত্র চালু আছে। বিড়লারা মহানুভব ব্যক্তি, তাঁরা শ্রমিকদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, শ্রমিকরাই মূর্খ, না বুঝেই তারা হরতাল করছে।[১২] মণি সিংহ শ্রমিকদের মজুরী কমার বিষয়টি জানতে চাইলে সেক্রেটারী পরিষ্কার কোন উত্তর দিতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন এবং বলেন সব ঠিক হয়ে যাবে বাবু। এ বিষয়ে বিশদ কোন জ্ঞান না থাকায় মণি সিংহ তার নীতিগত ধারণা হতে বুঝে নিয়েছিলেন যে, বুর্জোয়ারা কখনও শ্রমিকদের ভালো করতে পারে না।

**আন্দোলনের কারণ ঃ** এই সময় সুতাকল, পাটকলের মালিকরা একশত টাকায় একশত টাকা বা একশত টাকায় দেড়শত টাকা মুনাফা করতেন। শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা ছিল খুবই জঘন্য। অধিকাংশ শ্রমিক বস্তিতে বাস করতেন। জুলুম-ছাঁটাই অনবরত চলত, আর মজুরী ছিল খুবই কম। এসময় গোপেন চক্রবর্তী আন্দোলনের কারণে লিলুয়াতে ফিরে যান, ফলে মণি সিংহ একা হয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রমিলে গিয়ে উইভিং মাস্টারের মাধ্যমে পাউন্ড ও ইয়ার্ডের দ্বারা মজুরী প্রদানের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। মূলত পাউন্ড মাধ্যমে মজুরী প্রদান ছিল, উৎপাদিত পণ্যকে পাউন্ডে পরিমাপ করে মজুরী প্রদান করা, আর অন্যদিকে ইয়ার্ড ছিল উৎপাদিত পণ্যকে ইয়ার্ডের (গজের) মাধ্যমে পরিমাপ করে মজুরী প্রদানের পদ্ধতি। প্রথমে কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিকদেরকে পাউন্ডের মাধ্যমে মজুরী দেওয়া হত, কিন্তু পরে তা ইয়ার্ডের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হলে দেখা যায় যে, একেকজন শ্রমিক পূর্বের তুলনায় মাসে ১০/১২ টাকা মজুরী কম পাচ্ছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই মাটিয়াবুরুজের শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। পাউন্ড ও ইয়ার্ডের পার্থক্য ও শ্রমিকদের আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের পর মণি সিংহ লিলুয়াতে ফিরে আসেন।

**মাটিয়াবুরুজের শ্রমিক আন্দোলন ও মণি সিংহ ঃ** লিলুয়াতে ফিরে আসার পর তিনি গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামীর সাক্ষাৎ করে মাটিয়াবুরুজের ভাষা, পরিবেশ ও অন্যান্য সকল প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরে সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। উত্তরে তারা বলেন, "বিপ্লবতো মাখনের মধ্যে ছুড়ি চালিয়ে দেওয়া নয় যে এত সহজেই সম্ভব। প্রয়োজনে ভাষা শিখে নিতে হবে। এইসব আলোচনার সময় মণি সিংহের স্মৃতিপটে মাটিয়াবুরুজের শ্রমিকদের ছবি ভাসতে শুরু করে এবং তিনি সাথে সাথেই মাটিয়াবুরুজে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৩] শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মণি সিংহ পুনরায় মাটিয়াবুরুজে

আসেন এবং শ্রমিকদের সহায়তায় একটি ঘড় ভাড়া নিয়ে অফিস খোলেন। এসময় তাঁর থাকার জায়গার অভাব দেখা দেয়। অবশেষে ৯৬, পাহাড়পুর রোডে ২টি ছোট ও একটি মাঝারি ঘর ইলেকট্রিক বিলসহ মোট সাড়ে আট টাকায় ভাড়া নেন।[১৪]

এরপর তিনি শ্রমিকদের সাথে একাগ্রচিত্তে কাজ করতে শুরু করেন। শ্রমিকদের সাথে মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রমিক তাদের একদিনের মজুরী ইউনিয়নের তহবিলে প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন, এবাবে তিনি আন্দোলনের জন্য তহবিল গঠন করেন যা দিয়ে কেউ আহত বা গ্রেফতার হলে তাকে সহায়তার ব্যবস্থা করা হত। এসব কাজের পাশাপাশি এসময় তিনি হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষা শেখার চেষ্টা করছিলেন। পদ্ধতি হিসাবে তিনি বেছে নেন কিছু শব্দের অর্থ জেনে নেওয়া, কিছু কিছু প্রয়োজনীয় শব্দ মুখস্ত করে নেওয়াসহ বিভিন্ন পদ্ধতি। এসময় মিলে হরতালের মাধ্যমে আন্দোলন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।[১৫]

মাটিয়াবুরুজের বড় রাস্তার ধার ঘেঁষেই প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা নদী, আর এই গঙ্গা নদীর পারেই কারখানাগুলো অবস্থিত ছিল যেসবে তখন ধর্মঘট চলছিল। কারখানাগুলোর এই ধর্মঘট সম্পর্কে খিদিরপুর থানার ওসি রহমান এবং রবিনসন নামক একজন সার্জেন্ট মণি সিংহের সাথে দেখা করেন এবং ধর্মঘট সম্পর্কে বলেন, "আপনারা শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করতে পারবেন কিন্তু বিশৃঙ্খলা যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।"[১৬] ধর্মঘট চলা অবস্থায় একদিন ভোর ছয়টার দিকে মণি সিংহ বেশ কয়েকজন শ্রমিকসহ পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে কারখানার গেটে যান। পিকেটিং চলা অবস্থায় লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে একজন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট এসে মণি সিংহসহ শ্রমিকদেরকে পিকেটিং করতে দেখে মণি সিংহের উদ্দেশ্যে বলেন, "তুমি যদি আর একপা অগ্রসর হও তবে তোমাকে আমি গ্রেফতার করব।" প্রকৃত অর্থে মণি সিংহ ছিলেন খুব জেদী এবং এরূপ হুমকিকে তিনি কখনোই আমল দিতেন না। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, "এই পা বাড়ালাম"। ফলে ঐ সার্জেন্ট তাকে গ্রেফতার করে মাটিয়াবুরুজ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যান এবং মণি সিংহ তার রাজনৈতিক জীবনে প্রথমবারের মত পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।[১৭] মণি সিংহ গ্রেফতার হওয়ার পর-পরই হাজার হাজার শ্রমিক থানার সামনে জড়ো হতে শুরু করে এবং তারা মণি সিংহের মুক্তি দাবী করে। শ্রমিকরা মণি সিংহের মুক্তি দাবী করে শ্লোগান দেয় "আঞ্জুমান বাবুকো (ইউনিয়নের নেতাকে) ছোড় দো"। তাদের এই জঙ্গি মূর্তি দেখে ফাঁড়ির লোকজন ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং পরিস্থিতি দেখে থানার ওসি মণি সিংহকে বলেন, "তুমি গ্রেফতার হওনি, তুমি মুক্ত, নচেৎ এরা হয়ত ফাঁড়ি আক্রমণ করে বসবে।[১৮] প্রকৃতপক্ষে মণি সিংহ তখন রাজনৈতিকভাবে অতটা পাকা ছিলেন না, ফলে

তিনি তাদের শিখিয়ে দেওয়া বুলি "আমি গ্রেফতার হইনি" শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করেন। এতে শ্রমিকরা শান্ত হয় এবং মণি সিংহকে তারা একরকম কোলে করে ফাঁড়ি থেকে নিয়ে যায়।[১৯] এই ঘটনার পরও মিলে শ্রমিক ধর্মঘট পূর্বের মতই চলতে থাকে এবং তার নেতৃত্বেও ছিলেন মণি সিংহ। ধর্মঘটের কাজটা বেশী শক্তিশালী হত সকালের দিকে, এসময় মণি সিংহ মিল গেটে উপস্থিত থেকে পিকেটিংয়ে নের্তৃত্ব দিতেন। দিনের অন্যান্য সময় আর তেমন একটা পিকেটিং করতে হতনা, এমনিতেই ধর্মঘট পলিত হত। মালিক পক্ষ এই আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য কারবালা ময়দানে (কারবালা একটি মাঠের নাম) একটি জনসভার আয়োজন করে এবং তাতে সুভাষ বসুর মাধ্যমে হরতাল প্রত্যাহার করার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেন।[২২] যাইহোক সুভাষ বসু মালিকদের পক্ষে বক্তব্য দিলে এতে শ্রমিক আন্দোলন ভেঙ্গে যেতে পারে এই আশঙ্কায় মণি সিংহ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন, কিন্তু শ্রমিকরা মণি সিংহকে অভয় দিয়ে বলেন, "সুভাষবাবু বিড়লাজির পক্ষে বক্তব্য দিলেও কিছুই হবে না, সব শ্রমিক এক আছে, তাদের বক্তব্যের পর আপনাকেও বক্তব্য দিতে হবে"। মণি সিংহ শ্রমিকদের বলেন, "আমি কি বক্তব্য দিব? আমি জীবনে কখনো বক্তব্য দেই নাই"। শ্রমিকরা বললেন, "ফিকির মাত কিজিয়ে'স্রেফ বলিয়েগা হামলোগ পাউন্ড মাংতা, ইয়ার্ড নেহি মাংতা, যো থুক ফেকা হ্যায় উর থুক আওর নেহি চাটেগা, ব্যাস আওর কুচ নেহি।"[২১] এসময় মণি সিংহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়েন। একদিকে পুলিশ ও মালিকের পোষ্য বাহিনীর আক্রমণের ভয় অন্যদিকে মিল মালিকের পক্ষ নিয়ে নেতাজীর আগমন। সবমিলিয়ে বিষয়টি বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রমিকদের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি আন্দোলনরত শ্রমিকদের নিয়ে সভার দিনে কারবালা মাঠে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখেন কারবালা মাঠে প্রায় হাজার তিনেক শ্রমিক উপস্থিত হয়েছে, সামনে বানানো স্টেজে মিলের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত থাকলেও সুভাষ বসু তখনো উপস্থিত হননি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সুভাষ বাবু এসে উপস্থিত হন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মিটিং শুরু হয়ে যায়। কর্মচারীরা সকলেই একে একে বক্তব্য দিলেন যে বিড়লারা অতি মহৎ লোক, তারা শ্রমিকদের বাবা-মা, ইয়ার্ড খুব ভালো ব্যবস্থা, তোমরা সবাই কাজে যোগ দাও। নেতাজী তার বক্তব্যে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না বলে বলেন, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর এবং সম্ভব হলে হরতাল তুলে নাও। শ্রমিকরা এসব বক্তব্য নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, কেউ কোন টু শব্দ পর্যন্ত করছিলেন না। শ্রমিকরা এই সময় পাশের এক চায়ের দোকান থেকে একটি টেবিল আনলে মণি সিংহ তার উপর উঠে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "পেয়ারে ভাইও হামলোক পাউন্ড মাংগতা, ইয়ার্ড নেহি মাংগতা, যো থুক ফেকা হয়

ও যুক পের নেহি চাটেগা, আপলোক রায় দিজিয়ে।" মণি সিংহ চিৎকার করে তার এই বক্তব্য দেওয়ার পর পরই শ্রমিকদের নীরবতা ভেঙ্গে যায় এবং তারাও চিৎকার করে বলতে থাকে পাউন্ড মাংগতা, ইয়ার্ড নেহি মাংগতা, হরতাল চালু রহেগা। শ্রমিকদের চিৎকারে চারিদিকে হট্টগোল শুরু হয়ে যায় এবং যে যার মত সরে পরতে শুরু করেন, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মিটিং ভেঙ্গে যায়।[২২]

এই ঘটনার কিছুদিন পর চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট দত্ত সাহেব মাটিয়াবুরুজে এসে মণি সিংহের সাথে সাক্ষাত করে তিনি তার (মণি সিংহের) মামা সুরেশ সিংহের পরিচয় দিয়ে বলেন, "আমি তোমার মামার বন্ধু লোক, আমি তোমাকে জানি। আমি যে কারণে এসেছি তা হল ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সমঝোতা করতে প্রস্তুত আছে, তুমি তার অফিসে গিয়ে দেখা কর।" প্রত্যুত্তরে মণি সিংহ বলেন, "আমি একা যেতে পারিনা, আট/দশ জন শ্রমিক নিয়ে ডেপুটেশনে যেতে হবে।" তিনি বলেন, "তাই যাও, দেখ কোন অশান্তি বা গোলযোগ না হয়।" শেষ পর্যন্ত মিল মালিকপক্ষ ওই ম্যাজিষ্ট্রেটের মাধ্যমেই কথাবার্তা চালান এবং মণি সিংহও শ্রমিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে দশজন শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে ঘনশ্যাম দাস বিড়লার অফিসে যান এবং দাবীগুলি পেশ করেন। দাবীগুলো হচ্ছে ঃ (১) পাউন্ডে মজুরি পুনঃ প্রবর্তন, (২) কাহাকেও চাকুরী থেকে ছাঁটাই না করা এবং (৩) ধর্মঘটের সময়ের মজুরি প্রদান করা। মালিকপক্ষ প্রথমে ধর্মঘটের সময়ের মজুরি প্রদান করতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত তা মেনে নেন, কিন্তু পরবর্তীতে শ্রমিকদের সেই মজুরি আর প্রদান করেননি। অন্য দাবীগুলোর ব্যাপারে তারা কোন আপত্তি ছাড়াই মেনে নেন।[২৩]

মাটিয়াবুরুজের এই শ্রমিক আন্দোলন ছিল মূলত পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমদিকের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম। এসময় কলকাতাসহ বিভিন্ন এলাকার আরো বেশ কিছু আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলির মধ্য হতে কিছু কিছু আন্দোলন সফল হলে ব্যর্থতার নজির কোন অংশেই কম ছিল না। তাই মাটিয়াবুরুজের কেশোরাম কটন মিলের এই সফল শ্রমিক আন্দোলনটি শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করে। এই ধর্মঘট সফল হওয়ার পর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিক তাদের একদিনের মজুরি দিয়ে ইউনিয়নের সভ্য হন, যা কমিউনিস্ট অগ্রযাত্রা পথকে অনেকটাই প্রসারিত করেছিল। অন্যদিকে এই ধর্মঘট সফল হওয়ার পর মণি সিংহ সহ শ্রমিকদের জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক শ্রেণী বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেন, যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য কল-কারখানায় ইউনিয়ন ও সংগ্রামের বীজ রোপিত হয়। পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও শ্রমিক নেতারা এই আন্দোলনসহ

আরো কয়েকটি আন্দোলনের সফলতার কারণে রাজনৈতিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে এবং পরবর্তীতে তারা প্ল্যান মাফিক তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সুতরাং একথা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, মাটিয়াবুরুজের কেশোরাম কটন মিলের এই শ্রমিক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা লগ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল এবং এই আন্দোলনসহ ১৯২৮ সালের বিভিন্ন আন্দোলনের সফলতার ধারাবাহিকতায় পশ্চিমবঙ্গে একদিন বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়েছিল, যা আজও অব্যাহত আছে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) মণি সিংহের পুত্র ডাঃ দিবালোক সিংহের কাছ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকার, তাং ১৯.১০.০১ ইংরেজী
২) মণি সিংহ, জীবন সংগ্রাম (প্রথম খণ্ড), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৩, পৃঃ-২৭
৩) মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৯, ৩০
৪) দৈনিক সংবাদ, তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর-১৯৭২ ইংরেজী
৫) মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩০
৬) দৈনিক সংবাদ, তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর-১৯৭২ ইংরেজী
৭) মুজাফ্ফর আহমেদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (প্রথম খণ্ড ১৯২০-১৯২৯)। ন্যাশনাল
৮) দৈনিক সংবাদ, পূর্বোক্ত।
৯) দৈনিক সংবাদ, তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর-১৯৭২ ইংরাজী
১০) অমিতাভ চন্দ্র, অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন
১১) দৈনিক সংবাদ, পূর্বোক্ত।
১২) দৈনিক সংবাদ, তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর-১৯৭২ ইংরেজী
১৩) মুজাফ্ফর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৬৭
১৪) মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩৫
১৫) দৈনিক সংবাদ, পূর্বোক্ত
১৬) দৈনিক সংবাদ, পূর্বোক্ত
১৭) মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩৭
১৮) ১৯২৮ সালেব পুলিশ রিপোর্ট, কলকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও আর্কাইভস
১৯) মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩৬, ৩৭
২০) দৈনিক সংবাদ, পূর্বোক্ত
২১) মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩৬
২২) মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩৬, ৩৭
২৩) দৈনিক সংবাদ, পূর্বোক্ত

# ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

রাসবিহারী মিশ্র

এতকাল চলছিল দরকষাকষি ইংরেজদের সঙ্গে। ব্রিটিশ শক্তি তখন যুদ্ধে লিপ্ত ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে। ১৯৪২ সালের মার্চের শুরুতেই রেঙ্গুন জাপানিরা দখল করে নিল। সমগ্র বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে জাপানি রণতরীগুলির আধিপত্য বিদ্যমান। যে কোন সময় বঙ্গদেশ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা বড় অঞ্চল জাপানিদের হাতে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় বৃটিশ সরকার উদ্বিগ্ন। ভারতবাসী স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিজের সংকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে ব্রতী। অন্যদিকে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু জাপান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। জাপানি বন্দী শিবির থেকে আটক ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে, সুভাষচন্দ্র "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গড়লেন।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাব বাতিল। এই অবস্থায় গান্ধীজির উদ্যোগে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট রাত্রে বোম্বাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং-এ "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ হয়। এরপর নিপীড়ন যদি চলে তাহলে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী নিজেই হবেন নিজের পথপ্রর্দশক। শুধু গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেই হবে না। যেভাবে পারেন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। গান্ধীজি তার সঙ্গে যুক্ত করলেন আরও দুটি শব্দ "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।

কংগ্রেস কাজকর্মের উপর ব্রিটিশ সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ভোর হতে না হতেই ৯ই আগষ্ট বোম্বাইতে গান্ধীজি সহ কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশাসক মনে করেছিল নেতাদের বন্দী করে রাখা হলে আন্দোলন দানা বাঁধতে পারবে না। কংগ্রেস বেআইনি ঘোষিত হল। যাদের গ্রেপ্তার করতে পারলেন না তারা হলেন অরুনা আসফ্ আলি, অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন ও ডঃ রামমোহন লহিয়া। প্রথম আন্দোলন সুরু হল বোম্বাই শহরে। আহ্বানের উপেক্ষা না রেখে বোম্বাই শহরের শতশত মানুষ প্রতিবাদী কার্যক্ষমে অংশ গ্রহণ করার জন্য

আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই স্বতঃস্ফূর্ততাই আগষ্ট বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাজারিবাগ জেলে বসে আগষ্ট বিপ্লবী জয় প্রকাশ নারায়ণ ভাবছেন কিভাবে জেল থেকে বাহিরে যাওয়া যায়, জেলে সহবন্দী পূরম নারায়ণ সিংহের সহায়তায় দেয়াল টপকালেন ভাদ্র মাসের এক দুর্যোগের রাতে। জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কখনও পাটনায়, কখনও কলিকাতায়, কখনও বোম্বাই এবং এলাহাবাদে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর মণিপুর থেকে রেঙ্গুনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে সীমান্ত অতিক্রমে ব্যর্থ হয়ে কলিকাতায় ফিরে এলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমোহন লহিয়া এবং অরুণা আসফ্ আলি প্রমুখ আত্মগোপন অবস্থায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করেন।.মহারাষ্ট্রের সাতরায়, উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায়, আজমগড়ে, ওড়িশায় তালবের এবং বাংলার মেদিনীপুর এবং বালুরঘাটে এই আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। এই অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়।

কলিকাতায় আগষ্ট আন্দোলন সংগ্রামের রূপ নেয় ১৯৪২ সালের ১৩ই আগষ্ট থেকে। ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে নেতারা কারান্তরালে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র সমাবেশের উপর ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরদিন সারা শহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। শ্রীমানি বাজারের সামনে পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যা করে। এরপর কলিকাতায় গণবিক্ষোভ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। ট্রামবাসে আগুন দেওয়া হয়, টেলিফোন-টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে জনতা তাদের ক্রোধ প্রকাশ করে। আগষ্ট আন্দোলনের খবরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার প্রতিবাদে ১৯৪২ সালের ১৮ই আগষ্ট থেকে সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়। এই অবস্থায় কলিকাতা শহরকে মিলিটারীর হাতে তুলে দেওয়া হল। ঐ কয়েকদিন পুলিশ মিলিটারীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা দেড়শয়ের বেশী। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে গিয়ে গোপনে পাচার করে দেয় এবং এই সংবাদ কঠোরভাবে চেপে দেওয়া হয়েছিল। আগষ্ট মাসের শেষভাগে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অরুণা আসফ্ আলির সঙ্গে মেদিনীপুর কংগ্রেসের সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখার্জীর যোগাযোগ হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের উপর দায়িত্ব ছিল সারা দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে একটি গোপন যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা ও গুপ্ত বুলেটিন প্রচার করা। এই সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার অবিভক্ত তমলুক মহকুমার অগ্রণী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইংরেজের নির্যাতন ও অত্যাচার মেদিনীপুরবাসী কোনভাবে মেনে নেননি। পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানের অপ্রতিরোধ্য গতি ঠেকাতে না পেরে বৃটিশ

সরকার আতঙ্কিত হয়ে ভাবল, যে কোন মুহূর্তে জাপান সমুদ্রতীরবর্তী কাঁথি ও তমলুক মহকুমা আক্রমণ করতে পারে। সেই থেকে যানবাহন অপসারণ আরম্ভ হল। এই অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার যাতে শত্রুর জিম্মায় চলে না যায় সেজন্য খাদ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হয়। একে বলা হয় সরকারের সংরক্ষণ নীতি। সৈন্যদের খাদ্য জোগানের কাজে নিযুক্ত এজেন্ট ইস্পাহানী কোম্পানী দনিপুর রাইস মিল থেকে হাজার হাজার মন চাল সংগ্রহ করে কলিকাতায় চালান দিত। জেলা থেকে ধানচাল বাইরে রফতানি যাতে না হয় সে বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় এই অঞ্চলের মানুষদের অভুক্ত রেখে হাজার হাজার মন চাল রূপনারায়ণ নদীর দুপাশের সমস্ত রাইস মিল থেকে এজেন্ট মারফত চালান যাচ্ছে। আগষ্ট আন্দোলনের ঘোষিত কর্মসূচী জেলায় গ্রহণ করতে দেরী হলো কেন? ৯ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ পর্য্যন্ত সারা ভারতে যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে-বিপ্লবের অগ্নিশিখা তখন মেদিনীপুর শুধু সভা, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ মিছিলের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রেখেছে। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব অহিংস বা সহিংস কোন পদ্ধতিতে চলবে তার মূল্যায়ণ চলছে। একথা স্বীকার করতে হবে জেলার ছাত্র ও যুব সমাজ হিংসা-অহিংসার চুলচেরা বিচারে মোটেই আগ্রহী ছিল না। গান্ধীজি গ্রেপ্তারের পর একমাস অতিবাহিত হতে চললো, কোথা থেকে সুরু হবে মুক্তি সংগ্রামের প্রথম সূচনা? হঠাৎ ১৯৪২ এর ৮ই সেপ্টেম্বর তমলুকের সন্নিকটে রূপনারায়ণ নদীর ধারে দনিপুর চালকল মালিকের চাল পাচারের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে এই এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার বুভুক্ষু জনতা "বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে মিলগেটে পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন রাসবিহারী মিশ্র, গুরুচরণ অধিকারী, বেণু মহাপাত্র। মিছিল থেকে জনতার দাবী, আমাদের অভুক্ত রেখে সৈন্যদের জন্য চাল পাঠানো বন্ধ করতে হবে। পুলিশ সতর্ক বার্তা না দিয়ে অহিংস জনতার উপর গুলি চালায়। গুলিতে তিনজন যুবক মৃত্যুর কোলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং বেশ কয়েকজন আহত হল। আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার প্রথম তিন শহীদ সুরেন্দ্র নাথ কর, শশীভূষণ মান্না এবং ধীরেন্দ্রনাথ দীগার পথ দেখালো। প্রতিশোধের আগুন সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়লো - তার পরিণতি "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার"। দনিপুরের ঘটনার পরদিন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এন.এম. খাঁন বিরাট সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে দনিপুরের সংলগ্ন পাঁচটি গ্রামে সাঁড়াশী অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু যুবককে তমলুক কোর্টে চালান দিয়ে ভেবেছিলেন যে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের মধ্য দিয়ে নতুন কোন বিক্ষোভ আর দানা বাঁধতে

পারবে না। ঘটনার তিনদিন পরে ১১ই সেপ্টেম্বর তমলুক মহকুমার কংগ্রেসের গোপন প্রচার পুস্তিকা "বিপ্লবী" তার ৬২তম সংখ্যায়— সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে লিখল— "ইস্পাহানি কোম্পানী বা তার দালালকে এক মুঠা ধান ও চাল বিক্রি করবে না, মুটে গাড়োয়ান, দাঁড়ি মাঝি কেউ এসব বইবেন না যদি লাঠি চালায়, গুলি চালায় প্রাণ দিবেন তবু ধান দিবেন না।" পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৯২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তীতে ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায় তাই এই ঘটনাকে '৪২ আগষ্ট আন্দোলনের জেলার এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থানের প্রথম সোপান বলেছিলেন এবং দনিপুরের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ভবিষ্যতের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের পরিচালকরা। দনিপুরের গণ অভ্যুত্থানের পর আর সময়ের অপেক্ষা না রেখে জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মন্মথ নাথ দাসের কলিকাতার চেতলার বাড়ীতে এক বৈপ্লবিক কর্ম্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র সামন্ত, সুশীল কুমার ধাড়া, বিরাজ মোহন দাস ও রমেশ চন্দ্র কর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে একটি নির্দিষ্ট দিনে সমগ্র জেলার প্রত্যেকটি থানায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের অন্যতম দুর্গ-থানা এবং অন্যান্য সরকারী অফিসগুলি আক্রমণ ও ধ্বংসসাধন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে স্তব্ধ করে দেওয়া। ঐ ঐতিহাসিক অভিযানের দিন নির্দিষ্ট হল ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

জেলা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উক্ত কর্ম্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য তমলুক মহকুমার নেতৃবৃন্দ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বিশদ কর্ম্মসূচী প্রণয়ন এবং নির্দিষ্ট দিনে ছয়টি থানা আক্রমণের কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যাপক গণসংযোগ গড়ে তোলেন। সমস্ত অফিস আদালত বর্জনের আহ্বান জানান হয় জনসাধারণকে। ঐতিহাসিক আক্রমণাত্মক অভিযান বাস্তবায়িত করার জন্য নেতৃবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবকরা পূর্বরাত্রির কর্মসূচী অনুসারে পাঁশকুড়া থেকে সূতাহাটা পর্য্যন্ত মোটর চলাচলের রাস্তা এবং নন্দকুমার থেকে কাঁথিগামী রাস্তা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন পোষ্ট উপড়ে ভেঙ্গে ফেলা হল। ভেঙ্গে ফেলা হলো রাস্তার ৩০টি কালভার্ট। থানা আক্রমণের প্রাক পর্বে নীরবে নিভৃতে অমানিশার অন্ধকারে রচিত হল তমলুক মহকুমার আগষ্ট আন্দোলনের এক অনন্য অধ্যায়। ২৯শে সেপ্টেম্বর বহু শহীদের রক্তে রাঙা এই দিনটি মেদিনীপুরের তো বটেই, সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ভীত সন্ত্রস্ত শাসককুল ২৮শে সেপ্টেম্বর রাতের ঘটনার খবর পেয়ে মিলিটারী কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হলেন। বেতার মারফত সাহায্য চেয়ে পাঠান হল। মিলিটারী সহায়তায় যত তাড়াতাড়ি রাস্তার সংলগ্ন গ্রামের লোকজনকে জোর করে কাজে লাগিয়ে রাস্তা মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ করে গাড়ী চলাচলের পথ সুগম করতে সক্ষম হয়। বেলা ২টা নাগাদ বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্যদল ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তমলুক শহরে পৌঁছে গেল। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ঐদিন প্রায় ৫০ হাজার নরনারী তমলুক শহরের পাঁচটি প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বন্দুকধারী সৈন্যদল প্রতিটি প্রবেশ পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ সেই অবরোধ ভেঙ্গে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চলতে থাকে। শহরের উত্তরাংশে কোর্টের দিকে শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে-নেতৃত্বে ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা—যিনি গান্ধীবুড়ি নামে পরিচিতা। একহাতে বিজয়শঙ্খ, অন্যহাতে ভারতের কোটি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার দীপ্ত প্রতীক-ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। চলমান শোভাযাত্রীরা সঙ্গে এগিয়ে চললেন অকুতোভয়ে। পুলিশের গুলিতে তাঁর বাম হাতের কনুই বিদ্ধ হল। মাতঙ্গিনী দেবী সেই আঘাতের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। দ্বিতীয়গুলি তাঁর ডান হাতের কনুই বিদ্ধ করল। তবুও জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ রেখে তিনি সৈন্যব্যূহের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং দেশীয় সৈন্যদের গুলি চালনা বন্ধ করে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য চাকুরী ছেড়ে আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান। সৈন্যরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দানের পরিবর্তে পুনরায় গুলি চালায়। মাতঙ্গিনী দেবীর প্রাণহীন দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জাতীয় পতাকা তখনও বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ। মহীয়সী এই বীর রমণী এইভাবেই সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুকে মহিমময় করে শহীদ হলেন। তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন দুই বালক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩), পুরীমাধব প্রামাণিক (১২) এবং আরও দুই যুবক জীবনচন্দ্র বেরা (২৩) ও নগেন্দ্র নাথ সামন্ত। মাতঙ্গিনী হাজরা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীতলে। প্রমাণ করলেন— "অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা/বুঝি আরও দিতে হবে এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে।" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনাদের পাশে গৌরবের আসন করে নিল এই পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা নারী। গান্ধীজির অমর মন্ত্রে দীক্ষিতা মাতঙ্গিনী হাজরা। শহরের পশ্চিমপ্রান্তে তমলুক থানার কাছে মিছিলে পুলিশের গুলিতে বীর কিশোর রামচন্দ্র বেরার বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহটি

রাস্তায় পড়ে থাকে। সৈন্যদল কঙ্করময় পথের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে থানার প্রধান দরজার সামনে ফেলে রাখে। একটু পরে জ্ঞান ফিরলে রামচন্দ্র বেরা চিৎকার করে বলে "আমি থানা দখল করেছি"— অজয়দাকে বলো— "আমি থানা দখল করেছি", পরমুহূর্তে তার প্রাণহীন দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। দক্ষিণ দিকে শোভাযাত্রা ব্যবত্তারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষিরোদ চন্দ্র মাইতির নেতৃত্বে শহরের দিকে এগিয়ে চলে। শঙ্করআড়া ব্রিজের মুখে পুলিশ ও মিলিটারী দল শোভাযাত্রার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং কোন রকম সতর্ক বাণী ছাড়াই গুলি চালাতে শুরু করে। উপেন্দ্র নাথ জানা ঘটনাস্থলে শহীদ হন এবং অনেকেই আহত হয়। গুলিতে আহত শোভাযাত্রাকারীদের মুখে 'জলজল' চিৎকার শুনে পাশের বারাঙ্গনা পল্লী থেকে সাবিত্রী দাসী নামে এক মহিলা ঘটিভরা জল নিয়ে এসে তাদের মুখে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন কয়েকজন সিপাহী বন্দুক হাতে তার দিকে তেড়ে যায় এবং জল দিতে নিষেধ করে। সাবিত্রী দেবী বাড়ী ফিরে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি মাছকাটা বটি হাতে নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর পিছনে ঐ বারাঙ্গনা পল্লীর আরও কয়েকজন মহিলাও এক হাতে জলের ঘটি এবং অন্য হাতে বঁটি নিয়ে এগিয়ে আসেন। সাবিত্রী দেবী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন— "আয় কে আসবি, এগিয়ে আয়— আমি এদের মুখে জল দেবই, কার সাহস আছে আমাকে আটকাবি আয়"। তাঁব সেই রণরঙ্গিনী মূর্তির সামনে বন্দুকধারী সিপাহীরা কেহই আর তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি। তিনি ও তার সঙ্গী মহিলারা তারপর বিনা বাধায় আহতের মুখে জল দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়— আহত বিপ্লবীদের তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে সারারাত ধরে সেবাশুশ্রূষা করেছেন। সেদিন ঐ বারাঙ্গণা যেভাবে বীরাঙ্গনারূপে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে অকুতোভয়ে আহতের সেবায় এগিয়ে এসেছিলেন— দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আগস্ট বিপ্লবের রূপকার অজয় মুখোপাধ্যায় ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঐদিন পুলিশের গুলিতে ১৩ বছরের লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের মৃত্যুর খবর পেয়ে গভীর রাতে মথুরীর বাড়ীতে যান। লক্ষ্মীনারায়ণের মা পুত্র শোকে কাঁদছেন। অজয়বাবু ভাবছেন কি দিয়ে সান্ত্বনা দেবেন-- পুত্র হারা মা-বাবাকে। পুত্র হারা মা কাঁদতে কাঁদতে বাহিরে বেরিয়ে এলেন - "আমার কি কষ্ট হচ্ছে তা কি দিয়ে বুঝাব?" তবে দাদাবাবু একটা কথা বলি— "তোমরা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তাহলে আমি মা হলেও ছেলের শোক ভুলব"। তমলুক শহরে ঐদিন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী সহ দশটি তাজা প্রাণ শহীদ হল। ২০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল।

মহিষাদলে "বিদ্যুৎবাহিনী" নামে সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদল এবং বাহিনীর জি.ও.সি সুশীল কুমার ধাড়ার নেতৃত্বে প্রায় চল্লিশ হাজার নরনারী এক অনন্য আক্রমণ গড়ে তোলেন। সেনানায়ক ছিলেন সদ্য স্কুল ছেড়ে আসা গোপীনন্দন গোস্বামী। মহিষাদলের জমিদার গর্গ বাহাদুররা থানার পুলিশকে সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেন এবং বেশ কয়েকটি বন্দুক ও প্রচুর পরিমাণে বুলেট দেন। শোভাযাত্রা যখন থানার দিকে এগুচ্ছে তখন মহিষাদল জমিদারের দেহরক্ষী অগ্রগামী জনতার উপর অনর্গলভাবে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। অবিরাম গুলি বর্ষণের মুখে জনতা শেষ পর্য্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। মহিষাদলে সেদিন মোট তের জন মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন। মহিষাদল রাজার ব্রিটিশ প্রীতি এবং জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্ষমা করতে পারেনি। একদিন পরে ক্রুদ্ধ জনতা মহিধাদল রাজার কাছারী বাড়ী পুড়িয়ে দেয় এবং গেঁওখালির সরকারী ডাক বাংলোও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে সূতাহাটা থানার বিপ্লবী জনগণের থানা অভিযান সফল হয়েছিল বিনা রক্তপাতে। বিদ্যুৎবাহিনীর নেতৃত্বে প্রায় তিরিশ হাজার জনতা শোভাযাত্রা করে থানায় উপস্থিত হয়। তমলুক থেকে কোনও সৈন্য ও পুলিশ আসতে পারেনি। থানার দারোগা এবং পুলিশ জনতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ছয়টি বন্দুক এবং কিছু কার্তুজ বিপ্লবীদের হাতে আসে। বিপ্লবীদের নির্দেশে আত্মসমর্পণকারী পুলিশ দল জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে। সৈন্য পাঠাতে না পেরে সরকার সৈন্যবাহিনীর একটি বিমান সূতাহাটায় পাঠায়। বিমানটি সূতাহাটা থানাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং জনতার উপর দুটি বোমা নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যক্রমে দুটি বোমা পুকুরে পড়ায় কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

২৯শে সেপ্টেম্বর নির্ধারিত দিনে নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ তার মাত্র দুদিন আগে ঐ থানার নটশ্বরপুরে গুলি চলেছিল এবং সেখানে চারজন শহীদ হয়েছিল। পরদিন ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রায় বিশ হাজার বিপ্লবী জনতা নন্দীগ্রাম থানা অধিকার করতে এগিয়ে যায়। অগ্রগামী জনতার উপর গুলি চালালে চারজন শহীদ হলেন। কলেজত্যাগী দুই ছাত্র নেতা বঙ্গভূষণ ভক্ত ও অমূল্যরতন ভৌমিক এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে '৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর শুধু তমলুক মহকুমার কেন, সমগ্র বঙ্গ ও ভারতবর্ষের পক্ষে একটি গৌরবময় দিন। অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনে এই ঐতিহাসিক দিনগুলি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনের সমস্ত পরিকল্পনার মূল রূপকার ছিলেন অজয়কুমার। এই গণ অভ্যুত্থানের পরেই শুরু হলো পুলিশী তাণ্ডব। শহর এবং

গ্রামের বাজারগুলিতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং সৈন্যদল আমদানি করে সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল। সান্ধ্য আইন জারি করে জনসাধারণের জীবন যাত্রার গতিপথ সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। নির্বিচারে গুলিবর্ষণ, অবাধ লুণ্ঠন, অযথা হয়রানি, গ্রেপ্তার, গৃহদাহ ও নারী নির্যাতন প্রভৃতি অত্যাচার চালিয়েও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়া দূরে থাক— বরং দিনে দিনে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নেতৃত্বের নির্দ্দেশিকার প্রতীক্ষায় ছিল। এই অবস্থায় ১৬ই অক্টোবর ১৯৪২ মহাসপ্তমীর দিন হঠাৎ তমলুক ও কাঁথি মহকুমার বুকে নেমে এল মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। শুরু হল ঘূর্ণিঝড়, ঐ সঙ্গে সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে গ্রামগুলি ভাসিয়ে দিয়ে গেল। বন্যায় প্রায় চার হাজার জনের মৃত্যু হয় এবং ৬৯ হাজার গবাদি পশু মারা যায়, দেড় লক্ষ বাসগৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং ২ লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হয়। সব চেয়ে বেদনাদায়ক ঝড়ের পূর্বাভাস জেলা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে সতর্ক না করে চেপে রেখেছিলেন। সরকারী সাহায্য তো নাই, কোন বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বন্যাপীড়িতদের কোন ধরনের সাহায্য করার অনুমতি দেওয়া হল না। বাংলাদেশে তখন ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীসভা গদীতে আসীন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন অর্থমন্ত্রী। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন প্রাকৃতিক বা রাজরোষে নিপীড়িত মানুষদের সাহায্য করতে, ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ঐ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। আর একটা কাজ করেছিলেন, ভারত রক্ষা আইনের বলে সমস্ত সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে তখন মেদিনীপুরের উপর যে অবিচার অত্যাচারের স্রোত বয়েছিল সেগুলি ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতার মাধ্যমে নির্ভীকভাবে তুলে ধরেছিলেন। সারা জেলাব্যাপী যে বেপরোয়া পুলিশিতাণ্ডবে গরীব মানুষের আশ্রয় স্থলগুলি পেট্রোল দিয়ে একটার পর একটা ঘর পুড়িয়ে দিল - কোন সভ্যজাতির ইতিহাসে স্থান আছে কি? ব্রিটিশের শাসন, শোষণ, নির্যাতন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতিতে দুর্ভোগ চরম হলেও মেদিনীপুরের মানুষ 'স্বাধীনতার' জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। ১লা পৌষ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২) স্থাপিত হল "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার"। তাম্রলিপ্ত সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন মেদিনীপুর জেলার অনন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ চন্দ্র সামন্ত। প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য সর্বাধিনায়কের অধীনে কয়েকটি বিভাগে ক্ষমতা বণ্টন করা হল।

**গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মন্ত্রীগণ হলেন ঃ—**

| | | |
|---|---|---|
| সতীশ চন্দ্র সামন্ত সর্বাধিনায়ক | — | পররাষ্ট্র বিভাগ |
| অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় | — | অর্থ বিভাগ |

| | | |
|---|---|---|
| সুশীল কুমার ধাড়া | — | স্বরাষ্ট্র এবং সমর বিভাগ |
| ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র বসু | — | বিচার বিভাগ |
| সতীশ চন্দ্র সাহু | — | খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ |
| প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক | — | প্রচার বিভাগ |

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কর্মের পরিধি বিস্তৃত ছিল যথাক্রমে তমলুক, মহিষাদল, সূতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম এই চার থানার উপর। সুতরাং সর্বাধিনায়কের পরামর্শ এবং প্রশাসন পরিচালনায় সহায়তার জন্য এই চার থানার কর্মকর্তা এবং মহকুমার প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেতৃত্বের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শদাতা কমিটি (Advisory Council)।

ঠিক এইভাবে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩ স্বাধীনতা দিবসে তমলুক, মহিষাদল, সূতাহাটা, নন্দীগ্রাম থানায় এক একজন "অধিনায়ক"-এর উপর মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে নিয়ে "থানা জাতীয় সরকার" চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে।

**সর্বাধিনায়ক**

**সতীশ চন্দ্র সামন্ত**

| | | |
|---|---|---|
| মহিষাদল থানা | অধিনায়ক | নীলমনি হাজরা |
| তমলুক থানা | ঐ | গুণধর ভৌমিক |
| সূতাহাটা থানা | ঐ | জনার্দন হাজরা |
| নন্দীগ্রাম থানা | ঐ | কুঞ্জ বিহারী ভক্তদাস |

এই সঙ্গে ঘোষণা করা হল— আজ এই স্বাধীনতা দিবসে "বিদ্যুৎ বাহিনীকে" জাতীয় সরকারের সৈন্যবাহিনী বলিয়া গণ্য করা হইল এবং "বিপ্লবী" পত্রিকা সরকারের মুখপত্র করা হইল। অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। "বিপ্লবী" পত্রিকা সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে তরুণ যুবকদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করত। জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা এবং রূপরেখা তৈরী হয়েছিল স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কোন নির্দেশিকা এর মধ্যে ছিল না। এই জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে তেমন কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। যথা— শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, অর্থ, যোগাযোগ, বিচার ও প্রতিরক্ষার মত দপ্তরগুলি নির্দিষ্ট মন্ত্রী বা সচিবের পরিচালনাধীন থাকলেও সমস্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সতীশ সামন্ত এবং অজয় মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হত। জাতীয় সরকারের বিচারালয়ে অপরাধীদের ধরে এনে বিচার করা হত। ৯ই জানুয়ারী ১৯৪৩ - প্রায় ছয়শত পুলিশ ও মিলিটারী সৈন্য

মহিষাদল থানার চণ্ডীপুর, মাশুড়িয়া গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামের সমস্ত পুরুষদের ধরে নিয়ে যায়। তারপর চলে অবাধ লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন। ঐ দিনে বর্বর পশুরদল প্রকাশ্য দিবালোকে ৪৯টি অসহায় নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। কোন কোন নারীর উপর একাধিক বার উপর্য্যুপরি ধর্ষণ চালায়। এইভাবে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ অত্যাচার এর পূর্বে কখনও ঘটেনি। জাতীয় সরকারের মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রণা পরিষদ সুদীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন— এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এই সব দেশদ্রোহী দালালদের চরম শাস্তি দিতে হবে— প্রয়োজন হলে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ভার দেওয়া হল "বিদ্যুৎ বাহিনীর" উপর। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর বেশ কয়েকজন কুখ্যাত অপরাধী এবং বৃটিশের দালালদের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা সংরক্ষণে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আর্তমানুষের সেবা ও পুনর্বাসন। প্রকাশিত ৫১তম সংখ্যা "বিপ্লবী"তে ঐ পত্রিকায় সংবাদদাতা লিখেছেন— তমলুক মহকুমার বেশীরভাগ গৃহস্থের যা কিছু অন্নের সংস্থান ছিল শেষ হয়ে গিয়াছে। শাকপাতা, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ফলে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর প্রিয় সহচর সংক্রামক রোগ ও মৃত্যু ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠান "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" এবং মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটির সাহায্যার্থে "মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি" পরিচালিত হতো। জাতীয় সরকার স্থাপিত হওয়ার (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২) পর আর্তত্রাণে জাতীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় এবং বেসরকারী ত্রাণ কমিটির সহায়তায় "মহেন্দ্র রিলিফ্ কমিটির" কাজ উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করে। যে সব প্রতিষ্ঠান ঐ সময় আর্তদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর মহামারী রোখার জন্য মহেন্দ্র রিলিফ কমিটির পরিচালনায় কয়েকটি মেডিক্যাল কেন্দ্র মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়। কলিকাতা থেকে ডাক্তার এবং পাঠরত ছাত্ররা অনেক দূরদূরান্ত গ্রামের মেডিক্যাল কেন্দ্রগুলিতে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাকার্যে ব্রতী ছিলেন। জাতীয় সরকার ৭৯০০০ টাকার ঔষধপত্র, কাপড় চোপড়, খাদ্য দ্রব্যাদি, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের হাতে মহেন্দ্র রিলিফ কমিটি মারফৎ দিয়েছিলেন। সুদূর নন্দীগ্রাম ও সূতাহাটা থানার যোগাযোগ বিহীন গ্রামগুলিতে ডাক্তার বাবুদের আন্তরিক সাহচর্যে দুর্ভিক্ষজনিত মহামারী অনেকাংশে ঠেকানো সম্ভব হয়েছিল। প্রধানত জাতীয় সরকারের স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কেন্দ্রে ত্রাণের জিনিষগুলি বিলি বন্দোবস্ত করা হত। আত্মগোপন

অবস্থায় এই প্রবন্ধের লেখক (রাসবিহারী মিশ্র) ঐ মেডিক্যাল কেন্দ্রগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৪৩-এর ২৬শে মে জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্ত কলিকাতায় গ্রেপ্তার হলেন। তাঁরপর অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। গ্রেপ্তারের পর সতীশবাবুকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালতে বিচারকের সামনে বিপ্লবী নায়ক ঘোষণা করলেন— "আমি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সেই জাতীয় সরকারের আমি সর্বাধিনায়ক। বিদেশী সরকারের কোন আইন আমি মানি না এবং আমার বিচার করার কোন অধিকার বা এক্তিয়ার এই আদালতের আছে বলে আমি স্বীকার করিনা"। আদালতের রায়ে তিন বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অজয় বাবুর সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনায় জাতীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ করে বিচার বিভাগ, দেশরক্ষা, আর্তত্রাণ ও আইন শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিভাগ আরও বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৪৩ এর ১৯শে সেপ্টেম্বর তমলুক থানার গনপতি নগরে গুণধর মাইতির বাড়ীতে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। অজয় কুমারের গ্রেপ্তারের পর প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী সতীশ চন্দ্র সাহু তৃতীয় সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। সতীশ চন্দ্র সাহুর পর চতুর্থ সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন বরদা কাণ্ড কুইতি। ১৯৪৪ সালের ৬ই মে গান্ধীজি আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পেলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং সমস্ত কংগ্রেস কর্মীকে আত্মপ্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেন। গান্ধীজির নির্দেশ অনুসারে জাতীয় সরকারের সর্বাধিায়ক বরদাবাবু ৯ই আগষ্ট ১৯৪৪ তমলুক শহরে সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ শেষ স্বেচ্ছাসেবক দলকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল কুমার ধাড়া সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্বল অধ্যায়ের এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সঠিকভাবে মূল্যায়ন এখনও বাকী রইল— ভবিষ্যতে দায়দায়িত্ব রইল এই প্রজন্মের উপর। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে সতীশ চন্দ্র সামন্ত জেল থেকে মুক্তি পেলে। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল - এই অভিযোগের ভিত্তিতে গান্ধীজি মেদিনীপুর আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গান্ধীজির আগমন উপলক্ষে সতীশ সামন্তকে সভাপতি করে এক অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। গান্ধীজির ১৯৪৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মহিষাদলে আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমস্ত অভিযোগ শুনে গান্ধীজি আভা গান্ধী এবং ডাঃ সুশীলা নায়ারকে মহিষাদলের একটু দূরে মাশুড়িয়া গ্রামে পাঠিয়ে ৪৯জন ধর্ষিতা মহিলাদের সেই নৃশংস হৃদয় বিদারক কাহিনী শুনলেন। গান্ধীজি শেষ রায় দিলেন জনতার দরবারে— "বৃটিশরা যা

**করেছে. এখানে আমি হলে কি করতাম জানি না। তোমরা যা করেছ তা বীরোচিত ও গৌরবময়"। আগষ্ট আন্দোলনের ৬৩ বৎসর পরে সেই ৯ই আগষ্ট তোমায় জানাই আমার বিপ্লবী অভিনন্দন।**

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

ভারত ছাড়ো আন্দোলন — অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার — ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতি, স্বাধীনতা আন্দোলন — ডঃ কমল কুমার কুণ্ডু, অজেয় পুরুষ অজয় কুমার — রাধাকৃষ্ণবাড়ী, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর — রাস বিহারী পাল এবং অধ্যাপক হরিপদ মাইতি।

# কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলন

**মানস প্রতিম দাস**

ষাটের দশকে কলকাতা ছিল এক অগ্নিগর্ভ শহর। মিছিল, জমায়েত, স্ট্রাইক, বন্‌ধ, সঙ্ঘর্ষ— এসব যেন কলকাতার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। প্রতিবাদে প্রতিরোধে সামিল হচ্ছিলেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং খাদ্যসঙ্কট অসন্তোষে ভরিয়ে তুলেছিল সধারণ নাগরিকের মন। অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষের অনাচার গড়ে তুলছিল বিরাট ক্ষোভ। এরই ফলশ্রুতিতে নানারকম আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল গোটা শহর জুড়ে। এর পাশাপাশি ছিল বৈদেশিক ঘটনার প্রভাব যা ছাত্র সমাজ থেকে বুদ্ধিজীবী, সবাইকে এনে জড়ো করেছিল প্রতিবাদের মঞ্চে। এর মধ্যে প্রধান অবশ্যই ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যাদের মধ্যে বামপন্থী দলগুলো ছিল অন্যতম, এই অশান্ত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে তৎপর ছিল। প্রতিবাদের স্বাধীন কর্মসূচী হিসেবে শুরু হওয়া বহু ঘটনাই পরে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছিল। এই সব দল নিজেদের শাখা সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে তাকে রাজনৈতিক চেহারা দিয়েছিল। আন্দোলন-সংগ্রামের কিছু উদাহরণ সে সময়ের পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

১৯৬১-র শেষদিকে হিন্দুস্থান মোটর্স কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলন শুরু হয়।। সে বছরের ডিসেম্বর নাগাদ এই আন্দোলন পঞ্চাশ দিন অতিক্রম করে যায়। শ্রমিকদের সমর্থনে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গোটা শহর জুড়ে মিটিং, মিছিলের আয়োজন করে। চলে অর্থ সংগ্রহ অভিযান। দিনটা ছিল পাঁচ-ই ডিসেম্বর। ঐ একই দিনে নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত এবং তাঁর সহ অভিনেতারা শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে পথ নাটকের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন জানান।[১] শ্রমিকদের সমর্থনে শিল্পী মহলের এই উদ্যোগ তৎকালীন কলকাতায় বিরল ছিল না। ষাটের দশকের এই সময়টা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে খাদ্য আন্দোলনের জন্য। দেশের চরম খাদ্যসঙ্কটের প্রভাব পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গেও। রাজ্য জুড়ে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, তার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল

কলকাতা। ১৯৬২ থেকে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে খাদ্যশস্যের দামও বাড়তে শুরু করে। সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, নেমে আসেন রাস্তায়। বহুক্ষেত্রেই খাদ্যশস্যের গোডাউন খুলে নিম্নমূল্যে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় মালিককে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অসহায় সরকার, এই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণেও ব্যর্থ হয়েছিল। খাদ্য আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে ১৯৬৬ সালে। এই বছরে বহু জায়গায় বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশি নির্যাতন চলে। মার্চ মাসে কলকাতা শহরের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা শহরের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠি লেখেন। ঐ মাসেই শহরের চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলাকুশলীদের উদ্যোগে এক অর্থ সংগ্রহ অভিযান হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত বিক্ষোভকারীদের পরিবারকে সাহায্য করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এই অভিযান অবশেষে এক বিরাট মিছিলের আকার নিয়েছিল যাতে সমবেত হয়েছিলেন প্রায় দু'লক্ষ মানুষ। এরা জমায়েত হন ময়দানে।[২]

এদিকে ভিয়েতনামে মার্কিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তখন সরব কলকাতা। গোটা ষাটের দশক জুড়ে এই প্রতিবাদের পালা চলে। ভিয়েতনামে প্রথমে আগ্রাসনকারী ছিল ফরাসীরা, তারপরে আসে মার্কিনিরা। আগ্রাসনের চিত্র বদল হলেও কলকাতায় প্রতিবাদের চিত্র বদল হয়নি এতটুকু।[৩] ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামকে ঘিরে প্রতিবাদের স্রোতে বিপুলভাবে সামিল হন বুদ্ধিজীবীরা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনের পুরোভাগে নিজেদের সংগ্রামী চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৬৫-র জুলাই মাসে ছাত্রছাত্রী এবং বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে পালিত হয় 'ভিয়েতনাম সপ্তাহ'। স্ট্রাইক এবং বিক্ষোভে ভরে ওঠে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর এবং শহরের রাজপথ। এখানেই শেষ নয়, ১৯৭৫-এ সায়গণের পতন তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষের পাশে।[৪]

এভাবেই উত্তাল ছিল গোটা কলকাতা, ষাটের দশকে। এই প্রেক্ষাপটেই শহরে তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ। তখন অবশ্য 'তথ্যপ্রযুক্তি' শব্দটা পরিচিত ছিল না, পরিচিত ছিল 'অটোমেশন'। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে এই অটোমেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। যে কাজ মানুষ করত, সে কাজের দায়িত্ব নিল কম্পিউটার। একটি কম্পিউটার একসঙ্গে অনেক লোকের কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে। ফলে, কম্পিউটারের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল মানুষ। চাকরিজীবীর জন্য বিপদ ডেকে এনেছিল কম্পিউটার। কলকাতায় এ বিপদের সূচনা হয়েছিল পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে। ১৯৬৪ সাল নাগাদ ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া)

লিমিটেডের কলকাতা অফিস থেকে অ্যাকাউন্টস-এর কাজ স্থানান্তরিত হয় ঐ কোম্পানির বম্বে অফিসে। সেখানে তখন কাজ শুরু করে দিয়েছে কম্পিউটার। স্পষ্টতই, কোম্পানির পরিচালকরা চেয়েছিলেন বম্বে অফিসের কম্পিউটারের সাহায্যে কাজের কেন্দ্রীকরণ করতে। এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন। ১৯৬৫ সালে গঠিত হয় এক যুগ্ম কমিটি। এতে বাইশটি শিল্প ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছিল। এই কমিটির উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিল পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখা।[৫] তবে বড় বিপদ অপেক্ষা করে ছিল পেট্রোলিয়াম কর্মীদের জন্য বছরের শেষ নাগাদ।

১৯৬৬-র অক্টোবরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া)-র কলকাতা অফিসে। পূজোর ছুটিতে বম্বে থেকে একদল অফিসার এসে কলকাতা অফিস থেকে অ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত যাবতীয় ফাইল নিয়ে চলে গেলেন। তখন অফিসে ছুটি, পুরো কাজটাই হল গোপনে। ছুটির পর কাজে যোগ দিতে এসে অফিসের কর্মীরা আবিষ্কার করলেন, তাদের জন্য কোন কাজ আর রাখেনি কোম্পানির পরিচালকরা। ফাইলের সঙ্গে টেবিল-চেয়ারও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অসহায়, ক্ষুব্ধ কর্মীরা অফিসের শূন্য ঘরে ধর্না শুরু করলেন। তারিখটা ছিল ২৪শে অক্টোবর।[৬] একদিন, দু'দিন নয় এই ধর্না চলেছিল সাতশো উনষত্তর দিন ধরে। কোনও ফল অবশ্য ফলেনি। ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে কোম্পানি ছাঁটাই করল ক্যালটেক্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের কলকাতা অফিসের অষ্টাশি জন কর্মীকে। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রাম এই ছাঁটাই নিয়ে সংসদে সরব হয়েছিলেন। সংসদের সাতাশি জন সদস্যও কর্মীদের পুর্নবহাল দাবি করে। দেশ ও বিদেশের প্রায় আড়াইশো ট্রেড ইউনিয়ন সহানুভূতি জানায় কর্মীদের। এই সামগ্রিক প্রচেষ্টা অবশ্য কোম্পানিকে টলাতে পারে নি।[৭]

এর পরের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অধ্যায় জানতে নজর দিতে হবে বীমা শিল্পের দিকে। ১৯৬৩-র ডিসেম্বরে যখন নাগপুরে অল ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সম্মেলন চলছিল, তখন মাদ্রাজের 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রের একটি কাটিং সম্মেলনে পাঠানো হয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কাটিং-এ ছিল একটি ছোট্ট সংবাদ—ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের পরিচালকমণ্ডলী নিগমের কাঠামোগত সংস্কারের কথা ভাবছেন। এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে কিছু

ডিভিশনাল অফিস ও ব্রাঞ্চ অফিস তুলে দেওয়া। অ্যাসোসিয়েশন খোঁজ করে জানতে পারল যে পরিচালকমণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে করণিকদের কাজে অটোমেশন আনার কথা চিন্তা করছেন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বহু কর্মী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বেন এবং কাজের কেন্দ্রীকরণ করে বেশ কিছু অফিস তুলে দেওয়া হবে। নাগপুরের সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশন দাবি তুলল যে পরিচালকমণ্ডলী এ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য তাদের জানাত।

পরিচালক মণ্ডলী কোন উত্তর না দেওয়ায় কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ বাড়ল। পরে জানা গেল, নিগমের কিছু অফিসার ১৯৬৩ সালে আমেরিকার বড় বড় কোম্পানি ঘুরে কম্পিউটারের কাজের ধরন জেনে এসেছেন। দেশে ফিরে তারা নিগমকে মার্কিনি ছাঁচে কম্পিউটার ব্যবহারের পরামর্শ দেন। নিগম সে পরামর্শ গ্রহণ করে। সরকারও সবুজ সঙ্কেত দেয়।[৮]

অ্যাসোসিয়েশন এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় পরিচালকমণ্ডলী ও সরকার তাদের এই বলে শান্ত করার চেষ্টা করে যে নিগমে কম্পিউটার বসার ফলে কোন কর্মী ছাঁটাই হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন চুক্তিতে যেতে রাজি হয়নি সরকার বা পরিচালকমণ্ডলী। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের পর পর দেশব্যাপী অবসাদের সুযোগ ও অ্যাসোসিয়েশনের অসতর্কতার সুবিধে নিয়ে পরিচালকমণ্ডলী নিগমের বম্বে অফিসে একটি আই.বি.এম. কোম্পানির কম্পিউটার বসান। এর প্রতিবাদে ডিসেম্বরে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লীতে। প্রায় আটত্রিশটি জাতীয় কর্মী ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন এতে সামিল হয়। এর পরবর্তীকালে দেশজুড়ে শত শত কনভেনশন, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় অটোমেশনের বিরুদ্ধে। কলকাতায় এই আন্দোলনের ধারা ছিল তীব্র। ১৯৬৬-এর পঁচিশ থেকে উনত্রিশে ডিসেম্বর যে জেনারেল কাউন্সিল মিটিং হয় তাতে অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা লাগাতার স্ট্রাইক এবং সরকার ও পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।[৯]

বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের পরিচালকমণ্ডলী ততদিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে কলকাতার ইলাকো হাউসের অফিসে বসানো হবে নিগমের দ্বিতীয় কম্পিউটারটি। কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই কম্পিউটারের অনুপ্রবেশ যে কোনও উপায়ে ঠেকাতে নির্দেশ দিলেন কলকাতার বীমা কর্মচারীদের। শুরু হল ইলাকো হাউস অবরোধ আন্দোলন। তারিখটা ছিল ১৯৬৭ সালের তেসরা মার্চ। পাশাপাশি দেশজুড়ে স্ট্রাইক ইত্যাদি চলছিল। পরিচালকমণ্ডলী এর বিরুদ্ধে

কড়া ব্যবস্থা নিতে শুরু করলেন। কোন ক্ষেত্রে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট অর্থাৎ মাইনে বৃদ্ধির দিন পিছিয়ে দেওয়া, কোনও ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের শাস্তি দেওয়া এসব চলতেই লাগল।[১০] এদিকে সারা দেশে অটোমেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুলাই স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির বিশেষ মিটিং আহ্বান করে। সাধারণভাবে যাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই এই কমিটিতে তাদেরও আহ্বান করা হয় এই মিটিংয়ে। ভারতীয় জীবন বীমা নিগম, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রেল এবং পেট্রোলিয়াম কোম্পানির কর্মী ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এই মিটিংয়ে অংশ নেয়। অবশ্য কোন সমাধান বের হয়ে আসেনি এই মিটিং থেকে।[১১]

কলকাতায় ইলাকো হাউসের অবরোধ ততদিনে আরও সঙ্ঘবদ্ধ আকার নিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে ওই সময়টাতে কোন নির্বাচিত সরকার ছিল না। সংবিধানের তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা প্রয়োগ করে ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল বরখাস্ত করেন নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে। ফলে ইলাকো হাউসের 'অবরোধের সময় রাজ্যপালই ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা।[১২] তিনি ইলাকো হাউসে কম্পিউটার বসানোর ব্যাপারে নিগম কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। বড় রকম বিপদের আঁচ পেয়ে ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন অবরোধে সামিল হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দল তথা সর্বস্তরের মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানায়।[১৩]

আহ্বানে সাড়া দেন রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। অবরোধ জোরদার হয়। ঐ বছর পূজোর কিছু আগে অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পায় যে পূজোর ছুটির সুযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ ইলাকো হাউসে কম্পিউটার বসাবে। এই খবর পেয়ে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের কর্মচারীরা পূজোর সময়ও সারারাতব্যাপী অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৪] এই অবরোধে বীমা কর্মচারীদের পাশে ছিল রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি, বারোই জুলাই কমিটি এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো। ২৮শে সেপ্টেম্বর, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে আন্দোলনকারীরা। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জ্যোতিবাবু বলেন যে যুক্তফ্রন্ট অটোমেশনের বিরোধী। অন্যদিকে, কেন্দ্রের কংগ্রেস চালিত সরকার নিজেদের ঘোষিত নীতির বিরোধিতা করে এই অটোমেশনকে সাহায্য করছে।[১৫]

কর্মচারীদের সতর্কতায় ইলাকো হাউসে কোন কম্পিউটার বসানো গেল না পূজোর সময়। এদিকে, পরিচালকমণ্ডলী খবরের কাগজে একের পর এক বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে কম্পিউটার কারও চাকরি কেড়ে নেয় না। কর্মচারীরা এই প্রচারে কান দিলেন না। পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে কম্পিউটারের কারণে কর্মী

ছাঁটাইয়ের ঘটনা তাঁরা আগেই দেখেছিলেন। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে বার্মা শেল কোম্পানিতে তিনশো চল্লিশ জন কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণও যে অটোমেশন, সে ব্যাপারেও তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন।[১৬] এদিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটল পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করল যুক্তফ্রন্ট। নবনির্বাচিত সরকারের কাছে ভারতীয় জীবনবীমা নিগম কর্তৃপক্ষ ইলাকো হাউসে কম্পিউটার বসানোর অনুমতি চাইলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এইভাবে কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে ইলাকো হাউস পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৭]

কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনের আর এক বড় শরিক ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। অবশ্য তাঁরা যে তথ্যপ্রযুক্তির মূল যন্ত্র কম্পিউটারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে একজোট ছিলেন, তা নয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বৃহত্তম অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ভারতের মত বিকাশশীল অর্থনীতিতে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তবে এর ফলে যেন কারও চাকরি না যায় সে ব্যাপারেও তাঁরা নিজেদের দাবি তুলে ধরেছিলেন। তবে অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশন এই ব্যাপারে পুরোপুরি সহমত ছিল না।[১৮]

১৯৬৬ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালক মণ্ডলীর মহাসংগঠন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন এবং বিভিন্ন কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে অটোমেশন বা কম্পিউটার বসানো নিয়ে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে অটোমেশনের প্রকৃতি আলোচিত হয়। অটোমেশনের ফলে কোনও চাকরি না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এই চুক্তিতে।[১৯] এই ধরনের জাতীয় চুক্তির বাইরেও বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্ক নিজেদের কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে কম্পিউটার বসানো নিয়ে চুক্তি করে। এই ক্ষেত্রে বিফল হয় গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক। অল ইন্ডিয়া গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। তিন মাসেরও বেশি এই আন্দোলন চলে। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখায় এই আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিল। অবশেষে, নতুন দিল্লীতে এক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের অবসান হয়।[২০] ঐ একই বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বম্বে শাখায় কম্পিউটার বসানো নিয়ে সারা দেশে আন্দোলন শুরু করেন এই ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। আন্দোলন সত্ত্বেও পুলিশি সাহায্য নিয়ে তেসরা মে বম্বে শাখায় কম্পিউটার বসানো হয়। এই আন্দোলনের বেশ কিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় যার মধ্যে কলকাতারও কিছু নেতা ছিলেন।[২১]

বিভিন্ন কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লাভজনক চুক্তিতে আসা। ১৯৮৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এরকম এক চুক্তি

স্বাক্ষরিত হল আটান্নটি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনগুলির মধ্যে। ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন বা আই.বি.এ. এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। আবার তথ্যপ্রযুক্তি তথা অটোমেশন সম্পর্কিত কিছু বিধি প্রণয়ন হল, অটোমেশনের ফলে চাকরি না যাওয়া প্রতিশ্রুত হল এবং কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এমন কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ভাতা ঘোষিত হল।[২২] এদিকে, ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন নামে একটি নতুন সংগঠন, যা অটোমেশন প্রসঙ্গে এ.আই.বি.ই.এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করছিল। পরবর্তী বছরে এই সংগঠনটি জাতীয় স্তরে একটি সংগঠন হিসেবে নিজেদের ছড়িয়ে দেয়। এই ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া বা সংক্ষেপে বি.ই.এফ.আই. কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে এক বড় ভূমিকা নেয়। মূলতঃ এ.আই.বি.ই.এ. থেকে বেরিয়ে আসা এই সংগঠনের সদস্য তথা নেতাদের বক্তব্য ছিল চূড়ান্তভাবে অটোমেশন বিরোধী। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নরেশ পাল মনে করতেন, এ.আই.বি.ই.এ. অটোমেশন প্রসঙ্গে সমঝোতার পথ নিয়েছে। ওই সংগঠন আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়েছে বলে তিনি মত দেন।[২৩]

১৯৮৫ সালে বি.ই.এফ.আই. কলকাতার হংকং ব্যাঙ্কে অটোমেশনের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ অবরোধের পথ নেয়। মে থেকে অক্টোবর, মোট একশো চল্লিশ দিন ধরে চলে এই আন্দোলন।[২৪] তবে এই আন্দোলন যে খুব সংগঠিত ও সফল হয়ে উঠতে পেরেছিল, এমন নয়। সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের উপযুক্ত সমর্থন না পেয়ে এই আন্দোলন দাড়িয়ে ছিল সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন বা সি.আই.টি.ইউ-র সমর্থনের উপর। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এই সি.আই.টি.ইউ. ছিল পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসক জোট বামফ্রন্টের মুখ্য শরিক কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিষ্ট)-এর ট্রেড ইউনিয়ন শাখা। এই পার্টিরই নেতা তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অবশ্য এই আন্দোলনকে সুনজরে দেখেননি। বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী তার ক্ষোভ জানিয়ে পার্টি পলিটব্যুরোকে চিঠি লেখেন এবং এ ধরনের আন্দোলন মোকাবিলার নির্দেশিকা চান। পরবর্তীকালে অবশ্য বি.ই.এফ.আই. কে অগ্রাহ্য করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আদালতের আদেশবলে ব্যাঙ্কে কম্পিউটার বসাতে সমর্থ হন। আন্দোলনও প্রত্যাহৃত হয় অক্টোবরে।[২৫]

এ ধরনের আরও কিছু আন্দোলন বি.ই.এফ.আই-এর নেতৃত্বে আশির দশকের শেষ দিকে কলকাতায় সংগঠিত হলেও তার জোর উল্লেখযোগ্য ছিল না। ততদিনে অটোমেশনের ফলে চাকরি না যাওয়ার ব্যাপারটি প্রতিশ্রুত হওয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টি

অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিষ্ট) বা সি.পি.আই (এম) চালিত সরকার এ ধরনের আন্দোলনকে সাহায্য করতে নারাজ ছিল। রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতিকে চাঙ্গা করতে কলকাতায় আন্দোলনমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই সম্ভবতঃ সরকারের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য সবক্ষেত্রে পার্টি ও সরকারের মধ্যে যে এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য ছিল এমন নয়।[২৬] আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভাজন ছিল পার্টির মধ্যেও যা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে বাইরে প্রকাশিত হত। যাই হোক, বি.ই.এফ.আই. আন্দোলনের পথ থেকে সরে এসে চুক্তির পথে প্রবেশ করে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। ফলে, সারা দেশসহ কলকাতাতে কম্পিউটারের প্রবেশ ঘটতে থাকে সমঝোতার মাধ্যমে।[২৭]

ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্মচারীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের পাশে কলকাতায় যে আর কোনও রকম তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধী আন্দোলন ঘটেনি, এমন বলাটা ঠিক হবে না। বস্তুতঃ এক সময় কলকাতায় কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতি থেকে শুরু করে রেলের কর্মচারী সমিতি— সবার কাছেই অবশ্য করণীয় কাজ হয়ে উঠেছিল। সত্তরের দশকের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে আমদানি করা কম্পিউটার স্থাপন করার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের আন্দোলনকে প্রশমিত করতে রাজ্য পালের কঠোর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।[২৮] অন্যদিকে, পূর্ব রেল যখন পরিষেবায় কম্পিউটার আনতে উদ্যত তখন তাদের কর্মচারীদের জোরদার আন্দোলন এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিল।[২৯]

বলা বাহুল্য, এ সব আন্দোলন কেউ শখ করে শুরু করেনি। তথ্যপ্রযুক্তির ধাক্কায় নিজেদের চাকরি খুইয়ে বা চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কা থেকেই এ ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত। তবে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সময়কার লুডাইটদের মত কলকাতার তথ্যপ্রযুক্তি বিরোধীরা মেশিন ভাঙেননি। তারা স্বীকৃত পথেই আন্দোলন করেছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের পটভূমিকায় এ আন্দোলন স্বাভাবিক। কারণ খুব সামান্য সময়ের পরিসরে আধুনিকীকরণের নামে এখানে জোর করে প্রযুক্তি ঢোকানো হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। এহেন মত পোষণ করেছেন সমাজ বিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন। তাঁর মতে পাশ্চাত্যে যা দুশো বছর ধরে ঘটেছে সেই আধুনিক প্রযুক্তিকে এবং শিল্পায়নকে যদি পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মূলতঃ কৃষিভিত্তিক সভ্যতার মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয় তবে বিশৃঙ্খলা এবং আন্দোলন হবে স্বাভাবিক পরিণতি।[৩০]

## সূত্র-নির্দেশ :

১) অরূপ কুমার দাস (সম্পাদিত); গণযুগের দিনপঞ্জী (১৯৬০-১৯৭৯) প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০০২, পৃ. ৫-৬।

২) ঐ, পৃ. ৭-১৭।

৩) অঞ্জন বেরা, "ভিয়েতনাম দিবস ১৯৪৭", প্রকাশিত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সঙ্কলিত), "ভিয়েতনাম ও কলকাতা", পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, মে ২০০০, পৃ. ৭-১৭।

৪) "ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামে ষাট-সত্তর দশকের কলকাতা" (দিনপঞ্জী), ঐ, পৃ. ২৬-৩২।

৫) শান্তি শেখর বসু, "মডার্নাইজেশন ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইন্ডিয়ান সিচুয়েশন", কর্মচারী সমিতির স্যুভেনির, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এজরা স্ট্রীট শাখা, ১৯৯৯।

৬) চন্দ্র শেখর বসু, "এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন", অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত, জানুয়ারী ১৯৭৮, পৃ. ১০৫।

৭) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, ডিসেম্বর ১, ১৯৬৮।

৮) চন্দ্র শেখর বসু, আগে উল্লিখিত, পৃ. ৯৭-৯৯।

৯) ঐ, পৃ. ১০০-১০৪।

১০) ঐ, পৃ. ১০৫-১০৭।

১১) রিপোর্ট অফ দ্য কমিটি অন অটোমেশন, ১৯৭২, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন, পৃ. ৫-৬।

১২) অরূপ কুমার দাস, আগে উল্লিখিত, পৃ. ১৭ এবং ২০।

১৩) চন্দ্র শেখর বসু, আগে উল্লিখিত, পৃ. ১০৯।

১৪) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৬৮।

১৫) দৈনিক বসুমতী. কলকাতা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৬৮।

১৬) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৬৮।

১৭) চন্দ্র শেখর বসু, আগে উল্লিখিত।

১৮) পি.এস. সুন্দরেশন, "এ ট্রেড ইউনিয়ন ওডিসি! দ্য হিস্ট্রি অফ অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন", কর্ণাটক প্রদেশ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ব্যাঙ্গালোর, ১৯৯৬, পৃ. ২৪২-২৪৯।

১৯) সেট্‌লমেন্ট অন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট্‌স বিট্যুইন সার্টেইন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার্কমেন, ১৯ অক্টোবর, ১৯৬৬, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন।

২০) সুবিনয় রায়, "স্মৃতির ঝলকে কিছু কথা", প্রকাশিত পিনাকপাণি দত্ত (সম্পাদিত), "অবিসংবাদী নরেশ পাল", সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ ইউনিয়ন, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২, পৃ. ৯৭-৯৯।

২১) অরূপ কুমার দাস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২২।

২২) মেমোরান্ডাম অফ সেট্‌লমেন্ট, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, বিট্যুইন দ্য ম্যানেজমেন্টস অফ

ফিফটি এইট ব্যাঙ্কস অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার্কমেন অ্যাজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ।

২৩) পিনাকপাণি দত্ত, আগে উল্লিখিত, পৃ. ৬৮-৬৯।

২৪) ঐ, পৃ. ২৩৯।

২৫) আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২১ নভেম্বর, ১৯৮৫।

২৬) পিনাকপানি দত্ত, আগে উল্লিখিত, পৃ. ৬৮-৬৯।

২৭) ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রদীপ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ১৯, ২০০১।

২৮) শুভাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ, সাক্ষাৎকার।

২৯) দৈনিক বসুমতী, কলকাতা সংস্করণ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

৩০) স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন, "দ্য ক্ল্যাস অফ সিভিলাইজেশন্স অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অফ ওয়ার্ল্ড অর্ডার", পেঙ্গুইন বুক্স, ইন্ডিয়া, ১৯৯৭, পৃ. ৯৭।

# বর্ধমান জেলার 'অজয় হানা বন্ধ' আন্দোলন ও কৃষক সভা

জয়ন্ত চ্যাটার্জী

'অজয় হানা বন্ধ' আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে অতি গুরুত্বপূর্ণ গণ আন্দোলন। এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য ভূমিকা থাকলেও কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা সকলে মিলে একই দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনে সামিল হয়। কিন্তু পূর্বে বর্ধমান জেলায় দামোদর ক্যানাল কর বিরোধী যে গণ আন্দোলন ঘটেছিল তা ছিল পুরোপুরি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বৃহত্তর গণ আন্দোলন। সেই হিসাবে 'অজয় হানা বন্ধ' আন্দোলনের চরিত্র ভিন্ন ধর্মী। তা সত্ত্বেও পূর্বের আন্দোলনের মত এই আন্দোলনে জেলায় অজয় নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রামগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার সুদৃঢ় প্রভাব পড়ে।

'অজয় হানা বন্ধ' আন্দোলন শুরু হয় অরাজনৈতিক, দল নিরপেক্ষ স্থানীয় এলাকার দাবীর ভিত্তিতে। কিন্তু ১৯৪৪ সালের পর থেকে আন্দোলনের রূপরেখার পরিবর্তন হতে শুরু হয়। দাশরথি চৌধুরী জেলা কৃষকসভার পক্ষে সর্বপ্রথম অজয় নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ঘুরে এসে জেলা নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১] কিন্তু প্রথম দিকে জেলা কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। ১৯৪৩ সালে অজয় নদীর বন্যায় বর্ধমান জেলার ১০টি ইউনিয়নে ১৬৭টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অজয় নদীতে সামান্য জল বৃদ্ধি ঘটলেই হানা এলাকার গ্রামগুলি ও কৃষক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।[২] অজয় নদী বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার নারেঙ্গা গ্রামের পাশ দিয়ে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে গেছে। বর্ধমান ও বীরভূম জেলাকে বিভক্ত করেছে। অপর দিকে নারেঙ্গা পার হয়ে অজয় নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট (৮৭°৫৭' ৪৫" বর্ধমান জেলার) ও কেতুগ্রাম থানাকে বিভক্ত করে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৩] এই অঞ্চলে অজয় নদীর হানাগুলি ছিল। অজয় নদীর সঙ্গে কুন্নুর নদীর জল বর্ষার সময় মিলিত হয়ে কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার বিস্তৃত এলাকা প্লাবিত করতো। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে বর্ষার জল-এর জন্য কি এই এলাকা প্লাবিত হত?

বৃষ্টির জলের জন্য ঐ এলাকায় প্লাবন হত মনে করলে ভুল হয়। কারণ কেতুগ্রাম ও মানকড়ের বৃষ্টির পরিমাণ সাধারণভাবে সদর মহকুমা থেকে অপেক্ষাকৃত কম। এ বিষয়ে ১৯০১-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার এই অংশের গড় বৃষ্টির পরিমাণ লক্ষ্য করলেই একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।[৪]

| থানা | জুন | জুলাই | আগষ্ট | সেপ্টেম্বর |
|---|---|---|---|---|
| মঙ্গলকোট | ২৫৫.৮ সেমি | ২৫৯.৩ সেমি | ২৭০.৮ সেমি | ১৭৩.২ সেমি |
| মানকড় | ২০৮.০ সেমি | ২৭৪.৩ সেমি | ২৭৯.৭ সেমি | ১৭২.২ সেমি |
| বর্ধমান | ২৫৬.৮ সেমি | ৩৩৩.৩ সেমি | ৩১৭.০ সেমি | ২১৬.৯ সেমি |

সুতরাং বৃষ্টির জন্য (স্থানীয় এলাকা) প্রতি বৎসর মঙ্গলকোট ও আউসগ্রাম থানায় বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হত মনে করলে ভুল হয়। যতদূর মনে হয় ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে বৃষ্টি হলে অজয় নদীতে জল বৃদ্ধি ঘটতো। তার প্রভাবে অজয় নদীর হানা দিয়ে জল মঙ্গলকোট আউসগ্রাম থানার গ্রামগুলিকে প্লাবিত করতো।

১৯৪৩ সালের দামোদর ও অজয় নদীর বন্যায় বর্ধমান জেলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর পরই 'অজয় হানা বন্ধ' আন্দোলন-এর সূত্রপাত ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত মঙ্গলকোট ও আউস গ্রাম থানার মানুষজন মরহুম সামাদ সাহেব কে সম্পাদক করে একটি 'প্রতিনিধি মূলক বাঁধ কমিটি' গঠন করে।[৫] এই প্রতিনিধিমূলক বাঁধ কমিটি অজয় নদীর হানা বন্ধ করার জন্য সরকার ও বর্ধমান মহারাজার নিকট আবেদন জানায়।

এখানে প্রশ্ন আসে অজয় নদীব বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কার— সরকার না বর্ধমান মহারাজার। দায়িত্বের প্রশ্নে সরকার ও বর্ধমান মহারাজার মধ্যে বির্তকের সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে বলা যায় মঙ্গলকোট আউসগ্রাম থানা ছিল বর্ধমান মহারাজের খাস জমিদারী এলাকার মধ্যে। সুতরাং তাঁর দায়িত্ব ছিল অজয় নদীর বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু তিনি বাঁধ নির্মাণের দায়িত্বকে অস্বীকার করেন।[৬] বর্ধমান মহারাজের দায়িত্ব অস্বীকার করার মূল কারণ অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীর লেখাতে পেয়ে থাকি। তাঁর মতে 'ইংরাজরা রাজস্ব ব্যবস্থায় যে অসম্ভব কাঠিন্য দেখিয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন জমিদাররা আর বাঁধ সারাতো না''।[৭] তথাপি প্রজাকল্যাণ বা সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথাটি বর্ধমান মহারাজা কোনরূপ গুরুত্ব দেননি। অপর দিকে সরকারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয়। ফলে প্রতিনিধিমূলক বাঁধ কমিটির উভয়ের নিকট আবেদন বিশেষ ফলপ্রসূ হল না।

১৯৪৫ সালে মরহুম সামাদ সাহেবের স্থলে প্রতিনিধিমূলক বাঁধ কমিটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শৈলেশ্বর বন্দোপাধ্যায়। তাঁর আমলে অজয় নদীর বাঁধ নির্মাণ বা হানা বন্ধ আন্দোলন অন্যমাত্রা লাভ করলো। মঙ্গলকোট থানার গতিষ্ঠা, লাকুড়িয়া, পালিগ্রাম ও চানক ইউনিয়নের গ্রামগুলি প্রথম থেকে প্রতিনিধিমূলক বাঁধ কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে আউসগ্রাম থানার পাঁচটি ইউনিয়ন— রামনগর, বেরেন্ডা, উক্তা, ভেদিয়া ও গুসকরা বাঁধ কমিটির আন্দোলনে সামিল হয়।[৮] ফলে প্রতিনিধিমূলক বাঁধ কমিটি পরিচালিত আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্ধমান জেলা কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভা ক্রমে আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে। দাশরথি চৌধুরীর প্রভাবে বর্ধমান জেলার কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনে অংশ গ্রহণে অগ্রসর হয়।[৯] আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে জেলা নেতৃত্বের সামনে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়— তারা একক ভাবে না যৌথভাবে অন্যান্য দলগুলিকে নিয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবে। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির জেলা নেতৃত্বের ধারণা ছিল পার্টির গণ সংযোগ অত্যন্ত দুর্বল।[১০]

অবশ্য ১৯৪৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত অজয় নদী হানা এলাকার গ্রামগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির দু একজন কর্মী ছাড়া তাদের আদর্শ সম্পর্কে জানতো না এই ধারণা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। ফলে সেদিন জেলা নেতৃত্ব ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। তাদের দ্বিধাগ্রস্তভাব দূর হয় তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নীতির ফলে। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ছিল 'Make a real non party approach in its mass agitation in terms of the interests of the village as a whole'।[১১] কমিউনিস্ট পার্টি ও জেলা কৃষক সভা 'non-party approach' নিয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়। যার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভা 'অজয় হানা বন্ধ' আন্দোলনে মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে সামিল করে। বিনয় চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগের ফলে বর্ধমান মহারাজাকেও আন্দোলনে সামিল করা হয়।[১২] বর্ধমান মহারাজাকে আন্দোলনে সামিল করার ফলে আন্দোলন আরো বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির যে দুর্বলতা ছিল তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির গভীর প্রভাব ছিল তা সরকারী গোপন প্রতিবেদনে উল্লেখ পাই।[১৩] তাহা সত্ত্বেও সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির জেলা নেতৃত্ব এককভাবে আন্দোলনে সাহস পায়নি।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি থেকে অজয় নদীর ধারে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম, মঙ্গলকোট থানার গ্রামগুলিতে বাঁধ নির্মাণের দাবীতে প্রচার চলতে থাকে। এই প্রচার

অভিযানে নেতৃত্ব দেন হায়াৎ সাহেব, শৈলেশ্বর বন্দ্যেপাধ্যায় প্রমুখ। প্রচার অভিযানের ফলে আউসগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার প্রায় ১০০টি গ্রামের মানুষ প্রতিনিধিমূলক বাঁধ কমিটির পাশে এসে সমবেত হয়।[১৪] অপর দিকে বর্ধমান জেলা কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনে অংশ নিতে আরম্ভ করে। আন্দোলনকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলা কৃষক সভার পক্ষে দাশরথি চৌধুরী, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিনয় চৌধুরী, বিপদবরণ রায় ও হরেকৃষ্ণ কোঙার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্বকে প্রথম থেকে আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগাযোগ রাখা ও পরামর্শ দিয়ে চলেছিল।[১৫] হায়াৎ সাহেব ও শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকুশলতার ফলে গতিবসা ও পালিগ্রাম ইউনিয়ন আন্দোলনে সামিল হলে আন্দোলনের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটে। ইতিমধ্যে বর্ধমান মহারাজার সভাপতিত্বে অজয় হানা বন্ধ করার দাবীতে গুসকরায় এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৬] এই জনসভায় নতুন করে বাঁধ কমিটি গঠিত হয়। পূর্বের বাঁধ কমিটির সঙ্গে দাশরথি চৌধুরী ও শাহেদুল্লাহ সাহবকে যুক্ত করা হয়। গুসকরায় জনসভা থেকে ঠিক হয় নয়টি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিরা একযোগে পদত্যাগ করবে। অজয় বাঁধ নির্মাণ আন্দোলন দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে কৃষক সভার নেতৃত্বের হাতে আন্দোলনের রাশ ক্রমে চলে আসে।[১৭] কৃষকসভার জেলা নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা পদত্যাগ করবে, তারা বাঁধ এলাকা থেকে র‍্যালি করে বর্ধমান জেলা ম্যাজিসট্রেটের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করবে।[১৮]

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা পদত্যাগ করলে আন্দোলনের মাত্রা তীব্রতর হয়। কিন্তু সরকার আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব দিতে রাজি ছিল না।[১৯] ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম থেকেই আন্দোলনের মাত্রা আরো তীব্রতর হতে থাকে। বাঁধ এলাকায় মিটিং মিছিল প্রত্যহ চলতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবও দ্রুততর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার সচেতন হতে থাকে। বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্টদের প্রভাবে পূর্বে শক্তিশালী দামোদর ক্যানাল কর বিরোধী অন্দোলন চলেছিল ও তাদের বর্ধমান জেলায় গণভিত্তি বলিষ্ঠ সে সম্পর্কে সরকার সচেতন ছিল— তা আমরা সরকারী প্রতিবেদনে লক্ষ্য করে থাকি।[২০] আন্দোলন যাতে বিপ্লবাত্মক না হয়ে পড়ে এবং জনগণের চাপে পড়ে সরকার অর্থ মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়, সরকারী অনুমোদিত অর্থ যাতে দ্রুত সংগ্রহ করা যায় এবং সরকারী ঠিকাদার অতি সত্ত্বর নিয়োগ করা যায় তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ও শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।[২১] আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নীত হল।

সরকার অর্থ মঞ্জুর করে জুন-এর প্রথম দিকে, তা না হলে বর্ষা আসন্ন। এই অবস্থায় বাঁধ তৈরী কঠিন কাজ বলে সরকারী কনট্রাক্টাররা পেছু হটবার চেষ্টা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা কৃষক সভা শ্রমিক সংগ্রহ ও কাজ তদারকীতে কনট্রাক্টারদের সাহায্যের আশ্বাস দিলে কাজ শুরু হয়। জেলা কৃষক সভা বাঁধ নির্মাণের জন্য ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের লাঙ্গল বন্ধের ডাক দেয়। বিশেষ করে মঙ্গলকোট থানা ও আউস গ্রাম থানার গ্রামগুলিতে লাঙ্গল বন্ধের ডাক দেওয়া হয়।[২২] হরেকৃষ্ণ কোঙার, শাহেদুল্লাহ, দাশরথি চৌধুরী, বিনয় চৌধুরী, শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, হায়াৎ সাহেব বিপদবরণ রায়ের বিশেষ উদ্যোগের ফলে শ্রমিক সংগ্রহ করা সহজতর হয়। শ্রমিকদের কাজে তদারকি করার জন্য ভেদিয়ায় একটি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরী করা হয়।[২৩] শুধুমাত্র বন্যা কবলিত এলাকা থেকে বাঁধ নির্মাণের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়নি। বর্ধমান জেলার অন্যান্য থানার গ্রামগুলি থেকে বিশেষতঃ মেমারী সদর থানা থেকে বহু শ্রমিক বাঁধ নির্মাণে অংশ গ্রহণ করে। পুরচা গ্রাম থেকে সাঁগিরা পর্যন্ত অজয় নদীর হানাগুলি বন্ধ ও আংশিক বাঁধ নির্মাণ হয় ১৫ দিনের মধ্যে। ১৯৭৮ সালের বন্যায়ও এই বাঁধের ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অজয় নদীর অবশিষ্ট হানাগুলি বন্ধ করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যায় জেলা কৃষকসভা। ২১শে জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে বর্ধমানের কাশেমনগরে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে অজয় বন্যা প্রতিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] এই জনসভায় সাতকাহনিয়া থেকে সাগিরা পর্যন্ত মোট ৪০ মাইল বাঁধ নির্মাণ করা আশু প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়। কৃষক সভা অজয় বাঁধ নির্মাণের দাবীতে বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় সর্ব্বদলীয় আলোচনা সভা ডাকে। এই সময় বীরভূম জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টির বিশেষ দায়িত্ব ছিল বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরীর উপর।[২৫] ফলে বীরভূম জেলাতেও অজয় বাঁধ নির্মাণের দাবীর পক্ষে প্রচার চালানো ও আন্দোলন সংগঠিত করা সহজতর হয়। কিন্তু সরকার অজয় নদীর বাকি হানাগুলি বন্ধ ও বাকি বাঁধ নির্মাণের জন্য পুনরায় অর্থ মঞ্জুর করতে অপরাগ হয়। ১৯৪৬ সালের শেষ অবধি বারংবার সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণে জনগণ ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ১লা মে বীরভূম জেলার সিউড়িতে সর্বদলীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভা থেকে 'মোর পরিকল্পনা' কার্যকর করার দাবী জানিয়ে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, লিয়াকৎ আলিখান ও মন্ত্রী মিঃ ভাবার নিকট তার বার্তা প্রেরণ করা হয়।[২৬] শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারত সরকার অজয় নদী-বাঁধ সমস্যার সমাধান করে।

অজয় হানা বন্ধ আন্দোলন ছিল স্থানীয় এলাকার সমস্যা প্রতিকারের আন্দোলন। সরকারী দৃষ্টিতে অজয় হানা বন্ধ আন্দোলন কমিউনিস্টদের ও কৃষক সভার সৃষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার একটি উপলক্ষ মাত্র। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের পরোক্ষ ফলকে অস্বীকার করা যায় না। আউসগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার সকল সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার ফলে তাদের মধ্যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক বৈরিতা জন্মগ্রহণ করতে পারেনি। যার জন্য জেলায় ৪৬-এর দাঙ্গার প্রভাব বিশেষভাবে পড়েনি। সর্বশেষে বলা যায় বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানা, আউসগ্রাম থানা সহ বর্ধমান জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের গ্রামগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব সুদৃঢ় হয়।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) সন্তোষ মণ্ডল, রামনগর, বর্ধমান মহাশয়ের সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ০৮.১০.১৯৯২। কৃষ্ণপদ হালদার, বর্ধমান মহাশয়ের সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ০৮.০৮.১৯৯৩ দ্বারা সমর্থিত।

২) বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী— 'বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির প্রথম ২৫ বৎসর' পৃ ৬ বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির পক্ষে সমর বাওরা কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

৩) J.C.K. Peterson - 'Bengal District Gazette Vs Burdwan' Reprint - 1985 New Delhi, p. 14.

৪) J.C.K. Peterson - op cit, PP. p. 14.

৫) সৈয়দ শাহেদুল্লাহ— 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ', নতুন চিঠি— ১৯৯১ বর্ধমান, পৃ. ১৭৫।

৬) Binoy Chowdhury - My life and experiences Oct. 1999 NBA. p. 96.

৭) বিনয় ভূষণ চৌধুরী - পূর্ব ভারতে গ্রামীণ ক্ষমতা কাটানো ও কৃষি উৎপাদন ১৮৫৭-১৯৪৭ (বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন (দ্বিতীয় ভাগ) থেকে গৃহীত প্রবন্ধ) পৃ. ৫০।

৮) সৈয়দ শাহেদুল্লাহ — 'তদেব' পৃ. ১৮১।

৯) সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ মহাশয়ের সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ১২.০৪.১৯৯৪।

১০) অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (১ম খণ্ড) NBA সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ১২০।

১১) Jyoti Basu Ed. 'Documents of the Communist movement in India' vol-V, NBA 1997, p. 90.

১২) সন্তোষ মণ্ডল মহাশয়ের সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ০৮.১০.১৯৯২ সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ সহিত লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ১২.০৪.১৯৯৪ দ্বারা সমর্থিত।

১৩) W 324/40 Activities of Krishak Samities in the Burdwan District (I.B/S.B) সন্তোষ মণ্ডলের বক্তব্য (০৮.১০.১৯৯২) দ্বারা সমর্থিত। তার মতে বর্ধমান জেলায় কংগ্রেস কর্মী বলতে কমিউনিস্টদেরই জানতো।

১৪) কৃষ্ণপদ হালদার, বর্ধমান মহাশয়ের সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ০৮.০৮.১৯৯৩, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ১২.০৪.১৯৯৪ দ্বারা সমর্থিত।

১৫) সৈয়দ শাহেদুল্লাহ— 'তদেব' পৃ. ১৮৩

১৬) সৈয়দ শাহেদুল্লাহ — 'তদেব' পৃ. ১৮১।

১৭) সন্তোষ মণ্ডল, রামনগর, বর্ধমান সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ০৮.১০.১৯৯২।

১৮) Binoy Chowdhury opp cit-PP, p. 96.

১৯) 37/45 Confidential file 9.B.

২০) W. 324/40 Confidential file 9.B/S.B.

২১) সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ সঙ্গে লেখকের ১২.০৪.৯৪ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার। সন্তোষ মণ্ডলের সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকারের বক্তব্য অনুরূপ।

২২) সৈয়দ শাহেদুল্লাহ — 'তদেব' পৃ. ১৮৩।

২৩) Binoy Chowdhury 'opp cit PP', p. 96.

২৪) 'স্বাধীনতা' ২৪.০১.১৯৪৬।

২৫) File No. 666/33 I.B.

২৬) 'স্বাধীনতা' ০৪.০৫.১৯৪৭।

# স্বদেশী যুগের ছাত্র আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১)

**দোয়েল দে**

বর্তমান বিশ্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজ এক সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু তাদের এই সক্রিয় যোগদান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বহু বছরের প্রচেষ্টায়, বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা ক্রমশঃ নিজেদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে। আর একথা সত্য যে যথার্থ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেও একইভাবে ছাত্র-যুব সম্প্রদায় অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

ভারতের ছাত্রযুব সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নব্যবঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়।[১] এরপর সময়ের সাথে সাথে সেই রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়েই পশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা একটি জাতীয় সংগঠনের মারফত প্রকাশ করার সুযোগ পায়।[২] এই সময় ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বিতর্ক (১৮৮৩-১৮৮৪) বা সুরেন্দ্র নাথের কারাবরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতিতে ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে।[৩] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই সময় মূলতঃ বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ছাত্রদের উদ্দীপনার তথা প্রেরণার মূল উৎস। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ছাত্রমনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করে। এরপর ইটালীর কার্বোনারীর অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠে "অনুশীলন সমিতি"। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু এবং ব্যারিস্টার পি.মিত্র ছিলেন প্রথম সভাপতি। প্রথম পর্যায়ে ব্যায়াম সমিতি হিসাবে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে বিশেষতঃ অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবর্গের আবির্ভাবের পর তা ক্রমশঃ একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত হয়, যার মূল মন্ত্রই ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। "অনুশীলন সমিতি" র মাধ্যমে বহু ছাত্র সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর।

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইল ডুরান্ট "Case for India" তে মন্তব্য করেন — "It was in 1905, then, that the Indian Revolution began"। বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রথম সর্বাত্মক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা বঙ্গ দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকেই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের সাথে সাথে বাংলাদেশেও বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন এই নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে দমন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে তিনি বহুবিধ দমনমূলক নীতি ভারতবাসীর উপর চপিয়ে দেন, যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল "Indian Universities Act" (1904) যার মুল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ভারতের জাতীয়তাবাদীগণ ব্রিটিশের দমনমূলক নীতির সামনে মাথা নোয়ালেন না। আর তাদের এই অনমনীয় মনোভাব সবথেকে বেশী প্রভাবিত করল ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে।[৪] তারা কার্জনের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধাচরণের মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এদের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে এবং তাদের আন্দোলনের শরিক করার জন্য উদ্দীপনা যোগাতে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বঙ্গভঙ্গের বেশ কিছু আগে থেকেই এই দায়িত্ব পালন করে আসছিল দুটি ইংরাজী পত্রিকা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বেঙ্গলী" এবং মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত "অমৃতবাজার পত্রিকা"। অন্যান্য ইংরাজী পত্র পত্রিকার মধ্যে "নিউ ইন্ডিয়া", "ইন্ডিয়া মিরর", "ইন্ডিয়ান নেশন" ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই সব পত্রিকার পাঠকরা সবাই ছিলেন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষতঃ কিশোর তরুণমনে চেতনার সঞ্চার করতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। বঙ্গ ভঙ্গের প্রাক্কালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫টি। এর মধ্যে "হিতবাদী" এবং "সন্ধ্যা" পত্রিকা ছিল খুবই প্রভাবশালী। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত "বন্দে-মাতরম" পত্রিকায় কিছু রাজনৈতিক লেখা ছাত্রযুব সম্প্রদায়কে স্বরাজের ধারণায় অনুপ্রাণিত করতে প্রকাশিত হয়।[৫]

এছাড়া সখারাম গণেশ দেউস্কর "দেশের কথা" (২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ) নামক একটি লেখায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস আর্থিক শোষণের চিত্রটি তুলে ধরেন, যা স্বদেশী ধারণাকে আরও উজ্জীবিত করতে সাহায্য করে।[৬] এই অবস্থায় বাংলার ছাত্রযুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশী মনোভাব প্রসারে কয়েকটি সংস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেমন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "ডন সোসাইটি", ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পরিচালিত "সারস্বত আয়তন", সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রতিষ্ঠিত "আত্মোন্নতি সমিতি" ইত্যাদি, যা বহু যুবককে বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে।[৭] এইভাবেই তৎকালীন ছাত্রযুব সম্প্রদায় ব্রিটিশ রাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমতাবস্থাতেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ বিভাজনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে, যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ছাত্রযুবকদের জীবনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের তুল্য (১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর)।

শুরু হল নতুন পদ্ধতিতে লড়াই, যার অন্যতম দুটি দিক হল 'বয়কট' অর্থাৎ বিদেশী পণ্য বর্জন এবং 'স্বদেশী' অর্থাৎ স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদির ব্যবহার। আসলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আর্থিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার অস্ত্র ছিল বয়কট এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার সমবেত প্রচেষ্টার নামই ছিল স্বদেশী। যদিও এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মৌলভী লিয়াকৎ হুসেন প্রমুখ। কিন্তু এই সংগ্রামের জীবনীশক্তি ছিল দেশের ছাত্রসমাজ। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে হাজারে হাজারে ছাত্র সরকারী স্কুল, কলেজ থেকে বেরিয়ে এল বয়কট আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে। ১৯০৫ খ্রীঃ ৭ই আগষ্ট ঐতিহাসিক টাউন হলে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণের পর এই আন্দোলন সাংগঠনিক দিক থেকে আরও জোরদার হয়ে ওঠে।[৮] যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার জারি হবার পরই।[৯] সরকারী শিক্ষা-সচিব কার্লাইল ছাত্রদের কোন মিটিং মিছিলে যোগদান করতে, এমনকি বন্দে-মাতরম গাইতেও নিষেধ করেন। তিনি ফতোয়া জারি করলেন যে, এর অন্যথা হলে ছাত্রদের সরকারী স্কুল ও কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। কিন্তু এত হুমকি সত্ত্বেও ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত করা গেল না। ফলস্বরূপ ১লা নভেম্বর ১৯০৫ সালে রংপুরের প্রায় ১৫০ জন ছাত্রকে দুটি স্থানীয় স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হল।[১০] এই খবরে চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ১৯০৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে সরকারের বিভিন্ন দমন মূলক নীতি সহ কার্লাইল

সার্কুলারের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এই সমাবেশেই গঠিত হয় "অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি"।[১১] এর দুজন প্রধান সংগঠক ছিলেন রমাকান্ত রায় এবং শচীন্দ্র প্রসাদ বসু।[১২] প্রথম দিকে এই সমিতি প্রত্যেকদিন একটি করে শোভাযাত্রা বের করে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে সরকারের দমনমূলক নীতির সমালোচনা করত। কিন্তু পরে এই সমিতির কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃতি লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে থাকার অপরাধে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বদেশী পণ্যদ্রব্য বিক্রয়, স্বদেশী আদর্শ প্রসার প্রভৃতি কাজ এই সমিতির কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৩]

উল্লেখ্য যে, এই সময় জাতীয় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটি"। ডন পত্রিকাতে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষতঃ "An Examination in the present system of University Education in India and a Scheme of Reforms" রচনায় (এপ্রিল-জুন, ১৯০২), ছাত্রদের সৃষ্টিশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়। যাইহোক জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর মনে, বিশেষতঃ ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানো এবং এদের বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো। ১৯০৫ সালের ৫ই নভেম্বর ডন সোসাইটির আহ্বানে জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক বিশাল জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দেন। ১৪ই নভেম্বর ১৯০৫ খ্রীঃ আশুতোষ চৌধুরী এক চিঠিতে বুদ্ধিজীবীদের জানালেন — "A large number of students apparently determined not to go up for the university examination this year. Their idea is to sever all connection with the Calcutta University, and join some educational institution under national control. There is no such institution now and the question of establishing one, if we are to provide for these students, and others who are likely to follow their lead, must be at once taken up and finally determined"[১৪] (The National Council of Education, Bengal A History and Homage, Jadavpur, Calcutta, 1956, p. 40)

১৬ই নভেম্বর আহূত অপর এক সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা National Council of Education গড়ার পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট সতীশ চন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বাস্তব রূপরেখা প্রকাশিত হয় এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে একাধিক জাতীয় বিদ্যায়তন স্থাপিত হয়। সরকারী বিদ্যালয়গুলি থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদের প্রায় সকলেই এই জাতীয় বিদ্যায়তনগুলিতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেল।

এরপর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় কলেজ স্থাপিত হলে অরবিন্দ ঘোষ তার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার সমান্তরাল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করা হয়। বঙ্গীয় জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন— "The National Council of Education wanted to function as a full fledged University and had the ambition to importing literacy, scientific as well as technical education from the lowest (primary) to post graduate standard".

(Binoy Kumar Sarkar, Education for Industrialization, Calcutta, 1946)

ক্রমশ অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির অধীনে সারা বাংলাদেশে ছাত্র সংগঠন বিস্তার লাভ করে। এরমধ্যে ঢাকা, মৈমনসিংহ, নোয়াখালি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং বরিশাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরিশাল জেলার স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল প্রশ্নাতীত, যার মূল হোতা ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। দেশপ্রেমিক ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন "বান্ধব সমিতি"। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রযুব সম্প্রদায় বরিশাল জেলায় ব্রিটিশের অত্যাচারের সামনে দৃঢ় তথা অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরিত্রগত এক মৌল পরিবর্তন সাধিত হয়। "আনন্দমঠ" কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে জন্মভূমিকে মাতৃজ্ঞানে তার সন্তান রূপে নিজের জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকারে বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে তিনি উদ্বেলিত করে তোলেন। এর প্রভাবেই ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সম্পূর্ণ নতুন এক কর্মসূচী গৃহীত হয়। এইভাবেই ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের স্বরূপ ক্রমশঃ "সক্রিয় প্রতিবাদে" রূপান্তরিত হয়।[১৫]

এই অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও পদ্ধতিগত দিক থেকে একটি বিতর্ক উদ্ভাবিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, যাঁরা বাংলার ছাত্রযুব সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতির প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠেন।

এক্ষেত্রে দুটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ছাত্রযুব সম্প্রদায়কে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলল। আবিসিনিয়া কর্তৃক ইটালীর পরাজয় (১৮৯৬) এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৩-১৯০৫) রাশিয়ার পরাজয় যুব সম্প্রদায়কে এই মন্ত্রে উজ্জীবিত করে যে, যদি জাপান ও আবিসিনিয়ার মতন দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রাশিয়া ও ইটালীর মতন দুটি বৃহৎ শক্তিধর দেশকে পরাজিত করতে পারে তবে ব্রিটিশরাও অপরাজেয় নয়। এই অনুভূতি তাদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে তীব্রতর করে তোলে এবং এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যেও বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায় প্রমুখের নেতৃত্বে একটি চরমপন্থী শাখার উদ্ভব ঘটে এবং কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবর্গের সাথে তাদের মতাদর্শগত বিরোধ ঘটে। সরকার এই বিরোধিতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং বহু নতুন নতুন আইন পাশ করে ঃ যেমন, সংবাদ পত্র আইন (১৯০৮) "The Criminal Amendment Act" (1908) ইত্যাদি। ফলস্বরূপ বাংলাদেশে বহু চরমপন্থী নেতা এবং যুবক হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার অথবা শহিদের মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এত কিছু সত্ত্বেও সরকারের তীব্র দমন নীতি এই চরমপন্থী আন্দোলনকে অবদমিত করতে পারল না। বরং এই সময়েই বহু বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপ বহু ছাত্র ও যুবকের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যেমন — ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ফ্রেজারের ট্রেনকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল কিংসফোর্ডকে হত্যা কল্পে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করেন, যাতে ভ্রান্তি বশতঃ দুজন ইংরেজ মহিলা মারা যান।[১৬] এই অবস্থা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে যখন সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। "যুগান্তর", "সন্ধ্যা", "বন্দে-মাতরম" ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা, যা এই নবোদ্ভূত চেতনার ধারক ও বাহক তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।[১৭] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আন্দোলনের এই হিংসাত্মক রূপকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করা হয়েছিল "যুগান্তর" পত্রিকাতে।[১৮] সরকারের দমন নীতি এই সময় আরো জোরদার হয়ে উঠল। ১৮১৮ সালের Regulating Act III এর ভিত্তিতে চরমপন্থী নেতৃবর্গের দ্বীপান্তরের আদেশ বহাল রইল। "অনুশীলন সমিতি" এবং "আত্মোন্নতি সমিতি"কে বেআইনি ঘোষণা করা হল (১৯০৮)। এমতাবস্থাতেও ১৯১১ সালের বঙ্গবিভাজনের সিদ্ধান্তটির পুর্নবিবেচনা এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি আংশিক জয়কে সূচিত করে যাতে তৎকালীন ছাত্রযুব সম্প্রদায়ের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।[১৯]

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বয়কট এবং

স্বদেশীর পথ বেয়ে শেষ পর্যন্ত স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছায়। তাই বিপিন চন্দ্র পাল যথার্থই বলেছেন — "With the start of the Swadeshi Movement at the turn of the century the Indian National Movement took a major leap forward"। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের যে spirit, তা পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে। তাই লালা লাজপৎ রায় তাঁর "Young India" গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন— "What was done in Bengal found its echo in the rest of the country." আর এই আন্দোলনে সব থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বাংলার শিক্ষিত যুব ও ছাত্র সম্প্রদায়। তারাই বাংলার সর্বত্র স্বদেশীর আদর্শ প্রচার করেছিল। বিভিন্ন সমিতিতে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে তারাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। এরা পিকেটিং করে বিদেশী জিনিসের বিক্রী বন্ধ করে, স্বদেশী জিনিসের ব্যবহারের প্রসার ঘটিয়ে যথার্থই এই আন্দোলনের জীবনীশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ ছাত্রযুব সম্প্রদায় এই সময় থেকেই জাতীয় আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তটি বাংলা দেশে সাময়িকভাবে শান্তি নিয়ে এলেও তা ছাত্রযুব আন্দোলনের গতিকে রুখতে পারেনি। প্রকাশ্য ছাত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও গুপ্ত সমিতিগুলি তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থা চলে প্রায় ১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত। ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আবার নতুন রূপে, নতুন উদ্যমে শুরু হয় আন্দোলন।

### সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) Anil Seal : The Emergence of Nationalism Competition and collaboration in the later Nineteenth Century, New Delhi, 1971, PP 194-196.

২) R.P. Dutt : India Today, p 320.

৩) Surendranath Banerjee : A Nation in making, p-40 (Speech by Banerjee at the inaugural meeting of the Indian Association, Albert Hall, Calcutta, July 26, 1876).

৪) The Bengal Chemical, by the initiative of Sir P.C. Roy in 1893, Rabindranath's Swadeshi Bhandar 1897, Indian Stores by Jogesh Chandra Chowdhury 1901, Sarala Devi's Lakshmir Bhandar 1903.

৫) Bande Mataram and the Indian Nationalism, Bureaucracy and Nationalism, September 29, 1907 (Weekly Ed.) (Rare editorial articles of Sri Aurobindo and Bepin Chandra Pal between 1906 and 1908).

৬) Bengal Past and Present, July to December, 1979, PP. 48-49.
৭) Ibid.
৮) Ibid.
৯) Uma Mukherjee, The Swadeshi Movement (1905-1911) in Hundred years of Freedom Struggle, Calcutta, p. 103.
১০) Ibid, p. 104.
১১) Bengal Past and Present, July to December, 1979, p. 51.
১২) গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১২।
১৩) Haridas and Uma Mukherjee, The Origins of National Education Movement, Calcutta, 1957, PP. 27-31. Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal (1900-1938), New Delhi, 1973, PP 159-160.
১৪) The National Council of Education, Bengal, A History and Homage, Jadavpur, Calcutta, 1956, p. 40.
১৫) A Dictionary of Modern Indian History : 1707-1947, pp. 49-50, R.P. Dutt, India Today, p. 330.
১৬) P. Sitaramaya, A History of Indian National Congress, Vol.-I. pp. 69-70.
১৭) Ibid, p. 70.
১৮) R.P. Dutt, India Today, p. 330.
১৯) Ibid, p. 331.

# বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পূর্ব মেদিনীপুর

## কানাই লাল দাস

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসন ক্ষমতায় এলো 'পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তৎকালীন বাংলার দামাল ছেলেরা ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী ছিলেন। বিশ্বকবির আশীর্বাদধন্য বঙ্গ যুবকদের আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাংলা থেকে রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যান (অঃসং, নং-১৮ পৃঃ)।

বঙ্গভঙ্গের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে যতোই মত পার্থক্য থাকুক না কেন প্রশাসনিক সুবিধার চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধার কথা ভেবেই যে বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত হয়েছিল সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গদেশ ছিল বৃহত্তম প্রদেশ। প্রধানত বঙ্গদেশের ব্রিটিশ বিরোধী মনন ধ্বংস করতেই ইংরেজ রাজপুরুষদের এই বঙ্গ বিভাগের চক্রান্ত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের সে সময়কার বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি সরকারীভাবে বঙ্গ ভঙ্গ ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণাতে বলা হয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পার্বত্য ত্রিপুরা আসাম ও মালদাকে একত্রিত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে। এর রাজধানী হবে ঢাকা। আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার বাকী অংশ নিয়ে গঠিত হবে বাংলা প্রদেশ। এর রাজধানী হবে কলকাতা। তাদের যুক্তি ছিল বিশাল বাংলার সুষ্ঠু শাসনের প্রয়োজনে এই বিভক্তিকরণ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই বিভক্তি করণের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি বাংলা তথা বাঙ্গালী জাতির বিদ্রোহী কণ্ঠকে রোধ করা ও হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করা।

দেশহিতৈষী শারদ সংখ্যা ২০০৪ 'বঙ্গভঙ্গ : শতবর্ষে ফিরে দেখা' নিবন্ধে গৌতম রায় উল্লেখ করেছেন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেওয়ার আগে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন। সেই সময়ে প্রশাসনিক স্তরে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সবেমাত্র

শুরু হয়েছে। তবে এই চিন্তা ভাবনার বিষয়টি কোন অবস্থাতে গোপন নেই। সমাজের শীর্ষস্তরের ব্যক্তিত্বদের মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে এবং বলাবাহুল্য সে সম্পর্কে ক্ষোভের সঞ্চার হতে শুরু করে দিয়েছে। কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরের সময়েই এই ক্ষোভের বিষয়টি ভালোভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তবে সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের কেউ কেউ যে এই বিভাগ ব্যবস্থাকে নীরবে সমর্থন জানাচ্ছেন এই বিষয়টিও কিন্তু কার্জনের নজর এড়িয়ে যায়নি। এইসব মানুষকে কিন্তু সনাক্ত করার কাজটি কার্জন খুব ভালোভাবেই করতে পেরেছিলেন এবং তার থেকে যাবতীয় রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার পরিকল্পনা করাও তাঁর হয়ে গিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক দিকটা তখনো পর্য্যন্ত ততোটা প্রবল হয়ে না ওঠার দরুন বিষয়টি সম্পর্কে ব্রিটিশ আমলা স্তরের শীর্ষমহলে একটি আশ্চর্যজনক গোপনতা এবং নীরবতা অবলম্বন করা হচ্ছিল।

জাতীয়তাবাদ তখন ধীরে ধীরে যেভাবে কলকাতাকে ঘিরে আত্মপ্রকাশ করছে তাকে দুর্বল করে দেওয়া ছিল কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের সব থেকে বড় উদ্দেশ্য। (এ ডকুমেন্টারি অব ব্রিটিশ পলিসি টুয়ার্ডস্ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ১৮৮৫, ১৯/০৯-বি এল গ্রোভার দিল্লি, পৃ. ২২৪-২২৫) ব্রিটিশ ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব বললেন, বাংলার ঐক্যই হচ্ছে শক্তি। এই শক্তিকে অকেজো করে দেওয়ার একমাত্র উপায় হলো বাংলাকে ভাগ করা। বাংলা ভাগ হলে এই শক্তি ছড়িয়ে পড়বে, তার কেন্দ্রীভূত রূপটা আর থাকবে না। আমাদের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার সব থেকে বড় লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের শাসনকে যারা উৎখাত করবার জন্যে নানারকমের চিন্তাভাবনা করছে তাদের সংগঠনগুলিকে দুর্বল এবং শক্তিহীন করে দেওয়া (ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া, ১৮৫৮-১৯০৫-এস গোপাল, কেমব্রিজ, ১৯৬৫, পৃ. ২৭০)। নিবন্ধটিতে আরও উল্লেখ আছে— "দুটি প্রদেশকে দুটি ভিন্ন প্রশাসনের ভিতরে নিয়ে এসে বাঙালিদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে খাটো করে দেওয়ার পরিকল্পনাটাই এই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের সবথেকে বড় উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে। বাংলায় বাঙালিদের (হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে) সংখ্যালঘু করার মতলবটাই ব্রিটিশের কাছে প্রবল ছিল। কারণ সেই সময়ে যেখানে মূলত বাংলায় বাঙালির সংখ্যা ছিল এক কোটি সেখানে ওড়িয়া, হিন্দিভাষী লোকের সংখ্যাই হয়ে দাঁড়াতো প্রায় তিন কোটি সত্তর লক্ষ। এছাড়াও ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালির মধ্যে বিরোধ নিয়ে আসা এটাও ছিল বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান কারণ।"

যাইহোক ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব শাসকরা

আর গোপন রাখতে পারলো না। সাধারণ সচেতন মানুষ ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রের কথা জেনে গেলো। শুরু হয়ে গেল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। ঢাকা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম-এ প্রায় ৫০০টি প্রতিবাদ সভা হল। হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বেঙ্গলী ইত্যাদি পত্রিকাগুলি জোরালোভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিলেন। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসেও ঐ টাউন হলে পুনরায় প্রতিবাদ সভায় বাঙালীরা সোচ্চার হন। ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর যেদিন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর হল সেদিন সারা বাংলায় অরন্ধন পালিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান প্রকাশের পর আসমুদ্র হিমাচল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হতে থাকে। এর পরিণতি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের কাছে ভারতীয় প্রজা সাধারণের প্রয়োজনীয় দাবি-দাওয়া পেশ করা ও আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করা এসব চলতে থকে। ১৯০৩ সালে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রকাশ্যে এসে যায় তখন থেকে কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরের রাজনৈতিক কর্মধারা অনুযায়ীই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও আবেদন-নিবেদন প্রীতিই বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছিল। বিষয়টিকে ঘিরে নরমপন্থী কৌশল অবলম্বনেই প্রথমদিকে নেতৃত্ব ইচ্ছুক ছিলেন। কেবলমাত্র ভারত নয়, এই বিষয়টিকে ঘিরে ইংল্যান্ডেও একটা জনমত গড়ে তোলা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। নানাভাবে আবেদন-নিবেদনের ফলেও ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তনের কোন আভাস-ইঙ্গিতও পাওয়া গেল না। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় জাতীয়তাবাদী নেতারা পরিষ্কারভাবে বুঝে গেলেন যে, আবেদন নিবেদন করে ইংরেজদের এই সিদ্ধান্ত বদলের জন্য চাপ দেওয়ার যে পদ্ধতি তাঁরা নিয়েছিলেন, সেই নীতির-মাধ্যমে বিষয়টির কোনো সমাধান সম্ভবপর নয়। তখন ধীরে ধীরে তাঁরা নরমপন্থী কৌশলের পরিবর্তন ঘটিয়ে রণনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দাবি তুলতে শুরু করলেন। বঙ্গভঙ্গের সরকারী ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই বীরভূম, বরিশাল, ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসংখ্য প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন জেলায় বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতার টাউনহলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা প্রথম প্রকাশ্যে সোচ্চারভাবে ধ্বনিত

হয়। এই সভাতেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি গাওয়া হয়। মেদিনীপুর জেলাতে স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯০১-০৭) বিংশ শতাব্দী প্রারম্ভে বিকশিত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার যুবশক্তি গর্জে উঠে। শুরু হয়ে যায় মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজ। ইতিপূর্বে কংগ্রেস দলের মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুটো মতের প্রভাব পড়ে। মেদিনীপুরে চরমপন্থীদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এই জেলাতে সর্বপ্রথম গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। চরমপন্থী নেতা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে কলকাতার মানিকতলার বাগানে, মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থানে গুপ্ত সমিতিগুলি গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যান। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষ সহ কলকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। এই সময়ে কংগ্রেসে ধীরপন্থী, উগ্রপন্থী বা চরম ও নরম পন্থীদের মধ্যে আদর্শের তীব্র সংঘাত চলছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দাবিদাওয়া আদায়ে ইংরেজদের কাছে আবেদন নিবেদন ছাড়া অন্য কোন রাস্তায় যেতে রাজী ছিলেন না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও জাতীয় স্তরে কোন গুরুত্ব পায়নি। বাংলার বিপ্লবী অরবিন্দ, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ধীর বা নরমপন্থায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেও কংগ্রেসকে আপোষহীন বিপ্লবী ধারারপথে নিয়ে আসতে পারছিলেন না। এরকম একটা পরিস্থিতিতে মেদিনীপুরে সম্মেলন। এই সম্মেলন-এ প্রবল আপত্তি উঠলেও শেষ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র নাথেরই মন্ত্রশিষ্য ব্যারিষ্টার ক্ষিরোদবিহারী দত্ত সভাপতি নির্বাচিত হলেন। অনেকের ধারণা ছিল প্রতিনিধিরা সুরেন্দ্রনাথের নরমপন্থার বিরোধিতা করবে না। কিন্তু জেলার বিপ্লবী নেতা সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী ক্ষুদিরামসহ আরও অনেকে এই নরমপন্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। ফলে সম্মেলন দু'ভাগ হয়ে গেল। ৮ই ডিসেম্বর দুপুরে বল্লভপুরে মৌলভি আব্দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে চরমপন্থীদের ও মল্লিকচকে নরমপন্থীদের একটি আলাদা সভা হয়। উপস্থিত যুবকরা সকলেই চরমপন্থীদের সভায় যোগ দেন। প্রবীণ ও বয়স্করা সুরেন্দ্রনাথের নরমপন্থীদের সভাতে যান। এইভাবে চরম ও নরম দুটো দলে কংগ্রেস মেদিনীপুরের মাটিতে ভাগ হয়ে যায়। এই ঘটনার পর গুজরাটের সুরাটে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর জাতীয় মহাসভার

অধিবেশনে মেদিনীপুরের 'বিদ্রোহী রণনীতি' জয়লাভ করে। সত্যেন্দ্রনাথ সহ বহু চরমপন্থী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

যাইহোক নতুন বিপ্লবী সংগঠন সৃষ্টির কাজে সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ক্ষুদিরাম ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করতে গ্রামে গ্রামে প্রচারের সাথে সাথে গুপ্ত সংগঠন গড়ে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, অস্ত্র চালনা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া, হাটে বাজারে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং এসব কাজ চলতে থাকে। এর মাধ্যমেই স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ চলে। মেদিনীপুরের বিপ্লবী চক্রের সভাতে ক্ষুদিরামকে কাঁথি ও তমলুক মহকুমার (অধুনা পূর্বমেদিনীপুর) এবং প্রয়োজনে উড়িষ্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্ষুদিরামের বিশিষ্ট সহকর্মীদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র সেন, সন্তোষ দাস, জগজীবন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। ক্ষুদিরাম মুগবেড়িয়ার জমিদার দিগম্বর নন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে একটি ঘাঁটি করে ওখান থেকেই ভগবানপুরের বায়েন্দা, ইক্ষুপত্রিকা, কলাবেড়িয়া, ভীমেশ্বরী বাজার, নেলুয়া প্রভৃতি জায়গা ও তমলুক মহকুমার (অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শহর ও তমলুক) ময়নার আসনান, গজিনা, তমলুক, মহিষাদলের পিঁয়াজ বেড়িয়া ও নন্দীগ্রামের পশ্চিমাঞ্চলের (বর্তান চন্ডীপুর থানা) বিভিন্নস্থানে গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজে যেতেন। মুগবেড়িয়ার দিগম্বর নন্দ, দীননাথ নন্দ, বাঘাদাঁড়ির পদ্মলোচন সাউ, ভূপতি নগরের রজনীকান্ত প্রধান, কিশোরপুরের আশুতোষ দে, কলাবেড়িয়ার রামকৃষ্ণ দাস, কুলুপের যজ্ঞেশ্বর বথ এইসব কর্মীদের নিয়ে ক্ষুদিরাম উড়িষ্যা যেতেন। সেখানে প্রচার কার্য্যের কিছুদিন পর উড়িষ্যা থেকে ফিরে নন্দীগ্রাম থানা সংলগ্ন খেজুরী থানার ঠাকুরনগরের বিখ্যাত মেলায় দোল পূর্ণিমার দিন বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য সঙ্গীদের নিয়ে পিকেটিং করেন। ঐ মেলাতে বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডলের দোকানের কর্মীদের সাথে স্বদেশীদের বাক্‌বিতণ্ডায় লোকজন উত্তেজিত হয়ে ঐ মণ্ডলের দোকানসহ কয়েকটি দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় দোকানদাররা কাঁথি ফৌজদরি আদালতে যামিনীকান্ত পড়িয়া, রমেশচন্দ্র মণ্ডল, ঝিনুকখানির সৃষ্টি ধর জানা, জুখিয়ার-শশীভূষণ বেরা, ইক্ষুপত্রিকার ক্ষীরোদ নারায়ণ ভূঞ্যাকে আসামী করা হয়। কাঁথি আদালতে সে সময় একজন আইরিশ বিচারক ছিলেন। তিনি আসামীগণের প্রত্যেককে দশ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। আসামীগণ কলকাতা ন্যায়ালয়ে আপীল করলে দণ্ড বহাল রেখে মেয়াদ কমিয়ে তিন মাস করা হয়। নন্দীগ্রাম থানার ওসমানপুরে (বর্তমান চন্ডীপুর থানা) স্বদেশী বেজ পরিবারে ক্ষুদিরাম যাওয়া আসা করতেন। ঐ পরিবারের হরেকৃষ্ণ বেজ, ভক্তহরি বেজ, কুমার নারায়ণ বেজ. প্রাণকৃষ্ণ বেজ, কুঞ্জ

বেজ, প্রমুখ উৎসাহী যুবকদের সাহায্যে তিনি ঐ এলাকায় স্বদেশী চর্চার সুত্রপাত করেন। ক্রমে ক্রমে রাজারামপুরের জনার্দ্দন মাইতি, কাশিমপুরের উমেশচন্দ্র পড়ুয়া, কদমতলার ফকিরচাঁদ মাইতি, চাক্‌নানের উপেন্দ্র নাথ মাইতি, সনাতন মাইতি, যোগেশচন্দ্র পাণ্ডা, নরগ্রামের মহেন্দ্রনাথ জানা ও ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, নন্দপুরের শচীন্দ্রনাথ খাঁড়া, পাটনার কৈলাসচন্দ্র ভক্তা, খড়িগেড়িয়ার তরেন্দ্র নাথ মাইতি, কুলুপের ক্ষেত্র মোহন দাস, ইন্দ্র নারায়ণ প্রধান, হাঁসচড়ার ধনঞ্জয় গায়েন, সিমুলকুণ্ডের প্রসন্ন গিরি, কৃষ্ণ নগরের সুরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ যুবকরা ক্ষুদিরামের দলে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে এগিয়ে আসেন। ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী চর্চা অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রান্তে প্রান্তে সেদিন ছড়িয়ে পড়ে।

বিপ্লবী ক্ষুদিরামের আখড়া ছিল তমলুক শহরে বর্গভীমা মন্দিরের পাশে রক্ষিত বাটিতে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রক্ষিত বাটির বিরাট প্রাঙ্গণে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন হিতবাদী পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ। মৌলভি লিয়াকৎ আলি খান ও স্থানীয় পণ্ডিত তরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী আরও অনেকে ঐ সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ রাখেন। সভায় স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করা এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত জনতা স্বদেশ প্রেমিক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যদের নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তমলুক শহর পরিক্রমা করেন। কংগ্রেস নেতা রমেশ চন্দ্র কর মহাশয় বলেন তমলুকে প্রথম প্রকাশ্য সভা হয় ব্রহ্মা বারোয়ারীর মাঠে ১৯০৫ সালে। রাজা সুরেন্দ্র নাথ রায় এই প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। তমলুক থেকে 'তমালিকা' নামে একটি পত্রিকা শ্রীধর চন্দ্র ভক্তিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদনায় (১৯০৩-১৯০৮) প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী প্রচার জোরদার হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় তাঁর বাটিতে বিপ্লবীদের আখড়া গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিজে একজন স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এই আখড়াতে তমলুকের প্রখ্যাত উকিলবাবু মহেন্দ্রনাথ মাইতি ও ক্ষিরোদ নাথ সিংহ, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, পূর্ণচন্দ্র সেন, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মিলিত হতেন।

তৎকালীন তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানার জমিদার বসন্ত কুমার মণ্ডল হরিখালিতে জায়গা দিয়ে স্বদেশীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। হরিখালী বাজারে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিরাট সমাবেশ হয় ১৯০৬ খৃঃ মতান্তরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। কালিদাস ব্যবত্তা এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তা ছিলেন কালিপ্রসন্নকাব্যবিশারদ ও "হাওড়া

হিতৈষী" পত্রিকার সম্পাদক বাগ্মী গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। হলদি নদীর উত্তর পার্শ্বে নদী তীরবর্তী এই স্থানে হলদির দক্ষিণাংশে নন্দীগ্রাম থানার তৎকালীন প্রবেশ দ্বার বৃহৎ বন্দর বাজার তেরপেখ্যা থেকে খেয়া পেরিয়ে নন্দীগ্রামের বহু তরুণ যুব ছাত্র এই সমাবেশে যোগ দেন। নন্দীগ্রামের স্বদেশী রাজেন্দ্র নাথ ভূঞ্যা মহাশয় বন্দেমাতরম্ গানটি আবৃত্তি করে শোনান। নন্দীগ্রাম থানা সেন্টারের দক্ষিণাংশে গদাই বলবাড় গ্রামে উমেশচন্দ্র বল মহাশয়ের উদ্যোগে কালী মন্দির প্রাঙ্গণে জন সভায় ভাষণ দেন ব্যারিষ্টার সারদাচরণ মাইতি। এই আন্দোলন ক্রমান্বয়ে নন্দীগ্রামের পূর্বাংশে বিনন্দপুর, দক্ষিণাংশে ধান্যখোলা, উত্তরাংশে মনুচক ...... প্রভৃতি প্রধান গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে সরকার বিরোধী সভাসমিতি নিবারণ আইন প্রচারিত হয়। ব্রিটিশ সরকার জনজাগরণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যত্রতত্র সভা সমিতি নিষিদ্ধ করে দেন। ১৯০৮ সালে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে যে কোন আগ্নেয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা অপরাধ বলে গণ্য হয়। তৎকালীন নন্দীগ্রাম থানার পশ্চিমাংশে বামন আড়া গ্রামে শীতলাদেবীর মন্দিরে পূজা উপলক্ষ্যে আটদিন ব্যাপী মেলায় মন্দির সংলগ্ন পুকুর পাড়ে বহু দোকান পসারীতে বিলাতী কাপড়, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি বিক্রি করা হত। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে (১লা বৈশাখ) ঐ মেলাতে ভেকুটিয়ার রাজেন্দ্র নাথ ভূঞ্যা ও পাটনা গ্রামের কুঞ্জ বিহারী ভক্ত মহাশয়দের নেতৃত্বে স্বদেশীরা প্রচার কাজে যান।

"ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী
কভুহাতে আর-পরনা
জাগো ওগো মা ভগিনী
মোহের ঘোরে আর থেকো না"— ইত্যাদি গানের সুরে জনতা সুর মেলালে অথবা বোনেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ হাতের চুড়ি নিজেরাই ভেঙ্গে দিয়ে ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ দোকানে দোকানে পিকেটিং করে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে আহ্বান জানান।

সুতাহাটা থানার দ্বারিবেড়িয়ার সতীশ চন্দ্র মাইতি, চৈতন্যপুরের ভগবতীচরণ মাইতি স্বদেশীদের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলেন। ময়না থানার হাটবাজারগঞ্জে জোরদার প্রচার চলে। আসনান, গড়সাফাৎ, গরমানন্দপুর, দক্ষিণ ময়না, পূর্বময়না, প্রভৃতি এলাকায় জনসভা হয়। এইসব সভাগুলিতে গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, আবুল হোসেন প্রমুখ বঙ্গভঙ্গের কুফল নিয়ে জ্বালাময়ী

বক্তৃতা দেন। বিপ্লবী গণেশচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্র নাথ জানা, ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ দাস, প্রমুখ ময়নার স্বদেশীগণ এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য সাধারণ মানুষ যাতে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে পারে সেজন্য ময়নার রাজা সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র মহাশয়ের দুইপুত্র জ্ঞানানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ বাহুবলীন্দ্র গড়সাফাৎ হাটে স্বদেশী দোকান খোলেন। গ্রামেগঞ্জেও স্বেচ্ছাসেবকরা স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, ১৭৫৭ খৃঃ পলশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকগণ অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাব মীরজাফরের নিকট থেকে চব্বিশ পরগণা জেলাটি অধিগ্রহণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ নবাব মীরকাশিম আলি ইংরাজ বণিকদের সাথে সন্ধি করেন। ১৭৬০ এর ১৫ই অক্টোবর নবাব নাজিম পদ গ্রহণ করেন। এর ফলে তিনটি জেলা চট্টগ্রাম, চাকলা বর্ধমান ও চাকলা মেদিনীপুর অধিকার ছেড়ে দেয়। ১৭৬০ সালে পটাশপুর থানা মারাঠাদের অধীন উড়িষ্যা রাজ্যে ছিল। মেদিনীপুর জেলায় তৎকালে ৪৫টি পরগণা ছিল। কাশীজোড়া বাদে বর্তমানে কাঁথি ও তমলুক মহকুমা ছিল চাকলা হিজলীতে। ঘাটাল মহকুমা ছিল বর্ধমানের মধ্যে। তাছাড়া বর্তমান সময়ের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার পুরো দখল ব্রিটিশ তখনও পায়নি। দ্বিতীয় দলিলে ১৭৬৫ খৃঃ চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণের সাথে চাকলা হিজলীর তিনটি পরগণা কোম্পানীর অধিকারে আসে। তৎকালে হিজলী ও মেদিনীপুর দুটি পৃথক জেলা ছিল। বৃটিশ কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভ থেকেই মেদিনীপুরে কোন শান্তি শৃঙ্খলা ছিল না। এই সময়কালে ১৭৬০ খ্রীঃ চুয়াড় বিদ্রোহের শুরু। ১৭৬৫ খৃঃ পাইক বিদ্রোহ ইত্যাদির পরিসমাপ্তি ঘটে ১৭৯৯ খৃঃ। ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূমি ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। পূর্বের পাঁচশালা ও দশশালা বন্দোবস্ত তুলে দিয়ে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। ফলে ব্রিটিশ শাসন-পোষণ কায়েম রাখার জন্য একদল অনুগত রাজভক্ত সৃষ্টি হয়েছিল। এই সব রাজারা তাদের ভূখণ্ডের কিছু অংশ অন্যদের ছেড়ে দিয়ে রাজস্ব আদায় করতো। এরাই জমিদার জোতদার নামে পরিচিত। জোতদার জমিদাররা রাজাকে রাজস্ব দিতেন। রাজারা ব্রিটিশ শাসকদের তার নিদ্ধারিত রাজস্ব দিতেন। এইভাবে রাজস্ব আদায়ের বিকেন্দ্রিকরণ হয়েছিল। এমন পাকাপোক্ত ব্যবস্থার বৃহৎ জমির মালিকরা পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকদের বঙ্গবিভাগ মেনে নিতে পারেননি। প্রায় ক্ষেত্রে দেশ প্রেমিক এইসব জমিদার জোতদার, রাজারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী ছিলেন। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখী বন্ধন উৎসবের প্রভাবে "বাংলার মাটি, বাংলার

জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল এক হোক, এক হোক হে ভগবান"। বিবেকানন্দের বাণী— "ভুলিও না জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ........ তোমার বিবাহ, তোমার ধন নিজের সুখের জন্য নহে ইত্যাদি।" বিপ্লবীদের অবশ্য পাঠ্য শ্রীমদ্ভগবত গীতায় "কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্মফল হেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত কর্মনি।" নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শে নিজেদের গড়ে তোলা, রঙ্গ লালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।" কবি মনোমোহন চক্রবর্তীর "ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরো না"; চারনকবি মুকুন্দ দাসের কণ্ঠে 'যুবমনকে মাতাল করে তুলছে'।

যাইহোক মেদিনীপুরের অধুনা পূর্বমেদিনীপুর জেলার প্রান্তে প্রান্তে স্বেচ্ছাসংগঠন ক্লাব, আখড়া, ইত্যাদিতে ব্যায়াম চর্চার মাধ্যমে শরীরকে মজবুত করা আর মনকে দেশপ্রেমে পাকাপোক্ত করার কাজে সেদিনের জানা অজানা দেশভক্ত স্বদেশীদের মধ্যমণি ছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। ১৯০৮ খৃঃ ৩০শে এপ্রিল অত্যাচারী লাটসাহেব মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতির নেতা হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও সত্যেন্দ্র নাথ ক্ষুদিরামকে বিহারের মজঃফরপুরে পাঠান। তাঁকে সাহায্যের জন্য বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকেও পাঠানো হয়। নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময়ে উভয়ে ইংরেজশাসক মিঃ কিংসফোর্ডের পরিবর্তে ভুলক্রমে মিঃ কেনেডির গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করায় সপরিবারে কেনেডি নিহত হন। পলায়মান প্রফুল্ল মোকামা ষ্টেশনে পুলিশ বেষ্টিত অবস্থায় পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম কিছু দুরে এক পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়। দেশভক্ত নিষ্ঠাবান কর্মী বিপ্লবী ক্ষুদিরাম হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে যান। অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ক্ষুদিরামের এই আত্মদান সে সময়ে আবালবৃদ্ধ বনিতার মনে দেশ প্রেমের ভাবধারাকে পাকাপোক্ত করে তোলে। অজানা কবির রচিত "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। হাঁসি হাঁসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।" "ক্ষুদিরাম নুনের ছিটা ফেলল সাদা জোঁকের মুখে"। তোরা প্রাণখুলে বল বন্দোমাতরম। "ক্ষুদি তোর পায়ে নমস্কার।" এইসব গানগুলো একতারাতে সুর তুলে গ্রাম্য গাইয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতেন। গ্রামের মা বোনেদের চোখ জলে ভরে যেতো। দীর্ঘশ্বাস পড়তো। স্কুল কলেজ পড়ুয়ারা টগবগ করতো। সেদিনের উজ্জ্বল সৈনিক গ্রাম বাংলার 'দামাল' ছেলেরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার শপথ নিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলেন। উল্লেখনীয় এই আন্দোলনে মেদিনীপুরের

দামাল ছেলেদের প্রাণশক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করতে ঐ সময়ে ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ সরকার মেদিনীপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করার চক্রান্ত করেন। ১৯০৭ সালে বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনার মিঃ হেয়ার মেদিনীপুর পরিদর্শনকালে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় প্রকাশ করেন যে, মেদিনীপুর জেলা যেহেতু বড় সেহেতু একজনের পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। সে কারণে মেদিনীপুর জেলা দ্বিভাজিত হবে। বিভাগের প্রারম্ভে ৮ লাখ টাকা ও পরে প্রতি বছর দেড় লাখ টাকা খরচ করে খড়গপুরে দ্বিতীয় জেলা শহর গড়ার জন্য ৮০০০ বিঘা জমি হিজলীতে ক্রয় করা হয়। বঙ্গবিভাগের সাথে মেদিনীপুর বিভাজনের এই চক্রান্ত মেদিনীপুর জেলার জনমানসকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। ফলে আন্দোলনের তীব্রতায় মেদিনীপুর বিভাজনের প্রস্তাব মুলতুবী থেকে যায়। এদিকে স্বদেশী আন্দোলনকে দমন করতে ব্রিটিশী ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার চলতে থাকে। বিপ্লবীরাও বসে থাকেননি। তাদের গোপন কর্মসূচী চলতে থাকে। ১৯০৭ সালের ৫ই নভেম্বর নারায়ণগড়ের নিকট এন্ড্রুফেজারের গাড়ী উল্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল আরোহী ও গাড়ীর কোন ক্ষতি হয়নি। ১৯০৮ সালে জুলাই মাসে মেদিনীপুর শহরে জেলা শাসক ওয়েষ্টন সাহেব একটি বোমার ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে উকিল উপেন্দ্রনাথ মাইতি, নাড়াজোলরাজ নরেন্দ্রলাল খান এবং অবিনাশ মিত্র প্রমুখ ত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করেন। ঐ সময়ে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলাও খাড়া করা হয়। তাতে মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে জড়িত করে গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী এই অগ্নিগর্ভ বাংলা দেখে লর্ড কার্জন বিব্রতবোধ করেন। তাঁর পরিবর্তে লর্ড মিণ্টো বড়লাট হয়ে আসেন। ১৯১১ সালে ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ আইন রদ করা হয়। ভারত সচিব মর্লে ও বড়লাট মিন্টোর 'মর্লেমিন্টো সংস্কার' নামে একটি ভারত শাসন সংশোধন বিল পার্লামেন্টে পাশ হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায় বঙ্গভঙ্গ আইন রদ করা হল বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে লর্ড কার্জনের settled fact unsettled হয়ে যায়। বাংলা ও বাঙালীর জয় ঘোষিত হয়।

সুচতুর ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করলেও তাদের Divide and Rule Policy-র প্রভাব খাটিয়ে সিংভূম, পূর্ণিয়া ও মানভূম প্রভৃতি বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু প্রধান জেলা বাংলা থেকে বিহার প্রদেশে যুক্ত করে দেন। এবং বাংলা ভাষাভাষী কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সাথে যুক্ত করে বাংলাকে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করেন। (স্বাধীনতা সংগ্রামে নন্দীগ্রাম ২৩ পৃঃ)।

যাইহোক বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলা ও বাঙালী হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত জড়তা আলস্য কাটিয়ে সে সময়ে ব্রিটিশ সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে গণআন্দোলনের যে বিপ্লবী মেজাজ সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলে সারা ভারত ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন। কাশীতে জাতীয় কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন— "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে বঙ্গদেশের এই বিপুল জনসাধারণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রথম জাতীয় ও ধর্মের বৈষম্য ভুলিয়া বাঙালী জাতি বাহিরের কোন সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাভাবিক প্রেরণায় অন্যায়ের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছে। প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে জনসেবার উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের কাছে ঋণী। আজ বাংলা যে কথা চিন্তা করিয়াছে আগামী কাল সারা ভারতবর্ষ সে কথা চিন্তা করিবে।"

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) অতীতে সংগ্রামী নন্দীগ্রাম (প্রথম পর্ব) — কানাইলাল দাস।
২) সংগ্রামী নন্দীগ্রাম (২২/১১ সংখ্যা ১৩.০৯.০৪)
ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও আমরা - শ্রী সত্যরঞ্জন অধিকারী। ২২/১৩ সংখ্যা ০৪.১২.০৪)
খ) শতবর্ষের আলোকে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন — অধ্যাপক ভক্তিভূষণ ভক্তা।
৩) স্বাধীনতা আন্দোলনে পাঁশকুড়া — শ্রী বানেশ্বর চক্রবর্তী (শবনম্)
৪) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তমলুক মহকুমা — জয়দীপ পাণ্ডা। (দ প্রদীপ —১৪১১ শারদীয়া)
৫) গ্রাম বাংলার উজ্জ্বল সৈনিক — কানাই লাল দাস। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে পঠিত (১৬.০৮.০৩, ১৭.০৮.০ ও অন্যান্য সময়ে)
৬) দেশহিতৈষী — শারদ সংখ্যা — ২০০৪।

# 'পল্লীরামায়ণ' ঃ পল্লীকাব্যে স্বদেশী জাগরণের অভিঘাত

**শ্যামল বেরা**

আঞ্চলিক ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে স্বদেশী জাগরণের অভিঘাত 'পল্লীরামায়ণ' কাব্যের কায়া-কাঠামোয় নিহিত রয়েছে। 'পল্লীরামায়ণ' পল্লীকাব্য, কিংবা বলা যায় লোককাব্য। রামায়ণের গঠন কৌশল অবলম্বনে লেখা। কবি অখিলচন্দ্র রায়। জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার কাশিয়াড়া গ্রামে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন। পয়ার ছন্দে পাঁচালি আকারে লেখা এই কাব্যটি তৎকালীন জমিদার হৃষিকেশ লাহার আদেশে রচিত। রচনাকাল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। হাওড়া-মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী এ জাতীয় লোককাব্য বিরল দৃষ্টান্ত। কাব্যের বিষয় ভাবনা, তথা সারাৎসার কবি প্রথমেই দিয়েছেন—

'আদি কাণ্ডে বিস্তারিত গ্রন্থ বিবরণ।
কি রূপে প্রকাশ হইল পল্লী রামায়ণ।।
দ্বিতীয়ে হরতাল কাণ্ডে হাটে হরতাল।
যা হতে বাক্সীর হাটের গেল পরকাল।।'

বাক্সীর হাটেব বিবরণ এ রকম —

মেদ্‌নীপুর জেলা মাঝে থানা দাসপুর।
তাহার পূরব দিকে আট ক্রোশ দূর।।
দুদ্‌ কোমরা নামে গ্রাম তথা অবস্থিত।
রূপনারায়ণ নদ পাশে প্রবাহিত।।
সেই গ্রামে লাহাবাবুদের জমিদারি।
অর্দ্ধঅংশীদার যার প্রাণনাথ চৌধুরী।।
সেইখানে হবে নব হাটের পত্তন।।

আমার বক্তব্য, নব হাট পত্তনের আগে রূপনারায়ণের পূর্ব পাড়ে প্রাচীন বাক্সীর হাটে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরা এবং বিশ্লেষণ করা। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার

আগে প্রাচীন বাক্সীর হাট নিয়ে আরো দু'এক কথা বলে নিতে চাই। এই বাক্সীর হাট ছিল বর্ধমানের শীলবাবুদের মহল-এলাকা। তাঁরা কলকাতায় আসার পর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে এই হাটের জমিদারি স্বত্ব দেন। উল্লেখ্য, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। থাকতেন হাওড়া জেলার আমতার নারিট গ্রামে। এই গ্রাম ছিল সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। যাইহোক, এই মহেশবাবুর কাছ থেকে বহু হাত ফেরি হয়ে হাটের মালিক হন নাদের আলি। এই নাদের আলি এবং মেদিনীপুর জেলার গোপালনগরের সতীশ বাড়ুজ্যে কিভাবে হাটুরেদের উপর অত্যাচার করতেন, বিলাতি পণ্যের ব্যবসা করতেন এবং স্বদেশীদের বিরুদ্ধাচারণ করতেন তার বিবরণ এই কাব্যে রয়েছে।

সতীশ বাড়ুজ্যে বিলাতী সোডার দোকান করে রমরমা ব্যবসা ফেঁদে ছিলেন, সে ব্যবসায় নাদের আলিরও শেয়ার ছিল।

'সবে জানে সে ব্যবসা সতীশের খালি।
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে কিছু আছে নাদের আলি।।'

এ সময় দেশ জুড়ে চলছে স্বদেশী আন্দোলন— শুরু হয়েছে স্বদেশী গ্রহণ এবং বিদেশী বর্জনের পালা। এ আন্দোলনের অভিঘাত এসে পড়ল বাক্সীর হাটে। ১৩৩৯ সালের (১৯৩২ খ্রীঃ) বৈশাখে বাক্সীর হাটে শুরু হল পিকেটিং।

'কুক্ষণে কংগ্রেস হতে হইল মিটিং।
দিকে দিকে পিকেটার করে পিকেটিং।।
সেই পিকেটিং ক্রমে সংক্রামক বেশে।
বাক্সীর হাটেতে এসে দেখা দিল শেষে।।
ভলেন্টারগণ বলে ভাই সব শুন।
বিলাতি লবণ চিনি বস্ত্র নাহি কিন।।
মদ গাঁজা ছেড়ে দিয়ে হও সবে ধন্য।
বয়কট কর সবে বিলাতীর পণ্য।।'

সতীশ বাড়ুজ্যেকে বন্ধ করতে বলা হল তার কারবার। কিন্তু কে কার কথা শোনে। নাদের আলির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সতীশ তার কারবার চালিয়ে যেতে লাগল। বিপত্তির শুরু এখান থেকেই। স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হরতাল শুরু করলেন।

'দলে দলে পিকেটার পিকেটিং করে।
বিলাতি জিনিষ কেহ কিনিতে না পারে।।

হাওড়া-মেদিনীপুর জেলার নানা গ্রামের হাটুরেরা হরতালের ডাক দিলেন। অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তারা।

'ছোট বড়ো সকলেতে একমত হোল।
হাট হরতাল হবে প্রতিশ্রুতি দিল।।
হাটবারে সবান্ধবে আসে নাদের আলি।
জনপ্রাণী হাটে নাই মাঠ ঘাট খালি।'

এরপর নাদের আলি ও সতীশ বাড়ুজ্যে যুক্তি করে পিকেটারদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ-অনুগ্রহ পুষ্ট পুলিশ এনে ধড়পাকড় শুরু করেন।

'বাবুর হুকুম পেয়ে দুর্বুদ্ধি সতীশ।
থানায় খবর দিয়া আনিল পুলিশ।।
রীতিমত তাহাদের খরচ যোগায়ে।
নিজ দোকানের কাছে রাখিল বসায়ে।।
পিকেটারগণে তারা ধরিয়া ফেলিল।
ঘাড়ে ধরে কিল মেরে দূর করে দিল।।''

এরপর আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পর পর হাট বারে হরতালের ঘোষণা হয়। শুধু তাই নয়, এলাকার কৃষিজীবী মানুষ ঠিক করেন, তারা এই প্রাচীন হাট পরিত্যাগ করে রূপনারায়ণের পশ্চিম পাড়ে দুধকোমরায় নতুন হাট পত্তন করবেন। জমিদারের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী মানুষদের এই লড়াই অবশেষে জয় যুক্ত হয়েছিল। তবে, এই জয় সহজে আসেনি। যাইহোক, দুধকোমরায় নতুন হাটের কাজ শুরু হতেই নাদের আলি আবার নতুন চাল চাললেন। এদিকে শুরু হয়েছে তৃতীয় বার হরতাল। সমস্ত কাজেই ভলেন্টারগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। নতুন হাট নিয়ে অশান্তির আগুন এমনই লাগে যে, শেষ পর্যন্ত নতুন হাটে ১৪৪ ধারা জারি হয়। এমনকি একদিন সত্য-সত্যই নতুন হাটে আগুন লাগিয়ে দেয় নাদের আলির লোক অমূল্য সাঁতরা। ধরা পড়ে তার ছ'বছরের জেল হয়।

এর মাঝে নাদের আলি সবার মন পেতে পরিকল্পনা করলেন তিনি দুর্গাপূজা করবেন—

'তেরশো উনচল্লিশ সাল বিশে আশ্বিন।
নাদের আলি দুর্গা পূজা করে সযতনে।।'

শেষ খণ্ডের নাম 'উত্তরা কাণ্ড' নামে সপ্তম কাণ্ড। কাব্যের শেষ অংশ এই রকম—

'পল্লী রামায়ণ গ্রন্থ রহস্যের শেষ।
প্রতি ঘরে ঘরে স্থান দিও বঙ্গদেশ।।
বিদায় মাগিছে কবি করজোড় করি।
গ্রন্থ সাঙ্গ হইল সবে বল হরি হরি।।

'পল্লীরামায়ণ' কাব্যটি প্রতি ঘরে ঘরে তো দূরের কথা, কয়েক ঘরের দেউড়ীও যে অতিক্র করেনি, তার প্রমাণ এই যে— কাব্যটি আজও পাণ্ডুলিপি আকারে পল্লীর নিভৃত কোণে কোন রকমে হয়তো মৃত্যুর প্রহর গুনছে। যাইহোক, আমার বলার যে বিষয়, এ কাব্যের প্রথম অংশে রয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের অভিঘাত। সেই অভিঘাতে বাক্সীর এপার-ওপারের মানুষ কিভাবে স্বদেশী আন্দোলনে আলোড়িত হয়েছিলেন, আন্দোলনে মুখর হয়েছিলেন তারও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 'স্বদেশী গ্রহণ বিলাতী বর্জন'-এর ঢেউ কিভাবে আমাদের পল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল এবং সেই উত্তাপ কিভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল— তার প্রমাণ চিহ্ন এ কাব্য। ঐতিহাসিক সত্যতার নিরিখে কাব্যটির মূল্যায়ণের প্রয়োজন। প্রয়োজন দীর্ঘ কাব্যটির মুদ্রণের। হাওড়া জেলার বাক্সীর হাট, হাট বৃত্তান্ত, জমিদার নাদের আলির অবস্থান, বাক্সীর হাটে স্বদেশী আন্দোলন, এবং এই আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুর জেলায় দুধকোমরায় নতুন হাটের পত্তন এবং নানা আঞ্চলিক প্রসঙ্গ এসেছে এ কাব্যে। হাটের পতন-নতুন হাটের শুরু, জমিদারের কবল থেকে অত্যাচারিত হাটুরেদের মুক্তি, সর্বোপরি মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিত বিস্তারে যে স্ফুলিঙ্গ কাজ করেছে তা হল জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ স্বদেশ প্রেমিকদের লড়াই-সংগ্রাম। এই লড়াই একদিকে অত্যাচারী জমিদার নাদের আলির বিরুদ্ধে, সহযোগী সতীশ বাড়ুজ্যের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে। স্বভাবতই, বাক্সীর হাটের পিকেটারদের, তথা আন্দোলনকারীদের ইতিহাসকে যেমন মান্যতা দেওয়া কর্তব্য, তেমনি এই জাগরণের ইতিহাস লিখে রাখাও জরুরি।

## সারাংশ

# বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

দোলন চাঁপা হাজরা

স্বদেশ প্রেমিক অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (জন্ম ১৮৬৪, ২০শে আগষ্ট/বাংলা সন ১২৭১, ৫ই ভাদ্র— মৃত্যু ১৯১৯, ৬ই জুন/বাং সন ১৩২৬, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ) লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের তারিখ (১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর/বাংলা সন ১৩১২, ৩০শে আশ্বিন) ঘোষণাতে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বাঙালী হিন্দু নারীদের এই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা রচনা করেন এবং তা ঘোষিত দিনটিতে অরন্ধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত পালনের নির্দেশ দেন। দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত ব্রত বাঙালী মেয়েদের এক বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান। এক্ষেত্রে লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে এই ব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পুস্তিকায় লক্ষ্মী দেবীকে ঘিরে কাহিনীর পাশপাশি কিভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে হবে তাও পুস্তিকায় উল্লেখ রয়েছে।

আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বে স্বদেশসাধক রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য যে পথ গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নারী জাতির মধ্যে দেশপ্রেম জাগাবার যে প্রয়াস রামেন্দ্র সুন্দর দেখিয়ে গিয়েছেন তা আমাদের বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। সেই সব দিকগুলি বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। তাছাড়া বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের কাছে তাঁর রচিত বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথাটি পুরোপুরি তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

বঙ্গবিভাগ প্রতিরোধ কল্পে রবীন্দ্রনাথ যেমন বঙ্গভঙ্গের নির্দ্দিষ্ট দিনটিতে উভয় বঙ্গের মিলন সূচক রাখী বন্ধনের পরিকল্পনা নেন তেমনি রামেন্দ্র সুন্দর অরন্ধনের মধ্য দিয়ে নারী জাতিকে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা পালনের নির্দেশ দেন।

# ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম ঃ গুজব ও অলৌকিকতা নিয়ে দু-চার কথা

কেয়া মণ্ডল

ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের কাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যাবে উপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের পর্ব থেকে পর্বান্তরে বারবার গুজব এবং অনেক সময় গুজব নির্ভর অলৌকিক মহিমার মাহাত্ম্যের প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত টোটার ব্যবহারের গুজব নিয়ে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল বিদ্রোহের মত উপজাতীয় বিদ্রোহে গুজব— অলৌকিকতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনেও কিন্তু গুজবের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। গোরখপুরে গান্ধীজীকে নিয়ে এমন অনেক গুজব প্রকাশিত হয়েছিল যা শেষ অবধি গান্ধীজীকে অলৌকিক মহিমায় মহিমান্বিত করেছিল এবং কৃষক চৈতন্যে "স্বরাজের ব্যাখ্যা হয়েছিল— সব পেয়েছির দেশ।" অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে বারবার গুজব বা গুজব নির্ভর অলৌকিকতা প্রচারিত হয়েছে। উপবর্গীয় বা নিম্নবর্গীয় উভয় কাঠামোতেই গুজব ছিল একটি বহুল ব্যবহৃত বিষয়, যা আবার ব্যক্তি বিশেষকে অলৌকিক মহিমায় মহিমান্বিত করেছিল। এর ফলে জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগ জনগণকে অনেক বেশি আন্দোলন অভিমুখী করেছিল। অর্থাৎ গুজব বা গুজব নির্ভর অলৌকিকতা জনমনে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করে অন্দোলনের অন্যতম উপাদান জনশক্তিকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করেছিল। যদিও শেষ বিচারে এই অতি আবেগ হয়ত অনেক সময়ই শুভকর হয়নি। সে যাই হোক না কেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে বারবার গুজবের ব্যবহার ছিল আন্দোলনের-ই একটি রণকৌশল মাত্র, তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

# উনিশ ও বিংশ শতকে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী

সুজিত ঘোষ

প্রাচীনকালে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাংলার ঐতিহ্য আজ গল্প কথার মতো মনে হয়। কৃষিপ্রধান বাংলার কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প ছিল গৌরবময়। বাংলার পর্যাপ্ত কৃষি উদ্বৃত্ত ও রপ্তানীযোগ্য শিল্প-পণ্যকে ঘিরে দেশের ভিতরে শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল বিদেশের সাথে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এই বাণিজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে বাংলার বণিকশ্রেণীর প্রচেষ্টা ও প্রয়াস ছিল উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি ও নানা ধরনের শিলালিপি ও লেখমালা থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বণিকশ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অখণ্ডবঙ্গের উত্তরাঞ্চলেও এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধতা ও বণিকশ্রেণীর যে ব্যবসায়ী উদ্যোগ ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ)-এর সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সঙ্গে বিদেশের বিশেষ করে রোম, পারস্য, আরব ও সিংহল দেশের বাণিজ্যের কথা জানা যায়। একই সঙ্গে পুণ্ড্রদেশে সেই সময় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছিল।[১] অভ্যন্তরীণ এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্রদেশ তথা উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য স্থানীয় ছোটছোট হাট-বন্দর ও গঞ্জ। বর্ত্তমানকালে উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলের সঙ্গে "গঞ্জ" শব্দটি যুক্ত আছে। নামের সঙ্গে "গঞ্জ" উপসর্গ থেকে এ কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে এটা বাণিজ্যিক প্রসিদ্ধির নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার অর্থনীতির যে পরিবর্তন ঘটেছিল উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির ওপরও তার প্রভাব পড়েছিল। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে উত্তরবঙ্গে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্বেই শুরু হয়েছিল মালদহ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। আজকের উত্তরবঙ্গে কোম্পানীর শাসন সুদৃঢ় হয়েছিল ঐতিহাসিক ভুটানযুদ্ধের (১৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ) পর ও বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের পর (১৮৬৮ খ্রীঃ)। বর্ত্তমান জলপাইগুড়ি বিভাগ উত্তরবঙ্গ নামে সমধিক পরিচিত। ঔপনিবেশিক পর্বে বিশেষ করে উনিশ ও বিংশ শতকে এই অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী

শ্রেণীর উদ্ভব, কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক ভূমিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই নিবন্ধে আলোচনা করবো।

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তার দরুন এ অঞ্চলের অর্থনীতির একটা স্বক্রীয়তা লক্ষ্য করা যায়। উনিশ ও বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক স্বার্থে অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। উত্তরবঙ্গের মধ্যে আমরা আবার দুটি উত্তরবঙ্গকে খুঁজে পাই। একটি উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এবং অপরটি উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ বর্ত্তমান দুই দিনাজপুর ও মালদা। আমাদের আলোচ্য সময়ে এই দুই অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকব। এছাড়া স্থানীয় ও বহিরাগত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিক গোষ্ঠীও কিভাবে এ অঞ্চলের ব্যবসায় একটা বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল তাও খুঁজে পেতে চেষ্টা করবো এই প্রবন্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুঘল যুগে রাজ আনুকূল্য পেয়ে বিদেশী বণিকরা বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ করেছিল। অন্যদিকে ইংরেজদের বাংলায় আগমনের সাথে সাথে বাংলায় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী বিশেষত গুজরাটী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে।[২] উনিশ ও বিংশ শতকে আজকের উত্তরবঙ্গে ব্যাপক হারে অবাঙ্গালী বণিক শ্রেণীর বিস্তার ঘটেছিল।

কৃষিপ্রধান উত্তরবঙ্গের কষিকাজ মূল জীবিকা হলেও বিভিন্ন ব্যবসার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলি আলোচ্য সময়ে কৃষিপণ্য বাণিজ্যে উল্লেখের নজির রাখে। উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল ধান উৎপাদনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ছিল, এখনও আছে। মালদা ও অবিভক্ত দিনাজপুর থেকে বিভিন্নস্থানে ব্যাপকহারে চাল রপ্তানী হত। এই চাল রপ্তানী কাজে মাড়োয়ারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যুক্ত ছিল। ধান ও চালের ব্যবসা স্থানীয় স্তরে নিয়ন্ত্রণ করত সাহা এবং তিলিরা অর্থাৎ বাঙালী ব্যবসায়ীরা। তবে এ অঞ্চলের অধিকাংশ চাল কলের মালিক ছিল অবাঙ্গালী মাড়োয়ারী। এ অঞ্চলের রাজবংশী, মালো, নমশূদ্র ও সন্ন্যাসীরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ থেকে বহু লোক এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে কৃষিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রাচীন কালে অখণ্ড দিনাজপুরকে Matsya Desha বা মাছের দেশ বলা হত। ঔপনিবেশিক পর্বে বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথম দশকে মৎস্য বাণিজ্য ছিল অখণ্ড দিনাপুরে উল্লেখ করার মতো। বর্ত্তমান উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের সাত কিঃমিঃ দক্ষিণে দুর্গাপুর আলোচ্য সময়কালে এ অঞ্চলের একমাত্র মৎস্য বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।[৩] স্থানীয় মালো, নমশূদ্র ও হারি জাতির লোকেরা মৎস্য যোগান দিত। মাছের পাইকারী বা আড়তদারী

ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল সাহা ও কুণ্ডুরা। অখণ্ড দিনাজপুর ও বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আলোচ্য সময়কালে স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল থলি, মাদুর শিল্প ও তেলকল। তবে যন্ত্রচালিত তেলকলগুলি ছিল মাড়োয়ারী নিয়ন্ত্রণাধীন। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে বিংশ শতকে অখণ্ড দিনাজপুরে যন্ত্রচালিত তেলকল ছিল মাত্র দুটি— মাড়োয়ারী মালিকানাধীনে।[৪] বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগ ছিল লক্ষনীয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে অখণ্ড দিনাজপুরে ঊনিশ শতকের তিরিশের দশকে দু হাজার তাঁত কল ছিল এবং এর উৎপাদন মূল্য ছিল প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা। বয়নকারীরা সকলেই ছিলেন স্থানীয় তাঁতী, যুগী অথবা পলিয়া। বয়নশিল্প স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে উঠলেও পেশাগত দিক দিয়ে কৃষিই ছিল লাভজনক এবং স্থানীয় অমসৃণ বস্ত্রের বাণিজ্য বৃহত্তর বাংলার বাণিজ্যের সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে ওঠেনি। কারণ ভদ্রলোকশ্রেণীর এ প্রকার বস্ত্রে কোন চাহিদা ছিল না। তাই দেখা যায় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এ অঞ্চলকে স্পর্শ করে নি।[৫]

বর্তমান উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের মালদা ছিল আলোচ্য সময়কালে রেশম উৎপাদন ও রেশম ব্যবসার মুখ্যকেন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে রেশম ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই সপ্তদশ শতকে মালদায় বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকশ্রেণীর সমাগম হয়েছিল।[৬] তবে ১৮৩৩ খ্রীঃ ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসানের পর থেকে মালদা কেবলমাত্র কাঁচা রেশম উৎপাদনের দিকে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। মালদায় রেশম শিল্প, সূতো থেকে কাপড় তৈরীর পর্যায়ে মূলত দেশী পুঁজির উপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। বর্ধমানের তিলি ব্যবসায়ীরা, পোদ্দার, সার্টিয়ার এবং মাড়োয়ারী প্রভৃতি বণিকশ্রেণী মালদায় কাঁচা রেশমের কারবারী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল।[৭] তবে আলোচ্য সময়কালে রেশম শিল্প ও ব্যবসায় দেশী পুঁজির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পুঁজিও খাটতো। বুচানন হেমিল্টন-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ঊনিশ শতকের শেষ দিকে মালদা অঞ্চলে অন্তত সাতটি ইউরোপীয় কোম্পানী গুটি পোকা থেকে কাঁচা রেশম বের করতো। হান্টার সাহেবের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে মালদায় অন্তত কুড়িটি নীল তৈরীর কারখানা ছিল। প্রায় সবকটিই গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় পুঁজি উদ্যোগের উপর। মালদাতে এখনও গিরি ও সন্ন্যাসী পদবীধারী বহু বণিকগোষ্ঠী দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলের সূচনা থেকেই এরা ব্যবসা করতো। মটকা, তাঁত এবং বিশেষ করে কাটারী কাপড় তৈরী ও ব্যবসায় এরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। Report on the Survey and Cottage Industries in Bengal (1929) থেকে জানা যায় যে কাঁসা ও পিতল শিল্পে মালদার অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঔপনিবেশিক পর্বে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে চিরায়ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অর্থাৎ সাহা, তিলি, কুণ্ডু প্রভৃতি সম্প্রদায় পাইকারী, সাধারণ ও মাঝারি ধরনের বিভিন্ন ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হিসাবে অর্থনীতিতে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। অন্যদিকে এ অঞ্চলের বড় বড় ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো অবাঙ্গালী ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ীরা এবং ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করতে হয় যে এ অঞ্চলে চিরায়ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্যবসাসূত্রে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে উঠলেও বড় বড় ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেনি বিশেষ করে যেখানে পুঁজির প্রশ্ন জড়িত সেখানে এগিয়ে আসেনি।[৮] কেন আসেনি তা অবশ্যই নিবিড় অনুসন্ধানের বিষয়। হয়তো তারা পরিচিত সাধারণ ব্যবসা ও পারিবারিক গণ্ডির বাইরে যেতে চায়নি যা চিরায়ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যাইহোক এ অঞ্চলে ব্যবসায় অংশগ্রহণের সাথে সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধেও সচেতন হতে থাকে। ১৯১১ সালের লোকগণনায় সাহা সম্প্রদায় আলাদা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ কথা উল্লেখ করতে হয় যে সাহাসম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ১৮৯৬ সালে ‘‘স্বজাতি হিতসাধন সমিতি’’ গঠনের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী জানিয়েছিল।[৯] অন্যদিকে মাড়োয়ারী অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ও এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। মুখ্যত আবহমান দ্রব্যের একটা বড় অংশ তারা নিয়ন্ত্রণ করতো। জে.এ. ভাস বলেছেন পূর্ববঙ্গের রংপুর এবং অখণ্ড দিনাজপুর জেলার ব্যবসার সিংহ ভাগটাই নিয়ন্ত্রণ করতো মাড়োয়ারী ও সাহা সম্প্রদায়।[১০] সাহা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ন্যায় মাড়োয়ারী সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী স্বার্থ রক্ষার্থে ঔপনিবেশিক পর্বে বিশেষ করে বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে যথেষ্ট সচেতন ছিল তার প্রমাণ মেলে। ১৯৪৪ সালের ২৫শে নভেম্বর তারা রামেশ্বর লালজী আগরওয়ালার সভাপতিত্বে হিন্দু ব্যবসায়ী বৈধস্বার্থ সংরক্ষণে ‘‘দিনাজপুর হিন্দু ব্যবসায়ী সমিতি’’ গঠন করেছিল।[১১]

এখন উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের বণিক শ্রেণীর আলোচনায় আসা যাক। আলোচ্য সময়কালে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের আলোচনার সাথে সাথে সিকিম এবং ভুটান রাষ্ট্রের সানুদেশ ও আলোচনার সুবিধার্থে এসে পড়তে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে কোন স্থানীয় বণিকগোষ্ঠী গড়ে ওঠার এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মুখ্যত কৃষি প্রধান উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে কৃষি-ই ছিল অধিবাসীদের উপজীবিকা। স্থানীয় অধিবাসীরা কমলালেবু, এলাচ, ও বণজ দ্রব্য ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল। সমতলে মেচ এবং পাহাড়ে নেপালীরা বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও

ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[১২] রেল পরিবহনের সূত্রধরে দার্জিলিং থেকে কমলালেবু, এলাচ, আলু, কাঠ এবং উল রপ্তানী শুরু হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের সমতলে আত্মকেন্দ্রিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। এরা বাণিজ্যে আসে নি। এরা বাণিজ্যে আসে নি। অন্যদিকে নেপালীরাও বাণিজ্য করত না। এরা পার্বত্য অঞ্চলে খুচরো ব্যবসা, গো পালন এবং ড্রাইভিং প্রভৃতি কাজে বেশী আগ্রহী। তবে নেপালীদের মধ্যে প্রধান পদবীধারীরা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতো।[১৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে নেপালী প্রধান বণিক গোষ্ঠীর বাঙ্গালী সাহা ও বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

সুতরাং আলোচ্য সময়কালে এ অঞ্চলের সমতল এবং পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় বণিক শ্রেণীর অনুপস্থিতিতে অন্য অঞ্চলের বণিকশ্রেণী এবং ইউরোপীয় বণিকশ্রেণী এ অঞ্চলের ব্যবসার মুখ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের বিস্তৃত সীমান্ত - অঞ্চল জুড়ে শাল কাঠের ব্যবসা ও চা বাগান গড়ে উঠেছিল। উত্তরবঙ্গে এ ব্যবসার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ইংরেজরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইংরেজ বণিকরা কাঠের ব্যবসার দিকে দৃষ্টি দিতে থাকে, বিশেষ করে কোম্পানী যখন পূর্ণিয়া অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা হাতে পায়। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরা জাহাজ শিল্পের জন্য কাঠ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। প্রচুর অর্থাগম দেখে এই সময় উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় বাঙ্গালীরাও ইংরেজদের অনুকরণে কাঠের ব্যবসা ও চা বাগান পত্তনে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই সকল চা বাগিচার মালিক ও কাঠের ব্যবসায়ীরা কেউই কিন্তু স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন না। সকলেই এসেছিলেন হয় পূর্ববঙ্গ নতুবা দক্ষিণবঙ্গ থেকে। আলোচ্য সময়কালে এ অঞ্চলের কাঠের ব্যবসায়ীরা নব্বুই শতাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী এবং স্বল্প সংখ্যক এসেছিলেন বর্দ্ধমান থেকে।[১৪] কাঠের ব্যবসা এই অঞ্চলে বাঙ্গালীদের একাধিপত্য ও প্রধান ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের অপেশাদার গবেষক চোমংলামা বলেছেন যে তরাই অঞ্চলে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙ্গালীদের প্রধান তিনটি জীবিকার একটি ছিল কাঠ ব্যবসা। পরবর্তিতে এই কাঠ ব্যবসা থেকে অনেক বাঙ্গালী চা বাগানে বিনিয়োগ করেছিল।

ইংরেজ বেনিয়াদের কাছে চা বাগিচা ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। ১৮৩৯ খ্রীঃ তারা দার্জিলিং-এ প্রথম চা-বাগান ব্যবসার সূত্রপাত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সময় নীলচাষে ভাঁটা পড়ায় এবং চা-বাগান ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠলে দলে দলে ধনী ইংরেজরা উত্তরবঙ্গে চা বাগান পত্তনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের

অনুকরণে কিছু ভারতীয়ও এই উদ্যোগে সামিল হয়েছিল। চা-বাগান পত্তনের সূত্র ধরে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে বিপুলহারে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বাঙ্গালীদের আগমন ঘটেছিল। ১৮৭৯ সাল উত্তরবঙ্গের বাঙ্গালী ব্যবসার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। ঐ বৎসর বাঙ্গালীর সম্মিলিত কর্মদ্যোগে সর্বপ্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন চা বাগানের পত্তন হয়েছিল "জলপাইগুড়ি টী কোম্পানী লিমিটেডের" অধীন "মোগলকাটা চা বাগান"। উত্তরবঙ্গে বাঙ্গালীর চা বাগান ব্যবসায় অভাবনীয় সাফল্য উপনিবেশিক ইংরেজদেরও আশ্চর্য করে দিয়েছিল। মিঃ হেন্ডারসন নামে এক ইংরেজ সেই সময় মন্তব্য করেছিলেন— "আমি এর আগে ভারতীয় মালিকানায় এরূপ সুষ্ঠুভাবে বাগান পরিচালিত হতে দেখিনি।[১৫] তবে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সময় থেকে চা বাগান ও চা ফ্যাক্টরীগুলো বাঙ্গালীদের হাত থেকে ক্রমে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকে এবং এখনও তা চলছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে পাটের ব্যবসা বিশেষ ভাবে প্রসারিত হয়েছিল এবং বিংশ শতকে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ অঞ্চলে পাটের ব্যবসা মুখ্যত নিয়ন্ত্রণ করতো মাড়োয়ারীরা। মাড়োয়ারী ছাড়াও ইউরোপীয়দের এই ব্যবসায় যুক্ত থাকার নজির মেলে। আলোচ্য সময়কালে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের হলদিবাড়িতে গড়ে উঠেছিল একাধিক ইউরোপীয় জুট ফার্ম। পাটের ব্যবসার নিচের স্তরে যুক্ত ছিল পূর্ব বাংলার সাহা, তিলি ও বণিক গোষ্ঠী। তবে এ ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের ব্যাপক উপস্থিতি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে পৃথিবী ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাকালে ইউরোপীয় বহু জুট কোম্পানী ইংরেজদের থেকে মাড়োয়ারীদের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

আলোচ্য সময়কালে পার্বত্য উত্তরবঙ্গে বাণিজ্য ও বণিকশ্রেণীর যথেষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সিঙ্কোনা, এলাচ, কমলালেবু প্রভৃতি পণ্যের ব্যবসাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেপালী ও ভুটিয়ারা যুক্ত ছিল। তবে সামগ্রিকভাবে এ সকল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো তিব্বতীয় বণিকরা। ১৮৫৫ খ্রীঃ কালিংপং দার্জিলিং জেলার অধীনে আসে। কালিংপং ছিল সিঙ্কোনা বাণিজ্যের মুখ্য কেন্দ্র এবং পার্বত্য বাণিজ্যের প্রধান বাণিজ্যিক বন্দরের মারফৎ উল-এর ব্যবসা করতো।[১৬] গ্রুনিং সহেবের বিবরণী থেকে জানা যায় ভুটান বাণিজ্যের সিংহভাগটাই হতো বক্সাদুয়ারের মধ্য দিয়ে এবং তিব্বত, ভুটান ও মধ্য এশিয়ার উল এই পথ হয়ে ভারতে আসত।[১৬] তিব্বতী ছাড়া মাড়োয়ারীরাও এ অঞ্চলে উলের ব্যবসা করত। বিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকে আমেরিকার বণিকরা কালিংপং-এর সাথে আমেরিকার প্রত্যক্ষ বাণিজ্য করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮]

ইউরোপীয় বণিকদের কাছে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ছিল খুবই লোভনীয়। ১৬৮৯ খ্রীঃ বোম্বে কাউন্সিলের একটি পত্রে পরিষ্কারভাবে তা বলা হয়েছিল "Bengal trade was a jewel in the company's trade"।[১৯] সুতরাং অখণ্ডবঙ্গে সময়ের সাথে সাথে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এবং বিশেষ করে ইংরেজরা ভারত তথা বাংলার বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। আমাদের আলোচ্য সময়কালে উত্তরবঙ্গেও ঔপনিবেশিক ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। তবে এ কথা উল্লেখ করতে হয় যে এ অঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যের বাণিজ্যের প্রতিই তাদের ঝোঁক ছিল।[২০] যেমন তারা উত্তরবঙ্গে কাঠ ব্যবসা, চা বাগিচা ব্যবসা ও পাটের ব্যবসার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পরবর্তিতে অবশ্য তারা কাঠের ব্যবসায় তেমন উৎসাহ দেখান নি। এইভাবে দেখা যায় উত্তরবঙ্গে ইংরেজ বেনিয়াদের একটি ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে স্থানীক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনুপস্থিতিতে উদ্ভব ঘটেছিল অস্থানীক বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর, বিশেষ করে মাড়োয়ারী বণিকশ্রেণীর। অর্থ প্রাচুর্যে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এবং চিরায়িত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা এই অঞ্চলের প্রায় সমস্তরকম পাইকারী বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও সেইসঙ্গে নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে হয় যে ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছিল সুসংবদ্ধ এবং এ অঞ্চলের বহির্বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় সমস্তটাই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিংশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্তও এ অঞ্চলের চা বাগিচা-ব্যবসায় ইউরোপীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যে আসাম ও ডুয়ার্সের বহু চা বাগান বাঙ্গালী মালিকাধীনে এসেছিল। পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাকালে বহু জুট কোম্পানী মাড়োয়ারীদের হাতে হস্তান্তরিত হলেও Tea Plantation ব্যবসায় কিন্তু মাড়োয়ারীদের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমানে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকায় No mans Land-এ মাড়োয়ারীদের চা বাগিচা গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে এ কথা বলা যায় যে উত্তরবঙ্গে স্থানীক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনুপস্থিতিতে অস্থানীক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও অবাঙ্গালী ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে এবং বর্তমান শতকেও তা বিদ্যমান। অন্যদিকে উপনিবেশ ইংরেজ বণিকরাও উপনিবেশিক স্বার্থে এ অঞ্চলে আমাদের আলোচ্য সময়কালে ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জীবনে না ইউরোপীয়, না অস্থানীক বাঙ্গালী, না অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। উপনিবেশিক শাসনকালে উপনিবেশিক ববসায়ী ও

বৃহত্তর ভিন্ন প্রদেশীয় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং বহিরাগত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিস্তার সত্ত্বেও এ অঞ্চলে সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি কেন সম্ভব হয়নি তা অবশ্যই গভীর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। তবে এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করতে হয় যে স্বাধীনোত্তর পর্বেও উত্তরবঙ্গে তেমন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সূচিত হয়নি এবং এটাও নিবিড় অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) রমণী মোহন দেবনাথ — ব্যবসা ও শিল্পে বাঙ্গালী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃঃ-১০

২) রমণী মোহন দেবনাথ — ব্যবসা ও শিল্পে বাঙ্গালী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃঃ-৪০

৩) এফ.এ.স্ট্রং — ইষ্টার্ন বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার, দিনাজপুর, এলাহাবাদ ১৯১২, পৃঃ-৮০

৪) এফ.এ.স্ট্রং — ঐ, পৃঃ-৭৯

৫) এফ.এ.স্ট্রং — ঐ, পৃঃ-৮২

৬) সুশীল চৌধুরী — ট্রেড এন্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেসন ইন বেঙ্গল (১৬৫০-১৭২০) কোলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ-৯৮

৭) ডব্লু.ডব্লু.হান্টার — এ স্ট্যাটিসটিকাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, খণ্ড ৭ লন্ডন, প্রথম প্রকাশ-১৮৭৬, পৃঃ-৪৪

৮) রমণী মোহন দেবনাথ — ঐ, পৃঃ-৬০

৯) রমণী মোহন দেবনাথ — ঐ, পৃঃ-৪২

১০) জে.এ.ভাস (সম্পাদিত) — ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, রংপুর, ১৯১১, পৃঃ-৪৮

১১) আনন্দবাজার পত্রিকা — বাং ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫১, পৃঃ-৮

১২) ডব্লু.ডব্লু.হান্টার — এ স্ট্যাটিসটিকাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, খণ্ড ১০ লন্ডন, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭, পৃঃ-৩৯

১৩) অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, দার্জিলিং জেলার ব্যবসা বাণিজ্য, উত্তরধ্বনি শারদসংখ্যা, শিলিগুড়ি, বাং ১৪০৪

১৪) স্মারক সংখ্যা, জলপাইগুড়ি এ.সি. কলেজ অব কমার্স (১৯৬২-৮৭) প্রসঙ্গ ঃ বাঙ্গালীর কাঠের ব্যবসা — ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ।

১৫) যোগেশ জীবন — শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মহালয়া বাং ১৩৭১, গোপাল ভবন, জলপাইগুড়ি।

১৬) এ.জে.ড্যাস — গেজেটিয়ার অব দি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক আলিপুর, ১৯৪৫, পৃঃ-১৬৭
১৭) জে.এফ.গুনিং — ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, জলপাইগুড়ি-এলাহাবাদ, ১৯১১, পৃঃ-১১১
১৮) এ.জে.ড্যাস — ঐ, পৃঃ-১৬৭
১৯) সুশীল চৌধুরী — ঐ, পৃঃ-৫৭
২০) সুশীল চৌধুরী — ঐ, পৃঃ-৯৮

# ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর অভিবাসন ঃ প্রসঙ্গ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

কার্ত্তিক সাহা

'অভিবাসন' একটি 'আন্তঃবিষয়ী' বিষয় হিসেবে বর্তমানকার 'আনুবিক্ষণীক' ঐতিহাসিক গবেষণার একটি উপজীব্য বিষয়। এভারেট এস.লী., স্যামুয়েল এ স্টোফার, কে.সি. জাকারিয়া[১], এস্. চন্দ্রশেখরন প্রমুখ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সাধারণভাবে 'অভিবাসন' এবং বিশেষভাবে 'অন্তঃ অভিবাসন' বিষয়কে গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে আলোকিত এবং গণদৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ বা এখানকার বিশেষ কোন জেলাকে নিয়ে আঞ্চলিক স্তরে এ ধরনের আলোচনার বড়ই অভাব, শুধুমাত্র হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "Internal Migration in India : A case study of Bengal" (1987) এবং শ্রী নারায়ণচন্দ্র সাহা মহাশয়ের "The Marwari Community in Eastern India" (2003) ব্যতীত। অথচ এই উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা দুটি ভূ-ঐতিহাসিক দিক থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ 'অন্তঃ অভিবাসনমুখী' অঞ্চল। ঔপনিবেশিক এমনকি উত্তর-ঔপনিবেশিক কালেও এই অঞ্চলে অভিবাসন একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আলোচ্য এই দুই জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উত্তর ঔপনিবেশিক কালে জেলাদুটিতে অভিন্নধর্মী কিন্তু ভিন্ন চরিত্রের দুই প্রতিক্রিয়া। যেখানে জলপাইগুড়ি জেলায় 'রাজবংশী' সম্প্রদায় অভিবাসীদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'স্বকীয় শাসন' এবং আলাদা রাজ্যের দাবি মানিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমেছে, সেখানে দার্জিলিং জেলার অভিবাসী শ্রেণী 'গোর্খা-আইডেন্টিটি'-র ব্যানারে পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। প্রায় সমকালীন এবং সমরূপী অভিবাসনের এই বিষমরূপী প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমিই এখানে উপস্থাপিত হবে।

## ( I )

জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং ঔপনিবেশিককালের অনিয়ন্ত্রিত[২] এই জেলাদুটি (১৯৫০ খ্রী পর্যন্ত)[৩] ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার কর্তৃক গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃ অভিমুখী

অভিবাসনের প্রভাবে ঐ অঞ্চলের জন-জাতিতে সংখ্যাগত দিক হতে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ভৌগোলিক কারণে, যেমন উত্তর-পূর্ব ভারত এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সীমারেখা বা তার কাছাকাছি অবস্থান, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয় আভিবাসিতদের আকর্ষণের কারণ হয়। একারণে ভৌগোলিকগণ সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গকে এবং বিশেষভাবে জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চলকে 'উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার' হিসেবে বিবেচনা করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা গেছে যে, ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলার অধিকাংশ রাজনৈতিক কেন্দ্রই উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যেই অবস্থিত ছিল। বৈকুণ্ঠপুরের রাজা এবং কোচবিহারের মহারাজাদের প্রেরণাতেও এই অঞ্চলে অভিবাসন লক্ষিত হয়। এই ভূ-ঐতিহসিক পটভূমিতে ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ শাসকগণ কর্তৃক জেলা দুটির আধুনিক রূপদান, চা-শিল্পের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজন ইত্যাদি কারণে অন্তঃমুখী অভিবাসন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

উক্ত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পার্বত্যদেশ (বিশেষত নেপাল) এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত (যেমন বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও বাংলার অন্যান্য স্থান) হতে শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠী এবং বণিক ও প্রশাসনিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। ঔপনিবেশিক যুগে এই অভিবাসন প্রথমদিকে 'আমন্ত্রিত' হলেও পরবর্তীতে তা 'স্বেচ্ছা' অভিবাসনের রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে 'পুল ফ্যাক্টরগুলির ন্যায় অভিবাসনকারীদের স্ব-ভূমির নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা 'পুশ ফ্যাক্টর' হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিকোত্তর এই অভিবাসন এক নতুন চরিত্র লাভ করেছে। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ( যেমন চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণ) এবং ভারত বিভাগ এক নব অভিবাসন সৃষ্টি করেছে যা চরিত্রে 'বাধ্যতামূলক অভিবাসন' বা 'ফোর্সড মাইগ্রেশন' কিন্তু নামে 'রিফুজী মাইগ্রেশন'-এ পরিণত হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান অভিবাসন জেলাদুটির অস্থির পরিবেশ সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

## ( II )

১৮৫৮-৫৯ খ্রীঃ রংপুরের রাজস্ব জরিপকালে জলপাইগুড়ি জেলার জনসংখ্যার হিসেব ছিল ১৮৯০৬৭[৪], কিন্তু ১৮৭১-৭২-এর আদম সুমারী হিসেবে এই জনসংখ্যা হয় ৩,২৭,৯৮৫[৫]। ১৮৭২ থেকে ১৮৯১-এর মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যার সঠিক হিসেবে বলা যায় না। ভূটান যুদ্ধের পর পশ্চিম ডুয়ার্সের নিরীক্ষণে (১৮৬৫-৬৭) এই অঞ্চলের জনসংখ্যা দেখা যায় ৪৯,৬২০[৬]।

**জলপাইগুড়ির জনসংখ্যার দশকীয় পার্থক্য (১৯০১-১৯৭১)**

| বছর | মোট জনসংখ্যা | দশকীয় পার্থক্য | পার্থক্যের হার (%) |
|---|---|---|---|
| ১৯০১ | ৫৪৬৭৬৪ | — | — |
| ১৯১১ | ৬৬৩২২২ | ১১৬৪৫৮ | ২১.৩০ |
| ১৯২১ | ৬৯৫৯৪৬ | ৩২৭২৪ | ৪.৯৩ |
| ১৯৩১ | ৭৪০৯৯৩ | ৪৫০৪৭ | ৬.৪৭ |
| ১৯৪১ | ৮৪৭৮৪১ | ১০৬৮৪৮ | ১৪.৪২ |
| ১৯৫১ | ৯১৬৭৪৭ | ৬৮৯০৬ | ৮.১৩ |
| ১৯৬১ | ১৩৫৯২৯২ | ৪৪২৫৪৫ | ৪৮.২৭ |
| ১৯৭১ | ১৭৫০১৫৯ | ৩৯০৮৬৭ | ২৮.৭৫ |

উৎস ঃ প্রাসঙ্গি আদম সুমারী (সেন্সস)

ওপরের সারণী থেকে বোঝা যায় যে, প্রায় অর্ধশতাব্দীর মধ্যে (১৮৭২-১৯২১) জলপাইগুড়ি জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৪৪.২%। অবনী মোহন কুমারি-র মতে, "The population of the district between 1871 and 1921, had increased mainly through massive immigration".[৭] গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রেই জলপাইগুড়ি জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রাজ্যের তুলনায় অধিক ছিল। ১৯১১-২১ দশকে যেখানে বাংলার সামগ্রিক গ্রাম্য জনসংখ্যা ৪.৪৩% হ্রাস পায়, জলপাইগুড়িতে তা ৪.৫৫% বৃদ্ধি পায়। আবার ১৯৬১ খ্রীঃ যখন বাংলার গ্রাম্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩২.৮০%, সেখানে জলপাইগুড়ির বৃদ্ধি পায় ৪৮.২৭%[৮], তবে জলপাইগুড়ি শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৪১-৬১ খ্রীঃ গ্রামের তুলনায় অধিক ছিল। সম্ভবত প্রথমদিককার পূর্ব-পাকিস্তানী রিফুজীরা শহরাঞ্চল থেকে শহর এলাকাতেই বসতি গড়ে ছিল। কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ গ্রামগুলিতে দেরিতে পৌছানোয়, সেখান হতে অভিবাসনও দেরিতে হয়েছিল।

নিম্নলিখিত সরণী হতে ১৯০১ থেকে ১৯৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় অন্তঃ অভিবাসনের সংখ্যাগত ধারণা পাওয়া যেতে পারে—

| বছর | অন্তঃঅভিবাসী | বছর | অন্তঃঅভিবাসী |
|---|---|---|---|
| ১৮৯১ | ৯৮৬১১ | ১১৩১ | ১৫৮৭৫৭ |
| ১৯০১ | ৯৫৮৯৯ | ১৯৪১ | ১৫৬৭৬৫ |
| ১৯১১ | ১৫২১৭৪ | ১৯৫১ | ২৭৮৮৪২ |
| ১৯২১ | ১৬৩০২৪ | ১৯৬১ | ৪৫৪১৭৭ |

উৎস ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার্স, জলপাইগুড়ি[৯]

## দার্জিলিং জেলার জনবৃদ্ধি

| বছর | মোট জনসংখ্যা | দশকীয় বৃদ্ধি | বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|
| ১৮৭২ | ৯৪৭১৪ | | |
| ১৮৮১ | ১৫৫১৭২ | ৬০৪৬৭ | ৬৩.৮৪ |
| ১৮৯১ | ২২৩৩১৪ | ৬৮১৩৫ | ৪৩.৯১ |
| ১৯০১ | ২৬৫৭৮০ | ৪২৪৬৬ | ১৯.০১ |
| ১৯১১ | ২৭৯৮৯৯ | ১৪১১৯ | ৫.৩১ |
| ১৯২১ | ২৯৪২৩৭ | ১৪৩৩৮ | ৫.১২ |
| ১৯৩১ | ৩৩২০৬১ | ৩৭৮২৪ | ১২.৮৫ |
| ১৯৪১ | ৩৯০৪৯৯ | ৫৮৮৩৮ | ১৭.৭২ |
| ১৯৫১ | ৪৫৯৬১৭ | ৬৮৭১৮ | ১৭.৫৮ |
| ১৯৬১ | ৬২৪৬৪০ | ১৬৫০২৩ | ৩৫.৯০ |
| ১৯৭১ | ৭৮১৭৭৭ | ৫৭১৩৭ | ২৫.১৬ |

উৎস ঃ সেন্সাস রেকর্ড, ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার এবং ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ড বুক।

মোটামুটিভাবে দার্জিলিং জেলার জনবৃদ্ধির হার বাংলার তুলনায় অধিক ছিল। ইনফ্লুয়েনজা-মহামারীর কারণে যখন রাজ্যের জনসংখ্যা ১৯১১-২১ খ্রিঃ ২.৯১% হ্রাস পায়, তখন দার্জিলিং জেলায় ৫.১২% জনসংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। ১৯৫১-৫৬ খ্রীঃ যখন রাজ্যের গড় জনবৃদ্ধি ছিল ৩২.৮০% তখন দার্জিলিং-এর জনবৃদ্ধির হার হয় ৩৫.৯০%। দার্জিলিং-এর ক্ষেত্রে শহরের অভিবাসন রাজ্যের তুলনায় বরাবরই অধিক ছিল। ১৯১১-২১ খ্রিঃ যখন রাজ্যের শহরের জনসংখ্যা ৭.১৬% বৃদ্ধি পায় তখন দার্জিলিং-এর শহরে জনবৃদ্ধি হয় ৩৩.৭৭%। যখন ১৯৫১-৬১ খ্রিঃ রাজ্যের শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৫.৩৭%, তখন দার্জিলিং-এ তা হয় ৫৩.০৯%[১০]। ইহা শহরমুখী অভিবাসনের পরিচায়ক।

## দার্জিলিং জেলার অন্তঃ এবং বহির্মুখী অভিবাসন (১৮৯১-১৯৬১)

| বছর | মোট জনসংখ্যা | অন্তঃ অভিবাসন | বহিঃ অভিবাসন | স্বাভাবিক জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৯১ | ২২৩৩১৪ | ১১৯৬৭০ | ৯৬২ | ১০৪৬০৬ |
| ১৯০১ | ২৪৯১১৭ | ১১৩৫৮৮ | ৮০২ | ১৩৬৬৩১ |
| ১৯১১ | ২৬৫৫৫০ | ১১১২৬৯ | ৬০০০ | ১৬০২৮১ |
| ১৯২১ | ২৮২৭৪৮ | ১০১৮০৭ | ৬০০০ | ১৮৬৯৪১ |
| ১৯৩১ | ৩১৯৬৩৫ | ১০০৭০০ | ৩৪৫৫ | ২২২৩৯০ |

| বছর | মোট জনসংখ্যা | অন্তঃ অভিবাসন | বহিঃ অভিবাসন | স্বাভাবিক জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৪১ | ৩৭৬৩৬৯ | ৯৫৭৫০ | ৪১২০ | ২৮৪৭৩৯ |
| ১৯৫১ | ৪৪৫২৬০ | ১০০৩১১ | ৬৯০০ | ৩৫১৮৪৯ |
| ১৯৬১ | ৬২৪৬৪০ | ১৬৯২৫০ | - | ৪৫৫৩৯০ |

উৎস ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার, দার্জিলিং[১১]

## (III)

উক্ত ক্রমবর্ধমান অভিবাসন উত্তরবঙ্গে বিশেষত আলোচ্য দুই জেলার গতাণুগতিক আর্থ-সামাজিক সংগঠনে অবশ্যই পরিবর্তন নিয়ে আসে। ব্রিটিশ-পূর্ব এই অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল অনেকটা 'এশিয়াটিক মুড টাইপোলজি'-এর ন্যায়। এখানকার অর্থনীতি ছিল অনেকটা 'এনকেলভ' চরিত্রের এবং স্বীয় চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তায় আবদ্ধ হয়ে অভিবাসীরা ছিল স্ব-পুষ্ট কিন্তু ব্রিটিশ শাসন এবং অভিবাসন এক নব সামাজিক শক্তির সৃষ্টি করে যা পরিবর্তনের ঢেউ বইয়ে দেয়।

জলপাইগুড়ি জেলায় অন্তঃ অভিবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল এখানকার জমির হস্তান্তরের মাত্রা বৃদ্ধি। ব্রিটিশ প্রবর্তিত নব জমি-ব্যবস্থায় দার্জিলিং, রংপুর, কোচবিহার থেকে আগত অভিবাসীরা অধিকাংশ জোতের অধিকারী হতে থাকে। স্বরাজ বসু লিখেছেন যে, "The large influx of people only led to a growing demand for land and a rise in land price"[১২] এভাবে জলপাইগুড়িতে রাজবংশী জোতদারের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং মারওয়ারী উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত এবং অন্যান্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়।[১৩] স্বাধীনোত্তর কালে অভিবাসন বৃদ্ধির ফলে ভূমি-হস্তান্তরও বৃদ্ধি পায়। তদুপরি 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৯৫৩', 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৫', 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭১' ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস ঘটায় এবং এর ফলে প্রাপ্ত ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টিত হয়, যা স্বাভাবিকভাবেই অভিবাসীদেরই হস্তগত হয়। এভাবে 'ভূমি-পরস্বতা'র সৃষ্টি হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসিন্দা, তথা রাজবংশী সমাজে, জোতদার, চুকনিদার এবং আধিয়ারদের মধ্যে গাঠনিক বৃত্তিমূলক পার্থক্য থাকলেও এই সমাজ মোটামুটি 'ইগালিটারিয়ান' চরিত্রের ছিল। কিন্তু ১৮৯৫ খ্রিঃ থেকে নব পরিবেশ থেকে আগত নবজোতদার শ্রেণীর 'ইমার্জিং ক্লাস কন্‌সাসনেস'-নব সংস্কৃতির আনয়ন ঘটায়।[১৪] নতুন এলিটিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী রাজ বংশী সমাজে 'শ্রেণী সচেতনতা', তা থেকে শিক্ষা গ্রহণে

আগ্রহ এবং শিক্ষা তাদের মধ্যে 'পেশাভিত্তিক মর্যাদার' সৃষ্টি করে। ফলে তাদের সমাজ হতে ব্যক্তিক এবং মানসিক পরস্বতার সৃষ্টি হয়। রাজবংশী সমাজ কর্তৃক অভিবাসীদের 'কাস্টিক কালচার' গ্রহণ এক বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের পরিচায়ক।

অভিবাসন দার্জিলিং জেলার অর্থনৈতিক সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে ডঃ ক্যাম্পবেল-এর সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে নিযুক্তির পরই দার্জিলিং-এর অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়।[১৫] তিনি নেপাল থেকে অভিবাসীদের উৎসাহদান এবং চা ও সিঙ্কেনা চাষের প্রবর্তন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। ফ্রেড্ পিসের লেখাতেই অভিবাসন-পূর্ব দার্জিলিং-এর অনগ্রসর অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬] কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ও অভিবাসনের ফলে স্থায়ী কৃষি এখানকার অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দেয়। দার্জিলিং-এ অন্ততঃ অভিবাসন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি না করলেও ভূমিহীন জনগণের সৃষ্টি করে। স্বাধীনোত্তর কালে কৃষি শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এই সমস্যা উপলব্ধ হয়। দার্জিলিং-এ আগত অভিবাসীদের মধ্যে নেপালী উপজাতি সমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদের নিজস্ব সামাজিক সম্পর্ক এবং জাতি প্রথা দার্জিলিং-এর সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস হ্যামিল্টনের মতে ভারতীয় হিন্দু (রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ) সম্প্রদায়ের দ্বারাই তারা 'জাতি' প্রথার জালাবদ্ধ হয়। তবে নেপালীদের 'থ্রী-টায়ার-কাস্ট' প্রথা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কিত।

দার্জিলিং-এর অভিবাসনের এক বৈশিষ্ট্য ছিল সমভূমি হতে আগত অভিবাসী কর্তৃক, মূলত বাঙালী, মারওয়ারী ইত্যাদিদের দ্বারা পেশামূলক বৃত্তিগুলি দখল। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ সময় গোর্খা 'শ্রমিক-কৃষি-সেনা'-শ্রেণী হিসেবে একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এরা লক্ষ্য করে যে প্রায় সকল পেশামূলক বৃত্তিগুলি বাঙালী বাবুদের অধীনে। ফলে বাঙাল প্রোফেসনাল শ্রেণী এবং দার্জিলিং-এর 'ইমার্জিং মিড্ল ক্লাস'-এই দুই জনজাতির মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী প্রোফেসনাল কর্মক্ষেত্রগুলি অধিকারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রথম দিকে এই দ্বন্দ্ব বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব হলেও পরবর্তিতে তা অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনে 'হোওয়াইট কলার স্টীল ফ্রেম' হিসেবে অভিবাসীগণ বিশেষত বাঙালী ভদ্রলোকেরা আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে জলপাইগুড়িতে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের মধ্য হতে উদ্ভূত 'মধ্যবিত্ত-এলিট-শ্রেণী'-এর কাছে রাজ বংশীগণ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। উপেন্দ্রনাথ বর্মনের লেখায় এর সমর্থন মেলে। ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন ও শিক্ষায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠা 'ইমার্জিং মিড্ল ক্লাস' সামাজিক শ্রেষ্ঠতার জন্য 'ক্ষত্রিয়করণ' আন্দোলন শুরু করে। এভাবে

আশ্চর্যজনকভাবে রাজবংশী সম্প্রদায় তাদের স্ব-পরিচিত 'কোচ' থেকে 'রাজবংশী' (১৮৭২), রাজবংশী থেকে ব্রাত্যক্ষত্রীয় (১৯১১, ১৯২১) এবং ব্রাত্যক্ষত্রীয় থেকে বিলুপ্ত ক্ষত্রীয় (১৯৩১)-তে পরিবর্তন ঘটায়। ধীরে ধীরে ভূম্যধিকারী এবং কৃষক উভয়ে মিলিত হয়ে একটি 'ক্লাস-আইডেন্টিটি' গড়ে তোলে। স্বাধীনোত্তর কালের অভিবাসনের ধারা তাদের আরো সংখ্যা লঘিষ্ঠ এবং ভাষার দিক থেকে প্রান্তিকী করে তোলে। বাঙলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদান এবং কামতাপুর ভাষাকে 'সপ্তম শিডিউল'-এ অন্তভূক্ত না করায় শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এদিকে পেশাভিত্তিক কর্মে পশ্চাদগ্রস্ত এই সম্প্রদায় পূর্ব-পাকিস্তানগত অভিবাসীদের কৃষি-প্রযুক্তির কাছেও পিছিয়ে পরে। এমনকি তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রাপ্ত 'এম.সি' মর্যাদাতেও তারা অভিবাসী নমশূদ্র 'এস্ সি' দের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়ে। এরই ফলে শুরু হয়, যদিও পরবর্ত্তীতে, 'উত্তহাস' (উত্তরবঙ্গ তপশিলী জাতি এবং আদিবাসী সংগ্রাম)। এভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এই 'সামগ্রিক প্রান্তিকতা' তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে প্ররোচিত করে।

জলপাইগুড়ি জেলার ন্যায় দার্জিলিং-এ এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, যেখানে জলপাইগুড়িতে, অভিবাসীদের দ্বারা প্রান্তিকী হয়ে অনভিবাসীরা আন্দোলন গড়ে তোলে, সেখানে দার্জিলিং জেলার অভিবাসীরাই আন্দোলনে নামে। তবে দার্জিলিং-এ অভিবাসী, অনভিবাসী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও 'গোর্খা-আইডেন্টিটি'-র ব্যাপারে পৃথক প্রদেশ গোর্খাল্যান্ড-এর আন্দোলন চলে। এই 'গোর্খা আইডেন্টিটি' সৃষ্টির ক্ষেত্রে নেপালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ভাষাগত আধিপত্যের কথা বলা হয়। টি.বি. সুব্বা এক্ষেত্রে 'অ-পাহাড়ী' বিরোধী প্রবণতার কথা বলেছেন।[১৭] আসলে ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সংখ্যক সমভূমিজাত অভিবাসীর আগমন ঘটে এখানে এবং তারা প্রায় সকল 'হোয়াইট-কলার' বৃত্তিগুলি করে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন করে সেখানকার 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'-তে পরিণত হয়। এমনকি এখনও দার্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চলে অ-পাহাড়ী লোকেরাই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রভূত্বকারী শ্রেণী। কিন্তু ইতিমধ্যে দার্জিলিং-এর পাহাড়ী অভিবাসীদের মধ্যে এক 'ইমার্জিং মিড্ল ক্লাস' সৃষ্টি হয়, যারা স্বাধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। এভাবে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন অনেকটা এক অভিবাসী শ্রেণীর অধিপত্যের বিরুদ্ধে আরেক অভিবাসীশ্রেণীর আন্দোলন।

পরিশেষে বলা যায় যে, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা উভয়ক্ষেত্রেই অভিবাসীগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পক্ষান্তরে

এই অভিবাসনই আবার কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চঞ্চলতার একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে অভিবাসীদের ভূমিকা স্বাভাবিক হলেও দার্জিলিং-এর অভিবাসীরা অনেকটাই ফিজি, মরিশাস, ত্রিনিদাদ ইত্যাদি স্থানের ভারতীয় অভিবাসীদের ন্যায় একই ভূমিকা পালন করেছে।

## সূত্র-নির্দেশ :

১) জাকারিয়া, কে.সি — এ হিস্টোরিক্যাল স্টাডি অব এস্টার্নাল মাইগ্রেশন ইন ইনিডয়ান সাবকন্টিনেন্ট (১৯৬৪)

২) রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩ দ্বারা 'গভর্নর-জেনারেল-ইন কাউন্সিল' কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দান করা হয়েছিল। দার্জিলিং এবং পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চলকে এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়।

৩) দাস, শ্রী দীপক কুমার — 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জুরিডিকশনাল চেঞ্জেস ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব জলপাইগুড়ি সিল্ ইনফর্মেশন', পৃঃ-৫

৪) মিত্র, অশোক — ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, জলপাইগুড়ি, ১৯৫১

৫) জলপাইগুড়ি সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৫১

৬) এই হিসেব সঠিক বলা যায় না, কারণ যুদ্ধকালে বহু লোক সাময়িকভাবে গৃহত্যাগ করেছিল।

৭) কুমারী, অবনী মোহন — ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার্স, জলপাইগুড়ি, পৃঃ-৭২

৮) ঐ

৯) ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার্স পৃঃ-৭৩, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট সেন্স হ্যান্ডবুক, পৃ-৩০

১০) ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডিবুক, দার্জিলিং, ১৯৬১, পৃঃ-২৩

১১) ব্যানার্জী, এ.কে. — ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার, গভর্নমেন্ট অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, পৃঃ-১০৮

১২) বসু, স্বরাজ — 'ডায়নামিক্স অব এ কাস্ট মুভমেন্ট : দ্য রাজবংশীস অব নর্থ বেঙ্গল, ১৯১০-১৯৪৭, ২০০৩, পৃঃ-৫১

১৩) জারা, ডি — 'এভলুশন অব অ্যাগ্রারিয়ান স্ট্রাকচার অ্যান্ড রিলেশনস ইন জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট (ও.বে.)', সোসোলজিক্যাল বুলেটিন, ভল.-২৯, নং-১, ১৯৮০, পৃঃ-৭৭
মিত্র — 'ইমার্জেন্স অব এ ল্যান্ডমার্কেট ইন জলপাইগুড়ি (নর্থ বেঙ্গল) ইন দ্য আর্লি টুয়েন্টিথ্ সেনচুরি' পৃঃ-১০-১৩

১৪) রায়চৌধুরী টি.কে. — ল্যান্ড কন্ট্রোল : ক্লাস স্ট্রাকচার আন্ড ক্লাস রিলেশন ইন ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স, ১৮৭১ — ১৯০৫, ইউ.জি.সি. সেমিনার পেপার

১৫) ড্যাশ, এ.মে — বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার, দার্জিলিং, ক্যালকাটা, ১৯৪৭, পৃঃ-৪১

১৬) ক্যাম্পবেল — এ ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অব কালিমপঙ গভর্ণমেন্ট এস্টেট ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব দার্জিলিং, ১৯০১-১৯০৩, ক্যালকাটা ১৯০৫, পৃঃ-১২

১৭) সুব্বা, টি.বি. — এথনিসিটি, স্টেট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট : এ কেস স্টাডি অব গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্ট ইন দার্জিলিং, ১৯৯২, পৃঃ-৫৭-৬১

# দণ্ডকারণ্য প্রকল্প ঃ স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত

অঞ্জন সাহা

যে পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়, অনুরূপ প্রেক্ষাপটেই অনতিবিলম্বে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় ভয়াবহ মাত্রায়। প্রকৃতপক্ষে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬) পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালী হিন্দুদের সর্বস্ব হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিরামহীন আগমনের সূচনা করে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে আগত নথিভুক্ত উদ্বাস্তু সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ অতিক্রম করে।[১] তদানীন্তন জাতীয় নেতৃত্ব আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানে অবস্থানকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যদি ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন তবে তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য সর্ববিধ সাহায্য প্রদান করা হবে। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রতিশ্রুতি কত দূর বাস্তবায়িত হয়েছে— তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

যোজনা কমিশনের জনৈক উপদেষ্টা S.V. Ramamurthy ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে উদ্বাস্তু সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেন।[২] ঐ বছরই অনুষ্ঠিত পুনর্বাসন মন্ত্রীদের সম্মেলনে স্থির হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বসবাসে ইচ্ছুক বাঙালী উদ্বাস্তুরা সরকারী সহায়তা পাবেন।[৩] ১৯৫৭ সালে গঠিত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন AMPO (Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa) কমিটি রামমূর্তির সুপারিশ সমর্থন করে এবং ১৯৫৮ সালে গঠিত হয় 'দন্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' (D.D.A.)।[৪]

পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের মত পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদেরও যে পুনর্বাসন একান্ত প্রয়োজন— তা বহুদিন অবধি কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করতে চাননি। ১৯৫৫ বা তারও পরে ভারত সরকার উপলব্ধি করেন যে, ঐ উদ্বাস্তুদের চিরকাল সরকারী Dole-এর উপর নির্ভরশীল রাখা অনুচিত এবং অস্বাভাবিক।[৫] প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের ঐ বোধোদয়ের মুহূর্তে উদ্বাস্তু সংখ্যা পঁচিশ লক্ষ অতিক্রান্ত। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছেন যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল থেকে আগত ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করাই সরকারী নীতি।[৬] পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা সাময়িক, এই ধারণার ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল নেহে-লিয়াং ত চুক্তি, ৮ই এপ্রিল, ১৯৫০ তারিখে।

পরবর্তীকালে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকার করেন, কেননা পূর্বোল্লিখিত চুক্তি অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বিষয় সম্পত্তির উপর তাঁদের মালিকানা সত্ত্ব বহাল আছে। অথচ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক স্বীকার করেছিলেন যে, চুক্তির শর্তগুলিকে সুচিন্তিত উপায়ে, ধারাবাহিকভাবে পাকিস্তান উপেক্ষা করে এসেছে।[৭] কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রতি ভারত সরকারের যে অকৃপণ, সস্নেহ আনুকূল্য প্রদর্শিত হয়েছে, হতভাগ্য বাঙালী উদ্বাস্তুদের তা থেকে বঞ্চিত করার একটি দুর্বল অজুহাত তৈরী করা ছাড়া ঐ চুক্তি পুরোপুরি নিষ্ফলা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।[৭ক] একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সত্ত্বা হিসেবে পৌরাণিক দণ্ডকারণ্য আধুনিক ভারতবর্ষে অস্তিত্বহীন। মধ্যপ্রদেশের বস্তার এবং উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডি জেলা 'দণ্ডকারণ্য প্রকল্প'-র অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৮] অনুর্বর পাথুরে জমির জঙ্গল পরিস্কার, পুষ্করিণী খনন এবং উঁচু-নিচু জমি যথাসম্ভব সমতল করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপযোগী করার প্রচেষ্টা চালানো হয়— স্পষ্টতই রাজ্য সরকারদ্বয় সর্বাপেক্ষা অনুন্নত, দুর্গম অঞ্চল এবং নিকৃষ্ট জমিগুলি হস্তান্তরেই সম্মত হয়েছিলেন প্রাদেশিক স্বার্থে।[৯] সর্বোপরি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসিন মন্ত্রকের ব্যাখ্যাতীত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকল্পের সফল পরিচালনার অন্তরায় সৃষ্টি করে। D.D.A.-এর দু'জন পুরো সময়ের সদস্য ছিলেন, Chairman ও Chief Administrator - অথচ প্রশাসনিক কাঠামোয় তাঁদের নিজস্ব ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত না হওয়ায় প্রক্রিয়ারগত সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় অচলাবস্থা।[১০] প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রতিবেদনে ৩৫০০০ পরিবারের পুনর্বাসনের প্রস্তাব বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু পুনর্বাসন মন্ত্রকের নির্দেশে চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ১২,০০০।[১১] ১৯৬১ সালে প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে এবং প্রকল্প অঞ্চলে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৯৫৫,[১২] আর ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৭৫০০।[১৩] পরবর্তীকালে আরো মারাত্মক তথ্য জনসমক্ষে আসে— প্রথম থেকে একটি সর্বতোমুখী পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্য থাকলেও "উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মচারীর অভাবে এবং উক্ত অঞ্চল সম্পর্কে অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে অদ্যাবধি কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।"[১৪] অথচ বাঙালী উদ্বাস্তুদের প্রতি নৃশংস বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি'[১৪ক] গোপন রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সম্পর্কে অসত্য ও অর্ধ-সত্য প্রচারে দ্বিধান্বিত হননি, যথা, "ভারতবর্ষের অন্যত্র তাঁরা পুনর্বাসিত হতে অনিচ্ছুক"[১৫] এবং 'সময়মত সরকারী ঋণ পরিশোধ করেন না'।[১৬] বিহার ও উড়িষ্যায় পুনর্বাসন প্রচেষ্টার'[১৬ক] সামগ্রিক ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী (Committee of Ministers) স্পষ্ট ভাষায়

পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার সুপারিশ করে।[১৭] ঐ সুপারিশ রাজ্য সরকার পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা ইতিমধ্যে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সীমা (স্যাচুরেশন পয়েন্ট) অতিক্রম করেছে। তদানীন্তন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার হিরন্ময় ব্যানার্জীর মতানুসারে ঐ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, পরিসংখ্যান ভিত্তিক নয়।[১৮] প্রসঙ্গত 'দণ্ডকারণ্য প্রকল্প' পরিকল্পিত হয়েছিল শুধুমাত্র ত্রাণশিবিরে বসবাসকারী ২.৬১ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্যই,[১৯] যাদের ৭০% ছিলেন নমশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষিজীবী।[২০] ইতিমধ্যে লোকসভায় কমিউনিস্ট সাংসদ শ্রী সাধন গুপ্তের বিদ্রুপাত্মক সমালোচনার জবাবে পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী মেহেরচাঁদ খান্না সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের পরিবর্তে একটি বাস্তবসম্মত বিকল্প উপস্থাপনের।[২১] বাম প্রভাবিত 'সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ' (U.C.R.C.) ১১.০৮.১৯৫৮ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে একটি 'বিকল্প প্রস্তাব'[২২] পেশ করে সরকারী পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই প্রমাণ করে যে, পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তু এবং ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক ও প্রান্তিক কৃষকদের পুনর্বাসনের বাস্তব সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে গ্রাম বাংলায় কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করে উদ্বাস্তু নেতৃত্বের সাথে দেখা করতেও রাজী হননি প্রস্তাবিত 'বিকল্প' সম্পর্কে আলোচনার জন্যে, কেননা দণ্ডকারণ্য তখন শাসক দলের কাছে আক্ষরিক অর্থেই পরিণত হয়েছে একটি 'Obsession'-এ।[২৩] প্রথম থেকেই 'দণ্ডকারণ্য প্রকল্প'-র প্রতি উদ্বাস্তুদের প্রতিক্রিয়া ছিল চূড়ান্ত অবিশ্বাস ও সন্দেহের মিশ্রণ, কেননা কোন স্তরেই সরকার তাদের মতামত বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।[২৪] এরপর রাজ্য সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন যে, উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যেতে অস্বীকার করলে তাদের এককালীন কিছু অর্থসাহায্যের বিনিময়ে (Cash dole for six months) উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবিরগুলি ১৯৫৯-এর মাঝামাঝি নাগাদ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে[২৫]— অথচ তখনও পর্যন্ত প্রকল্প ভ্রূনাবস্থায় ছিল, এমনকি 'প্রকল্প সমীক্ষা' পর্যন্ত প্রস্তুত হয়নি।[২৬] মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য পরবর্তীকালে ঐ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। 'পশ্চিমবঙ্গে নতুন স্থায়ী উদ্বাস্তু শিবির খোলা হবে না'— এই সিদ্ধান্তে অবিচলিত থেকেও যদি নবাগত উদ্বাস্তুদের স্থিরভাবে ভালমন্দ বিচারের উপযুক্ত সময় দিয়ে অন্যত্র পাঠান হত, তবে অজস্র অনাবশ্যক অসুবিধা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত। ছিন্নমূল পরিবারগুলিকে প্রয়োজনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অন্যত্র প্রেরণের অতিব্যস্ততার ফলে চূড়ান্ত অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। উদ্বাস্তুদের সংখ্যাগণনায় ভুলভ্রান্তি ঘটেছে,

পরিবার থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন কিনা সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয়নি। যখন শিশু মৃত্যুর আধিক্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ডকারণ্যগামী ট্রেন থেকেই বৃদ্ধ ও শিশুরা মুমূর্ষু অবস্থায় নেমেছে, তখন জনস্বাস্থ্য দপ্তর স্বীকার করেন যে, অনেক ট্রেনেই যাত্রী সংখ্যার অনুপাতে পানীয় জল, খাদ্য এবং শৌচাগারের বন্দোবস্ত অপ্রতুল ছিল।[২৭] ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী স্থির করেছেন যে, মানাতে অর্ন্তবর্তী শিবিরে প্রাথমিকভাবে সকল উদ্বাস্তু সমবেত হবেন এবং সেখান থেকে তাঁরা পর্যায়ক্রমে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হবেন। উদ্বাস্তুরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হন এখানেও কেননা যেখানে একটি পরিবারের স্থান সংকুলান হওয়া দুরূহ, সেখানে দু-তিনটি পরিবার একসাথে থাকতে বাধ্য হলেন। জলাভাবে, অসহ্য গরমে এবং উপযুক্ত সংখ্যায় শৌচাগারের অনুপস্থিতিতে প্রায়শই আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব ঘটত।[২৮] অথচ এরকম অব্যবস্থা সত্ত্বেও সরকারী প্রচারযন্ত্রের ঢক্কানিনাদ অব্যাহত ছিল। প্রচার ও লোকরঞ্জন বিভাগের দ্বারা প্রযোজিত তথ্যচিত্র 'সকাল থেকে সন্ধ্যা' চিত্রশৈলীর দিক থেকে অনবদ্য হলেও তা সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত কল্পনাকে বাস্তবরূপে উপস্থাপিত করেছিল, যেন দণ্ডকারণ্য 'দুধ ও মধু'র দেশ— প্রায় 'ভূস্বর্গ' বললেই চলে।[২৯] প্রচারের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার উপর পুরোপুরি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখা হয়েছিল, অথচ তাকে বাস্তবায়িত করার পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে তার উপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের মানে হল সাহায্যপ্রার্থীরা এমন কোন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার উপর নির্ভর করে পরমুখাপেক্ষী না থেকে তারা আপন আপন পরিবারের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে সক্ষম। দণ্ডকারণ্যে আগত উদ্বাস্তুদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষিনির্ভর হওয়ায় কৃষিজ পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সর্বাগ্রে বিবেচ্য। ১৯৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে গড়পরতা সাত একর জমি বন্টিত হয়েছিল ফরাসগাঁও, উমরকোট, পারালকোট ও মালকানগিরির পুনর্বাসন প্রাপ্ত ৬২৮৬টি পরিবারের মধ্যে কিন্তু উৎপাদনশীলতার দিক থেকে তা ছিল বাংলার সাত বিঘা জমির সমতুল্য।[৩০] এছাড়া কৃষিকাজের জন্য প্রতিটি পরিবারকে ৮৫০ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থাও অনুমোদিত হয়। ভূমির নিকৃষ্টতা সম্পর্কে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের কৃষি-অধিকর্তা এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রকের প্রেরিত বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী, উভয়েই একমত হন।[৩১] রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী একটি উদ্বাস্তু পরিবারের শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য অন্ততপক্ষে চব্বিশ কুইন্টাল খাদ্যশস্য প্রয়োজন প্রতি বছর; অথচ ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রাপ্ত পরিসংখ্যান[৩২] অনুসারে ফরাসগাঁও-এর ২০৫টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ২৬টি ও পারলকোটের ২২২৩টির মধ্যে ১১৩০টি ১৬ কুইন্টালের অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনে সমর্থ হয়েছিল। মালকানগিরিতে একর প্রতি

গড় উৎপাদনশীলতা ছিল ২.৩০ কুইন্টাল মাত্র। কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্যে অভাবের দায়ভার যথারীতি বর্তে ছিল উদ্বাস্তুদের তথাকথিত 'আলস্যে'র উপর,[৩৩] যার অনিবার্য পরিনতি ছিল অর্ধাহার, অনশন তথা অপুষ্টি প্রভৃতি। কিন্তু ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারীতে লিখিত একটি রিপোর্টে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের ভূমি-বৈজ্ঞানিক স্বয়ং মন্তব্য করেছেন যে, "উদ্বাস্তু কৃষকেরা শ্রমবিমুখ একথা মিথ্যা, কিন্তু যেখানে জমি এতটা অনুর্বর যে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেও উৎপন্ন ফসল থেকে মজুরিও পোষায় না, সেখানে কি করে তাদের দোষারোপ করা চলে যদি তারা কৃষিকার্যে নিরুৎসাহিত হয়?"[৩৪]

উষ্ণ আবহাওয়া এবং পাথুরে মৃত্তিকার একত্র সমন্বয় বীজের অঙ্কুরোদগমের সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল এবং প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও কৃষিজমিতে প্রায়শই শস্যের বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত মাত্রায় আর্দ্রতার সৃষ্টি হত না। এই সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অনতিবিলম্বে সরকারী নির্দেশে উদ্বাস্তু পরিবার পিছু বণ্টিত জমির পরিমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় পাঁচ একর।[৩৫] কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী এই অবস্থায় সুপারিশ করেন ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের, কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। উমরকোটের ভাস্কল সেচ প্রকল্পের দ্বারা সেবিত জমির পরিমান ছিল ১১,০০০ একর, অথচ তার মাত্র এক-দশমাংশ ছিল উদ্বাস্তুদের নিজস্ব। চব্বিশটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ভিতর ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছিল মাত্র একটি (পাখানজোড়)।[৩৬] পরিনামে, উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে জলের অপ্রতুলতা ছিল ভয়াবহ মাত্রায়[৩৭] এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি কৃষিপণ্যের বাজার প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুষ্টিমেয় মধ্যসত্ত্বভোগীর কুক্ষিগত ছিল—তাই দেখা যায় যে উমরকোটের উদ্বাস্তু কৃষিজীবিরা যে মূল্যে মেস্তা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা ছিল চলতি বাজারদরের ৫০%। বহুক্ষেত্রে এমনকি দেখা গেছে উদ্বাস্তুরা হাটে তাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে না পেরে তা পথের ধারে ফেলে গেছেন।[৩৮] অন্ততপক্ষে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উদ্বাস্তুরা এমনকি জমির মালিকানাসত্ত্বেরও অধিকারী ছিলেন না, কেননা পুনর্বাসন মন্ত্রক তখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হননি যে, Land Reclamation & Development-এর ব্যয়ভার উদ্বাস্তুরাই বহন করবেন কি না![৩৯]

শিল্পের ক্ষেত্রেও চিত্রটি ছিল হতাশাব্যঞ্জক, প্রথম থেকেই প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অধীন পরিচালিত শিল্পোদ্যোগগুলি (যথা, আম্বাগুডা তৈল নিষ্কাশন কেন্দ্র, উমরকোট কাষ্ঠ-শিল্প কেন্দ্র) ছিল চূড়ান্ত অপেশাদারী পরিচালনার শিকার এবং অ-লাভজনক। সর্ববৃহৎ শিল্পকেন্দ্র বোরেগাঁওতে ১৯৬৩ সালে পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমান ছিল ৩.২৫ লক্ষ টাকা এবং আশ্চর্যজনক বিষয় হল সেখান থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে ১০,০০০ Ammunition Box সরবরাহ করা হয়েছিল প্রতিটি ২৯/- মূল্যে, যদিও প্রকৃত মূল্য

হওয়া উচিত ছিল তার অন্তত দ্বিগুণ।[৪০] সেখানে ঐ বছর নিযুক্ত উদ্বাস্তু কর্মচারীর গড় সংখ্যা ছিল ১৭০ (প্রতিদিন) এবং দেখা গেছিল যে জুন মাসে নিযুক্ত ২২৪ জন-এর মধ্যে ১৫৫ জন ইতিমধ্যেই পুনর্বাসন সহায়তাপ্রাপ্ত (জমি, ব্যবসার জন্য প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি), তা সত্ত্বেও তাঁরা অস্থায়ী চাকরীর সন্ধানে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঐ শিল্পকেন্দ্রে নিযুক্ত কর্মীদের প্রাপ্ত বেতন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ছিল জীবনধারণের পক্ষে অপর্যাপ্ত।[৪১] একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে পরিকাঠামোগত অসুবিধার কারণে দণ্ডকারণ্যে শিল্পস্থাপনা ছিল অতীব কষ্টসাধ্য, কিন্তু উদ্বাস্তুদের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল শ্রমনিবিড় শিল্পের— যদিও তা ঘটেনি। National Council of Applied Economic Research-এর উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল শিল্পোন্নয়ন সংক্রান্ত 'নীল নক্সা' প্রস্তুত করার[৪২] এবং তারা মূলত মূলধন ভিত্তিক ভারী শিল্প (ইস্পাত, সিমেন্ট, রাসায়নিক ইত্যাদি) গড়ে তুলবার পরামর্শ দেন।[৪৩] অথচ উল্লিখিত শিল্পগুলিতে প্রয়োজন হত দক্ষ শ্রমিকের যা উদ্বাস্তুদের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর ছিল এবং তাঁদের জন্য উপযুক্ত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার স্থাপন করেননি।[৪৪] এর ফলে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিল্পের ভিত্তিতে যথার্থ অর্থে একটি পরিবারও পুনর্বাসিত হয়নি।[৪৫] পরিশেষে বলা যেতে পারে ওখানে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারগুলির চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল ব্যাপক মাত্রায় এবং সৃষ্টি হয়েছিল এমন একটি সত্ত্বার যা পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের তুলনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাংশে পৃথক। উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে ওঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটুকুও অবহেলিত হয়েছিল চূড়ান্তভাবে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কিভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত হওয়া অনুচিত তার একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দণ্ডকারণ্য প্রকল্প' স্মরণীয়; বিশেষত যখন অশান্ত, সংঘর্ষমুখর পৃথিবীতে উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমবর্ধমান।

## সূত্র-নির্দেশ :

১) Statistical Officer, Offiice of the Refugee Rehabilitation Commissioner, Government of West Bengal.

২) U. Bhaskar Rao, The Story of Rehabilitation (Publications Division, Government of India, New Delhi, 1967), Page-199.

৩) Amritabazar Patrika, 29.06.1956.

৪) U. Bhaskar Rao, প্রাগুক্ত, pp. 199, 200.

৫) রণজিৎ রায়, ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ (শঙ্খ প্রকাশন, কলকাতা ১৯৭৭) Page-83.

৬) Constituent Assembly (Legislaive) Debates, Part-I, Volume-I, 1949, Page-214.

৭) রণজিৎ রায়, প্রাগুক্ত, পাতা-৮৪।
৮) Alok Kumar Ghosh (Ed), Dandakaranya, A Survey of Rehabilitation: Essays of Sri Saibal Kumar Gupta (Bibhasa, Kolkata, 1999), Page-2.
৯) শৈবাল কুমার গুপ্ত, কিছু স্মৃতি— কিছু কথা (M.C. Sarkar & Sons, Kolkata, 1994), পাতা-১৩৮,১৩৯।
১০) Estimates Committee (1964-65), 72nd Report, pp-4-7.
১১) তদেব, পাতা-২৮।
১২) Alok Kumar Ghosh, প্রাগুক্ত পাতা ৩, ৪।
১৩) Pradip Bose (Ed), Refugees in West Bengal : Institutional Practices & Contested Identities (Kolkata, Calcutta Research Group, 2000), page-110.
১৪) Estimates Committee, প্রাগুক্ত, পাতা-২৮।
১৫) U. Bhaskar Rao, প্রাগুক্ত, পাতা-১৪৭।
১৬) Jasodhara Bagchi & Subhoranjan Dasgupta (Ed), The Trauma and the Triumph : Gender & Partition in Eastern India (Stree, Kolkata, 2003) page-93.
১৭) Prafulla Chakraborty, Marginal Men : The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal (Lumiere Books, Kolkata, 1990) page-22.
১৮) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু (শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০), পাতা-১৩৫।
১৯) Alok Kumar Ghosh, প্রাগুক্ত, পাতা-৬৩।
২০) Prafulla Chakraborty, প্রাগুক্ত, পাতা-১৮০।
২১) Prafulla Chakraborty, প্রাগুক্ত, পাতা-১৮৮, ১৯৩।
২২) তদেব, পাতা-১৮৬, ২১৯।
২৩) তদেব, পাতা-১৯৩।
২৪) তদেব, পাতা-১৭৭।
২৫) তদেব, পাতা-১৯১।
তবে ঐ সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন নয়, অনুরূপ একটি সিদ্ধান্ত ১৯৪৯ সালে গৃহীত হয়েছিল। See, Memo No. 4482 (13)-Misc/6B-3/47 dated 11.07.1949 from the Secretary, Relief & Rehabilitation Department to the District Magistrate.
২৬) তদেব, পাতা-১৬২।
২৭) শৈবাল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পাতা-১২৩, ১২৪।
২৮) তদেব, পাতা-১২৪, ১২৫।
২৯) তদেব, পাতা-১৩২, ১২৩।
৩০) Pradip Bose (Ed), প্রাগুক্ত, পাতা-১১১।
৩১) Alok Kumar Ghosh (Ed), প্রাগুক্ত, পাতা-১৮, ২১।

৩২) Pradip Bose (Ed), প্রাগুক্ত, পাতা-১১২।
৩৩) তদেব।
৩৪) শৈবাল কুমার গুপ্ত, প্রাগুপ্ত, পাতা১৪৩, ১৪৪।
৩৫) Pradip Bose (Ed), প্রাগুক্ত, পাতা-১১৩।
৩৬) তদেব।
৩৭) শৈবাল কুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পাতা-১৪৩।
৩৮) Alok Kumar Ghosh (Ed), প্রাগুক্ত, পাতা-৩৬।
৩৯) তদেব, পাতা-৩৭।
৪০) তদেব, পাতা-৪০, ৪১।
৪১) তদেব, পাতা-৪৩-৪৫।
৪২) U. Bhaskar Rao, প্রাগুক্ত, পাতা-২১৪।
৪৩) Pradip Bose (Ed), প্রাগুক্ত, পাতা-১১৫।
৪৪) U. Bhaskar Rao, প্রাগুক্ত, পাতা-২১৩-২১৫।
৪৫) Dandakaranya Samachar, 17.04.1966.

৭ক. কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চর্যজনক নয়, কেননা ১৯৪৭ সালে জয়পুরে A.I.C.C.-র অধিবেশন চলাকীলন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু 'নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ'-এর একটি প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছিলেন যে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা 'বিদেশী' এবং তাই তাঁদের উচিত A.I.C.C.-র Foreign Bureau-র সাথে যোগাযোগ করা। See, Prafulla Chakraborty প্রাগুক্ত, পাতা-৫০।

১৪ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারী কার্যকলাপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানের জন্য দ্রষ্টব্য, Jasodhara Bagchi & Subhoranjan Dasgupta (Ed), প্রাগুক্ত, পাতা ২৪৪-২৫২ এবং রণজিৎ রায়, প্রাগুক্ত, পাতা-১০৬-১০৯।

১৬ক. বিহার ও উড়িষ্যায় যে সকল অঞ্চল পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল তা ছিল মানুষের বসবাসের পক্ষে পুরোপুরি অনুপযুক্ত। See, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পাতা-১৭৭-১৭৮।

# উনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষীরপাই ঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

কাকলি সিংহ

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা থানার মধ্যে ক্ষীরপাই একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প সমৃদ্ধ জনপদ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। যার বর্তমান আয়তন ১১.৬৫ স্কোয়ার কি.মি. এবং ওয়ার্ড সংখ্যা ১০।[১] রেনেলের ম্যাপে ক্ষীরপাইকে একটি নদী বন্দর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৭৭৯ সালে জেমস রেনেল সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হয়ে যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন 'The Map of Bengal and Bihar' তাতে দেখা যায় উত্তরের পথটি বড়নগরের কাছে বামিনিয়া থেকে দ্বিমুখী হয়ে একটি রাজমহল অন্যটি মালদহ। মালদহ পর্যন্ত পথটিই বাদশাহী সড়ক। এই সড়কের পরবর্তী অংশ মুর্শিদাবাদ থেকে পলাশী হয়ে বর্ধমান, আরামবাগ, ক্ষীরপাই ও মেদিনীপুরের উপর দিয়ে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২] মেদিনীপুর থেকে ক্ষীরপাই পর্যন্ত রাস্তাটিকে হান্টার সাহেব একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] ১৭৪০ থেকে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠারা বর্ধমান, মেদিনীপুর, খড়গপুর, খড়ার, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা ইত্যাদি স্থানে লুঠপাট ও নারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে।[৪] গঙ্গারাম রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ বর্গীদের এই অত্যাচারের কাহিনীর কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ —

কারু হাত কাটে কারু কাটে নাককান।
একি চোটে কারু বধ এ পরাণ।।
তবে কোন ২ গ্রাম বরগী দিল পোড়াইয়া।
সে সময় গ্রামের নাম শুন মন দিয়া।।
চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিখগপুর।
খিরপাই খোড়ার আর বদ্দমান সহর।।
নিমগাছি সেড়গাঁ আর সিমইলা।
চণ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইলা।।

এই মতে বর্দমান পোড়াও চহির ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগী কদর হুগলীতে।[৫]

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরপাইতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ্ দেখা দেয়। সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি বা সমাবেশ বিশেষভাবে হয়েছিল উত্তর মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থানে।[৬] ইংরেজ কোম্পানীর বেশ কয়েকটি কুঠি মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে মেদিনীপুর শহরের থান কাপড়ের কুঠি এবং ক্ষীরপাই-এর বয়ন কারখানা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।[৭] রেশম ও নীল চাষকে কেন্দ্র করে কোম্পানী আমলে ক্ষীরপাইয়ে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঘটে। ইংরেজদের কুঠি থেকে ডাচ বণিকরা এজেন্ট মারফৎ নিয়মিত দ্রব্যাদি কেনাকাটা করতেন। ১৭৬৩ সাল থেকে ফরাসীরা ক্ষীরপাইতে কুঠি স্থাপন করে কাপড় ও সিল্কের ব্যবসা শুরু করে। স্থানীয় ফরাসীডাঙ্গা স্থানটি ফরাসীদের সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ এখনও টিকিয়ে রেখেছে। ১৭৮৪ সালে ক্ষীরপাই কুঠির ইংরাজ রেসিডেন্ট তাঁর রিপোর্টে বলেছেন— Since the peace of 1763 the French had a factory in the Town of Keerpay, where their Resident lives ...... In 1771, they began to collect their outstanding balances, and 1773 they removed their effects.[৮] ইংরেজরা এখানে ব্যবসায়ীদের দাদন দিয়ে কাপড় তৈরী করাতেন। এখানকার শিল্প ঐতিহ্য সম্পর্কে হান্টার সাহেব লিখেছেন— At Chandrakona and Khirpai are large settlements of cotton weavers and at Ghatal of silk weavers.[৯] ক্ষীরপাই-এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম রাধানগর সিল্কের (রুমাল) জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার 'লাটের হাট' বিখ্যত হাট ছিল। রাধানগরের ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা প্রচলিত ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়—

বাহান্ন বাজার তিপান্ন গলি।
তবুও রাধানগরের অলি।।[১০]

(তুলনাটি চন্দ্রকোনার সাথে।)

ফরাসী ও ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য তৎকালে ক্ষীরপাইতে তাঁত শিল্পের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও চাল ডালেরও ঢালাও ব্যবসা ছিল এখানে। চাউলকাঁটা নামক স্থানটি এই কারবারেরই স্মারক।[১১] এছাড়া শিববাজার, কাছারী বাজার, দয়াল বাজার, তিলিবাজার, নুনিয়া বাজার, হাটতলা প্রভৃতি নাম থেকে বোঝা যায় এক সময় এখানে জম-জমাট ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরপাই বর্ধমান জেলা থেকে হুগলী জেলার অধীনে আসে। ১৮৩৪

খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাছারী বাজারের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ক্ষীরপাই তখন রীতিমত সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার তাদের কাজের সুবিধার জন্য প্রথম মহকুমা স্থাপনে উদ্যোগী হন। In 1845 the Hooghly District was divided into three subdivisions the sadar (chinsurah) Dwarhatta (Serampore) and Khirpai.[১২] ক্ষীরপাই মহকুমার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ক্ষীরপাই থেকে মহকুমা কার্যালয় জাহানাবাদে (বর্তমান আরামবাগ) উঠে যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরপাইকে মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরপাইতে পৌরসভা স্থাপিত হয়। সে সময় ক্ষীরপাই এর লোকসংখ্যা ছিল ৮,০৪৬ জন (১৮৭২ সালের জনসংখ্যা গণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। বর্তমানে ১৪,৫৪৫ জন (২০০১)[১৩]।

ইংরেজ আমলে কাশীগঞ্জ (বর্তমানে ৮ নম্বর এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ড) একটি থানা এবং শিক্ষাদীক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। ১৮৩৫-১৮৩৮-এর Report on the State of Education in Bengal (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪১ সালে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের ২২১-২২২ পৃষ্ঠায় আছে কাশীগঞ্জ থানায় মোট ৭৮টি বাংলা বিদ্যালয়, ২টি উড়িয়া বিদ্যালয় এবং ৫টি ফারসী বিদ্যালয় ছিল।[১৪]

উনিশ শতকে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার ধারাও সমানভাবে প্রবাহমান ছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার চতুঃস্পাঠী সমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণ কলকাতা সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে হত। চন্দ্রকোনা থানার উল্লেখযোগ্য চতুঃস্পাঠীগুলি ছিল ক্ষীরপাই, মাড়, বেলাদণ্ড, আমড়াপাট, বোনা, মাংরুল, যদুপুর, জাড়া, মাধবপুর, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থান।[১৫] কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বাংলার বিদ্যালয় সমূহের বিভাগীয় পরিদর্শকরূপে বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলায় ছটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরমধ্যে দাসপুর থানার চেতুয়া বাসুদেবপুর এবং চন্দ্রকোনা থানার ক্ষীরপাই গ্রামের স্কুল দুটি অন্যতম (১৮৫৫)।[১৬]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও ক্ষীরপাই জড়িয়ে পড়েছিল। সত্যেন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি সভাতে (২রা সেপ্টেম্বর ১৯০৫) সিদ্ধান্ত হয় মেদিনীপুরের ছাত্র সমাজ ১০/৯/১৯০৫ থেকে তিনদিন পাদুকা, কোট, ছাতা ব্যবহার করবেন না। শুধুমাত্র মেদিনীপুর শহরেই নয় ক্ষীরপাই, দাঁতন, পাঁচরোল, ঘাটাল, মহিষাদল, কাঁথি, মীরগোদা প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ সভা হয়।[১৭] ১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঘাটাল মহকুমা ভ্রমণকালে কালিকাপুর, ক্ষীরপাই ও ঘাটালে জনসভা করেন।[১৮]

বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের অন্যান্য মহকুমার তুলনায় ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম খুবই নিস্প্রভ ছিল। তবুও এই মহকুমার জাড়া, রামজীবনপুর, কেঁচকাপুর, নাড়াজোল, ক্ষীরপাই, ঘাটাল, চেচুয়াঁ, দাসপুর ইত্যাদি অঞ্চলের বিপ্লবী কর্মীগণ মেদিনীপুরের সার্বিক বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। ঘাটাল মহকুমার কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেই গান্ধীজীর অহিংস নীতির উপর আস্থা রাখতে পারেননি আবার ঐ সময় ক্ষীরপাই এর স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নেতাজী সুভাষের ছাত্রবন্ধু অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীকে কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্বে স্থান দেওয়ায় অনেকেই খুশী হতে পারেন নি।[২০] অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ১৯৪২ সালে পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারলেও ১৯৪৫ সালে কাঁথিতে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৪৬ (নভেম্বর) কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভায় অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী অর্থমন্ত্রী রূপে (১৯৪৭-৪৮) যোগদান করেন। বাংলায় 'পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন'-কে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী কংগ্রেস ত্যাগ করে 'প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি' গঠন করেন (১৯৪৯)।[২১] ১৯৪৮ সাল থেকে ক্ষীরপাইতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে।[২২]

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে ক্ষীরপাই এর এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অবলুপ্তির কারণ কি? এই দেশীয় শিল্পের নৈপুণ্যের অবলুপ্তির প্রধান কারণ 'বর্ধমান ফিভার'। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ম্যালেরিয়া জ্বর ক্ষীরপাইতে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই জ্বর বিস্তার লাভ করেছিল। এরফলে বহুলোক বিশেষ করে বহিরাগত বণিকসম্প্রদায় এই স্থান ত্যাগ করেছিল। এরফলে ক্ষীরপাই-এর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ক্রমশ জনহীন হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষীরপাই শহর শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। জনসংখ্যা হ্রাসের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হোল—

| সাল | জনসংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৭২ | ৮,০৪৬ |
| ১৯০১ | ৫,০৪৫ |
| ১৯১১ | ৪,৬০৫ |
| ১৯৩১ | ৩,৬৯৩ |
| ১৯৪১ | ৩,৬২৩ |
| ১৯৫১ | ৪,২৪৬ [২৩] |

বর্তমানে ক্ষীরপাইয়ের সেই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি না থাকলেও রয়ে গিয়েছে পুরানো পথ এবং পুরানো নাম।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) Preparation of State Urban Development Strategy Papers : Khirpai Municipality -- 27.08.2004.

২) অনিরুদ্ধ দাস — মুর্শিদাবাদ - বাণিজ্যপথ ঐতিহাসিক পরিক্রমা। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৭ পৃ-১৬২

৩) W.W. Hunter - The Statistical Accounts of Bengal (Roads and means of communication - Vol-III, P-148.

৪) রোহিনীনাথ মঙ্গল — জাড়া গোলোক বৃন্দাবন পৃঃ - ৩৫

৫) প্রণব রায় ও পঞ্চানন কাব্যতীর্থ — ঘাটালের কথা, পৃঃ-৩১

৬) মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বির্বতন (৩য় খণ্ড)। প্রণব রায় ও বিনোদ শঙ্কর দাস, পৃঃ-৮

৭) ডঃ গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় — দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার ইতিহাস, পৃঃ-৬২

৮) বিনয় ঘোষ — পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি। (২য় খণ্ড) পৃঃ-১০৬

৯) W.W. Hunter -- The Statistical Accounts of Bengal (Vol-III)

১০) সাক্ষাৎকার — সাধন সিংহ (স্কুলের শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত)

১১) পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায় — ঘাটালের কথা, পৃঃ-১৪৪

১২) রোহিনী নাথ মঙ্গল — জাড়া গোলোক বৃন্দাবন, পৃঃ-৩৯

১৩) Khirpai Municipality Papers.

১৪) পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায় — ঘাটালের কথা, পৃঃ-১১৩

১৫) মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (৩য় খণ্ড) প্রণব রায় ও বিনোদ শঙ্করদাস, পৃঃ-৫৯

১৬) তদেব, পৃঃ-৯৮

১৭) হরিসাধন দাস — মেদিনীপুর ও স্বাধীনতা, পৃঃ-৫৩

১৮) পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায় — ঘাটালের কথা, পৃঃ-২৯৭

১৯) ডক্টর প্রদ্যোত কুমার মাইতি — অনান্য মেদিনীপুর, পৃঃ-১৭৫

২০) রোহিনী নাথ মঙ্গল — আগষ্ট আন্দোলনে ঘাটাল মহকুমা, পৃঃ-৭০

২১) আশিষ আদিকরীর — সাক্ষাৎকার, (স্কুলের শিক্ষক, অবসর প্রাপ্ত)

২২) সাক্ষাৎকার ঃ সরোজ ঘোষ, (পৌর কর্মচারী সংগঠনের জেলা ও রাজ্য স্তরের নেতা)

২৩) Khirpai Municipality Papers.

# তমলুক শহরের প্রাচীন রক্ষিত পরিবার

অরিন্দম চক্রবর্ত্তী

১

বর্তমানের জেলা শহর তমলুক (প্রাচীন ইতিহাস খ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দর শহর)-এর অন্যতম প্রাচীন পরিবার হল আলোচ্য রক্ষিত পরিবার, আধুনিক তমলুক শহরের প্রাচীন ব্যবসায়ী ও সংস্কৃতি-সচেতন পরিবার বলতে রক্ষিত পরিবারকে বোঝায়। আজ থেকে প্রায় ২০৫ বছর পূর্বে সার্থকরাম রক্ষিত (১৭৭৮-১৮৩৮) নামে জনৈক ব্যক্তি তাঁর ভাইকে নিয়ে ঘাটাল অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে তমলুকে আসেন[১]। তবে ঐসময় ঘাটাল অঞ্চল বিদেশী বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ কেন্দ্র থাকা[২] সত্ত্বেও কেন সার্থকরাম চলে এলেন তা বোঝা যায় না। তবে আমাদের অনুমান তিনি ওখানে ব্যবসা বাণিজ্যে হয়ত সুবিধে করতে পারবেন না বা পারেননি বলে তমলুকে চলে অসেন। অথবা তমলুকে রেশম ও লবণ ব্যবসার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভেবে চলে আসেন। যা হোক উনি তমলুকে এসে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কর্মচারী হিসাবে জীবন শুরু করেন এবং কালক্রমে নিজেই রেশম ব্যবসায়ী রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। লক্ষণীয় এই যে ঐ সময় কোম্পানী নীলচাষ বন্ধ করে লবণ ও রেশম ব্যবসাতেই আত্মনিয়োগ করে।[৩] ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী এখানে লবণ উৎপাদনে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। অবশ্য লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র রূপে মুসলমান আমল থেকে তমলুকের খ্যাতি ছিল।[৪]

ব্যবসায়ী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি তমলুক শহরে দেবী বর্গভীমা মন্দির সংলগ্ন ২ বিঘা জমি দেবীর সেবাইত পরিবারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে সার্থকরায় স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করেন।[৫] বর্তমানে যেটি রঞ্জিত বাটি রূপে সুবিদিত। ওখানে বাড়ি তৈরীর পর এবং ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সার্থকরাম জমিদারী ক্রয় করে[৬] ভবিষ্যৎ কয়েক পুরুষকে জমিদার রূপেও প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন।

২

সার্থকরামের দুই ছেলে ছিল — মাধব ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের অন্যতম পুত্র হলেন ত্রৈলোক্যনাথ (১৮৫২-১৯২৪) যিনি এই পরিবারের সবচেয়ে খ্যাতনামা

পুরুষ। তিনি আজীবন পরোপকারী, সেবাব্রতী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান অনুসন্ধিৎসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তখনকার দিনে তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল এবং বহু অমূল্য গ্রন্থ তাঁর সংগ্রহে ছিল। যখনই কোন ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশের সন্ধান পেয়েছেন তখনই তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের জন্য সংগ্রহ করেছেন।[৭] তাঁর রচিত "তমোলুক ইতিহাস" এ ব্যবহৃত পুস্তকাদি লক্ষ্য করলে তা বোঝা যায়।

আবার তাঁরই প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় তমলুক থেকে মাসিক পত্রিকা "তমোলুক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই এই পত্রিকার বিষয়বস্তু ও লেখার উৎকর্ষ কেমন ছিল তা বিস্তারিতভাবে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" মাসিক পত্রের গ্রন্থ সমালোচনা প্রতিবেদনে। বঙ্গদর্শন-এর ২য় বর্ষ, ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৮০-এর ৮ম সংখ্যায় ত্রৈলোক্যনাথের সম্পাদিত 'তমোলুক পত্রিকার' সমালোচনাটিও ছিল নিম্নরূপ ঃ

"তমোলুক পত্রিকা মাসিক পত্র। কলিকাতা চিৎপুর রোড, সুচারুযন্ত্র, ইহার দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের প্রথম কারণ এই যে তমোলুক হইতে একখানি সাহিত্য বিষয়ক মাসিকপত্র প্রচারারম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় আনন্দের বিষয় এই যে এই পত্রখানি উৎকৃষ্ট।"

প্রথম খণ্ডে 'পত্রিকা সূচনা', 'সন্দেহস্থল' 'স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত রাজ্য', 'পদ্মমুখী', 'জনস্টুয়ার্ট-মিল', 'সাঁওতালদিগের সভ্যকরণ', 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'হিন্দু আচার ব্যবহার সমালোচনা', 'সেনিকত্ব পদ দেশীয়দিগের প্রাপ্য', 'নতুন গ্রন্থের সমালোচনা' এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডেও ঐরূপ সবিশেষ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

লেখকদিগের লিপি শক্তি ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদিও তমোলুক সামান্য নগর। তথাপি তথায় যে মাসিক পত্র প্রচারিত হইয়াছে— তাহা রাজধানীর অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক পত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেন তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা যে দেশহিতৈষী, সুযোগ্য এবং সাহিত্য প্রিয় তমোলুক পত্রিকা তাহার প্রমাণ। এই পত্রিকায় বিশেষ বিশেষ সংবাদ পরিবেশিত হত।[৮] বঙ্গদর্শনের সমালোচনা থেকে আমরা সহজেই পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথের যোগ্যতার কথা, ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় পেলাম। একজন সম্পাদকের এরচেয়ে বেশী কিছু প্রত্যাশার রয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না।

ত্রৈলোক্য নাথের ঐতিহাসিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল হল তাঁর রচিত ও প্রকাশিত

"তমোলুক ইতিহাস" পুস্তকটি যা ১৯০২ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি তিনবার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অনার্সের পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় স্থান পেয়েছে।[৯] এর পূর্বে তমোলুকের ইতিহাস নিয়ে প্রথম যে বই প্রকাশিত হয় তাহল উমাচরণ অধিকারী রচিত তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ (প্রকাশকাল ১২৮০ বঙ্গাব্দ/ইংরাজী ১৮৭২ খ্রিঃ)। সেই বইটিতে প্রধানত তাঁর সময়কার তমলুকের কিছু কথা স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে দেখলে তিনি তমলুকে ইতিহাস চর্চার প্রথম মানুষ। জানা যায় তিনি হ্যামিল্টন স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক ছিলেন।[১০]

এরপরেই ত্রৈলোক্য নাথ তাঁর "তমোলুক ইতিহাস" পুস্তকটি রচনা করেন (১৯০২ খ্রীঃ)। তিনি ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপন শিরোনাম অংশে লিখেছেন— "ইতিপূর্বে তমোলুক সম্বন্ধে যে পুস্তিকা বা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকলের একত্র সমাবেশের উদ্দেশ্যেই তমোলুক ইতিহাসের সৃষ্টি। কিন্তু এখনও এমন অনেক পুস্তকে তমোলুকের বিষয় লিখিত আছে। যাহার নাম পর্যন্ত জানিতে পারি নাই; এবং যে সকল পুস্তকে তমোলুকের বিষয় লেখা আছে বলিয়া জানিয়াছি তাহারও কতকগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে লেখকের এই যে উক্তি তার থেকে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করে নিজ মহৎ চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছেন। একটি মৌলিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে যে সব গবেষণা প্রণালী (Methodology) অনুসরণ করা দরকার তিনি সেইযুগে তা করেন। তাঁর পুস্তকটিকে সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করে তমোলুকের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রথম অধ্যায় (উপক্রমনিকা, স্থান নির্দেশ ও সীমা এবং নামকরণ) দ্বিতীয় অধ্যায়— মহাভারতীয় কাল, তৃতীয় অধ্যায়— পৌরাণিক কাল, চতুর্থ অধ্যায়— বৌদ্ধ, গ্রীক ও চৈনিক কাল, পঞ্চম অধ্যায়— রাজবংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়— মন্দির এবং সপ্তম অধ্যায়— মুসলমান এবং ইংরেজ রাজত্ব। গ্রন্থপঞ্জীও রয়েছে। অর্থাৎ আধুনিককালে কোন মৌলিক ইতিহাস পুস্তক রচনা করতে হলে এ সবের একান্ত দরকার। সেই ইতিহাস রচনার মৌল জ্ঞান ত্রৈলোক্য নাথের ছিল। খুব সম্ভবত তাঁর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গবেষণাধর্মী পুস্তকগুলির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল বলেই গবেষণাধর্মী পুস্তক রচনার প্রণালীর মত কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। এর জন্য তিনি অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধা দাবী করবেন।

এই পুস্তকের "প্রাক-কথন" অংশে অধ্যাপক ড. প্রদ্যোত কুমার মাইতি লিখেছেন ঃ "আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব যা এখন আমরা উপলব্ধি করছি—

সেই উপলব্ধি আজ থেকে প্রায় তিরাশি বছর পূর্বে ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। ........... ইতিহাসের তথ্য চয়নে ও পরিবেশনে যে দক্ষতা ও নির্ভীকতার প্রয়োজন—তা ত্রৈলোক্যনাথের লেখাতে স্পষ্ট। এক কথায় পুস্তকটি পাঠ করলে ত্রৈলোক্যনাথের ইতিহাস চেতনা কত গভীর ছিল তাও বোঝা যায়।"[১১]

৩

জনহিতকর কাজে রক্ষিত বাড়ীর ভূমিকাও রয়েছে। ১২৭২ সালের (ইংরাজী ১৮৬৪ খ্রীঃ) বন্যার সময় বহু নিরাশ্রয় শহরবাসী রক্ষিতবাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময় তমলুক শহরে মাত্র তিনটি পাকা বাড়ী ছিল। ঐগুলি হল তমলুক রাজবাড়ী, রক্ষিতবাড়ী ও চন্দ্রদের বাড়ী। তবে রক্ষিত বাড়ীতেই অধিকাংশ নিরাশ্রয় মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। ত্রৈলোক্য নাথের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ রক্ষিত আশ্রয় প্রার্থীদের গুড় ছোলা খাইয়ে রেখেছিলেন। সেবাব্রতের এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

তাঁর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথও অনুরূপভাবে সেবাব্রতে তথা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তমলুক পৌরসভার কমিশনার রূপে কাজ শুরু করেন ২০.০১.১৮৭৭ খ্রীঃ। এইভাবে একটানা ১৪ বারের মধ্যে একবার কমিশনার হননি (১৯১২-১৯১৫)। এর মধ্যে ৭ বার কমিশনার রূপে এবং ৬ বার ভাইস চেয়ারম্যান রূপে কাজ করেন।[১২] এই সময় সীমার মধ্যে তিনি তাঁর ওয়ার্ডে তথা সামগ্রিকভাবে তমলুক পৌরসভার এলাকাভুক্ত বহু কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তমলুক শহরবাসীর জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য দানে সক্রিয় ভূমিকা নেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে তমলুক শহরের প্রধান সড়কের দু-পাশে যে পাকা ড্রেন রয়েছে তা মূলত তাঁর প্রস্তাব ক্রমে তৈরী হয়েছিল।[১৩] জানা যায় যে জমির উপরে তমলুক পৌরসভা গৃহ গড়ে উঠেছে, সেই জমি রক্ষিত পরিবারের দান।[১৪] তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, লোকাল বোর্ডের সদস্য, তমলুক ডিসপেনসারি কমিটির সম্পাদক, তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলের সদস্য ইত্যাদি নানা পদ অলঙ্কৃত করেন।[১৫]

৪

স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান রূপেও রক্ষিত বাড়ি বিশেষখ্যাত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথমদিকে এই বাড়ীর চত্বর ছিল তরুণ দেশ প্রেমিকদের মিলন তথা শিক্ষাকেন্দ্র। যখন "অনুশীলন সমিতি"-র আদেশে লাঠি খেলা, কুস্তি ও ব্যায়াম অনুশীলনের উদ্যোগ শুরু হয় তখন ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর বাড়ীর ভেতরের প্রাঙ্গণ ও বাগানবাড়ী যুবকদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত (ডাক নাম ভীমাচরণ) এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি ছিলেন ব্যায়ামবীর। এখানকার

ব্যায়ামাগারের লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ দেহের পুষ্টিসাধন এবং চরম লক্ষ্য ছিল ইংরেজ বিতাড়ণ। উকিল কিশোরী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম, পূর্ণ সেন, যোগজীবন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই ব্যায়ামাগারে যোগ দেন।[১৬] বিপ্লবী যাদুগোপাল তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' পুস্তকে লিখেছেন ঃ "পরবর্তী যুগে এরা নিজেদের মাকে দেশ মাতৃকায় রূপান্তরিত করেছিল। দেশ সেবার যজ্ঞবেদিতে স্বার্থলেশহীন আত্মবলিতে যে প্রাজ্জ্বল হোমাগ্নি আজও দেদীপ্যম্যান তাতে সবিশেষ সমিধ ও শহিদ হয়েছিল বীর বালক ক্ষুদিরাম। পূর্ণ, সুরেন ও যোগজীবন (এরা পরস্পর হ্যামিল্টন স্কুলে সহপাঠী ছিলেন) আপন আপন শক্তি অনুসারে মায়ের বোধনে 'নৈবেদ্য' যুগিয়েছে। পূর্ণ আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হয়, যোগজীবন মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পড়ে। সুরেন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় সন্দেহ দাগী (suspert) হয়েছিল।"[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যাদুগোপালের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ('আমার প্রিয় বন্ধু সুরেন রক্ষিত'/'আর আছে বন্ধু, দোসরোপম দোসর—সুরেন) ক্ষুদিরাম এখান থেকে মেদিনীপুরে চলে গেলেও মাঝে মাঝে সেখান থেকে এখানে এসে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদির শিক্ষা দিতেন। নামে ব্যায়ামাগার হলেও এর চরম লক্ষ্য ছিল ইংরেজ বিতাড়ণের জন্য দেহ মনের পুষ্টি সাধন। এই ভাবে রক্ষিত বাড়ী স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের অন্যতম পীঠস্থান ছিল।

রক্ষিত বাড়ীতে ব্যায়ামাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে যেমন ইংরেজ বিতাড়ণের স্বপ্নকে রূপদানের চেষ্টা চলে তেমনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে তমলুক মহকুমায় প্রথম যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় তার স্থান ছিল রক্ষিত বাড়ীর ভেতরের বিরাট প্রাঙ্গণ। এই সভার সভাপতিত্ব করার জন্য উপস্থিত ছিলেন কলকাতার 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ। বিভিন্ন বক্তা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটি ঐ দিন হ্যামিল্টন স্কুলের ছাত্র শ্রী শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী গেয়েছিলেন।[১৯]

৫

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পরিবারের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। ত্রৈলোক্যনাথের পূর্ব পুরুষদের নির্মিত বৃহৎ অট্টালিকার বাইরের অংশে বর্তমান রক্ষিত বাড়ীর দোতলার হলগৃহে বহিরাগত যে কোন জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিদের তমলুক শহরে বসবাসের বা বিশ্রামের একমাত্র স্থানরূপে স্বীকৃত ছিল। এখানে কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, লিয়াকৎ আলি হোসেন প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা

এবং পরে হ্যামিল্টন স্কুলে স্বদেশী মেলা উপলক্ষ্যে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৯২৪) প্রফুল্লচন্দ্র সেন [পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী] (১৯২৪), পরের বছর কাজী নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ তমলুকে এসেছিলেন এবং সাময়িককালের জন্য হলেও রক্ষিত বাড়িতে আসেন।[২০] আরও জানা যায় 'কিশোরী মুখোপাধ্যায়, মোরাদ আলি প্রভৃতি সঙ্গীত বিশারদদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বৈঠক বসত ও সভা সমিতির অধিবেশন বরাবরই হয়ে আসছে ঐ রক্ষিত বাড়ীতে। তমলুকের ফুটবল শীল্ড খেলার সময় বহিরাগত ফুটবল টিমগুলির বিশ্রাম স্থান, শয়ন, স্নান ঐ রক্ষিত বাটীতে হত। ঐ রক্ষিত বাটীর স্মরণীয় ব্যক্তি যিনি তমলুক শহর গড়ার একজন প্রাচীন, উৎসাহী ও সক্রিয় কর্মী তিনি হলেন— ত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত"।[২১]

৬

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তমলুক শহর-কেন্দ্রিক ব্যবসা, জনজাগরণ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে রক্ষিত পরিবারের বিশেষ করে ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিতের এক উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। তাই তাঁর এই সব গুণাবলী তথা জন সেবামূলক কাজ কর্মের জন্য তমলুক পৌর সভা তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ করে রাখার জন্য "ত্রৈলোক্যস্মৃতি সদন" নামাঙ্কিত করে পৌরভবনের দোতলায় একটি কক্ষ উৎসর্গ করেছে।[২২]

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১. রক্ষিত বাড়ী থেকে সংগৃহীত লেখা তথ্যাদির বিবরণ থেকে নেওয়া।
২. ঘাটাল বর্ষপঞ্জী ২০০২, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৮, ১০।
৩. রক্ষিত বাড়ী থেকে সংগৃহীত হাতে লেখা বিবরণ।
৪. ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক ইতিহাস। পৃঃ-১১৬।
৫. রক্ষিত বাড়ী সংগৃহীত হাতে লেখা বিবরণ।
৬. তদেব।
৭. হরিসাধন সরকার, "আমার স্মৃতি কোঠায়", স্মরণিকা, পৃঃ-১, প্রকাশকাল ৯/৬/১৯৮১। লেখক ছিলেন একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত অ্যাডভোকেট এবং প্রেসিডেন্ট তমলুক মিউনিসিপ্যাল নাগরিক কমিটি ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। তাঁর রচিত তমলুক শহরের ইতিকথা, ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এবছর এটি পূর্ণমুদ্রিত হয়েছে।
৮. তমলুক পৌরসভা তথ্য পঞ্জী ২০০০. (সম্পাদনায় প্রণব বাহুবলীন্দ্র ও আশুতোষ দাস) তমলুক পৌরসভা তমলুক, মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ পৃঃ-৩৪৩ (লেখক জয়দেব মালাকার)।

৯. ত্রৈলোক্য নাথের পুস্তকের (৩য় মুদ্রণ) প্রাক-কথন অংশ দ্রষ্টব্য।
১০. তমলুক পৌরসভা তথ্যপঞ্জী, ২০০০, পৃঃ-৩৩৬ (লেখক ইন্দুভূষণ অধিকারী)।
১১. ত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত প্রাগুক্ত গ্রন্থ, বাং সন ১৩৯৩ দ্রষ্টব্য।
১২. তমলুক পৌর সভার তথ্যপঞ্জী, ২০০০, পৃঃ-১২৪-১৩১।
১৩. হরিসাধন সরকার, "আমার স্মৃতি-কোঠায়" পৃঃ-১-২।
১৪. তদেব, পৃঃ-১, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী বিংশ শতাব্দির তমলুক, বাং সন ১৩৮২, মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।
১৫. তাঁর রচিত তমোলুক ইতিহাস পুস্তকে নামের নিচে এসব পদগুলির উল্লেখ রয়েছে।
১৬. শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-৪, তমলুক, রক্ষিত বাটি ও ক্ষুদিরাম শীর্ষক পুস্তিকাও দ্রষ্টব্য।
১৭. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, কলকাতা ১৯৮২, পৃঃ-৭৮।
১৮. তদেব, পৃঃ-৪৭, ৬৯।
১৯. শ্রুতি নাথ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-৪।
২০. হরিসাধন সরকার 'আমার স্মৃতি কোঠায়' পৃঃ-২-৩।
২১. তদেব, পৃঃ-৩।
২২. এই প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা আমি আমার অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ প্রদ্যোত কুমার মাইতির কাছ থেকে পাই। এমনকি এই প্রবন্ধ রচনার জন্য বই ও প্রবন্ধ দিয়ে তিনি আমায় সাহায্যও করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অপর অধ্যাপক শেখর ভৌমিক মহাশয় "তমোলুক পত্রিকার" ফটোকপি দিয়ে তিনি এই প্রবন্ধ লেখার জন্য যে সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

# তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ও গরমদল

প্রদ্যোত কুমার মাইতি

১

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে 'গরম দল'-এর অলোচনা প্রাসঙ্গিক। বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের সূত্র ধরে মেদিনীপুর জেলার অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় (বর্তমানে তমলুক ও হলদিয়া মহকুমায় বিভক্ত) গড়ে ওঠা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের দীর্ঘস্থায়ী (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ থেকে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪৪) হওয়ার পশ্চাতে এই 'গরমদল' (Action Squad)-এর যে বিশেষ ভূমিকা ছিল তা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে। এই 'গরমদল' কি পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে, কি ছিল এর কাজকর্মের ধারা, মহকুমার জনগণের কাছে এই সংস্থাটির কাজকর্ম কিভাবে গৃহীত হয়েছিল এসব প্রশ্নের উত্তর এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল।

২

১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন শুরু হলে তমলুক মহকুমার জনগণ এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৪২) তমলুকের এক বিশিষ্ট দিন। কারণ ঐ দিন তমলুক মহকুমায় ব্রিটিশ সরকারের শাসন কেন্দ্রগুলিকে অহিংসভাবে দখল কবাব এক অভিযান চালান হয়েছিল। সেই দিনের থানা, সরকারী অফিস, আদালত ইত্যাদি দখল অভিযানের পর থেকেই ব্রিটিশ সরকার তমলুক মহকুমার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য গৃহস্থের ধান, চাল, নগদ অর্থ ও অলংকারাদি লুঠ, গৃহদাহ, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ ইত্যাদি চালিয়ে যেতে থাকলে তমলুক মহকুমার কংগ্রেস নের্তৃত্ব এসব প্রতিরোধ কল্পে ইংরেজ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জাতীয় সরকার বা সমান্তরাল সরকার স্থাপন করেন (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২)[১]।

এই জাতীয় সরকার যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হল ঃ— "সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলে জাতীয় সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করা হবে না। প্রয়োজন হলে জাতীয় সরকারের বিচারালয় দোষী ব্যক্তিদের কারাদণ্ড, সামাজিক ও আর্থিক শাস্তিদান, দৈহিক শাস্তিবিধান— এমনকি চরম

দেশদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারবেন।"[২] জাতীয় সরকারের বিচারালয় কাদের শাস্তি দেবে এবং কিভাবে দেবে এই চিন্তা থেকে প্রকৃতপক্ষে গরম দলের উদ্ভব হয়।

যারা স্থানীয় ব্রিটিশ সরকারকে কোনভাবে সহায়তা করছে, যারা গ্রামে গ্রামে তাদের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছে, আর্থিক প্রলোভনে কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করছে বা করেছে, যারা পুলিশের সঙ্গে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারে সহযাগিতা করছে, যারা টেস্ট রিলিফ কন্ট্রোল ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে ঠকিয়ে মুনাফা করছে, তাদেরকে শাস্তিদানের জন্যই গরমদলের সৃষ্টি হয়েছিল।[৩] তবে ঠিক কবে সৃষ্টি হয়েছিল তা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেও যেমন সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি তেমনি ঐ সময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রচিত কোন পুস্তকে এ পর্যন্ত উল্লেখ নেই। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর মধ্যে যে এই সংস্থাটি গড়ে ওঠে তা বোঝাযায় ঐ মাসের প্রথম গরমদলের কাজের উল্লেখ থেকে।[৫]

৩

এবার আমরা গরমদলের গঠন পদ্ধতি ও কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করব। গরমদলের গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিদ্যুৎবাহিনীর মঠাধ্যক্ষ (C-in-C) সুশীল কুমার ধাড়ার উপর। অবিভক্ত তমলুক মহকুমার ছটি থানার মধ্যে মহিষাদল, সূতাহাটী, নন্দীগ্রাম ও তমলুক— এই চারটি থানায় গরমদল থানা ভিত্তিক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাকী দুটি থানায় যথা পাঁশকুড়া ও ময়নায় গরমদলের সংগঠন গড়ে তোলা হয়নি। উপরোক্ত চারটি থানায় জাতীয় সরকারের কর্মী সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের বেশী এবং বিদ্যুৎবাহিনী ও ভগিনীমেলার সেনাণীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এদের মধ্যে সর্বক্ষণের কর্মী যারা ঘরবাড়ী ছেড়ে শিবিরে বাস করতেন তাদের সংখ্যা পাঁচ শয়েরও বেশী। এইসব সর্বক্ষণের কর্মীদের মধ্য থেকে উপরোক্ত চারটি থানার প্রতি থানায় ১০/১২ জন কর্মীকে গরমদলের সদস্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। নির্বাচনের সময় যে সব দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা হল (১) দৈহিক ক্ষমতা, বিশেষ করে স্নায়ু বল, (২) সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, (৩) শৃঙ্খলাবোধ এবং সর্বোপরি, (৪) মন্ত্রগুপ্তির ক্ষমতা।[৬]

গরমদলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন। প্রথমে মহিলাদের এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরে তিনজনকে দলের সদস্যা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এঁরা হলেন (১) জ্যোৎস্না দাস, (২) উষা চৌধুরী, এবং (৩) কুমুদিনী ডাকুয়া। এই তিনজন মহিলা দলের সবরকম কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে যথার্থ যোগ্যতার

পরিচয় দিয়েছিলেন।[৭] এই দলের সদস্য-সদস্যাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমসাময়িক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয় সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী শ্রী রাধাকৃষ্ণ বাড়ী মন্তব্য করেছেন ঃ "এই কর্মীদের নিষ্ঠা, সততা, সাহস, দায়িত্বজ্ঞান এবং কঠিন শৃঙ্খলাবোধের জন্যই দীর্ঘ প্রায় বিশ মাস কাল গরমদলের কাজকর্ম সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল।"[৮]

গরমদলের গড়ে ওঠার কথা জনগণের কাছে অজ্ঞাত ছিল। দলের সদস্যদের কাছে এর স্রষ্টা বা পরিচালক 'বড় সাহেব'। ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।[৯] লক্ষনীয় এই যে, কারা এই গরমদলের সেনানী, আবার কেইবা পরিচালক— কেউই তা সুনির্দিষ্টভাবে জানত না। যাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই দলটি গড়ে ওঠে তাদের বা তাদের ছেলেদের গ্রেপ্তার করে অর্থ আদায়েরও চেষ্টা করা হত। অবশ্য গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিস্বরূপ প্রাণদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।[১০] সমগ্র মহকুমায় এরূপ শতাধিক শাস্তি গরমদলের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। সুশীলবাবু লিখেছেন, "এইরূপ একশতটিরও বেশী হত্যা ও চরম কায়িক শাস্তিদান সংঘটিত হয়েছে গরমদলের হাতে যার ৯০-৯৫টি আমার হাতে বা আমারই পরিচালনায় ও আমারই উপস্থিতিতেই হয়েছে এটা স্বীকার করতে আজ আর আমার দ্বিধা নেই।"[১১]

গরমদলের কাজকর্ম সম্পর্কে সুশীলবাবু লিখেছেন ঃ "মজার কথা এই যে ব্রিটিশের গোয়েন্দা বিভাগ সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দেশদ্রোহীদের সন্ধান করতে বা আমাদের কারাগারে বন্দী একজনকেও উদ্ধার করতে। কোন কারাগারের সন্ধানও করে উঠতে পারেনি।........... জাতীয় সরকারের নিয়মশৃঙ্খলা ও গোপনীয়তা ছিল দুর্ভেদ্য বর্মে মোড়া--- এটা তার প্রমাণ, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে কয়েক সহস্র সেনানী ও সরকারের পরিচালকবৃন্দ এমনভাবে আবদ্ধ ছিল যে, এই সুকঠিন শৃঙ্খলা কোন সময় তাদের কাছে শৃঙ্খল বা বন্ধন হয়ে ওঠেনি।"[১২] আবার এই গরমদল ছিল দুষ্টের আতঙ্ক, শত্রু সরকারের ত্রাস ও তাদের গোয়েন্দা বিভাগের বিস্ময় এবং নাগরিকবৃন্দের শান্তি, তৃপ্তি ও ভরসার বস্তু।"[১৩]

৪

যাঁরা গরমদলের সদস্য ছিলেন তাঁদের নামের তালিকা[১৪] এবং যারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল তাদের তালিকা তথাকৃত কর্মের কথা[১৫] ও যাদেরকে জরিমানা করা হয়েছিল তাদের নামের তালিকা[১৬] বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থিত করা গেল না পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধির অশঙ্কায়।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তিরূপে গরমদল

যে কাজ করেছিল তা উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে যারা ইংরেজ শাসনের সহায়ক বা পৃষ্ঠপোষক ছিল, তাদের বিরুদ্ধেই মূলত গরমদলের জেহাদ। এদিক থেকে গরমদল তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিল তা অনস্বীকার্য। পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের আমলে গরমদলের দ্বারা যে সব হিংসাত্মক কাজ হয়েছিল, তা জাতীয় সরকারের সাফল্যের সহায়ক ছিল।[১৭]

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) প্রদ্যোত কুমার মাইতি, বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয় সাং ২০০৩, পৃঃ-৫৮
২) রাধাকৃষ্ণ বাড়ী, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, ২০০০, পৃঃ- ১৯২
৩) মাইতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-৭৫
৪) বাড়ী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, গরমদল প্রসঙ্গে আলোচনা, পৃঃ-২৬৯-২৯৮, বঙ্গভূষণ ভক্ত, গরমদল (ইংরাজী পুস্তক), ১৯৯৯
৫) সুশীল কুমার ধাড়া, প্রবাহ, ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, বাং সন ১৩৯০, পৃঃ-১৩৯
৬) বাড়ী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-২৭১
৭) মাইতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-১৭৮-১৭৯, ১৮২-১৮৩, ১৮৬-১৮৮
৮) বাড়ী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-২৭১
৯) পূর্বাদ্রি, পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাং সন ১৩৯০, পৃঃ এবং রাধাকৃষ্ণ বাড়ী, ''বড় সাহেব, স্বদেশ-সাধক সুশীল কুমার ধাড়া'' শীর্ষক সঙ্কলনের অন্যতম প্রবন্ধ, সম্পাদনায় প্রদ্যোত কুমার মাইতি ও বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, ১৯৯৫, পৃঃ-৮৭-৯৪
১০) তদেব, গোপীনন্দন গোস্বামী, ''তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের আমলে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড'', তাম্রলিপ্ত, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭, পৃঃ এবং ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭, পৃঃ-৩-৫, দ্রষ্টব্য বঙ্গভূষণ ভক্তের ইংরাজী পুস্তক।
১১) ধাড়া, প্রবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৪০
১২) পূর্বাদ্রি, পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ-৩০-৩১
১৩০ তদেব, তুলনীয় ধাড়া, প্রবাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ-১৩৯
১৪) বাড়ী, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-২৯২-২৯৫, মাইতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-৭৬-৭৯, ভক্ত প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-৫৫-৫৭, ৭১, ৮২-৮৩, ৮৮
১৫) গোপীনন্দন গোস্বামী, তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপঞ্জী, গোপালপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯৮৩, পৃঃ-৩৪-৩৬, মাইতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-৭৯-৮১
১৬) তদেব, পৃঃ-৩৭-৩৮, মাইতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-৮১-৮২
১৭) 'গরমদল' সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য (১) ভক্ত, গরমদল (ইংরাজী পুস্তক, বাকপ্রতিম, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯৯৯, (২) বাড়ী, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, পৃঃ-২৬৯-২৯৮ এবং (৩) মাইতি, বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, ২য় সাং ২০০৩, পৃঃ-৭৪-৮৬

# "রাজন্য শাসিত কোচবিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা"
# (বিশ্বসিংহ থেকে শিবেন্দ নারায়ণ পর্যন্ত)
# ১৫২২ - ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ

আরতি কাহালি গোস্বামী

একদা কোচবিহার ছিল প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হোসেনশাহ কামতা রাজ নীলাম্বরকে পরাজিত করে। ঐ অঞ্চল তখন কোচ মেচ, গারো, রাডা ও খেন উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। নীলাম্বরের পতনের পর কোচরা বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে ১৫২২ খৃষ্টাব্দে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। রাজ্যটির নাম কোচবিহার। নামকরনে বহু বিতর্ক ছিল যাহা পরবর্তীকালে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদূরের রাজ বিজ্ঞপ্তিতে বিতর্কের অবসান ঘটে। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক, মানসাই, গদাধর ও শংকোশ নদী বিধৌত কোচবিহার রাজ্যটি।

রাজ্যটি ২৩০ বছর পর্যন্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল; কিন্তু অভ্যন্তরীণ কলহ ও মুসলিম ও ভূটানী আক্রমণের ফলে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সহিত চুক্তি বদ্ধ হওয়ায় বৃটিশ করদ রাজ্যে পরিণত হয়, তবুও রাজ্যটি প্রায় ৪৫০ বছর স্বাধীন ও বৃটিশ করদ রাজ্য হিসাবে রাজত্ব করে। ইংরাজ শাসনের অবসানে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৮ আগষ্ট কোচবিহার মার্জার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

রাজন্য শাসিত কোচবিহারের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে বিশ্বসিংহ থেকে শিবেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদূরের রাজত্বকাল পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল মূলত সংস্কৃত মাধ্যম। পাঠ্য বিষয় ছিল— পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা ইত্যাদি। তবে এটা ঠিক রাজকার্যের ভাষা ছিল বাংলা মাধ্যম। দলিল, দস্তাবেজ, চিঠি পত্রের আদান প্রদান তার সাক্ষ্য বহন করে। যাহা আজও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

বিশ্বসিংহ সেই যুগেও তার পুত্রদের বারাণসী ক্ষেত্রে বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রেরণ করেন।

পুত্র নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ তথায় ব্রহ্মানন্দ বিষারদ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর আশ্রমে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। তাহারা ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা ও পুরাণাদি শাস্ত্র বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করে। তিনি মিথিলা, গৌড় ও কনৌজ প্রভৃতি স্থান থেকে পণ্ডিতদের স্বরাজ্যে ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি প্রদান করে স্বরাজ্য হিঙ্গুলাবাসে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার আমলে বিখ্যাত পণ্ডিতরা হলেন পীতাম্বর মানকর ও দূর্গাবর। এদের মধ্যে পীতাম্বর রাজপণ্ডিত হিসেবে গন্য ছিল। পণ্ডিত ও কবি পীতাম্বর কোচ সাহিত্যের সূচনা করেন পুরান অনুবাদ দিয়ে। এই সময়ে মার্কন্ডেয় পুরাণ ভাগবতের প্রথম ও দশম স্কন্দ উষা পরিণয় নলদময়ন্তী উপাখ্যান রচিত হয়।

মার্কন্ডেয় পুরাণের ভনিতায় আছে

"মহারাজ বিশ্বসিংহ কমতা নগরে।
তার পুত্র ভোগতুল্য নহে পুরন্দরে।।
একদিন সভা মাঝে বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলান্ত কাজ।।
পুরানাদি শাস্ত্র জেহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিত বুঝয় মাত্র অন্য না বুঝয়।।
একারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবারে।
নিজ ভাষা বন্দে রচিও পয়ার।।

পুথি নং ৮ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১/ক

এতে দেখা যায় যে সংস্কৃত থেকে নিজ ভাষায় কবিতা বা সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় সেই সময় থেকেই। বিশ্বসিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার পুত্ররাও স্বরাজ্যে পণ্ডিতদের বসবাস করার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন যার প্রমাণ সাক্ষ্য আজও দেখা যায় কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি, টাকাগাছি, কামিনীঘাট, ময়নাগুড়ি, গোবরাছড়া বামনহাট ও বানেশ্বরের ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর ভূমিতে বসবাস করে চলছে। নরনারায়ণ তার রাজত্বকালে মিথিলা ও গৌড় প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়ন পূর্বক স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রচুর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেন যাতে লোকশিক্ষার প্রসার হয়। তাহার রাজসভাপণ্ডিত দ্বারা সর্বদা শোভিত থাকত। দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রসার লাভ করে। নরনারায়ণের সময় ভ্রাতা শুক্লধ্বজ পুরুষোত্তম

বিদ্যাবাগীশ এবং পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি মণ্ডিত গৌড়রাজ্যের সভাপণ্ডিতদ্বয়কে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। রাজমহিষীর আদেশে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ রচনা করেন ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে। তাছাড়া নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় শঙ্করদেব, অনন্তকন্দলী, অনিরুদ্ধ বা রাম সরস্বতী, কলাপচন্দ্র, কাংসারি কায়স্ত ও মাধবদেব শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত করেন। ইহাদের রচিত সাহিত্য— ভাগবত, রামায়ণ বরগীত, ভচীম, তোটয়, কলিগোপাল রুক্মিনীহরণ, পরিজাতহরণ, রামবিজয়, মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব, জয়দেব কাব্য আজও উত্তরবঙ্গের কোচ বিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

লক্ষ্মী নারায়ণের সময় মাধবদেব, গোবিন্দ মিশ্র, পুরুষোত্তম ঠাকুর, গোপালচরণ দ্বিজ প্রধান প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তার রাজত্বকালে গোবিন্দমিশ্র শ্রীমদ্ ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। ইহাছাড়া বহুবিধ কৌমুদী রচিত হয় সিদ্ধান্ত বাগীশ পণ্ডিত প্রবর দ্বারা। মহারাজ বীর নারায়ণ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্থানে স্নানে বিদ্যালয় স্থাপন পূর্বক রাজকুমার, ব্রাহ্মণকুমার এবং রাজকর্মচারী পুত্রদেরও শিক্ষার পথ সুগম করেন। তিনি নিজে শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। তার আদেশে কবিশেখর কিরাত পর্ব রচনা করেন। পুঁথি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কোচবিহারে রক্ষিত আছে।

বীরনারায়ণের প্রচেষ্টাতে যে শিক্ষা ব্যবস্থার বীজ বপন করা হয় তাহা প্রাণ নারায়ণের আমলে মহীরুহ হয়ে উঠে। তিনি নিজে সুকবি ও গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাহার সময় সভাসদ থেকে নিম্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারীরাও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারত। প্রাণনারায়ণ তাহার আমলে পঞ্চরত্ন সভা স্থাপন করেন। সভাপণ্ডিত কবিরত্ন "রাজখণ্ডম" নামে রাজবংশের একখানা ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করে। এই সময় দ্বিজ শ্রীনাথ মহাভারতের পদ এবং দ্রুপদীর স্বয়ংম্বর কাব্য রচনা করে। শ্রীনাথ পাণ্ডিত বিশ্বসিংহ চরিতম গ্রন্থ, এবং কৃষ্ণমিশ্র প্রহ্লাদ চরিত রচনা করেন।

মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণের আমলে মোঘল আক্রমণ সত্ত্বেও দ্বিজ নারায়ণ কর্তৃক নারদীয় পুরাণ রচিত হয়। মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণের পর থেকে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার লড়াই, মুসলিম ও ভূটানী আক্রমণের রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এল এক অন্ধকার যুগ। অবশেষে হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে অন্ধকার থেকে শিক্ষাসূর্য রাজ্যে পুনরায় উদীয় হয়। ইতিমধ্যে স্বাধীন রাজ্যটি ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের আমলে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের যুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের পরে হরেন্দ্র নারায়ণ শিশু বয়সে রাজা হন। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস হেনরী ডগলাসকে কোচবিহারের কমিশনার নিযুক্ত করেন ডগলাস সাহেব ছিলেন কোচবিহারের প্রথম কমিশনার যিনি শিশু রাজার শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন সদা সতর্ক। রাজার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য হরিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী নিযুক্ত হন; বাংলা ও পারশী শিক্ষার জন্য নৃসিংহ মুন্সি ও মেহের আলি নিযুক্ত হন। হাতের লেখার জন্য স্বরূপ সিংকে নিযুক্ত করা হয়। হরেন্দ্র নারায়ণের সময়কে কোচবিহারের নবযুগের সূচনাকাল বলা হয়। সিংহাসনে আরোহণ করে বহুগুণশালী রাজা কোচবিহারে শিক্ষার প্রসার ঘটান। ইতিমধ্যে মহারাজের রাজত্বকালে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট রংপুরের তদানীন্তন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ন্যাথানিয়েল স্মিথ সাহেব সেই অঞ্চলের জমিদারদের সহযোগিতায় তথাকার লোকের হিতার্থে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের মানসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই সময়ের পত্রপত্রিকা "সমাচারদর্পণ"-এ জানুয়ারী ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয় তা থেকে জানা যায় মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ তার রংপুরস্থ জমিদারি ধামের মোকামে এক অতি উত্তম দোতলা দালান পাঠশালার জন্য প্রদান করেন। উক্ত দালানের মেরামতি খরচ বাবদ ২,০০০৲ টাকা ও পাঠশালার জন্য এককালীন ২,০০০৲ টাকা দান করেন। খবরটি চমকপ্রদ একারণে সময়টি বাংলাদেশের সামাজিক ও শিক্ষার ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। তখন সবেমাত্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উন্মেষের যুগ। তাই হরেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের নবযুগের প্রতিভূ বলা যায়। সেই সময়ে রাজার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আনুকূল্য প্রদর্শন সত্যিই প্রশংসনীয়। সমকালীন পরিস্থিতি বিচারে তিনি শিক্ষার বিস্তারে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন।

রাজা শিরেন্দ্র নারায়ণের আমলে কোচবিহার রাজার রংপুরস্ত জমিদারী ভেলুত্রবেল ক্লট নামক এক বৃটিশ ভদ্রলোকের কাছে ইজারা দিলে উক্ত বিদ্যালয়টি হাতছাড়া হয় এবং পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হলে উক্ত বিদ্যালয়টি রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। হরেন্দ্র নারায়ণ নিজে সুকবি, গায়ক, সাহিত্যিক ছিলেন। তার আমলে রাজভাণ্ডারে গড়ে উঠে সাহিত্য সম্ভার। তার সম্পাদিত গ্রন্থ রাজি তার নিজের রচিত বই ধর্মপুরাণ, উপকথা, স্কন্দপুরাণ, গীতাবালী, ক্রিয়াযোগসার, উপকথা, কৃষ্ণযোগসার, রামায়ণের সুন্দর কাণ্ড এবং মহাভারতে ঐশিক পর্ব। তার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয় বিষ্ণুপুরাণ। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, নৃসিংহপুরাণগুলির বাংলায় অনুবাদ হয়। তবে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল রাজধানীতে। রাজ্য জুড়ে শিক্ষা ছিল না। তবে তার সাহিত্যের ভাবভাষা প্রশংসনীয়। প্রাচীন

সাহিত্যগ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম। অধিকাংশ পুস্তক রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কোচবিহারে রক্ষিত আছে। তিনি সুগায়ক ছিলেন, তাঁর রচিত গানগুলি রাগশ্রয়ী ছিল। গানগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল যে উহা ছিল শ্যামাসঙ্গীত।

মহারাজ শিরেন্দ্র নারায়ণ সংস্কৃত ছাড়া আরবি, ফার্শি ভাষা জানতেন। তিনি কোন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেননি। কিন্তু অবিদ্যান রাজা কর্তৃক দেশের সমূহ বিপদ ও অনিষ্ট হয়ে থাকে তা তিনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁর দত্তকপুত্র নরেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরকে উত্তমরূপে ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ গর্ভরমেন্টকে অনুরোধ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শিবেন্দ্র নারায়ণ জেনকিন্সের কাছে কোচবিহার রাজধানীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সদিচ্ছা প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের নিমিত্ত আবেদন করেন। ১৫ই মার্চ সরকার বাহাদূরের সেক্রেটারী টি ডব্লু ম্যাডক প্রতিউত্তরে জেনকিন্স সাহেবকে জানান "The Governor - General in council is deposed to encourage the proposition of the Rajah for the establishment of a school and when arrangement shall have been completed for appropriating sufficient funds for its maintenance, the subject of supplying teachers for the Presidency will be taken into consideration".

ইতিমধ্যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আলেকজেন্ডার ডাফের প্রচেষ্টাতে অন্দরমহলের জেনানা শিক্ষার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। শিবেন্দ্র রাজমহিষী মহারাণী বিন্দেশ্বরী দেবতী বিদুষী ও বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি সেই সময়ে বেহারন্ত কাব্যটি লেখেন। তার ইংরেজী জ্ঞানও সম্ভবত ছিল। এতে বোঝা যায় অতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোচবিহার রাজ্যটি অবস্থিত হলেও রাজারা শিক্ষার ধারাটি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করে গেছেন যখন ব্রিটিশ শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যটি তখনও অন্ধকারময় যুগে শিক্ষার আলোহীন অবস্থায় ছিল।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

**এক - কোচবিহারের ইতিহাস হেমন্তকুমার রায়।**

(ক) বর্মা ২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮, ১৩৩-৩৪।

(খ) দ্যা কোচবিহার ষ্টেট এন্ড ইটস ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট - হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, পৃ. ২২৫, ২২৮, ২৩০, ২৩২-৩৩, ২৩৬-৩৭।

(গ) ষ্টাডিস ইন হিসটরি এন্ড অর্কিওলজি এ মেসেলিনি — মলয় শঙ্কর ভট্টাচার্য ও আনন্দ গোপাল ঘোষ পৃ. ৯৯।

(ঘ) কোচবিহারের ইতিহাস — নৃপেন্দ্রনাথ পাল, পৃ. ৭৭-৭৮।

ঙ) কোচবিহার গেজেট পৃষ্ঠাসংখ্য ২৮ পার্ট নং ১, ১৮৯৬ খৃঃ তারিখ ১৩/৪/১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।

দুই

ক) কোচবিহারের ইতিহাস ২য় সংস্করণ— হেমন্ত কুমার রায় বর্মা প্রাক্তন আহিলকার কোচবিহার ষ্টেট, পৃ. ১৩৬।

খ) কোচবিহারের ইতিহাস প্রথম খণ্ড— খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ পৃ. ৯৩।

গ) দরঙ্গ বংশবাসী।

ঘ) পুথি নং ৮, পৃ. ১/ক।

ঙ) "দ্য কোচবিহার ষ্টেট"— হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, পৃ. ২২৮-৩৭ পঞ্চম অধ্যায়।

তিন — কোচবিহারের ইতিহাস ১ম খণ্ড।

ক) খাঁ চৌধুরী আমনতউল্লা আহমেদ, পৃ. ১৩০।

খ) হেমকুমার রায় বর্মা কোচবিহারের ইতিহাস ২য় সংস্করণ পৃ. ১৩৭।

গ) সাহিত্যে সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার ডঃ শচিন্দ্র নাথ রায়, পৃ. ৩৪-৩৬।

ঘ) "দ্য কোচবিহার ষ্টেট"— হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, পৃ. ২৩৩, অধ্যায় ৫ম তদেব - পৃ. ২৩৬, অধ্যায় ৬।

ঙ) কোচবিহারের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃ. ১০৪, ১১৪, ১৩০-৩১, ১৫২। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ।

চ) তদেব, পৃ. ১৫৪, ১৬৩।
কোচবিহারের ইতিহাস হেমন্ত কুমার রায়, বর্ষ ২য় সংস্করণ পৃ. ১৪৫।

ছ) সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার।

জ) শচীন্দ্র নাথ রায়, পৃ. ৪০, পুঁথি নং ২৮, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থগারে রক্ষিত পুথি।

ঝ) ' 'দ্যা কোচবিহার ষ্টেট" এইচ এন চৌধুরী পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮-৩৭. পঞ্চম অধ্যায়।

চার

(ক) সাহিত্যে সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার ড. শচীন্দ্র নাথ রায়, পৃ. ৪১।

(খ) কোচবিহারের ইতিহাস ২য় সংস্করণ হেমন্ত কুমার রায় বর্মা, পৃ. ১৭০-১৯৩।

(গ) ' 'দ্যা কোচবিহার ষ্টেট" হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী - ২৪৯, ২৫২, অধ্যায় ৭ম, তদেব, পৃ. ২৫৮, তদেব, পৃ. ২৭৭।

(ঘ) সমাচার দর্পণ. জানুয়ারী ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ।

(ঙ) স্টাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল (রংপুর জেলা), পৃ. ৩৪০, লেখক— ডব্লু. ডব্লু. হান্টার।

(চ) "কোচবিহারের প্রাচীন কথা"— বিশ্বনাথ দাস পৃ. ৮৯-৮০।

পাঁচ

ক) কোচবিহার হিতৈষী সভার বক্তৃতা মালা ৯ম সংখ্যা, বক্তা রামচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ১৬২-৬৩, ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল।

খ) টি নং ৭৪৭,-টি ডব্লু মোডাক; সেক্রেটারী গর্ভণর অব ইন্ডিয়া তারিখ ১৫ই মার্চ ১৮৪১ খৃঃ প্রতি ফ্রান্সিস জেনকিনস, এজেন্ট গভর্নর জেনারেল এন.এফ. ফ্রন্টটিয়ার স্তবক ৫ম, পৃ. ৫৭, ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল, "ইতিকথায় কোচবিহার"।

# আমলাশোলের নিরিখে মেদিনীপুরের লোধা-শবর ও সরকার

শঙ্কর কুমার দাস

আমলাশোল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম। প্রায় মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত এই গ্রামটি জনজাতি অধ্যুষিত। 'অনাহারে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু'— এই বিষয়টি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ার সূত্রে গ্রামটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকারের উর্দ্ধতন স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক মহলে আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যু নিয়ে পরস্পর বিরোধী মত-অভিমত ব্যক্ত হতে থাকে। প্রকাশিত সংবাদটির প্রথম সরকারী প্রতিক্রিয়া হল— আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যু হয়নি। এক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ রোগ, ব্যাধি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনজাতিগুলির অসচেতনতা। অপরপক্ষে সরকার বিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আমলাশোলে অনাহারে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে অকাট্য তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে। এছাড়া স্থানীয় সি.পি.এম নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্য কৈলাস মুড়াও অনাহারেব প্রার্দুভাব সম্পর্কে বি.ডি.ও সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিষয়টি তুলে ধরেন এবং অনাহারে মৃত্যুর বিষয়টিকে তিনি পুরোপুরি সত্য বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জাতীয় তফসিলি কমিশনও এক রিপোর্টে আমলাশোলে অনাহারে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু কথা জানিয়েছে।[১]

অনাহারে হোক কিংবা স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবের জন্য হোক আমলাশোলে পাঁচ ব্যক্তির মৃত্যু প্রকৃতই মর্মপীড়াদায়ক। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে— আদি জনজাতি জীবনের স্বাভাবিকতা প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বৎসর (ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সময় খ্রীঃ পূঃ ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত) অব্যাহত থাকলেও ভারত ইতিহাসের পটপরিবর্তন প্রবাহের বিভিন্ন পর্বে ঐ স্বাভাবিকতা কেন ব্যাহত হয়েছে? নৃতাত্ত্বিকেরা ও সমাজ বিজ্ঞানীরা জনজাতি জীবনে বিভিন্ন প্রবাহের পরিবর্তন প্রসূত অস্বাভাবিকতার জন্য রাষ্ট্র, প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন।

সুলতানী শাসনের দিনগুলিতে জনজাতির এতাবৎ নিস্তরঙ্গ জীবনে ধর্মীয় কারণে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ধর্মান্তরণের ভীতি, বেকার খাটার ভীতি এবং সর্বোপরি

সুলতানী সমর বাহিনীর নারী হরণের আতঙ্ক তাদেরকে বিব্রত করে তোলে। ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন— সুলতানী সমরবাহিনীর আভিযানের পথ এড়িয়ে জনজাতিগুলি জনবসতির পক্ষে দুর্গম হলেও অরণ্য অঞ্চল এবং মালভূমি অঞ্চলগুলিতে সরে চলে যায়। মুঘল যুগেও জনজাতি জীবনে ও অবস্থানে বিশেষ কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য মুসলমান জমিদারেরা জনজাতির লোকজনকে দিয়ে বিনা মজুরীতে বিভিন্ন শ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে নিত।

টোডরমল প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা বাংলা বিহারে প্রথমের দিকে প্রযুক্ত হয়নি। উত্তরকালে তা প্রযুক্ত হলেও জমিদারী পীড়নের আতঙ্ক থেকে জনজাতিগুলি প্রায় মুক্ত ছিল। একারণে তাদের জীনবযাত্রার স্বাভাবিকতা মোটের উপর আগের মতোই থাকে।

১৭৬০-এ মেদিনীপুর ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক বৃহৎ জমিদারীতে পরিণত হয়। কোম্পানী নবাবী রাজস্ব ব্যবস্থা অনুসারে রাজস্ব আদায় করতে থাকে। একারণে জনজাতিগুলির উপর রাজস্ব আদায়ে কোন নতুন চাপ আসেনি। আবার কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের (১৭৬৫) কারণে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা কড়াকড়ি শুরু হলেও জনজাতির উপর তার তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে জনজাতিগুলির উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়। এসময় জমিদারী চাপ বাড়লেও যথেচ্ছ অরণ্য ব্যবহারের উপর বিধি নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হলে জনজাতি জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়। এছাড়া ডিকু মহাজনদের দৌরাত্ম্যও নতুন এক খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়ায়।

জমিদারী ও মহাজনী শোষণ-পীড়ন এবং অরণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কারণে অসহায় হয়ে ওঠা জনজাতিগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বাংলা বিহারে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের ধ্বজা উড়ায়। এই বিদ্রোহের এক প্রচণ্ড বৃহত্তর প্রকাশ হল সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের কারণে কোম্পানী-রাজ জনজাতি সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ রাজের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতে নতুন করে কোন বিদ্রোহ-বিক্ষোভ ঘটার আশু সম্ভাবনা নেই। এসময় ঔপনিবেশিক সরকার প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা দৃঢ় করে তোলার জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঐ সব বিধিব্যবস্থার বিবিধ কল্যাণকর দিক থাকলেও জনজাতিগুলি একাদিক্রমে ১৮৭৪, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ এর অরণ্য আইনগুলির কারণে নতুন করে পীড়িত

হয়।[২] তাদের কাছ থেকে অরণ্য কর আদায় হতে থাকে। অরণ্য আইন প্রসূত বিবিধ নিষেধাজ্ঞা ও কর ব্যবস্থা তাদের স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ রুদ্ধ করে দেয়।

১২০০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রসারিত কাল পর্বে কোন সরকারই জনজাতি উন্নয়ন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেনি। এ সম্পর্কে তাদের একমাত্র নীতি হল বৃহৎ ভারতের প্রায় $^{১}/_{৪}$ অংশের অরণ্যভূমি থেকে যত অধিক রাজস্ব আহরণ করা। এতৎসত্ত্বেও জনজাতিগুলির স্বাভাবিক জীবনে কোন বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা ফুটে ওঠেনি। তবে ভারতীয় জনজীবনে তাদের যে কোন সামাজিক মর্যাদা নেই, তারা যে অবহেলিত এবং সরকার যে তাদের প্রতি উদাসীন— ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই এবিষয়ে সচেতন হয়েছিল। চম্পারণের তিনকাঠিয়া নীলচাষী আন্দোলনের পর্বে ঐ সব বিধাতার অবহেলিত সন্তান (neglected sons of god) সম্পর্কে মহাদেব দেশাই প্রমুখ নেতৃবর্গ গান্ধীর নজরে বিষয়টি এনেছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩০-এর পূর্বে জনজাতি ও দলিত সম্প্রদায়গুলির সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা করে নি। অবশ্য ইতিপূর্বে জ্যোতিবাফুলে, রামস্বামী পেরিয়ার এবং ভীমজীরাও আম্বেদকার অনুন্নত শ্রেণীগুলির সামাজিক মর্যাদা ও উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন শুরু করে ছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের উপর তার প্রভাবও পড়ে ছিল।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জনজাতিসহ অনুন্নত জাতি-উপজাতিগুলির সামাজিক আধিকার ও মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে বিবিধ ধারা সংযোজিত হয়।

ইতিপূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবাধিকারের বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। ফলে সমগ্র বিশ্বে অনুন্নত জাতিগুলির উন্নয়নের বিষয়টি প্রতিটি দেশের সরকারের উপর প্রভাব ফেলে এবং ঐ সব সরকার বিভিন্ন বিকাশধর্মী ও উন্নয়নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তব পর্বের ভারতে সাংবিধানিক সহায়তা, কল্যাণকর রাষ্ট্রাদর্শ এবং নবপ্রবর্তিত বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমলাশোলে লোধা-শবর প্রভৃতি জাতি-উপজাতির উন্নয়ন ঘটেনি। বিপরীতে বলা যায়— পশ্চিমবঙ্গে চার হাজারের অধিক অনুন্নত গ্রামের একটা বড় অংশই হল জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম।[৩] ব্যাপক ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সরকারী নথিপত্রের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সূত্রে এই অস্বাভাবিক উন্নয়নহীনতার চিত্রটি স্পষ্ট হতে পারে।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার এক কর্মচঞ্চল থানা শহর হল বেলপাহাড়ী। থানা বেলপাহাড়ীর বিনপুর ব্লক-২ এর বাঁশপাহাড়ী পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত এক হতদরিদ্র গ্রাম হল আমলাশোল। আমলাশোলের পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম

হল— কাঁকড়াঝোর, ময়ূরঝর্ণা, জুজাতধারা ও আমঝর্না। এই গ্রামগুলির থেকে বাঁশপাহাড়ী ও বেলপাহাড়ীর দূরত্ব খুব কম করে হলেও যথাক্রমে ২৫ কি.মি. এবং ২৮ কি.মি। বাঁধানো পথ কিংবা সড়ক পথ না থাকার কারণে তাদের সঙ্গে গ্রামগুলির যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ভোটের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা নির্বাচিত হতে থাকলেও পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে গ্রামগুলির কোন ধরনের স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক নেই। সম্ভবতঃ গ্রামগুলির মানুষজনের উন্নয়ন সংক্রান্ত অসচেতনতার জন্যই পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে উদাসীন। পঞ্চায়েত থেকে কোন ধরনের সাহায্য পাওয়া যায় না এবং পাওয়া যেতেও পারে না— এ বিষয়ে গ্রামগুলির লোকজনের স্থির ধারণা হয়ে ছিল। নগদ অর্থে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ কেনার মত সম্বল তাদের নেই। সে কারণে বেলপাহাড়ী বাজারের সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। একারণে গ্রামগুলি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং থানা ও পঞ্চায়েত সমিতির দিক থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে।

আমলাশোল ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে কোন স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী হাট-বাজার নেই। আমলালশোলের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাঁকড়াঝোরে একটি ছোট মুদির দোকানে অল্প পরিমান চাল, ডাল, নুন, তেল, বেচার ব্যবস্থা রয়েছে। এর থেকে একটু বড় দোকানে যেতে হলে গ্রামবাসীদের জেলা পুরুলিয়ার জুগিডী অথবা ঝাড়খণ্ডের গননিয়াতে যেতে হয়। উল্লেখ্য একটি লোকালয়ের অর্থসংগতির প্রমাণ তার হাট-বাজারের অবস্থান এবং পণ্য সামগ্রী কেনা বেচার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বনের কন্দমূল, গোসাপ, লতা-পাতা খেয়ে যারা উদর পূর্ত্তি করে তাদের হাট-বাজারের প্রয়োজন হয় না। কেন্দুপাতা, কাঠ ও বাবুই দড়ি বেচে যাদের কোনক্রমে এক-আধসের চাল কেনার ক্ষমতা হয় তাদের জন্য কোনো স্থায়ী বাজার গড়ে ওঠে না।[৪]

আমলাশোল ও তার আশে-পাশের গ্রামগুলি একযোগে এক-একটি নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়— আমলাশোলে মুড়া, মাহাতো, শবর, বৈষ্ণব, ভূমিজ ও কর্মকার এই ছয়টি জাতি রয়েছে। এদের কয়েকটি জাতির নাম সূত্রে মনে হয় এক সময় তাদের উপর আর্যায়নের প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু সেরূপ কোন ছাপ বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় না। সাবেক কালের পেশাগত ভিন্নতার জন্য পদবী ও পরিচয়গত ভিন্নতা থাকলেও গ্রামবাসীরা সংহতিহীন নয়। অভাব, অপুষ্টি, রোগ-ব্যাধি, জরাজীর্ণতা, প্রতিকারহীন মৃত্যু এবং সর্বোপরি জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্য তাদেরকে এক পরিবারের মানুষ করে রেখেছে।[৫]

আমলাশোলের লোধা-শবরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার সূত্রে জনজাতিগুলির অসহায় চিত্রটি ফুটে ওঠে। আমলাশোলে ১৭টি লোধা-শবর পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৭৭। এদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ ও ৩৫। আর শিশু সহ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সংখ্যা হল ১৫। এই তথ্য থেকে পরিস্ফুট হয় পুরুষ লোধা-শবর স্ত্রী লোধা-শবরদের তুলনায় অল্পায়ু। সে কারণে বর্তমানে লোধানারীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা বেশি।[৬]

আমলাশোলে লোধা-শবরদের কোন ধরনের জমিজমা নেই। এমন কি নিজস্ব বাস্তুভিটে মাটিও নেই। সরকারী নথিপত্রে বনাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত ভূমিভাগে নড়বড়ে খুঁটির কাঠামোর উপর খড় জড়ানো ও প্রকৃতির করুণা নির্ভর এদের একটি করে জীর্ণ কুটির রয়েছে। লোধা-শবরদের ১৭টি পরিবারের মধ্যে ১০ টি পরিবার, মুড়াদের ৬২টি পরিবারের মধ্যে ২টি পরিবার এবং ১টি কর্মকার পরিবার পাট্টা নির্দ্দিষ্ট কয়েক শতক করে জমি পেয়েছে। কর্মকার পরিবারটির পাট্টা নির্দ্দিষ্ট ভূমি বাস্তুভিটে হওয়ায় তা নিজ ভোগদখলে রয়েছে। অপর ১২টি পাট্টা নির্দ্দিষ্ট ভূমি কৃষি জমি। ঐ সবগুলি বহুকাল আগে থেকেই অপরের ভোগ দখলের অধীন। সেহেতু হালে পাট্টা পাওয়া লোধা-শবর ও মুড়ারা ঐ জমির দখল পায়নি এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও তাদের ঐ জমির দখলী স্বত্ব পাইয়ে দেয়নি। একারণে লোধা-শবর প্রভৃতিদের কাছে তথাকথিত পাট্টা এক নিষ্করুণ প্রহসন বিশেষ।[৭]

আমলাশোল ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে অরণ্যই জীবিকা সংস্থানের একমাত্র উৎস ক্ষেত্র। বাবুই ঘাস, কাঠ ও কেন্দুপাতা এবং কন্দজাতীয় মূল ও পশুপাখি তাদের আহার্য সংস্থানের উপকরণ। কিন্তু বর্তমানে জনযুদ্ধ ও মাওবাদী কমিউনিষ্ট সেন্টারের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় অরণ্য অঞ্চল ফৌজের কড়া প্রহরাধীনে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত অঞ্চলের বাইরে পড়ে থাকা এলাকার বাবুই ঘাস থেকে তৈরী দড়ি, সংগৃহীত জ্বালানী কাঠ ও কাঁচাশাল পাতা তাদের অর্থ উপার্জনের তিন উৎস। আমলাশোল সহ আশে-পাশের গ্রামগুলির দরিদ্র মানুষজন জুগিডী বাজারে বাবুই দড়ি ও জ্বালানী কাঠ বেচে সপ্তাহে কুড়ি থেকে তিরিশ টাকা আয় করে। উল্লেখ্য, বছরের সকল সময় জঙ্গলে বাবুই ঘাস মেলে না। সেহেতু সারা বছরের মধ্যে মাত্র আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ— এই তিন মাসে বাবুই দড়ি তৈরীর উপকরণ মেলে। আর বছরের সকল সময় কাঁচা জ্বালানী কাঠের চাহিদা থাকে। সেহেতু লোধা-শবর প্রভৃতিরা ফৌজী প্রহরা এড়িয়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ফৌজের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাকরে সংরক্ষিত অরণ্যভূমিতে কেন্দুপাতা সংগ্রহ করত এবং এভাবে অতি সামান্য কিছু

পয়সা পেত। কিন্তু বাৎসরিককাল অরণ্য অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ায় কেন্দুপাতা সংগ্রহ ও বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, আরোপিত হয়েছে। ফলে দরিদ্র জনজাতির আহার্য সংস্থানের এই বিশেষ উৎসটিও প্রায় শুকিয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, জনযুদ্ধ ও মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টারের প্রতি জনজাতিগুলির সহানুভূতি লক্ষ্য করে সরকার লোধা-শবর প্রভৃতিদের গভীর অরণ্যে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। ফলে পশুপাখি শিকার, গোসাপ ধরা ও ফলমূল সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এহেতু অর্দ্ধাহারে ও অনশনে তাদের দিন কাটে।[৮] এমতাবস্থায় অরণ্যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষ.টি একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক তাঁর 'The Lodhas of West Benal' গ্রন্থে মেদিনীপুর জেলার লোধা-শবর অধ্যুষিত নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম, জামবনী, সাঁকরেল, দাঁতন, খড়গপুর, সবং, কেশিয়াড়ী ও নারায়ণগড়— এই ৯টি থানার ৩১টি গ্রামের উপর সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন প্রতিটি গ্রামের লোধা-শবেররা অর্থনৈতিক দিক থেকে একান্তই দুঃস্থ এবং সামাজিক দিক থেকে একান্তই মর্যাদাহীন। তাদের জীবন প্রবাহ পুরোপুরি উচ্চবর্গীয় সমাজের বিপরীতমুখী এবং এজন্য তিনি সরকারী উদাসীনতা ও স্থানীয় প্রশাসনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের শিথিলতাকে দায়ী করেছেন।[৯] ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কেও তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ'-এ সরকার ও তার আমলাদের সম্পর্কে একই অনুযোগ করছেন।

আদিবাসী সমাজের বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে যে তরফ থেকেই অনুযোগ-অভিযোগ উঠুক না কেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি জনজাতি সমাজের উন্নয়ন সম্পর্কে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করেনি। আবার ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত নীতি নির্ধারিত হলেও তা যথোচিত রূপায়ণ হয়নি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণীত হওয়ার কাল থেকে অদ্যাবধি একই ধারা প্রবাহ বর্তমান রয়েছে। কয়েকটি তথ্য ও দৃষ্টান্ত সূত্রে বিষয়টি পরিস্ফুট হতে পারে।

সংবিধানের ১৪ ধারায় বলা হয়— প্রতিটি নাগরিক আইনের ক্ষেত্রে সমানাধিকার পাবে। ১৫(৪) ধারায় বলা হয়— সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি-উপজাতিগুলির বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। আর ৩৩৮, ৩৩৯ ও ৩৪২ ধারায় বলা হয়— তাদের ক্ষেত্রে সংবিধান নির্দ্দিষ্ট রক্ষা কবচগুলি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য তদারকি কমিশন গঠিত হবে। আর সংবিধানের ৪৬ ও ২৭৫(১) ধারায় বলা হয়েছে তফসিলি জাতি ও

উপজাতিগুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত বিকাশ সাধনের বিষয়ে রাষ্ট্র সবিশেষ সচেতন থাকবে এবং এজন্য বিশেষ সংরক্ষিত তহবিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থবরাদ্দ করবে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা ও সংবিধানে বিবৃত নির্দ্দেশাত্মক নীতিগুলি এবং তফসিলি জাতি-উপজাতি উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়া তাদের কর্মনীতি রূপায়ণের জন্য অর্থবরাদ্দও হয়েছে। কিন্তু উপজাতিগুলির বিশেষ কোন কল্যাণ হয়নি। এতৎসংক্রান্ত সরকারি কমিটিগুলির নীতি মুখ্যতঃ কাগজে-কলমে থেকে গেছে। আর প্রকৃতই যদি উপজাতি কল্যাণের ব্যবস্থা হত তাহলে সর্বোপরি তাদের অনাহার, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের দুরীকরণ হত। সংবিধান নির্দ্দিষ্ট মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার কোন সুযোগই জনজাতিগুলি পায়নি। একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলা যায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা অনুসারে উন্নয়নের কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয় এবং তাদের রূপায়ণও হতে থাকে। কিন্তু জনজাতির উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ কোন গুরুত্ব পায়নি।

নেহরু উত্তর পর্বে বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী পর্বে 'গরীবি হটাও' জাতীয় সরকারের বিশ দফা কর্মসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব পায়। এতৎসংক্রান্ত বিবিধ অর্থকরী ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে উপজাতি কল্যাণের কাজ বিশেষভাবে শুরু হয়। উপজাতি অঞ্চলে সরকারী স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রকাশ পায়। শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচীও নেওয়া হয়। উপজাতি এলাকাগুলিকে সরকারী কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে পথঘাটও নির্মিত হয়। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে 'গরীবি হটাও' সংক্রান্ত অল্পবিস্তর কাজ শুরু হয়। কিন্তু জনজাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন কর্মসূচী গৃহীত হয়নি। সেরূপ হলে ব্লক উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতে তার তথ্য প্রমাণ মিলত।

১৯৭৭ থেকে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক স্থিরতা ও অর্থনৈতিক বিকাশের চিত্রটি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঘোষিত মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে জীবিকার অধিকার, খাদ্যের অধিকার এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে বামপন্থী সরকার বিশেষ তৎপর হয়। পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামোন্নয়নের বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে [illegible]শ্রেণীর মানুষকে রাজনীতি সচেতন করে তোলার বিষয়ে বিশেষ প্রয়াসও নেওয়া [illegible]য়। কিন্তু ভৌমিক ও বাস্কে দেখিয়েছেন জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে পঞ্চায়েতী

ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলেও মানুষজন রাজনীতি সচেতন হয়নি। দিন বদলের আশায় ভোটের মাধ্যমে গ্রাম সভা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচন করতে থাকে। পঞ্চায়েতগুলি গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকারী অর্থ পেতে থাকে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশাপ্রদ হয়নি। বাঁশপাহাড়ী পঞ্চায়েতের অধীন আমলাশোল ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির উন্নয়নের চিত্র একান্তই হতাশা ব্যঞ্জক। আমলাশোলের আশে-পাশের ৫ কি.মি.-র মধ্যে কোন স্থায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। সম্প্রতি গ্রামগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবা সুষ্ঠু (?) করার উদ্দেশ্যে একটি চলমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রবর্তন হয়েছে। চলমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি প্রতি মঙ্গলবার আমলাশোলে এবং প্রতি শুক্রবার কাঁকড়াঝোরে পরিষেবা দিয়ে থাকে। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রকার ও প্রকরণ নিতান্তই উদ্বেগজনক। ডাক্তারবাবুর উপস্থিতির অনিশ্চয়তা, ঔষধ পত্রের অপ্রতুলতা, প্রসূতি চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা প্রভৃতির কারণে ঐ ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামগুলির নূন্যতম চাহিদা মেটাতে পারেনি।[১০]

গ্রামগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনে পঞ্চায়েত ও সরকার কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি। পাট্টা জমির ভোগ দখল কৃষকের হাতে না আসায় কৃষির প্রসার ঘটেনি। গ্রামগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা নেই। কোন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক গ্রামে আসে না। অর্থাৎ কৃষির বিষয়ে গ্রামবাসীদের উৎসাহ দেওয়া হয়নি।[১১]

প্রতিটি গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এতাবৎ পঞ্চায়েত কোন কূপ খনন করেনি। ১৯৯৬-র আগে পর্যন্ত গ্রামে কোন নলকূপ বসেনি। বেলপাহাড়ী কিংবা বাঁশপাহাড়ীতে যাওয়ার মতো এতাবৎ কোন সহজ পথ পঞ্চায়েত কিংবা সরকার তৈরী করেনি। আমলাশোল ও কাঁকড়াঝোরে একটি করে প্রাথমিক স্কুল আছে। কিন্তু ঐ সব স্কুলে নিরন্ন পরিবারের ক্ষুধার্ত ছাত্রদের উপস্থিতির হার নিতান্তই কম হতে থাকায় শিক্ষকদের উপস্থিতি ও শিক্ষাদান ঠিক মতো হয় না। আর প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর শহরাঞ্চলে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার আর্থিক ক্ষমতা গ্রামবাসীদের নেই। পঞ্চায়েত গ্রামগুলিকে কুটির শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে কোনরূপ সহয়তা দেয়নি। অথচ শালপাতার থালা-বাসন তৈরী করার মতো কুটির শিল্প এখানে অতিসহজেই গড়ে উঠতে পারতো। পঞ্চায়েত এবিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন।[১২]

আমলাশোল ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির বর্তমান দুরবস্থার মূল কারণ জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলি সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা এবং বিভিন্ন ভ্রান্তনীতির কঠোর রূপায়ণ। গ্রামগুলিতে সরকার অগ্রণী হয়ে স্বর্ণজয়ন্তী যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা,

অন্ত্যোদয় যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা এবং জওহর রোজগার যোজনা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির প্রবর্তন করেনি। এমনকি আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দুঃস্থ পরিবারগুলির হাতে বি.পি.এল কার্ডের সুযোগটুকুও তুলে দেয়নি।[১৩] বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমলাশোলের লোধা-শবর পরিবারগুলি ২০০৪ এর আগস্টের ২৯ তারিখে বি.পি.এল কার্ডের হকদার হয়ে রেশনে চাল ধরার অধিকার পেয়েছে। কিন্তু আয়-উপায়হীন অসহায় মানুষগুলির কাছে বি.পি.এল. কার্ড কোন সুযোগ-সুবিধা আনতে পারেনি। অনেকেরই পক্ষে রেশনে চাল ধরা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে এখনও অনাহার ও তৎজ্জনিত অপুষ্টি এবং রোগব্যাধির শিকার হয়ে আমলাশোলের মতো গ্রামগুলিতে ধীর গতিতে এবং নিশ্চিতভাবে আজও মৃত্যু চলছে। এ যেন মৃত্যুর মিছিলে যোগ দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্তি ঘটছে।[১৪] সরকারী উদাসীনতার কারণে ইন্দিরা যোজনা অনুসারে কোন পাকাঘর আমলাশোল কিংম্বা কাঁকড়াঝোড়ে নির্মিত হয়নি। সরকারী উদাসীনতার আর কোন অকাট্য প্রমাণ থাকতে পারে? সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে খরা ও অজন্মার সময় এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রচণ্ড খাদ্যসঙ্কটের সময় ত্রাণমূলক কাজ করায়। কিন্তু আমলাশোল, কাঁকড়াঝোর, ময়ূরঝর্ণার পঞ্চায়েত এসব কাজ করেনি।[১৫] এখন প্রশ্ন হল— এত সব যোজনার অর্থ কিভাবে কেথায় চলে যায়? প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর ২৯শে জুন (২০০৪) ভাষণ সূত্রে জানা যায়— ভারতে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলির প্রত্যেকটির উন্নয়নের জন্য বছরে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়ে থাকে।[১৬] এখন প্রশ্ন হল— পশ্চিমবঙ্গের ঐ বরাদ্দ অর্থ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ব্যাপক পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলির জন্য কিভাবে ব্যয় হয়? আর প্রকৃতই যদি ঐ বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে তাহলে তার নীট উন্নয়ন ফল কতখানি হয়েছে? সবিনয়ে বলতে হয়— এতৎসংক্রান্ত নীট ফলের অঙ্ক একান্তই শূন্য। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের কাছে এরূপ আবেদন আসতে পারে—

১) জনজাতি অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলিকে মানবাধিকারের সূত্রগুলি অনুসারে সর্বপ্রথম সামাজিক মর্যাদার আধিকারী করা হোক। জাতিপুঞ্জের ফাও সংস্থার সুপারিশ মত খাদ্যের অধিকার ও জীবিকার অধিকার নিশ্চিত করে এখানকার মানুষজনে জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হোক।

২) থানা শহর ও পঞ্চায়েত কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য পথঘাট তৈরী করা হোক।

৩) দুঃস্থ গ্রামগুলির মানুষজনের মনে জীবন সম্পর্কে আস্থা সঞ্চারের জন্য ছোটখাটো

কুটির শিল্প বিশেষ করে শালপাতা, কেন্দুপাতা ও বাবুইঘাস ভিত্তিক কুটির শিল্প গড়ে তোলা হোক এবং ন্যায্য মূল্যে সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হোক।

৪) গ্রামগুলিতে যোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা দানের ব্যবস্থা করা হোক। এছাড়া জনজাতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রকল্পগুলি যথাযথ রূপায়ণের কর্মসূচী নেওয়া হোক। এক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে থাকা অথবা জনজাতির সমস্যাকে গুরুত্ব না দেওয়া এক বড় ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) ৮ই এপ্রিল, ২০০৫, আনন্দবাজার পত্রিকা।
২) Prof. V.S. Upadhyay & Dr. Gaya Pandey - Tribal Development in India (A Critical Appraisal), Crown Publications, Ranchi, 2003, p. 32.
৩) ১৬ই জানুয়ারী, ২০০৫, আনন্দবাজার পত্রিকা।
৪) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ২৯.০৮.২০০৪।
৫) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ২৯.০৮.২০০৪।
৬) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ২৯.০৮.২০০৪।
৭) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ২১.০১.২০০৫।
৮) ২৪শে জুন, ২০০৪, বর্তমান।
৯) Prabodh K. Bhowmik - The Lodhas of West Bengal, Institute of Social Research & Applied Anthropology, Cal-89, 1994, p. 24.
১০) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ২১.০১.২০০৫।
১১) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ১০.১১.২০০৪।
১২) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ২১.০১.২০০৫।
১৩) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ২৯.০৮.২০০৪।
১৪) ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ২২শে এপ্রিল, ২০০৫, আনন্দবাজার পত্রিকা।
১৫) ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে জ্ঞাত, ১০.১১.২০০৪।
১৬) ১লা জুলাই, ২০০৪, বর্তমান।

# সারাংশ

## বঙ্গদর্শন-এ মেদিনীপুর ঃ একটি অনুসন্ধান

ইন্দুভূষণ অধিকারী

বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষ, কার্তিক (১২৭৯) সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি নতুন বিভাগ খোলেন— 'নতুন গ্রন্থেব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। বর্তমান তমলুক মহকুমা থেকে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ' এই সংখ্যাতেই উল্লেখিত হয় লেখকের নামসহ। তিনি তারকনাথ চক্রবর্তী। বইটি ১২৭৮ বঙ্গাব্দে রচিত। (অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রিঃ) ১৮৭৩ খ্রিঃ প্রকাশিত স্থানীয় ইতিহাসকার উমাচরণ এবং ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিতের গ্রন্থে (১৯০২) বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের রচনাকারের নাম নেই।

বঙ্গদর্শনের এই সংখ্যাতেই মেদিনীপুরের নাড়াজোলরাজপুত্র মহেন্দ্রলাল খানের 'সংগীত লহরী' প্রশংসিত না হলেও উল্লেখিত। পরের বছর (বাং ১২৮০) বৈশাখ সংখ্যায় এই বিভাগেই সমালোচিত হয় গঙ্গানারায়ণ প্রধানের 'কাব্য-কদম্ব'। তিনি বর্তমান হলদিয়া মহকুমার দেভোগ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

উপযুক্ত প্রবন্ধ এবং কবিতার বইগুলি বঙ্গদর্শন কর্তৃক প্রশংসিত না হলেও প্রচুর প্রশংসা জুটেছে তমলুক থেকে প্রকাশিত এবং ত্রৈলোক্য রক্ষিত সম্পাদিত 'তমোলুক পত্রিকা'-র। বঙ্গদর্শন-এর ২য় বর্ষ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তমোলুক পত্রিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ''ইহার দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের প্রথম কারণ এই যে তমলুক হইতে একখানি সাহিত্য বিষয়ক পত্র প্রচারারম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় আনন্দের বিষয় এই পত্রিকাখানি উৎকৃষ্ট।'' এই কথা বলার পরও বঙ্গদর্শন থামেন নি। তমোলুক পত্রিকাকে রাজধানী অর্থাৎ কোলকাতার অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক পত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলায় তমলুকের মানুষের গর্ববোধ করার কারণ ঘটেছে। প্রসঙ্গত, এই পত্রিকার সূচনাকাল ১২৮০ অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের সূচনার পরের বছরই। তাছাড়া এই পত্রিকাটি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার প্রথম প্রকাশিত পত্র।

যখন সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন 'জটাধারীর রোজনামচা' নামে একটি রম্যরচনা ধারাবাহিকভাবে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে '৮৫ সালের চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। সমসময়েই জানা গিয়েছিল জটাধারী মেদিনীপুরের জাড়ার চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই কি বঙ্গদর্শনে মেদিনীপুরের একমাত্র প্রতিনিধি?

# "লোকসাহিত্যের ইতিহাসে" উত্তর-পূর্বভারতের রাজবংশী জাতির লোকসংস্কৃতি— "ব্রতকথা"

— মাধবচন্দ্র অধিকারী

রাজবংশী জনগণ উত্তরপূর্ব ভারতের সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়। তারা প্রাচীন কাল থেকেই এতদ্অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবেই গণ্য হয়ে আসছে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য, তাম্রশাসন, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ, ঐতিহাসিকদের বিবরণী প্রভৃতি হতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির অধ্যুষিত অঞ্চলটির বিভিন্ন নামের পরিচয় পাওয়া যায়— প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, লৌহিত্য, কামরূপ, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রভূমি, কামতাপুর, কোচবিহার মিত্ররাজ্য প্রভৃতি। বর্তমানে রাজবংশী জাতি যে সমস্ত অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বসবাস করছে সেগুলো হলো— উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর (উঃ ও দঃ), মালদহ, দর্জিলিং এর সমতল এলাকা, আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নঙগাঁও, ধুবড়ী জেলা, বিহারের পূর্ণিয়া, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, বাংলাদেশের রংপুর, পূর্ব-দিনাজপুর, ময়মনসিং জেলার কিছু অংশ, লোয়ার ভুটান, মেঘালয়, নেপালের ঝাপা ও মোরঙ্গজেলা, এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ। রাজবংশীরা উত্তর-পূর্বে ভারতের আদি অধিবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জাতি বিন্যাসের তৃতীয় বৃহত্তম জাতি হিসাবে গণ্য। রাজবংশীদের পরিচয় সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশী পণ্ডিত মহলের রচনা রাজবংশী সমাজের জাতিসত্ত্বা জাগ্রত করেছে এবং রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে। এ প্রসঙ্গে রাজবংশী জাতির পঞ্চানন বর্মা (কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার খলিসা মারী গ্রামের বাসিন্দা, পরবর্তীকালে রংপুর বিচারালয়ের উকিল) চিরস্মরণীয়। কোন জাতির ইতিহাস জানতে সেই জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন আবশ্যিক, রাজবংশী সমাজের লোক সংস্কৃতির মধ্যেই এই জাতির ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২

লোক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হল লোক সাহিত্য। সামাজিক মানুষের সার্বিক জীবন প্রকাশই সাহিত্যে সংস্কৃতি। তাই লোক সাহিত্যে স্থান পায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মমস্পর্শী চিত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা। লোক সাহিত্য অলিখিত হলেও সমাজের অলিখিত মানসধর্মে ও নিয়ম অনুসারেই এক বিশেষ শৃঙ্খলার মধ্যেই এর বিকাশ ঘটে। কালের প্রভাবে এর পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু কালের প্রবাহে আধুনিক যান্ত্রিকতার যুগে লোক সাহিত্যের ধারা হারিয়ে যেতে বসেছে।

তাই এর বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অনুশীলন একান্তই প্রয়োজন। আর সাহিত্যই যদি জাতির দর্পন, জাতির মেরুদণ্ডী হয়, তাহলে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজবংশী জাতির লোক সাহিত্যে লোকসংগীত, লোককথা, ব্রতকথা, ছড়া, ধর্মীয় বিশ্বাস, ছিলকা, প্রবাদ-প্রবচন বিষয়গুলোর প্রকৃত অনুসন্ধান ও মুল্যায়নে সেই জাতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

৩

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রাচীন কাল হতেই বনাঞ্চলে ভরা। প্রতি পদে পদে এতদ্‌অঞ্চলের মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তি বা বন্য পশুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে হত। প্রাকৃতিক শক্তির বিপত্তি থেকে রক্ষা পেতে এই অঞ্চলের জনগণ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে আসছে। এই পূজাকেই অবলম্বন করে রচিত হয়েছে রাজবংশী "ব্রতকথা" যা উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। যে সমস্ত "ব্রতকথা" রাজবংশী লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে সেগুলোর মধ্যে ভাণ্ডানী পূজা, সুবচনীর কথা, বিষহরীর গান, সাইটোল পূজার গান, ধরম ঠাকুরের গান, মদনকামের গান, হুদুমদেও পূঁজা উল্লেখযোগ্য।

এই প্রবন্ধে রাজবংশী ব্রতকথা-র "ভাণ্ডানী পূজা", "সুবছনীর পূজা", "বিষহরীর গান", "মদনকামের গান", "হুদুমদেও-পূজা/হুদুমা" প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।

**ভাণ্ডানী ঃ** ভাণ্ডানী পূজা শুরু হয় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের ঠিক অব্যবহিত পরেই। তিনদিন ধরে অতিধূমধামের মধ্য দিয়ে পূজা সমাপন হয়। উত্তরবঙ্গের অরণ্য সংকুল অঞ্চলের বন্যজন্তুদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই ভাণ্ডীপূজা বা ভাণ্ডানী পূজার প্রচলন হয়েছে বলে অনুমান। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এই পূজার প্রচলন বেশী।

**সুবচনী পূজা ঃ** "সুবচনী' কথার অর্থ যে সুবচন অর্থাৎ মঙ্গল আর্শীবাদ দেন। 'সুবচনী' লৌকিক দেবী। উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজবংশী জনগণের বাড়ীতে সুবচনীর পূজা হয়ে থাকে। কোন শুভ কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে বা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবীর প্রতি মানত করা হয় এবং মনস্কামনা পুরণ হলে পূজা দেওয়া হয়।

**বিষহরী ঃ** উত্তর-পুর্ব ভারতের অঞ্চলে সর্পদেবী মনসার পরিচিত নাম বিষহরী। রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত 'বিষ' শব্দটির অর্থ ব্যাথাও। প্রত্যেক রাজবংশী বাড়ীতে উত্তর বা পূর্বদিকে বিষহরীর থান বা মন্দির থাকে। চারুচন্দ্র স্যান্যালের মতে সাপের কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই রাজবংশী সমাজ বিষহরীর পূজা দিয়ে থাকেন।

**মদন কাম ঃ** উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজবংশীদের একটি অন্যতম উৎসব হল 'মদনকাম'

পূজা। কালিকা পুরাণের মতে ব্রহ্মার মন থেকে মদনের উৎপত্তি। সকলের মন আনন্দিত করে বলে এর নাম মদন। মহাদেবের দর্প চূর্ণকারী বলে এর আর এক নাম কন্দর্প। এই অঞ্চলে মদনকামের প্রতিকী বিগ্রহ হলো-বাঁশ। বাঁশ পূজাকেই মদনকাম পূজা বা বাঁশপূজা বলা হয়।

**হুদুমদেও/হুদুমা ঃ** হুদুম পূজা রাজবংশী সমাজের অন্যতম লোক সংস্কৃতির উদাহরণ। মনের বিশ্বাসকে জাগিয়ে রাখার যে সমস্ত প্রচেষ্টা সমাজে প্রচলিত, তারই একটি বিশেষ রূপ হুদুম দেও পূজা। অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য ও বৃষ্টি আনয়নের জন্য হুদুম দেও পূজা হয়ে থাকে। তবে শুধু রাজবংশীদের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন নয় সারা পৃথিবীতে এ ধরনের অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৪

যদিও পরিবর্তনশীলতাই সাহিত্যের ধর্ম তথাপি লোক সংস্কৃতির ধারা এমন এক প্রাণময় জীবাশ্ম, সে কখনো মরে না, মরতে পারেও না। ইহা উদ্ভিদের শিকড়ের ন্যায় স্বদেশের মাটির মধ্যেই মিশে রয়েছে। রাজবংশী লোক সংস্কৃতির উপাদানগুলো উত্তরপূর্ব ভারতের নিজস্ব উপাদান। তবে লিখিত সহিত্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু প্রাচীন রাজবংশী জাতির ইতিহাস আজ বিপদের মুখে। তবে প্রাচীন এই জাতির কিছু কিছু লিখিত উপাদান স্থানীয় ভাষায় যাহা রাজবংশী বা কামতাপুরী ভাষায় রচিত বলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আওয়াজ উঠেছে— তা বিভিন্ন মহলে সাড়া জাগিয়েছে। লৌকিক সাহিত্যের উপর নির্ভর করেই গবেষকদের উপর দায়িত্ব পড়েছে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার। আর সে সাহিত্য স্বদেশের মাটিতে লুক্কায়িত আছে আর উৎঘাটন হলেই উত্তর-পূর্ব ভারতের আঞ্চলিক ইতিহাসের নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে।

# "তমলুক পৌরসভা — সাম্প্রতিক সমীক্ষা"

অশ্রুরঞ্জন পাণ্ডা

তমলুক হলো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর। বর্তমান তমলুক হলো প্রাচীন তাম্রলিপ্তর আধুনিক রূপ। তমলুক মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভাও সাবেক বাংলা তথা পশ্চিমবাংলার অন্যতম পুরানো পৌরসভা যা ১৮৬৪ সালে স্থাপিত হয়। অবশ্য এর কার্য বিবরণী ১৮৭৭-র ২০শে জানুয়ারী থেকেই কেবল পাওয়া যায়।

তমলুক শহরটি রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত এবং যা কলকাতা থেকে প্রায় ৮৫ কি.মি. এবং হলদিয়া থেকে ৫০ কি.মি.। এই শহরটি রেলওয়ে এবং জাতীয় হাইওয়ের দ্বারা সংযুক্ত। শহরের সমগ্র এলাকা প্রায় ১৭৮৬ কিলোমিটার। অবশ্য শহরের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভার আয়তনও বেড়ে চলেছে।

তমলুক পৌরসভার ২০০০ সালে নির্বাচন পর্যন্ত ১৯টি ওয়ার্ড ছিল। ২০০৫ নির্বাচনের সময় (২২শে মে) তা বেড়ে ২২টি ওয়ার্ড করা হয়েছে। বর্তমান পীরসভার সাধারণ জনসংখ্যা ৫৯,১১২, তপশীলী জাতি - ৩৭১০, তপশীলী উপজাতি - ১৬১।

২০০০ সালের ১৯টি ওয়ার্ডের ফল ছিল — তৃণমূল কংগ্রেস-৮, বি.জে.পি-১, কংগ্রেস-২, বামফ্রন্ট-৫, নির্দল-৩। ২০০০-এ প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড তৈরী করে। রবীন্দ্রনাথ সেন চেয়ারম্যান হন। পরে রবীন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাঁকে অপসারিত করা হয় এবং বামফ্রন্টের সমর্থনে অশোক অধিকারী চেয়ারম্যান হন এবং ধনঞ্জয় মাইতি ভাইস চেয়ারম্যান হন। অশোক অধিকারীর মৃত্যু হলে বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী পৃথ্বীশ নন্দী চেয়ারম্যান হন এবং বাকি কয়েকমাস তিনি চেয়ারম্যান পদে আসীন ছিলেন।

২০০৫-এ যে ২২টি ওয়ার্ডের নির্বাচন ২২শে মে অনুষ্ঠিত হয় তাতে ত্রিশঙ্কু অবস্থা সৃষ্টি হয়। বামফ্রন্ট সমর্থিত ১১ এবং অন্য গোষ্ঠীও ১১ পায়। ফল হল নিম্নরূপ ঃ তৃণমূল কংগ্রেস-৮, সি.পি.এম-৩, সি.পি.আই-২, সি.পি.এম সমর্থিত নির্দল-৬, কংগ্রেস-২, কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল-১।

যেহেতু বামফ্রন্ট ও বামবিরোধী গোষ্ঠী সমান সমান হয়, তাই মহকুমা শাসক কাউন্সিলদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর চেয়ারম্যান পদ পূরণের উদ্দেশ্যে সভাপতি

নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। বামফ্রন্ট থেকে জগন্নাথ মিত্র সভাপতি পদে এবং বামবিরোধী গোষ্ঠী থেকে সুখিয়াবিবি প্রার্থী হন। এখানেও ১১-১১ হওয়ায় মহকুমা শাসক লটারি করেন এবং সেখানে বামফ্রন্ট প্রার্থী জগন্নাথ মিত্র সভাপতি পদে জয়ী হন। এরপর চেয়ারম্যান পদের জন্য ভোট নেওয়া হয়— বামফ্রন্ট থেকে চেয়ারম্যানের প্রার্থী হন পৃথ্বীশ নন্দী ও বামবিরোধী দল থেকে চন্দন প্রধান দাঁড়ান। এখানেও ১১-১১ হয় এবং তখন সভাপতি জগন্নাথ মিত্রর কাস্টিং ভোটে পৃথ্বীশ নন্দী চেয়ারম্যান হন। এরপর চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পদে কবিতা মিত্রকে নিয়োগ করেন।

এই ২২শে মে, ২০০৫-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে যে বিষয়গুলি নির্বাচনের আগে প্রাধান্য পায়, তাহল — (১) বামফ্রন্টে ঐক্য হয়নি। ২, ৮, ১৩, ১৬, ১৭, ২২নং ওয়ার্ডে সি.পি.আই প্রার্থীর বিরুদ্ধে সি.পি.এম নিজে প্রার্থী দেয়নি। কিন্তু 'উদীয়মান সূর্য' এই প্রতীকে প্রার্থী দাঁড় করায়। মূলত সি.পি.এম সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ এব্যাপারে উদ্যোগী হন। সি.পি.আই নেতা, জল সম্পদ মন্ত্রী (পঃবঃ) নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বলেন সি.পি.এম-এর কিছু নেতার দাদাগিরির জন্য বাম ঐক্য হয়নি। লক্ষ্মণ শেঠের বক্তব্য হলো যাদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী তাদেরই প্রার্থী করা হয়েছে। লক্ষ্মণবাবুর কৌশল সফল হয় এবং সি.পি.এম সমর্থিত 'উদীয়মান সূর্যের' প্রতীকে ৬ জনই জয়লাভ করেন। যদিও সি.পি.এম ৫নং ও ১৪নং ওয়ার্ডে সি.পি.আই প্রার্থী যথাক্রমে কবিতা মিত্র ও জগন্নাথ মিত্রর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়নি। ১০নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের রবীন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দেওয়া হয়নি।

(২) সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ 'হলদিয়া তমলুক উন্নয়ন পর্ষদ' গঠনের প্রস্তাব আনেন এবং ফেব্রুয়ারী ২০০৫-এ পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে তা পাঠানো হয়। এর বিরোধিতা করে তমলুকের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'তমলুক উন্নয়ন পর্ষদ' গঠন করতে আপত্তি নেই জানান। এই যুগ্ম পরিষদ হলে তমলুকের উপর হলদিয়ার আধিপত্য দেখা দেবে বলে তাঁদের আশঙ্কা। লক্ষ্মণবাবুর বক্তব্য হলো হলদিয়া শিল্পনগরীর স্বার্থেই তমলুক পৌরসভার পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন।

(৩) তমলুক থেকে নিমতৌড়িতে প্রশাসন, কাছারী, আদালত, পুলিশ লাইন প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে যওয়ার জন্য যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর বিরুদ্ধে বাম বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার নেয় এবং নির্বাচনে এটি একটি অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। আগের সি.পি.এম-এর বাম পৌর বোর্ড এই ৫ কি.মি. দূরে নিমতৌড়িতে প্রশাসন সরানোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। সি.পি.এম ও পৌরসভার বাম বোর্ডের বক্তব্য হলো এর ফলে এক জায়গাতে লোকে সব কাজ সেরে নিতে পারবে।

তমলুকের বিশিষ্ট নাগরিকেরা এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো তমলুকেই প্রশাসনের বিস্তার ঘটানোর সিদ্ধান্ত আগেই গ্রহণ করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসনের দপ্তরটিকেও এর জন্য চারতলা করা হয়। তাছাড়া এই প্রশাসনিক কার্যালয় সংলগ্ন ২০ একর জমিতে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি রয়েছে— এখানেই এর সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। নিমতৌড়িতে পঞ্চায়েতের জায়গা কিনে নতুন করে বাড়ী করা অপচয়ের নামান্তর। এছাড়া সবই যদি নিমতৌড়িতে চলে যায় তাহলে তমলুকের গুরুত্ব হ্রাস পাবে। এছাড়া তমলুক ষ্টেশনের পাশেই জেলা প্রশাসনের অফিস। তাই জেলার অন্য এলাকায় লোকের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

**সাধারণ সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প ঃ—** (১) তমলুকের জল সংকট গ্রীষ্মে তীব্র হয়। ১৪টি পাম্পের সাহায্যে ডিপটিউবওয়েলের মারফৎ জল সরবরাহের ব্যবস্থাতে সমস্যা মিটছে না। তাই তমলুকের অদূরে রূপনারায়ণ নদী থেকে জল এনে তা শোধন করে জল সঙ্কট মেটানোর প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও তা বাস্তবায়িত হয় নি।

২) জল নিকাশীর ব্যবস্থাও শঙ্করআড়ার এবং নারায়ণপুলের খালের সঙ্গে নালাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে, পলিমাটি সরাতে হবে। সারা শহরের খোলা ড্রেনগুলির সংস্কার দরকার। সর্বোপরি একটি সার্বিক নিকাশী ব্যবস্থার পরিকল্পনা নিতে হবে।

৩) বর্গভীমা মন্দিরের কাছে বিয়ের মরশুমে যে যানজট হল তার কারণ গাড়ীগুলিকে পার্কিং জোন বুদ্ধপার্কের কাছ পার্ক করা হচ্ছে না। এছাড়া স্কুল টাইমে সাগুনাময়ী গার্লস স্কুল থেকে হরির বাজার পর্যন্ত অংশে জ্যাম হয় এবং এর অন্যতম কারণ হলো নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে চারচাকার ঐ সব নিষিদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ। এই অন্যায় ব্যবস্থা কঠোর ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং করতে হবে এবং স্কুলের সময় চারচাকার গাড়ী ওখানে যাতে না ঢোকে সে সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪) তমলুক পৌরসভার সংলগ্ন মেডিকেল ক্লিনিক যা রবীন্দ্রনাথ সেনের আমলে চালু হয়েছিল এবং পরে অশোক অধিকারীর সময়ে যা বন্ধ হয়ে যায়, তা আবার ২০০৫ এর নির্বাচনের আগে চালু হয়েছে। রাত্রিতে ডাক্তার নিয়োগ করা হবে। স্বল্প ব্যয়ে প্যাথলজি ও X-ray-র ব্যবস্থা সুলভ মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৫) এছাড়া পৌরসভার নিজস্ব কোন হাউসিং কমপ্লেক্সের প্রকল্প নেই। মেথরপাড়া

সহ অন্যান বস্তি বা যেখানে প্রয়োজন সেখানে চারতলা বাড়ী তৈরী করা হলে বাসস্থানের যেমন সমস্যা মিটবে তেমনি বস্তির অপসারণে পরিবেশও উন্নতি হবে।

এছাড়া বেশ কিছু প্রকল্প আগের বোর্ড যা গ্রহণ করেছিল সেই বোর্ডই বর্তমানে ক্ষমতায় আসায় সেগুলি কার্যকরী দ্রুত হবে বলে আশা করা যায়। এগুলি হলো—

(১) সুবর্ণজয়ন্তী হল তৈরী করা, বুদ্ধপার্ক তৈরী সম্পূর্ণ করা -এর জন্য হাওড়ার একটি বেসরকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলি তৈরী করে পৌরসভার হাতে তুলে দেবে। এর বিনিময়ে তাদের ১০ বিঘা জমি দিতে হবে। সেখানে বাজারসহ বাসস্থান, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি তৈরী হবে— এর ২৩% পৌরসভা ও ৭৭% ঐ বেসরকরী সংস্থা লাভ করবে।

(২) তমলুককে IDSMT প্রকল্পর আওতায় আনা হয়েছে বলে পঃবঃ সরকার ঘোষণা করেছেন এবং এর স্থান হলো ২৮ নম্বরে। এ ব্যাপারে পঃবঃ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে।

(৩) এছাড়া মেছো বাজারে চারতলা কমপ্লেক্স, শহরের সর্বত্র সুলভ শৌচালয়, বিভিন্ন ওয়ার্ডে পার্ক, শপিং মল, মানিকতলার কাছে ডরমিটারী, রেষ্ট হাউস, চড়াল রেষ্ট হাউস, দমকল ব্যবস্থা, ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন। মানিকতলা থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত উন্নত ড্রেন ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রকল্প রয়েছে। আবার ১০ টাকার বিনিময়ে প্রতিটি বাড়ীতে নেম প্লেট লাগানো হবে, OBC দের ৫ টাকা লাগবে।

হলদিয়া, নিমতৌড়ী, তমলুককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিরোধকে পরিহার করতে হবে। তমলুকের ঐতিহ্য, পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে কিছু করা যাবে না। নিমতৌড়িতে পুলিশ লাইন যেতে পারে; ভাল আবাসিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, হাউজিং কমপ্লেক্স, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবর্ত্তন হোক। আর অটো রিক্সা চালু করে সস্তায় দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা পৌরসভা ও শহরকে এবং তার প্রান্তিক এলাকাগুলিতে চালু করা হোক। প্রয়োজনে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হোক যাতে ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা থাকবেন।

# পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার — একটি সমীক্ষা

শমিতা সিন্‌হা

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্রস্টা হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর মত বিশাল পান্ডিত্য এবং দক্ষতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতদের মধ্যে শুধু কম লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাই নয়, তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পন্ডিতদের মধ্যেও তেমন দেখা যায়নি। একথা সত্যি যে মৃত্যুঞ্জয়ের সমসাময়িক উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) এবং রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) রায় পরবর্তীকালে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় পান্ডিত্যের জন্য যে সম্মান পেয়েছিলেন তার গুরুত্বও কম নয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবোধ চন্দ্রিকা, হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি, বেদান্ত চন্দ্রি (১৮০৮), বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। ১৮০১ থেকে ১৮১৪ এর মধ্যে রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছিল দুটি মৌলিক গ্রন্থ এবং এই দুটি গ্রন্থ তাকে আধুনিক বাংলা গদ্যের পেশাদার লেখকদের অন্যতম পথিকৃৎ বলে চিহ্নিত করেছে।

রামমোহন রায় ১৮১৫ তে **বেদান্ত গ্রন্থ** রচনা করার আগেই রামরাম বসু, কেরী, গোলোক শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণি চরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চন্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি এবং হরপ্রসাদ রায় বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে অনেক উচ্চমানের ছিল। তবে তাঁর গদ্যের ভাষা একেক রচনায় ছিল একেকরকম। অনেক সময় কোন একটি রচনার মধ্যেও বিভিন্ন গদ্যরীতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের সর্বপ্রথম রচনা ***বত্রিশ সিংহাসন*** ১৮০২-এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ খুব সহজ বংলায় লেখা রাজা বিক্রমাদিত্যের ওপর লোককথা। এই গ্রন্থের দু এক পংক্তির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। "অবন্তী নামে নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অভিষেককালে শ্রী বিক্রমাদিত্য নামে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন।"[১]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে যারা পাঠ্যপুস্তক রচনা করবেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

মৃত্যুঞ্জয় সেই সময় কলেজের বাংলা সংস্কৃত বিভাগে কেরীর প্রধান পন্ডিত ছিলেন। তিনি **বত্রিশ সিংহাসন** রচনা করেন। এই গ্রন্থটি কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত হয়। উইলিয়ম কেরী এই গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক বলে উল্লেখ করেন এবং কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি চার্লস রথম্যানকে এই গ্রন্থ রচনার জন্য লেখককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে অনুরোধ করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ মৃত্যুঞ্জয়কে ২০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।[২]

মৃত্যুঞ্জয়ের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ **রাজাবলি** ১৮০৮-এ রচিত। এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্র থেকে পলাশী পর্যন্ত হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগের রাজা রাজরা এবং বিভিন্ন বীরপুরুষদের কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। রাজাবলি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থে বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ, অশোক, ইন্দো-গ্রীক, ব্যাক্ট্রিয়ানদের শাসনকাল বা গুপ্তযুগ সম্পর্কে প্রায় কিছুই আলোচিত হয়নি। এই গ্রন্থে তিনি সেনরাজা এবং বিক্রমাদিত্যকে দিল্লীর সম্রাট বলে উল্লেখ করেছেন। "এইরূপে বিক্রমাদিত্য দিল্লীর সিংহাসনে বসা অবধি বিক্রমসেনের সাম্রাজ্য সমাপ্ত পর্যন্ত ৯৩ তিরানব্বই বৎসর গত হইল। এই বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যবিধি ১৩৫ একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর গত হইলে শালিবাহন রাজার সন্তানেরা তাঁহার শক প্রবৃত্তি করিল।"[৩] রাজাবলিতে সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং যেখানে তিনি মুসলমানের ইতিহাস লিখেছেন সেখানে ফার্সী শব্দের অনেক প্রয়োগ করেছেন। "দক্ষিণে (৯) নয় সুবা ও উত্তরে (১) এক সুবা ও পূর্ব্বে (৩) তিন সুবা ও পশ্চিমে (৮) আট সুবা ও শাহজাহানাবাদ (১) এক সুবা হইতে আলমগীর বাদশাহের অতিবড় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য হইল প্রায় রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমন ঐশ্বর্য ও প্রতাপ কোন ২ দিল্লীর রাজার হয় নাই নিত্য জিলোখানাতে সশস্ত্র হইয়া পঞ্চাশ হাজার সওয়ার প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত হাজির থাকিত সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্যন্ত অন্য পঞ্চাশ হাজার সওয়ার এইরূপে নিত্য হাজির থাকিত।"[৪] তার মতে মারাঠারা ছিল বিদেশী দস্যু এবং তিনি তাদের আক্রমণকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেইযুগে বাস করতেন যখন ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক এবং জাতীয় চেতনা ছিলনা বলা চলে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় আধিপত্য স্থাপন পর্যন্ত তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ***হিতোপদেশ*** রচিত হয়েছে সহজ সংস্কৃতাশ্রয়ী রীতিতে। ১৮১৩ তে লেখা ***প্রবোধচন্দ্রিকা*** বাংলা সাহিত্যে তার একটি অবদান। এটি সমগ্র হিন্দু সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাঁর মধ্যে প্রচলিত উদাহরণ ও ক্ষুদ্র সত্য কাহিনীর উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা আছে। কেরীর মতে এটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে খুব প্রয়োজনীয় হবে।

***প্রবোধচন্দ্রিকার*** মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা আছে। লেখক এখানে বিভিন্ন রচনা রীতির প্রয়োগ করেছেন। কোথাও সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অমার্জিত ভাষার প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু এক রচনায় আবার কৌতুকরস বোধের প্রয়োগও দেখা গেছে। "ওরে ছোটলোকের বাইড় হইলে এমনি হয় যেমন পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ ও পালক উঠিলে পিপীলিকার অর্থাৎ পিপড়ার আকাশের উপর উঠা। তাকে আমাকে দেখাইতে পারিবা। ব্যাঘ্রী কহিল তার আটক কিসে সর্ব্বনেশে গোশাতে হন হন করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড় চক্ষু কন কন যখন করে তখন ভয়েতে খোকাখুকি গুলির চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়ে ও আমার প্রাণ ধড়ফড় করে গা থরথর সরসর ও জরজর করে যদি দৈবাৎ কদাচিৎ অল্প মাংস দি তবে ফর ফর করিয়া ফিরিয়া যায় আবার আপনিই খরখর করিয়া আইসে।"[৫] এই গ্রন্থের অন্য অংশে আবার সংস্কৃতের ব্যবহার করেছেন। ফলে অনেক সময় তা ছাত্রদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

১৮১৭-এ মৃত্যুঞ্জয় ***বেদান্তচন্দ্রিকা*** রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্রাহ্ম মতবাদের সমালোচনা করেছেন। অন্যান্যরা ব্রাহ্ম মতবাদের সমালোচনা করলেও মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা ছিল বিস্তৃত। বেদান্ত চন্দ্রিকার অর্থ বেদান্তর চন্দ্রকিরণ, এ গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃতাশ্রয়ী।

মৃত্যুঞ্জয়ের **বেদান্ত চন্দ্রিকা** পড়ে মনে হয় যে তিনি পুরাণ এবং বেদান্তর উপদেশ শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেননি। তিনি মূর্তি পূজারও সমর্থক ছিলেন। বেদান্ত চন্দ্রিকাতে তিনি হিন্দু ধর্মকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তার মতে বেদান্ত যুগের সাথে পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের পরিবর্তনের কোন বিরোধিতা ছিল না। তিনি রামমোহন রায়কে আক্রমণ করেছেন এবং রামমোহন রায় ও তার অনুগামীদের "intoxicated moderns" বলেছেন। তার মতে বেদান্তর মত পবিত্র সাহিত্য তারই ব্যাখ্যা করা উচিৎ যে এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভাসা ভাসা জ্ঞান সম্পন্ন হয়েও মিথ্যা ঐশ্বরিক জ্ঞানের যে দাবি কার সে শুধু লিখনে অপমিশ্রণ করে মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তির শুধুমাত্র ঈশ্বরের আকৃতি নিয়ে মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। মৃত্যুঞ্জয় একথা বিশ্বাস করতেন যে মূর্তি পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা আসলে অসম্পূর্ণভাবে দেবতার অর্চনা। কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে, এই অসম্পূর্ণতা মানুষের কোন ক্ষতি করেনি।

মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের মত বিশ্বাস করতেন যে একটা পাথর বা কাঠের টুকরো কখনও ঈশ্বর নয়। তিনি বলেছেন যে ঈশ্বরের উপাসনায় কোন মাধ্যম থাকা মনসংযোগের জন্য প্রয়োজন। রামমোহন মূর্তি পূজাকে অশুভ বলেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বলেছেন উপাসনার জন্য মূর্তি প্রয়োজনীয় প্রতীক। তিনি বলেছেন, যে বেদে বলা

হয়েছে যে ঈশ্বরের থেকে স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণাকে যে বিশ্বাস করে সে বিপন্ন এবং কখনও তার পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।[৬]

মৃত্যুঞ্জয় শুধুমাত্র গ্রন্থ রচনাই করেন নি, উইলিয়ম কেরীকেও গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। সংস্কৃতে রচিত উইলিয়ম কেরীর ***হিতোপদেশ*** ১৮০৪-এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল। কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৮০৬ এ রচিত হয়। এ ব্যাপারেও মৃত্যুঞ্জয় অনেক সাহায্য করেছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামনাথ বাচস্পতির সাহায্যের উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে যা বিশেষভাবে বলা যায় তা হল বেদান্ত ও উপনিষদের চর্চা ও অধ্যাপনা যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল সেই সময় অল্পসংখ্যক পণ্ডিত এই দুটি বিষয়ে অনুশীলন ও অধ্যাপনা করেছিলেন, তার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও ছিলেন।

গদ্য রচনা ছাড়া আরেকটি বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ করা যায়। সহমরণ প্রথা শাস্ত্রীয় কি না, তা নিয়ে যখন প্রবর্ত্তক ও নিষেধক, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের শেষ ছিল না, তারও পূর্বে মৃত্যুঞ্জয়ের মত একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনের অকৃত্রিম উদারতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে সংস্কৃত ভাষায় যে মত ব্যক্ত করেছিলেন, নিষেধকেরা তাই মূল প্রমাণ স্বরূপ মান্য করেছিলেন। রামমোহন তাঁর Some Remarks etc গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয়ের মতকেই প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মূল সংস্কৃত লেখা আর পাওয়া যায় না, তবে অক্টোবর ১৮১৯ এর ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া পত্রিকায় এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৭] এখানে মৃত্যুঞ্জয় সতীদাহর বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।

Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act, and a life of abstinence and chastity as highly excellent.

ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সম্পর্কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। ১৮৭৩ এ রামগতি তাঁর *বাংলা ভাষা* ও *বাংলা সাহিত্য* বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে লিখেছেন যে ***প্রবোধ চন্দ্রিকা*** গ্রন্থের রচনা অনাবশ্যক দীর্ঘ এবং এর মধ্যে যৌগিক শব্দের ব্যবহার খুব বেশী। এ গ্রন্থে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। লেখা অনেক সময় বোধাতীত বলেও তিনি সমালোচনা করেছেন।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর বাংলাভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকায় বলেছেন যে

রামমোহনের আগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার রচনাশৈলী নিকৃষ্ট এবং এই সব গ্রন্থের মধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। রামমোহনই প্রথম প্রাঞ্জল ভাষায় গদ্য রচনা শুরু করেন। সুতরাং রাজনারায়ণ বসুর মতে বাংলা গদ্যের স্রষ্টা রামমোহন। দীনেশ সেন বলেছেন রামরাম বসু ফর্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর *রাজা প্রতাপাদিত্য* চরিত্র গ্রন্থে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যবহৃত বাংলাও ব্যবহার করেছেন। রামরাম বসু *রাজা প্রতাপাদিত্য* **চরিত্রর** মধ্যে যে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃতাশ্রয়ী বাংলার চেয়ে গ্রহণযোগ্য।

সুশীল কুমার দে তাঁর History of Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থে লিখেছেন যে মৃত্যুঞ্জয়ের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রবোধচন্দ্রিকা সমস্ত রকম শৈল্পিক গুণ বর্জিত অর্থাৎ তার মধ্যে সুষমতা নেই, রচনা সুবিন্যস্ত নয়। তিনি মনে করেন যে এর মধ্যে আকস্মিক ও হাস্যকরভাবে কষ্টকৃত পন্ডিতি ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে জনসাধারণের প্রচলিত ভাষার ব্যবহার হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের লেখা সম্পর্কে একেবারে অন্যমত পোষণ করেছেন বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী। তিনি বলেন যে প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা নয়। তিনি কাব্যাদর্শ ও দন্ডীর কিছু সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে এই গদ্য রচনা করেছেন কিন্তু এর সাথে তিনি দন্ডীর কাব্যের ছন্দ এবং ভাগ ব্যবহার করেননি। তিনি কখনও একে গদ্য রচনার আদর্শ রীতি মনে করতে পারেন না। একথা ভাবা সম্ভব নয় যে বাংলা গদ্য রচনা সম্পর্কে মৃত্যুঞ্জয়ের এই ধারনা ছিল যে তা সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ ভেঙ্গে রচনা করা যায়; কারণ বীরবলের মতে মৃত্যুঞ্জয় শুধু প্রথম মার্জিত এবং সুন্দর বাংলা গদ্য রচনা করেননি তিনি কথ্য বাংলায় আদর্শ গদ্য রচয়িতা। একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যে কথ্য বাংলা ছিল বলিষ্ঠ ও সাবলীল।

বীরবলের এই মত পরবর্তীকালে সমর্থন করেছেন সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে বাংলা গদ্য যখন তার শৈশব অবস্থায় ছিল তখন মৃত্যুঞ্জয় বিভিন্ন গদ্য রীতি প্রয়োগ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। একথা সত্যি যে একজন বড় মাপের সংস্কৃত পন্ডিত হওয়ার ফলে তিনি বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করেছেন কিন্তু তিনি খাঁটি বাংলা রীতিও প্রয়োগ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ই প্রথম একজন যিনি সাধু ভাষার সাথে কথ্যভাষার পার্থক্য বুঝতে পেরেছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছেন যে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি তার কারণ তাঁর ধর্মীয় ভাবনা। তাঁর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ রামমোহন

এবং অন্যান্যরা প্রগতিশীল ধর্মীয় চিন্তা করতেন বলে মনে করা হত। ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধক চরিতমালায় রামমোহন জীবনীর ওপর লিখতে গিয়ে বলেছেন যে রামমোহনের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে রামমোহনের কৃতিত্বকে একটুও ছোট না করে বলা যায় যে সংস্কৃতাশ্রয়ী বাংলা হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যের স্রষ্টা মৃত্যুঞ্জয়।[৮] সজনীদাস বলেন যে মৃত্যুঞ্জয়ের ***প্রবোধচন্দ্রিকায়*** কথ্য সাধু, সংস্কৃতাশ্রয়ী বাংলার উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু এই পন্ডিতের কথ্যরীতির ব্যবহারের ঝোঁক ছিল। তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পীর সম্মান দেওয়া উচিৎ। মৃত্যুঞ্জয়ের সাধু বাংলা ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগরী বাংলায় উন্নীত হয়েছিল। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনী দাসের পরবর্তী সাহিত্য সমালোচকরা তাদের মতকে সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে সমালোচক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে মৃত্যুঞ্জয় সত্যিই বাংলা সাহিত্যের একজন দক্ষ শিল্পী। সংস্কৃতাশ্রয়ী রচনাশৈলী এবং যৌগিক সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও তার কাব্যগুলি দুর্বোধ্য নয়। সজনীকান্তের মত তিনি মন্তব্য করেছেন যে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় বিদ্যাসাগরীয় বাংলার বীজ নিহিত ছিল।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় কোথাও পরিষ্কারভাবে বলেননি যে মৃত্যুঞ্জয় গদ্যরচনার রীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন কিংবা তার কথ্য বাংলার ওপর বিশেষ কোন আসক্তি ছিল। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে মৃত্যুঞ্জয় তার শিল্পবোধ দিয়ে উইলিয়ম কেরীর *কথোপকথন* এর স্থূল, অমার্জিত এবং কঠিন বাংলাকে মনোরম রচনায় পরিবর্তিত করেছেন।[৯]

**হিতোপদেশের** ভাষা সংস্কৃতাশ্রয়ী এবং অনেক সময় তা সংস্কৃতর আক্ষরিক অনুবাদ। আধুনিক বাংলা গদ্যের সাথে এর খুব কম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের অন্যান্য রচনার চেয়ে এই গ্রন্থ অনেক সুপাঠ্য। *রাজাবলিতে* মৃত্যুঞ্জয় আগাগোড়া একই রচনা রীতি ব্যবহার করেননি।

***প্রবোধচন্দ্রিকা*** গ্রন্থের ভূমিকায় মৃত্যুঞ্জয় বলেছেন যে সংস্কৃত সমস্ত ভাষার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ভাষা। সুতরাং আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে তাঁর বাংলা রচনা সংস্কৃতাশ্রয়ী হতেই পারে। তাঁর গ্রন্থ **বেদান্তচন্দ্রিকার** শেষে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনকে কথ্য বাংলায় বেদান্ত রচনা করার জন্য আক্রমণ করেছেন। ***প্রবোধচন্দ্রিকার*** দ্বিতীয় অংশের শুরুতে মৃত্যুঞ্জয় বিভিন্ন বাংলায় বিভিন্ন রীতিতে বাক্য রচনা সম্পর্কে লিখেছেন এবং তার দোষগুণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

একথা সত্যি যে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর ***প্রবোধচন্দ্রিকা*** গ্রন্থে মাঝে মাঝে কথ্য বাংলা ব্যবহার করেছেন কিন্তু এর কারণ খুঁজতে হলে তাঁর রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে হবে। ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য এই

পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। উনিশ শতকের ৭০ এর দশক পর্যন্ত ***প্রবোধচন্দ্রিকা*** বাংলায় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই গ্রন্থের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে সতীদাহ প্রথা রদ এবং রামমোহন রায়ের মতকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ এই সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে পথ প্রদর্শক বলেছেন। তিনি ছিলেন অন্যতম যিনি মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদ ভেঙে ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন একজন বাস্তববাদী পন্ডিত। তাঁর সাথে সংসার অনভিজ্ঞ পন্ডিত বুনো রামনাথের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং পরবর্তীকালের বিদ্যাসাগরের সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। মৃত্যুঞ্জয় মাসিক ২০০ টাকা বেতন পেতেন। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য আয়ও ছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রবর্তকরা আত্মত্যাগকে খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের জীবনের অঙ্গ বলে মনে করতেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে একটা কঠিন মনোভাব ছিল। সংস্কৃতকে তিনি মাতৃভাষার মত শ্রদ্ধা করতেন। নিজের ভাষা সম্পর্কে তার এই মনোভাব একজন স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতামুক্ত উচ্চশ্রেণীর রচয়িতার মধ্যে থাকতে পারে যাকে অনিচ্ছাভরে আঞ্চলিকভাষা ব্যবহার করতে হয়েছিল। ভাষা সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে এটি সহায়ক হয়েছিল।

পন্ডিতদের এইভাবে ভাষার ব্যবহার শেষ পর্যন্ত ফল দিয়েছিল এমনকি খাঁটি বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। যেখানে রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীদের ভাষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষার মধ্যে মিশে গিয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য আরেকটি সমান্তরাল বাংলাভাষা সৃষ্টি করেছিল। এই প্রবণতার পরবর্তী ধারক ছিলন সুরেশ সমাজপতি যিনি বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করেছিল।

রামমোহন রায়ের মত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বৈদিক পন্ডিত হিসাবে স্বতন্ত্র ছিলেন। বৈদিক শিক্ষার অনুশীলনে হিন্দু সমাজ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাছেই প্রেরণা পেয়েছিল।

মৃত্যুঞ্জয় হিন্দুত্ববাদের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন এবং এর মধ্যে বিশ্বজনীন উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তিনি হিন্দুত্ববাদকে বেদান্তচন্দ্রিকায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিভিন্নতার মাঝে এই ঐক্যের সন্ধান বাংলার নবজাগরণের বিশিষ্টতম প্রবণতা।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ


১। ড. ভূদেবচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনাবলী, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৪।

২। Samita Sinha, Pandits in a changing Environment, Kolkata, 1993, p. 95.

৩। ড: ভূদেবচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনাবলী, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৫১।

৪। ঐ - পৃষ্ঠা ১৯০।

৫। ঐ - পৃষ্ঠা ৩০৫।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৩৯, পৃ. iii-iv.

৭। Friend of India, October 1819, No. XVIII, P. 48.

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃষ্টা. ৭৬।

৯। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন, ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১০৯-১১০।

# উনিশ শতকের মেদিনীপুরের শিক্ষাচিত্র ও শিক্ষাবিদ রাজনারায়ণ বসু

সুজয়া দে (সরকার)

মেদিনীপুর শহরে জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসাবে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬খৃঃ-১৮৯৯খৃঃ) এসেছিলেন ১৮৫১খৃঃ। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে এই অঞ্চলে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি গড়ে উঠলেও মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর মূল সংস্কার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল শিক্ষাসংস্কারকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের মেদিনীপুরের শিক্ষাচিত্রে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটেছিল তাঁর প্রচেষ্টায়। শুধুমাত্র মৌখিক বাগাড়ম্বর নয়, লক্ষ্য পুরণের জন্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ—মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার গন্ডীকে আবদ্ধ না রেখে বহমানতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে। তাঁর বিভিন্ন উদ্যোগগুলি এখনও পর্যন্ত প্রায় অনালোচিত। কলকাতার তৎকালীন আধুনিক শিক্ষার দুই পীঠস্থান হেয়ারস্কুল ও হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র এই যুবক শিক্ষাবিদ মাত্র ২৫ বছর বয়সে মফস্বল অঞ্চলে চাকরি করতে এসে চাকরিটিকেই একমাত্র মনে করেননি, চেয়েছিলেন এই মফস্বল অঞ্চলের শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। তাঁর এই চেতনার পশ্চাতে কাজ করেছিল সম্ভবতঃ তাঁর নিজের পাঠ-গ্রহণ-প্রক্রিয়ার বিড়ম্বনা। তাঁর জন্মস্থান গন্ডগ্রাম বোড়াল থেকে তাঁকে যেতে হয়েছিল কলকাতায় আধুনিকমানের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য। মফস্বল মেদিনীপুর শহরের শিক্ষার্থীদের যাতে উপযুক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য দূর-দূরান্তে ছুটে যেতে না হয়, তার জন্য তিনি গঠন করতে চেয়েছিলেন এখানে আধুনিক শিক্ষার বাতাবরণ ও প্রতিষ্ঠান। মেদিনীপুরের শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনারায়ণের তিনধরণের রূপ লক্ষ্য করা যায়- শিক্ষক, প্রধানশিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, আবার এই তিনটি রূপের মধ্যেই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর শিক্ষাসংস্কারক রূপটি।

রাজনারায়ণ বসু যখন মেদিনীপুরে এসেছিলেন তখনকার মেদিনীপুরের শিক্ষাচিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। ১৮০২ খৃঃ এইচ.স্ট্র্যাচি-র প্রতিবেদনে সাধারণ জনগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহকে প্রায় অনুপস্থিত

বলা হয়।[১] ১৮৫২খৃঃ মেদিনীপুরের কালেকটর এইচ.ভি.বেলী-র প্রতিবেদনে বলা হয় যে মূলতঃ নতুন সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিবেচিত হওয়ায় জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।[২] এই পরিস্থিতিতে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসেবে রাজনারায়ণ যোগদান করেন ১৮৫১খৃঃ।[৩] মেদিনীপুরে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর যে উদ্যোগগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল: জেলা স্কুলের সংস্কার সাধন, নারীশিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টা ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, গভর্মেন্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা, শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনাসভা স্থাপন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা, স্থানীয় সংবাদপত্র প্রকাশে সহায়তা ইত্যাদি।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে রাজনারায়ণের সময়কালে মেদিনীপুর স্কুলের লক্ষনীয় উন্নতি ঘটেছিল। ১৮৩৪খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের চতুর্থতম প্রধানশিক্ষকের পদে যোগদান করেছিলেন তিনি। জেলা স্কুলে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনিই। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি ছিল আকর্ষণীয় ও অভিনব। তাঁর শিক্ষকদের প্রভাব ও তাঁর নিজের শিক্ষাগ্রহণপ্রণালী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই ধরণের পন্থা অনুসরণ করতে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাপ্রদ গল্পের অবতারণার বা কোন শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার জন্য ঐ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর উত্থাপনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থ উদঘাটন- এ সমস্তই তিনি শিক্ষাদানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে অনুসরণ করতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা থাকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতার মতো, যা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের 'বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও বক্তৃতাশক্তি' বৃদ্ধির জন্য তিনি ছাত্রদের নিয়ে বিতর্কসভা গড়ে তুলেছিলেন।[৪] যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর জ্যেষ্ঠতাত অন্নদাচরণ বসুর বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন রাজনারায়ণের পাঠদানের গভীরতা ছাত্রমানসে কত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৫] পাঠ্যপুস্তক ছাড়া প্রতিটি ছাত্রকে অন্য কোন নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠের নির্দেশও দেওয়া হত, যার ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষাগ্রহণ করে নম্বর প্রদান করা হত।

নিয়মিত বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরশিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠনের জন্যও রাজনারায়ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যা সেই যুগের পক্ষে ছিল নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। তিনি তাঁর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে তাঁর সমসাময়িক কালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ব্যায়াম শিক্ষার অভাব' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যে জেলাস্কুলের শিক্ষার্থীদের কথা বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে মেদিনীপুর জেলা স্কুল।[৬] এই

সমস্যা নিরসনের জন্য তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক, এক নতুন মাত্রার পরিচয়বাহী। তৎকালীন মেদিনীপুরের সেচবিভাগের কর্তা ক্যাপ্টেন বীডল সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারী উদ্যোগ ছাড়াই কেবলমাত্র অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দানে শিক্ষার্থীদের জন্য 'ক্রীড়াঙ্গন' (র‍্যাকেট কোর্ট) নির্মাণ এবং তাদের শ্রেণীকক্ষে বসার জন্য স্বাস্থ্যোপযোগী বেঞ্চ-টুলের ব্যবস্থার প্রচলন করেন তিনি। উচ্চতর কতৃপক্ষের কাছে অর্থভিক্ষার যুগে এ ছিল আত্ম-নির্ভরতার প্রতীক।[৭] ১৮৫২ খৃঃ থেকে আরম্ভ করে সমকালীন শিক্ষাবিষয়ক সরকারি রিপোর্টগুলিতে রাজনারায়ণ ও তাঁর স্কুলের সম্পর্কে সদর্থক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৫২খৃঃ সরকারি রিপোর্টে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মান সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে পরিদর্শকরা যে সন্তুষ্ট ছিলেন তা বোঝা যায়।[৮] ১৮৫৭-৫৮খৃঃ শিক্ষা বিষয়ক সরকারি রিপোর্টে প্রধানশিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।বলা হয়েছে যে বিদ্যালয়ের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন এবং এমনকি এই কারণে তিনি জেলাবাসীদের চোখে বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের চোখে রাজনারায়ণ বসু উচ্চমানের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বাস্তবরূপ প্রদানকারী।[৯]

১৮৫৭খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সময় মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে ১৮৫৯খৃঃ ৪জন শিক্ষার্থী এন্ট্রাস পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন, এঁরা হলেন অঘোরনাথ দত্ত, মধুসূদন রায়, নন্দলাল ঘোষ এবং অযোধ্যালাল পাল।[১০] ১৮৫৮-৫৯খৃঃ রিপোর্টে পরিদর্শক এইচ. উড্রো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শ্রেণীতে বিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব ঘোষণা করেন শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের সুবিধার্থে।[১১] শিক্ষাসম্পর্কিত পারস্পরিক আলোচনায় শিক্ষক এবং উচুঁ শ্রেণীর ছাত্রদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে রিপোর্টে প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমন্বয়ে বিদ্যালয়ে একটি দরিদ্র ভান্ডার খোলা হয়, যা ছিল তৎকালীন সময়ের স্বেচ্ছামূলক সেবার নিদর্শন।

রাজনারায়ণ যখন স্কুলে যোগদান করেন তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০, যখন ১৮৬৯খৃঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন তা হয়েছিল ৩০০।[১২]

তিনি যে তাঁর ছাত্রদের প্রতি কি ধরণের স্নেহশীল ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের লেখায়। মেদিনীপুর থেকে চলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পরে দেওঘরে অবস্থানকালে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের জনৈক ছাত্র (যাঁকে তিনি 'শ্রীযুক্ত ক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন) রাজনারায়ণের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, যিনি সেইসময় দেওঘরের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সাক্ষাতে রাজনারায়ণের প্রতিক্রিয়া তাঁর

প্রাত্যহিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, "পুরাতন ছাত্রদিগকে দেখিলে কি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়, অধিক বয়স্ক হইলেও বোধহয় যেন তিনি সেই অল্পবয়স্ক আছেন"।[১৩] প্রিয় ছাত্র ঈশানচন্দ্র বসুর সাহিত্যকর্মের পশ্চাতে প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল রাজনারায়ণ বসুর কাছে তাঁর পাঠগ্রহণের অভিজ্ঞতা।[১৪] এমনকি রাজনারায়ণের 'সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা' বিষয়ক বক্তৃতার লিখিতরূপ রেখেছিলেন তিনি, যার মাধ্যমে পরবর্তীকালে গ্রন্থরূপে এর প্রকাশ ঘটে।[১৫]

রাজনারায়ণ ব্যক্তিগত ভাবে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তাঁর এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মেদিনীপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে। শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের কাছে ঘুরে ঘুরে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৬১খৃঃ ১৯শে জুলাই শহরের মীরবাজারের হনুমানজীর চক্রের কাছে একটি ছোট বাড়ীতে রাজনারায়ণের একক উদ্যোগে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'অলিগঞ্জ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'-এর। সম্ভবত তৎকালীন হিন্দু স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয়ের নামকরণে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। মেদিনীপুর শহরে এটি প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, জেলার প্রথম দিকের বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম।প্রারম্ভিক পর্বে এটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। তৎকালীন সময়ের শহরের অভিজাত পরিবারের কন্যারা ছাত্রীরূপে এই বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণে এগিয়ে এসেছিল। রাজনারায়ণ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। মেদিনীপুর পৌরসভার রেকর্ড থেকে জানা যায় যে সেই সময় বিদ্যালয়টি বঙ্গীয় সমাজ কর্তৃক পরিচালিত হত।[১৬] তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পন্ডিতমশায় ও গুরুমা নামে পরিচিত ছিলেন। যেহেতু রাজনারায়ণ এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাই দীর্ঘদিন পরেও মেদিনীপুরের জনমানসে এই বিদ্যালয়ের গুরুত্ব ছিল স্বতন্ত্র। এক ছাত্রীর স্মৃতিকথায় জানা যায় যে তাঁর পিতামহ তাঁকে মিশনারি পরিচালিত স্কুল থেকে নিয়ে এসে এই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে ও আন্তরিকতায় নির্মিত হয়েছিল।[১৭]

শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে রাজনারায়ণের অন্যতম প্রচেষ্টা শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন। সম্ভবতঃ ১৮৫২-৫৩খৃঃ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যে ১৮৬০খৃঃ ২২শে জুন সোমপ্রকাশ পত্রিকায় মেদিনীপুরে শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখা হয়েছে- 'শ্রমজীবীদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটি রাত্রিকালীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসু এটির সম্পাদকীয় কাজের ভার গ্রহণ করেছেন'।[১৮]

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের অনুষঙ্গ হিসেবে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে স্থাপন করেছিলেন এই

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।[১৯] এই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ব্যাপারে রাজনারায়ণের ওপর দেবেন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ব্যক্ত হয়েছে ১৭৮২ শকের ২৫শে মাঘ কলকাতা থেকে লেখা এক পত্রে—"ব্রহ্ম বিদ্যালয় তোমার দ্বারা যেমন উন্নত হইবে, এমত আমি কেশববাবুর দ্বারাও আশা করিতে পারি না।" ১৮৫২-৫৩খৃঃ তিনি মেদিনীপুরে ধর্মালোচনা সভা, বিতর্ক সভা, সাহিত্য উৎসাহিনী সভা স্থাপন করেন।[২০] ব্রাহ্মধর্ম ভিত্তিক তাঁর লেখা দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ব্রহ্মসাধন' (১৮৬৬খৃঃ) এবং 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (১৮৫৩-১৮৬৬খৃঃ) -মেদিনীপুরে অবস্থানকালেই রচিত।

রাজনারায়ণ দীর্ঘদিন মেদিনীপুর গর্ভমেন্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সদস্য ছিলেন এবং এই বাংলা-মাধ্যম বিদ্যালয়টির উন্নয়নের স্বার্থে যে বিবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল, তাতে সমিতির সদস্য হিসেবে তাঁর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন- ১৮৫৯খৃঃ ১লা সেপ্টেম্বর সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করার, যা ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হত না। ১৮৬১খৃঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী রাজনারায়ণ ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের শিক্ষক মনোনীত হয়েছেন। এই সময়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত মিশনারি পরিচালিত ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রমশ যোগদানে ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ায় বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির উৎকণ্ঠার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, কারণ তা ছিল বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।[২১] বিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে প্রত্যাগত ছাত্রদের কোনরকম 'দন্ড' ছাড়াই বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার কথাও সমিতির অনুমোদন লাভ করে।[২২] এমনকি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছাত্রদের নামকর্তনের পরিবর্তে ভয়প্রদর্শনই বিধেয় বলে বিবেচিত হয় উপরোক্ত কারণে।[২৩] শুধুমাত্র পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবেই নয়, সময়বিশেষে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হতেন। ১লা আগষ্ট,১৮৫৯খৃঃ কার্যবিবরণীতে জানা যায়; "বর্তমান মাসে বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ জন্য শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তত্ত্বাবধায়ক নির্দিষ্ট হইলেন।"

মেদিনীপুর জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগার নির্মাণে দুজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—রাজনারায়ণ বসু এবং তৎকালীন জেলা কালেক্টর হেনরি ভিনসেন্ট বেলী। সম্ভাব্য সূত্র থেকে জানা যায় যে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৮৫১খৃঃ। প্রাচীন গ্রাম্য শহরে গ্রন্থাগার স্থাপন শিক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমপর্বে গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন রাজনারায়ণ। এই সময়ে তিনি মেদিনীপুর লাইব্রেরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ভিত্তিক লিখিত বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন।[২৪] এই গ্রন্থাগারের জন্য

নানাবিধ গ্রন্থ ক্রয় বা সংগ্রহ করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' পুস্তক প্রকাশিত হলে বেলী সাহেব যখন তা সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন তিনি। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণকে লিখিত অক্ষয়কুমারের পত্র থেকে এবিষয়ে জানা যায়। রাজনারায়ণের দৌহিত্রী বাসন্তী চক্রবর্তীর সংগ্রহ থেকে দুটি পত্রাংশ এবিষয়ে আলোকপাত করে- "বেলী সাহেবের নিকট হইতে 'মানব প্রকৃতির' প্রথম ভাগের মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি তাঁহাকে দ্বিতীয় ভাগ ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি কি তাহার কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। তথাকার যে যে মহাশয় প্রথম ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ গ্রহণ করিবেন না?-ইতি শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত (২৮ চৈত্র,১৮৫১)।"" মেদিনীপুরস্থ কার্ত্তিকবাবুর নিকট পাঁচখান এবং বেলী সাহেবের নিকট একখান 'বাহ্য বস্তু' প্রেরণ করিয়াছি। এতদিনে পৌঁছিয়া থাকিবেক।- ইতি শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত। (৩আষাঢ়,১৮৫২)

মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মেদিনী' (আশ্বিন ১২৮৬) পত্রিকার সঙ্গে রাজনারায়ণ যুক্ত ছিলেন। এর সম্পাদক ছিলেন তাঁর শিষ্য, ব্রাহ্ম অখিলচন্দ্র দত্ত। রাজনারায়ণের সাথে এই পত্রিকাটির যোগাযোগ সম্পর্কে জানা যায় 'সাধারণী' পত্রিকা থেকে, যেখানে এই স্থানীয় পত্রিকাটির প্রকাশের জন্য তাঁর বহুধরণের আন্তরিক উদ্যোগ ও অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] 'মেদিনী' পত্রিকাটির প্রকাশ অতি শীঘ্রই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে রাজনারায়ণ এক সুদীর্ঘ পত্রে লিখেছিলেন, "আমার একজন পরমপ্রিয় অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলে আমার যেরূপ ক্লেশ হয়, 'মেদিনী'-র ঐরূপ অবস্থাতে আমার সেইরূপ ক্লেশ হইতেছে।" তিনি শুধু নিজে অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করেই থেমে থাকেননি, যাতে 'মেদিনী' ঋণজাল থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় প্রকাশিত হতে পারে, তার জন্যও তিনি নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেছিলেন।[২৭]

উনিশ শতকের মেদিনীপুরে শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে রাজনারায়ণ যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেক্ষেত্রে তিনি মেদিনীপুরের বেশ কিছু ব্যক্তির সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়।[২৮] এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেলা স্কুলের হেডপন্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী। দেশীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণে উৎসাহী ইওরোপীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন বীডল, ডব্লিউ লুক , জি. এফ. ককবার্ণ।

মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডপন্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী বিভিন্ন ভাবে রাজনারায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন একটি গ্রন্থ 'সেই একদিন আর এই এক

দিন', যেখানে তাঁর আদর্শ ছিল রাজনারায়ণের 'সেকাল আর একাল'। ১৮৭৬খৃঃ কলকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করেছিলেন।[২৯] আবার মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভায় (যেটি রাজনারায়ণের মতে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম) গাওয়ার জন্য ভোলানাথ চক্রবর্তী সুরাপান-বিরোধী কিছু গানও রচনা করেছিলেন।[৩০]

রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে শিক্ষাপ্রসার সহ উন্নয়নমূলক কাজে এতটাই আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চাকরি গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। ১৮৬১খৃঃ সরকারের পক্ষ থেকে রাজনারায়ণকে 'অ্যাসেসর অফ ইনকাম ট্যাক্স' পদগ্রহণ করার আহ্বান আসে। হেয়ার স্কুলে ও হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য রাজনারায়ণকে আহ্বান জানানো হয়। ইতিপূর্বে ১৮৫৬খৃঃ বর্ধমানের কমিশনার ও রেভিনিউ হ্যান্ডবুকের প্রণেতা জে.এইচ.ইয়ং যখন মেদিনীপুরে পরিদর্শনে এসেছিলেন, তখন তিনি জেলা স্কুল দেখে ও রাজনারায়ণের সঙ্গে কথোপকথনে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি রাজনারায়ণকে ডেপুটি কালেকটরের পদগ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। রাজনারায়ণ এ সমস্ত কিছুই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মেদিনীপুরের উন্নয়নের জন্যই।[৩১]

রাজনারায়ণের শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টাগুলি মেদিনীপুরবাসীদের ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে রাজনারায়ণের আকস্মিক মেদিনীপুর ত্যাগের পর (শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে)১৬৫জন মেদিনীপুরবাসীর স্বাক্ষরসম্বলিত অভিন্দনপত্র তাঁকে প্রেরণের মধ্যে। এরমধ্যে গভর্ণমেন্ট ইংরাজি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, বালিকা বিদ্যালয় বা শ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠিত প্রচেষ্টা সবই আবেগপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই অভিনন্দনপত্রকে রাজনারায়ণ 'হীরক ও স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান' বলে অভিহিত করেছেন।[৩২]

মেদিনীপুরবাসীরা রাজনারায়ণের জন্য বসতবাটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, যার উল্লেখ রাজনারায়ণ করেছেন গর্বিত ভাবে, "বঙ্গদেশের অন্য কোন জেলায় প্রধানশিক্ষকের প্রতি সেই জেলার নিবাসীরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা আমি জানি না"।[(৩৩)] মেদিনীপুরের বিদ্যালয়সমূহের কুশলবার্তায় যে তিনি প্রীত হবেন, তাও তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি তিনি এ কথাও বলেছেন,"আমি লোকের নিকট নিজ গ্রাম 'বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু' বলিয়া পরিচিত নহি, 'মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু' বলিয়া পরিচিত।"[৩৪]

মেদিনীপুরবাসী শিক্ষাধারা পরিবর্তনের এক যুগসন্ধিক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়েছিল রাজনারায়ণের দীর্ঘ সাহচর্য। আধুনিক শিক্ষাচিন্তার বিস্তারে, শিক্ষাভাবনার বলিষ্ঠ রূপদানে, সর্বোপরি শিক্ষাপ্রসারকে সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি মেদিনীপুরে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই নব্য যুবকের সংস্কার-উন্মাদনা সচেতনভাবেই চেয়েছিল এই মফস্বল অঞ্চলটির ভাবধারা ও মানসিকতার পরিবর্তন সাধন। শিক্ষাসংস্কারক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সক্রিয় অংশের সিংহভাগ কেটেছিল এই জেলায়। রাজনারায়ণের প্রত্যক্ষ অবদান এক অর্থে মেদিনীপুরের রূপান্তর ঘটিয়েছিল—নতুন ভাবনায় পরিশীলিত এই অঞ্চল ক্রমশঃ শহর কলকাতার শিক্ষাচেতনার সাথে সহাবস্থানে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) Reports of H.Strachey, Judge and Magistrate of Midnapore, to George Dowdeswell, Esq. secretary ،o Government, in the Judicial and Revenue Department on 30th January, 1802.

২) 'Memoranda of Midnapore', by H.V. Bayley, originally written in 1852 and published in 1902.

৩) Genral Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1850-51,p.136.

৪) রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, চতুর্থ সংস্করণ,কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৪৫।

৫) যোগেশচন্দ্র বসু, 'রাজনারায়ণ বসু ও তৎকালীন মেদিনীপুর' নামক অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ৩৫; অশ্রু কোলে, 'রাজনারায়ণ বসু : জীবন ও সাহিত্য', কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১০৬।

৬) রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল', (বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত), কলিকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৩২-৩৩

৭) বীডন সাহেব সংবাদপত্রে এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

৮) General Report on public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1851-52, Midnapur School Chapter, p. 116.

৯) General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1857-58, Vol.-I,Appendix-A, p. 307-308.

১০) C.U. Calendars, 1858-59 & 1859-60.

১১) General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1858-59.

১২) S.K.Som, 'History and Development of Midnapore College— Centenary Commemoration Volume', Midnapore, 1973,p. 02.

১৩) রাজনারায়ণ বসু, 'দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি', ২৯জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭বঙ্গাব্দ; ১৮৮০খ্রীঃ, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, (বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত), কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৪০২,পৃঃ ১৯৬-১৯৭।

১৪) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

১৫) রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল আর একাল', প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, ১৭৯৬ শক (১৮৭৪ খ্রীঃ)।

১৬) অরুনা রায়, 'বিদ্যালয়ের রূপ ও বিকাশ', অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়ের ১২৫তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্মরনিকা,মেদিনীপুর, ১৯৮৫, পৃঃ ঘ।

১৭) সুরমা সিংহ,'আমার স্মরণে আসা অলিগঞ্জ বিদ্যালয়ের কয়েকটি ঘটনা', পূর্বোক্ত,পৃঃ১।

১৮) সোমপ্রকাশ, ১৮৬০খ্রীঃ ২২শে জুন।

১৯) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক সংখ্যা, ১৭৮৪ শক।

২০) অশ্রু কোলে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৪৭৪ঘ।

২১) মেদিনীপুর গভর্ণমেন্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির ১লা আগষ্ট,১৮৫৯খ্রীঃ-এর কার্যবিবরণী।

২২) প্রাগুক্ত, ১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৯খ্রীঃ কার্যবিবরণী।

২৩) পূর্বোক্ত, ১লা আগষ্ট, ১৮৫৯খ্রীঃ, কার্যবিবরণী।

২৪) Brojendranath Bandyopadhyay, 'Rajnarayan Bose on The Midnapur Library', The Modern Review, May, 1934.

২৫) অশ্রু কোলে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৪-১১৫।

২৬) 'সাধারণী' পত্রিকা, পৌষ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

২৭) পূর্বোক্ত।

২৮) যদিও প্রথমিক পর্বে তাঁকে যে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার নিদর্শন রয়েছে তাঁকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্রে। সূত্র : রণতোষ চক্রবর্তী,'রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রাবলী', কলিকাতা,১৯৮৯,পৃঃ ৪৩।

২৯) যোগেশচন্দ্র বসু, পূর্বোক্ত, পৃঃ২৬।

৩০) রাজনারায়ণ বসু,'আত্মচরিত' পৃঃ৫২-৫৩।

৩১) রাজনারায়ণ বসু,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭-৬৮।

৩২) রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯-৮২।

৩৩) রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।

৩৪) রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৮৩।

# ইতিহাসের আলোকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক সাংবাদিক রামমোহন

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

"রামমোহন রায় পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও জাগ্রত মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য বক্তৃতার চেয়ে সংবাদপত্রই অধিকতর শক্তিশালী মাধ্যম"।

— *রেভারেন্ড জেম্‌স লঙ,*

*(রিপোর্ট অন্ দ্য নেটিভ প্রেস অফ্ বেঙ্গল, ১৮৫৯)*

রামমোহন এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সূচিত হতে চলেছে সমাজের অর্থনৈতিক গতিধারায়। সমাজের দীর্ঘকাল সঞ্চিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ওপর আঘাত হানার প্রকৃষ্ট সময়ে রামমোহনের আবির্ভাব। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে আলোকপাতের বিশেষ তাগিদ এসে গিয়েছিল যার মূলে ছিল নবযুগের অর্থনীতি।[১] নতুন আর্থিক পরিস্থিতি সাগ্রহে গ্রহণ করে রামমোহনের যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতা। নয়া অর্থনীতির ভিত্তির উপর যে ধরনের সামাজিক পরিস্থিতি গড়ে ওঠা দরকার, তার অস্তিত্ব রামমোহনের সমকালীন কলকাতার সমাজেও ব্যাপ্ত হয়নি। যুগ পরিস্থিতির পথ নির্দেশের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল সমাজ পরিবর্তনের। সমাজ বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী এই সমাজ পরিবর্তনের পথ দু ধরনের হতে পারে।[২] যথা— (১) প্রণোদিত পরিবর্তন এবং (২) সংঘর্ষজনিত পরিবর্তন। প্রথম পথটি অবলম্বন করেই সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন সাংবাদিক রামমোহন; আর তাঁর অগ্রগামী কর্মসূচী ও চিন্তাভাবনার অনুরণন ঘটেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

ভারতীয় নবজাগরণের জনক হিসাবে রামমোহন রায়কে (১৭৭৪-১৮৩৩) চিহ্নিত করার মধ্যে তর্কের উপাদান যতই থাকুক, ভারতীয় হিসাবে তাঁর মধ্যে আমরা যে সর্বপ্রথম একজন আধুনিক ভাবনা সমৃদ্ধ মানুষকে পেয়েছিলাম, এ নিয়ে সম্ভবত বিতর্কের অবকাশ নেই। রামমোহনের জীবনী থেকে দেখা যায় ২৭ বছর বয়সে

অর্থাৎ ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় পা ফেলেছেন। এই সময় পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাগত চর্চা মূলত ফার্সি, আরবি ও সংস্কৃতের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ইতিমধ্যে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে কলকাতায় কোম্পানির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। লর্ড ওয়েলেসলি তখন গভর্ণর জেনারেল (১৭০৯-১৮০৫)।

জেমস্ অগাস্টাস হিকি ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করেন। এদেশে সাংবাদিকতার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হিকির হাত ধরে। ১৭৮৫ সালে মাদ্রাস থেকে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়— 'মাদ্রাজ কুরিয়ার'। বম্বের প্রথম সংবাদপত্র 'বম্বে হেরাল্ড' বেরোয় ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। কলকাতায় হিকির গেজেটের পর দ্বিতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালের ১৮ নভেম্বর - সাপ্তাহিক, 'ইন্ডিয়া গেজেট'।[৩] সাপ্তাহিক, মাসিক মিলিয়ে ১৭৯৯ সালের মধ্যেই কলকাতা থেকে ২৪টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

হিকির গেজেট প্রকাশিত হবার পর অষ্টাদশ শতকের শেষ দু-দশক ২৪টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও, উনিশ শতকের প্রথম ১৪টি বছর নতুন কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। ১৮১৪তে প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা টাইমস'। ১৮১৫-তে বেরোয় 'গভর্ণমেন্ট গেজেট'। এরপর থেকে রামমোহনের কলকাতায় থাকা পর্যন্ত ৩৪টি ইংরেজি কাগজ প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮১৮-র মে মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া'। ১৮১৮-র ২ অক্টোবর জেম্‌স সিল্ক বাকিংহামের (১৭৮৬-১৮৫৫) 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হিসাবে। ১৮১৯-র ২ জুলাই থেকে তা দৈনিকে পরিণত হয়। অবশ্য এর আগেই ১৮১৯-র ১৯ এপ্রিল থেকে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'বেঙ্গল হরকরা'।

রামমোহনের কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা থাকাকালীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতীয় ভাষার পত্রিকা প্রকাশনার আবির্ভাব। এদেশে সংবাদপত্র চালু হবার পর প্রায় প্রথম চার দশক সংবাদপত্র বলতে ছিল ইংরেজি সংবাদপত্র এবং সেগুলি সবই ছিল এদেশে আগত ব্রিটিশদের। যারা আসত মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে অথবা বাণিজ্যের কাজে। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল ১৮১৮-র এপ্রিলে মাসিক সাময়িক পত্র হিসাবে 'দিগদর্শন'-র আবির্ভাব।[৪] জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, যে কোনও ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক পত্র। অবশ্য 'দিগদর্শন'কে সংবাদপত্র বলা যায় না।

এই ১৮১৮ সালের ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত হয় বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গাল গেজেট'। এর সম্পাদক ছিলেন রামমোহনের বন্ধু হরচন্দ্র রায়। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। 'বঙ্গাল গেজেট'ই ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র।

এপ্রসঙ্গে নজর কাড়ার মত বিষয় হল ভারতীয় ভাষার প্রথম সংবাদপত্রটি, প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে এবং বাংলা ভাষাতে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে মারাঠী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বেরোয় ১৮২২ সালের ১ জুলাই। হিন্দি ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র 'উদন্ত মার্তন্ড' এই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় ১৮২৬-র ৯ ফেব্রুয়ারী। ১৮৩১ সালে তামিল ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বেরোয়— 'তামিল ম্যাগাজিন'। এর পিছনে ছিল ক্রিশ্চান মিশনারীরা। মিশনারীদের উদ্যোগেই মাদ্রাজ থেকেই ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হয় তেলেগু ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র 'সত্যদূত'।

বাংলায় সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে 'বঙ্গাল গেজেট'-এর কথা বলা হলেও এর মূল সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায়নি। সমকালীন পত্রপত্রিকা থেকে পরোক্ষে সামান্য কিছু জানা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'বঙ্গাল গেজেট' চলেছিল 'বৎসর খানেক'। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করা 'বঙ্গাল গেজেটে'র পক্ষে সম্ভব হয়নি। তুলনায় বাংলা সাংবাদিকতায় পথিকৃৎ হিসাবে 'সমাচার দর্পণ'-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৮১৮-র ২৩ মে শ্রীরামপুর মিশন থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রকাশনা শুরু।

একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে রামমোহনের সমকালে এদেশে না ছিল টেলিগ্রাফ, না ছিল টেলিফোন। বিদ্যুৎ ছিল না। আজকের দিনের পি.টি.আই বা ইউ.এন.আই-এর মতো সংবাদ সংস্থাও ছিল না। মুদ্রণ ব্যবস্থাও ছিল আদিম যুগের, হাতে চালিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্ভরতা ছিল পালকির ওপর। বাইরের বিশ্বে কী ঘটছে তা জানার একমাত্র উপায় ছিল বিলেত থেকে আসা সংবাদপত্রগুলি। প্রকাশের কয়েকমাস পরে জাহাজে চেপে যেগুলি এদেশে আসত সেইসব সংবাদপত্রের বিভিন্ন অংশ এখানকার সংবাদপত্রগুলি পুনর্মুদ্রিত করত। শিক্ষাগত ও সামাজিক কারণে পাঠক সংখ্যাও ছিল সীমিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাঠক সংখ্যা একশো-দেড়শোর বেশি ছাড়াতো না। সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহী ভারতীয়র সংখ্যা তখন বেশি হবেও বা কী করে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই শিক্ষিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এরাই পরবর্তী সময়ে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে আলোড়িত করেছে। ওই ১৮১৭ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' অর্থাৎ সংবাদপত্র

ও সাংবাদিকতার ভিত্তি অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হবারও দরকার আছে। কার্যত উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই এই প্রস্তুতির সূচনা। প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন ও তৎকালীন সমস্যা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন— 'আধুনিক বাংলাদেশের জন্ম হয় সেদিন— যেদিন মুদ্রাযন্ত্র আবির্ভূত হল হুগলীর শ্রীরামপুরে ও কলকাতায়। আর বাঙালির নবজন্ম ও দ্বিজত্ব লাভ হল সেদিন— যেদিন সাময়িক পত্র প্রকাশিত হল, প্রথমে ইংরেজিতে, পরে বাংলায়।' আধুনিকতার আধার ও আধেয় হিসাবে গণমাধ্যমের এই অবস্থান আমাদের দেশে উন্মোচিত হয়েছিল রামমোহনের সময় কালেই।

১৮১৫ সালে রামমোহন যখন এদেশে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন, তার আগেই এদেশে মুদ্রণ ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র প্রকাশনা অনেকটা ভিত্তি পেয়েছে। অবশ্য সংবাদপত্র বলতে তখনও সবই ইংরেজি ভাষায়; অর্থাৎ ইংরেজি জানা মহলেই তার প্রচার। যাঁর মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল স্বভাবতই হাতে গোনা। অবশ্য যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান মনস্ক প্রচারক হিসাবে আমরা রামমোহনকে প্রথম পাচ্ছি আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠার একদশকেরও আগে। আরবি-ফার্সি ভাষায় ছাপা রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮০৩-০৪ সালে। রামমোহন তখন মুর্শিদাবাদে। পৌত্তলিকতা বিরোধী এই গ্রন্থের নাম ছিল 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহিদীন'।

প্রচলিত ধ্যানধারণা যদি যুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করে না থাকে, তবে তা পরিবর্তনের জন্য কলম ধরেন বিজ্ঞান সাংবাদিক, বিজ্ঞান মনস্ক সাংবাদিক। এদেশে যুক্তিবাদের ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের।[৫] প্রাচীন যুগে (চার্বাক দর্শন) এবং মধ্যযুগেও (আকবরের ধর্মদর্শনে যুক্তি বা 'আকল'-এর ওপর জোর) ভারতে যুক্তিবাদের অস্তিত্ব ছিল। তবে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে প্রতিটি ঘটনাকে যাচাই করা, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথে পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা শুরু ঔপনিবেশিক কাঠামোতে ব্যক্তিগত স্তরে। এ ব্যাপারে কয়েকজন ব্যক্তির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৬৬), রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৬-১৯১৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার কাজটা করে গিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহনকে আমরা দেখেছি সতীদাহ প্রথা বিরোধী ভূমিকায়। 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশের ছ' মাস পর, ১৮১৮-র নভেম্বরে প্রকাশিত হয় তাঁর বাইশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা— ''সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ''। এর ঠিক এক বছর পর মিশন প্রেস থেকে ছেপে বেরোয় তেত্রিশ পৃষ্ঠার ''সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ''। সতীদাহ নিয়ে রামমোহনের ১১ পৃষ্ঠার তৃতীয় পুস্তিকা 'সহমরণ

বিষয়' ছেপে বেরোয় ১৮২৯ সালে; যে বছর সতীদাহ প্রথা রদ করা হয়। অর্থাৎ এখানে বিজ্ঞান মনস্ক ও যুক্তিবাদী সাংবাদিকতা রামমোহনকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় উন্নীত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হরচন্দ্র রায় সম্পাদিত ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বঙ্গাল গেজেটেও 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' লেখাটি ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়।

ক্যালকাটা জার্নালের সুবিখ্যাত সম্পাদক বাকিংহামের সঙ্গে তাঁর গভীর মিত্রতার কথাও সুবিদিত। হাতে কলমে সাংবাদিকতায় বাকিংহামের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল, একথা ধরে নিলে সম্ভবত ভুল হবে না। ক্যালকাটা জার্নালে রামমোহন নিজে কিছু লিখেছেন এমন তথ্য না পাওয়া গেলেও, তাঁর সম্পর্কে এ কাগজে নিয়মিত লেখা হত। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতেও রামমোহন প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। বিশেষত, তাঁর পৌত্তলিকতা বিরোধী ও একেশ্বরবাদী মতামত মিশনারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবার খ্রিষ্ট্রীয় ত্রিতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে রামমোহনের মতামত মিশনারিরা মেনে নিতে পারেননি। আসলে ধর্ম ও ধর্মীয় আচার সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যই এর কারণ। আর বাস্তবেও 'সমাচার দর্পণ'-এর সঙ্গে মত পার্থক্যের সূত্র ধরেই রামমোহন হাতে কলমে সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন।

শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে রামমোহন প্রথম মাসিক পত্রিকা (দ্বিভাষিক) প্রকাশ করেন। এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অন্য পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ থাকত। ইংরেজিতে এই পত্রিকার নাম ছিল — "The Brahmanical Magazine --- The Missionary and the Brahmin"। বাংলায় নাম — 'ব্রাহ্মণ সেবধি ঃ ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সংবাদ'। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে এই পত্রিকার মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত চতুর্থ সংখ্যা "Brahmanical Magazine" কেবলমাত্র ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।

'ব্রাহ্মণসেবধি' বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন যুক্ত হন 'সম্বাদ কৌমুদী'-র সঙ্গে। বাংলা সাপ্তাহিক সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর। 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করেছিলেন তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গাল গেজেট' এর পর বাঙ্গালি সম্পাদিত ও বাঙ্গালি পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র। তবে, এই পত্রিকার পিছনেও রামমোহন ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— "নামে যিনিই সম্পাদক থাকুন, 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্পাদনার ব্যাপারে যে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট হাত ছিল এবং তিনি যে পত্রিকাখানির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।"

স্বাভাবিকভাবে 'সম্বাদ কৌমুদী' ছিল রামমোহন-প্রভাবিত উদার সংবাদপত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত এর কোনও ফাইল পাওয়া যায়নি। ক্যালকাটা জার্নাল, এশিয়াটিক জার্নালের মতো সমকালীন ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি মারফৎ 'কৌমুদী'-র কভারেজ সম্পর্কে পরোক্ষে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা, বাঙ্গালিদের জন্য ইউরোপীয় ডাক্তারদের চিকিৎসা পাবার আবেদন জানিয়ে নিবন্ধ, প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রসারের পক্ষে আবেদন জানিয়ে প্রস্তুত নিবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ রামমোহনের যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্ক সাংবাদিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, 'কৌমুদী' সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জেমস লঙ লিখেছিলেন— "সতীদাহ প্রথা বিলোপের পক্ষে মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদি রচনা এবং শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে 'কৌমুদী'-র অবদান মোটেই নগণ্য ছিল না।"

প্রসঙ্গত, সম্পাদক হরিহর দত্ত সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কৌমুদীতে লেখার প্রতিবাদেই ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী' ছেড়ে দেন। ভবানীচরণ ছেড়ে চলে যাবার পর ১৮২২-র আগষ্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ 'কৌমুদী' বন্ধ হয়ে যায় প্রথম বারের জন্য। ১৮২৩-এর ৭ আগষ্ট তা পুনঃপ্রকাশিত হয়। এরপর প্রায় দশ বছর 'কৌমুদী' জীবিত ছিল।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের ৯৮ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৮২২ সালে ১২ এপ্রিল রামমোহন প্রকাশ করেন একটি ফার্সি সাপ্তাহিক 'মীরাৎ-উল-আখবার'। যার বাংলা অর্থ 'সংবাদ দপর্ণ'। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল জন অ্যাডামের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিধির প্রতিবাদে এই পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন রামমোহন। এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৩ এর ৪ এপ্রিল; অর্থাৎ মীরাৎ-উল-আখবার প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় এক বছর।[৬] দুঃখের বিষয় হল, 'মীরাৎ-উল-আখবার' পত্রিকারও কোনও সংখ্যা পাওয়া যায়নি। যদিও 'ক্যালকাটা জার্নাল' ও 'বেঙ্গল হরকরা' থেকে ইংরেজিতে অনূদিত ও পূণর্মুদ্রিত কিছু কিছু প্রতিবেদন সম্পর্কে জানা গেছে। যেমন জানা যায়, মাছের আচরণ, চুম্বকের ধর্ম, বেলুনের বিবরণ, শব্দ বিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত হত মীরাৎ-উল-আখবারে। এ ধরনের লেখা প্রকাশ রামমোহনের বিজ্ঞান সাংবাদিকতারই পরিচায়ক।

'মীরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ করে দেওয়ার পর প্রায় বছর ছয়েক আর কোনও সংবাদপত্রের সঙ্গে রামমোহনকে যুক্ত থাকতে দেখা যায় না। এই সময় তিনি একের পর এক পুস্তিকা প্রকাশ করে তাঁর বিজ্ঞান মনস্ক ও যুক্তিবাদী ভাবনা প্রচার করে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে রবার্ট-মন্টোগোমারি মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার

ঠাকুর, নীলরতন হালদার ও রাজ কিষেন সিং-এর সঙ্গে রামমোহনও 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন। এই 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এরই বাংলা ভাষায় সহচর পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত'।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে রামমোহন বিরোধিতায় কাগজের অভাব ছিল না। সমাচার দর্পণ, ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া, সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ তিমিরনাশক, সর্বতত্ত্বদীপিকার মতো কাগজ ছিল রামমোহন বিরোধিতায় সরব। আর রামমোহন এই সব সংবাদ পত্রের সমালোচনার জবাবে শুধু সংবাদ পত্র নয়, পুস্তিকাকেও হাতিয়ার করেছিলেন। 'ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কে রামমোহন একাধিক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 'সমাচারদর্পণ'-এ একটি লেখার জবাবে তিনি যেমন ১৮২২-এর মে মাসে প্রকাশ করেন ২৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকা— 'চারি প্রশ্নের উত্তর', আবার 'সমাচার চন্দ্রিকার' সত্তরতম সংখ্যায় পৌত্তলিকতার পক্ষে একটি লেখার জবাবে ১৮২৩ সালে ছাপা হয় তাঁর ৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'গুরুপাদুকা'।

'এত কিছু সত্ত্বেও রামমোহনের বিজ্ঞান মনস্কতা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। তাঁর বেদান্তচর্চা এবং একেশ্বরবাদ তাঁকে পুরোপুরি বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে পারেনি। বহুক্ষেত্রে দ্বিচারিতা রামমোহনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপর অনেকেই অভিযোগ করেন— রামমোহন হিন্দু ধর্ম থেকে 'পলায়ন' করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তবু উপবীত ধারণ করতেন। আসলে রামমোহনের ধর্মসংস্কার ধর্মকে 'বিশ্বাস' নয়, যুক্তি ও আধুনিক মানবিকতার সাপেক্ষে যাচাই-এর প্রচেষ্টা। তাঁর মধ্যে দ্বিচারিতা থাকলেও সেই যুগে দাঁড়িয়ে তিনি যে বিজ্ঞান মনস্কতার ও যুক্তিবাদের বীজ বপন করেছিলেন আজ তা যে কোনও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পাথেয় হওয়া উচিত। যুগের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ নিজেকেও সংশোধন করেন। আজকের যুগে রামমোহন থাকলে তাঁর চিন্তাধারা যে আরও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠত তা বলার অপেক্ষা রাখে না; অষ্টাদশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে রামমোহনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপই তার প্রমাণ।

## সূত্র-নির্দেশ :

১) মুরারি ঘোষ, অনন্য রামমোহন অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ও যুগনায়ক, — প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮ খ্রিঃ, পৃ. ৪৭।

২) পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গণ জ্ঞাপন, পঃবঃ রাজ্যপুস্তক পর্যৎ, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিঃ, পৃ. ২৩৪।

৩) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ সংকলন, পঃবঃ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারী ২০০৫ খ্রিঃ, পৃ. ৫।

৪) ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য, সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত, লিপিকা, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬।
৫) সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, সম্পাদনা-রাহুল রায়, পশ্চিমবঙ্গ ফিরে দেখা, প্রতীতি, হুগলী, ২০০৩ খ্রিঃ, পৃ. ২৩২।
৬) অঞ্জন বেরা, রামমোহন রায় ও সাংবাদিকতা, পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রিঃ, পৃ. ১৪৮।

**<u>এই প্রবন্ধের উপস্থাপনার জন্য সাহায্যকারী আরও কয়েকটি বই</u>**

১) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
২) স্মরজিৎ চক্রবর্তী, দ্য বেঙ্গলী প্রেস (১৮১৮-১৮৬৮), ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৬।
৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
৫) রেভারেন্ড জেমস্ লঙ, আদি পর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা (অনুবাদ ঃ মুহম্মদ হাবীবুর রশিদ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রিঃ
৬) ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও বাংলা সহিত্য, কথা ও কাহিনী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
৭) দীপঙ্কর চক্রবর্তী, বাংলা রেনেসাঁস এবং রামমোহন, পিপল্স বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯০ খ্রিঃ।
৮) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়— হিস্ রোল ইন্ ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০১ খ্রিঃ।
৯) দেবেশ রায়, উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯০ খ্রিঃ।
১০) সম্পাদক ঃ শিবনারায়ণ রায়, রাজা রামমোহন রায় (বিশেষ সংখ্যা), জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।
১১) সম্পাদনা ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিরোধ, উৎস মানুষ বিশেষ সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৩ খ্রিঃ।
১২) সম্পাদক ঃ বিজন মুখোপাধ্যায়, মান্দাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক, রামমোহন সংখ্যা, কলকাতা এপ্রিল, ১৯৯৭ খ্রিঃ।
১৩) সোমেন্দ্রনাথ বসু, রামমোহন রায় - নবযুগের নেতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৪ খ্রিঃ।
১৪) সন্তোষ কুমার দত্ত, উজান পথে রামমোহন সমীক্ষা, বারুইপুর, ১৯৯১।
১৫) বিজিত কুমার দত্ত, আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন রায়, ন্যাশানাল বুক ট্রাষ্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিলি, ১৯৯৭ খ্রিঃ।

# প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়ন চর্চা

## চিত্তব্রত পালিত

ঔপনিবেশিক বাংলায় ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ সুযোগ ছিল না। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে খুব সাধারণ স্তরের বিজ্ঞান শেখান হত। বিজ্ঞান গবেষণার জন্য উপযুক্ত গবেষণাগারও ছিল না।[১] সরকার বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান চালাবার উপযুক্ত কিছু ভারতীয় শিক্ষার্থীকে নিয়োগ করত এবং তাদের হাতে কলমে তালিম দিত। উঁচুমানের গবেষণার কোন সুযোগ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ২রা আগষ্ট ১৮৬১ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম। খুলনা জেলার রাড়লি-কাটপাড়া গ্রামে। তিনি প্রথমে গ্রামের স্কুলে শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে প্রথমে কলকাতার হেয়ার স্কুল ও পরে অ্যালবার্ট ইন্সটিটিউশনে স্কুলের শিক্ষা শেষ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনে কেমিষ্ট্রি অনার্স নিয়ে বি.এস.সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। রসায়নে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি গিলখ্রিষ্ট বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দেন এবং সফল হন। অতঃপর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য বিলেতে যাত্রা করেন। পাঁচ বছরের মধ্যে ডি.এস.সি. উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল রাসায়নিক যৌগ Conjugated Sulphate এর উপর। এই সময়ে তিনি "Before and after the Sepahi Mutiny" নিবন্ধ লিখে বিশেষ পুরস্কার পান। এই বইতে কোম্পানীর শাসনের সমালোচনা ছিল এবং ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন সংস্কারের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। অপরপক্ষে, এই রচনা প্রফুল্লচন্দ্রের সাহস এবং দেশপ্রেমের নিদর্শন। এই সময়েই প্রফুল্লচন্দ্র I.E.S. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন বিভাগে প্রফেসর পদে যোগ দেন। তাঁর আগে জগদীশচন্দ্র I.E.S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও প্রফেসর পদ পাননি। এক বছর সংগ্রামের পর তিনি ঐ পদ পান। হয়তো প্রফুল্ল চন্দ্রের D.Sc. উপাধি থাকায় তাঁকে এই অসুবিধায় পড়তে হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক পদে থাকাকালীন শিক্ষকতার বাইরে গবেষণার জন্য তাঁকে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং আলাদা কোনো গবেষণাগারেরও ব্যবস্থা করা হয়নি। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মতই প্রফুল্লচন্দ্রও আদর্শ শিক্ষক হিসেবেই স্বীকৃত ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে যান। ১৯১৬ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে

ছিলেন। ঐ সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত "Mercurous Nitrate" এর গবেষণা প্রকাশ করেন এবং এই গবেষণা অত্যন্ত উঁচুমানের এবং নোবেল পুরস্কার পাবার দাবী রাখে। কিন্তু সেরকম কোনো স্বীকৃতি তিনি পাননি। পরে তিনি ঐ গবেষণা পত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। এর জন্য তিনি Ph.D. উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁর অনেক লেখা Asiatic Soceity-র Journal-এ প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকাকালীন ১৯০২ সালে তাঁর History of Hindu Chemistry প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি একটি যুগান্তকারী রচনা। বহু সংস্কৃত, তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ ঘেঁটে তিনি প্রাচীন ভারতের রসায়নশাস্ত্রের এই অজানা ইতিহাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। পরাধীন ভারতবর্ষে এই অতীত গৌরবের আবিষ্কার ভারতবাসীর মনে আত্মশক্তির সঞ্চার করে। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্থেলো (Barthelot) এই রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নোবেল প্রাইজ পাবার যোগ্য বলে বর্ণনা করেন।[৪] জার্মানীতেও এই গ্রন্থ সমাদৃত হয় কিন্তু নোবেল পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জোটে না। বইয়ের নামকরণে "হিন্দু" কথাটি থাকায় বইটিকে হিন্দুত্ববাদী বলে এদেশে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রাচীন ভারতের কথা লিখেছেন, সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিল না। এটা হিন্দুগৌরবেরই ব্যাপার। এতে হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। মুসলমানেরা দারা শিকোর মাজনান-আল-বাহরাইন এর সুখ্যাতি করার সময় শুধু মুসলমানের প্রশংসা বলে সঙ্কুচিত বোধ করেন না। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যরা বোধ করেছিলেন এবং প্রিয় শিষ্য প্রিয়দারঞ্জন রায় বইটির সারবস্তু রেখে নিজের গবেষণা সংযোজন করে বইয়ের নাম রাখেন "History of Chemistry in ancient and medieval India"। একজন বিশিষ্ট গবেষক ও গ্রন্থকারের রচনার এই ধরনের পরিশোধন বা সম্মার্জন অমার্জনীয়। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে হিন্দু রসায়নের অবক্ষয়ের জন্য মুসলমানদের ভারত জয়কে দায়ী করেন নি। তিনি জাতিভেদ প্রথা, গুরুকুল প্রথা, আয়ুর্বেদের বৈষয়িক ব্যবহার এবং মৌখিক ইতিহাসের ধারা ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র পরবর্তী কালে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ছিল ব্রিটিশ সরকারের মুসলিম তোষণ নীতির বিরুদ্ধে, হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের দাবীতে। হিন্দু রসায়ন লেখার সঙ্গে এই ব্যাপারে তাঁর কোন ধারাবাহিকতা নেই।

স্যার আশুতোষ প্রফুল্লচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের পালিত প্রফেসর পদে নিয়োগ করেন। বিজ্ঞান কলেজ প্রফুল্লচন্দ্রের প্রচেষ্টায় রসায়নচর্চার তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই অকৃতদার জ্ঞানতপস্বী সারাদিন শিক্ষকতায় এবং গবেষণায়

ব্যাপৃত থাকতেন। সামান্য কিছু আহার স্বপাকেই সারতেন। তাঁর ছিল প্রখ্যাত শিষ্যবর্গ। তাঁদের মধ্যে জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, জ্ঞান ঘোষ, নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায় এবং সহায়রাম বসু প্রসিদ্ধ। এইভাবে তিনি একটি রসায়নশাস্ত্রের গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে ভারতে রসায়নচর্চার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং বিশ্বময় এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দেশগড়ার কাজে এই পরম্পরার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

এছাড়া ১৯২৪ নাগাদ তিনি Indian Chemical Society প্রতিষ্ঠা করেন, এখানে উচ্চতর গবেষণা চলতে থাকে। তিনি এইভাবে রসায়নচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। এই গবেষণাকেন্দ্র আজও বর্তমান এবং উঁচুমানের গবেষণার জন্য বিখ্যাত।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০১ সালে "Bengal Chemical and Pharmaceutical Works" এর প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল যুগপৎ ফলিত রসায়নের এবং স্বদেশী ব্যবসায়িক উদ্যোগ। নিজের বেতন থেকে বাঁচিয়ে বহু হিতৈষীর অর্থানুকূল্য এবং শেয়ার বিক্রয় করে তিনি এর মূলধন সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান স্বদেশী শিল্পের মহীরূহ হয়ে ওঠে। B.C.P.W.-এর বহু ওষুধ এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক যৌগ প্রফুল্লচন্দ্র নিজের প্রতিভায় আবিষ্কার করেন এবং উৎপাদন করান। বটকৃষ্ণ পালের মত বিদেশী ওষুধ বিক্রির ব্যবসা তিনি করেন নি। এটি ছিল সম্পূর্ণ স্বদেশী শিল্প। এটি আজও বর্তমান। উল্টোডাঙায় অবস্থিত এর বিশালকারখানা আজও চোখে পড়ে। এই উদ্যোগ বাঙালী বেকার যুবকদের ব্যবসায় প্রণোদিত করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক ছিল। তাঁর দেখাদেখি এরকম প্রতিষ্ঠান আরও গড়ে ওঠে। ওষুধের ক্ষেত্রে সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয়, ঢাকা আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী প্রভৃতি। তিনি তাঁর ''বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার'' এবং ''বাঙালীর অন্নসমস্যা ও তার প্রতিকার'' প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালী যুবকদের শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর আত্মজীবনী "Life and experiences of a Bengali Chemist" তাঁর কর্মময় জীবনের এক সার্থক রূপায়ণ, বিজ্ঞান ও দেশপ্রেমের সম্মিলনে এক সার্থক সাহিত্যকীর্তি। সে যুগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তারই আদর্শ রূপকার।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) Debabrata Chakraborti, Sri P.C. Ray, 1861-1944 : The Quest for National Science and Swadeshi Enterprise (Unpublished Ph.D. Thesis, J.U. )

২) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা — প্রফুল্লচন্দ্র রায় সংখ্যা।

৩) Santimoy Chatterjee and Amitabha Sen (eds) Acharya Prafulla Candra Ray some the aspects of his life and work, p. 39

৪) ibid, p. 57.

৫) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা — পূর্বোক্ত।

৬) S. Chatterjee & A. Sen (eds) India, p. 40

General

1. J. Sengupta - P.C. Ray
2. N.R. Dhar - Acharya Prafulla Chandra Ray — Life and Achievement

# আসামের বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা

**সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়**

বিজ্ঞান এবং সমাজের সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা ক্রমেই বাড়ছে।[১] বিদ্যাচর্চার একটা ক্ষেত্র হিসেবে বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত অধ্যয়ন একদিকে যেমন তাত্ত্বিক স্তরে হচ্ছে অন্যদিকে চেষ্টা চলছে ব্যবহারিক স্তরে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের। বিজ্ঞানকে সমাজমুখী এবং সমাজকে বিজ্ঞানমুখী করার লক্ষ্য নিয়ে যে বিজ্ঞান আন্দোলন কাজ করে তার মূলত তিনটে ধারা ঃ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞানমনস্কতা-র বিকাশ এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জনকল্যাণের চেষ্টা।[২] এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য আসামের বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা তুলে ধরা।

ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্য আসামের সঙ্গে বাংলার যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা পৃথক (অসমিয়া) হলেও অসমিয়া এবং বাংলা ভাষার লিপি এক। ফলে এই গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে অসমিয়া ভাষায় লেখা বিভিন্ন বই/পুস্তিকা/পত্রিকা ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

আসামও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণে পিষ্ট এক অঞ্চল। বিশেষ করে অসামের চা কুলিদের ওপর ব্রিটিশ শোষণ ছিল সর্বাধিক।[৩] ঔপনিবেশিক শাসনে স্বাভাবিকভাবেই আসামে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা (সাধারণভাবে) বা বিশেষভাবে বিজ্ঞানশিক্ষার তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ সরকার আমাদের মানুষদের উন্নতিকল্পে শিক্ষা এবং বিজ্ঞান প্রচারে আগ্রহ দেখায়নি। উনিশ শতকের গোড়ায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে তা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১৮৩১-এ অ্যাডাম হোয়াইট নামক এক খ্রীষ্টান মিশনারীর উদ্যোগে গৌহাটিতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] ১৮৩৬-এ দু'জন আমেরিকান ব্যাপটিস্ট ড. নাথাল ব্রাউন এবং ও.টি. কাটারের উদ্যোগে আসামের পূর্বপ্রান্তে সাদিয়ায় একটি অসমিয়া মাধ্যম স্কুল স্থাপিত হয়।[৫] ১৮৪৪-এর মধ্যে, ও.টি. কাটারের নেতৃত্বাধীন আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারিজ শিবসাগর জেলায় চোদ্দটি অসমিয়া মাধ্যম স্কুল গড়ে তুলেছিল।

১৮৫৩ সালে ওয়েলশ মিশনারীরা ছ'টি স্কুল তৈরি করেছিল।[৬] খ্রীষ্টান মিশনারী ছাড়া, বেসরকারি বাণিজ্যিক কোম্পানির প্রতিনিধিরা আসামে শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। বেঙ্গল আর্মির ডাক্তার এবং আসাম রেলওয়েজ অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টর জন বেরি হোয়াইট তাঁর আয়ের একটা বড় অংশ, একটি মেডিকাল স্কুল স্থাপন করার জন্য সরকারকে দান করেন। ফলে ১৮৮৯-৯৯ সালে, আসামের চিফ্ কমিশনার স্যার হেনরি জন স্টেডম্যান কন্টনের আমলে, ডিব্রুগড়ে বেরি হোয়াইট মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হয়।[৭]

সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার বিকাশ আসামে খুব ঢিমেতালে চলছিল। ১৮৩৫-এর আগে এগারোটি স্কুল স্থাপিত হয় যার মধ্যে বেশি সংখ্যকই গড়ে ওঠে নিম্ন আসাম অঞ্চলে। ১৮৩৫-এ আসামে প্রথম ইংরেজি মাধ্যম স্কুল 'গৌহাটি স্কুল' গড়ে ওঠে। এখানে নিচু ক্লাসে ভূগোলকের ব্যবহার, পাটীগণিত এবং উঁচু ক্লাসে ভূগোল, উচ্চস্তরের গণিত শেখানো হত। ১৮৬৪ সালে গৌহাটি ইংলিশ স্কুল (পরবর্তীকালে যা পরিচিত হয় কলেজিয়েট স্কুল হিসেবে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নথিভুক্ত হয়।[৮] শিক্ষার মাধ্যম হয় বাংলা, আসামের ছাত্রদের কাছে ইংরেজি এবং বাংলা দুইই ছিল 'বিদেশী' ভাষা।[৯] মাতৃভাষা অসমিয়ার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চার সুযোগ না থাকায় সামগ্রিকভাবে শিক্ষা, বিশেষভাবে বিজ্ঞানশিক্ষার বিকাশ ব্যাহত হয়।

স্বভাবতই এই ফাঁক পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বিজ্ঞান পত্রিকা। গোড়ার দিকের পত্রিকা যে বিজ্ঞান বিষয়ক ছিল এমন নয়। আসামের পত্রিকার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, পত্রিকা, তা সে সাহিত্য বিষয়ক হোক, বিজ্ঞান বিষয়ক হোক বা সাধারণ পত্রিকাই হোক, তার প্রকাশ যুক্ত ছিল মিশনারী কাজকর্মর সঙ্গে। মিশনরীরাই আসামের প্রথম সংবাদপত্র 'অরুণোদয়'[১০] (অরুণোদই) প্রকাশ করেন। এই সংবাদপত্র চালু হয় ১৮৪৬ সালে। মিশনারীদের উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এক তরুণ অসমিয়া আধিকারিক আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন।[১১]

সাধারণ সংবাদপত্র হলেও অরুণোদয়ে জোর ছিল বিজ্ঞান প্রচারের ওপর। এখানে বিশ্বের ভূগোল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ যেমন প্রকাশ করা হয়েছিল সেরকম সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছিল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত আবিষ্কার (যেমন— মুদ্রণ যন্ত্র, টেলিগ্রাফ, কাচ) -এর কাহিনীও প্রকাশিত হত অরুণোদয়ের পাতায়।[১২]

শুধু বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ নয়, অরুণোদয়তে মাঝে-মাঝে কুসংস্কারের সমালোচনাও

প্রকাশিত হত। এই সমালোচনা নিশ্চয়ই আসামের শিক্ষিত লোকের চিন্তা ভাবনাকে কিছু পরিমাণে গড়ে দিয়েছিল। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অরুণোদয়ের উদ্দেশ্য ছিল অ-খ্রীষ্টান দেশীয় সমাজের কুসংস্কার তুলে ধরা যাতে তা খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের সহায়ক হয়। প্রকৃত বা ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের প্রচার বা প্রসার এদের উদ্দেশ্য ছিল না।

এ প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ চৌধুরীর বিশ্লেষণ উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৩] ১৮৪৭ সালের মে মাসে অরুণোদয়ে প্রকাশিত এক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আসামের কোন একটা অঞ্চলের মানুষ সর্বগ্রাসী কলেরার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'বুরা দাঙ্গরিয়া'-র পূজার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তারপরেও কলেরার প্রকোপে সেখানে বহু লোকের মৃত্যু হল। মিশনারীরা অরুণোদয়ের পাতায় মন্তব্য করল, 'বুরা দাঙ্গরিয়াকে মান্য করায় তো কোন উপকার হল না।[১৪] এটা মানতেই হবে যে কলেরা সংক্রান্ত অপদেবতার দেশীয় কুসংস্কারের বিরোধিতা করে 'অরুণোদয়' বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু এই অরুণোদয়, যখন ১৮৪৭ সালেই লেখে, সব রোগই পাপের ফল।[১৫] তখন বোঝা যায় বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার নয়, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই এর প্রধান লক্ষ্য। এই দুর্বলতা সামগ্রিকভাবে ধর্মনির্ভর যুক্তিবাদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের প্রকাশ।

অরুণোদয়তে আসামের শিক্ষিতজনের যুক্তিবাদী চেতনার প্রকাশও দেখা যায়। ১৮৬১ সালে জনৈক পত্রলেখক কোনরকম রাখঢাক না করেই লিখেছিলেন, আসামে গণক, বামুন প্রমুখ অনেক প্রকারে উন্নতির পথে বাধা দিচ্ছে। এরা 'গ্রহের দোষ, বুরা ডাঙ্গরীয়ার দোষ' প্রভৃতির কথা বলে মিছিমিছি ফাঁকি দিয়ে খায়'।[১৬] পত্রলেখক ছিলেন এক স্কুল ছাত্র। প্রসেনজিৎ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, এই নির্মম সমালোচনা আসলে ছিল আত্ম-সমালোচনা যা প্রমাণ করে দেশীয় যুবমানসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের প্রভাব পড়ছিল। মিশনারীদের সমালোচনার তুলনায় এই আত্মসমালোচনা ঐতিহাসিকভাবে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

আসামের কিছু ছাত্র, যারা কলকাতায় পড়াশোনা করতে এসেছিল তারা 'জোনাকি' নামে একটি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেছিল।[১৭] এই পত্রিকা প্রথম বের হয় ১৮৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে। এতে যেমন ছোটগল্প, কবিতা বের হয় তেমনই বের হত বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ। জোনাকির প্রথম সম্পাদক চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা পত্রিকায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রবন্ধ প্রকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, যদি অসমিয়াদের আধুনিক যুগের উপাদান যেমন বাষ্পীয় জাহাজ,

রেল ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সম্বন্ধে জানানো না যায় তবে তারা তাদের সহনাগরিকদের তুলনায় পিছিয়ে থাকবেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে হেমচন্দ্র গোস্বামী, রজনীকান্ত বরদলৈকে 'জোনাকি'-র পাতায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন। রজনীকান্ত সেই সময় কলকাতায় ডাক্তারি পড়তেন। তিনি 'জোনাকি'-র প্রথম বছরেই খুব সরল সহজবোধ্যভাবে লেখেন 'শরীরতত্ত্ব'। পরে লেখেন গাছগাছালির জন্মের নিয়ম।[১৮] জোনাকির দ্বিতীয় বছরে বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা এবং লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। বিশিষ্ট অসমিয়া লেখকরা বিজ্ঞাননিবন্ধ লিখতে এগিয়ে এলেন। উপেন্দ্রনাথ বড়ুয়া লিখলেন জল এবং ভূমিকম্প সম্বন্ধে। জ্ঞানেশ্বরী বরককতি নামে এক লেখিকা লিখলেন শারীরিক শ্রম, ফুল প্রভৃতি বিষয়। আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত (আগরওয়াল) লিখলেন শরীর ভাল রাখতে নানান সু-অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। চন্দ্রধর বড়ুয়া লিখলেন, 'বায়ু' সম্পর্কে। তৃতীয় বছরে, জোনাকির সেই সময়কার সম্পাদক কলকাতার বড়ুয়া চেষ্টা শুরু করলেন বিশ্বের নানান প্রান্তে ঘটা বিজ্ঞান বিষয়ক ঘটনা বা আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের টুকরো খবর হিসেবে তুলে ধরতে। তাঁর লেখার মধ্যে উঠে এসেছিল— জার্মানির হামবুর্গ শহরে আগুনে পোড়ে না এমন এক বাড়ির বর্ণনা, বাষ্পীয় শক্তিচালিত যানবাহন, মাকড়সার কামড়ের ওষুধ, সৌরশক্তি চালিত ঘড়ি, টমাস আলভা এডিসনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি। পরবর্তীপর্বে জোনাকিতে আরও অনেকে লেখেন। বিশিষ্ট অসমিয়া লেখক কনকলাল বড়ুয়া লেখেন 'ভূমিকম্পের উপযোগিতা' এবং 'বিবর্তন' সম্পর্কে। বিজয় রাম বড়ুয়ার লিখিত বিষয় ছিল টেলিফোন। একই সময়ে উদ্ভিদের উপযোগিতা নিয়ে লেখেন সৈফুদ্দিন অহমেদ।[১৯] এই সব প্রবন্ধেরই উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের নানান খবরাখবর, তত্ত্ব এবং তথ্যকে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করা।

বিজ্ঞান আন্দোলনের কুশীলবদের মধ্যে পত্রিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই পত্রিকার ভূমিকা আলোচনাকালেই উল্লেখিত হয়েছে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞান লেখকের নাম। কাজেই বিজ্ঞান আন্দোলনে ব্যক্তির ভূমিকাও অনুল্লেখ্য নয়। উপরোক্ত বিজ্ঞান লেখক ছাড়াও আসামের বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা বিধেয়।

এপ্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য হেমচন্দ্র বড়ুয়া।[২০] কলকাতায় শিক্ষালাভ না করলেও বাংলার সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। তিনি বিদ্যাসাগরের আদর্শ এবং 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর চিন্তাচেতনার অনুরাগী ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের মরণোত্তর পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রথাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লিখেছিলেন, জীবনশূন্য

মৃতদেহের যত্ন করে সৎকার করার নিমিত্ত বৃথা খরচ বা পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন নেই।[২১] তিনি 'বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়া ভাতুরী'[২২] নামে একটা সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন যাতে দেখিয়েছিলেন প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ধর্মধ্বজাধারীদের ভণ্ডামি। এই উপন্যাসের জনৈক চরিত্র 'হেড কেরানী বাবু'-র মধ্যে মুখে যুক্তিবাদিতা অথচ কাজে বা আচরণে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতি আস্থার যে স্ববিরোধী দ্বান্দ্বিক ছবি ফুটে ওঠে তার নির্মম সমালোচনা করেছেন হেমচন্দ্র। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজে এই দ্বন্দ্ব দুর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

গুণাভিরাম বড়ুয়া নামক আর একজন ব্যক্তির কথাও উল্লেখযোগ্য।[২৩] তিনি কলকাতাতে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিধবা বিবাহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আদর্শের অনুরাগী গুণাভিরাম ১৮৮৫ সালে 'আসাম বন্ধু' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার একটি লেখায় ভূতপ্রেতের অস্তিত্বের সপক্ষে তথাকথিত যুক্তি নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়। গুণাভিরাম এ প্রসঙ্গে তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন, 'যার কারণ জানি না সেটাকেই ভূতের কাজ বলা আমাদের অভ্যাস। কারণ জানলে ভূতের নাম ঘোচে।[২৪]

এছাড়াও আরও কয়েকজন লেখকের লেখায় ভূত-প্রেত, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার-এর বিরোধিতার নিদর্শন মেলে। বিজ্ঞান আন্দোলনে পত্রপত্রিকা এবং ব্যক্তির ভূমিকা আলোচনা করার পর এবার আমরা বিজ্ঞান সংগঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আমরা সব সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা না করে প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটিকে বেছে নেব।

আসামের এক বিশিষ্ট বিজ্ঞান সংগঠন হল 'অসম বিজ্ঞান সমিতি' বা (ইংরেজিতে) 'অসম সায়েন্স সোসাইটি'।[২৫] এই সংগঠন স্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালে। প্রধানত আসামের কয়েকজন বিজ্ঞান শিক্ষকের উদ্যোগে গৌহাটিতে এই সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ। আর এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মাতৃভাষা অসমিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করার এবং জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরবর্তীক্ষেত্রে এই সংস্থার কার্যক্রমে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং সাক্ষরতা বিষয়ক কাজকর্ম যুক্ত হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে সমিতি, অসমিয়া ভাষায় 'বিজ্ঞান জ্যোতি' নামক একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে। এছাড়া 'জার্নাল অব অসম সায়েন্স' নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা ছাড়াও সমিতি থেকে

নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করা হয় ইতিমধ্যে যার সংখ্যা প্রায় একশো। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' এবং 'শিশু বিজ্ঞান কোষ'-এর প্রকাশ।[২৬]

সাক্ষরতা প্রসারের লক্ষ্যে সমিতির একটি বিশেষ শাখা রয়েছে যার নাম 'জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি, অসম'। লেখা পড়া অংকের সংকীর্ণ সাক্ষরতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সমিতি, বিজ্ঞান সাক্ষরতার প্রসারে প্রয়াসী। সেজন্য সমিতি বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতি বছর একটি মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠ্যপুস্তকের মানরক্ষার ক্ষেত্রেও সমিতি সচেষ্ট। হাতে কলমে বিজ্ঞানচর্চার আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে সমিতি, বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় 'সায়েন্স কিট' তৈরি করেছে। পাঠ্যসূচি বহির্ভূত বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে সমিতি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 'হবি ক্লাব' গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে।[২৭]

আর একধরনের ক্লাব, 'টাকা ক্লাব' ও সমিতি গড়ে তুলেছে পরিবেশকে ভাল রাখতে। টাকা ক্লাব ছাড়াও সমিতি পরিবেশ সচেতনতা বিকাশের জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণের আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দুটি গ্রামকে বেছে নিয়ে সেখানে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কাজ করেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হয়ে অসম বিজ্ঞান সমিতি প্রাথমিকভাবে জোর দিয়েছে রোগ প্রতিরোধে। সমিতির অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে নিরাপদ পানীয় জল এবং কম খরচে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা।[২৮]

আসামের আর একটি বিজ্ঞান সংগঠন 'স্টুডেন্টস সায়েন্স সোসাইটি'-র অবস্থানও গৌহাটিতে। এই সংস্থা পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান ক্লাবদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, এমন নজির রয়েছে। 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্য না হলেও, ১৯৮৬ সালে এই সংগঠন (ইসকা)-এর উদ্যোগে যে পঞ্চম সারা ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকায় 'স্টুডেন্টস সায়েন্স সোসাইটি'-র নাম পাওয়া যায়।[২৯]

আসামের বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে গৌহাটির 'প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান সমিতি'র কথা বলতেই হয়। এই সমিতি বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ক নানান আলোচনা সভার আয়োজন করে। পরে সেখানে আলোচিত প্রবন্ধগুলো সঙ্কলিত আকারে প্রকাশিত হয়। এই ধরনের সঙ্কলনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ 'অসমত বিজ্ঞানচর্চার ধারা' (১৯৯৫), এতে আসামে বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা-সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই অ্যাকাডেমিক

আলোচনায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান/সমিতির কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। 'প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান সমিতি' যে বিজ্ঞান এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত তার পরিচয় মেলে তাদের প্রকাশিত 'বিজ্ঞান, অন্ধবিশ্বাস আৰু সমাজ'[৩০] বইতে। 'বিজ্ঞান আৰু মুল্যবোধ'[৩১] শীর্ষক আর একটি বইয়ের কথাও উল্লেখযোগ্য।

আসামের বিজ্ঞান আন্দোলনে পরিবেশ, একটা বিরাট কাজের ক্ষেত্র। সত্যি কথা বলাতে কি পরিবেশ সমস্যা এখন আর কোনও ভৌগোলিক সীমা মানে না। এই সমিতির উদ্যোগে পরিবেশ প্রদূষণ আৰু নিয়ন্ত্রণ'[৩২] শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়। এতে সাধারণভাবে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলেও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে আসামের সেই সময়কার অবস্থা। দূষণের নানান দিক, তা নিয়ন্ত্রণের উপায়, জনসাধারণের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় এই বইতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল।

পরিবেশ বলতে শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ বোঝায় না। সামাজিক পরিবেশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই সামাজিক পরিবেশ ভাল করার কাজে নিয়োজিত 'গণবিজ্ঞান সংসদ, করিমগঞ্জ'। এদের দ্বিমাসিক পত্রিকার নাম 'গণবিজ্ঞান'। এই পত্রিকার বিষয়সূচির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, মানবদরদী বিজ্ঞানীর জীবন ও সাধনা, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের খবরাখবর, পরিবেশ, বিজ্ঞানের খবর ইত্যাদি।[৩৩]

আসামের বিজ্ঞান আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক রূপরেখা এই নিবন্ধে তুলে ধরা হল তাতে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল তিনটি ধারা, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জনকল্যাণের চেষ্টা, আসামেও সক্রিয়। আর এই তিন ধারার কুশীলব হল পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তি এবং বিজ্ঞান সংগঠন। উনিশ শতকে মিশনারী এবং ব্যক্তিমানুষের প্রয়াসে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যে বিজ্ঞান আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা বিশ শতকে সংগঠনকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকা এবং কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বহুমাত্রিক এই বিজ্ঞান আন্দোলন, আসামের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে আরও ভাল, আরও উন্নত করতে সচেষ্ট।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) বিজ্ঞান এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ক্লাসিক গ্রন্থ হল জন ডেসমন্ড বার্নালের সায়েন্স ইন হিস্ট্রি (ইতিহাসে বিজ্ঞান)। সাম্প্রতিককালে এই সম্পর্ক নিয়ে নানান গবেষণা হচ্ছে; বইপত্র বের হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দু'একটা বইয়ের নাম করা যায়— অরুণ কুমার বিশ্বাস

সম্পাদিত, 'হিস্ট্রি, সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনটেক্স্ট্', কলকাতা, ২০০১।

* ধ্রুব রায়না এবং এস. ইরফান হাবিব, 'ডোমেসটিকেটিং মডার্ন সায়েন্স ঃ এ সোশাল হিস্ট্রি অব সায়েন্স অ্যান্ড কালচার ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, নিউদিল্লী, ২০০৪।

* অশোক মুখার্জী, 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অ্যান্ড সায়েন্স ঃ ভিউড ফ্রম দ্য ইন্টারফেস', কলকাতা, ২০০৫।

২) সব্যসাচী চ্যাটার্জী, 'এ হিস্টোরিকাল স্টাডিজ অব দ্য সায়েন্স মুভমেন্টস্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ৯১৯৪৭-১৯৯৭)' অপ্রকাশিত পি.এইচি.ডি. থিসিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, 'ইন্ট্রোডাকশন' অংশ দ্রষ্টব্য।

৩) এপ্রসঙ্গে প্রথম জানা যায় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৪-১৮৯৮) প্রয়াসে, ১৮৮৬ তে তিনি আসামের চা-বাগিচা শ্রমিকদের দুর্দশার কাহিনী শুনে সেখানে যান। যেহেতু কোনও বহিরাগতকে বাগিচাগুলিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হত না সেহেতু দ্বারকানাথ কুলির ছদ্মবেশে চা বাগিচাগুলি পরিদর্শন করতে যান। তাঁর প্রতিবেদন কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত বাংলা পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' এবং সুরেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য বেঙ্গলী'তে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন বাগিচা শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বারকানাথ আসামের চা-বাগানের কুলিদের কাজের অবস্থা এবং নিয়োগ পদ্ধতি দেখার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে সরকারকে একটি তদন্ত কমিশন নিয়াগ করার অনুরোধ করেন। ওই অধিবেশনে আসামের চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকদের দাসত্ব বিলোপ করার আহ্বান জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও রাখী চট্টোপাধ্যায়, বাংলার মুক্তি-সন্ধানী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪৪-৪৭।

৪) বন্দিতা ফুকন, 'পপুলারাইজেশন অব সায়েন্স ইন আসাম ঃ এক্সামপল্স্ ফ্রম প্রি-ইন্ডেপেনডেন্ট ইন্ডিয়া'; নরেন্দ্র কে. সেহগাল, সভপাল সাঙ্গয়ান, সুবোধ মহান্তি সম্পাদিত 'আর্নচার্টেড টেরোইনস্' এসেস অন সায়েন্স পপুলারাইজেশন ইন প্রি-ইন্ডেপেনডেন্স ইন্ডিয়া', নিউ দিল্লী, ২০০০, পৃ. ১৪৭।

৫) পূর্বোল্লিখিত।

৬) বন্দিতা ফুকন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৭) পূর্বোল্লিখিত।

৮) পূর্বোল্লিখিত।

৯) শেষ অবধি ১৮৭৩ সালে জনমতের চাপে এবং উচ্চ আধিকারিকদের সুপারিশে, লেফটেনান্ট গভর্নর ঘোষণা করেন, বিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে শিক্ষার মাধ্যম হবে অসমিয়া। এ ব্যাপারে 'ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্' কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অসমিয়া

ভাষায় উপযুক্ত বই লেখার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়।

১৯০১ সালে গুয়াহাটীতে কটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সালে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি হয় যাতে ছিল ডার্ক রুম, অপটিকাল রুম এবং লেকচার-থিয়েটার। ১৯৩৯-৪০ এ জীববিদ্যা যুক্ত হয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার বাইরে কটন কলেজ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণেও প্রয়াসী হয়েছিল। এজন্য জনপ্রিয় বক্তৃতা এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হত। ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে কটন কলেজ যুদ্ধর জন্য অর্থ সংগ্রহর উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী সংগঠিত করে।

দ্রষ্টব্য ঃ বন্দিতা ফুকন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫০।

১০) বন্দিতা ফুকন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০ এবং প্রসেনজিৎ চৌধুরী, 'উনৈশ শতিকার অসমত যুক্তিবাদী চেতনা' (অসমিয়া); পরমানন্দ মজুমদার সম্পাদিত 'বিজ্ঞান আরু মূল্যবোধ', গুয়াহাটী, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩।

১১) বন্দিতা ফুকন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে ঃ

* এম. নিওগ, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন ঃ প্লী ফর আসাম অ্যান্ড আসামিজ, যোরহাট, ১৯৭৭ এবং

* গুণাভিরাম বড়ুয়া, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন-চরিত্র. গুয়াহাটী, ১৯৭১।

১২) বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া সঙ্কলিত, 'অরুনোদইর ধলকাট' (অসমিয়া), যোরহাট, ১৯৬৫।

১৩) প্রসেনজিৎ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

১৪) অরুণোদইর ধলকাট, পৃ. ১০।

১৫) পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১।

১৬) পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮ (ভাবানুবাদ বর্তমান লেখকের)

১৭) বন্দিতা ফুকন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

১৮) পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫১।

১৯) পূর্বোল্লিখিত।

২০) বিশদ আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে ঃ সর্বেশ্বর কটকী, হেমচন্দ্র বরুয়ার জীবনচরিত (অসমিয়া), যোরহাট, ১৯৮১, পৃ. ৩৩।

২১) সর্বেশ্বর কটকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, (ভাবানুবাদ বর্তমান লেখকের)।

২২) হেমচন্দ্র বড়ুয়া, বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়া ভাতুরী (অসমিয়া), শিবসাগর, ১৯৫৯।

২৩) প্রসেনজিৎ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

২৪) নগেন শইকীয়া সঙ্কলিত, আসাম-বন্ধু, গুয়াহাটী, ১৯৮৪, পৃ. ২৩৮, (ভাবানুবাদ বর্তমান লেখকের)।

২৫) সমিতির প্রচারপত্র, তারিখবিহীন।

২৬) সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, 'পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলন', উৎস মানুষ, কলকাতা, নভেম্বর-

ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

২৭) পূর্বোল্লিখিত।

২৮) পূর্বোল্লিখিত।

২৯) প্রোসীডিংস জার্নাল অব ফিফথ্ অল ইন্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব কনফরেন্স, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৩, বাগনান, হাওড়া, পৃ. ৩১।

৩০) পরমানন্দ মজুমদার সম্পাদিত 'বিজ্ঞান, অন্ধবিশ্বাস আরু সমাজ' (অসমিয়া) প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান সমিতি, গুয়াহাটী, ১৯৯৩।

৩১) পরমানন্দ মজুমদার সম্পাদিত বিজ্ঞান আরু মূল্যবোধ, (অসমিয়া) গুয়াহাটী, ১৯৯৩।

৩২) জগন্নাথ পাটাগরি, পরিবেশ প্রদূষণ আরু নিয়ন্ত্রণ (অসমিয়া), প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয় ভূগোল সংস্থা, গুয়াহাটী, ১৯৯৭।

৩৩) সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, উৎস মানুষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

# সারাংশ

## সুভাষচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনায় বিবেকানন্দ

রত্না ঘোষ

সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর-লোক আলোকিত করে যে 'পুরুষমহাত্তম' তাঁকে জীবন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন— তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। বৈদিক ভারতবর্ষের তেজ, বলিষ্ঠতা, সমাহিত আত্মশক্তি ও বিশুদ্ধভাব— সবই তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। তাই সুভাষচন্দ্র 'নিছক রাজনীতিক' না হয়ে একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক হয়ে উঠেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'শিব-জ্ঞানে জীবপূজা'— সুভাষচন্দ্রের দেশসেবার ভিত তৈরী করেছিল। অন্তর্লোকে তিনি বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য আর উদ্দীপ্ত কর্মজীবনে তিনি বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য। সুভাষচন্দ্র যথার্থভাবেই বুঝেছিলেন যে জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দের ভূমিকা শুধুমাত্র একজন হিন্দুধর্ম প্রচারক সন্ন্যাসী রূপে নয়, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, ভারতের নবজাগরণের পুরোধা। ভারতীয় ভাববাদী দর্শন বেদ-বেদান্ত যে তৎকালীন ইউরোপের যে কোন ভাববাদী দর্শনের তুলনায় অনেক ঐশ্বর্যময় ও উন্নততর— এটাই ছিল বিবেকানন্দের প্রচারের বিষয়। শিকাগো ধর্মসভায় তিনি যে সনাতন বেদান্ত ভাবনাকে দৃপ্ত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাত্ম করে ভাষণ দিয়েছিলেন— তার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল আসমুদ্র হিমাচলে। স্বাদেশিকতার আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল আপামর ভারতবাসী। একশো বছর আগের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ যেভাবে হিন্দুধর্মকে অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বন্ধন থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ মুক্ত জ্ঞান ও কর্মের উৎস করে তোলেন এবং সর্বোপরি তার সঙ্গে দেশাত্মবোধ ও মানবিকতাকে যুক্ত করেন— তা ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে ঐক্য গড়ে তোলার বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক কারণে ধর্মের মাধ্যমে তা আর বাস্তবায়িত করা যায় নি। কিন্তু বিবেকানন্দের সেই আকাঙ্ক্ষা আরও বাস্তব এবং সক্রিয় রূপ পেয়েছিল সুভাষচন্দ্রের কর্মসাধনায়। বিবেকানন্দের যাবতীয় গঠনমূলক পরিকল্পনাকে সুভাষচন্দ্র দেশ ও জাতি গঠনের কাজে ব্যবহার করেন। তাই বিবেকানন্দকে যদি ভারতের জাতীয় পুনর্জাগরণের উদ্‌গাতা বলা হয়— তবে সেই পুনর্জাগরণের বাস্তব রূপকার হলেন বিপ্লবী যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র।

# শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

**বিশ্বজিৎ রায়**

শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Education is the manifestation of thc perfection already in man." — মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান তাহার প্রকাশই হল শিক্ষা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টা যখন ভারতবর্ষে তথা সমগ্র পৃথিবীর বুকে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের জাতীয় চেতনা ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। প্রধানত ধর্মপ্রচারক হলেও বিদেশী শাসন ও শোষণে জর্জরিত ভারতবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দ আত্মবলে বলীয়ান হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তঃস্বার-শূণ্যতাকে উপলব্ধি করে তিনি প্রকৃত মানুষ তৈরীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই মানুষের মন থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে দূর করা যায়। আমি জনসমক্ষে এই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করব যে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে তিনি মনোযোগ, একাগ্রতা ও ধ্যানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল 'গণশিক্ষার প্রসার'কে দেশের অগ্রগতির পূর্বশর্ত হিসাবে প্রচার করা। স্বামীজী বলেছেন— আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় পাপ হল জনগণকে অবহেলা করা আর এটাই আমাদের পতনের কারণ। গণশিক্ষার জন্য তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, সমাজ সেবা প্রভৃতি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল সমাজে স্ত্রীজাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন জাতির উন্নতি হবেনা। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি নারী মঠ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের কথা বলেন।

কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে স্বামীজি বলেছেন যে, কারিগরি শিক্ষার প্রসার হলে ছাত্রেরা কেবল চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে নিজেরাই বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্প উৎপাদন করতে সক্ষম হবে এবং তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে

পারবে। সমাজ সেবার ব্যাপারেও ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে যাতে তারা নিজেদের আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক উন্নতির ব্যাপারেও যত্নবান হতে পারে। প্রধানত সন্ন্যাসী হলেও ভারতবর্ষের শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন তা বিচার করলে তিনি যে একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

# বাঙালির ফুটবলে ঘটি-বাঙাল ঃ ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি সামাজিক দ্বন্দ্ব

**কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়**

উপনিবেশিক ভারতে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা বিকশিত হয়েছিল।[১] উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা ও দেশভাগ— এই পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অবশ্য খেলাটি এক অন্যতর সামাজিক প্রভেদের প্রতিফলক হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে ঘটি-বাঙাল[২]-এর সামাজিক দ্বন্দ্ব ফুটবল মাঠে দুই জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল-এর ময়দানী লড়াই এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিপরীতমূলক সাংস্কৃতিক সত্বা, সামাজিক প্রভেদ ও আবেগের সাযুজ্যকে ভিত্তি করে গঠিত দু' প্রধানের লড়াই বৃহত্তর অর্থে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[৩] এই ফুটবল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও প্রসার মূলত সামাজিক ও উপপ্রাদেশিক বিভেদকে কেন্দ্র করে ঘটলেও ক্রমে তা এক তীব্র ক্লাব সংঘাত তথা সমর্থক দন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার গত দশ বছরে খেলায় বাণিজ্যিকীকরণ ও পেশাদারিকরণ-এর প্রেক্ষিতে এই দ্বন্দ্বের অন্যতর তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যায়।

'ঘটি' ও 'বাঙাল' শব্দদুটি যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার আদি অধিবাসীদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য বাংলা অভিধানে 'বাঙাল' শব্দটির বহুল ব্যবহৃত হলেও 'ঘটি' শব্দের ব্যবহার প্রায় বিরল। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই পূর্ব বাংলা হতে আগত পড়াশুনো বা কর্মসূত্রে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত কলকাতায় 'বাঙাল' অভিধায় তাচ্ছিল্য করা হত।[৪] অন্যদিকে, 'ঘটি' শব্দের উৎপত্তি ও ব্যবহারিক তাৎপর্য্য নিয়ে মতপার্থক্য[৫] থাকলেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এদেশীয়দের দ্বারা অবজ্ঞা ভরা 'বাঙাল' ডাকের প্রত্যুত্তর রূপেই পূর্ববঙ্গীয়রা এদেশীয়দের বোঝাতে 'ঘটি' শব্দের ব্যবহার শুরু করে। এক ধর্ম, এক ভাষা বা এক সাংস্কৃতিক অতীত এর অংশীদার হলেও এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপভাষা, আচার-ব্যবহার, সাজ-পোষাক, খাদ্যাভাস ও সংস্কার-রীতি-নীতি, এমনকি দৈহিক দর্শনের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট পার্থক্য প্রতীয়মান ছিল। এইসব সাংস্কৃতিক প্রভেদ হয়ত আপাতদৃষ্টিতে তেমন কঠোর ছিল না, কিন্তু বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে এগুলোই স্পষ্টতর সামাজিক সত্বার

জন্ম দিতে সমর্থ ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে পশ্চিম বাংলায় অসংখ্য হিন্দু শরনার্থীর আগমন স্থানীয় সমাজে এ ধরণেরই এক উপপ্রাদেশিক সামাজিক দ্বন্দ্ব বিস্তারের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করেছিল বলা চলে। এই প্রেক্ষাপটেই পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের কাছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের সামাজিক সত্বা তথা সাংস্কৃতিক 'নিজ' (self)-এর প্রতিনিধিস্বরূপ 'অপর' (other) অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গীয়দের ক্লাব মোহনবাগানের বিপক্ষে লড়াই ও জয়লাভের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। যদিও দেশ-বিভাজনের পরেই এই সংঘাত তীব্রতা অর্জন করেছিল, ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্মলগ্ন হতেই এই দ্বন্দ্বের উৎস সন্ধান করা যায়।

বিশ শতকের প্রথম দু'দশক কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবদলগুলোতে পূর্ববঙ্গ হতে আগত ফুটবল খেলোয়াড়গণ নিয়তই নানা বৈষম্যের শিকার হতেন। এই বৈষম্য বঞ্চনার প্রতিবাদস্বরূপ ১৯২০ সালে মূলত পূর্ববঙ্গীয় কিছু ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষনায় পূর্ববঙ্গীয় খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম হয়।[৬] ময়মনসিংহ জেলার নাগরপুরের জমিদার তথা কলকাতার ধনী প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ক্রীড়া সংগঠক সুরেশ চৌধুরী এবং কলকাতা ময়দানের দুই প্রতিষ্ঠিত পূর্ববঙ্গীয় ফুটবলার নসা সেন ও শৈলেশ বসু ক্লাব গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। ক্লাবের নামকরণ থেকেই স্পষ্টত বোঝা যায় যে সমর্থনের ভিত্তি জোরদার করতে প্রথম থেকে ক্লাব কাদের প্রতি আবেদন রেখেছিল। খুব শীঘ্রই ভাগ্যকুলের রায়বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায়, মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় এবং প্রখ্যাত ক্রীড়া সংগঠক পঙ্কজ গুপ্ত ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসলে ইস্টবেঙ্গল দ্রুত নিয়ন্ত্রক সংস্থা আই.এফ.এ-র অনুমোদন সহ দ্বিতীয় বিভাগে খেলার সুযোগ লাভ করে এবং ময়দানে মোহনবাগানের অংশীদার রূপে মাঠ পেয়ে যায়। অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের মতো সদ্যজাত একটি ক্লাবের এই দ্রুত ও ক্রমিক উত্থানকে মোহনবাগান সহ তথাকথিত কুলীন বাঙালি ক্লাবগুলো আদৌ সুনজরে দেখে নি। ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ লাভকে কেন্দ্র করে আই.এফ.এ-তে চূড়াত বিতর্ক ও বাদানুবাদ ছিল এ হেন দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন।[৭] এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, ইস্টবেঙ্গলের প্রথম বিভাগে উন্নীত হবার প্রশ্নটি সম্পূর্ণ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত হলেও মোহনবাগান ও এরিয়ান আশ্চর্যজনকভাবে ঐ প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিল।[৮] অথচও প্রায় সব ইউরোপীয় ক্লাবই এই বিতর্কে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ঐ দাবিতে তারা একযোগে লিগ খেলা হতে দল প্রত্যাহারারের মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত গ্রহণ করে।[৯] এই পরিস্থিতিতেই শেষ পর্যন্ত আই.এফ.এ ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম বিভাগে উন্নীত করতে এবং

একই সঙ্গে এযাবৎ প্রথম বিভাগীয় লিগে দুয়ের বেশি ভারতীয় দলের অংশগ্রহণের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নিতে বাধ্য হয়।[১০] সমসাময়িক সংবাদপত্রে অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি অন্য ভারতীয় দল বিশেষত মোহনবাগানের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।[১১] সম্ভবত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রমবর্দ্ধিত জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক শক্তি ও খেলায়াড় সংগ্রহে দক্ষতা মোহনবাগানের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[১২] সময়ের সাথে সাথে বিশেষত ১৯৩০-এর দশকে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আর শুধুমাত্র বাঙাল খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত না হলেও পশ্চিম বাংলায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় জনতার চোখে ক্লাবটি এক আবেগঘন সম্পর্কের প্রতীক হয়ে ওঠে। এর ফলে ঘটি-বাঙাল প্রচ্ছন্ন সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিনিধি ফুটবলে জাতীয়তাবাদী সত্বায় আঘাত হেনেছিল বলা যায়।

সম্প্রতি পল দিমিও (Paul Dimeo) তাঁর গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও তজ্জাত রাজনৈতিক টানা পোড়েনের আগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাব দুটি নাকি প্রায় প্রতিবেশীর মতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল।[১৩] দু'দলের একই মাঠের অংশীদারী হওয়া এবং ১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম লিগ জয়ে মোহনবাগানর চায়ের আসর আয়োজনকে দিমিও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপনা করেছেন।[১৪] আসলে দিমিও-র মূল লক্ষ্য হল দু'দলের ফুটবল দ্বন্দ্বকে দেশভাগ উত্তর পরিযান সমস্যার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে দিমিওর দু'একটি বক্তব্য স্ববিরোধিতার নমুনা বহন করে।[১৫]

তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার নিরিখে দিমিও-র বক্তব্য ও যুক্তিসমূহ সারবত্তাহীন বলে মনে হয়। প্রথমত, ময়দানে একই মাঠের অংশীদার হওয়া দু'ক্লাবের বন্ধুত্ব নয়, দ্বন্দ্বই বাড়িয়েছিল। বাংলা ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হঠাৎ উত্থান মোহনবাগান বোধহয় খুব একটা সুনজরে দেখেনি।. ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম বিভাগে ওঠার প্রশ্নে মোহনবাগানের চূড়ান্ত বিরোধিতা দু'দলের দ্বন্দ্বকে প্রথম থেকেই তীব্রতর করেছিল। ১৯২০-৩০ এর দশকে দু'দলের খেলা প্রায়শই সুতীব্র দর্শক উন্মাদনা ও হিংসা-র কেন্দ্রে পরিণত হত। ১৯৩২ সালে দুই প্রধানের খেলাটিকে সম্ভাব্য দর্শক হামলার আশঙ্কায় লিগ কমিটি সি.এফ.সি. মাঠে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়।[১৬] ১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গলের লিগ জয়ে মোহনবাগানের চা-পানের আয়োজন এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত এবং এটি আসলে ক্লাবের উদারতা প্রদর্শনের কূটনৈতিক প্রয়াস ছিল বলে মনে হয়। অন্যদিকে, একটি বিশেষ মুসলমান দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল পারস্পরিক সহযোগিতা-র ধারণাটিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৩৯

সালে মহামেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল ও কালীঘাট তিনটি ক্লাব আই.এফ.এ.-র পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের প্রতিবাদে লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়।[১৭] ঐ বছরই তারা একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'বেঙ্গল ফুটবল অ্যাসোসেয়িশেন' গঠন করে এবং 'ব্র্যাবোর্ণ কাপ' নামে একটি নতুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সুতরাং, ১৯৪০-এর দশকে মুসলমান ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে হিন্দু ক্লাবদ্বয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-এর সহযোগিতার ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। বরং ঠিক তার বিপরীতে মোহনবাগানের প্রতি আই.এফ.এ.-র পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং এই দুই দলই যুগ্মভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রাক্কালে বাংলার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলেও খেলার মাঠে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দ্বন্দ্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। ১৯৪৬ সালে দু'দলের লিগম্যাচ গোলশূন্য শেষ হলে এবং ফলত ইস্টবেঙ্গল লিগ জয় করলে মাঠে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় এবং মোহনবাগান ক্লাব তাঁবু আক্রান্ত হয়।[১৮]

১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান হতে অসংখ্য হিন্দু শরণার্থীর পশ্চিম বাংলায় পরিযানের প্রেক্ষাপটে দুই ক্লাবের ফুটবল দ্বন্দ্ব এক কঠোর রূপ ধারণ করেছিল। এসময় পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের উপপ্রাদেশিক সত্তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গীয় স্থায়ী অধিবাসীদের স্বার্থ সংঘাত থেকে বাঙাল ঘটির সামাজিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর রূপ পরিগ্রহ করে। কলকাতাসহ এ বঙ্গে ঘটিদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে জীবন-জীবিকা অর্জনের লড়াইতে বাঙালদের মূলধন ছিল একটি সাধারণ আবাসভূমির স্মৃতি, একই দৈনন্দিন সংস্কৃতি আর নির্যাতন ভোগ ও পরিযানের একই অভিজ্ঞতা।[১৯] আর এরই ভিত্তিতে বাঙাল-রা পশ্চিমবঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি লাভের জন্যে লড়াই চালিয়েছিল। নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্বা ও একাত্মতা রক্ষা ও প্রকাশের প্রয়াসে তারা এক সার্থক মাধ্যম রূপে ফুটবল খেলাকে বেছে নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু শরণার্থীদের দৈনন্দিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি ফুটবল মাঠে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব হয়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা প্রকাশের মাধ্যম ও আত্মবিশ্বাস আত্মমর্যাদার প্রতীক। ১৯৪৯-৫৩ সময়সীমায় জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এবং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলায় ক্লাবের ধারাবাহিক সাফল্য[২০] বাঙাল অভিবাসীদের কাছে ঘটিদের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এক সাংস্কৃতিক অস্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই ঘটিদের দল মোহনবাগানের সঙ্গে বাঙালদের দল ইস্টবেঙ্গলের বিরোধ ময়দানের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক দীর্ঘমেয়াদী বিপরীতমূলক সামাজিক দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিল।

১৯৫০-৬০ এর দশকে দু'দলের খেলাকে কেন্দ্র করে দর্শক উন্মাদনা ও হাঙ্গামা এক নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে পুলিশি তৎপরতা এবং ক্লাব পুলিশ মতান্তর ময়দানে নতুন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। বিশেষত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পুলিশি সহায়তায় লিগ পরিচালনার আই.এফ.এ-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবাদ জানালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত ফুটবলের সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে চিন্তা প্রকাশ করেন।[২১] শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এতটাই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে যে তিনি ধর্মীয়, প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক উষ্ণতা সম্পন্ন ক্লাবের নাম পরিহার করার জন্যে আহ্বান জানাতে বাধ্য হন।[২২] বস্তুতপক্ষে ১৯৫০-৬০ এর দশকে হিন্দু শরণার্থীদের যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমুনিস্টদের সহায়তায় কংগ্রেস নের্তৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রত[২৩] তখন সাংস্কৃতিক স্তরে ফুটবল মাঠে ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রতিনিধিরূপে যেন লড়াই চালিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আবার নতুন করে হিন্দু শরণার্থীদের ধারাবাহিক পরিযান পশ্চিমবঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থনের ভিত্তিকে নিঃসন্দেহে আরও সুদৃঢ় ও আগ্রাসী করেছিল বলা যায়। ১৯৭০-৭৫ সময়কালে ক্লাবের অবিসংবাদী সাফল্য এই ধারাকেই যেন প্রতিফলিত করেছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, উপনিবেশিক বাংলায় ঘটি-বাঙাল ফুটবল দ্বন্দ্ব বাঙালির ঐক্যমূলক ক্রীড়া জাতীয়তাবাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল। কিন্তু দেশভাগের পরবর্তী তিন দশকে এই ফুটবল বিরোধ পরিযায়ী (immigrants) দের প্রতিষ্ঠিত সমাজে (host community) অঙ্গীভূত করতেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল বলা চলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এই উপপ্রাদেশিক তথা সামাজিক বিরোধক্রমে এক দীর্ঘমেয়াদী তীব্র ক্লাব-দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়েছিল। আর দুই ক্লাবের দ্বন্দ্বের এই নতুন সমীকরণে তীব্র ক্লাব আনুগত্য ও সমর্থক বিরোধ আগেকার সামাজিক বা উপপ্রাদেশিক সংঘাতকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ১৯৭০ এর দশকের প্রথমার্ধে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যুব সমাজে হিংসা ও সন্ত্রাসের ধারা যে প্রভাব ফেলেছিল, ফুটবল মাঠও তার থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। ফলে খেলার মাঠে দর্শক আচরণেও এর যথেচ্ছ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষিতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলাকে কেন্দ্র করে দু'দলের সমর্থকদের উত্তেজনা ও সংঘাত এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। প্রিয় দলের জয় বা পরাজয় সমর্থকদের মধ্যে অতি স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস বা তীব্র হতাশার সৃষ্টি করত। ১৯৭৫ সালের শিল্ড ফাইনাল-এ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ০-৫ ব্যবধানে মোহনবাগানের পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে পঁচিশ বছরের যুবক উমাকান্ত পালোধি-র আত্মহত্যা এজাতীয়

অতি আবেগেরই প্রতিফলন ছিল।[২৪] সত্তর দশক জুড়ে এরকম আরও অনেক ঘটনার নমুনা পাওয়া যায়। তবে দু'দলের খেলায় দর্শকাচরণের চরিত্রে যে এক আশঙ্কাজনক মৌলিক পরিবর্তন এসেছিল, তা ঐ সময়কার পত্র-পত্রিকায় আভাসিত হচ্ছিল।[২৫] শেষপর্যন্ত ১৯৮০ সালে দু'দলের এক আপাত গুরুত্বহীন লিগ ম্যাচে দর্শক হাঙ্গামার বলি হয়ে কলকাতার ইডেন উদ্যানে ১৬ জন দর্শকের মৃত্যু হয়।[২৬] কলকাতার ফুটবলের এই ট্রাজিক দুর্ঘটনা বাঙালির ফুটবল সমাজে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঘটি-বাঙাল ফুটবল দ্বন্দ্বের বিরোধমূলক চরিত্রায়ণের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ প্রথম থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর সেটি হল ১৯২০-র দশকের কিছু সময় ছাড়া আর কখনই কিন্তু দু'দলের খেলোয়াড়রা ঘটি বাঙাল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন না। মোহনবাগানে খেলে যাওয়া অসংখ্য বাঙাল খেলোয়াড় ছিলেন সে দলের সাফল্যের কাণ্ডারি, আবার ইস্টবেঙ্গলে খেলে সুনাম অর্জন করেছেন অসংখ্য ঘটি খেলোয়াড়। ১৯৮০-র দশকে এসে দু'দলের সমর্থকদের সমর্থনের ভিত্তিতেও ক্রমশ অনুরূপ স্ববিরোধী পরিবর্তন স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। অনেক ঘটিও ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ও অনেক বাঙালই মোহনবাগানপ্রেমী হতে শুরু করেন। তাছাড়া ঘটি-বাঙাল, যা কখনই খুব কঠোর বিভাজন ছিল না, আশির দশক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালির কাছে খুব অস্পষ্ট ও মিশ্র একটি ধারণা রূপে প্রতিপন্ন হতে শুরু করে। ফলে ক্লাব সমর্থনের ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে সামাজিক বিরোধ বা উপপ্রাদেশিকতার স্থলে পারিবারিক প্রভাব, পারিপার্শ্বিক তথা আঞ্চলিক অবস্থা, মুহূর্তকালীন বা সাময়িক সাফল্য কিংবা ক্লাব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছিল। সুতরাং প্রথম থেকেই ঘটি বাঙাল দ্বন্দ্ব কোন জাতিগত (ethnic) দ্বন্দ্ব ছিল না,[২৭] পরবর্তীতে উপপ্রাদেশিক বা সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে উগ্রসমর্থন ভিত্তিক ক্লাবদ্বন্দ্বই মূল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

গত আড়াই দশকে বাঙালির ফুটবল নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।[২৮] খেলার মাঠে ঘটি-বাঙাল ক্রমশ ফিকে হয়ে প্রায় মুছে যাবার উপক্রম হলেও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দ্বন্দ্বে কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। তবে ১৯৯৭ সালে একই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান [২৯] দুদলকে স্পনসর করার সিদ্ধান্ত হলে দু'দলের চির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক চরম সংকটের সম্মুখীন হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। এমনকি প্রকাশ্যে এবং পত্র-পত্রিকায় এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দু'দলের সমর্থকরা প্রতিবাদমূলক বিবৃতিও দিতে থাকেন। কিন্তু এই আশঙ্কা যে অমূলক, তা ঐ একই বছরে প্রমাণিত হয়। ঐ বছর ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনাল খেলায় দু'দলের ম্যাচে কলকাতার

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে দর্শক সমাগম[৩০] কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে দর্শক সংখ্যায় বিশ্বরেকর্ড করেছিল। নতুন শতাব্দীর সূচনাতেও দুই ক্লাবের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এমনকি গত তিন বছরে একদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভারতের সেরা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যতম সেরা ক্লাবদল হিসেবে আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে ক্লাবকর্তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক দুর্বলতা আর আদালতের সমস্যায় জাতীয় ক্লাব মোহনবাগানের চূড়ান্ত নৈরাজ্য ও জরাজীর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও দু'দলের সমর্থকদের কাছে তথা বাঙালি ফুটবল প্রেমীর কাছে দুই ক্লাবের ময়দানী বিবাদ আজও ইলিশ আর চিংড়ি-র প্রতীকী লড়াই রূপে বিদ্যমান। আগামী দিনেও বাঙালির ফুটবলকে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল 'নিজ-অপর' বিপরীতমুখী ধারণা ভিত্তিক ও আবেগমূলক দ্বন্দ্ব-ই চালিত করবে বলে অনুমান করা যায়।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) উপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার প্রতিফলকরূপে ফুটবল খেলার তাৎপর্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনার জন্যে দেখুন ঃ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ''রেস্, নেশন, স্পোর্ট, ফুটবলিঙ্ ন্যাশনালইজম ইন কলোনিয়াল ক্যালকাটা'', 'সকার অ্যান্ড সোসাইটি', ৪.১ (মার্চ ২০০৩), পৃ. ১-১৯, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ''বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও ক্রীড়াসত্বা'', গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসাধন-১৭' (কলকাতা, ২০০৩) এর অন্তর্গত, পৃ. ৫৫৪-৫৬৪, বোরিয়া মজুমদার, ''পলিটিক্স অফ সকার ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া'', 'সকার অ্যান্ড সোসাইটি', ৩.৩ ( সেপ্টেম্বর, ২০০৩)।

২) বাঙালি সমাজে ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় আলোচনার জন্যে দেখুনঃ মনসুর মুসা, ''ঘটি-বাঙাল এর বিরোধ নিষ্পত্তি'', নীতিশ বিশ্বাস ও মুকুলেশ বিশ্বাস সম্পাদিত 'বঙ্গ-সংস্কৃতির সংহতির ঐতিহ্য'-এর (ঐকতান গবেষণা সংসদ, ১৯৯৫) অন্তর্গত, পৃ. ২৩৫-২৪২।

৩) এ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম গবেষণার জন্যে দেখুন ঃ বোরিয়া মজুমদার ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফুটবল ঃ স্ট্রাইভিং টু স্কোর' (লন্ডন, ২০০৫), পৃ. ২১০-২২৬।

৪) সে যুগের বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র-র রচনা 'সধবার একাদশী'-তে বাঙালদের প্রতি এই আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৫) অনেকের মতে, উনিশ শতকে কলকাতায় জলের কলের প্রচলন না থাকায় প্রতি বাড়িতেই কূয়া থাকত এবং প্রায়শই ঘটি-পাত্র তার মধ্যে পড়ে যেত। প্রতিদিন বিকালে কিছু লোক সেগুলোকে কূয়া হতে তোলবার জন্যে দড়ি ও বড়শি নিয়ে বেরোত এবং 'ঘটি তুলবেন' 'ঘটি তুলবেন' রবে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াত। ঐসব এলাকায়

বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয়গণ রোজকার ঐ ডাক শুনে ধারণা করেছিল যে পশ্চিমবাংলার স্থানীয় অধিবাসীদের বোধহয় 'ঘটি' বলা হয়।

উপরোক্ত মতের বিপরীতে কেউ কেউ 'ঘটি' শব্দের উৎপত্তির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে একটি জনপ্রিয় বক্তব্য হল এরকম ঃ একবার একজন গৌড়দেশীয় ব্যক্তি পূর্ব বাংলায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবার সময় নিত্য প্রয়োজনের ঘটিটি সঙ্গে নিতে ভুলে যান। সঙ্গের ঘটি না থাকায় ভদ্রলোক নিতান্ত অস্বস্তিতে পড়ে শেষ পর্যন্ত আত্মীয়ের এক পড়শির বাড়ি থেকে একটি ঘটি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। এর ফলে পূর্ববঙ্গীয়দের চোখে গৌড়বাসী তথা পশ্চিমবঙ্গীয়দের হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং শেষোক্তগণ 'ঘটি' বলে পরিচিতি হন।

৬) ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসকারগণ সকলেই এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশদ আলোচনার জন্যে দেখুন ঃ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল' (কলকাতা, ১৯৭৯), জয়ন্ত দত্ত, 'গ্লোরিয়াস ইস্টবেঙ্গল' (কলকাতা, ১৯৭৫), পরেশ নন্দী, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, ১৯২০-৭০, পঞ্চাশ বছরের সংগ্রাম ও সাফল্য' (কলকাতা,১৯৭৩), পণ্ডিত মশাই, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস' (কলকাতা,১৯৬৩), রূপক সাহা, 'ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল' (কলকাতা, ২০০০)।

৭) উক্ত বিতর্কের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ মজুমদার ও বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এ সোশ্যাল হিস্ট্রি', পৃ. ১৬৪, ১৬৮, ২১৪-১৫, ২২৩-২৪।

৮) সুখরঞ্জন ঘোষ, 'ভারতীয় ফুটবলের তিন প্রতিদ্বন্দ্বী' (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ. ৮১।

৯) দ্য ইংলিশম্যান, ২৪ এপ্রিল, ১৯২৫।

১০) ঐ, ২ মে, ১৯২৫।

১১) দ্য স্টেটস্ম্যান, ২২ এপ্রিল, ১৯২৫।

১২) ঐ।

১৩) পল দিমিত্ত, "টিম লয়্যালটি স্পিলিটস্ দ্য সিটি—ইন টু টু" ঃ ফুটবল, এথনিসিটি এ্যান্ড রাইভ্যালরি ইন ক্যালকাটা জি. আর্মস্ট্রং ও আর গিউলিয়ানটি সম্পাদিত 'ফিয়ার এ্যান্ড লোদিং ইন ওয়ার্ল্ড ফুটবল' (অক্সফোর্ড, ২০০১)-এর অন্তর্গত।

১৪) ঐ, পৃ. ১০০। দিমিত্ত-র আরও স্পষ্ট বক্তব্য হল ঃ 'The main difference at this time (the 1930s-40s) was that while Mohammedan Sporting's rivalry with several Hindu clubs prompted serious communal violence, the two most successful Hindu clubs were on friendly terms'.

১৫) যেমন, দিমিত্ত লিখছেন, 'Yet, an exhibition match in 1942 between the 'Bengalees' - a term referring to the West Bengalis and the Rest, took players' individual ethnicity as relevant : the Rest including Muslim, Europeans and East Bengalis' দিমিত্ত, 'টিম লয়্যালটি স্পল্টিস্', পৃ. ১০১।

১৬) দ্য স্টেটস্ম্যান, ৬ জুলাই, ১৯৩২।

১৭) 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সুভেনীর' (কলকাতা, ১৯৩৯), পৃ. ৬৬-৬৮, পরেশ নন্দী, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব', পৃ. ৮৪-৮৭, রূপক সাহা, 'ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল', পৃ. ৩৯-৪৩।

১৮) অমৃত বাজার পত্রিকা, ৭ই জুলাই, ১৯৪৬।

১৯) পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের দুর্ভোগের একটি সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক আলোচনার জন্যে দেখুন ঃ জ্ঞানেশ কুদাসিয়া, ''ডিভাইডেড ল্যান্ডস্কেপস, ফ্র্যাগমেন্টেড আইডেনটিটিস ঃ ইস্টবেঙ্গল রিফিউজিস ল্যান্ড দেয়ার রিহ্যাবিলিটেশন ইন ইন্ডিয়া', ১৯৪৭-৭৯'', ডি.এ. লো ও হাওয়ার্ড ব্রাস্টেড সম্পাদিত 'ফ্রিডম, ট্রমা অ্যান্ড কন্টিন্যুয়িটিস্' (নিউ দিল্লি, ১৯৯৮)-এর অন্তর্গত।

২০) এই সাফল্যের মূলে ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিখ্যাত 'পঞ্চপাণ্ডব' ফরোয়ার্ড লাইন—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালে।

২১) অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৯শে জুন, ১৯৫৫।

২২) ঐ, ১৭, ১৮, ২৪ জুলাই, ১৯৫৭।

২৩) পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক তৎপরতা ও শরণার্থী সমস্যার রাজনৈতিক যোগ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হল ঃ প্রফুল্ল চক্রবর্তী, 'দ্য মার্জিনাল মেন, দ্য রেফিউজিস্ অ্যান্ড দ্য লেফট পলিটিক্যাল সিনড্রোম ইন ওয়েস্টবেঙ্গল' (কলকাতা, ১৯৯০)

২৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫।

২৫) খেলার আসর, ৩ জুলাই, ১৯৭৯, পৃ. ৩৮। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ আগস্ট ১৯৮০।

২৬) এই দুর্ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণের জন্য দেখুন ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ আগস্ট ১৯৮০, খেলার কাগজ ১ ও ১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৮০, খেলার কথা, ১ ও ১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৮০।

২৭) পল দিমিত্ত পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে মোহনবাগা -ইস্টবেঙ্গল তথা ঘটি-বাঙাল ফুটবল দ্বন্দ্বকে মূলত একটি ethnic বিরোধের ফলরূপে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ধারণা যে অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখিত যুক্তি ও উদাহরণ হতে তা স্পষ্ট হবে আশা করা যায়।

২৮) আশির দশকে এক দিকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিকল্প জনপ্রিয় খেলারূপে ক্রিকেটের উত্থান ও আন্তর্জাতিক স্তরে জাতীয় দলের সাফল্যের প্রেক্ষিতে খেলাটির ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে দূরদর্শনে সরাসরি বিশ্বকাপ ফুটবল প্রদর্শন এবং নব্বই দশকে স্যাটেলাইট টিভি-র মাধ্যমে ইউরোপ-লাতিন ও মেরিকার উন্নত ফুটবল লিগের প্রদর্শন এদেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তায় থাবা বসালেও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দ্বৈরথের গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল বলা যায় না।

২৯) দ্য ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিস্ গ্রুপ, যার অধিকর্তা হলেন বিজয় মালিয়া।

৩০) এই দর্শক সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১,৩১,০০০।

# বেতার নাটকের বিবর্তন ও বাংলার শ্রোতারা

## সুশান্ত কুমার ভৌমিক

বেতার নাটক বেতারের সম্পদ, তার গৌরব। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বাক্সের নাটক বলতে এখনও বেতার নাটক-ই বোঝে। বয়স্ক মানুষ মাত্রই জানেন, বেতার নাটকের কি প্রবল জনপ্রিয়তা ছিল আগে।

এখন প্রশ্ন হল, বেতার নাটকের চিন্তাটা মাথায় এল কিভাবে? কেবল কানে শুনে নাটক! তা আবার হয় নাকি?

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বেতার নাটক সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ হয় ১৯২২ সালের ৩রা আগষ্ট আমেরিকার Y.G.Y. স্টুডিওতে। পরবর্ত্তী আবির্ভাব B.B.C. স্টুডিওতে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে। ভারতবর্ষে বেতার নাটকের জন্ম ১৯২৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কলকাতা বেতার কেন্দ্রে[১] হলেও সেটি এখন তার একটি বিশেষ অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সমাজ মানসে তার প্রভাব ও আবেদন দুই-ই তীব্র। ইদানীং মঞ্চ নাটকের মত শ্রুতি নাটকও মঞ্চে আরোহন করেছে, তবে দৃশ্য হয়ে নয়, শ্রুতি হয়েই।

কলকাতা বেতার নাটকের আগে কয়েকটি ইংরাজী নাটক প্রচার করা হয়েছিল। সে সময় রেডিও শোনার পরিধি মোটামুটি শহর আর শহরতলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং শ্রোতাদের বেশীরভাগই ধনী এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের দাবি না মেনে উপায় ছিল না। রেডিওর প্রথম বাংলা নাটক 'বসন্তলীলা'। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে এই গীতি নাট্যটি নিবেদন করেছিল 'নাট্য মন্দির সংস্থা'। তবে এটা ঠিক বেতার ধর্মী নাটক ছিল না। সর্বপ্রথম প্রচারিত যথার্থ মঞ্চ নাটক ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদের 'নরনারায়ণ'। নাট্য মঞ্চ থেকে সরাসরি প্রচার করা হয়েছিল।[২]

কলকাতা বেতারের জন্মের পরে সরাসরি নাটক সম্প্রচার করা হত সাধারণ রঙ্গালয় থেকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তৈরী হল বেতার নাটুকে দল। নৃপেন মজুমদার, বাণী কুমার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মত নিবেদিত প্রাণ নাটুকে মানুষের হাত ধরেই এই বাংলায় বেতার নাটক তার স্বরূপের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকল।

মঞ্চসজ্জা, পোষাক, মেকআপ, আলো ছাড়াই, শুধু মাত্র সংলাপ, কণ্ঠ, মডুলিউশনের নৈপুণ্যে সাউন্ড এফেক্ট্‌স আর আবহ সুরের মূর্চ্ছনায় লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মনে তরঙ্গ তুলতে লাগল বেতার নাটক। শিশির কুমার ভাদুড়ী, অহিন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, নিভাননী দেবী, সরযূবালা দেবী, সন্তোষ সিংহ, ধীরেন দাসের মত বাঘা বাঘা অভিনেতা-অভিনেত্রী রেডিও নাটকে অংশ নিতে যেতেন রেডিওর পুরনো বাড়ী ১নং গারস্টিন প্লেসে। বাড়িতে বসে সেইসব দুর্লভ কণ্ঠস্বর আর বাচিক শৈলীতে চরিত্র নির্মাণ শুনতে শুনতে মজে যেতেন আপামর জনগণ।[৩]

ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাতেই যে প্রথম বেতার নাটক রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরও গর্বের বিষয় এই যে, এখানেই সূত্রপাত হিন্দি, উর্দু, এমনকি গুজরাটি নাটকেরও।[৪]

১৯২৮ এর সাড়া জাগানো ঘটনা বাংলার দরদী কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ ষোড়শীর প্রচার। প্রচার তারিখ ২৩শে জানুয়ারী রাত ৮টায়। নাটকের সময়সীমা দু ঘণ্টা। নিবেদন করেছিল 'নাট্য মন্দির সংস্থা'। জীবানন্দ চরিত্রে অভিনয় করেন শিশির কুমার ভাদুড়ী ও ষোড়শী চরিত্রে অভিনয় করেন চারুশিলা। ১৯২৮ এর ২১শে আগষ্ট 'চিকিৎসা সংকট' নামে একটি হাসির নাটক সন্ধ্যে ৭টা ৪০ মিনিটে প্রচার করা হয়েছিল। এটি হুবহু প্রচার করা হয়েছিল বলে, শ্রোতারা আশানুরূপ আনন্দলাভ করেনি। সেজন্য পরবর্ত্তীকালে এটিকে বেতার নাটকে রূপান্তরিত করেন কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী। তিনি এর নতুন নামকরণ করেন 'মন-পাখি'। ১৯২৮ এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কালজয়ী উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নাট্যরূপ 'ভ্রমর', 'দায়ে পড়ে দ্বার পরিগ্রহ' নাটকে নয়নতারা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ফলে তাঁকে মহিলার কণ্ঠস্বর নকল করতে হয়েছিল। বেতার নাটুকে দলের প্রথম অভিনয় সৌরিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'লাখ টাকা'।

১৯২৯ এর ২৮শে সেপ্টেম্বর, কলকাতা বেতারের স্মরণীয় দিন, গৌরবোজ্জ্বল দিন, কারণ— সেদিন সন্ধ্যা ৬টায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর নাট্যমন্দিরে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকটি মঞ্চ থেকে সরাসরি রীলে করে শোনানো হয়েছিল। কবি স্বয়ং ওই নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ স্টুডিওতে না এলেও নাটকটি পুরোপুরি রীলে করে শোনানো হয়েছিল। এই অর্থে 'তপতী' নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বেতার অনুষ্ঠানরূপে স্বীকার করে নেব, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না তিনি বেতার সাহিত্য নামধেয় কোন সাহিত্যের বীজ

বপন করেছিলেন। কারণ, নাটকটি বেতারে সম্প্রচারের জন্যে রচিত হয়নি। বেতারে প্রচারের জন্যে তাঁর প্রথম রচনা তাঁর 'জন্মদিন' কবিতাটি। বেতারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত এই কবিতাটি কবি কালিম্পং থেকে জন্মদিনের বাণী হিসাবে পাঠ করেছিলেন এবং টেলিফোন লাইন মারফত কলকাতা কেন্দ্র থেকে তা রীলে করে শোনানো হয়েছিল।

কাজী নজরুল ইসলাম কবি হিসাবে বিখ্যাত কিন্তু তিনি প্রথম জীবনে যে গল্পগুলি লিখেছিলেন তা অবলম্বন করেও বেতার নাটক প্রযোজিত হয়েছে, যেমন— 'অগ্নিগিরি', 'রাক্ষসী', 'শিউলিমালা'।

সূত্রপাতের দিন থেকেই বেতার নাটকের কাহিনী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনীর জনপ্রিয় যে সব নাটক প্রথম দিকে অভিনীত হত সেগুলিই কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতেন, যাতে সমাজে অনর্থক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত নাট্যধর্মী অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়—

| প্রচার তারিখ | সময় | নাটকের নাম | রচয়িতা/নিবেদক |
|---|---|---|---|
| ০৫/১২/২৭ | ৭.৪৫ রাত | বসন্তলীলা | নাট্যমন্দির লিমিটেড |
| ১৬/১২/২৭ | ৮.৪৫ রাত | নরনারায়ণ (নির্বাচিত দৃশ্য) | ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদ |
| ১০/০১/২৮ | ৮.০০ রাত | রাধাকৃষ্ণ | ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদ |

হাসির নাটকের চাহিদা প্রথমদিকে ছিল খুব বেশী। ১৯৩৯-এও দেখি শ্রোতার হাসির নাটক অনেক বেশী করে শুনতে চাইছে। ১৯৩১-এর ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বেতার জগতে দেখা যাচ্ছে বেতার নাটক এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, বাইরের অভিনেতারা আবেদন করছেন বেতারে অভিনয় করবার জন্যে।[৫]

প্রথম দিকে নাটক পরিচালনার পুরো দায়িত্বটা থাকত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উপর। অভিনেতা, অভিনেত্রী হিসাবে তখন ঘন ঘন ডাক পড়ত রুবী রায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, বাণী কুমার, রাইচাঁদ বড়াল, বিজন বসু, বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আঙুর বালা, এছাড়া বীণাপানি, মিস্ লাইট, উষাবতী, নিভাননী, সুশীলা বালা প্রমুখ। কিন্তু অভিনয়ে মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।[৬]

আজকালকার গানের অনুরোধের আসরের মত তখনকার দিনে শ্রোতারা কোন নাটকের বিশেষ একটি অংশ শোনার জন্যে অনুরোধ করে চিঠি লিখতেন। এই

অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'নির্বাচিত দৃশ্যাবলী'। পরবর্ত্তীকালে শ্রোতারা অজস্র চিঠিতে অনুরোধ করলেন আর নির্দ্দিষ্ট অংশ নয়, গোটা নাটকটাই পুনঃপ্রচার করতে হবে। তাৎক্ষণিক নাটকও হয়েছিল অর্থাৎ যার মনে যা আসবে, তাই বলে তাৎক্ষণিকভাবে একটি অর্থবহ নাটক অভিনয় করতে হবে। এই রকমই একটা নাটক 'পঞ্চভূত'। এতে অভিনয় করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, নলিনীকান্ত সরকার, সারদা গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তি। শ্রোতারা এই নাটকের পুনঃপ্রচারের জন্য অনুরোধ করে অজস্র চিঠি লিখলেও তা আর করা যায়নি। কারণ এর কোন স্ক্রীপ্ট ছিল না।[৭]

'বেতার বিচিত্রা' নামক অনুষ্ঠানটি যে কত জনপ্রিয় হয়েছিল তা শ্রোতাদের চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায়। এই অনুষ্ঠানে নাটকের নক্‌শা বা ছোট ছোট নাটক সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ বা জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কৌতুকের মোড়কে মুড়ে জনগণকে সৎ উপদেশ দেওয়ার জন্যে পরিবেশিত হত। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'— এই বাণী প্রচারের জন্যে কতকগুলি নাটক সম্প্রচারিত হয়েছিল, যেমন— 'বন্দিসেনা', 'সংহার', 'যুদ্ধ-শান্তি', 'রেড-ক্রশ' ইত্যাদি।[৮]

আকাশবাণীর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে সরল গুহের প্রযোজনায় হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'নাইল-আপ', অতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা', অভিনেতা প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় 'নিশিযাপন', 'সাগরের কত রং', 'হাসুবানু', 'রাম-শ্যাম-যদু'। প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটি বিশেষভাবে জড়িত আছে বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের সঙ্গে। এই সমস্ত নাটক আজও লোকে শুনতে চায়।[৯]

এখন টি.ভি. সিরিয়াল নিয়ে হইচই। কিন্তু ছ'য়ের দশকের একদম গোড়াতেই কলকাতা বেতার বহুদিন ধরে একটা সিরিয়াল নাটক প্রচার করেছিল। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী নিয়ে এই ধারাবাহিক নাটক হ'ত প্রতি সপ্তাহে। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন আকাশবাণীরই স্টাফ আর্টিস্ট মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেও অনেক ধারাবাহিক নাটক প্রচার হয়েছে। পারিবারিক নাটক 'কোথায় গেল', 'অবলম্বন'। ঐতিহাসিক নাটক 'বিরসা মুন্ডা'। এই ধরনের ধারাবাহিক নাটক এখনও হয়। নাটক নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ষাটের দশকের শুরুতে। তখনকার কেন্দ্র অধিকর্তা দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত শুরু করেছিলেন পাঁচ মিনিটের নাট্য সিরিজ 'রেডিও কার্টুন'।

৮৪-৮৮-র মধ্যে প্রতি রবিবার শোনানো হত স্বপ্নময় চক্রবর্ত্তীর রেডিও কার্টুন 'জ্যোতি'। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে শুরু হয়েছিল মাসে একটি করে ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় লেখা নাটকের বাংলা রূপান্তর। হিন্দী নাটকের বাংলা রূপান্তর করে পরিচিতি

লাভ করেছিলেন শশাঙ্কভূষণ মৈত্র। দক্ষ নাটক প্রযোজক ছিলেন নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সূর্য সরকার, অজিত মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু, নির্মল গুহ, অজিত বসু প্রমুখ।

## সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে কলকাতা বেতারের কয়েকটি পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটকের তালিকা :—

| পুরস্কার | নাটক | প্রযোজক | লেখক/নাট্যকার | সাল |
|---|---|---|---|---|
| দ্বিতীয় | সেপ্টোপাশের ক্ষিদে | জগন্নাথ বসু | সত্যজিৎ রায় | ১৯৭৫ |
| দ্বিতীয় | সরীসৃপ | জগন্নাথ বসু | বিধায়ক ভট্টাচার্য | ১৯৭৭ |
| প্রথম | মালিয়া | সূর্য সরকার | সূর্য সরকার (নাট্যকার) | ১৯৭৬ |
| শ্রেষ্ঠ প্রযোজকের পুরস্কার | তিমি-তিমিঙ্গী | সমরেশ ঘোষ | নারায়ণ সান্যাল | ১৯৮২ |
| প্রথম | মৃত্যুহীন প্রাণ | সমরেশ ঘোষ | বেঞ্জামিন মলায়েজ | ১৯৮৭ |
| সাইপ্রাসের নিকোসিয়ায় অনুষ্ঠিত বমুখ ফেস্টিভ্যালে সিলভার ট্রফি পায় | মৃত্যুহীন প্রাণ | সমরেশ ঘোষ | বেঞ্জামিন মলায়েজ | ১৯৮৮ |
| প্রথম | মহেশ | সমরেশ ঘোষ | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১৯৯৪ |
| শ্রেষ্ঠ প্রযোজক | তারিণী মাঝি | সমরেশ ঘোষ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৯৯৮ |
| দ্বিতীয় | ফসিল | সমরেশ ঘোষ | সুবোধ ঘোষ | |
| সার্টিকিেট অফ মেরিট | বিহিত | সমরেশ ঘোষ | সমরেশ বসু | |
| সার্টিফিকেট অফ মেরিট | মানবপুত্র | পাপিয়া চক্রবর্ত্তী | অমিতাভ ভট্টাচার্য | |

মঞ্চ নাটকে সঙ্গীত বরাবরই ছিল, বরং বর্তমানের তুলায় বেশীই ছিল। কিন্তু প্রকৃত আবহ সঙ্গীত ছিল না বলেই মনে হয়। বেতার নাটকে আবহ সঙ্গীত রচিত হয় নাটকের মর্মবাণীকে স্পষ্টতম করার জন্যে। চরিত্রের অন্তঃস্থলে জমাট বাঁধা আনন্দ বেদনা বোধকে বর্হিমুখী করার জন্য আধুনিক মঞ্চ নাটক এই প্রয়োগ-কৌশল গ্রহণ করেছে বেতার নাটকের কাছ থেকে। পর্দার পিছনে টেপ-রেকর্ডার বসিয়ে টেপ করা আবহ-সঙ্গীত বাজিয়ে মঞ্চ নাটককে চলচ্চিত্রের মত আকর্ষণীয় করার প্রবণতা বেতার নাটকের চমক সৃষ্টিকারী অবদান।

'নীলদর্পণ', 'নন্দকুমারের ফাঁসি', 'ক্ষুদিরামের ফাঁসি', 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি নাটকে সর্বজনীন আবেদন থাকলেও স্বাধীনতার আগে কলকাতা কেন্দ্র থেকে নাটকগুলি প্রচারিত হয়নি। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপাদিত্য' ছাড়া সব নাটকই ছিল বঙ্গ বীরবর্জিত নাটক, যেমন —

| নাটক | নাট্যকার | প্রচার তারিখ |
|---|---|---|
| আলমগীর | ক্ষীরোদ প্রসাদ | ২৪/০৭/২৮ |
| প্রতাপাদিত্য | বিদ্যাবিনোদ | ২৬/০৬/৩১ |
| অশোক | বিদ্যাবিনোদ | ২০/০৩/৩১ |
| শাহজাহান | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | ০৮/০৫/৩১ |
| চন্দ্রগুপ্ত | দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | ১৩/০৩/৩১ |

১৯৫৬ সালে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে একটি বেতার নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বেতার নাটকের জনপ্রিয়তা ও নাট্য প্রতিভা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ১৯৬১তে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বেতার নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় প্রায় ১১২টি নাটকের মধ্য থেকে ২০টি নাটক পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয়। দ্বিজেন বাগচী রচিত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত 'মুক্তি' নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায় ১৯৬৩তে। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া অন্যান্য সালের নাটকগুলি হল —

| পুরস্কার | নাটক | রচয়িতা | সাল |
|---|---|---|---|
| প্রথম | মুক্তি | দ্বিজেন বাগচী | ১৯৬৩ |
| প্রথম | দরজা | সুব্রত চক্রবর্ত্তী | ১৯৬৫ |
| সান্ত্বনা | অসবর্ণ | সুপ্তেন্দু রায়চৌধুরী | ১৯৬৪ |
| দ্বিতীয় | নির্মোক | শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ১৯৬৪ |

১৯৭৮ সালে কলকাতা কেন্দ্রের নাট্যবিভাগ বেতার নাটক রচনা প্রতিযোগিতার

আয়োজন করে। তাতে দেড় হাজারের মত পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। চূড়ান্ত বিচারে দ্বিতীয় হয় মনোজ দাস রচিত 'অলৌকিক অভিনয়' এবং অসীম কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'সেই দিন সেই রাত'। ১৯৮৯ সালের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় —

প্রথম — যে টেলিফোন আসার কথা — স্মরজিৎ দত্ত

দ্বিতীয় — ফুলের গন্ধ — ভবানী লেখক

তৃতীয় — আলোকরে এই ঝর্ণাধারায় — অনিন্দ সুন্দর চট্টোপাধ্যায়[১২]

বেতার নাটক একই সময়ে অসংখ্য শ্রোতার মানসমঞ্চে অভিনীত হয়। স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিকতার কোন বাধা তার গতিপথ রুদ্ধ করতে পারে না। মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন, এই তিনটি অনুষ্ঠান মাধ্যম দর্শকের সজাগ দৃষ্টির উপর কমবেশী নির্ভরশীল। একমাত্র শ্রুতি নাটকই বিশ্রাম ভঙ্গীতে শোনা সম্ভব। প্রবল শীতে অন্ধকার ঘরে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়েও আমরা বেতার নাটক শুনতে পারি, বরং সেই শোনাটা বেশী নির্ঝঞ্ঝাট। এমন আরামে দূরদর্শনে নাটক দেখার কথাও ভাবা যায় না। শ্রুতির এই স্বাধীনতা অন্য মাধ্যমের নেই। প্রমোদ মাধ্যমগুলির অনেকটাই যেন স্থবির, দর্শককে তাদের কাছে যেতে হয়. কিন্তু বেতার নাটক শ্রোতার মনেব আসনে উঁকি মেরে বলে, আমায় শোনো, শিল্পের এই সচলতাও সামাজিকতাই বেতার নাটককে পরিবারের কাছে আদরণীয় করে তুলেছে। অনুরূপভাবে তার দায়িত্বও বেড়েছে।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) সূর্য কুমার সরকার, বেতার নাটক শ্রোতার মন, কলকাতা ১৯৯৬, পৃ. ৫।
২) সূর্য কুমার সরকার, কলকাতা বেতার নাটক, কোরক, কলকাতা, পৃ. ১১৩।
৩) জগন্নাথ বসু, বেতার নাটক, আজকাল, ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০১, রবিবাসর।
৪) সূর্য সরকার, কলকাতা বেতার ৭৫ বছ, পর্ব ১৫, কলকাতা-ক, ২০০১, সকাল ৮টা।
৫) সূর্য কুমা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
৬) হীরেন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বেতার ৭৫ বছর, পর্ব ১৬, ৯/১২/২০০১, কলকাতা-ক, সকাল ৮টা।
৭) পূর্বোল্লিখিত, পর্ব-১৭, ১৬/১২/২০০১।
৮) পূর্বোল্লিখিত, পর্ব-১৮, ২৩/১২/২০০১।
৯) পূর্বোল্লিখিত, পর্ব-৪৬, ৭/৭/২০০২।
১০) পূর্বোল্লিখিত, পর্ব-৪৭, ১৪/৭/২০০২।
১১) সূর্য কুমার সরকার, বেতার নাটক শ্রোতার মন, কলকাতা ১৯৯৬, পৃ. ১০৯।
১২) পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২১ এবং ১২২।

# প্রমথেশ বড়ুয়া ঃ চলচ্চিত্রে সমাজ চেতনা

মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের মতো চলচ্চিত্রও সমাজের দর্পণ। ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন, 'Literature is the criticism of life'। চলচ্চিত্রও তাই, তার লক্ষ্য জীবনের স্বরূপ অন্বেষণের মধ্য দিয়ে জীবন-সত্যের উপলব্ধি। চলচ্চিত্রের দর্পণে যুগমানস ও সমকালীন বাস্তব প্রতিফলিত হয়। সে যুগের মানুষের সুখ, দুঃখ, সংগ্রাম ও সমাজ সমস্যা ছবিতে ফুটে ওঠে।

প্রমথেশ বড়ুয়ার চলচ্চিত্রে আবির্ভাব গত শতাব্দীর তিরিশ দশকের প্রথমে। দেশ তখন পরাধীন। সমাজ ছিল রক্ষণশীল, সামন্ততান্ত্রিক, পুরুষশাসিত। সেখানে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল, তখন স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ছিল না। তাদের স্থান ছিল প্রধানত অন্তঃপুরে। বনেদি পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখা অপরাধ বলে গণ্য হত। তখন পণপ্রথার রমরমা। গরীব ঘরের মেয়ে ধনী শ্বশুরগৃহে লাঞ্ছিত হত। বাবা পণের টাকা দিতে না পারলে গৃহবধূ শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হত। সংস্কারকদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বর্ণভেদ অক্ষত ছিল। বামুন-কায়েতের বিয়ে হত না। কুলীন প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। গ্রামীণ সমাজে যেমন নানা কুসংস্কার ছিল, শহুরে সমাজেও তাই। জাতপাতের বিচার ছিল প্রবল। ছোট জাতের ছোঁয়াকে লোকে এড়িয়ে চলত।[১]

তিরিশ দশক খুব 'অশান্ত' সময় ছিল না। ইউরোপে ইংলন্ড ও ফ্রান্স তখন হিটলারকে তোষণে ব্যস্ত। ভারতে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন বিফল হওয়ায় জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছিল। চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনও নিস্তেজ হয়। যুব মানসে হতাশা ছিল, কিন্তু বিক্ষোভ নয়। বন্দুক ও বোমা দেশপ্রেমিক যুবকদের দেশোদ্ধারের অস্ত্র ছিল, ভিন্ন দলের শত্রুকে খতম করার হাতিয়ার নয়। সমাজ অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। কৃষক ও শ্রমিক শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না।[২] স্বচ্ছল মধ্যবিত্তরা মোটামুটি নিশ্চিন্তে ছিল। সেই সঙ্গে সিনেমা এদেশে তখন এক নতুন মাধ্যম।

এ হেন প্রেক্ষাপটে ছবি করতে এসেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া এবং তাঁর কাজকে বিচার করতে গেলে এই সামাজিক প্রেক্ষাপটকে মনে রাখতে হবে। তিরিশ দশক বাংলা সিনেমার রোমান্টিক যুগ। বড়ুয়ার রোমান্টিক মন ছিল, তাই তাঁর ছবিতে বারবার প্রেম

এসেছে মুখ্য বস্তুরূপে। কিন্তু তাঁর একটা আধুনিক মনও ছিল। বিদেশের সঙ্গে সংযোগ, প্যারিসে বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক রোজার্সের কাছে ক্যামেরার পাঠ, রেনে ক্লেয়ার ও লুবিৎস প্রমুখের সংস্পর্শ তাঁর প্রগতিশীল আধুনিক মানসিকতার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তাঁর সমাজচেতনা এর ফলশ্রুতি। তাঁর ছবিগুলিতে সেই সময়ের ও সমাজ বাস্তবতার সফল প্রতিফলন দেখা গিয়েছে, বিশেষত তিরিশ দশকে। বড়ুয়া একটিও পৌরাণিক ও ধর্মীয় ছবি করেননি। রূপলেখা ছাড়া তাঁর সকল ছবিতে রয়েছে আধুনিক সমাজ, যেখানে সে যুগে দেবকী বসুর ছবিতে ছিল প্রাচীন সমাজ। সমাজসমস্যা ও ব্যক্তিসম্পর্কের প্রতিই বড়ুয়া আকৃষ্ট ছিলেন।

এক লেখক লিখেছেন, ''অনেকের মতে 'দেবদাস' ছবিতে রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে পরিচালক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানোর চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন নায়কের বিষাদঘন জীবনকে দেখাতে'' ভাবপ্রবণ ও বিয়োগান্ত গল্প-প্রিয় বাঙালি দর্শকদের ভালো লাগার কারণে।[২] এই অভিমত ত্রুটিপূর্ণ। কানন দেবী এই নিবন্ধকারকে বলেছিলেন, প্রমথেশ বড়ুয়া দর্শকদের মুখ চেয়ে, তাদের খুশি করার জন্য কোন ছবিই করতেন না।[৩] 'দেবদাস' উপন্যাসের মর্মকথা দেবদাস ও পার্বতীর প্রেম এবং দুটি প্রাণের বিচ্ছেদ ও বেদনা। শরৎচন্দ্র মানবচরিত্র ও মানবিক সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন। দেবদাস-পার্বতীর প্রেমের সার্থকতার পথে অন্তরায় হয়েছিল সামাজিক সংস্কার ও বৈষম্য। দেবদাস ধনী জমিদার পুত্র ও পার্বতী নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে। এই সামাজিক ব্যবধানের সঙ্গে ছিল গ্রামীণ কুসংস্কার। বাড়ির পাশে কুটুমে দুই বাড়ির অনীহা ছিল। তৃতীয়ত, সে যুগে ছেলেমেয়েরা নয় অভিভাবকরাই বিবাহ নির্ধারিণ করতেন ও তারই কুফল দেবদাসের ট্রাজেডি। কিন্তু এগুলি গৌণ। উপন্যাসের মুখ্য বস্তু যে প্রেম ও তার ব্যর্থ পরিণতি শরৎচন্দ্রের এই ছবির প্রতি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনই তাঁর প্রমাণ। নায়ক-নায়িকার মর্ম বেদনাকে বড়ুয়া এমন মর্মস্পর্শীভাবে ছবিতে ফুটিয়েছেন তাতে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, 'দেবদাসের দুঃখের অবসান যে পথে এঁরা এঁকেছেন, তা মনকে অভিভূত করে।'[৪] কিন্তু বড়ুয়া 'সামাজিক তাৎপর্যকে অবহেলা করেছেন, বলে যে অভিযোগ কোন কোন মহলে উঠেছে[৫] তা অযৌক্তিক। উপন্যাসে সমাজ যেমন আছে তিনি সেইভাবেই ছবিতে দেখিয়েছেন। বড়ুয়া সাহিত্যকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতেন, তার খোলনলচে পাল্টে দেননি কখনো। তাঁর মৌলিক প্রতিভার দ্বারা ছবি গড়তেন, ছবি ও শিল্পের প্রয়োজনে কখনো বা উদ্ভাবন করতেন, যেমন 'দেবদাস'-এর শেষের দৃশ্য, কিংবা 'মুক্তি'র প্রথম দৃশ্য। দেবদাসের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পার্বতী যেভাবে সমাজ-

সংস্কারের সকল বাধাকে লঙ্ঘন করে ছুটে গেল দেবদাসকে দেখতে সেও এক বিদ্রোহ, যাতে সাহসের পরিচয় আছে। এই শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা যে অনবদ্যভাবে বড়ুয়া করেছিলেন— লঙ শটে পার্বতী সাদা শাড়ি পরে লুটানো আঁচল ও খোলা চুলে কাঁদতে কাঁদতে দেওয়াল ঘেঁষে ছুটে চলেছে ও শেষে হাওয়ায় বন্ধ হয়ে আসা বিশাল ফটকের সামনে তার আছড়ে পড়া, তা শরৎচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। ঐ বন্ধদ্বারকে বড়ুয়া নিষিদ্ধ সমাজের প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন, কারণ তখন বিবাহিত নারীদের অন্তঃপুরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না।[৬] বিশিষ্ট সাহিত্যিক লিখেছেন, 'শেষ দৃশ্যে প্রমথেশচন্দ্রের চিত্রকল্প-চেতনা রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা এক অমর ধ্রুবপদে ধরা দিয়েছে ........ এই দৃশ্যকল্পনার কাছে পৃথিবীর সব মহান চলচ্চিত্রকারই চিরকাল টুপি খুলে দাঁড়াবে।'[৭]

মৃগাঙ্কশেখর রায় তিরিশ দশককে 'অ্যালিয়েনেশন'-এর যুগ ও 'আত্মবিনাশকামিতা'কে সেই সময়ের যুগধর্ম বলেছেন এবং দেবদাস যেন সেই যুগের বিচ্ছিন্নতাকামী আত্মপীড়নকারী ব্যক্তিসত্তার প্রতীক-রূপ।[৮] এটি আংশিক সত্য, কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সাধারণীকরণ। অ্যালিয়েনেশন শুরু হয়েছিল অনেক আগেই— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। কল্লোল গোষ্ঠী পুরণো সমাজকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সেই বিদ্রোহ পূর্ণ রূপ পায়নি। পুরণো সমাজের কাঠামো তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা বা যৌথ পরিবারের ভাঙন আসেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যুবসমাজ বিশ্বাস হারিয়েছিল। তার থেকে আসে হতাশা। তখন মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবককুলের এক অংশের আত্মক্ষয়ী রূপ ছিল। এই আত্মপীড়ন আসে হতাশা এবং ব্যর্থ প্রেম ও বিচ্ছেদের বেদনা থেকে, দেবদাস যার symbol হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৯] তাছাড়া বড়ুয়ার অনন্যসাধারণ অভিনয় এবং অপরিণত, অল্পবয়স্ক, ভগ্ন আশায় উদভ্রান্ত যুবকদের ওপর দেবদাসের বোহেমিয়ান স্টাইলের জীবনধারার প্রভাব স্বাভাবিক। তারাই বড়ুয়াকে অনুকরণ করতো তাদের পরিধেয়তে, চালচলনে। কিন্তু সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজ সেইরূপ ছিল একথা বলা সঙ্গত নয়। বাঙালি যুবকদের আর এক অংশ ব্যক্তিগত প্রেমে না মেতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং তার জন্য আত্মবলিদান করেছিল। তাদের আদর্শ ছিল বাঘা যতীন ও সূর্য সেন, দেবদাস নয়। দেবদাসের আত্মক্ষয়ের পিছনে কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল না, যা 'মুক্তি'র প্রশান্তর ক্ষেত্রে ছিল। তার আত্মপীড়ন নেতিবাচক। সুতরাং মৃণাল সেনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য যে বড়ুয়া 'মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিদ্রোহী সত্তাকে তুলে ধরেছিলেন 'দেবদাস'-এর আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে'[১০] সঠিক নয়। আত্মবিনাশকামিতা যদি যুগধর্ম হবে, তবে ঐ দশকে দুর্গাদাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলি, সায়গল জনপ্রিয় ও সফল নায়ক হয়েছিলেন কি করে? তাঁরা কোন আত্মক্ষয়ী চরিত্রে অভিনয় করেননি।

বড়ুয়া তাঁর ছবিতে প্রথম সমাজ-পরিত্যক্তা পতিতাদের এনেছেন। দেবদাস-এ পতিতালয়ের পরিবেশ সৃষ্টিতে বড়ুয়া যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে লম্পটদের আনাগোনা, মদ্যপদের মাতলামি, তাদের শিথিল আচরণে ওই পরিবেশ বাস্তব রূপ পেয়েছে। অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আজকের হোমো সেক্সুয়ালিটি নিয়ে যাঁরা ছবি করেছেন আমি মনে করি বড়ুয়া সে যুগে দেবদাস করে আরো বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।'[১১] অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের মতে '.... সেকালের প্রমথেশ বড়ুয়া বা নিউ থিয়েটার্সের ছবির মধ্যে সময়ের পদচিহ্ন যেভাবে পড়েছে তা অনুল্লেখযোগ্য নয়। ... 'দেবদাস'-এ সেকালের নির্মম কুসংস্কারকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রমথেশ। ...... পূর্বোক্ত পটভূমিকায় সেটা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আর একটি ছবি 'মুক্তি'। ধনী ও দরিদ্রের শ্রেণীদ্বন্দ্বর মধ্যে পড়ে প্রেমের দুরবস্থার কথা বলার চেষ্টা হয়েছিল।[১২]

'মুক্তি' বড়ুয়ার একটি বিতর্কিত চিত্র। দেবদাসের মত এখানেও সমাজের চাপে খাঁটি প্রেমের ব্যর্থতা চিত্রিত হয়েছে। এই ছবিতেও সামাজিক স্তরভেদ রয়েছে। নায়ক প্রশান্ত শিল্পী, সে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। তার স্ত্রী চিত্রা ধনী-কন্যা। তার পিতৃকুল অভিজাত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অংশ, যাকে প্রশান্ত অবহেলা ভরে এড়িয়ে চলে। প্রশান্ত ভালবাসে চিত্রাকে ও তার শিল্পকে। নগ্ন মডেলকে সামনে রেখে সে ভাস্কর্য সৃষ্টি করে শিল্পীর আত্মমগ্নতায়, কোন যৌন লালসায় নয়। অভিজাত সমাজ তাকে ভুল বোঝে। চিত্রা তার স্বামীকে প্রাণভরে ভালবাসে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সে চায় সামাজিক মর্যাদাও। তাই সে মডেলকে মেনে নিতে পারে না। এইখান থেকে আসে সংঘাত ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব যাতে ইন্ধন যোগায় তার উন্নাসিক পিতা ও সাঙ্গপাঙ্গরা। ফলে দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরে। চিত্রা মুক্তি চায়। প্রশান্ত স্টুডিও ভেঙে দিয়ে আসামের অরণ্যে চলে যায়। ছবির দ্বিতীয়াংশে আরণ্যক পর্বে ফর্মুলা কাহিনী ও শেষে মেলোড্রামা এনে বড়ুয়া ছবিটিকে কিছুটা তরল করে ফেলেছেন। কিন্তু প্রথমার্ধে শহুরে সমাজের বাস্তব চিত্র, যেটা 'ছদ্ম বাস্তবতা' নয়, এবং সামগ্রিকভাবে ছবিতে বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ছিল বৈকি। সেখানে আছে শিল্পীর সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, যা ছবির মর্মকথা, নাগরিক সমাজের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে নায়কের প্রতিবাদ, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নৈতিক ভঙ্গুরতা, নায়িকা চিত্রার মধ্যে সংস্কারবন্দী মানুষের অসহায়তা, মূল্যবোধের সঙ্কট, মডেলের সঙ্গে শিল্পীর বাস্তব সম্পর্ক যা বড়ুয়া মডেলের মুখে একটি সূক্ষ্ম সংলাপে তুলে ধরেছেন। প্রথম দৃশ্যে নায়কের দরজার পর দরজা খুলে ঘরের পর ঘরের মধ্য দিয়ে নায়িকার কাছে যাওয়া—স্বামী-স্ত্রীর দূরত্বের প্রতীক রূপী এই ব্যঞ্জনাময় দৃশ্যকল্প আজও ভারতীয় সিনেমার এক

বিস্ময়। আবার শেষ দৃশ্যে চিত্রার কোলে মাথা রেখে মৃত্যুর মুহূর্তে প্রশান্ত বলেছিল, 'চিত্রা, তুমি মুক্তি চেয়েছিলে, না?' চিত্রার কণ্ঠে আর্তি 'না'। প্রশান্তর শেষ উক্তি, 'তুমি না চাইলেও, তোমার শিক্ষা চেয়েছিল, তোমার সমাজ চেয়েছিল, তোমার সংস্কার চেয়েছিল'। চিত্রা সংকটের মুহূর্তে সংস্কারের বেড়া ভেঙে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াতে পারেনি। এই সবের মধ্যে সমাজচেতনার উপাদান যথেষ্ট ছিল। এই প্রেক্ষিতে বড়ুয়া 'ব্যক্তি ও শিল্পী জীবনের সংকটকে সমসাময়িক সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করেননি',[১৩] সুব্রত রুদ্রের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

পঙ্কজ মল্লিকের থেকে শুনে মুক্তির গল্পের আইডিয়া রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'প্রথমেই দ্বারমুক্ত, লোকটি বোধহয় মুক্তি চাইছে'।[১৪] সেই শুনে বড়ুয়া ছবির নামকরণ করেন। দুটি বিদেশী গল্পকে (স্যাপারের লেখা) মিশিয়ে বড়ুয়াই প্রধানত এর কাহিনী লেখেন। বড়ুয়াকে 'আধুনিকতার পথিকৃৎ' আখ্যা দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বাংলা চলচ্চিত্রে মুক্তি প্রথম আধুনিক পরীক্ষামূলক ছবি'।[১৫] অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় মুক্তির গল্পকে সে যুগের তুলনায় 'যথেষ্ট আধুনিক' মনে করেন।[১৬] শেষোক্তের মতে 'সমাজের একটা চেহারা সেখানে তুলে ধরা হয়েছিল। পোষাকে পর পোষাক চড়িয়ে ও মাথায় টুপির পর টুপি পরা নায়কের কিম্ভূত চেহারা বর্তমান সভ্যতাকে ব্যঙ্গের প্রতিচ্ছবি'। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'মুক্তির গল্পের প্রথমাংশে সাহসিকতার পরিচয় আছে, সেই সঙ্গে নীতিবোধ ও রুচিবোধও। মডেলের কনসেপ্টে আধুনিকতা ছিল।'[১৭] ছবির প্রথম দিকে বড়ুয়া নারীর স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেছেন তার পুরুষ-নির্ভরতার ওপর জোর দিয়ে, সেখানে তিনি ট্র্যাডিশানালিস্ট, যা সে যুগের পুরুষশাসিত সমাজের মনোভাবের পরিচায়ক। তেমনই পরে তিনি চিত্রার দ্বিতীয়বার বিবাহের মাধ্যমে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। মডেলের সঙ্গে স্বামীর শারীরিক সম্পর্কের সত্যতা যাচাই করে চিত্রার দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি বাংলা সিনেমায় নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার প্রথম দৃষ্টান্ত, যা অনেক পরে দেখা গিয়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'তে। মুক্তি 'নিরর্থক নিবীর্য ও জলো কাহিনী', মৃণাল সেনের এই অভিমত ছবির সামগ্রিক বিচারে কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া হাতির সঙ্গে নায়কের সম্পর্ককে ব্যঙ্গ করার কি আছে, যা শ্রী সেন করেছেন? বাস্তবে ও গল্পে পশুর সঙ্গে মানুষের র‍্যাপোর্ট তো হামেশাই দেখা যায়।

শরৎ-কাহিনী অবলম্বনে বড়ুয়ার 'গৃহদাহ' ছবিতে সমাজচেতনার সাক্ষর ছিল। দেবদাস ও মুক্তির চেয়ে গৃহদাহের বাস্তবতা আরো বলিষ্ঠ। ত্রিমুখী সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব রূপ এই ছবিতে আরো বেশি ফুটেছে এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের

দ্বিধাবিদীর্ণ চেহারা দেখা যায়। এ ছবির একদিকে ব্রাহ্মসমাজের চেহারা। তার গোঁড়ামি কেদারবাবুর চরিত্রে। ওই সমাজের আর এক রূপ শিক্ষিত, মার্জিত, সংস্কারমুক্ত অচলা। অন্য দিকে গৃহদাহে গ্রামীণ হিন্দু সমাজও রয়েছে তার সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা নিয়ে। মৃণাল সনাতনী হিন্দু নারী, সে অচলার মত আধুনিকা নয়। অচলা গ্রামে গিয়ে ওই সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। সে যুগের রক্ষণশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে ভালবাসার টানাপোড়েন যা দোলাচলচিত্ত অচলাকে বার বার ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা শুধু অভিনব নয়, সেখানে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় ছিল, বড়ুয়া ছবিতে যাকে নিপুণ বিশ্লেষণে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। মহিমের উদারতা ও ক্ষমাশীলতায় সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। তবে ছবির বিষয়বস্তু সময়ের অগ্রবর্তী হওয়ায় সে যুগের সাধারণ দর্শকরা তাকে গ্রহণে অপারগ হয়, যদিও বোদ্ধাগণ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন ছবি দেখে।

'মায়া' বড়ুয়ার এক সমাজচেতনা-সম্পন্ন ছবি। একটি আশ্রিত মেয়ের অসহায়তা ও অস্তিত্বের সঙ্কট এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ধনী পরিবারের চক্রান্তে সে গর্ভবতী অবস্থায় বিতাড়িত হয়ে বস্তিতে ঠাঁই পেয়েছিল। শুরু হল পিতৃপরিচয়হীন সন্তানকে নিয়ে তার জীবন-ধারণের সংগ্রাম। নানা ঘটনাচক্রের পর নায়ক প্রতাপ শেষ পর্যন্ত তার স্বামীত্ব ও পিতৃত্বকে স্বীকার করে মায়াকে মর্যাদা দিয়েছিল। জয় হল সততা ও সুস্থ মূল্যবোধের। 'জিন্দগি'তে (প্রবোধ সান্যালের 'প্রিয়বান্ধবী'র হিন্দিরূপ) নায়িকা শ্রীমতী লম্পট স্বামীর অত্যাচারের সঙ্গে আপোস না করে পথে এসে দাঁড়ায়। পরিচয় হয় ভবঘুরে জহরের সঙ্গে। সান্নিধ্য থেকে আসে গোপন ভালবাসা। পরে সে ফিরে যায় স্বামীর ঘরে নয়, পিতৃগৃহে ও স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকে। এই দুটি ছবিতে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন এসেছে এবং শ্রীমতী নারীর প্রতিবাদ ও আত্মনির্ভরতার দৃষ্টান্ত।

বড়ুয়ার রজতজয়ন্তী সামন্তসমাজের ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন। বড়ুয়া এখানে কৌতুকের আড়ালে উনিশ শতকের বাবু-সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন, যার উপর অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। উডহাউসের গল্প 'ম্যানি ফর জ্যাম' থেকে বড়ুয়া এই ছবির রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। অসার আভিজাত্য, লোভী জমিদার, অসৎ ব্যবসায়ী, অকর্মণ্য ধান্দাবাজ যুবকের দল, এ্যামেচার ফিল্ম কোম্পানী, এ সবই ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের প্রতিনিধি এবং তাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ, আসল ও নকল, খাঁটি প্রেম ও কপট চাতুরীর দ্বন্দ্বে সৎ ও আসলের জয় দেখানো হয়েছে সমাজে-কল্যাণের লক্ষ্যে। বিশিষ্ট লেখক এ ছবির প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'the thrive for overall social welfare amidst

all sorts of farce and hypocrisy'[১৮]। এই প্রসঙ্গে রজত রায়ের মন্তব্য, বড়ুয়া অবক্ষয়ী সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমাজ প্রগতির আলোকে বিচারের চেষ্টা করেননি,[১৯] সঠিক নয়। অরুণ মুখার্জির মতে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ করা এই 'বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকচিত্র' সময়ের অগ্রবর্তী ছিল।[২০]

'অধিকার' বড়ুয়ার শ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন ছবি। একটি বস্তির মেয়েকে প্রতিবাদী নায়িকা করার সাহস বড়ুয়া এখানে দেখিয়েছেন। মূল ভাবনা নিয়েছেন বার্নার্ড শ-এর পিগম্যালিয়ন থেকে। এখানে দুটি সমান্তরাল শ্রেণী এসেছে 'মুক্তি'র মত, যদিও আরো স্পষ্টভাবে এবং তাদের দ্বন্দ্ব এ ছবির মূল কথা। বস্তিতে পালিত পিতৃ-পরিত্যক্তা অনাথা রাধা একদিন জানতে পারে সে প্রয়াত অভিজাত পিতার সম্পত্তির অধিকারী। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে তার বোন ইন্দিরার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধে। রাধা ইন্দিরার ভাবী স্বামী নিখিলেশকেও দখল করতে চায় এবং সেই সঙ্গে তার ছিল ইন্দিরার জন্য রচিত নিখিলেশের 'মানস মন্দির'-এ প্রবেশের লোভ। এই ত্রিবিধ অধিকারের দাবী শ্রেণীদ্বন্দ্বকে জটিল করে তোলে। রাধা ইন্দিরাকে বলে, 'যে ভণ্ড সমাজ ভদ্রতার আড়ালে সত্যকে চাপা দিয়ে অপরকে বঞ্চিত করে তুমি সেই দাম্ভিক সমাজেরই একজন।' সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে এমন জোরালো ও সুস্পষ্ট প্রতিবাদ সে যুগে খুব কমই দেখা গেছে। এ ছবিতে বড়ুয়া অভিজাত সমাজ ও বস্তি-দুই স্তরেই ভালো মন্দ, দুই দিককে দেখিয়েছেন। লোভী সংগ্রামী রাধার পাশে আছে তার প্রেমিক নির্লোভ রতন, উন্নাসিক অম্বিকা প্রসাদের পাশে উদারচেতা ইন্দিরা। তেমনই তিনি সুস্থ মূল্যবোধকেও তুলে ধরেছেন, যা হল আত্মত্যাগ, সততা ও ভালবাসার শক্তি, এবং যা দেখে শেষে রাধার বোধোদয় হয় যে প্রেমহীন অধিকারের মূল্য নেই ও সম্পত্তির চেয়ে হৃদয়বত্তা বড়। ছবির চরিত্রগুলির আশা আকাঙ্খা, সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজের একটা চেহারা দেখা যায় যেখানে রয়েছে দারিদ্র্য ও সম্পদের সহাবস্থান, একদিকে অহমিকা, লোভ, ঘৃণা, অন্যদিকে বিশ্বাস, সততা, সুস্থ জীবনের দাবী, এই দুই-এ মিলিয়েই সমাজ। তপন সিংহ লিখেছেন, বড়ুয়া বস্তির দুঃস্থ মানুষদের এনে 'বাংলা সিনেমাকে এক নতুন মাত্রা দেন'।[২১] চন্দন শর্মার মতে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যপ্রসূত সমাজবাস্তবতার ছবি অধিকার এবং বড়ুয়া ভারতীয় সিনেমায় এনেছেন 'concept of socio-realism', যে ধারাকে পরে 'হাইলাইট' করেছেন শান্তারাম, বিমল রায়, মেহবুব খান, চেতন আনন্দ, কে.এ. আব্বাস।'[২২]

'শাপমুক্তি'তে বড়ুয়া বধূ নির্যাতনের নির্মম বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছিলেন। এটি এক গরীব গ্রাম্য মেয়ের শহরে ধনী শ্বশুরালয়ে প্রতিপদে লাঞ্ছনার চিত্র। স্ত্রী-স্বাধীনতার

অভাবের প্রশ্নও তিনি উত্থাপিত করেন। কিন্তু নায়িকার দাদা রমেশ গ্রাম্য স্কুলশিক্ষক থেকে শহরে গাড়ির কারখানার শ্রমিক হল, এই বৈপ্লবিক রূপান্তরকে বড়ুয়া কাজে লাগাতে পারলেন না। কোন শিক্ষকজনিত ও শ্রমিক সমস্যা আনেননি। তবে এ ছবিতে দরিদ্রের বাঁচার কঠিন লড়াইকে তিনি দেখিয়েছেন। নায়িকার ছোট ভাইকে অন্নের জন্য রাস্তায় গান গেয়ে জুতো পালিশ করে পয়সা রোজগার করতে দেখা গেছে।

চল্লিশ দশকে বড়ুয়া অবশ্য ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ছবিতে উচ্চ, মধ্য, নিম্নবিত্ত মানুষদের দেখা গেছে, কিন্তু কৃষক, শ্রমজীবী, বিপ্লবীরা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, এসব কিছুই আসেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা, '৪২-এর আন্দোলন, '৪৩-এর মন্বন্তর, বিক্ষোভে আন্দোলনে উত্তাল ৪০ দশক (৩০ দশক যা ছিল না) প্রতিফলিত হল না তাঁর ছবিতে। তিনি রোমান্টিকতাকে বর্জন করে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলেন না।

মৃণাল সেন তাঁর বড়ুয়ার উপর নিবন্ধে ৪০ দশক ও 'চাঁদের কলঙ্ক' ছবিটির উপর জোর দিয়েছেন, যেটি বড়ুয়ার নিকৃষ্ট ছবি।। কোন স্রষ্টাকে বিচার করতে হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আলোয়। আমরা শরৎচন্দ্রকে কি বিচার করব শুভদা, হরিলক্ষ্মী দিয়ে, নাকি শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, দেনাপাওনা প্রভৃতির মাধ্যমে? শ্রী সেন মনে রাখেননি যে ১৯৪৫-এ বড়ুয়ার শিল্পীজীবন শেষ হয়ে গেছে, চল্লিশের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন স্বাস্থ্যহানির কারণে। তিরিশ দশকে নিউ থিয়েটার্সে থাকাকালীন বড়ুয়া তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি করেছিলেন, দেবদাস ও মুক্তি ছাড়া যাদের কোন উল্লেখ মৃণাল সেনের রচনায় নেই, অথচ সেই সব ছবি উন্নত মানের যাদের মধ্যে সমাজচেতনার নিশ্চিত পরিচয় ছিল। সুতরাং বড়ুয়ার মধ্যে 'সমাজ চেতনার অভাব' ছিল বলে যে অভিযোগ মৃণাল সেন এনেছেন[২৩] তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পরিশেষে বলা যায় জীবনতুষাতুর প্রমথেশের রোমান্টিকতা জীবনের কাছ থেকে পালানো নয়। বরং সেখানে ছিল জীবনাবেগের আধিক্য। তিনি আকণ্ঠ জীবনের সুধা ও আসব পান করেছেন, যে জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে সমাজ তার শক্তি ও সীমা নিয়ে। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, দেবদাস ও মুক্তির নায়কের হতাশার মধ্যেও 'জীবন সম্বন্ধে ভালবাসা' ও 'জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকার একটা চেষ্টা ছিল'।[২৪]

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) অবনী লাহিড়ী, তিরিশ চল্লিশ দশকের বাংলা।
২) অজয় দে, চলচ্চিত্রের শতবর্ষ ও বাংলা চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রে শতবর্ষ, ২য় খণ্ড ১৯৯৮।
৩) সাক্ষাৎকার, কানন দেবী, ১৯৮৩।

৪) উদ্ধৃত, নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথেশ বড়ুয়া ও বাংলা চলচ্চিত্র, ১৯৮৭।
৫) পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপরেখা, ১৯৯৭।
৬) সাক্ষাৎকার, যমুনা বড়ুয়া, নন্দন মিত্র, মাধ্যম ও সংযোগ, নভেম্বর ২০০২।
৭) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরুয়া সাহেব, আজকাল, ১০.০৪.২০০৫।
৮) মৃগাঙ্কশেখর রায়, হারানো তারার বারোটি স্বপ্ন, দেশ, ১৫.০৪.২০০০।
৯) আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাসের প্রত্যাবর্তন ও বাঙালির সকাল-সন্ধ্যা, আজকাল, ০৮-০৯-২০০২।
১০, ২৩) মৃণাল সেন, প্রমথেশ বড়ুয়ার সমাজ চেতনা, চিত্রভাষ, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা।
১১, ১৫, ১৬, ১৭, ২০, ২১) চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে, প্রমথেশ বড়ুয়া জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ২০০৩।
১২) অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র ভাবনা, ১৩৯২।
১৩) সুব্রত রুদ্র, প্রমথেশ বড়ুয়ার জীবনচরিত, ২০০৪।
১৪) পঙ্কজ কুমার মল্লিক, আমার যুগ আমার গান।
১৮, ২২) চন্দন শর্মা, প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া, চিত্রচিন্তা, গুয়াহাটি, ২০০৩।
১৯) রজত রায়, প্রমথেশ বড়ুয়ার নির্মল প্রহসন, চিত্রসমালোচনা ৪০, ১৯৮৭।
২৪) শঙ্খ ঘোষ, নিঃসঙ্গতার শিল্পী, চলচিত্র প্রসঙ্গে, বড়ুয়া সংখ্যা, ২০০৩।

# ডক্টর জন গ্রান্ট ঃ ডিরোজিওর প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাঁর প্রথম কাব গ্রন্থ 'পোয়েমস্' (১৮২৭) উৎসর্গ করেন জন গ্রান্টকে।[১]

কে এই জন গ্রান্ট? কি করেছিলেন তিনি ডিরোজিওর জন্য? যে জন্য প্রায় ঋণ পরিশোধের ভাষায় ডিরোজিও তাঁকে উৎসর্গ করলেন তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ!

ডিরোজিওর প্রথম জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস লিখেছেন, জন গ্রান্টই প্রথম ডিরোজিওর অসামান্যতাকে স্বীকৃতি দেন। 'Dr. John Grant, the man of all men who first recognized Derozio's brilliant capacity'।[২]

বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট'-এর ৫ম খণ্ডে জন গ্রান্ট সম্পর্কে একটি স্বাক্ষরহীন ছোট লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

'জন গ্রান্ট জন্মেছিলেন ২৮শে আগস্ট, ১৭৯৪। ১৮১৬ সালের ৭ই অক্টোবর 'বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে' অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন হিসাবে যোগ দেন। অবসর গ্রহণ করেন ১৮৫৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এবং ১৮৬২ সালের ১৪ এপ্রিল লন্ডনে মারা যান। তিনি চাকরি করতেন 'এপোথিকারী জেনারেল'-এর অফিসে— এখন যাকে বলে 'মেডিক্যাল স্টোর কিপার'। তিনি থাকতেন ওয়েলেসলি প্লেস-এর পূর্ব দিকে 'মেডিক্যাল স্টোর ডিপো' সংলগ্ন একটি বাড়িতে। গ্রান্টের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৮২৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল সেন্ট জন্স ক্যাথিড্রেলে স্যার জন হের ছোট মেয়ে এলিজাবেথের সঙ্গে। গ্রান্ট স্যার জোমস রোলান্ড মার্টিনের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছিলেন রবার্ট জ্যাকসনের লেখা 'অন দি ফরমেশন, ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ইকনোমি অব আর্মিস্' নামক গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ (১৮৪৫) এবং তার ভূমিকাংশে ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অ্যাকসনের যে জীবনীটি আছে সেটি গ্রান্টের লেখা। খ্যাতনামা ইউরেশিয়ান কবি হেনরি ডিরোজিও তাঁর 'পোয়েমস্' কাব্য গ্রন্থ জন গ্রান্টকে উৎসর্গ করেছেন।'[৩]

স্কেচ ধর্মী এই ছোট্ট জীবনীতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য থাকলেও তিনি যে এক সময় 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সেই তথ্যটি অনুল্লেখিত থেকে গেছে। ডাক্তার জন গ্রান্ট ছিলেন ডিরোজিওর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ডাক্তার গ্রান্ট ৩নং

চৌরঙ্গী রোডে অধিষ্ঠিত টি.বি. স্কট অ্যান্ড কোম্পানী পরিচালিত ও মুদ্রিত ইন্ডিয়া গেজেট' (১৭৮০) পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন ১৮২২-১৮২৯ মার্চ পর্যন্ত। তার আগে পর্যন্ত পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। তাঁর সময়ে 'ইন্ডিয়া গেজেট' সপ্তাহে দু'বার বের হতে থাকে। সোমবার সকালে ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ১৯৩০-এর নভেম্বর থেকে এটি দৈনিকে পরিণত হয়। কিন্তু সরকারী নিয়মবৈগুণ্যে গ্রান্ট ১৮২৯ সালের মার্চ মাসে সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। নিয়ম হয়েছিল সরকারী চাকুরে কেউ পত্রিকা সম্পাদনা করতে পারবেন না।

কিন্তু যে সময়কালটুকু গ্রান্ট 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন ডিরোজিওর পৃষ্ঠপোষকতার দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা ১৮২২ সাল নাগাদ ডিরোজিও তাঁর স্কুল জীবনের শেষ পর্যায়ে। এরপর থেকেই তিনি কবি যশঃপ্রার্থী হয়ে 'জুভেনিশ' ছদ্মনামে 'ইন্ডিয়া গেজেটে' কবিতা পাঠাতে শুরু করবেন। গ্রান্ট খানিকটা উদারতাবশত তাঁর অপটু হাতের কবিতা ছাপতে শুরু করবেন। পরে গ্রান্ট আবিষ্কার করছেন 'জুভেনিশ' আর কেউ নয় তারই পূর্ব পরিচিত অসাধারণ এক কিশোর যার প্রকৃত নাম হেনরি ডিরেজিও।

বিদ্যালয়-পর্ব শেষ না হতেই জেমস স্কট অ্যান্ড কোম্পানীর বরিষ্ঠ হিসাবরক্ষক ফ্রান্সিস তাঁর মধ্যমপুত্র হেনরিকে কেরানীর চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু সে চাকরি তাঁর ধাতে সয়নি বলে ভাগ্যান্বেষণে হেনরি পাড়ি দেন ভাগলপুরে। সেখানে তারাপুর নীলকুঠির মালিক ছিলেন ডিরোজিওর মামা এবং পিসেমশাই আর্থার জনসন। সেখানে তাকে কি করতে হত তা জানা না গেলেও সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ডিরোজিওর কবিত্বশক্তি উন্মেষে সাহায্যকারী হয়েছিল। দূর ভাগলপুর থেকে তিনি ছদ্মনামে কবিতা পাঠাতেন 'ইন্ডিয়া গেজেটে'। তাঁর কবিতা ও রচনা শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গ্রান্ট তাঁকে 'ইন্ডিয়া গেজেটে'র সাব অডিটার পদে নিযুক্ত করে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন। সেই থেকেই ডিরোজিওর সামাজিক প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। ভাগলপুর নীলকুঠি থেকে হিন্দু কলেজে শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যবর্তী স্তরে ছিল 'ইন্ডিয়া গেজেটে' সাব-অডিটার হিসাবে কিছুদিন কলম চালনার চাকরি। শুধু কবিতা ছাপা নয়, 'ইন্ডিয়া গেজেটে' সহ-সম্পাদনার চাকরি দিয়ে গ্রান্ট কলকাতার বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী সমাজের সঙ্গে ডিরোজিওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাত্র ষোড়শবর্ষীয় এক উঠতি তরুণের হাতে 'ইন্ডিয়া গেজেটের' মতো জাঁদরেল পত্রিকার সহ সম্পাদনার ভার দিয়ে গ্রান্ট তাঁর প্রতিভাকে সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। হিসেব করে দেখেছি খুব বেশিদিন তাঁকে সে চাকরি করতে হয়নি ১৮২৬-এর জানুয়ারী থেকে ১৮২৬-এর

এপ্রিল/মে। মাত্র চার-পাঁচ মাস। কিন্তু তার মধ্যেই ডিরোজিওর বৈদগ্ধ্য ও লিখন ক্ষমতার পারদর্শিতার সংবাদ উইলসন বা হেয়ার বাহিত হয়ে হিন্দুকলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের শূন্য পদে (১৮২৬, ১লা মে)। তারপর তিনি যা করেছিলেন তা আজ ইতিহাস। পালন করেছিলেন যথার্থ পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব, তা আমরা সেভাবে জানতেই পারতাম না যদি না তিনি একটি অসামান্য স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখে যেতেন।[৪] গ্রান্ট লিখেছেন, 'একদিন কলোনেল W.C.F. এর বাড়িতে বৈকালিক আহার-আপ্যায়নে যোগ দিতে গিয়ে আলাপ হল সস্ত্রীক ফ্রান্সিস মহোদয়ের (ডিরোজিওর পিতা) সঙ্গে। ফ্রান্সিস বেশ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও খ্যাতনামা ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রীও খুব সদাশয়া। তাঁদের সঙ্গে আলাপের সময় হেনরি সেখানে এল। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় সংবাদ-প্রতিবেদককে দেখে তাঁর চোখে মুখে খেলে গেল আনন্দের ঝিলিক। আমি তাকে আমার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। তারপর থেকে সে প্রায়ই আসত আমার কাছে। লক্ষ্য করেছিলাম বয়স অনুপাতে সে পরিণত মনের মানুষ। 'I found his intellectual powers precocious, and his acquirements ripe beyond his years. In a word, I took a great interest in him'.[৫]— এই হচ্ছে শুরু।

গ্রান্ট লিখেছেন, লক্ষ্য করে দেখলাম কবিতা ও নাটকের প্রতি তার ঝোঁক মাত্রাতিরিক্ত। ভালো-মন্দ নির্বিশেষে হাবি-জাবি কণ্ঠস্থ করে সে তার স্মৃতিশক্তি বা মস্তিষ্ক বোঝাই করে ফেলছে। এ ব্যাপারে আমি তাকে নিরুৎসাহিত করলাম এবং পড়তে বললাম ইতিহাস। 'I rather discouraged this sort of taste, and urged him to read history with assiduity'।[৬] এ ছাড়া লাতিন সে কিছুমাত্র জানত না। এ ব্যাপারে উৎসাহও ছিল না। ওকে বোঝালাম— ধ্রুপদী রোমান সাহিত্যের রাজসিক ভাষার আস্বাদ কখনো অনুবাদ পড়ে পাওয়া সম্ভব নয়। মূলই পাঠ করতে হবে।

'জুভেনিশ' ছদ্মনামে পাঠানো ডিরোজিওর প্রথম সনেট ছাপানোর কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন গ্রান্ট। তখনো তিনি জানতেন না 'জুভেনিশ'ই হেনরি। ১৮২৩-এর এপ্রিলে প্রেরিত সনেটের সঙ্গে ছিল 'very neatly and prettily written.[৭] একটি ছোট্ট চিঠি। সনেটটা এমন কিছু নয়, খুবই অপটু হাতে লেখা। কিন্তু চিঠিটা পড়ে মনে হল 'there is something in him'। গ্রান্টের মনে পড়ে গিয়েছিল, তাঁর নিজের প্রথম জীবনের কথা। তাঁর পাঠানো আবেগ-উদ্ভাসিত একটি কবিতার উত্তরে সম্পাদক জানিয়েছিলেন এটা মনে হল, 'জুভেনিসের সৌভাগ্যের দরজা খোলা না খোলা এখন আমার হাতে'। সনেটটা তিনি ছাপতে দিলেন এবং যা ভেবেছিলেন তাই হল, 'Juvenis improved more and more every time he appeared।[৮]

১৮২৪ সালের ২০শে জানুয়ারী ড্রামন্ডের 'ধর্মতলা একাডেমি'-র ছাত্ররা স্কুলের মঞ্চে অভিনয় করল 'ড্যালাস' নাটক। নাটক শুরু হওয়ার আগে স্বরচিত কবিতায় লেখা 'প্রোলোগ' পাঠ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল এই কিশোর। 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকা বিস্তারিত প্রতিবেদনে উচ্চ প্রশংসা করল সেই নান্দীপাঠের।[৯] শুধু আবৃত্তি নয়, ডিরোজিও গ্লিনেলভেন চরিত্র অভিনয়ও করেছিল সুন্দর। গ্রান্ট তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'His conception of the part was good and his execution spirited.'[১০] প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক শুধু বাহবাই দেয় না ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতনও করে দেয়। গ্রান্ট তা করেছিলেন। অভিনয়ের আতিশয্য ও 'overdoing of emphasis' [১১] নিয়ে সতর্ক করেছিলেন গ্লিনেলভেন চরিত্রের অভিনেতা ডিরোজিওকে।

ডিরোজিওর সঙ্গে গ্রান্টের বয়সের তফাৎ অন্তত ১৫ বছরের। তথাপি উভয়ের মধ্যে একটা অসমবয়সী বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। গ্রান্টের আমন্ত্রণে ডিরোজিও প্রায়ই যেতেন তাঁর কাছে। যখনই যেতেন তাঁর হাতে থাকত কোনো-না-কোনো ফুল।[১২]

গ্রান্ট তাঁর স্মৃতিচারণে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন এই বলে যে বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে খাঁচার পাখির মতো আটকে পড়েছিল সে। তার বাবা যদি তাকে ব্রিটেনে পাঠাতে পারতেন উচ্চ শিক্ষার জন্য যদি সে বিশ্বের বিশালবিস্তৃত প্রকৃতির বৈচিত্র্যও সজীবতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেত তার প্রতিভা ও কবিত্ব আরো বিস্তৃত প্রকাশ লাভ করতে পারত। ইতালি, গ্রীস নিয়ে সে যেরকম কবিতা লিখেছে তাতে বোঝা যায় তার মধ্যে একটা বিশ্ব-তৃষ্ণা ছিল কিন্তু নিজের দেশটাও সে ভালো ভাবে ভ্রমণ করার সুযোগ পায়নি। জঙ্গীরা পাহাড় নিয়ে সে কল্পনা-সমৃদ্ধ কাব্য লিখেছে। সে যদি ঢাকা, বেনারস, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, ইলোরা প্রভৃতি ঐতিহাসিক শহর, যার অনেকগুলি 'beautiful in ruin',[১৩] দেখতে পেত তবে তার রোমান্টিক কল্পনা আরো উদ্দীপিত হতে পারত। তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা অরণ্যের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল মাত্র, কিন্তু তা যথাযথভাবে পল্লবিত ও পুষ্পিত হতে পারেনি।

এইভাবে আবেগপূর্ণ ভাষায় অকাল প্রয়াত ডিরোজিও সম্পর্কে যে মূল্যায়ণ ও দীর্ঘশ্বাস আমাদের উপহার দিয়েছেন গ্রান্ট, তাতে বোঝা যায় কী গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে কতটা আকাশস্পর্শী প্রত্যাশা ছিল তাঁর।

ডাক্তার জন গ্রান্ট বৃত্তিতে ছিলেন চিকিৎসক। ডিরোজিও যখন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন তখন ডিরোজিওর ছাত্র ও পরিজনদের সঙ্গে তিনিও ছিলেন সেই লড়াই-এর সঙ্গী হয়ে। কলেরার সুচিকিৎসা তখনো চিকিৎসাশাস্ত্রের করায়ত্ত হয়নি। কাজেই পরাজয় হয়েছিল সকলের সঙ্গে গ্রান্টেরও। তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিভার

শৈশব অঙ্কুরণে, তাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায়, তাঁর অকাল প্রয়াণের বিষণ্ণ প্রহরে। ডিরোজিওর জীবনীকার অনবদ্য ভাষায় লিখে রেখে গেছেন সেই স্বীকৃতিটুকু— গ্রান্ট হচ্ছেন সেই ব্যক্তি 'who rocked the cradle of his genius, and followed to the grave his hearse, was in constant attendence.'[১৪]

নানা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। 'ইন্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাফল্য তর্কাতীত। সম্পাদকের কৃতিত্ব শুধু পত্রিকা-পরিচালনার কৌশল বা উৎকৃষ্ট সম্পাদকীয় লেখার উপর নির্ভরশীল নয়; যিনি ডিরেজিওর মতো প্রতিভাকে শৈশবেই চিহ্নিত করতে পারেন, তাঁকে পত্রিকার মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন এবং বঙ্গসংস্কৃতিকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারেন নীলকুঠিতে চাকরী করতে চলে যাওয়া সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে তিনি নিঃসন্দেহে বাংলার সফল সম্পাদকদের অন্যতম।

এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪)-র সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৮২৩ সালের মার্চ মাসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে খোলা হয় 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি' 'for the promotion of medical enduring and research in the East, [১৫] প্রতি মাসের প্রথম শনিবার বসত তার সভা। প্রেসিডেন্ট ছিলেন এইচ. এইচ. উইলসন, সম্পাদক জে. এডাম। গ্রান্ট ছিলেন পরিচালন-সমিতির সদস্য।

১৮২৫ সালের ৪ঠা মার্চ হেয়ার স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল হরকরা লাইব্রেরীতে ডক্টর প্যাটারসনের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'ক্যালকাটা ফ্রেণোলজিক্যাল সোসাইটি', জনগ্রান্ট হন তার ভাইস প্রেসিডেন্ট।[১৬]

জেনারেল পাবলিক লাইব্রেরীর স্থাপনের লক্ষ্যে কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মিলে স্থাপন করেন 'ক্যালকাটা লাইব্রেরী সোসাইটি'। প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ৯টায় টাউন হলে বসত কমিটির মিটিং। ১৮১৯ সালেই সোসাইটির পুস্তক সংখ্যা ছিল ২,৭০০। ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল— 'The Society is at length in full operation and offers the reading part of the community an excellent opportunity of persuing all the best new works, in every department of science at the least possible expense'।[১৭] জন গ্রান্ট এক সময় এই লাইব্রেরী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী হয়েছিলেন (১৮২৬)।

১৮২৮ সালে 'মিলিটারী অরফ্যান সোসাইটি'র সার্জেন সদস্য হয়েছিলেন গ্রান্ট।[১৮]

কলকাতার 'নেটিভ হসপিটাল' পরিচালন মণ্ডলীর (গভর্নরস্) মাননীয় সদস্য ছিলেন হেনরি মেরেডিথ পার্কার, জর্জ উদনী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী। এঁদের সঙ্গে জন গ্রান্টও ছিলেন সদস্য হিসাবে (১৮৪০)।[১৯]

এসব সংবাদ-একত্র করলে ডাক্তার জন গ্রান্টের যে মূর্তিটি ফুটে ওঠে তা সমীহ করার মতোই। বোঝা যায় কলকাতার বিদ্বৎ সমাজে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও খ্যাত নামা ব্যক্তিই ছিলেন।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) Henry Louis Vivian Derozio, Poems, Calcutta, Baptist Mission Press, 1827, Dedication Page; Song of the Stormy Petrel (Complete works of H.L.V. Derozio), Ed. A.M., A.D., A.K., SSM, DCC & Progressive Publishers, Feb. 2001, p. 5

২) T. Edwards, Henry Derozio : The Eurasian Poet, Teacher and Journalist (1884) Riddhi edition 1980, p. 167.

৩) 'Bengal Past & Present', vol-5, p. 52.

৪) 'Calcutta Literary Gazette', 10 Nov. 1833, rpt. 'Bengal Hurkaru', Nov. 12, 1833; Song of the Stormy Petrel, Ibid, Appendix-II, Memoirs, The Late H.L.V. Derozio, A Memoir by Dr. John Grant, pp. 433-437.

৫) Ibid.

৬) Ibid.

৭) Ibid.

৮) Ibid.

৯) 'India Gazette', rpt. 'John Bull', January 26, 1824; শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলকাতার আদি আচার্য : ডেভিড ড্রামন, ডিরোজিও স্মরণ সমিতি ও পুনশ্চ, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪, Second Part, Documents & Original Writings, pp. 218-224.

১০) Ibid.

১১) Ibid.

১২) দ্রষ্টব্য ৪ নং উল্লেখ।

১৩) Ibid.

১৪) দ্রষ্টব্য ২নং উল্লেখ।

১৫) The Bengal Directory and General Register for the year 1826, Samuel Smith & Co, Bengal Hurkaru Press, pp. 364-365.

১৬) Ibid.

১৭) 'Calcutta Journal' or Political, commercial and Literary Gazette, (1818), vol. III, No. 64, Tuesday April 6, 1819, p. 67.

১৮) The Bengal Directory and General Register for the year 1828, Ibid.

১৯) The Bengal Almanac for the year 1940, Samuel Smith and Co., Bengal Hurkaru & Chronicle Press, No. 1, Hare St, p. 516.

# গ্রামীণ লোক উৎসব 'ভাদু'

## ধরমবীর পরামানিক

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়খণ্ডের রাঁচী, সিংভূম, এমনকি ওড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে এই 'ভাদুউৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। 'ভাদু' এমনই একটি প্রাচীন জনপ্রিয় সার্ব্বজনীন ও সামাজিক উৎসব যা ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর একদিকে যেমন রয়েছে প্রাচীনত্ব, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায় এর আধুনিকতা। গানই হল ভাদু উৎসবের প্রধান এবং একমাত্র অঙ্গ। এর সঠিক মূল্যায়ণে একদিকে যেমন বহু অজানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাবে, তেমনি অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা, জনসংযোগ, সমাজ সচেতনতা ও নারীমুক্তির কাজকে ত্বরান্বিত করা যাবে।

দারিদ্র্য, বঞ্চনা, খরা, শোষণ, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, নিরক্ষরতা যাদের নিত্যসঙ্গী সেই সমস্ত নারী সমাজেই সাধারণত ভাদ্রমাসে এই উৎসব পালন করেন। 'ভাদুউৎসব' স্থানীয় ভাষায় 'ভাদুপূজা' বা 'ভাদুপরব' হিসেবে পরিচিত। যদিও এই পূজায় কোন বিধিনিষেধ নেই, সময় নির্ঘণ্ট নেই, নেই পুরোহিত নেই কোন ছুৎ-অচ্ছুত বা জাতি ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সর্বোপরি ভাদু কোন নির্দিষ্ট দেবী নন বরং জনশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির মায়াবী রূপ। সমাজে নারী যতই অবহেলিতা হোক না কেন, সমাজে নারী শক্তির পূজা, নারীর যে উঁচু স্থান রয়েছে তারই নিদর্শন এই 'ভাদু'। ভাদু অর্চনার মূল মন্ত্র হল এর গান। এর উৎস এবং গানের গুরুত্ব হল আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় বস্তু।

গ্রামীণ লোক উৎসবগুলি কবে কোথায় বা কি প্রসঙ্গে শ্রুত হয়েছিল তা সঠিক নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। কতকগুলি কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, ভাদুগানের হেটো বই প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এর উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। উৎস প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কিংবদন্তীর কথা প্রায় সকল অন্বেষকই উল্লেখ করেছেন। তা হল— "পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজার নাকি এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম কেউ বলেছেন ভদ্রাবতী, কেউ বলেছেন ভদ্রেশ্বরী। সেই রাজকন্যার বিবাহ নির্ধারিত হয়েছিল সুপাত্রে এবং বিবাহের রাত্রেই বর আগমনের পথে ভাবী বর ডাকাতদের হাতে নিহত হন ও লগ্নভ্রষ্টা কন্যা আত্মহত্যা করেন। আবার

অনেকে বলেছেন কন্যা স্বামীর সাথে সহমরণে যান, কেউ বলেছেন অকাল মৃত্যু ঘটে। এছাড়া আরেকটি কিংবদন্তী আছে যে, ভাদু ছিলেন বিবাহিত কিন্তু স্বামীর ঘর করতেন না, দেব দেউলে রাত্রি যাপন করতেন, মীরাবাঈ-এর আমলে এই ঘটনা রাজপরিবারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। যার জন্য রাজকর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ভাদুর অকাল মৃত্যু ঘটে।[১]

কিন্তু এই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করা যায় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কন্যার অস্তিত্বের কোন সমর্থন নেই। এছাড়া ভাদু গানগুলিতে কোথাও উল্লেখ নেই যে ভাদু বিবাহিত। এছাড়া প্রশ্ন এখানেই যে, হিন্দু রাজকন্যা সম্প্রদায়ভুক্ত কন্যার বিবাহের দিন কিভাবে ভাদ্রমাসে সম্ভব? বরং কোন কোন গানে প্রাকবিবাহের মুহূর্তগুলিই দেখা যায়। যেমন—

"বিয়ে করলো ভাদু'
সাধের যৌবন ঘুচাস্‌নে শুধু শুধু।"

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায় যে, ১৭৯২ সালে পঞ্চকোটের রাজা মণিলালের মৃত্যুর পর ভরতশেখর রাজা হন, তাঁর রাজধানী ছিল 'কেশরগড়'। ভরতশেখরের তিন পুত্র ও এক কন্যার নাম যথাক্রমে চেৎসিংহ, শম্ভুনাথ, ভূপতিনাথ ও পঞ্চকুমারী। ভরতশেখরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চেৎসিংহ রাজা হন ১৮১৫ সালে। চেৎসিংহের চারপুত্র, নাম যথাক্রমে জনজীবন, জগভূষণ, জগমোহন ও রামজীবন। জ্যেষ্ঠ জগজীবন 'গরুর নারায়ণ' নাম নিয়ে রাজা হন পিতার মৃত্যুর পর এবং তাঁর সাথে কেওনঞ্জারের বিদূষী রাজকন্যার বিবাহ হয়। এঁদেরই সন্তান নীলমণি সিংহ। এরপর ১৮৩২ সালে রাজধানী কেশরগড় থেকে স্থানান্তরিত হয় 'কাশীপুরে'। কাশীপুরের রাজা বলতে নীলমণি সিংহকেই বোঝায়। এ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন এই কারণেই যে, কিংবদন্তী অনুসারে ভদ্রেশ্বরী বা ভদ্রাবতী যদি কাশীপুরের রাজকন্যা হন তবে নীলমণি সিংহই হচ্ছেন তাঁর পিতা। কিন্তু নীলমণি সিংহের তিনটি বিবাহ ও তেরটি পুত্রের সংবাদ জানা গেলেও কন্যার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। একমাত্র ভরত শেখরের কন্যা পঞ্চকুমারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] বাংলা মাসের পঞ্চম মাস ভাদ্র এবং ভাদু যে কুমারী এ সমর্থন কিংবদন্তী এবং গানে বিদ্যমান। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে ভাদুর উৎপত্তির অন্তরালে এই পঞ্চকুমারীর কথা বলা যায়।

কাশীপুরের সঙ্গে ভাদুর একটা নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ্য করে সুব্রত চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন যে, 'দেশের শৃঙ্খলা মোচনে আকাঙ্খী মানুষটির প্রগতিচিন্তায় নারী শৃঙ্খল মোচনের চিন্তা অসম্ভব নয়। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাবদ্ধ পর্দানসীন

সংসার-যাতনাক্লিষ্ট অবহেলিত নারীসমাজ অন্তত একদিন তার প্রাত্যহিকতার বাইরে আমোদ আহ্লাদে উন্মুক্ত প্রশ্বাস নিক এই সদিচ্ছা থেকেই হয়ত 'ভাদু' উৎসবের ব্যাপক প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন নীলমণি সিংহ এবং এখানেই সম্ভবত কাশীপুরের সঙ্গে ভাদুর যোগ।"[৩]

'ভাদুর' উৎস প্রসঙ্গে পুরন্দর সিংসর্দ্দার জানিয়েছেন যে, ভদ্রেশ্বরী হচ্ছে এক নিম্নবর্ণের ঘরের মেয়ে, যে কাশীপুরের রাজার কোনো এক ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়ে। কিন্তু রাজা তা মেনে নিতে পারেন নি। তাই ভদ্রেশ্বরী শেষ পর্যন্ত রাজকুমারকে না পেয়ে আত্মহত্যা করে এবং সেই থেকেই গ্রামের মেয়েরা 'ভাদু-পূজা' শুরু করেন। এ থেকে অসবর্ণ বিবাহের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্যা সমাজে আজও বর্তমান। অপর একটি কিংবদন্তী হল পাঁচেটের রাজার সঙ্গে নাকি ছাতনার রাজার যুদ্ধ শুরু হয় ভাদ্র মাসে এবং সেই যুদ্ধে জয়ী পাঁচেটের রাজা বিজয়োৎসব হিসাবে 'ভাদু' উৎসবের প্রচলন করেন। 'বাঁকুড়ার-মন্দির' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভাদু উৎসের একটি সুত্রে জানিয়েছেন যে, "পুরাকালে পাঁচেৎ রাজ্যে এক রাজা ছিলেন তাঁর মেয়ে ভাদু, কন্যার বিবাহের বর পেতে পাঁচেৎ রাজারা নাকি বরাবরই ঘোর অসুবিধা ভোগ করতেন। বহুদিন অবিবাহিতা থেকে ভাদু আত্মহত্যা করেন"।[৪]

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, লাড়া গ্রামের (বর্তমান সোনাথলি) মুখিয়া গিরিলাল প্রকৃতির কোলে এক কন্যা সন্তান কুড়িয়ে পান। সেই বৎসরই রাজা নীলমণি সিংহ দেও ভাদই ধানের চাষ প্রচলন করেন। তাই গিরিলাল তাঁর পালিতা কন্যার নাম রাখেন ভদ্রেশ্বরী ভাদরি, ভাদু। এই নতুন কৃষি ব্যবস্থায় প্রজারা খুশি কিনা তা সম্যক জানার জন্য রাজা ছদ্মবেশে তাঁর প্রিয় সহচর ধ্রুবচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রাজা নীলমণি সিংহের কোনো কন্যা সন্তান না থাকায় তিনি গিরিলালের পালিতা কন্যা ভদ্রেশ্বরীকে দত্তক নেন। কিন্তু তার এই পরিচয় গোপন রাখা হয়। সে বড় হতে থাকে গিরিলালের কাছেই। সমস্ত শাস্ত্র সে যথাযথ আয়ত্ত্ব করে সর্বগুনান্বিতা হয়ে ওঠে। কুশগুড়ি গ্রামের কবিরাজ কলাধর মিশ্রের পালিত পুত্র অনঙ্গর সঙ্গে ভাদুর প্রণয় ও তার পরিণামে পড়াশোনায় অমনোযোগ চিন্তায় ফেলে গিরিলাল এবং ধ্রুবচাঁদকে। এই সময় সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহে মদত দেওয়া এবং ট্রেজারি থেকে টাকা লুঠের পিছনে রাজার হাত আছে সন্দেহে ক্যাপ্টেন ওক্স সসৈন্য এসে বন্দি করে রাজা নীলমণিকে। অন্যদিকে অনঙ্গ ও ভদ্রেশ্বরী যেখানে মিলিত হত সেই মন্দির প্রাঙ্গন থেকেই একদিন ধ্রুব চাঁদের পাঠানো অশ্বারোহী অনঙ্গকে বন্দি করে আনে। গ্রামের মানুষ বা ভদ্রেশ্বরী কিছুই জানতে পারে না। ভদ্রেশ্বরী নির্ধারিত সময়ে অনঙ্গর জন্য

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে ফিরে আসে। পরে গিরিলাল ও তার স্ত্রীর মুখে অনঙ্গর নিরুদেশ হওয়ার খবর পেয়ে ভদ্রেশ্বরী অতিমাত্রায় কাতর হয়ে পড়ে, তার মনে জমে ওঠে নানা সংশয়। অবশেষে ভদ্রেশ্বরী দুই সখিকে সঙ্গে নিয়ে উন্মাদের মতো খুঁজতে শুরু করে। এদিকে রাজা নীলমণি সিংহ দেও মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে এই সংবাদে দিশাহারা হয়ে ওঠেন। রাণীদের পরামর্শে মুক্ত অনঙ্গকে নিয়ে ধ্রুব ও রাজা গিরিলালের বাড়ীতে এসে শুনেন ভদ্রেশ্বরী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। গোটা গ্রাম মূহ্যমান। ভদ্রেশ্বরীর দুই সখি রাজাকে জানায় কীভাবে তাদের সঙ্গে নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে এখানে ওখানে অনঙ্গের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ভদ্রেশ্বরী হারিয়ে যায় এবং আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখে। স্থানীয় বালিকাদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে ভাদুর রচিত গান। তাই ভাদুকে মানুষের মনে বাঁচিয়ে রাখতে রাজা নীলমণি সিংহ দেও 'ভাদু উৎসব' প্রচলন করেন।[৫]

এই সমস্ত কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি থেকে জানা যায় ভাদুর আত্মহননের কথা। সুতরাং এগুলি যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে ভাদু একটি 'স্মৃতি উৎসব'। কারণ এই মস্ত এলাকায় এখনও অনেক স্মৃতিউৎসব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে যদিও সেগুলি বেশিরভাগই ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ পরামানিক কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন মঠা সিংহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহার সংলগ্ন 'মাঠাবুরু', সরলা সতীকে কেন্দ্র করে বাগমুণ্ডি থানার অন্তর্গত সিন্দরী অঞ্চলের নিধিয়াটাঁড়ের 'সতীমেলা', অর্চনা জড়ত্তির 'হারূপ মেলা' প্রভৃতি। অর্থাৎ তিনি ভাদুর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে ভাদুকে কেন্দ্র করে 'ভাদুউৎসব'-এর কথা বলেছেন।

ভাদু উৎসবকে অনেকে 'করম উৎসব'-এর সংস্করণ বলে মনে করেন। কিন্তু 'করম উৎসব'-এর সঙ্গে 'ভাদু উৎসব'-এর যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বরং টুসু উৎসবের সঙ্গে ভাদুর প্রকৃতিগত বহু মিল লক্ষ্য করা যায়। ভাদু যেমন কৃষিকার্য শেষ করার পর শুরু হয়। ঠিক একইভাবে জমি থেকে ফসল বাড়ীতে নিয়ে আসার পর টুসু উৎসব শুরু হয়, দুটি উৎসবের মধ্যেই মেয়েদের প্রাধান্য এবং গানের ক্ষেত্রে বহু সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখিত উৎসবগুলি প্রায় সমস্তটাই অনুমান নির্ভর হওয়ায় বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় সকল অন্বেষকই প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই উৎসবকে মেনে নিয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য কৃষি পরিমণ্ডলের সঙ্গে ভাদুর নিবিড় যোগ লক্ষ্য করে এটিকে 'কৃষি উৎসব' বা 'নবান্ন উৎসব' বলে অভিহিত করেছেন।[৬] তরুণদেব ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেছেন,

সম্ভবত বিস্তীর্ণ অনুর্বর জমিগুলিতে ভাদোই চাষের জন্য পাঁচেটের রাজা বাউরিও বাগদিদের উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতাই এই উৎসব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[৭] 'ভাদু ও টুসু' গ্রন্থের প্রণেতা রামশঙ্কর চৌধুরীর মতে, ভাদু উৎসব ফসল ফলানোর উৎসব, ফসলের সঙ্গে এই উৎসবের যোগ অত্যন্ত নিবিড়।[৮] নিবারণ চন্দ্র মাহাত ও নিরঞ্জন পরামাণিক ভাদু উৎসবকে 'ঋতু উৎসব' বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির ঘটে রূপের পরিবর্তন, প্রকৃতির সেই রূপসজ্জার বৈচিত্রই রচনা করে দেয় বাংলার উৎসবগুলির বর্ণোজ্বল পটভূমি। বর্ষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শুরু হয় 'জাঁতাল পূজা' (বৃক্ষরোপন উৎসব), তেমনি চাষবাস শেষ করে ভাদ্র মাসে শুরু হয় 'ভাদু পূজা' বা 'ভাদু উৎসব'।

ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সমাজের গ্রামীণ উৎসবগুলি সমস্তই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া মূলত যে দুটি জেলায় এই উৎসবের শিকড় নিহিত, আজ সভ্যতার একবিংশ শতাব্দীর জন্ম লগ্নেও খরায় অভিশপ্ত এই অঞ্চলের দারিদ্রসীমা অপরিসীম। দারিদ্র ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা এই অঞ্চলের বৃহদাংশ নারী সমাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেই সঙ্গে রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে কুসংস্কারের জটিল জাল, পরাধীনতার শৃঙ্খলে তারা আবদ্ধ। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষিকার্য ও গৃহকার্য সমানতালে চালিয়ে ভাদ্র মাসে তাঁদের ভাগ্যে জোটে অল্পসময়ের অবসর। এই সময়েই তারা ক্ষণিক আনন্দে মেতে ওঠেন এবং ভাদ্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত একটি নারীমূর্তিকে কেন্দ্র করে একটি স্থানে সমবেত হয়ে গানের মধ্য দিয়ে সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা, শোষণ-শাসন, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম-বিরহ প্রতিবাদের ভাষা, চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি, ঐতিহাসিক ঘটনা সমস্ত কিছু মনের ভাব প্রকাশ করে গানের মধ্যে দিয়ে। স্বাধীনতা বলতে তাদের এইটুকুই। ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় কয়েকজন বৃদ্ধানারীও বলেন, "বাবু হাম্‌দের ত্ সারাবছরেই চাষ কত্তে, কুথায় সময় .......... ভাদরটাই টুকু ফুর্‌সৎ (সময়) পাই .......... বলিই হাম্‌রা লাচ-গান করি .........."। তাই যেহেতু এই আনন্দ উৎসব ভাদ্র মাসে শুরু হয় সেই কারণেই হয়ত 'ভাদু উৎসব' নামে পরিচিত। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রত্যক্ষভাবে ভাদ্র মাসের নাম সাদৃশ্য হেতু ভাদ্র থেকে ভাদুর উৎপত্তি বলে জানিয়েছেন।[৯] এক কথায় নানা বন্ধনে নিপীড়িত, অবহেলিত এই নারী সমাজের জীবনের সামান্যতম আনন্দের জন্য তারা ভাদুকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠেছিল এই স্বল্প সময়ের আনন্দ উৎসবে। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অল্প সময়ের জন্যও লক্ষ্য করা যায় অবমানিতা নারী সমাজের স্বাধিকার কামনার আকাঙ্খা, ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাদু উৎসবকে

'নারী মুক্তির উৎসব' হিসাবে পরিগণিত করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ভাদু গানও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

"আজকের ভাদুপূজা, ..........
বছর মাঝে একটি রাতেই লো উড়াতে প্রাণের ধ্বজা।
বাধা বারণ কিসের কারণ রে, আজ খোলা সবদরজা
নেই কোন ভয় মনে মোদের, আজকে রাতের মোরা রাজা।[১০]

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাদু গানগুলির ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত নিত্য বহমান সর্বস্তরের ঘটনাবলী এর মূল বিষয়। এই গানের মধ্যে রয়েছে এক গতিশীল ধারা। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংসারিক আত্মিক সব কথা আছে ভাদু গানে। আসলে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানের ভাষাও বদলে গেছে। কিন্তু তার অন্তরের সুর বদলায়নি। এটাই এর বৈচিত্র্য, এটাই বিরাটত্ব, সংস্কৃতির লোক চরিত্র এটাই। ভাদুগানে কুমারী মনের ভাবনা চিন্তা, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম ইত্যাদি যত আছে, তার চেয়ে বেশি আছে চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসলও যেমন আছে, তেমনি আছে আগামী দিনের সম্ভাব্য প্রাচুর্য্যের ছবি, যেমন আছে পৌরাণিক কাব্যগাথার বিষয়, তেমনি আছে ঐতিহাসিক ঘটনা ও আধুনিকতা। এই গানগুলির মধ্যে দিয়ে একটা চেতনা সঞ্চারের শুভ প্রচেষ্টার দিকটি লক্ষ্য করে এ উৎসবের প্রসার চিন্তা বর্তমানের সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে একটি জরুরী ও সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর গানগুলির যথাসামান্য উদাহরণ উদ্ধৃত করে আলোচনা করলে বোঝা যাবে এর গুরুত্ব কতখানি।

ব্যাপক হারে বৃক্ষছেদনের ফলে বনজঙ্গল আজ ধ্বংসের পথে। ভাদুগানে তারই ইঙ্গিত—

"ভাদু পূজতে হলে
বনফুল আর কোথা পাব জঙ্গলে,
আশে পাশে নাই যে জঙ্গল যাব দুবড়াকোণের জঙ্গলে .........।"[১১]

গ্রামীণ সমাজে নিরক্ষরতার অভিশাপ আরো দুর্বিষহ। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গীতিকার তুলে ধরেছেন,

"বলি ও মরমী সই,
আমার হাতে কেন দিলে ভাদু বই,

বালিকা বয়সে আমি লো লেখাপড়া শিখলাম কই,

সেই জন্যই তো লাজে মরি, সরমে মরিয়া রই ........।"

পণ প্রথা সমাজের এক নিদারুণ ক্ষত। তাই পণপ্রথার ধিক্কার জানিয়েছেন—

"বলি এ সংসারে ............

গরু কাড়া, ছাগল ভেড়া সাজালি যে বেটারে,

দিচ্ছে টাকা নিচ্ছে গুনে বেটাকে বিক্রি করে।"[১২]

শুধু তাই নয় পণপ্রথার বিরুদ্ধে ভাদু গানে নারীমুখের প্রতিবাদী ভূমিকাও দেখা যায়। যেমন—

"এস এস যত নারীগণ ...........

দিব না দিব না বলি গো দিব না বরের পণ .............

তবে যত নারী লাঠি হাতে ধরি করব বলি আমরা রণ ............"।[১৩]

নারী মুক্তির চিন্তার এমন জ্বলন্ত বাগ্মিতা তীব্রভাবে উচ্চারিত হয় কটি লোকউৎসবে? যার মধ্য দিয়ে পণ প্রথায় নয়, উচ্চনীচ ভেদাভেদ ও ঐক্যসংহতির ডাক বহন করে।

"যদি চাও মঙ্গল

প্রেম বারিতে নিভাও দেশের হিংসানল ............

হোস যদি এক ভায়ে ভায়ে, জগৎ রবে তোদের তল।"[১৪]

ভাদুগানের মধ্যে সামাজিক সচেতনতার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়।

"দেখলাম বাঁকুড়াতে

মদ খেয়ে ভাই উনিশ জনার প্রাণ গেছে ............

তাই পলি কেউ মদ খেও না যেও না মদের কাছে।"[১৫]

বেকারের যে জ্বালাতন সেটিও নারী হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

"বেকার সারা দেশে

কত ছেলে পাশ করে সব যায় ভেসে ...........।।"[১৬]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভারতবর্ষ আজ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সম্মুখীন। তাই দেশের শান্তির জন্য গীতিকারগণ সেদিকেও নজর দিয়েছেন।

"শান্তি সেদিন হবে

মানুষ যবে প্রকৃত মানুষ হবে

হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ, দ্বন্দ্ব গো যেদিন সবে ছাড়িবে
দয়া, মায়া প্রীতি, ভক্তি সবার প্রাণে জাগিবে ............।"[১৭]

অন্যায়, শোষণ, শাসন, খরা, বন্যা প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশ কোন কিছুই বাদ যায়নি তাদের গানে—

১) "দেশের অনাচারে
সারা বাংলা ছাইল মন্বন্তরে
সে দিনই আসছে আবার ঠিক দুবছর পরে ............।" [১৮]

২) "সুনামীতে সব ভেসে গেল
কত শিশু যে অনাথ হল .............
দলে দলে চল সবাই তাদেরকে সাহায্য কর ............"[১৯]

৩) "কুলি মজুর তোরা
তোদের দিকে চাইবে না ভুলেও এরা
পেট ভরে না খেতে পেয়ে রে, হোস যদি সব আধমরা,
(তবু) চাইবে না রে তোদের প্রতি এরাই দেশের ধনীরা .........।"[২০]

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রতিবছরই স্থান পাচ্ছে ভাদু গানের হেটো বইগুলিতে। কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যে সে বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কয়েকটি পুরানো ভাদু গানের বই-এর নাম উল্লেখ করা হল। যথা— "নীল করদের কী অত্যাচার (১৮৬০)", "হায় কি অদ্ভুত কাণ্ড (১৮৬৪)", "বাবুদের দুর্গোৎসব (১৮৪৮)", "ডেঙ্গুজ্বরের পাঁচালী (১৮৭২)", "বউ হওয়া একী দায়, গঞ্জনায় প্রায় যায় (১৮৯৮)"। কিন্তু এই সমস্ত বইগুলি আজ অবহেলিত। নেই সংরক্ষণ বা সংকলনের বিষয়ে পর্যাপ্ত ভাবনা চিন্তা। তাই এগুলি যদি প্রকাশের উৎসাহ দেওয়া যায়, এগুলিকে আরও যত্ন সহকারে উপস্থাপনের একটা সম্ভাবনা গড়ে তোলা যায়, তবে একদিকে যেমন গ্রামীণ অখ্যাত গীতিকারদের একটা প্রশস্থ ক্ষেত্র তৈরী করা যাবে, তেমনি অন্যদিকে সমাজ সচেতনতার অনেক বার্তা খুব সহজে পৌঁছে দেওয়া যাবে গ্রামীণ অবহেলিত নারী সমাজের কাছে। যেখানে 'মিডিয়া'-র অভাব সেখানে 'ভাদু'কে মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি ভেবে দেখার সময়।

সুতরাং একদিকে দারিদ্রের অপরিসীম নিষ্পেষণ, অন্যদিকে সামাজিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নানা প্রতিবন্ধকতার জটিল জাল ছিঁড়ে একদা তাই জেগে উঠেছিল

সমবেত বৃহদাংশ নারী সমাজ ভাদুকে উপলক্ষ করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও কিন্তু সেই বৃহদাংশ নারী সমাজের সমস্যা আজও যথেষ্ট পরিমাণে দুরীভূত হয়নি। তাই সমাজ উন্নয়ন চিন্তায় নারী সমাজে যে সচেতনতা উদ্ভাবনের জন্য বর্তমান চিন্তা কর্মরত ভাদুর মাধ্যমেই সেই কাজ সেই সমস্ত এলাকায় তরান্বিত করা সম্ভব। বৃহৎ নারী সমাজ জনসংযোগের কাজে ভাদু একটি উন্নত ক্ষেত্র। তাই বর্তমান নারী প্রগতি চিন্তায় ভাদু উৎসবের ব্যাপক প্রসার চিন্তা, একটি সময় অনুযায়ী বাস্তব সমাজ চিন্তার সংযোজন, যা সার্থক হয়ে উঠলে একদিকে যেমন ক্রমশ অবলুপ্তি থেকে রক্ষা পাবে একটি প্রাচীন লোকউৎসব তেমনি অন্যদিকে সমজের একটি বৃহদাংশ নারী সমাজ সচেতন হয়ে উঠবে যার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা, কুসংস্কার, জনসংযোগ, জনশিক্ষা নারীমুক্তি প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করা যাবে। কিন্তু নানা গুরুভার সমস্যার চাপে গ্রামীণ উৎসবগুলি আজ নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। নাগরিক সভ্যতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার নিষ্ঠুর আক্রমণে উৎসবের আত্মা আজ তিরোহিত। মানুষের চিন্তা-ভাবনাও শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিকাশের দিকে। কিন্তু শহরের সঙ্গে গ্রামের সংস্কৃতির যদি বিকাশ না ঘটানো যায়, তাহলে কখনও সামগ্রিক সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে এটা ভেবে দেখা দরকার।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১, ২, ৩) ভাদুঃ সুব্রত চক্রবর্তী, পৃ. ৯, ১১, ১২।

৪) ' বাঁকুড়ার মন্দির'— শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫) 'দেশ' পত্রিকা ঃ ধারাবাহিক উপন্যাস, ভূমিকন্যা — নীলকণ্ঠ ঘোষাল, নভেম্বর ২০০৪ থেকে এপ্রিল ২০০৫।

৬, ৯) বাংলার লোকসংস্কৃতি ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

৭) পুরুলিয়া ঃ তরুণদেব ভট্টাচার্য্য।

৮) ভাদু ও টুসু ঃ রামশঙ্কর চৌধুরী।

১০) ছন্নছাড়া — ২রা ভাদ্র, ১৩৬৮।

১১) প্রণেতা ও প্রকাশক নারায়ণ চন্দ্রগরাই।

১২) গীতিকার — মধুসূদন দেব

১৩, ১৭) গীতিকার — কালিপদ কুণ্ডু।

১৪) গীতিকার — রাখহরি কর্মকার।

১৫, ২০) গীতিকার — রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮) রচনা — শ্রী নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, প্রকাশক শ্রী প্রবোধ চন্দ্র দত্ত বাঁকুড়া।

১৯) গীতিকার — সুমেন মাহাত, পুরুলিয়া।

**সাক্ষাৎকার ঃ**

নিবারণচন্দ্র মাহাত (প্রধান শিক্ষক, বাগমুন্ডি উঃ মাঃ বিদ্যালয়), সুখেন মাহাত (ঝুমুরশিল্পী), নিরঞ্জন পরামানিক (শিক্ষক বাগমুন্ডি উঃ মাঃ বিদ্যালয়), জলধর কর্মকার (শিক্ষক, বলরামপুর ফুলচাঁদ উঃ মাঃ বিদ্যালয়), পুরন্দর সিং সর্দ্দার (পুরুলিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ), দেবেন্দ্রনাথ পরামানিক, ভবানী প্রসাদ সিং দেও (নীলমণি সিংহদেও এর উত্তরসূরী), লান্টু বিদ (কাশীপুর), ঝুমা মাঝি, প্রতিমা দে (ভাদু পালন কারিনী) ও বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার অন্যান্য গ্রামবাসীগণ।

# শ্রমিক সচেতন বাংলা সাহিত্যিক ঃ ১৮৭০-১৯৫০

শুভেন্দু শিকদার

দেশ ও কাল সাহিত্য-শিল্পীর মনে যে ভাব ও চিন্তায় রেখাপাত করে, তাই তার বিশিষ্ট কল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অনেকাংশ শিল্পরূপে প্রকাশ পায়। বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবন অনুসন্ধান করে তাঁদের শ্রমিক সংক্রান্ত সাহিত্য কর্মকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

পুঁজিপতিদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ না করলেও[১] নিজের সমাজের অধস্তন শ্রেণীর প্রাসঙ্গিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র[২] ও শিবনাথ শাস্ত্রী সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সমূহর (মার্কসবাদ নয়) দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তা বিসর্জন দিলেও শিবনাথ শাস্ত্রী স্বভূমির শ্রমিক জাগরণ কামনা করেছেন।[৩] খোঁজ খবর রাখলেও (হয়ত মার্কসবাদেরও[৪]) বিবেকানন্দের আস্থা বেদান্তের সাম্যের উপরে, তবে 'শূদ্র'দের (শ্রমজীবীদের) অভ্যুত্থান রাশিয়া অথবা চিনে প্রথম হবে বলে তিনি আশাবাদী ছিলেন।[৫]

রবীন্দ্রনাথ সমাজবাদী অভ্যুত্থান[৬], ধনতান্ত্রিক শোষণ[৭], শ্রমিক অন্দোলন - মে দিবস[৮] সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। রুশ বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর আশা[৯] ও সংশয়[১০] থাকলেও ক্লার্তে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর (১৯১৯), সংহতি পত্রিকায় লিখিত পত্র (১৯২৩) ও রাশিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন ভবন প্রদত্ত ভাষণ (২৪শে সেপ্টে. ১৯৩০), সোভিয়েত সুহৃদ সংঘে থাকার বাসনা, জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাফল্যে উচ্ছ্বাস মেহনতী মানুষের জাগরণের প্রতি তাঁর আস্থা ঘোষণা করে। যা তার লেখার মধ্যেও বড় হয়ে উঠেছিল।[১১] তা বলে শ্রমজীবির একনায়কত্ব কামনা করেন নি। কমিউনিজমের আলোক দ্যুতি প্রত্যক্ষ করলেও[১২], রাশিয়ার কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার বরণের কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করলেও[১৩] মার্কসবাদীদের সঙ্গে তার মতাদর্শগত ব্যবধান ছিল। শ্রমজীবি জনগণের জীবনই সকল শিল্প-সাহিত্যের আসল ভিত্তিভূমি, এই সত্যের ক্ষণকালীন আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[১৪]

মার্কসবাদ, রুশ বিপ্লব সম্পর্কে ত্যাগের[১৫] প্রভাব শরৎচন্দ্রর উপর কতটা পড়েছিল বলা না গেলেও সমাজতান্ত্রিক চেতনা তাঁর মনে ক্রমেই দানা বাঁধছিল।[১৬] রেঙ্গুন পর্বে জোলা ও অন্যান্য ফরাসী সাহিত্যিকদের প্রতি আকর্ষণই নির্যাতিত ও অপাংক্তেয়

মানুষগুলির শরৎসাহিত্যে স্থান পাওয়ার কারণ[১৭], রুশ বিপ্লব সম্পর্কে উচ্ছ্বাস[১৮], মার্কসবাদী রাজনীতির প্রতি ঝোঁক, সাম্যবাদী ইস্তাহার পাঠ[১৯] সত্ত্বেও নজরুলের বিদ্রোহ মার্কসবাদী প্রেরণা সঞ্জাত নয়, শ্রমিক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত মানবদরদী কবি প্রাণের প্রচন্ড আবেগ সঞ্জাত।[২০]

কল্লোল গোষ্ঠী রুশ বিপ্লবের উন্মাদনায়[২১] বা মার্কসবাদের অনুপ্রেরনায় (সেই গভীর সমাজবোধ ছিল না)[২২] জনজীবনবাদের অবতারণা করেন নি। গোর্কি-হাসমুন, শরৎ সাহিত্য ছিল তাঁদের প্রেরণা,[২৩] তবে শৈলজানন্দকে ফ্রয়েড বা বিদেশী সাহিত্য প্রভাবিত করতে পারে নি,[২৪] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রোমান্টিক কল্পনার জন্য দুঃখ-দারিদ্রের জীবন কল্লোলের সহচরদের মতো গ্রহণ করতে পারেন নি।[২৫] প্রেমেন্দ্র মিত্র ওয়াল্ট হুইটম্যানের দ্বারা প্রভাবিত হলেও[২৬] শোষক-শোষিত সম্পর্কে তার ধারণা বোধ হয় মার্কসীয় চেতনা সঞ্জাত।[২৭] মার্কসবাদের উপযোগিতার কথা স্বীকার[২৮] বা ব্যক্তি চেতনায় তা বহন ইতর জনতার জীবন সংগ্রাম হিসাবে তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয় নি।[২৯] রাজনীতি নিরপেক্ষ জীবনানন্দ দাশ তিরিশের দশকের শেষ ভাগে সাম্যবাদী চেতনার প্রভাব একেবারে এড়াতে পারেন নি।[৩০]

কমিউনিজমের তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ ও কিছুটা 'ক্যাপিটাল' পাঠ রুশ বিপ্লব ও লেনিনের প্রীতি আকর্ষণ বোধ করলেও,[৩১] তারাশঙ্কর নিজের আদর্শবোধ অনুযায়ী (গান্ধীবাদের প্রভাবে[৩২] বা সামন্ততন্ত্রের প্রতি আপোষমুখী মানসিকতা ও ভালবাসার টানে[৩৩]) কমিউনিজমের এক রূপকে তৈরী করে তাকেই স্বরূপ বলে ধরেছিলেন।[৩৪] তবে নিজের চোখে দেখা, কানে শোনা অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর শিল্প প্রেরণার উৎস।[৩৫]

কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও স্বীকার করেছেন মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়েছে,[৩৬] নিজের মতো করে সাম্যবাদী ধ্যানধারণার কথা বলে গেছেন।[৩৭] 'শ্রমিক শ্রেণীর যোদ্ধা কমিউনিস্ট'[৩৮] মানিকের বিশ্বাস শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থসংগ্রাম ও চেতনা ষোল আনা নিজের করে নিয়ে তাদের একজন হয়ে পড়া।[৩৯] শিল্পী-সাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শ্রমিক মজুরের মধ্যে কাজে নামাতেও তাঁর সমর্থন ছিল।[৪০]

সন্তোষকুমারী দেবী শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতির জন্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।[৪১] বিমল, প্রতিভাদেবী বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের সদস্য, আর সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা, গোপাল হালদার কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। ১৯৩০ এ তিনি তরুণ সম্প্রদায়কে কৃষক-মজুর শক্তি সংগঠনের কথা বলেছিলেন,[৪২] কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য সোমেন চন্দ্র শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বিপ্লবী কৌশল ও বিস্তার নিয়ে

যথেষ্ট ভাবতেন।[৪৩] শ্রমিকদের মধ্যে থাকলেই লেখার উপকরণ জোগাড় হয় বলে মনে করতেন।[৪৪]

সুবোধ ঘোষ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হয়ে শ্রমিক-কৃষককে ছেড়ে অন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[৪৫] নবেন্দু ঘোষ ছিলেন বামপন্থী।[৪৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়েও সমাজবাদ বিষয়ে ভাববাদী।[৪৭] বনফুল সপ্তর্ষি (১৯৪৫) উপন্যাস যুগের রাজনীতি ও গণচেতনার প্রমাণ রাখলেও জনযুদ্ধের নীতি[৪৮] ও বুর্জোয়া সমাজের উপযোগী সাহিত্য রচনার[৪৯] কারণে কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হয়ে পড়েন। সতীনাথ ভাদুড়ী মার্কসবাদ পড়েছিলেন, কমিউনিস্টদের পছন্দও করতেন,[৫০] কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সহানুভুতির দ্বারাও ছিলেন অনুপ্রাণিত, তবে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল।[৫১] গান্ধীবাদী (গান্ধীর অর্থনৈতিক ভাবনা নয়) ছিল তাঁর জীবনাদর্শ।[৫২] শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী রাজনীতির দিকে পা না বাড়িয়ে বাকী সাহিত্য জীবন কাটিয়ে দেন, সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদও পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি স্বীকার করেছেন গান্ধীজী ছিলেন তাঁর অন্তরের একমাত্র প্রেরণা।[৫৩]

দিনেশ দাস চা বাগানের কুলিদের দুর্দশা দেখে, সাম্যবাদী সাহিত্যের প্রেরণায় সর্বহারা শ্রমিকদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। মার্কসবাদেও দীক্ষিত হন। বিষ্ণু দে'র নবীন চেতনায় কৃষক মজুরের সংহতি চেতনা অঙ্গীভূত হলেও, সাম্যবাদ অবলম্বনে কবিতা লিখলেও জনতার কাছে তাঁর কবিতার সহজ আবেদন একেবারে নেই।[৫৪] সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কসবাদের শিক্ষা পেলেও, সাম্যবাদের পথ একমাত্র পথ বুঝলেও, সমর সেনের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিলসই প্রধান হয়ে উঠেছে, জনতার আবেগ ভাষারূপ লাভ করে নি। আর রাজনীতি আর কবিতাকে মেলাতে না পারায় শোষিত জনসাধারণের জীবন সংগ্রামের জ্বালা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করেনি। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলেই সুকান্ত হতে চেয়েছিলেন জনতার কবি।[৫৫] মজুর জীবনের দুঃখ আর সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে দুঃখ মোচনের জন্য বিদ্রোহের প্রয়োজন বুঝতে শিখেছিলেন।[৫৬] কবি গোলাম কুদ্দুসও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর চল্লিশের দশক থেকে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃষক-শ্রমিক অর্থাৎ বামপন্থী আন্দোলন প্রচারের দায়বদ্ধতাকে তাঁর কাব্য কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন।[৫৭]

উদার মানবতাবাদী অকমিউনিস্ট শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও তুলসী লাহিড়ী গণনাট্য সংঘের কর্মকান্ডকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলেন।[৫৮] হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়,

জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র, সলিল চৌধুরী, মেটিয়াবুরুজের চটকল শ্রমিক গুরুদাস পাল (সনাতন মন্ডল), হাওড়ার রাজগঞ্জের চটকল কর্মী সুরেন নস্কর, কৃষক শ্রমিকের জয়গান গাওয়া রমেশ শীল, শ্রমিক ও বণিক পালার রচয়িতা কৃষক কবি গোমহানী দেওয়ান, সুতাকল মজুর প্রমুখের জন্য গান লেখা কৃষক নেতা সত্যেন সেন প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং মার্ক্সীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে অসংখ্য গণসঙ্গীত রচনা করেন। সলিল চৌধুরী গীতিকার সুরকারকে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গান তৈরী করতে হবে - রণদিভে লাইনের এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।[৫৯]

শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কের দিকটাতে দেখা যায় শিবনাথ শাস্ত্রী 'সমদর্শী'তে ও রামকুমার বিদ্যারত্ন 'সঞ্জীবনী'তে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর নিষ্পেষণের বিবরণী তুলে ধরেন। শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রমিকদের নিয়ে প্রথম কবিতা লিখেছিলেন এবং জাতিকে স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত করার কাজে শ্রমজীবিদের যোগদান একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন।[৬০] রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রহ্মধর্ম প্রচারের কাজে গিয়েই চা-কুলিদের দুর্দশার কথা জানতে পারে, তারই ফল 'কুলি কাহিনী'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পড়ে ও নীলদর্পণের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে[৬১] দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় চা-কর দর্পণ (১৮৭৪) লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। কারখানার শূদ্রদের উপর বৈশ্যদের শোষণ সম্পর্কে অবহিত[৬২] বিবেকানন্দ, নতুন ভারত কারখানা থেকেও আবির্ভূত হোক চেয়েছিলেন।[৬৩] স্বদেশী যুগে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যারিস্টার প্রভাত কুসুম চৌধুরী 'নব্যভারত' পত্রিকায় বহুশ্রমিক দরদী প্রবন্ধে লেখেন, আজীবন তিনি শ্রমিক সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন।[৬৪]

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৩ এ আমেদাবাদের শ্রমিকদের দুরবস্থা; পরে মাদ্রাজ, কলকাতা, জামসেদপুর ও আসামের শ্রমিক ধর্মঘটের কথা শুনেছিলেন। রক্তকরবী নাটক হয়ত এরই শিল্পরূপ[৬৫] (বিপরীত মতও আছে[৬৬])। গ্রামের কৃষকের চটকলের শ্রমিক হওয়ার খবর রাখতেন[৬৭], তাদের উপর অমানুষিক শোষণের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (মর্ডান রিভিয়িউ, জানু-১৯৩০)। ১৯৩৪ এ তাদের ধর্মঘটের সময় সরকারকে তাদের দাবি মেনে নেওয়া ও জনসাধারণকে তাদের সাহায্য করার আবেদন রেখেছিলেন। 'মাধো' কবিতাটি এই উপলক্ষেই রচিত। তবে কারখানার শ্রমিক জীবনের সঙ্গে তাঁর অপরিচিতি হেতু তাঁর সাহিত্য কর্মে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, তা তিনি স্বীকার করেছেন।[৬৮]

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের জীবন কেটেছিল শ্রমিকদের মধ্যে।[৬৯] ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও সহানুভূতির পরিচয় তাঁর 'পথের দাবী' (১৯২৬)।[৭০] হাওড়া

মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙর ধর্মঘটে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে বোধহয় শরৎচন্দ্র মাটির মানুষের কথা খুব কমই বলেছেন।[৭১] বাংলা সাহিত্যের সঠিক আদর্শ 'সমাজের নীচের স্তরে' নেমে যাওয়া তাতে সংশয় তাঁর না থাকলেও[৭২], কৃষক-শ্রমিকের জন্য সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না বলে 'পথের দাবী'তে রায় দিয়েছেন।[৭৩]

কৈশোরই নজরুলকে শ্রমজীবী সমাজের অভিজ্ঞতা এনে দেয়।[৭৪] নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন শুধু কবিতা রচনা নয়, কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলনকে স্মরণ-সমর্থন করতে হবে এবং শ্রমিকদের মধ্যে ক্যাপিটালের মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু যোদ্ধা মানুষের দরকার।[৭৫] লেবার স্বরাজ পার্টি (১৯২৫), বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল (১৯২৭) এর তিনিই অন্যতম উদ্যোক্তা, নবযুগ ও লাঙ্গলের পাতায় পাতায় শ্রমিক ও কৃষকের কথা ঘোষণা করতেন।[৭৬] কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে মিশতেন,[৭৭] তাদের মধ্যে গানও গাইতেন,[৭৮] কৃষ্ণনগরে শ্রমজীবী মহল্লায় থেকেছিলেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) এই পরিবেশেই লিখিত হয়েছিল।[৭৯]

কল্লোলের লেখকরা বস্তি থেকে কুলি লাইনে গেলেও তাদের মনন সঞ্জাত বাস্তবতার ছবিতে প্রকৃত অভিজ্ঞতার অভাব যথেষ্ট ছিল।[৮০] তবে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও রানিগঞ্জে কয়লাখনি অঞ্চলে কাটানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল কয়লাকুঠির কাহিনীগুলি।[৮১] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই নিম্নবিত্তের জীবনসীমাকে সঠিক চিহ্নিত করতে পেরেছেন।[৮২] জীবনানন্দ দাশের সুতীর্থ (১৯৪৮) উপন্যাসে শ্রমিক ধর্মঘটের বিবরণ প্রমাণ করে ১৯৪৮ এর সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর সচেতনতা।[৮৩] তবে কল্লোলের লেখকদের মনে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট কোনো সাড়া জাগাতে পারে নি।[৮৪]

তারাশঙ্করের শ্রমিক জীবনের অভিজ্ঞতা হয় কোলিয়ারিতে।[৮৫] বীরভূমে চালকল স্থাপন ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে থেকে কলের মজুর হওয়া তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।[৮৬] যার প্রথম ফসল হল চৈতালী ঘূর্ণি (পূর্বনামা শ্মশানের পথে, ১৯৩১)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৭-৪০ এর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান জাগ্রত চেতনার প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। শহরতলীর (২য় পর্ব ১৯৪১) যশোদার মধ্যে তা প্রোথিত করেছেন।[৮৭] শ্রমজীবী মানুষের পাশে তাঁকে সর্বদাই দেখা যেত। এ ব্যাপারে ১৯৪৬ এর অভিজ্ঞতা রূপ পেয়েছে 'চিহ্ন' (১৯৪৭) উপন্যাসে।[৮৮]

গোপাল হালদার কৃষক-মজুরদের মধ্যে জীবনের অনেকটা কাটিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও 'ত্রিদিবা'র অমিতের ক্রমশ মজুরদের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া এক

সূত্রে গাঁথা।[৮৯] সোমেন চন্দ্র ঢাকেশ্বরী কটন মিল বা নারায়ণ গঞ্জের চটকল মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিলেন। 'সংকেত' গল্প লক্ষ্মী নারায়ণ ও ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিক ধর্মঘটকে, 'একটি রাত' সমসাময়িক শ্রমিক আন্দোলনকে[৯০] মনে করিয়ে দেয়। আর 'ইঁদুর' গল্প ঢাকায় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ওয়াকার্স ইউনিয়নের সম্পাদকের অভিজ্ঞতা প্রসূত।[৯১]

সন্তোষকুমারী দেবী চটকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন, সাপ্তাহিক শ্রমিক পত্রিকার উদ্যোক্তা ও সম্পাদিকা ছিলেন। বিমল প্রতিভা দেবী শ্রমিক আন্দোলন সমিতিতে কাজ করেছেন। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 'নতুন দিনের আলো' রচিত।[৯২] সোমনাথ লাহিড়ী বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা প্রসূত 'আঁকাবাঁকা' গল্প।[৯৩]

প্রবোধ কুমার সান্ন্যাল স্টীমার ঘাট, চটকলের ধারে, রেলস্টেশনে গল্পের উপকরণ খুঁজে বেড়িয়েছেন।[৯৪] সমকালীন শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার দলিল বনফুলের 'সপ্তর্ষি'। সতীনাথ ভাদুড়ীর তিরিশের দশকের শেষে কাটিহার জুট মিলের ধর্মঘটে শ্রমিক পক্ষে থাকার অভিজ্ঞতা 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (১৯৪৯)। সোস্যালিষ্ট পার্টিতে থাকাকালীন কলকারখানার শ্রমিকের সংস্পর্শে আসেন। শ্রমজীবীর সংগ্রামী ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু পার্টিতে কৃষক-শ্রমিকের প্রতি অবিচার দেখে হতাশ হন।[৯৫]

সমরেশ বসুর চটকলগুলির ট্রেডইউনিয়ন ফ্রন্টেও জগদ্দলের বস্তিতে বস্তিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজের অভিজ্ঞতা বি.টি. রোডের ধারে(১৯৫২) উপন্যাসে ব্যবহৃত।[৯৬] নবকুমার দাশের মুখে শোনা চটকলের কাহিনী 'উত্তরঙ্গ-এর উৎস।[৯৭] জগদ্দলের চটকলের দারোয়ানের শ্রমিক হত্যার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্রোধ ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতা 'যুগযুগ জীয়ে' (১৯৮১) ও 'শেকল ছেঁড়া হাতে খোঁজে'।[৯৮] নৈহাটি স্টেশনের পাশে সমাজবাদী গণ আন্দোলনের স্পর্শ পাওয়া 'বাসন্তী কেবিন'ই 'শ্রমিক কাফে' (১৯৫৩)।[৯৯]

দিনেশ দাশের চা বাগানের কুলিদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার ভাবরূপ 'চা' কবিতা।[১০০] ১৯৪৬ এ তিনি ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্মীদের ইউনিয়ন গঠন করেন। সমরসেন খনি অঞ্চলের সাঁওতালদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা পরিবর্তনের খবর রাখলেও জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না।[১০১] সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তত পার্টিসূত্রে যেটুকু গড়ে ওঠা প্রয়োজন তা ছিল।[১০২] তিনি সুকান্ত, গোলাম কুদ্দুস ১৯৪৫-৪৬-র গণসংগ্রামের শরীক। কুলি-মজুরদের সঙ্গে বসে সিনেমা দেখা, চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করা বা তাদের আন্দোলনে পাশে দাঁড়ানোর কাজ সুকান্ত করতেন।[১০৩] গোলাম

কুদ্দুসের পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকার রেলশ্রমিকদের মধ্যে কাজের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'মরিয়ম' উপন্যাস।[১০৪] বিজন ভট্টাচার্য্যের এই অভিজ্ঞতা ও বোধ না থাকার প্রমাণ 'অবরোধ' (১৯৪৭) নাটক।[১০৫]

হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুধাংশু ঘোষ, সলিল চৌধুরী চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস রেলওয়ে, রিক্সাচালক, ডিগবয় তেল কোম্পানীর শ্রমিক সংগ্রামে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, গুরুদাস পাল, সুরেন নস্কর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায় শ্রমিকদের গানও শেখাতেন। এঁদের অনেকেই ১৯৪৫-৪৬ - এর গণসংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী।

এই সমস্ত সাহিত্যিকদের শ্রেণীবিচার করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র সেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মতো ভূম্যধিকারী পরিবার ভুক্ত, গুরুদাস পাল ও সুরেন নস্করের মতো শ্রমিক এবং সত্যেন সেন, রমেশ শীল, গোমহানী দেওয়ান, পঞ্চানন দাশের মতো কৃষক পরিবার ভুক্ত ছাড়া বাকিরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ, বলা যায় তথাকথিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীই শ্রমিক সাহিত্য রচনায় ব্যগ্র। চল্লিশের দশকে শ্রমিকদের দ্বারা গণসঙ্গীত ও গণনাট্য রচনার আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[১০৬] বাঙালী শ্রমিকদের দ্বারা রচিত শ্রমিক সাহিত্যের স্বল্পতর সাধারণ কারণ তাদের জীবনের কাঠিন্য ও শিক্ষার অভাব। যেটুকু হয়েছে তাতে তাদের নিজস্ব প্রতিভা থাকলেও, কমিউনিস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের নিশ্চয়ই এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার বিষয়টাও গুরুত্বপূর্ণ।[১০৭]

তাহলে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের শ্রমিক সাহিত্য রচনার উপযোগিতা কী? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন শ্রমজীবী শ্রেণীর মুক্তির জন্য যথার্থ কিছু করতে চাওয়া শিক্ষিত শ্রেণীকে উজ্জীবিত ও মানসিক খোরাক যোগানোতে তাঁর লেখার উপযোগিতা।[১০৮] সোমেন চন্দও বুঝতেন ডিমিট্রভের নির্দেশ 'সাহিত্যকে শ্রমিক বিপ্লবের সহায় হতে হবে'।[১০৯] বনফুলের সপ্তর্ষি উপন্যাসে টাটা কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘটের কথা বিবৃত হয়েছে বলে শ্রমিক নেতা জে. এন. মিত্রকে তাঁর যে সহকর্মী জানিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে সেই উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে।[১১০] আর শ্রমিকদের গান শেখানো বা শোনানো, নাটকের অভিনয় করা বা করানো (যেমন সুনীল দত্তের লুঠতরাজ [১১১]) তাদের উজ্জীবিত করারই হাতিয়ার, তাই হয়ত ১৯৪৫ - এ ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলনের শেষদিনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভায় নীহার দাশগুপ্ত যখন সুকান্তের

'লেনিন' কবিতাটির আবৃত্তি শেষ করেছেন, তখন নৃপেন চক্রবর্ত্তী তাঁকে বলেছিলেন 'দশ হাজার মেহনতী মানুষের কাছে কী প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়ে গেলে, মনে রেখো'।[১১২] এইখানেই এইসবের সার্থকতা।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) ডঃ জীবেন্দু রায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত চিন্তাঃ সূত্র ও প্রকৃতি। ১৯৮৪, পৃ: ৬৬।

২) 'সাম্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

৩) ওই দেখ সাগরের পারে,/শ্রমজীবী শত শত /কেমন সংগ্রামে রত/.../আয় তবে শ্রমজীবীগণ/নবোৎসাহে চলে আয়/সময় বহিয়া যায়,/ঘোরতর বাজিতেছে রণ;— 'শ্রমজীবী'(১৮৭৪)।

৪) প্রণবরঞ্জন ঘোষ, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য। ৩য় সং, ১৩৮৫, পৃ: ৩৭২-৩৭৩।

৫) অমর দত্ত, উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ২য় সং, ২০০১, পৃ: ৪৪-৪৬।

৬) ডঃ নিতাই বসু, শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৭৫, পৃ: ৭৮।

৭) 'মুক্তধারা' (১৯১৮) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটক।

৮) সুধা প্রধান, 'রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক' , পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ-৩০, সংখ্য ৪-৮, জুলাই-আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃ: ১২৬।

৯) 'বিজয়ী (১৯১৮) কবিতা ও মডার্ন রিভিয়িউ এ লেখা 'অ্যাট দা ক্রস রোডস্' (জুলাই, ১৯৯৮) প্রবন্ধে।

১০) 'রায়তের কথা' (১৯২৬) প্রবন্ধ।

১১) কালের যাত্রা (১৯৩২) নাটক, 'ওরা কাজ করে' কবিতা, বড়ো খবর (১৯৪১) গল্প।

১২) 'অমৃত' কবিতা।

১৩) অরুণ চৌধুরী, ''রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' : সভ্যতার পিলসুজদের জাগরী, শিক্ষা ও সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৪০১, পৃ: ৪৬৬।

১৪) বদরুদ্দিন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, ১৯৮৬, পৃ: ৩১।

১৫) অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শরৎ প্রসঙ্গ, ১৯৭৫, পৃ: ১৩৪-১৩৫।

১৬) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বাংলা কথা সাহিত্য : প্রকরণ ও প্রবণতা ১৯৯১, পৃ: ১০৩।

১৭) ডঃ নিতাই বসু, শরৎচন্দ্র ঃ জীবন ও সাহিত্য ১৯৭৫, পৃ: ৮৩-৮৪।

১৮) প্রলয়োল্লাস (১৯২২), বিদ্রোহী, ব্যাথারদান (১৯২৫) কবিতা।

১৯) কল্পতরু সেনগুপ্ত, 'অবিভক্ত বঙ্গে সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারে নজরুলের ভূমিকা', নাগরিক কথা, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৯৯।

২০) সরোজ মোহন মিত্র, সুকান্তের জীবন ও কাব্য। ২য় সং, ১৯৮০, পৃ: ১৫৭-১৫৮।

২১) ডঃ নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ জিজ্ঞাসা, ১৯৮৬, পৃ: ১০।

২২) জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল : কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি দিন, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং, ১৯৮৭, পৃ: ১৪৬,

২৩) অশ্রুকুমার সিকদার, 'শরৎচন্দ্র : কল্লোল এর উত্তরাধিকার', সুরেশচন্দ্র মৈত্র (সম্পা:), শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা সংকলন, ১৯৭৭, পৃ: ৭১-৭২।

২৪) সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'সামাজিক দায়বদ্ধতার এক যথার্থ গল্প-শিল্পী শৈলজানন্দ, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ-৩৪, সংখ্যা, ৩১-৩৫, ফেব্রু-মার্চ, ২০০১, পৃ: ৫২।

২৫) বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোট গল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ২য় সং, ১৯৯৫, পৃ: ১৩১।

২৬) সরোজ মোহন মিত্র, সুকান্তের জীবন ও কাব্য, ২য় সং, ১৯৮০, পৃ: ১৫৮।

২৭) সুমিতা চক্রবর্ত্তী, মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারা, ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা:) বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, ১৯৯২, পৃ: ৩০১-৩০২।

২৮) প্রেমেন্দ্র মিত্র, শত প্রসঙ্গ, ১৩৮৮, পৃ: ৩৫৬।

২৯) সরোজ মোহন মিত্র, সুকান্তের জীবন ও কাব্য, ২য় সং, ১৯৮০, পৃ: ১৫৯।

৩০) সুস্নাত দাশ, 'ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব : দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩০-৪৭), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা:) ইতিহাস অনুসন্ধান-১৪, ২০০০, পৃ: ৬০৩।

৩১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্য', অমৃত, ৩রা বৈশাখ, ১৩৭৭।

৩২) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৯, পৃ: ৬।

৩৩) তরুণ চৌধুরী, তারাশঙ্কর : যেমন জেনেছি ও বুঝেছি, ১৯৯৯, পৃ: ৪৭।

৩৪) তদেব, পৃ: ২৭।

৩৫) ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, 'ইতিহাস অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর, মানস কুমার সাঁতরা (সম্পা:), ইতিহাস ও সাহিত্য, প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর, ২০০২, পৃ: ৫।

৩৬) ডঃ নিতাই বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, ১৯৮৬, পৃ: ৫৪-৫৬।

৩৭) নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, ৩য় সং, ১৯৯১, পৃ: ১৭২।

৩৮) ডঃ নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, ১৯৮৬, পৃ: ৫৩।

৩৯) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, পৃ: ১৩২।

৪০) চিন্মোহন সেহানবীশ, 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন', বিশ্বনাথ দে (সম্পা:) মাণিক বিচিত্রা, ১৯৭২, পৃ: ৭২।

৪১) শ্রমিক, ১ম বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২৬ ফেব্রু., ১৯২৪।

৪২) গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের পাতা থেকে, ২০০১, পৃ: ৫৮।

৪৩) কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমেন চন্দ্র, ১৯৯৭, পৃ: ১৫।

৪৪) 'প্রথম ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক শহীদ সোমেন চন্দ্র : সমিতির সশব্দ অভিভাবন, শিক্ষা ও সাহিত্য, ৭৫ তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৯৯, পৃ. ২০২।

৪৫) বীরেন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫২-৪৭১।

৪৬) তদেব, পৃ. ৬৪৭-৬৪৯।

৪৭) সুস্নাত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০১।
৪৮) বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য, 'বাংলা উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্র', ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাঃ) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫।
৪৯) বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪-৪৯।
৫০) স্বস্তি মন্ডল, সতীনাথ ভাদুড়ী, ২০০২, পৃ. ২৪-২৭।
৫১) মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংস্কৃতির নানা দিক, পৃ. ৩৭।
৫২) মিহির দেববর্মন, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস' মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ) স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য (১ম খন্ড), ১৯৮৯, পৃ. ১৩৬।
৫৩) সমরেশ বসু, 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখন্ড) পার্টি ও আমি', দেশ, ২২শে নভেম্বর, ১৯৮৬।
৫৪) সরোজ মোহন মিত্র, সুকান্তের জীবন ও কাব্য, ২য় সং, ১৯৮০, পৃ. ১৬১।
৫৫) তদেব, পৃ. ১৬৩-১৬৫
৫৬) অমিয় ভূষণ চক্রবর্ত্তী, সুকান্ত পরিচয়, ১৯৮২, পৃ. ৬৬-৬৭।
৫৭) অশোক পাল, 'ভাঙল এই শিকল গাঁয়ে গাঁয়ে, প্রসঙ্গ মঙ্গলাচরণ এর কবিতা, শিক্ষা ও সাহিত্য, ৮২ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩, পৃ. ৬০৪।
৫৮) ডঃ মানসী জামন, বাংলা নাটক (১৯৪০-৬০) ঃ আর্থসামাজিক দৃশ্যপট, ১৯৯২, পৃ. ৮৪-৮৫।
৫৯) বাবলু দাশগুপ্ত (সম্পাঃ), সেই বাঁশিওয়ালা ঃ একটি সলিল সংকলন, ২০০৪, পৃ. ১৪৬।
৬০) নরহরি কবিরাজ, 'শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ - ৩১, সংখ্যা ২৮-৩৩, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, জানু., ১৯৯৮, পৃ. ৩০।
৬১) ডঃ মনাসী জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৬২) স্বামী বিবেকানন্দ, 'বর্তমান ভারত', ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (সম্পাঃ) বিবেকানন্দের বাংলা রচনা সমগ্র, ১৯৯৪, পৃ. ১১-১২।
৬৩) স্বামী বিবেকানন্দ, 'পরিব্রাজক', ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩।
৬৪) মহুয়া সরকার, 'শ্রমিক আন্দোলন ও বাংলার কয়েকজন আইনজীবী' গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ইতিহাস অনুসন্ধান - ৩, ১৯৮৮, পৃ. ৩২১-৩২২।
৬৫) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী (৩য় খণ্ড), ১৩৫৯, পৃ. ১১২।
৬৬) শান্তিময় গুহ, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক ও শ্রমিক শ্রেণী', মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
৬৭) নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঃ কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭।
৬৮) 'ঐকতান' (১৯৪১) কবিতা।
৬৯) গোপাল চন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও বাণী, ১৯৭৬, পৃ. ৭-৮।
৭০) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, ১৯৬২, পৃ. ২৪৫।

৭১) নীলরতন সেন, প্রসঙ্গ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৯৮৭, পৃ. ২০০।
৭২) সত্যপ্রিয় ঘোষ, 'বাংলা সাহিত্যে গোর্কির প্রভাব ও নতুন চেতনার সূচনা', ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
৭৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'পথের দাবী', সুকুমার সেন (সম্পাঃ), শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, ১৩৯২, পৃ. ১২৪৫।
৭৪) রফিকুল ইসলাম, 'সৃষ্টির ভুবনে নজরুল স্বাধীন সম্রাট', দেশ, ৬৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১২ জুন, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮।
৭৫) প্রসূন মুখোপাধ্যায়, 'নব উত্থানের চেতনা ও নজরুল', গণশক্তি, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯০।
৭৬) প্রতাপ রঞ্জন হাজরা, 'প্রসঙ্গ : নজরুল ও মুজাফফর আহমদ', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, নজরুল সংখ্যা, ১৪০৫, পৃ. ৬৫।
৭৭) অন্নদাশঙ্কর রায়, 'দেশের দুর্দশা দেখে নজরুল মৌন হয়েছিলেন', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।
৭৮) জলধর মল্লিক, নাম তার নজরুল, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ. ২৯।
৭৯) মুজাফফর আহমদ, কাজী নজরুল স্মৃতিকথা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৬৬।
৮০) সুমিতা চক্রবর্ত্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।
৮১) ডঃ সরোজ মোহন মিত্র, ছোটগল্পের বিচিত্র কথা, ২য় সং, ১৩৮৬, পৃ। ২১৭।
৮২) বীরেন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।
৮৩) সুমিতা চক্রবর্ত্তী, জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল, ১৯৮৭, পৃ. ৪৬।
৮৪) নেপাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।
৮৫) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।
৮৬) তারাশঙ্কর রচনাবলী (১ম খন্ড), গজেন্দ্র কুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ৫ম মুদ্রণ, ১৩৯৭, পৃ. ৩৫৬।
৮৭) ডঃ মীরা ঘোষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, ১৯৮৪, পৃ. ২২৯-২৩০।
৮৮) চিন্মোহন সেহানবীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১।
৮৯) বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য, প্রাগুক্ত, ১২৬-১২৭।
৯০) প্রথম ফ্যাসিবাদী সাহিত্যিক শহীদ সোমেন চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।
৯১) কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
৯২) সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা, বিমল প্রতিভা দেবী, নতুন দিনের আলো।
৯৩) সিদ্ধার্থ গুহরায়, কলকাতার ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : প্রথম যুগ, ১৯২৭-১৯২৯, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ইতিহাস অনুসন্ধান - ৩, ১৯৮৮, পৃ ৪৩৩।
৯৪) বীরেন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।
৯৫) স্বস্তি মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯ ও ৪৫।

৯৬) সমরেশ বসু রচনাবলী (১ম খন্ড), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ১৯৯৭, পৃ. ৭০০।

৯৭) সমরেশ বসু, 'নিজেকে জানার জন্যে', সমরেশ বসুর গল্প সংগ্রহ, ১৯৭৮, পৃ. ৪-৫।

৯৮) অশ্রুকুমার সিকদার, অধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ১৯৮৮, পৃ. ৩২২।

৯৯) সমরেশ বসু রচনাবলী (১ম খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০।

১০০) জগদীশ ভট্টাচার্য্য, আমার কালের কয়েকজন কবি, ১৯৯০, পৃ. ২৭২-২৭৩।

১০১) সমর সেন, বাবু বৃত্তান্ত, পরিবর্ধিত সং, ১৯৮১, পৃ. ৩৭ ও ৫৫।

১০২) ডঃ অজয় কুমার ঘোষ, শিল্প সাহিত্যের আঙ্গিক ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কবিতা, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

১০৩) অমিয় ভূষণ চক্রবর্ত্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭ ও মণিগোপাল বসু, 'অন্তরঙ্গ সুকান্ত', পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কলকাতা জেলা কমিটি (সম্পাঃ), সেই বাতিওয়ালা, ২০০৩, পৃ. ৪৯।

১০৪) গোলাম কুদ্দুস, যুগ সন্ধিক্ষণ, ২০০৩, পৃ. ১০৭।

১০৫) শান্তিময় গুহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

১০৬) অনুরাধা রায়, চল্লিশ দশকে বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন, ১৯৯২, পৃ. ৫৯।

১০৭) রয়েল কমিশন অন লেবার ইন ইন্ডিয়া, রিপোর্ট (১৯৩১)।

১০৮) নাজমা জেসমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

১০৯) সুশান্ত দাস, 'বিপ্লবী কথা শিল্পী, সোমেন চন্দ', শিক্ষা ও সাহিত্য, ৭৫ তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৯৯, পৃ. ২০৪।

১১০) বিমল ব্যানার্জী, 'বনফুলের নায়ক শ্রমিক নেতা যতীন দা', যুগের ডাক, ২৯শে ডিসেম্বর, ২০০১।

১১১) অনুরাধা রায়, 'বাংলায় অ্যাজিট গ্রুপ থিয়েটার (১৯৪৮-৫০)' গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ইতিহাস অনুসন্ধান - ২, ১৯৮৭, পৃ. ৪৩৯।

১১২) নীহার দাশগুপ্ত, 'দরিদ্র যে কবিকে মহান করেছে', বিশ্বনাথ দে (সম্পাঃ), সুকান্ত বিচিত্রা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৭, পৃ. ২০৩-২০৪।

# কলিকাতায় কবি নজরুলের জাতীয় সংবর্ধনা (১৯২৯) ঃ চিঠিপত্রের আলোকে একটি পর্যালোচনা

সুনীল কান্তি দে

গত শতকের তৃতীয় দশকে ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের আক্রমণের অন্যতম শিকার মুক্ত বুদ্ধির সাধক বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্য ও জাতীয় জাগরণে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় জাতীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংবর্ধনার আয়োজনে প্রধান সারথির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। এই উপলক্ষে বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, রাজনীতিবিদ এবং সাধারণ নাগরিক সংবর্ধনা সম্পর্কে তাদের মতামত জানিয়ে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নিকট বেশ কিছু চিঠিপত্র লিখেছিলেন। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য সাপ্তাহিক সওগাতে সেসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এসব চিঠিপত্রের আলোকে আলোচ্য প্রবন্ধে নজরুল সংবর্ধনার পটভূমি, সংবর্ধনার আবশ্যকতা, সংবর্ধনার বিরোধিতা, সংবর্ধনার সফলতা এবং নজরুল মানস প্রভৃতি তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর 'সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে কলিকাতায় নজরুল সংবর্ধনার পটভূমি সম্পর্কে লিখেছেন,

> ''চারদিকে নজরুলের খ্যাতি বৃদ্ধিতে আমরা 'সওগাত দল'ও খুব উৎসাহিত হলাম এবং বিরুদ্ধবাদীদের মুখ চিরতরে বন্ধ করার উপায় খুঁজতে লাগলাম। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি নজরুলের এই অবদান নিয়ে 'সওগাতে'র সাহিত্য মজলিসে আলোচনা চলতে লাগল। আলোচনা চলল এখন কিভাবে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমরা প্রস্তাব করলাম, যেহেতু নজরুল হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জাতীয় কবি সেহেতু বাঙ্গালী জাতির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া

উচিত। এতেই তাঁর প্রতি জাতির ভালবাসা প্রকাশ পাবে।

খান মুহম্মদ মঈন উদ্দিন, হাবিবুল্লাহ বাহার ও কবি ফজলুর রহমান আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন প্রস্তাবটি শুনে। সকলেই বললেন, 'নজরুলের যুগের স্বীকৃতির এর চেয়ে ভাল উপায় আর হতে পারে না'।

'সওগাত সাহিত্য মসলিস' এ নিয়ে আরো আলোচনা চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হবে। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এ বিষয়ে জনমত সংগ্রহ করা হউক।

'সাপ্তাহিক সওগাতে' প্রথমে এবং পরে অন্যান্য পত্রিকায় প্রস্তাবটি ছাপা হল। প্রস্তাবে সওগাত অফিসে মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানানো হল।

নজরুল সংবর্ধনা সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই প্রগতিপন্থী বিশেষ করে তরুণ দলের মধ্যে উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অজস্র চিঠি পেতে লাগলাম। অধিকাংশ চিঠিতেই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন ছিল। একদল রক্ষণশীল - যাঁরা আগে থেকে নজরুলের নিন্দা করতেন, তাঁরা বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। ....কিন্তু এই বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সর্বত্র।"[১]

দুষ্প্রাপ্য 'সাপ্তাহিক সওগাত' এর ফাইল থেকে জানা যায় 'সওগাত সাহিত্য মজলিসে' নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়ার বিষয়টি আলোচনার পূর্বে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে সর্বপ্রথম যিনি পত্র লিখেছিলেন তিনি উদীয়মান তরুণ কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী। পত্রে তিনি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্প্রতি সংবর্ধনা[২] দেওয়ার কথা উল্লেখ করে কবি নজরুলকেও একইভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠনেরও অনুরোধ করেন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখের সাপ্তাহিক সওগাত-এ প্রকাশিত চিঠি নিম্নে হুবহু তুলে ধরা হলো।

মাননীয় সওগাত সম্পাদক সাহেব,

গত রবিবার ইউনিভার্সিটী ইনস্টিটিউটে শরৎচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক দল। প্রবীণেরা আশীর্বাদ করিয়াছেন, প্রৌঢ়েরা শ্রদ্ধাপ্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছেন আর তরুণেরা করিয়াছেন তাঁহার জয়গান। ইহাতে শরৎচন্দ্রের সম্মান বর্দ্ধিত হয় নাই - বহু পূর্ব্বে হইতেই যে

সম্মান তাঁহার প্রাপ্য ছিল, সাহিত্যামোদী জনসাধারণ একটি সভায় সম্মিলিত হইয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এই মাত্র। আমার মনে হয়, ইহাতে বরং বাংলার সাহিত্য রসিক সমাজেরই সম্মান ও গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে; কারণ এই ব্যাপারে এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, শরৎচন্দ্রের বিরাট প্রতিভাকে বুঝিবার, স্বীকার করিবার, শ্রদ্ধা করিবার মত সাহসী রসজ্ঞ মনের মালিক তাঁহারা।

কবি নজরুল ইসলামকেও এভাবে সম্বর্ধনা করা উচিত। তাঁহার সম্বর্ধনায় সম্মান আমাদেরই। আমি মনে করি, তিনি আমাদের কাব্য-সাহিত্যে যে ভাবধারা আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব; তিনি তরুণ বাঙ্গলার প্রাণে যে বাণী জাগ্রত করিয়াছেন, তাহা যুগ-সম্ভাবনার বিপুলতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার অমর প্রতিভা বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে বিধাতার বিপুল শুভাশীর্ব্বাদ রূপে। তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। তাঁহাকে এতদিন সম্বর্ধনা না করিয়া আমরা যে লজ্জা অর্জ্জন করিয়াছি, শীঘ্রই তাহা দূর হোক।

আমি প্রস্তাব করি, আগামী পূজার বন্ধের পূর্ব্বেই সমগ্র বাঙ্গলার পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইসলামকে অভিনন্দন করিবার আয়োজন করা হোক। পূজার বন্ধের এখনও প্রায় তিন সপ্তাহ বাকী। ইহার মধ্যে চেষ্টা করিলে সব আয়োজনই হওয়া সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্র ও তরুণ বন্ধুরা একার্য্যে আগ্রহে সানন্দে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা কবিকে ভালবাসেন; তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার গৌরব তাঁহাদেরই প্রাপ্য।

অমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, এবিষয়ে সকলেরই বিপুল আগ্রহ। অতএব আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, এই সপ্তাহেই কলিকাতায় একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হোক। সমিতি গঠিত হইলে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

মোয়াহেত বখ্‌ত চৌধুরী

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত নজরুল সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে বা প্রবন্ধে নজরুল সংবর্ধনা সম্পর্কে আলাচনা হলেও এই চিঠির ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই। এমনকি সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের "সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম" গ্রন্থে সাপ্তাহিক সওগাত-এ প্রকাশিত কয়েকটি চিঠি সংকলিত

হলেও উপরে উল্লিখিত কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরীর চিঠির উল্লেখ নেই। তবে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখের সাপ্তাহিক সওগাতের সম্পাদকীয় কলামে এই চিঠি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখা হয়—

"উদীয়মান কবি মোয়াহেত বখ্‌ত চৌধুরী তরুণ প্রিয় কবি নজরুল ইসলামকে অভিনন্দিত করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাদিগকে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। 'চিঠিপত্র' বিভাগে তাহা প্রকাশিত হইল। সাহিত্যরসিক সমাজের বিশেষত তরুণ বন্ধুদের দৃষ্টি চিঠিখানির দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কবি নজরুল ইসলামের প্রতিভাকে যুগ প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি করা হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। তাঁহাকে তরুণ বাঙ্গলার পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র দিবার প্রস্তাবে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কবির গুণগ্রাহী ভক্তদের মধ্য হইতে কেহ কেহ একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের চেষ্টা করিলে তাহাতে আমরা সাগ্রহে যোগদান করিব। তরুণ সাহিত্য-রসিকরাও যে হইাতে সানন্দে যোগ দিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পূজার বন্ধের আর অধিককাল বিলম্ব নাই; তাহার পূর্ব্বেই কবিকে অভিনন্দন করিতে হইলে অবিলম্বে উদ্যোগ আয়োজন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করিয়া মাত্র একটি সপ্তাহ ভালরূপে চেষ্টা করিলেই কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব হইবে।"

এই সম্পাদকীয় থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরীর প্রস্তাবের পরই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সহ সওগাত দলের সাহিত্যিক সাংবাদিকগণ 'সওগাত সাহিত্য মজলিসে' কবি নজরুল ইসলামের সম্বর্ধনার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। যদি তা না হত তাহলে সাপ্তাহিক সওগাত সম্পাদক অবশ্যই উল্লিখিত সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করতেন যে ইতিমধ্যে তাঁরা সাহিত্য মজলিসে এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেছেন অথবা সম্বর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরীর পত্রটি সাপ্তাহিক সওগাতের ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যায় (৫ই আশ্বিন, ১৩৩৫, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮) প্রকাশিত হয়;[৫] আর কবির নজরুলের সম্বর্ধনা উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের জন্য অনুষ্ঠিতব্য জনসভার (৯ই অক্টোবর, ১৯২৮) সংবাদ প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয় ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যায় (১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৫, ৫ই অক্টোবর, ১৯২৮)।[৬] কাজেই সাপ্তাহিক সওগাত সম্পাদক-এর নিকট কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরীর চিঠি, এই চিঠি সম্পর্কে সাপ্তাহিক সওগাত সম্পাদকীয় মন্তব্য ও অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সংবাদ প্রকাশের তারিখ থেকে স্পষ্ট হয় যে কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী নজরুল সম্বর্ধনার প্রথম প্রস্তাবক।

যথারীতি ৯ই অক্টোবর, ১৯২৮ কবি নজরুল ইসলামকে বাংলার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ার নিমিত্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরীর নাম অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সম্পাদকদের মধ্যে একজন হিসেবে দেখা যায়।[৭ক] কিন্তু সম্পাদক নাসির উদ্দীন তাঁর (সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম) গ্রন্থে অভ্যর্থনা সমিতির যে তালিকা দিয়েছেন সেখানে কবি মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরীর নাম নেই।[৭খ] অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের পর থেকে নজরুল সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের নিকট বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চিঠিপত্র আসতে থাকে। স্বদেশী যুগের কারাদণ্ডিত কবি, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সুসাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী এরূপ এক পত্রে লেখেন,

> "স্নেহাস্পদ নজরুলের সম্বর্দ্ধনা প্রস্তাবে সুখী হইলাম। আমি সর্ব্বপ্রথমেই তাহাকে ৬ বছর পূর্ব্বে সম্বর্দ্ধনা এবং প্রীতি সম্ভাষণ জানাইয়া সামান্য কিছু অর্থোপহার প্রেরণ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার কত আনন্দ! আমি অসুস্থ এবং বহু ছাত্র, বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যের জন্য অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। বড় দুঃখ আজ যদি টাকা থাকিত, তাহা হইলে কবিকে স্বর্ণমুকুটে সাজাইয়া আনন্দ করিতাম। আমার পূর্ণ সহানুভূতি জানিবেন। এ বিষয়ে আমি যতদূর পারি চেষ্টা করিব।"[৮]

একই চিঠিতে ইসমাইল হোসেন সিরাজী মোহাম্মদী সম্পাদক আকরাম খাঁ কর্তৃক নজরুলের বিরুদ্ধাচরণ[৮ক] এবং সমকালে মোহাম্মদী পত্রিকার ভূমিকার প্রতিবাদ করে লেখেন,

> "মিলাদ মহফেলে যে গান গাওয়া লইয়া কবি নজরুল ইসলামকে অতীব জঘন্য ভাষায় জঘন্যভাবে গালাগালি দিয়ে (সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে) ইসলামী ভদ্রতার (আদবের) মাথায় পাদকাঘাত করা হইয়াছে, আবার মাসিক মোহাম্মদীতে জোরে সোরে সেই গান বাজনা জায়েজ বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হইতেছে। এই সমস্তই চমৎকার কান্ড। আমার মনে হয়, বন্ধুবর মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের তওবা করিয়া প্রায়শ্চিত করা কর্ত্তব্য। হয় তিনি ভদ্রলোকের মত মোহম্মদী পরিচালিত করুন, না হয় বন্ধ করিয়া দিন। এইরূপে ব্যবহারের দ্বারা তিনি সর্ব্বত্রই প্রায় সর্ব্বজন কর্তৃক তিরস্কৃত এবং নিন্দিত হইতেছেন। লজ্জায় আমাদের মাথা অবনত হইয়া যাইতেছে। পয়সার জন্যই যদি

এরূপ করিতে হয়, তবে চুরি ডাকাতি বা জাল জুয়াচুরি করিলে ইহা অপেক্ষা রোজগার হইতে পারে।"[৯]

নজরুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে সাংবাদিক মোদাব্বের এর সমকালীন মন্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎসাহব্যঞ্জক —

"নজরুল ইসলাম নিশিতের অন্ধকারে অংকুরিত হইয়া একদিন প্রদীপ্ত ভাস্করের মত মুসলিম সাহিত্য গগনে উদিত হন বাঙ্গলার কাব্য সাহিত্যে তাঁর অবদান অমর। যদিও তিনি এখনও তরুণ, সম্বর্দ্ধিত হওয়ার যোগ্য বয়স তাঁহার এখনও হয় নাই, তথাপি তাঁহার প্রতিভা এমনি প্রখর যে তাঁহার বর্তমান সম্বর্দ্ধনা মোটেই অশুভনীয় নয়।"[১০]

তিনি নজরুলকে তরুণ সমাজের অগ্রপ্রতীক আখ্যায়িত করে এবং সংবর্ধনার সাফল্য কামনা করে বলেন,

"নজরুল ইসলাম সাহেব বাঙ্গলার যুগ প্রবর্ত্তক কবি; প্রতিভার বরপুত্র। তরুণবাঙ্গলাকে তিনি কাব্য গাঁথার মধ্যে দিয়ে যে পথে চালাইয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বে আর কোন কবি তাহা করিতে প্রয়াস পান নাই। সম্বর্দ্ধনার সম্মান কাজী সাহেবকে তত গৌরবান্বিত করিতে পারিবে না, যত গৌরব তিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার কাব্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। তরুণের চেষ্টা থাকিলে তাহাদের তাজা প্রাণের তাজা আগ্রহ থাকিলে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন সাফল্য মণ্ডিত হইবে, কারণ বাঙ্গলার তাজা প্রাণ তরুণ সম্প্রদায় আজ স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছে; তারা তরুণের অগ্রপ্রতীক কবি নজরুলকে সম্বর্দ্ধনার আবশ্যকতা প্রাণের সঙ্গে উপলব্ধি করিতেছে।"[১০ক]

চট্টগাম থেকে সাহিত্যিক আশুতোষ নারায়ণ চৌধুরী সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে লেখা এক পত্রে ১৯২৬ সালে কবি নজরুলের চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে নজরুল সান্নিধ্য গণমানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন সহায়ক বলে মন্তব্য করে লেখেন,

"কবি যিশ্বের, বসন্তের ও আকাশের, এই আমরা জানতাম; কিন্তু কবি যে সঙ্গে সঙ্গে দেশের, শীতের ও নীড়ের হতে পারে তা আমরা জেনেছি সেদিন যখন নজরুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে নেহাত অপ্রত্যাশিত ভাবে। নজরুলই আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন 'বহু হইতে একের দিকে', 'বিশ্ব হইতে ঘরের দিকে', 'আকাশ হইতে নীড়ের

দিকে', নজরুলের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় তাঁর বিদ্রোহ কেবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয় - আকাশচারী কবিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।''[১১]

এই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের জাতীয়তা ভাবনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন,

''জাতীয়তার বাণী অনেকেই প্রচার করেছেন বাঙ্গলা সাহিত্যে; কেহ 'বিশকোটি' বাঙ্গালীর মহিমা কীর্তন করে, কেহ বা যবন ধ্বংসের সপ্ন নিয়ে। নজরুলের জাতীয়তা কিন্তু তাই অন্য রকমের নয় কি?''[১২]

নজরুলের জাতীয় সম্বর্দ্ধনা যে নজরুল বিরোধিতাকারীদের প্রতি শ্রেষ্ঠ জবাব পরিশেষে এ মন্তব্য করে আশুতোষ নারায়ণ চৌধুরী বলেন,

''নজরুলকে আজ নানা জনে নানা ভাবে লাঞ্চিত করছেন - কেহ ছাপার কালিতে, কেহ চিঠি দিয়ে, কেহ বা যষ্টি ও ফতোয়া প্রহারে। নজরুল - সম্বর্দ্ধনা হবে এইসব লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ।''[১৩]

সমকালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক - সাংবাদিক 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায় জলধর সেন সম্পাদক নাসির উদ্দীনকে নজরুল সম্বর্দ্ধনার আয়োজনকে সমর্থন ও উৎসাহ জানিয়ে পত্র লেখেন। অনুরূপভাবে বাংলার তৎকালীন তরুণ রাজনীতিবিদ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজ এর সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সংবর্ধনা জ্ঞাপনকে সমর্থন ও এতে নিজেকে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিপ্রায় জানিয়ে মন্তব্য করেন,

''আপনারা নজরুল সংবর্ধনার আয়োজন করে একটা মহৎ কাজ করেছেন। নজরুল শুধু মুসলমানের নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরব। এই সংবর্ধনার ব্যাপারে আপনাদের সাথে আছি। যত শীঘ্র সম্ভব সংবর্ধনার আয়োজন করুন।''[১৫]

নজরুলের বাল্য বন্ধু আবদুল ওহাব নজরুল কর্তৃক স্বরচিত কবিতা পড়ে শুনানোর বাল্যস্মৃতি উল্লেখপূর্বক সংবর্ধনার সফলতা কামনা করে লেখেন,

''...... সেই সময়েই তাঁর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলাম, 'বন্ধু! একদিন তুমি বাঙলার কাব্য সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।' আজ আমার সে কথা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে এ জন্য আমি মনে মনে গর্ব্বানুভব করি। এই জন্য সমগ্র বাঙলার পক্ষ হইতে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা দিবার আয়োজন হইতেছে দেখিয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে তাহা প্রকাশ কবিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।''[১৫(ক)]

এখানে উল্লেখ্য, অধ্যাপক আবদুল ওদুদ সহ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের দিশারীগণ কলিকাতার নজরুল সংবর্ধনা আয়োজনের দুই বছর পূর্বে ঢাকায় নজরুলের সবংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় নজরুল অসুস্থ থাকায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়নি।[১৬] তাই কলকাতায় নজরুলের জাতীয় সংবর্ধনার আয়োজনে আনন্দ প্রকাশ করে অধ্যাপক আবদুল ওদুদ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে একপত্রে লেখেন,

> "নজরুল সম্বর্ধনা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো - আনন্দের কথা। ...বাংলার মুসলিম জাগরণের তিনি এক শ্রেষ্ঠ বৈতালিক - এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"[১৭]

এভাবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক মোতাহার হোসেন নজরুলকে জন্মগতভাবে প্রতিভার অধিকারী বলে মন্তব্য করত সংবর্ধনার আয়োজনে সন্তোষ প্রকাশ করে মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনকে যে পত্র লেখেন তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লেখেন,

> "নজরুল সম্বর্ধনা হচ্ছে জানতে পেরে যার পর নাই সুখী হয়েছি। এমন একটা আনন্দ মেলায় স-শরীরে উপস্থিত হতে না পারায় মনে মনে অনেকখানি ক্ষতির পীড়নও অনুভব করেছি। আনন্দ ও স্ফূর্তির ভিতর দিয়ে মানুষের যে বিকাশ হয় সেইটেই স্বাভাবিক; তার বাদ বাকী জীবনটা কৃত্রিমতার মৃতস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কবি নজরুল স্বাভাবিক জীবন্ত মানুষ এইটেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব। অন্যের প্রতিধ্বনি হয়ে যে জীবন যাপন করে অন্যের ভাব কথা যে আওড়ায় অর্থাৎ নিজের হৃদয় ও মনের ভিতর থেকে যে আপন কর্ম্ম ও বাক্যের প্রেরণা লাভ না করে, সে যে পরিমাণে মানুষ, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে যন্ত্র। সংসারে অধিকাংশ মানুষই এই ধরনের। তাই এর ব্যতিক্রম দেখলেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি, সকলেই প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে চাই আর বলি, 'একটা প্রতিভার জন্ম হয়েছে।"[১৮]

এই পত্রে অধ্যাপক মোতাহার হোসেন চৌধুরী নজরুলের সাহিত্যকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে —

> "কবি নজরুল জীবন্ত মানুষ বলে তার বলবার অনেক কথা আছে, তিনি প্রতিভা-বলে সেই কথাগুলি অকুণ্ঠিত ও সরলভাবে প্রকাশ করতে ভয় পাননি। এই জন্যই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য এত বড় সম্পদ হয়েছে। তাঁর কথাগুলি জীবনের আনন্দ ও প্রাচুর্য্যের বীর্যবন্ত ও পরিস্ফুট হয়ে

ঝরণার মত সহস্র ধারায় অজস্রভাবে উৎসারিত হয়েছে। তার ভিতর থেকে ইন্দ্রবসুর বর্ণ-বিলাস দেখা যাচ্ছে। কবি তাঁর প্রাণের কাব্যে সঞ্চারিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন, এই বাংলা ভাষাই কতই বীর্য্যবন্ত, অথচ কত সুকোমল — এতেই কত আশা-দ্বন্দ্ব দ্বিধা আদর অভিমান প্রীতি, প্রকাশ করা সম্ভব।"[১৯]

সংবর্ধনার দুইদিন আগে সাহিত্যিক আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী সংবর্ধনায় যোগদানের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে অসুস্থতাহেতু যোগদানের অপারগতা প্রকাশ করে কবি নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনকে লেখেন,

"তসলিম! নজরুল সম্বর্দ্ধনার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি। বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে বালার্ক ভাস্কর প্রতিভার দীপ্তরূপ, ভদ্র সৌজন্য, সরলতা ও অমায়িকতার প্রতীক, মধুস্রাব বাংলা গজল গানের স্রষ্টা ও উদ্‌গাতা, দেশপ্রেমে উৎদীপক বীবরসাত্মক গান ও কবিতার রাজা, সর্ব্বজনপ্রিয় কবি নজরুল ইসলামের সম্বর্দ্ধনার উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদে এতটা আনন্দ অনুভব করিয়াছি যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমি শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য অনিবার্য কারণে অমন আনন্দের ব্যাপারে যোগদান করিতে না পারিয়া আন্তরিক দুঃখ ও ক্ষোভ অনুভব করিতেছি। দূর হইতে আমি আমাদের প্রিয় কবিকে আমার সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার যশ, সুখ ও ঐশ্বর্য্যময় দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।"[২০]

সংবর্ধনার আগের দিন বুদ্ধির মুক্তি অন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার আবুল হুসেন ঢাকা থেকে নজরুল সংবর্ধনা সমিতির সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনকে এক পত্রে নজরুল সংবর্ধনা এমন এক বৈরী পরিবেশে আয়োজন করার সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ায় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন,

"কাল কবির সংবর্ধনার দিন; কিন্তু সে জয় উৎসবের আনন্দ ভোগ করবার উপায় নেই। সেজন্য লজ্জিত। আপনারা যে আয়োজন করতে পেরেছেন এতেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। কারণ বর্ত্তমান বাংলার মুসলমান সমাজ প্রতিভার কদর করতে শেখেনি, বরং প্রতিভাকে মেরে ফেলেই তারা ইসলাম ও তার প্রবর্ত্তকের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়।

এ অবস্থায় কবির প্রতিভাকে সমাদর করবার জন্য যে আপনারা সাহস

করেছেন তাতে যে আপনারা ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকের অভিযোগ - কলংক থেকে বর্ত্তমান বাংলার মুসলমান সমাজকে মুক্ত করেছেন, এতে সন্দেহ নেই। সেজন্য আমার রুদ্ধ অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার থাকলেও প্রকাশ করবার যোগ্য শক্তি আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে, এই যে দুঃখ। তবু আশা করি, কবি আপনাদের সমাদর তাঁর পক্ষে যথেষ্ট না হলেও হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন। আমি দূর থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তি জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ জীবন ও বিপুল শক্তি জগৎকারণ আল্লাহর কাছে কামনা করছি।"[২১]

নজরুল সংবর্ধনা আয়োজনের প্রধান সারথি হিসেবে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কাছে সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং সাধারণ নাগরিক যে সব চিঠিপত্র লিখেছেন তাতে দেখা যায় একদিন তাঁরা নজরুলকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন অন্যদিকে নজরুল সাহিত্য ও নজরুল মানসের একটি খণ্ডিত চিত্র অঙ্কিত করেছেন এসব চিঠিপত্রে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত - যুগে নজরুল ইসলাম, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ: ২০৮।

২) ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ (৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৫), কলিকাতায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে একখানি পত্র প্রেরণ করেন; যা সভায় পঠিত হয়। ডা. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মানপত্র পাঠ করেন। মানপত্র পাঠের পর সভাপতি শরৎচন্দ্রকে (১) রৌপ্য নির্মিত পত্রে হস্তীদন্তনির্মিত আরণীযুক্ত মীনা করা অক্ষরে লিখিত মানপত্রে, (২) সোনার দোয়াত ও কলমে, (৩) রৌপ্য নির্মিত আলবেলা, (৪) রৌপ্য নির্মিত পঞ্চপত্র, (৫) রৌপ্য নির্মিত দুইটি চন্দনের বাটি, (৬) রৌপ্য নির্মিত থালা, (৭) গরদের জোড় প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন। সাপ্তাহিক সওগাত - ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন ১৩৩৫, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮, পৃ: ১২।

৩) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নিকট মোহাম্মদ বখ্ত চৌধুরীর পত্র, সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা ৫ আশ্বিন ১৩৩৫, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, পৃ: ১৫।

৪) সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন ১৩৩৫, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮, পৃ: ২-৩।

৫) ঐ, পৃ: ১৫।

৬) ঐ ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৫, ১২ই অক্টোবর ১৯২৮, পৃ: ১৫।

৭) ঐ ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৫, ১২ই অক্টোবর ১৯২৮, পৃ: ১৪।

৭ক) সংবাদপত্রে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সংবাদ যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল নিম্নে হুবহু তুলে দেওয়া হল-

গত ৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউট হলে খান বাহাদুর মৌলভী আসাদুজ্জামান এম এ বি হল সাহেবের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, সম্পূর্ণ হলের মধ্যে তিল ধারণের স্থান ছিল না। উপরন্ত হলের সম্মুখস্থ ও পেছনের বারান্দাও জনতায় ভরিয়া গিয়াছিল। সমবেত মুসলিম তরুণের ঘন ঘন আনন্দ করতালিতে সভাস্থল সরগরম হইয়া উঠিযাছিল। এই সভায় তরুণ মুসলিমের যে প্রাণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব, বাঙ্গালার যুগ প্রবর্ত্তক কবি নজরুল ইসলামকে সমগ্র বাংলার পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা দিবার জন্য সভায় এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহাতে নিম্মলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি - মিঃ এস ওয়াজেদ আলী বি এ (ক্যান্টাব) বার এট - এল, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট।

সহঃ-সভাপতি - শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী জলধর সেন, বাহাদুর, মৌঃ এ কে ফজলুল হক, মান বাহাদুর মৌলবী আসাদুজ্জামান, মিঃ দিলীপ কুমার রায়, ডাঃ আব আহমদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

সম্পাদক - শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশ, সম্পাদক - কল্লোল, মৌঃ এম নাসিরুদ্দীন, সম্পাদক - সওগাত।

সহঃ সম্পাদক - সৈয়দ জালাদুদ্দীন হাশেমী, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, মৌঃ আবুল মনসুর আহমদ, মৌঃ মোয়াহেদ বখ্ত চৌধুরী. মৌঃ আয়নুল হক খাঁ।

কোষাধ্যক্ষ - মিঃ এস ওয়াজেদ আলী বি এ (ক্যান্টাব) বার এট - ল, প্রেসীডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট।

অভ্যর্থনা সমিতি অফিস - ১১ নং ওযেলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

(সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ২৬শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, ১৯২৮, পৃ: ১৮।)

৮) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনেব নিকট ইলমাইল হোসেন সিরাজীর পত্র। সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২০শে কার্ত্তিক ১৩৩৫, ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৮, পৃ: ১৫।

৮ক) আখরাম খাঁ ও মোহম্মদী কর্তৃক নজরুল বিরোধিতার বিষয়ে বিস্তারিত জার্নাল দেখুন - সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ৩০ কার্ত্তিক ১৩৩৫, ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৮, পৃ: ১৫।

৯) ঐ।

১০) নজরুলের সংবর্ধনা, ঐ, পৃ: ১৬।

১০ক) ঐ।

১১) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নিকট আশুতোষ নারায়ণ চৌধুরীর পত্র। সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা, ৬ই পোষ১৩৩৫, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৮, পৃ: ১৬।

১২) ঐ।

১৩) ঐ।

১৪) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৯।

১৫) ঐ

১৫ক) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নিকট নজরুলের বাল্য বন্ধু আবদুল ওহাব এর পত্র। সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা, ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ২৩শে নভেম্বর ১৯২৮, পৃ: ১৫।

১৬) ঐ ১ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা, ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৩৫, ১৬ই নভেম্বর ১৯২৮, পৃ: ১৬।

১৭) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নিকট অধ্যাপক ওদুদের পত্র, ঢাকা ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৯। সাপ্তাহিক সওগাত, ২য় বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা, ৫ই পৌষ, ১৩৩৬, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৯, পৃ: ৯।

১৮) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের নিকট অধ্যাপক মোতাহের হোসেনের পত্র, ঢাকা ১৩-১২-১৯২৯। সাপ্তাহিক সওগাত, ২য় বর্ষ, ৩১শে সংখ্যা, ৫ই পৌষ ১৩৩৬, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৯, পৃ: ৯।

১৯) ঐ

২০) সম্পাদক নাসিরউদ্দীনের নিকট মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীর পত্র, রাণী ভিলা, তারিখ ১৩-১২-১৯২৯। সাপ্তাহিক সওগাত, ২য় বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা, ২০শে ডিসেম্বর, পৃ: ৯।

২১) সম্পাদক নাসিরউদ্দীনের নিকট আবুল হুসেনের পত্র, ১৪-১২-১৯২৯, সাপ্তাহিক সওগাত, ২য় বর্ষ, ৩১শে সংখ্যা, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৯, পৃ: ৯।

# রবীন্দ্রনাথ ঃ ইতিহাসের অন্যপাঠ

বিভাসকান্তি মণ্ডল

''আমরা ইতিহাস পড়ি, কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানাস্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না'।

ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ ১৭ চৈত্র ১৩১১ সালে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন। পাঠক্রমে রচিত ইতিহাসের চরম অসারতাকে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চান যে 'আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। সেই জন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে'। এই ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করার জন্য কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের স্বাভাবিক যোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরী। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্য রাষ্ট্রের আদলে তৈরি। সে কারণে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে কলেজের সঙ্গে দেশের 'ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত' হয়নি। 'দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেন না নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ, শিক্ষায় পরধর্ম।'

আশ্চর্যের বিষয় সেই পরধর্মই আমাদের এখনো আশ্রয়। এখনো সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও ইতিহাসচর্চাকে তাপ্পি দিয়েই আমরা চলেছি। আমরা আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, অতীত গৌরবকে অন্বেষণ করি না। দু-একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াসকে কেউ সেভাবে মনেও রাখে না। কিন্তু কেন ইতিহাসের প্রচলিত-পাঠক্রম বা চর্চা ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে হওয়া উচিত নয় একথাটাও ভেবে দেখিনা। দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে শতবর্ষ আগেই। ১৩০৯ এ 'বঙ্গদর্শনে' ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রবন্ধটির প্রকাশ। এখানে ভারতবর্ষে প্রচলিত ইতিহাস, তার অন্তঃসার শূন্যতা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি তার কুফল কি, প্রকৃত ইতিহাস কোথায়, কোথায় তা পাশ্চাত্য থেকে ভিন্নতর এবং তার ইতিহাসের সমুন্নত মহিমাই বা কোথায় তা যথার্থ দার্শনিক বীক্ষায় ব্যাখ্যা করেছেন।

'আমরা যাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভূগোলের এক অংশ, কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন আছে বায়ুমণ্ডল, যেখানে বয় তার প্রাণের নিশ্বাস, যেখানে ওঠে তার গানের ধ্বনি, যার মধ্যে দিয়ে আসে তার আকাশের আলো তেমনি একটা মনোমণ্ডলের স্তরে স্তরে এই ভূ-ভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে ঘিরে ফেলেছে সমস্ত দেশকে সে-ই দেয় অন্তরের ঐক্য'। এখানে তিনি যে History of Idea র কথা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট। 'ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। Centre of Indian Culture-এ তাই intellectual life থেকে শুরু করে কৃষিভূমি থেকে ছাত্র পর্যন্ত পরিক্রমা করেন তিনি। ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টির উৎসকেই রবীন্দ্রনাথ পৃথক বলতে চান। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের সভ্যতা 'অরণ্য হইতে সৃষ্ট' আর বিদেশের অর্থাৎ পাশ্চাত্যের সভ্যতা 'নগর হইতে'। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের এ বক্তব্য যথার্থ। কিন্তু বিদেশীদের অনুকরণে লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেবল ঝড়ের কথা আছে 'ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না'। মোগল, পাঠান, পোর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজদের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্ক পত্রের ধ্বজা তুলে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মামুদের আক্রমণ থেকে লর্ডকার্জনের সাম্রাজ্যকাল পর্যন্ত বিচিত্র কুহেলিকা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের 'দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র'। সেই বাহ্যিক আড়ম্বরের ইন্দ্রজাল ভারতবর্ষের পূণ্যমন্ত্রের পুথিকে অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়ে মুড়ে রেখেছে। যার ফলে আমাদের নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। এর ফলে আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না এবং আমাদেরকে অশন-বসন আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিতে হবে। ইংরেজের ছেলে জানে তার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধ জয়, দেশ অধিকার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। সেও নিজেকে রণ গৌরবে, ধনগৌরবের অধিকারী করতে চায়। অপরপক্ষে আমরা জানি আমাদের পিতামহগণ দেশ অধিকার, বাণিজ্য বিস্তার করেনি। এইটে জানার জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ব আমরা! এমন বিস্ময় আর কি হতে পারে! আসলে রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, 'ইতিহাস সকল দেশের সমান হবে— এ কুসংস্কার বর্জন করতেই হবে। ভারতবর্ষের নিজের দিক থেকে ভারতবর্ষকে না দেখে পাশ্চাত্যের ঢঙে তা দেখার ফলে শিশুকাল থেকে স্বদেশকে খর্ব করছি— নিজেরাও খর্ব হচ্ছি।' রবীন্দ্রনাথ তো পাশ্চাত্যের বস্তু সর্বস্ব সভ্যতার প্রতি কখনোই আস্থাস্থাপন করেননি। ১৯২১ সালের ৫ মার্চ এন্ড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে (পরে 'Modern Review তে প্রকাশিত) তিনি লিখেছিলেন, 'I do not believe in the material civilisation of the west just as I do not believe in the physical body to be the highest truth in man.'

তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কি হবে? History of Idea টা কি? ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা তো 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। 'একের অনলে/বহুরে আহুতি দিয়া/বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল/একটি বিরাট হিয়া।' মহামানবের সাগরতীরে 'সেই প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাইরের যে সব পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাকে নষ্ট না করে তার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করাই ভারতবর্ষের একমাত্র চেষ্টা।' য়ুরোপীয় পলিটিক্যাল ঐক্যের বিরোধমূলক ফাঁস ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, রাজায়-প্রজায়, ধনীতে-দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে জাগ্রত করে রেখেছে এবং তার বিষবাষ্প এদেশেও ছড়িয়েছে যা আজকে মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। আমরা ভুলে গেছি 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্'-ই ভারতবর্ষের পিতৃপিতামহের বাণী'। গীতার জ্ঞান ও প্রেম এবং কর্মের মধ্যে যে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রচেষ্টা তা য়ুরোপের 'রিলিজন'-এর পরিভাষায় বোঝানো কোনোদিনই সম্ভব নয়। ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার আমাদের এই সত্যটির কথা মনে করিয়ে দিতে চান যে কোনো বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়কে নিয়ে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে না। কারণ সমগ্র ভারতবাসী-ই এই ইতিহাসের উপকরণমাত্র। এই উপকরণগুলিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে রচিত হওয়া উচিত ইতিহাসের নতুন পাঠ। 'ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে'। রবীন্দ্রনাথ এভাবে ইতিহাসের নতুন পাঠ নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কিভাবে রচিত হবে? তার একটা রূপরেখাও পাই রবীন্দ্রনাথের নানান রচনা থেকে।

রামায়ণ, মহাভারত বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় মেলে। রাম-রাবণের যুদ্ধকে তিনি আর্য-অনার্যর সংঘাত হিসাবে দেখেছেন। এই আর্য-অনার্যর সংঘাতকে সামাজিক বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে রামমন্দিরের/বাবরি মসজিদের উন্মাদনায় মাতে যারা তারা ইতিহাস জানে না বলেই এমনটা করে। রবীন্দ্র-রচিত দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'-র ভূমিকাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যকর্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' প্রকৃত পক্ষে এগুলি কেবল মহাকাব্য নয় 'ইতিহাসও

বটে'। মহাভারতে 'কত পরিবর্তন, কত সমাজ বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তি-সংঘর্ষ' বর্ণিত হয়েছে। এসবের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মকেন্দ্রিক ইতিহাসই প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ঐ সমস্ত দেখিয়েছেন এবং তাঁর সেই বিশ্লেষণ আজকেও আমাদের ইতিহাস রচনার একটা পথ দেখাতে পারে।

স্বদেশকে যথার্থভাবে জানতে হলে তার লোকায়ত জীবনকে জানতে হয়। লোকায়ত জীবন অর্থাৎ 'যারা চিরকাল ধরে থাকে দাঁড়' তার প্রবহমানতাকে জানতে হলে লোকজীবন সম্ভূত শিল্প-সংস্কৃতিগুলি অনুধাবন করতে হয়। লোকায়ত জীবনের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার-উপাচার, সংস্কার, বিশ্বাস, ব্রত, পালা-পার্বন এবং লৌকিক শিল্পের ভেতর নিগূঢ়ভাবে ফুটে উঠে। জাপানি পেট্রিয়ট তোরাজিরোর মতো তিনি তন্ন তন্ন করে দেশে ভ্রমণ না করলেও বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বাক্ষর তাদের লোকসাহিত্য ও শিল্পকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। 'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে।......... বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুর নিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে।' শিলাইদহে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ নৌকাভ্রমণকালে ডিঙিমাঝিদের গান শুনে নিভৃত বাংলার গ্রামের উঠোনের ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। 'যুবতী, ক্যান কর মন ভারী/পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি।' রবীন্দ্রনাথ মানসচক্ষে দেখতে পান 'এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জামরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুলগাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন-ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিল কটাক্ষপাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরেতালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।' অর্থাৎ গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে মানবিক ইতিহাসের চিরন্তন স্বরূপটি চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে যায়। গ্রাম্য সাহিত্যের ভেতর যাপিত জীবনের যথার্থ ছবি ফুটে উঠে। প্রতিদিন বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড-খণ্ডভাবে সম্পন্ন জীবনচর্যা যেমন— চাষবাস, খেয়াচালনা, কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতোরের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে মোটরি নির্মাণ— এ সমস্তই ঐক্যসূত্রে 'গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে'। এমনকি রবীন্দ্রনাথ মেয়েলি (কাঁচা হাতেরও) শিল্প সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন জীবনের অভ্যন্তরীণ সুরটিকে উপলব্ধি করার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটে ঃ 'চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে তা সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে যে সমস্ত আল্পনা এঁকে থাকে....... খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালির শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটা জিনিস চাই। চাটগাঁ অঞ্চলের যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর তার ফটো বা অন্য কোন রকমের প্রতিকৃতি,...... ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কী রকম চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী.......।'

শিল্প যেমন মানবিক ইতিহাসকে প্রকাশ করে তেমনি আর্থ-সামাজিক ইতিহাসও তার দ্বারা গঠিত হয়। শ্রীনিকেতনের হস্তশিল্প, লোকশিল্পচর্চা তার উদাহরণ। ফলে সামগ্রিকভাবে একটা দেশের ইতিহাস জানতে হলে দেশের ঐতিহ্যময় দিক যা তার ক্লাসিকগুলোতে নিহিত তা জানতে হবে এবং সেই সঙ্গে চিরপ্রবহমান লোকায়ত জীবনের সামগ্রিকরূপের প্রতিচ্ছবি তার লোকসাহিত্য-শিল্প এবং নানাপ্রকার সংস্কৃতিচর্চাকেও জানতে হবে। এভাবেই রচিত হতে পারে যথার্থ ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ প্রায় শতবর্ষ পূর্বে তা নির্দেশ করলেও আমরা এখনো তাকে সার্থক রূপ দিতে পারিনি। আমাদের এ ব্যর্থতা আগামী দিনে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব আমরা এ প্রত্যাশা রাখি।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) ভারতবর্ষ ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০২।
২) স্বদেশ ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০২।
৩) লোকসাহিত্য ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতীয়, ১৪০২।
৪) প্রাচীন সাহিত্য ঃ তদেব।
৫) ধর্ম ঃ রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০২।
৬) সঞ্চয়িতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, দশম সংস্করণ, ১৩৮৯।
৭) Gandhi Centenary Volume : Visva-Bharati, 1969.
৮) রবিজীবনী ঃ প্রশান্তকুমার পাল, ১-৮ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স।
৯) বাংলার রেনেসাঁস ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়, বাণীশিল্প, ১৩৮১।
১০) রবীন্দ্রনাথ ঃ একটি উত্তর আধুনিক পাঠ ঃ বিভাসকান্তি মণ্ডল, দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা, ২০০৪।

# কবি ঈশ্বর গুপ্ত

## অঞ্জলি দাস

প্রাচীনবঙ্গের সংস্কৃতির উৎসস্থলগুলির অন্যতম কেন্দ্র ছিল কুমারহট্ট। কবি ঈশ্বরগুপ্তের জন্মস্থান কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়া চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিল হাবেলী শহর পরগণার অন্তর্গত।

তৎকালীন বঙ্গসমাজে তরুণ লেখকগণ যেভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ঈশ্বরগুপ্ত সেভাবে প্রভাবিত না হলেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেসময় অনেকেই চাকরী পাওয়ার আশায় সংস্কৃতচর্চা ত্যাগ করে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়েছিলেন। যেভাবে তৎকালীন তরুণগণ বঙ্গসাহিত্য-সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন তা থেকে তিনি বিরত ছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতিতে তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন। হক্ সাহেবকে ইংরাজীতে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁর ইংরাজী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি সমসাময়িক কবিদের কিন্তু অনুবাদকার্যে উৎসাহ দিতেন। এবং তাদের পুরস্কার প্রদান ও অনুদিত কবিতা তাঁর পত্রিকা 'প্রভাকরে' মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি যে কতদূর বাস্তববাদী ছিলেন তা তাঁর গৃহীত কর্মসূচীগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায়। Grey Elegies Goldsmith এর Hermit, Campbell এর Pleasures of Hope ও Pope এর Universal prayer এর অনুবাদগুলি তাঁর প্রভাকরে মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি নিজেও কিছু ইংরেজী কবিতা অনুবাদ করেন তারমধ্যে Campbell ও Cowper এর কবিতা অন্যতম।

তথাপি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁকে 'খাঁটি বাঙালীই' বলবো। নতুন যুগের বাংলা কাব্যের ভাষাকে মৌখিক রীতির দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিবর্তনশীল সমাজে থেকে তিনি তাঁর কবিতার রসদ জোগাড় করেছিলেন। সমাজের পালে যখন পাশ্চাত্যভাবের হাওয়া বাঙালীর নিজস্বতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, যা কিছু বিদেশী তাকেই বিনা বিচারে গ্রহণ করছে সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যুগের সন্ধিক্ষণে জন্ম হয় ঈশ্বরচন্দ্রের। তাঁর কবিতার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বাঙালীর ভাবধারা।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— "আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে

সমারূঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাংলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় হউক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের— আমাদের নহে। খাঁটি বাঙালী কথায়, খাঁটি বাঙালী মনের ভাব তো খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাংলা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না, জন্মিবার জো নাই — জন্মিয়া কাজ নাই।"[১] বাঙালীর প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেওয়ার মত প্রাণের ভাষায় আর কোন কবি আছেন কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— এমন বাঙালীর বাংলা ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া কেহই লেখেন নাই— আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরগুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তৃপ্ত করে। পাবলো নেরুদা একথাই বলেছেন "কবিতাকে যেতে হবে পাঠকের কাছে। ........... সন্ধ্যালগ্নে কিংবা নক্ষত্রের রুপোলি আগুনভরা রাতে অন্তত একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি প্রয়োজন অনুভব করে .............. এভাবেই কবিতা বেঁচে থাকবে। একই অনুভূতি কবিতার জন্য বঙ্কিমের ক্ষেত্রে — তিনি একদা বর্ষাকালে গঙ্গার তীরে বসে ছিলেন। অবর্ণনীয় রূপ উপভোগ করার জন্য কবিতা পড়ে তৃপ্ত হতে চাইলেন। আকাশে নক্ষত্র নদী বক্ষে নৌকায় আলো তরঙ্গে চন্দ্ররাশি সবই আছে কিন্তু ইংরাজী কবিতা পড়ে বা কালিদাস ভবভূতি' পড়ে আশা মিটল না। তিনি বলছেন মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময় গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনী শুনা গেল—

"সাধো আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যাজিব
জাহ্নবী জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল— মনের সুর মিলিলো ........... আপনার বলিয়া মনে হইল।"

প্রাচীনধারার শেষ ও আধুনিক ধারার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরগুপ্ত কবিতা চর্চা করেছিলেন। সে সময় বাংলায় কবিতা লেখা বা বাংলা বলতে বুঝতে পারাটাই ছিল লজ্জার বিষয়। মাতৃভাষা চর্চা বা কথা বলা যেন ঘৃণ্য কাজ ছিল। বরং তা না জানাই ছিল গৌরব জনক। তাঁরা নিজেদের ইংরাজী নবীন বলে জাহির করে গৌরব বোধ করতেন। এই সময় ঈশ্বরগুপ্ত ছাড়া খাঁটি বাংলার কবি আর কেহই ছিল না। তিনি যত পদ্য লিখেছেন তা আর কোন বাঙালী কবি লিখেছেন কি না সন্দেহ আছে।

ঈশ্বরগুপ্তের সময় কবিতা চর্চার নামই ছিল সাহিত্য-চর্চা। সে সময় রামায়ণ, মহাভারত সকলেই পাঠ করতো।— কবি কঙ্কনের 'চণ্ডী', পামেশ্বরের 'শিবায়ন'

ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' 'দুর্গাদাসের' 'গঙ্গাভক্তি' 'তছঙ্গিনী' প্রভৃতি পঠিত হইত। বহুকাল এরূপ চলিতেছিল। ঈশ্বরগুপ্ত আসিয়া কাব্য সাহিত্যে একরূপ নতুন ভাব আনিলেন।[২] গঙ্গাচরণ সরকার বলেছেন "ঈশ্বরগুপ্তের সময় থেকেই বঙ্গ কাব্যের পুন প্রভাব সূচিত হয়েছিল। বরেণ্যগণ ব্যক্তি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরগুপ্ত যে কাজ করে গেছেন তা কালোত্তীর্ণ এবং আজ যদি সাংবাদিক কবি সহিত্যিক হিসাবে একজন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা যায়— তবে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত।

G. A. Grierson বলেছেন "In Bengali Poetry of the nineteenth century, Iswar Chandra Gupta was the forerunner of the modern school".[৩]

রাজনারায়ণ বসু বলেছন— "ঈশ্বরগুপ্ত রহস্যজনক কবিতাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি পাঠাঁর সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছেন, তাহাতে পাঠাঁর সাদা ও কাল ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে লিখেছেন— "মুরগির আন্ডা গন্ডা গন্ডা
খেয়ে কর প্রাণ ঠাণ্ডা"।

অক্ষয় কুমার দত্ত সম্বন্ধে লিখেছেন— মাথা মুণ্ডু ঘুরে গেল মাথা মুণ্ডু লিখে" রাজনারায়ণ বসুকেও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। রাজনারায়ণের নিজের বক্তব্য থেকে তা জানা যায়— ঈশ্বরগুপ্ত তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলছেন "বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত"।[৪]

ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাটিতে মার্শম্যানকে শিব ও সহকারী সম্পাদক টাউনবোন্ড ও রবিনসন সাহেবদের নন্দী ভৃঙ্গীরূপে বর্ণনা করেছেন। দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন— ঈশ্বরচন্দ্র কবি খাঁটি বাঙালি কবি। ইহার ন্যায় স্বভাবকবি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ প্রকাশে তিনি অদ্বিতীয়।

বিহারীলাল বলেছেন— ইনি খুব উচ্চ শ্রেণীর কবি না হলেও স্বভাব কবি ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের বক্তব্য তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখান থেকে জানা যায় যে, সমাজে যা কিছু ঘটতো তা তিনি কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করতেন। তাঁর কবিতার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

গঙ্গাচরণ সরকার বলেছেন, "একটি সুন্দর সুকবির প্রতিভারশ্মি বঙ্গ সাহিত্যাকাশে প্রতিফলিত হইল। ....... ফলত বঙ্গদেশে যে নৈশতিমির বিস্তারিত হইয়াছিল তা তিরোহিত হইয়া বঙ্গ কাব্যের পুন প্রভাত সূচিত করেছিল।

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও নিজে বাঙলা যা শিখেছিলেন তাই সম্বল করে নিজের প্রচেষ্টায় তিনি বাংলার সুকবি ও দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সে সময় তিনি অনেক সভা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর রচনাকার্যে সহায়তা করার জন্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন, অনেক ব্যক্তিকে তাঁর কার্যে সহায়তা করতে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য পণ্ডিত 'সোমপ্রকাশের' জন্মদাতা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা চাঙ্গারপোতা গ্রামের অধিবাসী হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ে অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন।

প্রভাকর প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙলার মানুষ প্রভাকরের কবিতাগুলি পড়বার জন্য ব্যকুল হয়ে অপেক্ষা করত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন— "ক্রমে দেশে ঈশ্চরচন্দ্রী কবি দল দেখা দিল। এবং বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হইল। এখন যেমন ছোট বড় পুরুষ নারী যিনি-ই কবিতা রচনা করেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে ঢালিয়া থাকেন। তখন কবিতা লেখার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি অজ্ঞাত বা জ্ঞাত সারেই ঈশ্বরচন্দ্রের ছাঁচে ঢালিতেন।[৫]

শিবনাথের উপর ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরগুপ্তের মত তিনি ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন যার মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের ছাপ বর্তমান—

চাদর চাপকান গায়ে ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গদাধর হাতি
বড় তার অহংকার ধরা দেখে সরাকার
চলে যেন নবাবের নাতি।

ঈশ্বরগুপ্তের গুণগ্রাহীর সংখ্যা সে সময় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের সম্মেলনে এক নব্য কবি সম্প্রদায় জন্মলাভ করে। সুধীরঞ্জন প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন বসু প্রমুখ সকলেই তাঁর শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার ছাপ রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও সুস্পষ্ট—

আমসত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে

হাফুস হুপুশ শব্দ    চারিদিক নিস্তব্ধ
পীপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বেথুন সাহেব তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী কয়েকটি পুস্তক রচনা করতে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। পত্রটির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ—

বাবু
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৭ই জুলাই, ১৮৫১

স্ত্রী বিদ্যালয়ের সকল অধ্যক্ষগণ সর্বদাই আমার নিকট অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ সকল বঙ্গ ভাষায় এ পর্যন্ত একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।............ আপনি যদ্যাপি এই সৎকার্য সম্পাদন নিমিত্ত .......... একখানি পুস্তক রচনা করেন, তবে আপনার দেশীয় ব্যক্তিগণ আপনার দ্বারা বিশেষোপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবেক।

আপনার
ডবলিউ, জে. বি, বেটন।[৬]

ঈশ্বরগুপ্ত সকল সময়েই মেকির উপর বিরূপ ছিলেন। এবং তা ছিল যথার্থ। তাঁর কাব্যে সর্বদাই তা পরিলক্ষিত। মেকি বাবুদের মেকি সাহেবদের ব্যঙ্গের মাধ্যমে আঘাত করেছেন। মেকি ব্রাহ্মণদের বলতেন "নস্য চোষা দধি চোষার দল"। মিশনারীদের ধর্মের মেকির ওপর তাঁর অত্যন্ত রাগ ছিল। রাগ ছিল মেকি রাজনীতির ওপর। তাই ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহকারে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অশ্লীলভাষা প্রয়োগ করতেন।

বেথুন সাহেব সে সময়কার রচনাকারদের সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন তাই তিনি যথোচিত সাবধান বাণী ঈশ্বরগুপ্তের কাছে নিবেদন করেছিলেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে। তৎকালে প্রচলিত কবিওয়ালার কবিতার পাঁচালী গানে অশ্লীলভাষা প্রয়োগের বাড়াবাড়ি চরমপর্যায়ে পৌঁছেছিল।

ঈশ্বরগুপ্ত ঈশ্বরের সঙ্গেও ব্যঙ্গ করেছেন—
কহিতে পার না কথা কি রাখিব নাম?
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

আবার যদি তাঁর ঈশ্বরভক্তি লক্ষ্য যার সেখানে দেখা যায় রামপ্রসাদ যেন যেমন মাতৃভাবে ঈশ্বরকে দেখেছেন ঈশ্বরগুপ্ত দেখেছেন পিতৃভাবে।

তুমি হে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত কুমার তোমার

বাস্তব জীবনে এক সময় তাঁর খাওয়া পরার অভাব ছিল কিন্তু যখন তিনি নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন তখনও কোনদিনও অর্থ নিয়ে ভোগ বিলাসে রত হননি। তাঁর গৃহে সারাদিন উনান জ্বলতো, যে আসত সেই খাবার পেত। নিজে তিনি প্রায়ই ভোজের আয়োজন করতেন। পরিচিত অপরিচিত যে কোন ব্যক্তি অর্থ সাহায্য চাইলে তৎক্ষণাৎ তা প্রদান করতেন।

তাঁর চরিত্রের একটি দোষ ছিল তিনি সুরাপান করতেন। শোনা যায় সুরাপান করে তিনি অনর্গল কবিতা লিখে যেতেন। তাঁকে সে সময় যে কোন কবিতা গীত ইত্যাদি রচনা করে দিতে বললে তিনি তা তৎক্ষণাত সম্পন্ন করে দিতেন।

পরিহাসপ্রিয়তা এমন চরম পর্যায়ে ছিল যে দুঃখ দুর্দশা, অত্যাচার, অন্যায় সব কিছুর মধ্যেই তিনি অদ্ভুত নির্লিপ্ততায় বিরাজ করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয়দের জীবনে যে সব ঘটনা আলোড়ন তুলেছিল তা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কবিতার মাধ্যমে এবং তা নিঃসন্দেহে ব্যঙ্গ বিদ্রুপসহ।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে যখন মানুষের মনে গভীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সাহিত্য পত্রিকার নাটকে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন নীরব ছিলেন না— তিনি এই অত্যাচার, সাদা হাকিমগণ কালার প্রতি সাদার বিচারের প্রহসন সম্বন্ধে বলেন—

'হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা ঘটে সর্বনাশ
কাল সাপ কি কোন কালে
দয়াতে ভেকে পালে?
টপাটপ আপনি করে গ্রাস।

অত্যাচারীর হাতে আইনের ভার থাকলে বিচার সঠিক হতে পারে না এই তাঁর কথার মর্ম্মবস্তু।। তিনি ভিক্টোরিয়াকে নিজ চোখে দেখার আহ্বান জানান

কোথা রইলে মা ভিক্টোরিয়া মাগো
কাতরে কর করুণা
'আসিয়া' আসিয়া মাগো করুণাময়ী—
করুণা চোখে দেখ না।

মিশনারীদের ধর্মান্তিকরণের সময় তিনি লেখেন—

পরমেশ কৃপাময় এক ভিন্ন নয় দুই নয়—
সবার উপাস্য হন যিনি
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী যত বর্ণ
সকলের ত্রাণকর্তা তিনি।

ধর্মান্তিকরণের কোন প্রয়োজন নেই বলেই তাঁর বক্তব্য—

জুস জাতি সুনিপুন তারা জানে ঈশগুণ
কোরাণে যবস নাশে খেদ
তোমাদেরি বাইবেলে তোমাদেরি সুখ মেলে
আমাদের শিরোধার্যে বেদ।

এত যুক্তি দিয়ে লেখার পরও কিন্তু পরিহাসপ্রিয়তা থেমে থাকেনি—

(১) মিশনারী রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে
একেবারে বিশ দাঁতে মেরে ফেলে তারে।

(২) বিদ্যাদান ছল করি মিশনারী ভব
পাতিয়াছে ভালো এক বিধর্মের টব।

বিধবা বিবাহ যখন আইনী হয় তখন সমাজ জীবনে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়— কবি মন থেকে এই আইন মেনে নিতে পরেননি। তিনি বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে লেখেন— অগাধ বিদ্যার সাগর

তরঙ্গ তার রঙ্গ নানা
তাতে বিধবাদের কুল তরী
অকুলেতে কুল পেলো না।

বিধবা বিবাহ আইনে কোন বয়সের উল্লেখ না থাকায় কবি শঙ্কিত—

সকলেই এইরূপ বলা বলি করে
ছড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে।

যেখানে সন্তান বয়সে তরুণ সেখানে বিধবার বিবাহ কেমনে হবে হলে কি করে তা নিয়ে চিন্তিত—

জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে
কে পাইবে 'সৎ বাপ' মায়ের কল্যাণে।

আর সন্তান যদি মায়ের বিবাহ দিতে পারে তবে সে বাহাদুর ছেলে—

জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর
এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর।

সহজে যদ্যপি হয় এরূপ ব্যাপার
করিতে হবে না আর আইন প্রচার।

এই কবিই আবার বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা করেছেন—

কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে
শতেক বিধবা হয় একের কারণে
হে বিধু করুণাময় বিনয় আমার
এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার।

তৎকালীন সমাজে কবি মানুষের অন্বেষণে বিফল হয়েছেন। প্রকৃত মানুষের বড়ই অভাববোধ করেছেন—

জগতে মানুষ কেহ নাই
মনের মানুষ কোথা পাই।
মানুষ মানুষ করে সব
ফলে আমি দেখি শব।।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমস্ত কবিতাগুলিকে সংকলিত করে বাঙালীকে ধন্য করেছেন। তিনি বলেছেন— "বাংলাভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ধারার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাংলা বড়ই দো টানার মধ্যে পড়িয়াছে। .......... ইংরেজীর ভরাগাঙের বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছাড়খার করিয়া তুলিয়াছে। ........... স্বচ্ছ সলিলা পুন্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাংলা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ হইতেছে।"[১] এই সকল কারণে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যিনি ঈশ্বরগুপ্তের মন্ত্রশিষ্য কবিবরের কবিতাগুলি সংগ্রহ কার্যে লিপ্ত হয়ে ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন আক্ষেপ করে বলেছেন "কেহ কি নাহি তব বান্ধারের দলে"?

সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাছে আপন ঋণ স্বীকার করেছেন— ১৩৪৬ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বরগুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গীর অনুকরণে তখনকার

অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, বাঙালীর ইতিহাস বোধ নেই— বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলেছেন। আমাদের ঔদাসীন্যে— আমাদের আতম্ভরিতার ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন—

যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণ গীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।

এমনই এক কবি বাংলা তথা ভারতের প্রথম দৈনিকের জন্মদাতা সাহিত্যাকাশে বর্ণোজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ সংঘটিত করার নায়ক গুপ্তই থেকে গেলেন। তাঁর লেখা কবিতার সাহায্য নিয়েই আমরা প্রবন্ধের ইতি টানছি।

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় বাংলাভাষা পায় প্রভাকর।

সূত্র-নির্দেশ :

১) ঈশ্বরগুপ্ত স্মারক সংখ্যা — পৃ. ৩
২) ঈশ্বরগুপ্ত বিশেষ সংখ্যা — ১৯০৮
৩) The Imperial Gazetter of India - Vol, II, New ed Oxford 1928 ch II Pg 433
৪) বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা — সম্বৎ — ১৯৬৫ পৃ. ৩২
৫) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯০৩
৬) হিত প্রভাকর থেকে সংকলিত।
৭) ঐ।

# সারাংশ

## অপেশাদার ইতিহাসচর্চা ও তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়

**শেখর ভৌমিক**

পেশাদার ইতিহাসবিদদের গবেষণার পাশাপাশি বাংলাদেশে অপেশাদার ইতিহাস চর্চারও একটা ঐতিহ্য ছিল এবং আছে। সেই কবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা চণ্ডীচরণ সেনদের মত মানুষদের নিয়ে এর সূত্রপাত। 'বাংল্যর বেগম' বা 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' তো রীতিমত গবেষণাধর্মী ইতিহাস গ্রন্থের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসাবে একালের ঐতিহাসিকরা এগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদাও দিয়েছেন।

তপনমোহনকে অনেকটা শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার)-র মতই আমি এ ঘরানার সুযোগ্য উত্তরসূরী রূপে প্রতিপন্ন করতে চাইছি। তপনমোহন লিখেছেন সাহিত্যের ইতিহাস আবার বিবাহ বা রাজনীতির ইতিহাসও তিনি শুনিয়েছেন। এ ইতিহাস মনগড়া নয়। মৌলিক তথ্যসূত্র ব্যবহার করেই তিনি নির্মাণ করেছেন ইতিহাসের গল্প. আখ্যান। এ ইতিহাস কোন 'text' বই নয়, যা তিনি বারংবার নিজেই বলেছেন, এ হল 'Popular History' আর এখানেই তার বা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য।

## একজন ভদ্রলোকের হয়ে ওঠা ঃ প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

**অমল শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়**

২০০৩ সালে ইতিহাস সংসদের বিগত অধিবেশনে একজন ভদ্রলোকের হয়ে ওঠা শীর্ষক নিবন্ধে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাদ্যায়ের জীবনের প্রথম ৪০-৪২ বছরের অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্মবিকাশের পর্যায়ের ঘটনাবলীগুলিই মাত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়ে ছিল। কিন্তু ঐ ঘটনাবলীর কোনো বিশ্লেষণ সংসদ নির্দেশিত পরিসরে করে ওঠা সম্ভব হয়নি। এবারের অধিবেশনে গতবারের অনারব্ধ ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি। 'ভদ্রলোক' পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বিভেদক লক্ষণগুলি অন্য সূত্রে বিদ্ধৃত হয়েছে, অন্যত্র এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত পর্যালোচনা করা গেছে। এবারে দেখা যেতে পারে আলোচনাধীন ব্যক্তিটির মধ্যে ঐ লক্ষণগুলি কোথায় কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, কোথায় হয়নি, কেন

তা হতে পারেনি? ১৮৭৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাঙালী ভদ্রলোকদের অর্ন্তলোকের আলোতে তাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলয় অনুসন্ধান করতে বসে ভদ্রলোকদেরই জগতে তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত, কিছু পরিমাণে বাস্তব সাফল্যমন্ডিত ও মনোজগতে কিছু প্রভাবসম্পন্ন একটি ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা বর্তমান গবেষণার একটি অংশকে কার্যকরী করে তুলতে আগ্রহী।

## বিধবা বিবাহ্ আন্দোলন ঃ বাংলা কবিতা ও নাটক

মণিদীপা ঘোষ

ঔপনিবেশিকযুগে পাশ্চাত্যের আইন ব্যবস্থা এদেশে চালু হবার সাথে সাথে এমন কিছু সামাজিক সংস্কারকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হতে থাকে যার দ্বারা পরোক্ষভাবে ভারতীয় নারীর মৌলিক বেঁচে থাকার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়। সতীদাহ রদ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, সহবাস সম্মতি আইন এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, এই আইনগুলি কি প্রেক্ষিতে তৈরী হচ্ছিল এবং এই প্রচেষ্টাগুলি ঔপনিবেশিক সমাজে তথা উপনিবেশিক মননে কি প্রভাব ফেলেছিল সেটাই এই অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য। এরজন্য আমরা বেছে নিয়েছি উনবিংশ শতকে যে বিষয়টি সমাজকে বিশেষ নাড়া দিয়েছিল — বিধবা বিবাহ প্রচলন। এই বিষয় নিয়ে ঔপনিবেশ্বিক শাসন ব্যবস্থা দ্বারা নিবদ্ধিকৃত আইন ও তার ব্যবহার কিভাবে উপনিবেশিক মননে ছাপ ফেলেছিল তার সর্বোত্তম প্রতিফলন দেখা যায়, সাহিত্যের দর্পণে, বিশেষত কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কিছু মানুষ বিধবা সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং সমস্যা নিবারণের উপায় হিসাবে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব আলোচনা করেছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা বিধবা মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের আনন্দে বাঁচবার অধিকারকে স্বীকার করা হয়, বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় ১৮৫৬ সালে। সমাজে বিধবাদের স্থান, বৈধব্যের কঠোরতা, বিধবাদের ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যা এবং নিহত ও সুপ্ত বাসনা কামনা, বিধবা বিবাহের ঔচিত্য - অনৌচিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সমকালীন বাংলা নাট্য রচনায় ও বাংলা কবিতা রচনায় চমৎকার ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। শুধুমাত্র বিবাহ বিষয়ক যে নাটক - প্রহসনগুলি রচিত হয়েছে তা নয়, সেগুলি ছাড়াও সমসাময়িক অনেকগুলি সামাজিক

নাট্য রচনায় বিধবা বিবাহের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে লেখা হয়, একাধিক নাটক ও কবিতা, এথেকে বোঝা যায় যে, এই বিষয়টি তৎকালীন সমাজ ও সময়কে নাড়া দিয়েছিল।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উদ্যোক্তা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে স্বভাব কবিরা গান বেঁধে ছিলেন। শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিপিন বিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সে কথা বলেন। পল্লীগ্রামে চাষাভূষোদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের নামই হল 'বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর', বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঁচালিকার দাশরথি রায় 'বিধবাবিবাহ পালা' নামে একটি পালা গান রচনা করেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন রয়েছে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরোধী নয়, সমাজও সংসারের পরিপন্থীও নয়, উল্লিখিত চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যে। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রতিফলন রয়েছে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিধবা রমণী' কবিতায়, বিধবার অসহায়তার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মানকুমারী বসুর 'পতিতোদ্ধারিনী' কবিতায়। এছাড়া বিধবা বিবাহের সমর্থনে সে সময় পত্র পত্রিকাতেও একাধিক কবিতা লেখা হয়েছিল। সেগুলির কয়েকটি হল - 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিধবা বামার' 'শোকোক্তি', বান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গবিধবা' (জ্ঞানদাসের ছন্দানুকৃতি), 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গবিধবা', অনুসন্ধান পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাল্য বিধবার কথা' ইত্যাদি।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতার চিত্র প্রতিফলিত রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গাঙ্গনা' কাব্যে। উল্লিখিত কবিতাটি ছাড়া আরও একাধিক কবিতায় বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করা হয়। বিরুদ্ধে লেখা কবিতাগুলির মূলবক্তব্য এই যে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে নারী সমাজের পবিত্রতা নষ্ট হবে, সমাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে, বিশেষ করে সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী নিয়ে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হবে।

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রসঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে যে প্রবল বিরোধিতা দেখা দেয়, কাব্যে ততটা প্রবল আকার ধারণ করেনি। কবিতাগুলি উদ্দেশ্যমূলক হলেও সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই পাঠকের কাছ থেকে বিদায় নেয়নি, তাদের সাহিত্য মূল্যও বর্তমান।

১৮৫৪ সাল নাগাদ বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সচেতনতা সমাজের একটি অংশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই বছরই প্রথম বাংলা নাটক 'কুলীন কুল সর্বস্ব' প্রকাশিত হয়, নাট্যকারগণ শুধুমাত্র বিধবা বিবাহ বিষয়ক নাটক লেখার প্রেরণা ও সাহস পান বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ণের পরে। ১৮৫৬ সালে আইন ঘোষিত হওয়ার পর

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবোদ্বাহ, উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ, রাধামাধব মিত্রের বিধবা মনোরঞ্জন এবং অজ্ঞাত নামার বিধবার বিষমবিপদ এই চারটি নাটক প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত চারটি নাটক ছাড়াও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে যে সমস্ত নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল —

সমর্থনে ঃ- শিমূয়েল পিরবক্সের - 'বিধবাবিংহ' (১৮৬০), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা চিত্ত চাপল্য' (১৮৬১), হরিশচন্দ্র মিত্রের 'শুভস্য শীঘ্রং' (১৮৬২), যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিলাস' (১৮৬৪), বিরাজমোহন চৌধুরীর 'বঙ্গবিধবা' (১৮৮২)।

বিরুদ্ধে ঃ- 'বাবু' (১৩০০), অমৃতলাল বসু। 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪), গোলাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিধবা বিবাহের সমর্থনে লেখা নাটকগুলি আলোচনা করলে একটা দিক আমাদের চোখে পড়ে, তা হল এই যে, বিধবা বিবাহের সমর্থনে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা কেবল বিধবাদের যৌন সমস্যার কথা ভেবেই বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছেন। অথচ এর একটা অর্থনৈতিক দিকও ছিল, যার জন্য বিধবা বিবাহ অনিবার্য। নাট্যকাররা একটু সচেতন হলে তা দেখাতে পারতেন। আন্দোলনের সমর্থনে তাঁদের বক্তব্যের গুরুত্বও তাহলে অধিক বৃদ্ধি পেত।

বিদ্যাসাগর অনুরাগী নাট্যকাররা যখন বিধবা বিবাহের সমর্থনে কলম ধরেছিলেন তখন রক্ষণশীলরাও চুপ করে থাকেননি। তাঁরাও নাটক নক্‌শার মাধ্যমে বিধবা বিবাহের সর্বনাশা পরিণতি দেখিয়ে আন্দোলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন, এধরনের একটি নাটক হল অমৃতলাল বসুর 'বাবু' নাটকটি। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখা নাটকগুলির মধ্যে এটিই সব দিক থেকে জোরালো।

উনিশ শতকের শেষ দশকেও হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ প্রচলনে প্রবল বাধা ছিল, নাটকগুলির অভিনয়ে মঞ্চ সাফল্য তা প্রমাণ করে।

এই সময় সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি সাক্ষরতা প্রসার, অভিনয় ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহারের প্রসারের ফলে মুদ্রিত বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগও বহুলাংশে এ সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ সমকালীন সমাজমনের সার্বিক প্রতিফলন আমরা পেয়েছি নাটক ও কবিতার মাধ্যমে।

# ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গললনা বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী ও বারাঙ্গনা সাবিত্রী দাসী

জয়দীপ পন্ডা

১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলার মেদিনীপুর জেলার বীরত্বপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল ভুমিকা ছিল। এই আন্দোলনকে সফলতায় রূপ দিতে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সাধারণ গ্রাম্য বিধবা রমণী থেকে পতিতাপল্লীর অশিক্ষিতা রমণীরা জীবনের পরোয়া না করে। আমাদের আলোচ্য মাতঙ্গিনী হাজরা ও সাবিত্রী দেবী সেদিন জীবন-মৃত্যুপণ করে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলেন দেশের মুক্তি সংগ্রামে।

**মাতঙ্গিনী দেবী**

মাতঙ্গিনী দেবীর জন্ম বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত হোগলা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১২৭৭)।[১] ওনার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করার সুযোগ হয়নি। মাত্র বার বছর বয়সে বিবাহ হয় পার্শ্ববর্তী আলিলান গ্রামের ষাট বছর বয়সী অবস্থা সম্পন্ন ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে। মাত্র ছ বছর পরেই গত হলেন ত্রিলোচনবাবু। সংসার বুঝে ওঠার আগেই বৈধব্যের করাল ছায়া নেমে এল জীবনে।[২]

ইতিমধ্যেই পরিচয় ঘটে পাশের সিউরী গ্রামের কংগ্রেস নেতা গুণধর ভৌমিকের সঙ্গে। ওনার কাছেই মাতঙ্গিনীদেবী পরাধীন ভারতবর্ষের অসহায় যন্ত্রণার কথা, গান্ধীজীর আন্দোলনের কথা শুনতেন।[৩] ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলে তিনিও তাতে অংশ নেন। তারপর শুরু হল জীবনের কঠিন পরীক্ষার পালা। বাত রোগের জন্য তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। যন্ত্রণা লাঘব করতে তিনি আফিম খেতেন। গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ করবার পর তিনি আর কখনও আফিম খাননি। গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বাসের তাঁর অন্ত ছিল না। গান্ধীজীর নামে 'সিন্নীজল' খেতেন।[৪] গান্ধীজীকে জীবনে কখনও চোখে দেখবার সুযোগ না ঘটলেও মাতঙ্গিনীদেবী "গান্ধীবুড়ী" বলে অভিহিত হয়েছিলেন ওনার জীবদ্দশাতেই।[৫]

১৯৩৩ সাল। ঐ বছর বাংলার গভর্নর এন্ডারসন সাহেব আসবেন তমলুকে— প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। তিনি আসবেন এবং তাকে তমলুকবাসী সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন একথা ভাবার কোন কারণ নেই। মেদিনীপুর জেলার উপর দমন-পীড়নমূলক কাজকর্মের তিনিই মূল কান্ডারী। তমলুক শহরে যখন লাট সাহেব এলেন তখন চারিদিকে সশস্ত্র পাহারা। শহরে ১৪৪ ধারা জারি। ছুঁচ গলবার উপায় পর্যন্ত নেই। কিন্তু সুকৌশলে সমস্ত বেষ্টনী ভেদ করে কালো পতাকা নাড়াতে নাড়াতে 'বন্দেমাতরম্', 'লাট সাহেব তুমি ফিরে যাও'— ধ্বনি দিতে দিতে মাতঙ্গিনী দেবী স্বয়ং লাট সাহেবের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর এই কার্যকলাপে সকলেই হতভম্ব হয়ে গেল। বিচলিত পুলিশের দল চারিদিক থেকে ক্ষিপ্ত শৃগালের ন্যায় দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাতঙ্গিনী দেবীর উপর। নরপশুদের লাঠির আঘাতে জল-জল চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে তাঁকে আদালতে তোলা হোল। বিচারে ছ মাস জেল— পাঠানো হোল বহরমপুর জেলে।[৬]

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি কংগ্রেসের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করলেন। মাদক দ্রব্য বর্জনের পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, চরকা-খাদির প্রচলন, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতির প্রচারকার্যে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন। নিজেও নিয়মিত চরকা কাটতেন, খদ্দরের কাপড় পরতেন, স্বপাক আহার করতেন। আলিনান গ্রামের নিজ বাড়ীর পাশে লবণ তৈরীর একটি শিবিরও খোলা হয়েছিল— যার মধ্যমণি ছিলেন মাতঙ্গিনী দেবী।[৭]

অবশেষে এল বহুকাঙ্ক্ষিত ১৯৪২ সাল। গান্ধীজীর আহ্বানে উত্তাল হল সমগ্র ভারতবাসী 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো' ধ্বনি দিয়ে। ঐ বছর ২৯শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর তথা তমলুক বাসীর কাছে এক রক্তরঞ্জিত গৌরবময় দিন। ঐ দিন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তমলুক থানা ও দেওয়ানী আদালত দখল অভিযানে সামিল হয়েছিল প্রায় ৫০ হাজার নরনারী। শহরে প্রবেশের পাঁচটি প্রবেশপথ দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলল থানা ও দেওয়ানী আদালত অভিযানকারী দল। শহরের উত্তর দিক থেকে রূপনারায়ণ নদী বাঁধ ধরে সোয়াদিঘি, আলিনান, সিউরী, বিশ্বাস মথুরী, খোসরেখা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ৫ হাজার নরনারী 'বন্দেমাতরম্', 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো', 'গান্ধীজী কি জয়'— ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলল। বানপুকুর পাড়ে শহরে প্রবেশের সঙ্কীর্ণ রাস্তার উপর তমলুক থানার সেকেন্ড অফিসার অনিল ভট্টাচার্যের অধীনে একদল সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী সৈন্য পথ আটকে দাঁড়ায় এবং বন্দুক উচিয়ে তাড়া করে। ফলে মিছিলের গতি কিছুটা থমকে যায়। এরই মধ্যে একজন ১৩ বছরের

বালক লক্ষ্মী নারায়ণ দাস হঠাৎই দৌড়ে এসে এক সৈন্যের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সশস্ত্র পুলিশের দল তাকে ঘিরে ফেলে বন্দুকের পেছন দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করে। বালকটি যন্ত্রনায় চিৎকার করতে লাগল। মিছিল ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম এমন সময় মিছিলের পেছন সারিতে থাকা মাতঙ্গিনীদেবী সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।[৮]

প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সবচেয়ে বড় পতাকাটি মাতঙ্গিনীদেবী স্বেচ্ছাসেবকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাস্তার পাশের একটা বাড়ীর রকে উঠে পাঁচ-সাত মিনিট একটা বক্তৃতা করেন, তার বুকের আগুন ছুটিয়ে দিল। সকলে মাথা হেঁট করল। সে বলল— 'কাপুরুষ, যা ফিরে যা, আমি একলাই যাচ্ছি। পেছন ফিরে চাইব না, দেখব না—কেউ এল কিনা'। পতাকাটি নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। কাছে আসতেই পুলিশের দল গর্জে উঠল— খবরদার আর এক পা এগুলে গুলি করব। থমকে দাড়িয়ে পড়ে মাতঙ্গিনী বলল— 'তোমাদের তো কালো চামড়া— নিশ্চয়ই ভারতবাসী। আমরা দেশের জন্য লড়ছি। তোমাদের স্বাধীনতা হবে না?' সৈন্যরা বিদ্রূপ করে বলল— 'রাখ বুড়ি তোর বক্তৃতা। এক পা এগোলে গুলি করব'। মাতঙ্গিনী বলল— 'কর গুলি, মরতেই তো এসেছি! বল বন্দেমাতরম্'। পাগলীর মত পতাকা নিয়ে ছুটল। রাইফেলের একটা গুলি এসে তার বাঁ হাতটা গুঁড়িয়ে দিল। ডান হাতে পতাকা তুলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে এই বীর রমণী। দ্বিতীয় গুলি ডান হাতটা জখম করে দিল। দুটো হাত দিয়ে পতাকা দণ্ড বুকে চেপে ধরে রক্ত ছড়াতে ছড়াতে ছুটে চলেছে। মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। দুডুম করে গুলি চলল, লাগল তার কপালের মাঝখানে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এই মহিয়সী মহিলা। আশ্চর্যের বিষয় তখনও তার বুক চেপে ধরা ছিল পতাকাদন্ড। একজন সৈনিক এসে লাথি মেরে পতাকাটিকে নীচু করে দিলে তখনও দন্ডটি সেইভাবে ধরা আছে.........'[৯] মাতঙ্গিনীর সাথে প্রাণ দিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, পুরীমাধব প্রামাণিক, জীবন চন্দ্র বেরা. নগেন্দ্রনাথ সামন্ত। আহত হলেন অসংখ্য মানুষ।

**বারাঙ্গনা সাবিত্রীদেবী**

এবার আমরা আলোচনা করব বারাঙ্গনা সাবিত্রী দের বীরাঙ্গনায় উত্তরণের লোমহর্ষক কাহিনী।

সাবিত্রীদেবী বিবাহিত জীবনে সফলতা অর্জনের সুযোগ পাননি বলে তাঁকে তমলুক শহরে এসে বারবণিতার বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়।[১০] ১৯৩০ সালে লবণ আইন

অমান্য আন্দোলন শুরু হলে সাবিত্রী এই আন্দোলনে যোগ দেন। তমলুক থেকে ৬ই ডিসেম্বর মহকুমার সত্যাগ্রহীরা নরঘাটের উদ্দেশ্যে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য রওনা হল। সত্যাগ্রহীদের সাথে পা মেলালেন অষ্টাদশী সুন্দরী বারাঙ্গনা সাবিত্রী।

নরঘাটে সত্যাগ্রহীরা একটি জনসভার আহ্বান করেছিলেন। জনসভায় বক্তা ছিলেন মহিলা নেত্রী চারুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখেরা। এদিকে প্রবল অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট *পেডী* সাহেব জনসভা বান্‌চাল করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং নরঘাটে ১৪৪ ধারা জারি করে মিটিং বন্ধ করার নির্দেশ দেন। জ্যোতির্ময়ীদেবী পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে জনতাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'যারা বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত আছেন তারা এই সভায় এগিয়ে আসুন, যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন তারা ফিরে যান।' এই আহ্বান শুনে বারাঙ্গনা সাবিত্রী সামনে এসে বললেন, "আমরা বুকের রক্ত দেব, তবু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করব না।" সাবিত্রীদেবীর সঙ্গে আরও আটশো গ্রাম্য মেয়ে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁরা পুরুষদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট *পেডীর* নির্দেশে সশস্ত্র পুলিশ নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে লবণ প্রস্তুতের সরঞ্জাম ভেঙে দেয়। শিশু বালকরাও তার হাত থেকে রেহাই পায়নি। *পেডী* নিজেই একটি দশ বছরের বালকের চোখে এমন আঘাত করেছিল যে বালকটির চোখ বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে চলল। সেই সময় সাবিত্রীদেবী ছুটে এসে নিজের পরনের খদ্দরের শাড়ী ছিড়ে তা চোখ বেঁধে পরম স্নেহে কোলে বসালেন।[১১] এমনকি এও জানা যায় সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার অপরাধে তিনি বেশ কয়েকদিন জেলও খাটেন। তমলুক শহরে এস.ডি.ও. সাহেবকে তিনি সুকৌশলে স্বদেশের তৈরী লবণ বিক্রী করেছিলেন।[১২] জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য না হয়েও তিনি নিজেকে দেশের কাজে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৪২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুক থানা দখল অভিযানে শহরের দক্ষিণ দিক থেকে আসা প্রায় ১০ হাজার সংগ্রামী জনতা ব্যবত্তাহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী ক্ষিরোদ চন্দ্র মাইতির নেতৃত্বে শংকর আড়া ব্রীজের কাছে পৌঁছলে সশস্ত্র পুলিশ পথ অবরোধ করে। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে জনতা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। গুলির শিকার হয়ে ঘটনাস্থলে শহীদ হলেন শ্রী উপেন্দ্রনাথ জানা। বহু ব্যক্তি গুরুতর জখম হলেন।[১৩]

আহতরা যখন অসহায় অবস্থায় একটু জলের জন্য আর্তনাদ করছেন তখন পাশের বারাঙ্গনা পল্লী থেকে সাবিত্রী দেবী এক বালতি জল নিয়ে ছুটে এলেন আহতদের সেবায়। তিনি যখন আহতদের মুখে জল দিচ্ছেন তখন ব্রিটিশ সৈন্যরা বন্দুক উঁচিয়ে

তাড়া করল। সাবিত্রীদেবী অকুতোভয়ে মুখ ভেংচে তাদের উদ্দেশ্যে বলল, "দাঁড়া গুখেগোর ব্যাটারা, আজ আমি তোদের মজা দেখাচ্ছি। জোয়ান মরদগুলো কি দোষ করেছে যে তাদের গুলি মারলি? তারা কি তোদের বাপের পাকা ধানে মই দিয়েছে? দেশ স্বাধীন হলে কোন বাপ তোদের রক্ষা করবে?" এই রকম নানা গালিগালাজ করতে করতে সাবিত্রীদেবী দ্রুত পদে তার ডেরায় গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কিছু মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে এলেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক বালতি করে জল আর একটি করে বঁটি। তাদের কোমরের কাপড় আঁট সাঁট করে বাঁধা। তাদের চোখ মুখে যেন আগুন জ্বলছে। সাবিত্রীদেবী সিপাহীদের দিকে বঁটি উঁচিয়ে বলল, 'দ্যাখ মাগীর ব্যাটারা, এদিকে আর এক পাও এগোবি নি। এই আহত লোকগুলোকে যদি সেবা করতে বাধা দিস, তবে এই বঁটি দিয়ে তোদের সব নাক কান কেটে ফেলব।' সিপাহীরা থমকে দাঁড়িয়ে রইল, কিছু বলতে সাহস পেল না। সাবিত্রীর দল তাদের সেবা করতে লাগল।[১৪] ঐ দিন সাবিত্রীদেবী কয়েকজন গুরুতর আহতকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সারা রাত সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন।[১৫] এইভাবে বারাঙ্গনা সাবিত্রী সেদিন বীরাঙ্গনায় পরিণত হয়েছিল।

১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। ঐ সময় তিনি সর্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবীদের চিঠিপত্র লেনদেন করতেন। একবার ধরাও পড়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে আরতি নামে আরেক বারাঙ্গনা রক্ষা করে দেন।[১৬] স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ওঁর জীবন অসহায় অবস্থায় ভিক্ষে করে কাটে। ১৯৯৪ সালের ২০শে মার্চ ৮২ বছর বয়সে ওঁর জীবনাবসান ঘটে।

পরিশেষে বলি এই দুই ইতিহাস সৃষ্টিকারী রমণী নিজেদের জীবনকে সেদিন তুচ্ছ মনে করে পরাধীন মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে যশস্বী হয়ে রয়েছেন। এঁদের আত্মবিসর্জনের ধারা বেয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এল। এঁদের যেন আমরা ভুলে না যাই।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী— কমলা দাশগুপ্ত, জয়শ্রী প্রকাশন, কলিকাতা, বাং সন ১৩৯৬, পৃ. ২২৭।

২) ভারতের জোয়ান অব আর্ক বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী— প্রিয়নাথ জানা, মাতৃভাষা পরিষদ, ঝোড়হাট, হাওড়া সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১১।

৩) বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী— ভক্তদাস, হোগলা, তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর আষাঢ় ১৪০৯, পৃ. ৪০-৪১।

৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিপ্লবীদের মুখোমুখি— সম্পাদনা, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারী ২০০২, পৃ. ৪৩। (গুনধর ভৌমিকের সাক্ষাৎকার)।

৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী— কমলা দাশগুপ্ত, পৃ. ২২৯।

৬) বীর ও বীরাঙ্গনার মেদিনীপুর— সুদিন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক জেলা পরিষদ, পূর্বমেদিনীপুর, মে ২০০৩, পৃ. ১৩।

৭) মাতঙ্গিনীদেবীর এইসব কর্মকাণ্ডের কথা আমরা ওনার স্নেহধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রিয়নাথ জানা ও অমূল্য চরণ মাইতি মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি।

৮) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার— রাধাকৃষ্ণ বাড়ী, প্রকাশক সুশীল কুমার ধাড়া, নিমতৌড়ী স্মৃতি সৌধ, তমলুক, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৯) 'বিয়াল্লিশের স্মৃতি থেকে'— অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, তমলুক ক্লাব সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, বৈশাখ, ১৩৮০।

১০) স্বাধীনতা আন্দোলনে তমলুক ও হলদিয়া মহকুমার নারী সমাজ— ড. প্রদ্যোত কুমার মাইতি, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ. ৬২।

১১) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী— কমলা দাশগুপ্ত, পৃ. ৬৮।

১২) 'বীরাঙ্গনা সাবিত্রীর বর্তমান আশ্রয় গোয়ালঘর, করুণ তার কাহিনী'— সিগন্যাল (সাপ্তাহিক)। সম্পাদনা— আশুতোষ দাস, আকস বাড়ী তমলুক, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২।

১৩) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার— রাধাকৃষ্ণ বাড়ী, পৃ-. ১৩৮-৩৯।

১৪) ভারতের জোয়ান অব আর্ক বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী— প্রিয়নাথ জানা, পৃ. ৬৫-৬৬।

১৫) প্রবীণ বিপ্লবী ড. সুশীল কুমার ধাড়া মহাশয়ের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

১৬) '৪২-এর রক্তঝরা দিনের কথা— কুমুদিনী ডাকুয়া, আপনজন বীরাঙ্গনা সংখ্যা ১৪০৯, সম্পাদক— তমালিকা পণ্ডাশেঠ, সংস্কৃতি ভবন, চিরঞ্জীব পুর, হলদিয়া, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৫২।

# প্রসঙ্গ মেদিনীপুর — সামাজিক বিবর্তনে নারীর অবস্থান

## সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞান গবেষণাধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা এবং মানবী বিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়সমূহ। অবিভক্ত মেদিনীপুর প্রাচীনকাল থেকেই নানা কারণে আজও ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে স্বীকৃত। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি, বাঁকুড়া, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা, হাওড়া জেলা, হুগলী নদী ও রূপনারায়ণের সীমান্তরেখা, পশ্চিমে বিহার ওড়িশা। সুদূর অতীত থেকেই এখানকার আদি জনগোষ্ঠী হলেন সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, লোধা ও শবরগণ। প্রশাসনিক কারণে ও উন্নয়নের স্বার্থে ২০০২ সালের ১লা জানুয়ারী অখণ্ড মেদিনীপুরের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বিভক্তিকরণ ঘটেছে। সাম্প্রতিক জনগণনার বিচারে দুই মেদিনীপুরের মোট নারী ও পুরুষ সংখ্যা যথাক্রমে ৪৭০৯৪৭২ জন এবং ৪৯২৯০০০ জন।[১]

মেদিনীপুরের জনসংখ্যার ১৮.১৬ শতাংশ তফসিলি সম্প্রদায় এবং ৮.৪৮ শতাংশ আদিবাসী।[২] উভয় সম্প্রদায়-ই মূলত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন এবং এখনও পর্যন্ত আদিবাসীদের নগরায়ণ সীমিত। এদের মধ্যে সর্বাধিক সাঁওতাল— এরপর ভূমিজ মুন্ডা, কোরা, লোধা এবং শবররা।

মেদিনীপুরের আদিবাসী সমাজে মহিলাদের সংখ্যা প্রায় পুরুষের সমান। কিন্তু এই মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার যথেষ্ট কম। সম্প্রতি ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে আদিবাসী সমাজ উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা থাকলেও বিভিন্ন NGO গুলি এ বিষয়ে এবং মূলত আদিবাসী সমাজের মহিলাদের উন্নয়নস্বার্থে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এদের মধ্যে Rural Development Association বা RDA সংস্থাটি ১৯৮০ সাল থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের কাজে সংযুক্ত। এই সংস্থার মূল কার্যালয় মেদিনীপুর শহরে। বর্তমানে সংস্থার প্রধান শ্রীমতী নন্দিনী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষিতে এবং RDA-র ২০০৩-

০৪ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জানা যায় যে জন্মলগ্ন থেকেই সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য হল নারী শক্তির যথার্থ ব্যবহার ও উন্নয়ন, যদিও ১৯৯৯ সাল থেকে বিভিন্ন Self-Help-Group (SHG) গঠনের মধ্য দিয়ে বাস্তবে কাজটি শুরু হয়।

পশ্চিম-মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল, ঝাড়গ্রাম কেশিয়াড়ী ও নারায়ণগড় ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে গ্রামগুলি নিয়েই এই সংস্থার কাজ। বর্তমানে এই সংস্থার অধীনে প্রায় ৯০০০ মহিলা কর্মে যুক্ত— যাদের অধিকাংশই মূলত আদিবাসী সমাজ-ভুক্ত। এই কর্ম সংযুক্তি মহিলাদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন সত্তার প্রকাশ ঘটায় যা আদিবাসী মহিলাদের Empowerment কে বাস্তবায়িত করে। লক্ষ্যণীয় হল এই যে এই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনায় মূলত স্থানীয় উপাদান (Resource) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতি ১০ থেকে ২০ জন আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে এক একটি Group তৈরী হয়। প্রতি Group এর নিজস্ব fund সদস্যগণ-ই তৈরী করেন এবং পরে প্রয়োজনমত তার থেকে ঋণ নেওয়া যায়। অধিকন্তু সদস্যাগণ এই সংস্থার মাধ্যমে সরকারী ঋণও পেতে পারেন (স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা)।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে RDA একদিকে যেমন স্থানীয় উৎপাদন ভিত্তিক বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেয় তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয় সেইসব পণ্যশিল্পের প্রতি— যেগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় বাজার পাওয়া যাবে, কিন্তু গ্রামীণ ঐতিহ্যের চিরাচরিত কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না— সেরূপ বিষয় হল পশুপালন, মাদুর বুনন প্রভৃতি।

RDA প্রধান নন্দিনী বসু বলেন যে তাঁদের সংস্থা প্রাথমিকভাবে আদিবাসী সমাজে মহিলাদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী মনে করে তাহল পরিবারে এবং সমাজে মহিলাদের শক্তিশালী স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় তাদের বক্তব্য/ভূমিকা অনিবার্য করে তোলা— অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। এবং এজন্যই SHG এর মধ্যে তৈরী করা হয় Cluster Committee যারা নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। প্রসঙ্গত, ঝাড়গ্রাম রাজীব গান্ধী রুর‍্যাল এন্ড সোস্যাল রিফর্ম সেন্টারের সাপ্তাহিক বুলেটিন এর প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে গড়শালবনীতে ২৬শে জুন, ২০০৪ সালে ভারতী মাহাতোর শ্লীলতাহানি ও তাঁর স্বামীর খুনের প্রতিবাদে ১৬ই জুলাই, ২০০৪-এ মহামায়া মহিলা স্বনির্ভর সংঘের প্রায় ৫০০ জন মহিলা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

আদিবাসী সমাজ মূলত পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বশাসিত সংস্থা নেহেরু যুব কেন্দ্র (মেদিনীপুর সদর)-র সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায় যে পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৯টি ব্লকের অধীনে ৬২২টি Youth Club নিয়ে যুব কেন্দ্র উন্নয়নের কাজে যুক্ত। এঁরা মহিলা-পুরুষ সকলকে নিয়েই কাজ করেন। মহিলা সংগঠনগুলি "মহিলা মণ্ডল" নামে পরিচিত। এই সংস্থাটি সাঁকরাইল ব্লকের ঝিলিদাম গ্রামে সম্প্রতি আদিবাসী নৃত্য শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। প্রশ্ন করা হলে সংস্থার পক্ষ থেকে নন্দিতা ভট্টাচার্য বলেন যে কৃষ্ণা মাহাতো আদিবাসী নৃত্য প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। নন্দিতা ভট্টাচার্য আরও জানান যে এঁরা সরকারী বা বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী মহিলাদের Sex Education দিচ্ছেন। যেন তাঁরা কোনভাবেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতৃত্বলাভ না করেন— যা একই সঙ্গে সরকারী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টির সঙ্গে সংযুক্ত। নেহেরু যুবকেন্দ্রের পক্ষ থেকে আদিবাসী মহিলাদের সচেতন করার জন্য AIDS বিরোধী বিভিন্ন আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। এছাড়াও অল্প বয়সী মেয়েদের বয়ঃসন্ধি সমস্যা, ঋতু সংক্রান্ত নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক বক্তব্য অনুন্নত অঞ্চলে পৌঁছে দেবার জন্য নেহেরু যুব কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[৪] মেদিনীপুরের আর একটি উল্লেখ্য সংস্থা হল ঝাড়গ্রামের 'স্নেহা' সংস্থাটি। (সংলাপের শাখা)— যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের যৌন কর্মীদের কন্যা সন্তানদের প্রতিপালন ও শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছেন। 'স্নেহা'র কন্যাগণ সমাজের মুলস্রোতে সহজেই যুক্ত হতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধে মেদিনীপুরের আদি জনগোষ্ঠীর মহিলাদের নানা সমস্যা, তাদের সামাজিক অবস্থান আর্থিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি পর্যালোচনা-র সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ভারত সরকার কিভাবে নারী-উন্নয়নের বিষয়গুলির গুরুত্ব দিয়েছেন সাম্প্রতিক যোজনা রিপোর্ট থেকে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পরে। ১৯৮০-৮৫ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয় যে সাংবিধানিকভাবে নারীর সুরক্ষা থাকলেও বাস্তবে নারীর অবস্থান অন্যককম— কর্মক্ষেত্র সহ নানা স্তরেই রয়েছে সমস্যা এবং এই পরিকল্পনাতেই মহিলাদের উন্নয়নের জন্য Self Employment বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৮৫-৯০ সালের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কর্মপ্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এই পরিকল্পনাতেই প্রথম বলা হয়— "that confidence building and creation

of awareness of their rights among women must be accelerated, so that women realise their Potential for development.'[৫] অষ্টম এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মক্ষেত্রে নারীর অস্তিত্বকে পুরুষের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে বলা হয় যে, "National Policy for empowerment of women would be formulated."[৬]

ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের অধিকাংশ জনগণই নানাভাবে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থা, বাণিজ্যকরণের সঙ্গে যুক্ত। সামগ্রিকভাবে জেলার এই উৎপাদনে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা, উৎসব, লোকাচারের নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার মূল বিষয়টি সংযুক্ত। এমনকি ধর্মীয় উৎসবও এই কৃষি ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে গেছে। আজ যা উচ্চ বর্ণের হিন্দু-ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য — আম্রপল্লব ও ঘটপূজা, কলা-বৌ. ধানের ছড়া — এগুলি মূলত আদিবাসী কৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত। সামগ্রিকভাবে উর্বরতার বিষয়টিতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। জারডিগার সময়কালে (আষাঢ় থেকে আশ্বিন) করম উৎসবে করম গাছের দুটি ডাল-নারী ও পুরুষের দ্যোতক, এদের মিলনেই পৃথিবী ফলবতী হন, আবার আদিবাসী রমণী সন্তান কামনাতেও করমপূজা করেন। জাওয়া পরবটিও উর্বরতা কেন্দ্রিক— অধিক শস্য কামনায় কুমারী ও সদ্য বিবাহিতা নারীও এই পূজা করেন। গ্রাম বাংলায় নবান্ন উৎসব বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়— এই উৎসবও ফসল উৎপাদনের মঙ্গল কামনার সঙ্গে যুক্ত— মেদিনীপুরে পিংলা-ময়না অঞ্চলে পিপলেশ্বরী দেবীর পূজা প্রচলিত, মনে করা হয় দেবী সন্তুষ্ট হলে পিঁপড়ে ফসলের ক্ষতি করবে না।[৭] আদিবাসী সমাজের প্রায় জাতীয় উৎসব হল টুসু পরব, জনপ্রিয়তার বিচারে টুসু সর্বাগ্রে। সারা পৌষ মাস ধরে চলে টুসু-উৎসব। অনেকেই এই উৎসবকে প্রধানত আদিবাসী এবং তথাকথিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা অনুষ্ঠিত শস্যোৎসব বলে থাকেন।

মেদিনীপুরের আর্থ সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে মহিলাদের সুদূর অতীত থেকেই নিবিড় সংযোগ রয়েছে। গ্রামীণ নানা সমস্যার সমাধানের জন্য সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দেবীর কাছে পূজা দেন, মানত করেন। সমগ্র মেদিনীপুর জুড়ে বিভিন্ন লৌকিক দেবীদের আধিপত্য— লক্ষণীয় হল যে সকল লৌকিক দেবী এক সময় আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন পরবর্তী সময়ে তাঁদের অনেকেই উচ্চবর্ণের মধ্যে স্থান পেয়েছেন— বিভিন্ন বর্ণ-সমাজ-ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে-মানুষের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্যই নয় প্রাচীনকাল থেকেই নানা ব্রত

ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে— মানুষের জন্মপূর্ব সময় থেকে মৃত্যুর পরও সভ্যতার ইতিহাসে ব্রত এক অপরিহার্য ধারাবাহিকতা। মানুষের কামনার অনুষ্ঠান হল 'ব্রত'। বিভিন্ন ব্রতের মূল চরিত্র নারী কেন্দ্রিক হওয়ার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল যে প্রাচীন কালে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ প্রাথমিক স্তরে ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং নারীর ক্ষমতা, সম্মান ও স্বাধীনতাও ছিল যথেষ্ট। ঘর সংসারের দায়িত্ব, লৌকিক অচার অনুষ্ঠানের ভার নারী সাগ্রহে বহন করতেন এবং আদর্শগতভাবে নারীকে লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করা হত— ফলে নানা ব্রত ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্ব নারী-ই গ্রহণ করতেন।[৮]

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মহিলাদের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে পরাধীনতার সময় থেকেই। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত তথা তমলুকের নারী প্রাতঃস্মরণীয়া মাতঙ্গিনী হাজরা বয়সের বিরুদ্ধে সাহস ও বীরত্বে বলীয়ান হয়ে অহিংস-আত্মত্যাগের রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন গণ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ও শহীদ হয়ে। ১৯৪২-এ ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুকের অন্দোলনে গুলিতে আহত আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর এক বীরাঙ্গনা-বারাঙ্গনা সাবিত্রী দাসী।[৯] আবার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুলিশি নির্যাতনে গণ ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন মহিষাদল ও নন্দীগ্রামের সিন্ধুবালা মাইতি ও রাসি দাস। আবার মহিষাদলে প্রবোধ সামন্তের স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় ধর্ষিতা হয়েছেন। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিল— সেই সময় বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীন এক প্রশাসন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। সেই স্বাধীন সরকারের সৈন্যবাহিনীর এক প্রধান অংশ ছিল ভগিনীসেনা বাহিনী— যার অন্যতম এক সেনানী কুমুদিনী ডাকুয়া আজও রয়েছেন এবং সম্প্রতি ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকেও তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

অগ্নিযুগের যুব আন্দোলনে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রভাবিত আন্দোলনের প্রভাব মেদিনীপুরেও পড়েছিল। ১৯৪২-৪৩-এর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি-র জেলা ভিত্তিক সংগঠনে দেখা যায় যে মেদিনীপুরের গড়বেতা, কেশপুর, দাসপুর, শালবনী, ঘাঁটাল প্রভৃতি মহকুমায় ঘুরে ঘুরে কাজ করেছেন গীতা মুখার্জী, উষা চক্রবর্তী, সাধনা পাত্র, মণিকুন্তলা সেন, প্রতিমা ব্যানার্জী-র মত সক্রিয় কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব।[১০] তমলুকে প্রতিষ্ঠিত হয় সমিতির জেলা কমিটি - সেখান থেকে কৃষক-নারী ও মধ্যবিত্তের একাংশ নিয়ে শুরু হয় নতুন ধারার আন্দোলন— যার উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিষ্ট বিরোধী

প্রচার ও জনমত গঠন, বন্দী মুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেস, হিন্দু-মুসলীম নির্বিশেষে সকলকে একই ক্ষেত্রে উপনীত করা এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবা, নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্যবস্তু আদায় এবং আশ্রয় কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র খোলার ঐকান্তিক চেষ্টা।

স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে তার-ই একটি অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের নারীদের অবস্থান ও উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের বিষয়গুলি ভাবা যেতে পারে। ১৯৫১ থেকে ২০০১ সালের সরকারী হিসেবে জেলার নারী-শিক্ষার সাক্ষরতার হার শতকরা ১২.২৩ থেকে ৬৪.৬৩। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত নারীর পরিসংখ্যান বিচারে দেখা যায় যে যেখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কর্মরতা নারীর সংখ্যা ১৮.০৮ জন সেখানে মেদিনীপুরে এই সংখ্যা ২২.৭৯ জন— বিষয়টি লক্ষনীয়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও মুসলীম নারীরাও অগ্রণী হচ্ছেন। সদর মেদিনীপুরের মুসলীম গালর্স হস্টেলের সুপার আমিনা খান[১১] বলেন যে, যেহেতু তাঁদের ভবনটি ওয়াকফ্ (WAQF) এর নিয়ন্ত্রাধীন তাই তাঁরা সরকারী সাহায্য বিশেষ পান না। বর্তমানে আবাসিকা সংখ্যা ২২ জন। এঁদের মধ্যে আসমিনা খান সাহানা সিরিন ও ফরিদা খাতুন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। এখানকার-ই কয়েকটি মুসলীম পরিবারের মহিলাগণ Microbiology বা Textile Engineering নিয়ে কলকাতায় পড়ছেন। শুধু তাই নয় মুসলিম পরিবারগুলিতে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন তাঁরাও নিজ কন্যাদেরও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন— প্রয়োজনে প্রাথমিকস্তর থেকেই কন্যাদের ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হচ্ছে। পুত্রের প্রতি যে আশা থেকে পিতা-মাতাগণ সর্বস্ব বিনিয়োগ করতেন এখন অন্তত বেশ কয়েকটি পরিবারের (হিন্দু-মুসলীম উভয়ক্ষেত্রেই) অভিভাবকগণ মনে করেন যে কন্যার ভূমিকাও একইরূপ হওয়া সম্ভব এবং কন্যারও পুত্রের মতই প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

মুসলীম মহিলাদের দাম্পত্য সমস্যার অন্যতম বিষয় তালাক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আমিনা খান তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলেন যে বহুক্ষেত্রেই অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের অভাব মহিলাদের এরূপ সমস্যায় ফেলে। উপরন্তু বিশুদ্ধ কোরান অনুসারে প্রচলিত তালাক ব্যবস্থা মোটেই গ্রাহ্য নয়। আমিনা খান ব্যক্তি জীবনের নানা অসহনীয় পরিস্থিতিতে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করে মনে করেন যে মুসলীম মহিলাদের সর্বাগ্রে শিক্ষার প্রয়োজন যা তাঁদের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবে। অত্যন্ত নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক

নানা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মানতু আহ্‌মেদ[১২] এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে উনি বলেন যে এখন নিম্নবিত্ত মুসলীম মহিলাগণও মনে করেন যে তালাক উচ্চারণ অনেক সময়ই মূল্যহীন, উষ্মার বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং এজন্য তাঁরা নিজেদের দাবীত্যাগ করেন না এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন NGO গুলি কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা নেয়। মেদিনীপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী রোশেনারা খান মহিলাদের আত্মসম্মান, স্বাধীনতা রক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য নারীর শিক্ষা ও পুরুষের সহযোগিতা দুটিকেই গুরুত্ব দেন।[১৩]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। স্বল্প পরিসরে মেদিনীপুরের প্রেক্ষাপটে নারী সম্পর্কিত আলোচনা-খণ্ডিত অংশমাত্র। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যখন ১৯৭৫-৮৫ সালকে নারী দশক রূপে চিহ্নিত করা হয়— তখন নারীর অধিকার সমূহকে চিহ্নিত করাও জরুরী হয়ে ওঠে।[১৪] এই চিহ্নিত করণ তখনই নারীর পক্ষে যায় যখন শিক্ষা তাকে সচেতন করে— যেহেতু মেদিনীপুরের জনগোষ্ঠীর অনেকটাই আদিবাসী সমাজ— তাই সর্বদা পুঁথিগত বিদ্যালাভ সম্ভব না হলেও নানা উপায়ে জীবন উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নারী সম্পর্কিত প্রথাগত ধারণা— আদর্শ স্ত্রী বা মাতা এ দুটি ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেও নারীকে আদর্শ নাগরিক হতে হলে তাঁর প্রয়োজন তাঁর অন্তরস্থ শক্তির সুনিপুণ সুসংহত বহিঃপ্রকাশ। সমাজে লিঙ্গসমস্যা তৎসারিত নানা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন রয়েছে— নারী শক্তির প্রকাশ সেখানে দৃঢ় ও যুক্তিবাদী হওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে শেফালী মৈত্র[১৫] মনে করেন প্রাত্যহিক জীবনে নারী নানাভাবে লিঙ্গ সমস্যার শিকার হন— সেক্ষেত্রে আত্মসচেতন হওয়া একান্ত জরুরী।

### সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) পশ্চিমবঙ্গ-মেদিনীপুর জেলা সংখ্যা (১৪১০)— তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জানুয়ারী-২০০৪, পৃ. ৭, ৮, ৮, ১১।

২) সারণি-৭-জনসংখ্যা, তফসিলি, আদিবাসী, ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ-মেদিনীপুর জেলা সংখ্যা, পৃ. ১১৫।

৩) Rural Development Association - Activity Report-2003-2004, Mirzabazar, Midnapur, p. 1-19.

৪) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার — নন্দিতা ভট্টাচার্য্য, নেহেরু যুব কেন্দ্র, মেদিনীপুর।

৫) Yojana-4 Development Monthly - January-2005, Vol-49, Women's Rights - Gender and Planning - Devika Paul, p. 35-37.

৬) Yojana - January-2005, Vol-49, p. 37.

৭) বাংলা লোকসংগীতে লোক জগৎ ও লোক মানস— ডঃ চিত্ত রঞ্জন মাইতি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, সুমন প্রকাশন, অমলেন্দু মণ্ডল, ১৬০ মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬, পৃ. ৩৯।

৮) মেয়েলি ব্রতঃ — সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ - সুগত সেনগুপ্ত, পৃ. ১৩১ (মূল গ্রন্থ মেয়েলি ব্রত বিষয়ে শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত ১৯৯৫)।

৯) অবিভক্ত তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রাম — তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার রাধাকৃষ্ণ-বাড়ী, পৃ. ১৩৯।

১০) স্বাধীনতা সংগ্রামে বাকলার ছাত্রী সমাজ ঃ একটি সামগ্রিক রূপরেখা— সুস্নাত দাস, মূল গ্রন্থ— মুক্তি সংগ্রামে বাকলার ছাত্র সমাজ — সম্পাদনা বরুণ দে, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ১৯৯২, পৃ. ৮৩-৮৫।

১১) ব্যক্তিগত সাক্ষৎকার— আমিনা খান — মুসলীম গালর্স হস্টেল, সিপাই বাজার মেদিনীপুর।

১২) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার— মানতু আহমেদ — Secretary, Midnapur, Progressive SC/ST Minority Development Association.

১৩) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার— দূরদর্শন ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী রোশেনারা খান।

১৪) নারী শিক্ষা ও নারী বিদ্যা চর্চা— রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, মূলগ্রন্থ— ইতিহাসে নারী : শিক্ষা, পৃ. ১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, বেথুন কলেজ।

১৫) Shefali Moitra - Feminist Ethics, Dept. of History, Jadavpur University.

# নারীর ওপর যুদ্ধের প্রভাব ঃ তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে

পারমিতা মহারত্ন

এটা দেখা গেছে যে, যে কোন ধরনের যুদ্ধ তা সে প্রথাগত সামরিক যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদমূলক যুদ্ধ বা জাতিগত দাঙ্গা, যাই-ই হোক না কেন— প্রায় একইরকমভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে নারী জাতিকে। নারীজাতির ওপর যুদ্ধের নানাবিধ প্রভাবের কথা রাধিকা কুমারস্বামী, রীতা মানচন্দ ও অনুরাধা এম. চেনয়মের গবেষণায় নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকিত হয়েছে।[১] নারীজাতির ওপর যুদ্ধ কি ধরনের প্রভাব ফেলে এ ব্যাপারে রাধিকা কুমারস্বামীর রচনা থেকে অন্তত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন দিকের কথা জানতে পারা যায় ঃ

১. যুদ্ধের সময় তারা প্রায়শই প্রত্যক্ষভাবে হিংসার বলি হয় কিংবা ধর্ষণ, খুন বা পঙ্গুত্বের শিকার হয়।

২. বিশাল সংখ্যক উদ্বাস্তু ও গৃহচ্যুত মানুষের মধ্যে বেশীরভাগই নারী ও শিশু যারা প্রায়শই বাস করতে বাধ্য হয় বিভিন্ন উদ্বাস্তু বা শরণার্থী শিবিরে বা অন্যান্য সমাজকল্যাণ কেন্দ্রে।

৩. যুদ্ধ শেষে দেখা যায় একটা বিশাল সংখ্যক নারী স্বামীহারা বা বিধবা যাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব ও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

৪. তারা প্রায়শই পতিতাবৃত্তি বা দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সেনাশিবিরের চাহিদা মেটানোর কারণে। এটা প্রথাগত সামরিক যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ঘটে।

৫. শেষ পর্যন্ত, যুদ্ধে নারী হয়ে ওঠে প্রথম সারিতে যুদ্ধরত একজন যোদ্ধা।[২]

দক্ষিণ এশিয়ায় এইসব সমস্যা বিশেষভাবে দেখা যায় "কিন্তু এই সমস্যা জানা-বোঝার ক্ষেত্রে খুব কম উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা পুনর্নির্মাণ বা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মসূচী কিছুই প্রায় নেওয়া হয়নি"।[৩]

যুদ্ধের সময় নারী ধর্ষিত হয়। আর ধর্ষণ কিংবা বলপূর্বক গর্ভসঞ্চার ঘটানো এখন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের অন্যতম এক কৌশলও বটে, যাতে বিরোধীপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি

করা যায় বা অস্বস্তিতে রাখা যায় — এমনটিই দেখা গেছে বস্‌নিয়া বা হেরজেগোভিনার যুদ্ধেও। ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছে ভয়ের আবহাওয়া তৈরীর ক্ষেত্রে, নারীর প্রতি অবমাননা এবং পুরুষের প্রতি এক অপমানকর অবস্থা সৃষ্টি করার অস্ত্র হিসেবে। "নারীকে রক্ষা করার সামর্থ্যহীনতা পুরুষের পৌরুষে আঘাতের একটি উপায়"।[৪] ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পিছুহটা পাকিস্তানি সেনারা প্রায় দুলক্ষ বাঙালী নারীকে ধর্ষণ করেছিল। আরও সাম্প্রতিককালে এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়া, গুয়াতেমালা, রাওয়ান্ডা ও বুরুন্ডিতে। শুধুমাত্র পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ায় ধর্ষিত নারীর সংখ্যা কুড়ি থেকে ষাট হাজারের মধ্যে এবং রাওয়ান্ডায় ষাট হাজার। ঘটনা হল এই যে, নারীকেই এই লজ্জা বহন করতে হয়েছে আর তারপরে তাকে করা হয়েছে সমাজচ্যুত বা সমাজ থেকে নির্বাসিত"।[৫]

যুদ্ধ সাধারণতঃ জন্ম দেয় নানা ধরনের উন্মাদনার, যার ফলে পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া সেনাবাহিনী কিংবা সাধারণ মানুষ নারী ধর্ষণের মতো কাজে উৎসাহী হয়ে ওঠে, যেহেতু তারা সে সময় বেশ সচেতন থাকে যে, এ ব্যাপারে কোনো শাস্তিই তাদের ভোগ করতে হবে না। সবধরনের যুদ্ধের ক্ষেত্রেই এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং নারীর দুর্দশার এটা একটা বৃহৎ কারণও বটে। আন্তর্জাতিক আইন থেকে দেখা যায়, যে দুর্দশা নারীকে ভোগ করতে হয় তাতে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না। বিভিন্ন দেশের সরকারের বক্তব্য এই যে, যুদ্ধের সময় যে সব ধর্ষণের ঘটনা ঘটে তা আদৌ কোন যুদ্ধাপরাধ নয়।[৬] তবে সম্প্রতি "আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ইন্টারন্যাশানাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট') বিধানে যুদ্ধের সময়ে ঘটা যৌন-নিগ্রহকে একই সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধ ও মানবতার প্রতি অবমাননা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ......... এদিক থেকে দেখতে গেলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দোষীদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমান শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে"।[৭]

যুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ার ফলেও নারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাঁরা বিশ্বের উদ্বাস্তু বা গৃহহারা মানুষদের মধ্যে নারী ও শিশুর ভাগ শতকরা ৭০-৮০ শতাংশ। এই উদাস্তু শিবিরে যাওয়ার পথেই নারীকে ধর্ষিত হতে হয়— এমন তথ্যও বিরল নয়। যেহেতু যুদ্ধের ফলে গৃহচ্যুতি আর সে কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া পারিবারিক জীবন— এইসব নারীকে শরণার্থী শিবিরে এসেও প্রায়শই তাদের স্বামীদের কাছ থেকেও নির্যাতিত হতে হয়। আবার কখনও কখনও এদেরকে ত্রাণশিবিরের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকেও যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হয়। সাম্প্রতিককালে আফ্রিকায় ত্রাণকর্মীদের থেকে শিশুরাও যৌন-নিগৃহীত হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এইসব নারী ও শিশুদের প্রতিবাদ

করার ক্ষমতা নেই কারণ তাদের কোথাও যাবার থাকে না ফলে তাদের এদের অনুগ্রহে থাকতে হয়।[৮]

অবশ্য, প্রতিটি উদ্বাস্তু নারীই এইরকম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে বাস করেনা বলেও যুক্তি দেখানো হয়েছে। কার্যত, কিছু নারী প্রকৃতভাবেই নিজেদের ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলছে বলে ধারীনী রাজসিংঘ সেনানায়কের মতো পণ্ডিতরাও উল্লেখ করেছেন।[৯] তারা অন্দরমহল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে বহির্বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সুস্থভাবে বাঁচার উপযোগী কোন কাজও খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পরিবারে যারা তাঁদের ওপর নির্ভশীল তাদের হয়ে এইসব নারীরা সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে শুরু করেছেন এবং মনে হয় এদের জীবনের পূর্ণ দায়িত্বও তাঁরা নিতে পারবেন। যদিও বেশীরভাগ সময় এইসব নারী নিচুমানের কাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, তবুও তাঁরা উঠে আসছেন এতটাই জোরের সঙ্গে যে, বহির্জগতের মুখোমুখি হতে আজ তারা সম্পূর্ণ তৈরী।[১০]

যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হয় বিশালসংখ্যক স্বামীহারা অর্থাৎ বিধবা নারীর, যারা কোনো জায়গা থেকেই কোনো সহায়তা পায় না, এমনকি দেশের সরকারের কাছ থেকেও নয়। সংসারে রোজগেরে ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে এইসব নারীরা এখন দিনতিপাত করার মতো অবস্থায়ও নেই। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, গভীর দারিদ্রের কবলে পড়া এইসব নারী কার্যত কোনো দেশীয় সরকার বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তাও পায় না। যেখানে নারী দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য এবং যাদের বেশীরভাগই নিরক্ষর ও কর্মহীন, সেই আফগানিস্তানের উদাহরণ টেনে বলা যায়, এইসব নারী তাদের পুরুষসঙ্গী হারানোর ফলে গভীর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।[১১] এইসব নারীর দুর্দশা মোচনের জন্য আই.সি.আর.সি-র পক্ষ থেকে সম্প্রতি কিছু কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে ইরাকে, এই ধরনের নিঃসহায় নারী ও শিশুদের ওপর প্রবল বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া পড়েছিল। যুদ্ধের ফলে ঘটা জলদূষণের কারণে হাজার হাজার নারী ও শিশুর জীবনহানি ঘটেছিল মূলত হাসপাতালের অব্যবস্থার কারণে।[১২] এই ধরনের নারীদের ওপর কর্মরত শ্রীলঙ্কার মনোবিদ ডঃ গামিলা সমরসিংঘের বক্তব্য অনুযায়ী, এইসব নারী প্রায়শই আত্মহনন প্রবণ হয়ে পড়লেও তাদের শিশুদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা বাঁচার লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[১৩] তবে বাস্তুহারা নারীদের মতো এইসব স্বামী স্বজনহারা নারীরাও এখন আত্মশক্তির প্রতি আস্থা খুঁজে পাচ্ছে এবং এক শক্তিশালী নারী হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলছে।

সৈনিকদের হাতেও নারীকে শোষিত হতে হয়। নবীন যুবক সৈন্যদের নিয়ে গড়া সেনাবাহিনীর ছাউনির পাশাপাশিই চলে পতিতালয় বা দেহব্যবসা। কখনও আবার কিছু কিছু ব্যক্তিও এইসব সেনা শিবিরের কাছাকাছি জায়গায় পতিতালয় চালায়। তবে কখনও কখনও অন্য ধরনের ব্যাপারও চোখে পড়ে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে ঘটেছিল। জাপানি সেনারা সেইসময় শিবিরের মধ্যেই পতিতালয় সংঘটিত করেছিল আর নারীকে পরিণত করেছিল "সেনাবহিনীর যৌন দাসত্বে"।[১৪] এরকম ঘটনা ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল বসনিয়া ও *সিয়েরা লিওনে* যেখানে বিপুল সংখ্যক জাতি সংঘের শান্তিরক্ষা কর্মীরা (ইউ.এন.পিস্ কিপারস্) উপস্থিত ছিলেন। সেনারা সাধারণত অল্পবয়সী বাচ্চাদেরই বেশী পছন্দ করে কারণ এইডস মহামারী সংক্রমণের সম্ভাবনা তাতে কম।[১৫]

কখনও কখনও এইসব নারী পতিতাবৃত্তিকেই বেশী কাম্য মনে করে কারণ বিকল্প পথ হিসেবে তার সামনে খোলা থাকে একমাত্র অনাহার। তারা ভাবে, যদি কোনভাবে তারা একবার বিদেশী শান্তিরক্ষা কর্মীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারে তাহলে সেটাই তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে যা তারা অন্য কোনভাবে অর্জন করতে পারবে না। এই জটিল পরিস্থিতির কারণে বহুনারীবাদী গোষ্ঠী এ ধরনের বলপূর্বক পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে কিন্তু স্বেচ্ছা পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে নয়। তারা বুঝেছেন যে, এইসব নারীকে তাদের বাঁচার ক্ষেত্রে কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে— যদি তাঁরা জীবন যাত্রা নির্বাহের উপায় হিসেবে পতিতাবৃত্তিকেই বেছে নিতে চান তাহলে সেই সুযোগই করে দেওয়া যে-পর্যন্ত না তা কোন অশুভ ফলাফলের জন্ম দিচ্ছে। নারীবাদী গোষ্ঠী ও অসরকারি সংস্থার (এন.জি.ও) উচিত এইসব নারীদের রক্ষা করা এবং তাদের বেছে নেওয়া পথের অর্থ সঠিকভাবে তাদের কাছে তুলে ধরা।[১৬]

শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যুদ্ধে নারী ক্রমশই যোদ্ধা হিসেবে উঠে আসছে। "সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ নারীর শক্তিশালী হয়ে ওঠার একটা দিক কিনা, সে ব্যাপারে একটা প্রাথমিক বিতর্ক রয়েই যাচ্ছে"।[১৭] কয়েকজন নারী অবশ্য এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, লিবারেশন্ টাইগারস্ অব তামিল ইলামের (এল.টি.টি.ই) নারী সদস্যরা অনান্য সাধারণ নারীর থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। যেহেতু তারা বিভিন্ন শিবির ও কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব প্রাপ্ত, তাই তারা এতটাই শক্তিশালীভাবে গড়ে উঠেছে যে, তারা প্রায়ই নানা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাকে কাজে রূপান্তরিতও করতে সক্ষম। আর এভাবেই একজন পুরুষ যেরকম কাজ করতে পারে তারাও ঠিক সেই একইরকম কাজ করতে পারছে। নিঃসন্দেহে এটা একটা যথেষ্ট প্রত্যয়ী যুক্তি। কিন্তু এর একটা

প্রতিযুক্তিও আছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, সেনাবাহিনীতে নারী সাধারণত নিচুমানের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না। তাই উল্লেখ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী তারা কখনই হতে পারে না। সুতরাং কুমারস্বামীর তুলে ধরা প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে যে তারা এজেন্ট না কি পরিস্থিতির শিকার? (Agents or Victims?)[১৮]

যুদ্ধশেষে, এইসব নারীর সমাজে পুনর্বাসনের বিষয়টিও একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে। যেমন রাধিকা কুমারস্বামী উল্লেখ করেছেন, কলম্বোয় এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হওয়া নারীদের কথা। সাধারণ শান্তির সময় পুরুষরা তাদের স্ত্রী হিসাবে এই ধরনের নারীদের গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক যদিও তারা হয়ত একইসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করেছে। এছাড়াও যুদ্ধের সময় এইসব নারীরা যে ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে তা তাদের নিজেদের সমাজে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সারা বিশ্বের দিকে যদি আমরা একবার দৃষ্টি সরাই তাহলে দেখতে পাবো যে, বেশীরভাগ পুনর্গঠন-সংক্রান্ত কর্মসূচীতে এই ধরনের নারী যোদ্ধাদের পুনর্বাসনের ওপরে কোন রকম নজরই দেওয়া হয়নি। সুতরাং সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে এবং "যদি তাদেরকে শান্তিপূর্ণ সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে আগে প্রয়োজন এই সমস্যার মোকাবিলা করা"।[১৯]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো এই যে, যুদ্ধের সময় নারীকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হয়— এজেন্ট না কি পরিস্থিতির শিকার? তবে নারী যে চিরকাল চক্রান্তের শিকার, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়— এরকম ছবিও প্রায়শই আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বের নারীকে এইভাবে তুলে ধবার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমই মূলত দায়ী। রীতা মানচন্দ প্রকৃতই সঠিক ভাষাটি প্রয়োগ করেছেন, "দুর্দ্দশাগ্রস্ত মাতা (Grieving Mothers)"।[২০] তবে গবেষকরা একথাও উল্লেখ করেছেন যে, এইসব নারী সাধারণত যথেষ্ট শক্তিশালী, তৎপর ও দক্ষ। আর এটাই ইউনাইটেড্ নেশানস্ সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই প্রস্তাবটি পাশ করতে বাধ্য করেছে, যাতে বলা হয়েছে যে শান্তিরক্ষার প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অবশ্যই অংশগ্রহণ থাকা উচিত। "একটা উদ্বাস্তু শিবিরে কিংবা যুদ্ধের একজন স্বজনহারা স্বামীহারার দিনগুজরানের বিষয়েই শুধু নয় বরং ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী দিশার বিষয়েই নারীর কর্তৃত্বের স্বীকৃতিই হলো নারী, হিংসা ও যুদ্ধের বিষয়ে আমাদের জানা বোঝার ক্ষেত্রটির কেন্দ্র"।[২১]

কুমারস্বামী একথাও উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীলঙ্কার নারীবাদী গোষ্ঠীরা সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে যা সরকার এবং এল.টি.টি.ই-কে একটি "জেন্ডার

কমিটি" গঠন করতে বাধ্য করেছে। সেখানে প্রখ্যাত নারীবাদীরাও আছেন, যারা শান্তি রক্ষার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। একে একটা বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে কুমারস্বামী দাবী করেছেন।[২২] পলা ব্যানার্জিও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে হিংসার অবসানের ব্যাপারে বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠনের আলাপ আলোচনার প্রয়াস প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন গুয়াহাটির মাতৃমঞ্চের কথা, মণিপুরের মেইরা পাইবিস্ বা Torch bearers দের কথা এবং নাগাল্যান্ডের নাগা মাতৃসমিতির কথা (Naga Mothers Association) উত্তর-পূর্ব ভারতে শান্তিরক্ষার রাজনীতিতে নাগা মাতৃসমিতি উল্লেখযোগ্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।[২৩]

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (International Humanitarian Law) লিঙ্গ নির্বিশেষে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সুরক্ষার জন্য তাদের বিশেষ আইন আছে। যদি এই আইনগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের দুর্দশা অনেকটাই মোচন করা যাবে।

ভারতবর্ষের কথা যদি ধরা যায় তাহলে আমরা দেখবো যে গুজরাটে নারীদের জন্য অর্থ উপার্জক অনেক প্রকল্পের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য তা রূপায়িত হচ্ছে না।[২৪] আবার কাশ্মীরেও সন্ত্রাসবাদের হেতু মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মার্চ ২০০০ সালে J & K State Commission for Women গঠিত হয়। কিন্তু নারী সমস্যা নিয়ে এযাবৎ তা বিশেষ কাজ করেনি। এই কমিশনের প্রধান হিসেবেও বহুদিন কাউকে নিয়োগ করা যায়নি।[২৫]

উপসংহারে পৌঁছে কুমারস্বামীকে উদ্ধৃত করে বলা যায় ঃ "যদি আমরা এটা না বুঝতে পারি যে নারীর অংশগ্রহণের অর্থ শুধুমাত্র কিছু অগুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা নয়, এর অর্থ কাঠামোগত পরিবর্তন যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে নারীর নিজের সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্র, তাহলে এটা নিশ্চিত করা প্রায় সম্ভবই নয় যে. যে নারী একদিন যুদ্ধের কবল থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে, আজ সে শান্তির সুফল লাভ করতে পারবে"।[২৬]

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) রাধিকা কুমারস্বামী, "উওমেন অ্যান্ড ওয়ার", দ্য লিটল্ ম্যাগাজিন, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, ২০০৪।

রীতা মানচন্দ (সম্পাদিত), উওমেন, ওয়ার এ্যান্ড পিস্ ইন সাউথ এশিয়া, বিয়ন্ড ভিকটিমহুড টু এজেন্সি, সেজ্ নতুন দিল্লী, থাউজেন্ড ওক্স্, লন্ডন, ২০০১।

অনুরাধা এম. চেনয়, মিলিটারিজিম এ্যান্ড উওমেন্ ইন সাউথ এশিয়া, কালি ফর উওমেন, নতুন দিল্লী, ২০০২।

২) কুমারস্বামী, পৃ. ৭।

৩) তদেব।

৪) তদেব।

৫) চেনয়, পৃ. ২৮।

৬) কুমারস্বামী, পৃ. ৭।

৭) তদেব।

৮) তদেব, পৃ. ৭, ৮।

৯) তদেব, পৃ ৮।

১০) তদেব।

১১) চেনয়, পৃ. ২৯।

১২) তদেব, পৃ. ৩০।

১৩) কুমারস্বামী, পৃ. ৮।

১৪) তদেব।

১৫) তদেব।

১৬) তদেব।

১৭) তদেব, পৃ. ৯।

১৮) তদেব।

১৯) তদেব।

২০) মানচন্দ, পৃ. ৯।

২১) কুমারস্বামী, পৃ. ৯।

২২) তদেব।

২৩) পলা ব্যানার্জি, "উওমেন্স ইন্টারভেনশন ফর পিস্ ইন দি নর্থ-ইস্ট" জেন্ডার এ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি বিষয়ে পঠিত, স্কুল অব উওমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

২৪) মানচন্দ, পৃ. ৩২।

২৫) "দি স্টেট্স্ম্যান্" পত্রিকা, ১৪ সেপ্টেম্বব. ২০০৪।

২৬) কুমারস্বামী, পৃ. ৯।

# "যবনিকার-অন্তরালে নারী ছিল যখন"

অনুরাধা ঘোষ

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থে অভিনয় কলাশিল্পকে চৌষট্টিকলার-অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীদের সংস্কৃত সাহিত্যে নটনটী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নট ও নটী উভয় মিলে নাটক উপস্থাপন করতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে কুবলযা নামে এক নটীর উল্লেখ পাই। বাংলা নাটকের শুরুতেই রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে পুরুষের মতো নারীও উজ্জ্বল অভিনব ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের ধারাবাহিক কর্মধারা বিশ্লেষণ বাংলা নাটকের ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়েছে বারবার। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন অভিনেত্রীর জীবন বা অভিনয় প্রতিভা নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচিত হলেও অভিনেত্রীদের রঙ্গালয়ে আবির্ভাবের পর থেকে যে নতুন নতুন রঙ্গালয় গড়ে উঠল এবং সেখানে অভিনীত স্ত্রী চরিত্রে কোন্ কোন্ অভিনেত্রীরা রূপদান করলেন তার সামগ্রিক অনুসন্ধান আজও হয়নি। বর্তমান নিবন্ধে বঙ্গরঙ্গালয়ের কিছু বিখ্যাত অভিনেত্রীদের জীবন ও কর্মধারা অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে।

রুশ ভদ্রলোক হেরেসিম লেবেডেফ ১৭৯৫-এর ২৭ নভেম্বর— The Bengali Theatre এ কাল্পনিক সংবদল (The Disguise) মঞ্চস্থ করে যেমন বাংলা থিয়েটারের সূত্রপাত ঘটালেন ঠিক তেমনিভাবে নারীচরিত্রে নারীদের নিয়ে অভিনয় করিয়ে বাংলা নাট্যমঞ্চের উত্তরাধিকার পুরুষের মতো নারীকেও প্রদান করলেন।

লেবেডেফের থিয়েটারকে অভিনেত্রীদের মান এবং কোথা থেকে তাদের সংগ্রহ করা হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঢাকা শহরের বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হায়াৎ মামুদের গ্রন্থে আমরা দেখি যে সাম্বরস্কিকে লেখা চিঠিতে লেবেডেফ তিনজন এদেশীয় অভিনেত্রী নিয়োগের উল্লেখ করেছেন। এই পত্রকে কেন্দ্র করে অভিনেত্রীদের সম্পর্কে কয়েকটি অনুমান লক্ষিত হয়।

১) অভিনেত্রীরা কোনো যাত্রাদল থেকে এসেছিলেন।

২) অভিনেত্রীদের ঝুমুর বা কীর্তনীয়া দল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

৩) তাঁরা ছিলেন বারবণিতা (পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ঃ বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা)।[১]

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বাঙালীরাও থিয়েটার চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের গৃহে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে শৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক নাট্যাভিনয় শুরু হয়। প্রসন্ন ঠাকুর নামে এক নাট্যানুরাগী বাঙালী খুললেন হিন্দু থিয়েটার। ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারের নবীন বসুর নিজস্ব রঙ্গালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক মঞ্চস্থ কালে সমস্যা দেখা দিল অভিনেত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে। কারণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের পক্ষে তখন অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবে সুযোগ ছিল না। অবশেষে পতিতা-পল্লীর রমণীরা ঐ অবস্থা সামলে দিল। জয়দুর্গা, রাধমণি ও রাজকুমারীর চরিত্রে বারাঙ্গনারা রূপদান করেন। নবীনচন্দ্র লেবেডেফের পথ অনুসরণ করে বারাঙ্গনাপল্লী থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু বারাঙ্গনা দর্শনে কলাসরস্বতীর পবিত্রতা অশুচি হবে বা নাট্যমন্দির হয়ে পড়বে কামনাকুঞ্জ ইত্যাদি অজস্র যুক্তি দেখিয়ে বাংলার নব্যশিক্ষিত সমাজ বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজ আপত্তি তুললেন। তবুও সেকালের 'Hindu Pioneer' পত্রিকার প্রতিবেদনে স্ত্রী চরিত্রাভিনেত্রীদের চমৎকার অভিনয়ের প্রশংসা করা হল। কিন্তু ঝড় তুলল Englishman and Military Chronicle পত্রিকা। হিন্দু পাইওনিয়রের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হল। নবীন বসুর পক্ষে যুক্তিবাদীদের সমর্থন বিপক্ষবাদীদের নিন্দা ও সমালোচনার বন্যায় খড়কুটোর মত ভেসে গেল। ফলে নারীর কাছ থেকে মঞ্চের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। এইভাবে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। কিন্তু নবীন চন্দ্রের বাড়িতে স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রীদের অভিনয় যে একান্তভাবে স্বাভাবিক ছিল তা জোর করে ভোলানো সম্ভব হল না। ১৮৭৩ খৃঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে হাওড়ায় Oriental Theatre-এ অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয়ের ধারা শুরু হল। এই পরিবর্তনের যুগেই আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হতে আশুতোষ ঘোষের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ স্ত্রী ভূমিকায় অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনয়ের প্রয়াসকে সমর্থন করলেন। ৯নং বিডন স্ট্রীটে বাংলার প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হল যার দুই প্রধান স্তম্ভ ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র ঘোষ। ভালভাবে থিয়েটার পরিচালনার জন্য গঠিত হল একটি উপদেষ্টা কমিটি। কমিটিতে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সেখানে মধুসূদন দত্তর প্রস্তাব অনুযায়ী স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অভিনেত্রী নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মাইকেলের মতে পুরুষ দ্বারা স্ত্রী চরিত্রগুলি অভিনীত হলে সেই অভিনয় কখনো স্বাভাবিক, জীবন্ত হতে পারে

না। শরৎচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেন।[২]

'ভারত সংস্কারক' পত্রিকার ২২শে আগষ্টের একটি মন্তব্যের দিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। "এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম, ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।" 'মধ্যস্থ' পত্রিকার সম্পাদক মনোমোহন বসু অভিনেত্রীদের নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্‌যোগকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। অভিনেত্রী নিয়োগে বিরোধী মনোমোহন লিখলেন— "এদেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রী রূপে প্রাপ্ত হওয়া ........ অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ ...... বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবে বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গ ভূমিতে রঙ্গ করিবেন, ...... ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহা কি সহ্য হয়?"[৩]

তবুও এত সমালোচনা, নিন্দা উপেক্ষা করেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে রঙ্গনায়িকারা অধিকার আদায় করে নিলেন। সংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষ শাসিত সমাজ প্রথমে নারীদের অভিনয়বৃত্তির গ্রহণের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালেও নানা যুক্তিতে আত্মসাৎ করে নিল নারীর অংশটি। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় শুরু হলেও ন্যাশানাল থিয়েটারে স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করতেন। এরপর অবশ্য বেঙ্গল থিয়েটারের সাফল্য দেখে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনেত্রী নেওয়া শুরু হয়। শরৎচন্দ্র ঘোষ তাঁর বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম থেকে অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় করার জন্য নিষিদ্ধপল্লী থেকে চারজন অভিনেত্রী নিয়ে আসেন— এঁরা হলেন গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী ও শ্যামা। এঁদের মধ্যে গোলাপসুন্দরী সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৮৭৩ সালে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা পান। এরপর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'পুরুবিক্রম' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন।

এদিকে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অসূর্যম্পশ্যা নারীদের অন্তঃপুরে এক নতুন যুগের আলো দেখা দিল। কিন্তু সে আলো পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা নিয়ে পৌঁছল না। কোথাও নারীরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন কোথাও পুরুষের সংস্পর্শে, উৎসাহে ও প্রসারে আধুনিকতার নামে উৎকট স্বেচ্ছাচারিতা এল, পদস্খলনের পথ বিস্তৃত হল। কলকাতার নাগরিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে বারাঙ্গনারা এসে ভিড় জমাতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে বারাঙ্গনাদের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারে কলকাতার ভদ্রসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বারাঙ্গনা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন গড়ে ওঠার খবর পাওয়া যায়। অতএব বাঁচার তাগিদে তারা অন্যপথ খুঁজতে লাগলেন— সেই পথগুলির অন্যতম হল থিয়েটার, তাঁরা নাচ, গান শিখতে শুরু করলেন, শিক্ষার অধিকার পেতে চাইলেন। বারাঙ্গনা পল্লীতে সাড়া পড়ে গেল। যেহেতু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ভদ্রসন্তানেরা অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করার জন্য হেয় বলে গণ্য হতেন সেহেতু উপেন্দ্রনাথ দাস বারাঙ্গনাদের বিবাহ দিয়ে ঘর সংসারী করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন এবং গোলাপসুন্দরীর সঙ্গে গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামে এক অল্পবয়স্ক অভিনেতার বিবাহ দেন। এরপরে গোলাপসুন্দরী মিসেস সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিত হন। এই বিবাহ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে, গোষ্ঠ বিহারী আত্মীয় স্বজনের-ধিক্কার ও গঞ্জনায় বাধ্য হয়ে বিলাতে চলে যান।

এদিকে একটি কন্যাসন্তানের জননী সুকুমারী অসহায় রিক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে থাকেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদে 'অপূর্বসতী' নামে একটি বিয়োগান্তক সামাজিক নাটক রচনা করেন। এক বারাঙ্গনার জীবনী নিয়ে এই নাটক রচিত। মনে হয় অভিনয় না করে গৃহবধূরূপে নেপথ্যে থেকে রঙ্গমঞ্চের সেবার্থে নাট্যরচনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত প্রতিঘাতে পুনরায় অভিনয় পেশায় ফিরে আসেন।

রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় শতকের অভিনেত্রীদের মধ্যে নটীকুলোত্তমা বিনোদিনী দাসী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি দাসী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিনোদিনীর অভিনয় জীবনের পেছনে লুকিয়ে আছে অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার কথা। ১৪৫নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে দিদিমার বাড়িতে বাস করতেন। ঐ বাড়ির এক ভাড়াটে ছিলেন গঙ্গামণি বা গঙ্গাবাঈজী। এঁর কাছে ৭/৮ বছর বয়সে বিনোদিনীর সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় এবং গঙ্গামণি বিনোদিনীর দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হয়ে দিদিমাকে বলেন নাতনীকে থিয়েটারে যোগ দেবার জন্য তাতে জলপানিবাবদ কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। এইভাবে ১২ বছর বয়সে বিনোদিনীর অভিনয় জীবন শুরু হয়। বিনোদিনীর রূপমুগ্ধ গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি নামে জনৈক মাড়োয়ারী যুবক বিনোদিনীকে সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার শর্তে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসুর কাছে একটি নতুন থিয়েটার গড়ার প্রস্তাব দেন। গুর্মুখ রায় ৫০,০০০ টাকা দিতে চান বিনোদিনীকে। কিন্তু বিনোদিনী অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করে গুর্মুখকে অনুরোধ করেন থিয়েটার গড়ার জন্য। গুর্মুখের অর্থে বিডন স্ট্রীটে থিয়েটার ভবন নির্মিত হয়। বিনোদিনীর নামে থিয়েটার গৃহের নামকরণ হবে এই প্রস্তাব উঠলে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কেউ থিয়েটার দেখতে আসবে না পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। তাই বাদ সাদ দিয়ে মাতব্বররা ঠিক করলেন বিনোদিনীর আদ্যক্ষর অনুযায়ী 'B'

থিয়েটার নাম রাখার সুপারিশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাইনবোর্ডে লেখা হল 'Star Theatre'।[৪] অভিনেত্রীদের আত্মত্যাগের গুরুত্ব সে যুগের সমাজের কর্তাব্যক্তিরা বুঝতে পারেননি। এদিকে আত্মীয় স্বজনের চাপে গুর্মুখ থিয়েটার বিক্রি করে বিনোদিনীর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং বিনোদিনীও জন্মের মত গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় নিলেন। ভগবৎচিন্তা ও সাহিত্য সাধনায় কেটেছে তাঁর শেষ দিনগুলি। বাংলার অভিনেত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আত্মচরিত লিখে গেছেন 'আমার জীবন'।

এযুগের বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের অন্যতম অভিনেত্রী ছিলেন কিরণবালা। এঁর জন্ম হয় এক নিষিদ্ধপল্লীতে। পিতৃপরিচয় হীনা কিরণবালা মাত্র ১৩ বছর বয়সে অভিনয় জীবনে প্রবেশ করে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পেরেছেন। বিনোদিনী যখন অভিনয় জীবনে ছেদ টেনে সংসার জীবনে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সময় তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলিতে রূপদান করলেন কিরণবালা। গিরিশবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থ ব্যয় করে কিরণবালাকে অভিনয় শেখাতে শুরু করেন ও অল্প দিনের মধ্যে সুদক্ষ নটীরূপে চিহ্নিত হলেন। কিরণবালার খ্যাতি যখন উচ্চশিখরে উঠতে শুরু করেছিল সেই সময় অকালমৃত্যু তাঁকে গ্রাস করে।

তিনকড়ি দাসী ছিলেন রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগের এক উজ্জ্বলতম তারকা। কলকাতার এক কুখ্যাত পল্লীতে তাঁর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের শখ ছিল, রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। বীণা থিয়েটারে থাকাকালীন 'মীরাবাঈ' নাটকে মীরার ভক্তিরস সিঞ্চিত ভূমিকাটি গান ও অভিনয়ে মূর্ত করেছিলেন। এরপরেই একটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনকড়ির রূপলাবণ্যে মুগ্ধ দুজন সুদর্শন যুবাপুরুষ তাঁর মায়ের কাছে প্রস্তাব রাখেন তিনকড়িকে তাঁদের রক্ষিতারূপে থাকতে হবে, এর বদলে তাঁরা প্রচুর টাকা দেবেন। কিন্তু তিনকড়িকে অভিনয় ছাড়তে হবে। বলাবাহুল্য তিনকড়ি রাজী হলেন না। মায়ের নিষেধ, তিরস্কার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে তেজীস্বভাবের তিনকড়ি থিয়েটার আঁকড়ে থাকলেন। অভিনেত্রী হিসাবে তিনকড়ি যখন অদ্বিতীয়া তখন ঘটল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ঘটনা; উত্তর কলকাতার এক ধনী ভদ্রলোকের নজর পড়ল তাঁর ওপর। তিনি তিনকড়িকে অভিনয় ছেড়ে পুরোপুরি তাঁর আশ্রিতা রূপে থাকার প্রস্তাব দিলেন; গিরিশচন্দ্র তিনকড়িকে অভিনয় ছাড়তে নিষেধ করলে ঐ ভদ্রলোক গিরিশচন্দ্রকে পথের কাঁটা ভেবে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু রাজেন চাটুজ্জ্যে নামে এক ভদ্রলোকের বুদ্ধির জোরে এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং সে যাত্রায় গিরিশবাবুর প্রাণরক্ষা হয়।[৫]

সে যুগে রঙ্গজগতের লোকদের মধ্যে গিরিশবাবু ও তিনকড়িকে নিয়ে প্রণয় ঘটিত যে সব গুজব শোনা যেত তার মধ্যে উপরোক্ত কাহিনীই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে তিনকড়ি রোগগ্রস্ত ও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

নাট্যশালার গোড়ার যুগে কুসুমকুমারী নামে এক অভিনেত্রী তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এঁরও জন্ম পরিচয় অজ্ঞাত। নাচে গানে পটু ছিলেন তবে শিক্ষা ছিল সাধারণ। ১৭ বছর বয়সে নগেন মুখুজ্জ্যের হাত ধরে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করতে আসেন। মঞ্চ জগতের দিক্‌পাল নটনাট্যকার অমরেন্দ্র নাথ দত্ত-র 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ যোগদান করেন ও তাঁরই শিক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন। অমরেন্দ্র নাথের সঙ্গে তাঁর প্রণয় গড়ে ওঠে এবং অমরেন্দ্র নাথের বাগমারীর বাগান বাড়িতে বাস করতেন। সুদীর্ঘ চার দশকের বেশী কর্মজীবনে বাংলায় প্রতিটি সাধারণ রঙ্গালয়ে কোন না কোন সময়ে তিনি হাজির হয়েছেন। শেষ জীবনের ১৫ বছর কাল অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে কেটেছে। নিজের বসতবাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে পরের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। রঙ্গ মঞ্চের 'মর্জিনা' রূপে তিনি পরিচিতা ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

বাংলার রঙ্গমঞ্চের আর এক খ্যাতনামা অভিনেত্রী ছিলেন নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী। হাতিবাগানের এক নিষিদ্ধপল্লীতে এঁর জন্ম। বিনোদিনীর প্রতিবেশিনী ছিলেন। সাত বছর বয়সে গিরিশ ঘোষের চৈতন্যলীলা নাটকে এক বালকের চরিত্রে রূপদান করেন ও ১৩ বছর বয়সে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন স্টার থিয়েটারে। প্রথম জীবনে অমৃতলাল মিত্র ও অমৃতলাল বসুর কাছে অভিনয় শিক্ষা গ্রহণ করেন ও পরে সঙ্গীত ও নৃত্য বিদ্যায় তালিম নেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাটকে শৈবলিনী চরিত্রে অভিনয় করে অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন। স্টার থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটার যোগদান করেন। তারার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অমরেন্দ্রনাথ পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে তাঁকে নিয়ে বাগান বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। ইতিমধ্যে কুসুমকুমারীকে কেন্দ্র করে উভয়ের সম্পর্কে চিড় ধরে এবং তারাসুন্দরীও অমরেন্দ্রনাথকে ছেড়ে নটনায়ক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করতে শুরু করেন। সেদিনের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে এটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল। ১৯২২ সালে পুত্র বিয়োগের পর তারাসুন্দরী নাট্যজগত থেকে বিদায় নেন, ধর্মের দিকে তাঁর মন টানে। ১৯২৫ সালে শিশিরকুমারের অনুরোধে আবার 'জনা', 'রিজিয়া' নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন ও ১৯২৬ সালে 'শ্রীদুর্গা

নাটকে দেবীদুর্গার ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটকের ভাষা আরম্ভ করতে গিয়ে নিজ অজ্ঞাতসারে অন্তর থেকে উৎসারিত হল কবিতা। তাঁর লেখা অজস্র কবিতা গান সে যুগের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মঞ্চাভিনয়ে তিনি পেয়েছিলেন অজস্র প্রশংসা আর অভিনন্দন কিন্তু সংসার জীবন ভরে উঠেছিল হতাশা আর বঞ্চনায়।

সবশেষে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের তৃতীয় দশকের দুই খ্যাতনামা অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী ও নরীসুন্দরীর অবদান উল্লেখ করে আলোচনা প্রসঙ্গ শেষ করব। নীরদাসুন্দরীর জন্ম উত্তর কলকাতার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তিতে। মাত্র ৯ বছর বয়সে কুসুমকুমারীর হাত ধরে অভিনয় জগতে আসেন। গিরিশচন্দ্রের 'রামানুজ' নাটকে অভিনয় কালে মা সারদাদেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে জরাগ্রস্ত হয়ে অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

এযুগের অপর খ্যাতনামা গায়িকা-অভিনেত্রী ছিলেন নরীসুন্দরী। ১৫ বছর বয়সে রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব, বহু নাটকের গান তাঁর কণ্ঠে গীত হয়ে জনসমাদৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' নাটকে সূর্যমুখীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। 'চন্দ্রশেখর' নাটকে দলনী বেগমের ভূমিকায় মর্মস্পর্শী অভিনয় করে খ্যাতির উচ্চশিখরে পৌঁছান। 'শ্রীদুর্গা' নাটকে পৃথিবীর চরিত্রে গানে ও অভিনয়ে দর্শকদের শেষ অভিবাদন জানান। ১৯৩৯ সালের ১লা জুন তাঁর দেহাবসান ঘটে।

সমগ্র আলোচনার সংক্ষিপ্তসার করলে দেখা যায় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত অভিনেত্রীরা অন্ধকার গলির ঘৃণিত *নর্ম্মনটী* জীবন থেকে অথবা সমাজের নীচুতলা থেকে এসেছিলেন 'রঙ্গনটী' হবার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। এঁরা থিয়েটারকে অকৃত্রিম ভালবেসে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছেন, প্রতারিত হয়েছেন। মহিলা শিল্পীদের দুঃখবেদনা অনুভব করা হত না, উপরন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হতো দুর্নাম দিয়ে লোকে মজা পেত। নাচে গানে অভিনয়ে দর্শকচিত্ত জয় করলেও চারিত্রিক সম্মান এঁদের ভাগ্যে জোটেনি। নরীসুন্দরীর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় এর সমর্থন মেলে; 'আমার জন্মের পর সাধু সমাজ আমায় বলিয়াছিলেন যে পুণ্যের ছাপমারা কুলে তোর যখন জন্ম নয় তখন তুই পাপ করতে থাক্ আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে থাকি।'[৬]

নটীদের ক্ষেত্রে পিতৃপ্রদত্ত নামের ব্যবহারের প্রচলন ছিল না, টেঁপি, পাঁচি এসব নামেই ডাকা হত। বঙ্গনটীদের কেউ ছিলেন পতিতা কেউ বা ছিলেন ধনী জমিদার পুত্রের রক্ষিতা। এঁদের অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। শেষ জীবনে এঁদের

জুটত শুধু হতাশা আর বঞ্চনা। অনেক নটী পরবর্তীকালে সংসারে ঢুকেও বিগত জীবনের দুর্নাম ঘোচাতে পারেন নি। অনেক সময় দেখা গেছে বিবাহিতা-কন্যারাই মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী নন। তবে কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিরিশ দশকের চারুবালা, ফিরোজাবালা, পূর্ণিমা প্রমুখ নটীরা অভিনয় জীবন থেকে সরে আসার পর স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সুখে সংসার করেছিলেন। অভিনেত্রী রেবা দেবী ছিলেন বনেদী বংশের কন্যা ও বধূ এবং অবশ্যই শিক্ষিতা। সংস্কারের বিধি নিষেধ গণ্ডী পেরিয়ে অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই সব বঙ্গনটীদের অবদান যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি, শিল্প প্রতিভার মূল্যায়ণ হয়নি। অথচ এঁদের প্রাণপাত পরিশ্রম, প্রেরণা, প্রতিদান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া বাংলা থিয়েটারের জগৎ কখনই এত বর্ণময় ও সৃষ্টিমুখর হতে পারত না। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ভাষায় ''আমাদের দেশীয় অভিনেত্রীকুল পঙ্কিল সমাজে হেয় বারবালাগণ হইতে সংগৃহীত হইলেও ...... ললিতকলা মন্দির তাহাদের আসন ...... অনেক উচ্চে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী— অমিত মৈত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩।
২) বাংলার নটনটী— দেবনারায়ণ গুপ্ত, সাহিত্যলোক, পৃ. ২২।
৩) রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী— অমিত মৈত্র, পৃ. ৯।
৪) কলকাতা পুরশ্রী, বিশেষ সংখ্যা— স্টার থিয়েটার পুনরুজ্জীবন, পৃ. ২৩।
৫) বাংলার নটনটী— দেবনারায়ণ গুপ্ত, পৃ. ৭২।
৬) তদেব— পৃ. ১৩১।

# নবজীবনের গান : ফ্যাসিবাদ বিরোধী পর্বে মহিলা শিল্পী

জাহানারা রায় চৌধুরী

বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদের দ্রুত উত্থান ও তার পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। এসব ঘটনার অভিঘাতে ভারতেও যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ তার বাইরে ছিল না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক অস্থিরতার সেই পরিবেশকে বদলে দেওয়ার আশা নিয়ে প্রতিবাদের নতুন যে ভাষার জন্ম হয় এসময়, মহিলা শিল্পীরাও ননা বাধা সত্ত্বেও সাগ্রহে সে আন্দোলনের অংশীদার হয়েছিলেন। সব দিক থেকেই এঘটনা ছিল গভীর তাৎপর্যবাহী। নাচ, গান অভিনয়ে 'ভদ্রঘরের' মেয়েদের প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে রক্ষণশীলতা ছিল তাকে ভেঙে দেওয়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মহিলা শিল্পীদের শিল্পী সত্ত্বারই বিকাশ ঘটে তাই নয়, মানুষ হিসাবেও তাঁরা নিজেদের আবিষ্কার করেন নতুনভাবে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে যে প্রগতি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ব্যবহার যা ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বা তাগিদের সীমা ছাড়িয়ে একটি সংঘবদ্ধ রূপ নিয়েছিল।[১] মহিলা শিল্পীরাও সেই প্রক্রিয়ার অংশ ছিলেন। ১৯৪৩-এ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা এ ব্যাপারে তাৎপর্য পূর্ণ। তবে তার আগে থেকেই নানাভাবে এ কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বাম-মনোভাবাপন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ইউথ কালচারাল ইন্সষ্টিটিউট। তার আগেই প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলনের পর তৈরী হয় গান ও অভিনয়ের দল। তবে ইউথ কালচারাল ইন্সটিটিউট উপস্থাপিত 'দি হার্ট অব চায়না' নাটকটি উল্লেখযোগ্য কারণ সেখানে উমা চক্রবর্তী ও চিত্রা মজুমদার মহিলাশিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন যদিও তখনও পুরুষ ও মহিলাদের একই দৃশ্যের অভিনয়ে এক সঙ্গে রাখা হয়নি। ক্রমে সে বাধাও তারা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন অদূরভবিষ্যতে। সজল রায় চৌধুরী স্বীকার করেছেন, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ঐ নাট্যাভিনয় বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে।[২]

সমাজে মেয়েদের অবস্থানের প্রথাগত ধারণা ভাঙার প্রয়াস উনিশ শতক থেকেই শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের সূচনা থেকে তা আরও জোরদার হলেও সমাজ মনে মেয়েদের প্রকাশ্য নানা কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ নিয়ে দ্বিধা, স্পর্শকাতরতাও যে যথেষ্ট প্রবল ছিল তা সমসাময়িক মহিলা শিল্পীদের কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি যাঁরা এতদিনের অচলায়তন ভেঙে পা বাড়িয়ে ছিলেন তারাও সব সময় ঐতিহ্য ও সংস্কারের টানাপোড়েন কাটিয়ে উঠতে পরেননি। গণনাট্য সংঘের অন্যতম মহিলা শিল্পী উষা দত্ত যখন পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করে কলকাতায় পালিয়ে আসেন তখন তাঁকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে সহযোগী কমরেডদের মনের প্রবল দ্বিধার কথা তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়।[৩] আবার শিল্পীদের নিজেদের মধ্যেও ছিল দ্বিধা। তৃপ্তি মিত্র লিখছেন, 'আগুন' নাটকে এক অভিনেত্রীর পরিবর্ত হিসাবে হঠাৎই তিনি এসে পড়েন গণনাট্য আন্দোলনের আঙিনায়।[৪] ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট সংকোচ ছিল, দিদির প্রেরণায় সেবার তিনি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।[৫] কিছু ব্যতিক্রম বাদে,[৬] নানা পারিবারিক ও সামাজিক বাধাকে অস্বীকার করে বাংলায় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মে যে মেয়েরা সামিল হয়েছিলেন তাঁদের নামের তালিকা নেহাত ছোট নয়— রেবা রায় চৌধুরী, উষা দত্ত, প্রীতি সরকার, গীতা ঘোষ, তৃপ্তি ভাদুড়ী, অনু দাশগুপ্ত, শোভা সেন, সাধনা গুহ, সাধনা রায় চৌধুরী, গীতা মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মুখার্জী, সতী বসু, কুমকুম রায়, কল্পনা নিয়োগী, সন্ধ্যা দাশ, অঞ্জলি দাশ, আরতি দাশ, নিপুণা বন্দ্যোপাধ্যায় আরো অনেকে। মাঝে মধ্যে অংশ নিয়েছেন এমন নামও কম নয়। আবার বামধারার বাইরেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা প্রয়াস ছিল যাতে অংশ নিয়েছেন আরো কিছু মহিলাশিল্পী।

অবশ্য সংগীত বা নৃত্যাভিনয়ের আঙিনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ পাবলিক থিয়েটার, রেডিও বা রেকর্ড সংগীতের ক্ষেত্রে নতুন ঘটনা এ সময়, এমন নয়। পাবলিক থিয়েটারে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে শিশির যুগ। শিশির ভাদুড়ী ও তাঁর আর্ট থিয়েটারকে কেন্দ্র করে বাংলা রঙ্গমঞ্চের গানে, অভিনয়ে রানীবালা, নীহারবালা, সরযূবালা, ইন্দুবালার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তিনের দশকের চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয়তম অভিনেত্রী হয়েছেন কানন দেবী। তাঁদের সাজসজ্জা, পোশাকের আঙ্গিক মেয়ে মহলে গ্রহণীয় হলেও মধ্যবিত্ত আমবাঙালির কাছে তাঁর ঘরের মেয়ের মর্যাদা পাননি। তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি ঘরের মেয়েরা নাচ গান অভিনয়ে একেবারে অংশগ্রহণ করেননি তা নয়, তবে সেটা ছিল ব্যতিক্রম মাত্র। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ সব কাজকর্মকে ভালো চোখে দেখা হত না। সুতরাং প্রগতি আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ

হয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন যে মেয়েরা, তাদের যথেষ্ট প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এঁদের সমস্যা ছিল বহুমাত্রিক। একদিকে পারিবারিক রক্ষণশীলতার বাধা, অন্যদিকে সমাজ আরোপিত আরো নানা বিধিনিষেধের গণ্ডী। এমনকি মেয়েদের অবস্থানের উন্নতির বিষয়টিও ছিল নির্দিষ্ট কিছু ভাবনার অনুযায়ী। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ও আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও মেয়েদের ভূমিকার একটা নির্দিষ্ট রোল মডেল নির্মাণ করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল। সুতরাং ঘর ও বাহির, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে টানাপোড়েন এই মহিলা শিল্পীদের পথ চলাকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। রেবা রায়চৌধুরী পারিবারিক বাধা অগ্রাহ্য করে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণে জানা যায়, শুধু বিরোধিতা নয়, তাদের সামাজিক কুৎসার সম্মুখীন হতে হত।[৭] এ প্রসঙ্গে, মালিনী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে সুরথ পাল চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে জানা যায়, শিলচরে গণনাট্য আন্দোলনে মেয়েরা যখন প্রথম রাস্তায় বেরোতে শুরু করেন তখন কিভাবে তাঁদের বিদ্রুপ করা হত![৮]

এই মেয়েদের কেউই পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। প্রথাগত তালিমও তাঁদের ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ও কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে অনুশীলন করে তাঁরা সাফল্য পেয়েছিলেন এবং শিল্পী হিসাবেও চূড়ান্ত সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। প্রীতি সরকার (ব্যানার্জী) এসেছিলেন রাজশাহী থেকে। রেবা রায়চৌধুরী লিখছেন, প্রীতির কণ্ঠের যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছিল। দিলীপ রায়ও তাঁর ভূয়সি প্রশংসা করেছিলেন।[৯] শিল্পী হিসাবে এই সার্থকতার পিছন যে কঠোর শ্রম ও দলের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনচর্যাই ছিল মূল কথা। প্রীতি নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা— "আমরা কেউই প্রকৃত শিল্পী ছিলাম না। ওঁরাই তৈরী করেছিলেন আমাদের নাচে ও গানে। বাইরে নানা ধরনের কাজ করেছি— তাই ঘরে বসে দীর্ঘ অনুশীলন করতে সব সময় মন চাইত না। কিন্তু যোশী বলেছিলেন, এখন ঘরে বসে 'তানপুরা নিয়ে গলা সাধাই তোমাদের প্রধান কাজ'।[১০] রেবা রায় চৌধুরীরও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রেবার রামলীলাতে নাচ ও গান তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী সিমকির প্রশংসা লাভ করেছিল। গণনাট্যের কেন্দ্রীয় ব্যালে ট্রুপের সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠান করে মহিলা শিল্পীরা যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিলেন। উষা দত্তের মহামারী নৃত্যের জন্য বিপুল প্রশংসা লাভের কথা জানিয়ে সাধনা সেন (গুহ) লিখছেন, উপস্থাপনার বলিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।[১১]

দু এক জন ব্যতিক্রম বাদে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়া এই

মেয়েদের নিজেদের পরিবারের দিক থেকে শিল্প চেতনা গড়ে তোলার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে নানা টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা ও দেখার মধ্য দিয়েই তাদের মনে শিল্পী চেতনার জাগরণ হতে শুরু করেছিল।[১২] অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ ধারার রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে তাঁদের মনে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। সমাজ মনে দীর্ঘদিন লালিত রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মেয়েদের এগিয়ে চলার পথ আরও প্রশস্ত হচ্ছিল। তবে নাচ, গান, থিয়েটারের ব্যাপারে মানসিক বাধা তখনও যথেষ্ট স্পষ্ট। কানন দেবীর বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়, ১৯৪৪-এ রেডিও ষ্টেশনে ভদ্রলোক কন্যার পাশাপাশি 'বাঈজী' গয়িকাদের গান করা নিয়ে যে বিপুল বিরোধিতা শুরু হয়েছিল তা থেকেই চিত্রটা পরিষ্কার।[১৩] করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "তখনকার দিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে মূল্যবোধটা সাধারণতঃ বেশ মজার ছিল। গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে নাটক করা বা অন্যান্য সংস্থার (দক্ষিণী, লিটন থিয়েটার) বা শৌখিন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যাপারে (সবই বিবাহের পরে) আমার বাড়ির লোকে আপত্তি করার কথা ভাবেন নি"।[১৪] কিন্তু পেশাদার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আপাত উদার সচেতন পরিবারেও প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে যেত।

সংগ্রাম শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই ছিল না, সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রেও ছিল নানা দ্বিধা, ঈর্ষা, দলাদলি। উষা দত্তের স্মৃতিচারণায় তার উল্লেখ মেলে।[১৫] একদিকে পুরুষ সহকর্মীদের সাহায্য এবং আন্তরিক ভূমিকা যেমন ছিল, অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের আচরণ মহিলা শিল্পীদের পক্ষে অসুবিধাজনকও হয়ে উঠত। কেউ কেউ মনে করেন মেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ মেলামেশার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা অনেকের ছিল না।[১৬] তবে প্রচলিত প্রথা ভেঙে একসাথে কাজ করার সময় এই সমস্ত তরুণ-তরুণী সে সম্পর্কের মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয়ে সে ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। তাঁদের এই নিষ্ঠার জন্যই বহু রক্ষণশীল ব্যক্তিও তাঁদের মনোভাব বদল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সজল রায় চৌধুরী অসমের নওগাঁর অভিজ্ঞতা এ প্রসঙ্গে জানিয়ছেন।[১৭] আবার রাজনৈতিক আদর্শের প্রেক্ষাপট থাকায় শিল্পী সত্ত্বা না রাজনৈতিক কাজকর্ম কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই টানাপোড়েন সংস্কৃতি আন্দোলনের মেয়েদের অন্যতম সমস্যা ছিল। ফলে কারো কারো শিল্পী হিসাবে সম্ভাবনা পূর্ণ বিকশিত হতে পারে।[১৮] তবে অনেকে এই মতকে একপেশে মনে করেন। তাঁদের মতে প্রগতি আন্দোলন থেকে মেয়েদের অপ্রাপ্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ রয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন তাদের ব্যবহার করেছিল— কিন্তু তাদের নিজস্ব প্রতিভা

বিকাশের অবাধ ক্ষেত্র তৈরী করে দিতে পারে নি।[১৯] কথাটি আংশিকভাবে সত্য। এই আন্দোলনে নৃত্যশিল্পী, গায়িকা বা অভিনেত্রী হিসাবে মেয়েদের ভূমিকা থাকলেও দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া গীতিকার, নৃত্য-নির্দেশক বা নাটক পরিচালক হিসাবে পাওয়া যায় না।[২০] আবার বাইরের কাজের পাশাপাশি সাংসারিক নানা পিছুটানেও অনেকে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছেন।

এটা ঠিক যে এই মেয়েরা সাংস্কৃতিক জগতে পা বাড়িয়ে ছিলেন আদর্শেরই তাগিদে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই অর্থোপার্জনের থেকেও সেই আদর্শই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রেবা রায় চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "যে যা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দিয়েছেন তাই সানন্দে নিয়েছি। তাকে অর্থোপার্জন বলা চলে না। প্রফেশনের চাইতে অভিনয়কে মিশন হিসাবেই নিয়েছি।[২১] তবে শেষ পর্যন্ত সবাই না হলেও এদের মধ্যে কেউ কেউ 'প্রফেসন' হিসাবেই বেছে নিয়েছেন নাচ-গান-অভিনয়। বাকিরাও বহন করেছেন সেই সাহসী চেতনা যা পরবর্তী সময়ে আরও অনেক বাঙালি মেয়ের সাংস্কৃতিক মঞ্চে অংশগ্রহণে প্রেরণা দিয়েছে। এটাই এই আন্দোলন থেকে মেয়েদের বড় প্রাপ্তি।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) অনুরাধা রায়, সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন, কলকাতা, মে ২০০০, পৃ. ১৭০। সুধী প্রধান (সম্পাদক), মার্কসিষ্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড ১, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ২০-২১।

২) সজল রায় চৌধুরী, 'চল্লিশের দশকের গণনাট্য আন্দোলনের মহিলাশিল্পী', গ্রুপ থিয়েটার, দশমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ৩৩।

৩) উষা দত্ত, দিন গুলি মোর, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭।

৪) তৃপ্তি মিত্রের স্মৃতিচারণ, বহুরূপী ৩৩ (নবান্ন স্মারক সংখ্যা), ১৯৭০, পৃ. ১৮৯।

৫) তৃপ্তি মিত্র (তৃপ্তি মিত্রের নিজস্ব রচনা ও তৃপ্তিকে নিয়ে রচনার সংকলন), কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৩।

৬) যেমন, সাধনা গুহ— মা মনোরমা গুহ সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকায় সাধনার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি। সাধনা সেন, গণনাট্যের গোড়ার দু-চার কথা, গণনাট্য পঞ্চাশ বছর, ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ১১৯।

৭) রেবা রায় চৌধুরী, জীবনের টানে শিল্পের টানে, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮।

৮) মালিনী ভট্টাচার্য, 'নতুন ভূমিকার খোঁজে ঃ গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের মহিলা শিল্পী, ধ্রুবপদ, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৩২১।

এ প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেন, সে দিনের কথা, কলকাতা, ১৯৮২ দ্রষ্টব্য।

৯) রেবা রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত গ্রন্থে, পৃ. ১৮।

১০) প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সে দিনের সেই অনুভূতি', গণনাট্য ঃ পঞ্চাশ বছর, ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ১২৬।

১১) সাধনা সেন, প্রাগুক্ত রচনায়, পৃ. ১১৮।

১২) প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত রচনায়, পৃ. ১২৬।

১৩) জাহানারা রায় চৌধুরী, রমণীয় বিনোদন ঃ বাংলার সংস্কৃতি মঞ্চে মহিলা শিল্পী, (অপ্রকাশিত এম.ফিল গবেষণাপত্র), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ৫৯।

১৪) করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চলমান চিন্তা', শতবর্ষে চলচ্চিত্র (নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত) কলকাতা ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য।

১৫) উষা দত্ত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, দ্রষ্টব্য।

১৬) সুধী প্রধানের বক্তব্য, অনুরাধা রায়, সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন গ্রন্থে, কলকাতা, মে ২০০০, পৃ. ১৮৯।

১৭) সজল রায় চৌধুরী, গণনাট্য কথা, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৯৩।

১৮) ঐ, পৃ. ১১৫-১৬।

১৯) অনুরাধা রায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থে, পৃ. ২০৪।

২০) সজল রায় চৌধুরী, প্রাগুপ্ত, রচনায়, পৃ. ৩৪।

২১) পত্রাঙ্গ বসু কৃত সাক্ষাতকার, 'রেবা রায়চৌধুরী ঃ গণনাট্যের শক্তিময়ী অভিনেত্রী', গ্রুপ থিয়েটার, দর্শমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর-জানুয়ারি, ১৯৮৮, পৃ. ১৬৬।

# স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা — একটি পর্যালোচনা

অনিন্দিতা ঘোষাল

বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ বা ধ্যানধারণাকে অতিক্রম করে যদিও এই শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই নারীর সমানাধিকার-এর প্রশ্নটি বহু আলোচিত হয়ে উঠছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে এটি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। বিংশ শতক থেকেই নারীকে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার — বিষয়টি বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে এই ব্যবস্থাতেও অংশগ্রহণের মধ্যে— সংখ্যাগত অবস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম ইত্যাদি প্রশ্নে যথেষ্ট বৈষম্য বর্তমান। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরীর জন্য কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যে যে আন্দোলনের জোয়ার আসছিল— তাতে নারীদের অংশগহণ মোটেই আশাপ্রদ ছিল না।[১] কিন্তু আদমসুমারী তথ্য বা বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে— পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে এই চিত্র যথেষ্টই আশাব্যঞ্জক। স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণ বা অন্যান্য ইতিবাচক কার্যাবলী গ্রহণ করার ফলে মহিলাদের অবস্থা বা অবস্থান উভয়ই অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে সমাজ মূলত দুই শ্রেণীর নারীসমাজে বিভক্ত। এর প্রথমটি হলো— উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় গৃহবন্দী নারী যারা শ্রমহীন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট নারী সমাজকে নিয়ে তৈরী যারা শ্রমের ভারে আনত। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মনিযুক্তি, প্রসূতি,

শিশুমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট চিত্র পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে চিত্রটি খুব আশাপ্রদ না হলেও বলা যায় যে গ্রামীণ স্তরে শিক্ষার প্রসার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান, ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তন, কুটির শিল্পের বিস্তার, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নারীরা যথেষ্টই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছেন। এমনকি সারা ভারতে নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার যেখানে ২৪.৮৮ শতাংশ, সেখানে বিগত আদমসুমারীতে পশ্চিমবঙ্গে ওই হার ৩০.০০ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে কুটির শিল্পের প্রসার হবার ফলে লক্ষ লক্ষ নারী হস্তশিল্প, তাঁত শিল্প ও অসংখ্য গ্রাম্য কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে মজুরির ভিত্তিতে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানা, খনি, বাগিচা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিসদপ্তর, সর্বত্রই নারীরা সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনার কাজে মূল সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল পরিসংখ্যানের সীমিত সংজ্ঞা, ব্যাপ্তি ও অপ্রাচুর্য।[২] এই সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য হলো — অর্থনীতিতে নারীর শ্রমের অপেক্ষাকৃত ক্রমমূল্যায়ন এবং পুরুষের তুলনায় নারীর প্রতি বৈষম্য। National Sample Survey, ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলার গ্রামে মহিলাদের শ্রমে অংশগ্রহণের হার স্থির করেছিলেন ৩.৪% এবং ১৯৮১ সালে আদমসুমারীতে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় এই হার ছিল ৩.৩%। কিন্তু কল্যানীতে অবস্থিত "জনসংখ্যা, কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ননীতি গবেষণাকেন্দ্র"তে গবেষণারত শ্রী অশোক কুণ্ডু, শ্রীমতি চন্দনা কুণ্ডু, শ্রী দেবাশীষ মল্লিক ও শ্রীমতি মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী-এর দ্বারা সংগৃহীত প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮২ সালে নদীয়া জেলায় এই হার ছিল ১০%। এই পরিসংখ্যান-এর পার্থক্যের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, আদমসুমারীতে চিরাচরিত সংজ্ঞার বাইরে পারিবারিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী কাজকে বাদ দেওয়া হয় যে কারণে স্বভাবতই শ্রমে অংশগ্রহণের পরিমাণ এবং হার নারীর চেয়ে পুরুষের, আপাতদৃষ্টিতে অনেক বেশী মনে হয়।

১৯৯১ সালে "পশ্চিমবাংলায় পারিবারিক কল্যাণে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের ভূমিকা" নামক এক গবেষণা প্রকল্পে পশ্চিমবাংলার ৪০টি দেশের ২০৩৬টি গ্রামীণ পরিবারে একটি সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য ভাগ করলে দেখা যায় যে— মহিলারা মূলত তিন ধরনের কাজ করেন — (ক) কৃষিকাজ (খ) কৃষি ছাড়া অন্যান্য অর্থকরী কাজ (গ) বেতনহীন পারিবারিক কাজ। আবার অনেকেই স্বনিযুক্ত ও মজুরিভিত্তিক কাজে অংশগ্রহণ করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গতানুগতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রমে অংশগ্রহণের হার পুরুষের ক্ষেত্রে ৫৩% এবং

মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৬%। কিন্তু বেতনহীন পারিবারিক শ্রমকে যদি হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে নারীর শ্রমে অংশগ্রহণের হার দাঁড়ায় ৩৪% কিন্তু পুরুষের পক্ষে সেই হার নামমাত্র বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪%। বেতনহীন পারিবারিক কাজের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি হবার ফলে মোট কাজে অংশগ্রহণের হারে তারতম্য অনেকটা দেখা যায়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে গত ত্রিশ বছরে নারীর শ্রমে অংশগ্রহণের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধানচাষ-সংক্রান্ত কাজের কথা।[৩] কারণ পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহিলা ও পুরুষের একটি প্রধান অংশ নিযুক্ত হয় এই কাজে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আসার দরুন এটি উৎপাদন, আয় ও বিনিয়োগকে অনেকটা প্রভাবিত করে পরিবারের অভ্যন্তরীণ শ্রম ও সম্পদ বণ্টনের ওপর অনেকটা ছাপ ফেলে। তাই মহিলাদের শ্রমে অংশগ্রহণের হার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হওয়ার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের একটা বড় ভূমিকা থাকলেও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন যে এর মূল কারণ তা বলাই বাহুল্য। যেমন— ধানচাষে নিড়ানির কাজ (weeding) প্রধানত মহিলারাই করতেন। ঢেঁকিতে ধান ভাঙার কাজেও মহিলা কৃষি-শ্রমিকদেরই একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিতে রাসায়নিক এবং ধান ভাঙার মেশিন মহিলাদের অনেকাংশে স্থানচ্যুত করেছে এবং সেখানে অল্প পরিমাণে হলেও পুরুষের কাজের সংস্থান হয়েছে।[৪] যে কোন উচ্চফলনশীল প্রযুক্তিতে নারীর কাজ প্রধানতঃ processing (ঝাড়াই, বাছাই, শুকোন, সেদ্ধ করা ইত্যাদি) এবং তত্ত্বাবধান। কিন্তু প্রযুক্তি পরিবর্তনের একটি লক্ষণীয় ফল হলো— পরিবারের মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয়িত সময় আগের চেয়ে বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির পরিমাণ নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশি। পরিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদার যথার্থ মূল্যায়নে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় নমুনা পরীক্ষা থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে— সারা দেশে যেখানে ৩২% থেকে ৩৬% মেয়েরা কাজে আসেন গ্রামীণ ক্ষেত্রে সেখানে এর পরিমাণ ১৬%। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটি ২০% মতো।[৫] শহরে বেকারির হার অসম্ভব উঁচু, প্রায় ২৪% - ২৫%। বর্ধমান জেলায় একটি গবেষণায় দেখা যায় যে— মহিলারা বাইরের কোন তথাকথিত অর্থনৈতিক কারোর সঙ্গে যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পান না। তাই ঘরের ভিতরে যে কাজ তাঁদের করতে হয়, একাধারে তার কোন স্বীকৃতি নেই এবং সেই কাজের জন্য তাঁরা কোন মূল্যও পান না। নদীয়া জেলার ফুলিয়াতে গেলেও এই একই চিত্র দেখা যায়।[৬] সেই গ্রামে প্রত্যেক

তাঁতী বাড়িতে একজন তাঁতী কাজ করেন এবং সেইসঙ্গে অন্তত দুটি মেয়েকে কাজ করতে হয়; সুতোয় রং করা বা মাড় দেবার জন্য। কিন্তু নদীয়ার সেন্সাস রিপোর্ট শিল্পজগতের পরিসংখ্যান মেয়েদের কোন উল্লেখ নেই। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশম শিল্পেও, রেশমের গুঁটি তৈরী করা যাকে বলে, সেই কাজটা বেশিরভাগই মেয়েরা করে; অথচ তাদের সেই কাজের কোন স্বীকৃতি নেই। এমনকি এসব কাজে দক্ষ হতে গেলে যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন; সংসারের বিভিন্ন কাজের ফাঁকে গৃহভিত্তিক শিল্পে কাজ করার জন্য তিনি প্রশিক্ষণ নেবার সময় পান না।[১১] তাই আমাদের দেশে যে উদ্যোগের যে নতুন ধারা এসেছে। তাতে যেহেতু অশিক্ষিত, অদক্ষ শ্রমের কোন স্থান নেই; তাই মহিলাদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষণ এর মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।[৬]

জনগণনায় দেখা যায় জীবিত পুত্রসন্তানের তুলনায় জীবিত কন্যাসন্তানের সংখ্যা অনেক কম। তাই সামাজিক দিক থেকে দেখতে গেলেও বলা যায় — পারিবারিক সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে যে বৈষম্য আছে, বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে তা আরো প্রতিফলিত হয়।[৬] যদিও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম এক অস্তিত্বের চেতনা তৈরী বা সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়েছে, তা সত্ত্বেও যদি অর্থনৈতিক কাজে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত না করা যায়, তাহলে নারীমুক্তির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও কার্যাবলী অনেকটাই ইতিবাচক চিত্রকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছে।[৪]

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) Mukhopadhyay, Sudhin K. and Bannisikha Ghosh, Contribution of Women in the Rural Economy of West Bengal, The World Bank, Washington, D.C. 1992.

২) Ghosh, Bannisikha, "Work, Income and Women : A Macro-micro Exercise in India; Madras Institute of Development Studies, 1984.

৩) Mukhopadhyay, Sudhin K. Constraints to Technological Progress in Rice, Cultivation, University of Kalyani, Report on Project sponsored by the Ford Foundation, New Delhi, 1984.

৪) Ghosh, Bannisikha, "Role of Women in Economic Activity : A Study of Women in Rice Farming Systems", Oxford University Press, 1992.

৫) The Status of Women in India, Allied Publishers, New Delhi, 1975. pp. 114-15.

৬) G.K. Lieten, "Panchayat Leaders in a West Bengal District", Economic and Political Weekly, October 1, 1988.

৭) Chhaya Bera, Women and the Left-Front Government in West Bengal, NBA, 1991.

৮) Panchayats in West Bengal, Development and Planning Department, Government of West Bengal, Atul Kohli, The State and Poverty Reforms in India, Princeton University Press, USA.

৯) Towards Equality; Report of the Committee on the Status of Women in India (Government of India, Department of Social Welfare, Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, 1974.

১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা "অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের সমস্যা"— রাজ্য পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ সংস্থা, পঞ্চায়েত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রবন্ধের সংকলন। পৃ. ৬৬-৬৮।

১১) মুখোপাধ্যায়, সাধনা, "শ্রমজীবী নারী ও আমাদের সমাজ", ঐ, পৃ. ৭১-৭৪।

# জনগণনায় নারী সাক্ষরতার রূপ 'জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব'

উজ্জয়িনী রায়

শুধুমাত্র প্রযুক্তি ও বস্তুগত অগ্রগতির দ্বারা কোন রাষ্ট্রের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না, তা অনেকখানি নির্ভর করে নাগরিকদের জীবনের গুণগত মানের উপর। 'জাতীয় উন্নয়ন নীতি'(National Development Policy)-র বর্তমান কাঠামোয় নারীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই নীতিতে নারীকে 'একটি অনন্য শক্তির একক' (a unique power unit) এবং 'সম্ভাবনাময় সম্পদ' (a potential resource) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক আঙিনায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বহু যুগ ধরে বিভিন্ন রূপে নারীরা তাদের নিজেদের পরিবারের ও বৃহত্তর সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব পালন করে এসেছেন ও আজও করছেন। স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকায় পরিবারের সুস্থিতি রক্ষায় ও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে সমগ্র নারী জাতির উন্নতি/উন্নয়ন অপরিহার্য এবং এই উন্নয়নের উপাদানগুলির মধ্যে শিক্ষা হল অন্যতম যা জন-জীবনের বাহ্যিক/ভৌত গুণাবলীকে উন্নত করে। উন্নয়নের মাপকাঠি (developmental indicators) এবং জনগণের শিক্ষার মানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, প্রধানত মেয়েদের ক্ষেত্রে। মায়ের শিক্ষার মান যত নিম্নগামী হবে, ততই বেশী হবে তার সন্তানের সংখ্যা এবং তার চেয়েও অনেক বেশী হবে সন্তানহানির আশঙ্কা। নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে, জনস্বাস্থ্য সম্পকে সচেতনতা বাড়বে, শিশু মৃত্যুর হার কমবে ফলে জনসংখ্যার হারও কমবে।

জনগণনায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অধোগতির যে কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ[১]

১) লিঙ্গ-বৈষম্য (Gender based inequality)।

২) সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক শোষণ (Social discrimination & economic exploitation)।

৩) গৃহস্থালীর সবরকম কাজে কন্যা সন্তানদের যুক্ত করা (Occupation of girlchild in domestic chores)।

৪) বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে সংখ্যার স্বল্পতা (Low enrolment of girls in Schools)।

৫) বিদ্যালয়ের শিক্ষা ধরে রাখার অক্ষমতা এবং শিক্ষার মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা (Low retention capacity and high drop-out rate)।

সরকারের পক্ষে নারী সাক্ষরতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যে কৌশলগুলি অবলম্বন করা হয়েছে ঃ

ক) National Literacy Mission for imparting functional literacy.

ভারত সরকার ১৯৮৮ সালে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে, 'জাতীয় সাক্ষরতা পরিকল্পনা' গ্রহণ করে। যেহেতু এই প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী, সেই কারণে এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, প্রধানত নিরক্ষর নারীদের মধ্যে কার্যকরী শিক্ষার প্রচলন।

খ) Universalisation of elementary education.

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনকরণ।

গ) Non-formal education

প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষার প্রসার।

বিংশ শতকের মধ্যভাগে নারী সাক্ষরতার পরিসংখ্যান ঃ

| বছর | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|
| ১৯৬১ | ৩৪.৪% | ১২.৯% |
| ১৯৭১ | ৩৯.৫% | ১৮.৭% |
| ১৯৮১ | ৪৬.১৮% | ২৪.৮% |
| ১৯৯১ | ৫৩.১% | ৩২.৭% |

এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বাড়লেও তা কখনও পুরুষদের সমান হয় না। শুধুমাত্র কেরালা রাজ্যটি ব্যতিক্রম যেখানে নারী সাক্ষরতার হার প্রায় ৭৫.৩%। তবে আশার কথা হল ২০০১ এর জনগণনায় দেখা গেছে যে আমাদের দেশে নারী সাক্ষরতার হার প্রায় ৫৪.১৬%। ১৯৫১ সালে এই হার ছিল ৮.৮৬%। দেখা গেছে যে (১৯৯১-২০০১) এই সময়ের মধ্যে নারী সাক্ষরতা বেড়েছে প্রায় ১৪.৮৭%। তবে শঙ্কার কারণ এই যে গ্রামের নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার শহরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

বিদ্যালয়ে মেয়েদের নথিভুক্তকরণের পরিসংখ্যান ঃ ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত হওয়া মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা — এই ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা (১৯৫০-৫১) সালে ৫.৪ মিলিয়ন থেকে (১৯৯৩-৯৪) সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬.৪ মিলিয়নে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তর — এই ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা (১৯৫০-৫১) সালে ০.৫ মিলিয়ন থেকে (১৯৯৩-৯৪) সালে বেড়ে হয়েছে ১৩.৭ মিলিয়ন।

হাইসেকেন্ডারী স্তর — এই ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা (১৯৫০-৫১) সালে ০.২ মিলিয়ন থেকে (১৯৯৩-৯৪) সালে বেড়ে হয়েছে ৮.১ মিলিয়ন।

তবে বিদ্যালয়ে নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা বাড়লেও, শিক্ষা অর্জনের মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেওয়া বা ছাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা এখনও একটি বড় সমস্যা। দেখা গেছে যে গ্রামীন অঞ্চলে একটি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে মেয়ের সংখ্যা যদি ১০০ হয়, তাহলে পঞ্চম শ্রেণীতে তা হয়ে যায় ৪০টি, সপ্তম শ্রেণীতে তা হয়ে যায় ১৮টি, নবম শ্রেণীতে তা হয়ে যায় ৯টি এবং একাদশ শ্রেণীতে তা কমে হয় ১ জন।[২]

শহরে এই পরিসংখ্যান ঃ প্রথম শ্রেণী — ১০০, পঞ্চম শ্রেণী — ৮২, সপ্তম শ্রেণী — ৬২, নবম শ্রেণী — ৩২, একাদশ শ্রেণী — ১৪।

গ্রামের তুলনায় শহরের পরিসংখ্যান কিছুটা ভাল হলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষা উচ্চ স্তর পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার অক্ষমতা শহরের বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানেও স্পষ্ট।

নারী সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নথিভুক্তকরণ ও সেই পড়াশোনা বজায় রাখা দুটোই সমান প্রয়োজনীয়। শিক্ষা পাওয়ার অধিকার, সমান পাঠক্রম, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা লাভ, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা লাভ, নারী শিক্ষার এই সমস্যা গুলি আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই নারীদের সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য নেওয়া পরিকল্পনাগুলিতে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান এর উপর জোর দিলে হবে না, তাদের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে যাতে তারাও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। একসাথে কাজ করে যাতে তারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারে— সেই উদ্দেশ্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী (Self-employment groups) গঠনে উৎসাহ দিতে হবে। সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার আত্মবিশ্বাস তৈরীতে সাহায্য করা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ছোট পরিবার সম্পর্কে শিক্ষা, মেয়েদের কাছে বহির্জগতের তথ্য পৌঁছে দেওয়া, প্রথা বহির্ভূত ভূমিকায় মেয়েদের এগিয়ে আসার উপর উৎসাহ

দান এই সবকিছুর উপর জোর দেওয়া উচিত নারীদের সাক্ষরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরী পরিকল্পনাগুলিতে।

নারীদের জন্য 'প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা পরিকল্পনা, অপ্রচলিত শিক্ষা এবং প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এই তিনটি ব্যবস্থার মেলবন্ধন ঘটিয়ে নারীদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে (১৯৯১-২০০০) সালের মধ্যে 'A National Plan of Action for the Girl Child' গ্রহণ করা হয়েছে।[৩] এই পরিকল্পনায় কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা, শোষণ, দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাদের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সার্ক (SAARC) ১৯৯০ সালটিকে 'The year of the Girl Child' এবং (১৯৯০-২০০০) কে 'Decade of the Girl Child' ঘোষণা করেছে, মানুষের মনে কন্যা সন্তানদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় সচেতনতা বাড়াবার জন্যে।[৪]

মানুষের পঙ্গুত্বের জন্যে অপুষ্টি অনেকটাই দায়ী। সন্তানসম্ভবা মহিলার ক্ষেত্রে অপুষ্টি এতটাই ক্ষতিসাধন করে যা পরবর্তীকালে সুষম খাদ্য দিয়েও পুরণ করা সম্ভব হয় না। গর্ভাবস্থায় অপুষ্টির ফলে বহু শিশুর ওজন কম হয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে প্রায় ৩৬ শতাংশ শিশুই Low Birth Weight-এর শিকাব এবং এর একমাত্র কারণ গর্ভাবস্থায় মায়ের অপুষ্টি জনিত অসুস্থতা। 'ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে' (National Family Health Survey-N.F.H.S.) প্রথমবার (১৯৯২-১৯৯৩) তে এবং দ্বিতীয়বাব (১৯৯৮-৯৯)- তে করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে দেখা গেছে যে তিন বছরের নীচে শিশুদের ওজন (প্রায় আঠারো শতাংশ) অস্বাভাবিক কম, প্রায় ৫৬% শিশুর উচ্চতা তাদের বয়সের তুলনায় অনেক কম, ৭৪% (৬-৩৫ মাস) অ্যানেমিয়া বা রক্তাল্পতার শিকার। শিশুদের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা, তাদের মায়ের রক্তাল্পতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই পরিকল্পনায় পাওয়া গেছে (১৫-৪৯) বয়সের মেয়েদের মধ্যে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অপুষ্টির শিকার। প্রায় ৫২% মহিলাই রক্তাল্পতার শিকার।[৫]

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িশ্যায় এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একে অপরের পরিপূরক। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে শিক্ষিত নারীরাই একটি সুস্থ সমাজ উপহার দিতে পারে।

**সূত্র-নির্দেশ :**

১) Census of India, 1991, 2001 : Provisional Population Total.

২) Census of Bengal (Report) - Vol. VI, 1951, 1961.

৩) Progress of Women's Literacy in India : Challenges for 21st Century - N. Nagarajan. (Papers from the 2nd Asia Regional Literacy Forum)

৪) National Literacy Mision And Women's Empowerment (Pg 1-4).

৫) Indian Journal of Medical Ethics (Pg-1 to 10).

# বাংলায় মহিলা ফুটবলের বিকাশ ঃ নারীমুক্তির এক অনন্য অধ্যায়

শুভ্রাংশু রায়

কাকতালীয় হলেও মিলটা ভীষণই। আবার অমিলও বটে। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ক্রিকেট বিশ্বকাপ। সেই ফাইনালে দুটি দেশ ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। সেই ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার হাতে পর্যুদস্ত ভারত। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে ২০০৩ আর ২০০৫-এ দক্ষিণ অফ্রিকার ওয়ানডারস্ আর সেঞ্চুরিয়ান পার্কের ক্রিকেট চিত্রনাট্যে যতই মিল থাক না কেন একটি জায়গায় অমিল রয়েছে আর এই অমিলটা হল প্রথমটি পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ আর দ্বিতীয়টি মহিলাদের বিশ্বকাপ। তাই অস্ট্রেলিয়ার হাতে গো-হারান হেরেও সৌরভদের কপালে যেখানে নেতাজী ইন্ডোরে কিংবা দেশের অন্যত্র সম্মান জুটেছিল, মিতালীরাজ, ঝুলন বা রুমেলি ধরদের দেশে ফিরে প্রায় কিছুই মেলেনি। সংবাদমাধ্যমে একটি ছবি বেরিয়েছিল তাও মন্দিরা বেদীর কৌলিন্যে। পুরুষদের বিশ্বকাপ ক্রিকেট কারা দেখাবে তাই নিয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে রীতিমত কামড়াকামড়ি পড়ে গিয়েছিল। আর সারাদিন হাপিত্যেশ করে টিভির রিমোট খোঁচাখুচি করেও মেয়েদের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের একটু ঝলকও আমরা দেখতে পাইনি। কারণটা অত্যন্ত জটিল, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মনস্তত্ব ইত্যাদির বিশ্লেষণ তারপর .........। আবার কারণটা খুব সোজাও বটে। ভারতীয় ক্রীড়া জগতের আঙিনায় লিঙ্গ বৈষম্য। আর এই লিঙ্গ বৈষম্যের কারণেই স্বাধীনতার পর থেকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় বিভিন্ন ধরনের খেলায় পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে বেশি ভালো পারফরম্যান্স করেও মেয়েরা ব্রাত্য, নানাভাবে বঞ্চিত। উদাহরণ হয়তো অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ মেয়েদের ফুটবল।

বাংলায় ফুটবলের সূত্রপাত ঘটে নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারীর ১৮৭৭ সালে কিক অফের জেরে।[১] ক্রমশ কলকাতা ও তার আশপাশে অসংখ্য ফুটবল ক্লাব জন্ম নেয়। নগেন্দ্র প্রসাদের আন্তরিক উদ্যোগ এবং স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার বিনোদ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়,

স্যার ভুপেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের সহযোগিতায় ফুটবল সংস্কৃতি বাঙালির রক্তে মিশে যায়। এরপর ১৯১১ সালে শিল্ড ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার ক্লাবকে হারিয়ে মোহনবাগানের জয় ফুটবলকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে মিলিয়ে দেয়।[২] বাংলায় মহিলা ফুটবলের বিকাশের ইতিহাস অত পুরানো না হলেও উপনিবেশিক আমলেই এর বিকাশ ঘটে এবং এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা হিসেবে যার নাম উঠে আসে তিনি হলেন বাংলায় ক্রীড়া সাংবাদিকতার জনক ব্রজরঞ্জন রায়। ব্রজরঞ্জন রায় ১৯২০ দশকের শেষের দিকে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে মেয়েদের ফুটবল চালু করার উদ্যোগ নেন এবং মূলত তাঁর উদ্যোগেই ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশানাল ইউথ অ্যাসোশিয়েসন। এরই এক সদস্যা পূর্ণ ঘোষ শাড়ী পরে ফুটবল খেলার প্রচেষ্টা করলে সাংঘাতিক সামাজিক প্রক্রিয়া দেখা যায়। যদিও সেই সময়ের অন্যতম অগ্রগন্য বাংলা দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার এ প্রসঙ্গে পূর্ণ ঘোষের পাশে দাঁড়ালেও ব্রজরঞ্জনরা সমালোচনা বিদ্রুপের হাত থেকে রক্ষা পাননি।[৩] বস্তুত পূর্ণ ঘোষের ফুটবল খেলার প্রচেষ্টার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত, মেয়েদের ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করা বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজ খোলামনে গ্রহণ করেনি। পূর্ণ ঘোষরা যখন ফুটবল খেলতে শুরু করেছিলেন কিংবা তারও কয়েক বছর পরে যখন কলকাতার বেথুন কলেজ, আশুতোষ কলেজ, ভিক্টোরিয়া কলেজে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল (১৯০৪-০৮) কলেজের মেয়েদের সমালোচনা, সামাজিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৪] এদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে যখন মেয়েদের ফুটবল প্রচলনের প্রচেষ্টা সরকারী স্বীকৃতি পেল লক্ষ্ণৌতে মহিলাদের জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে, তখনও বাংলায় মহিলা ফুটবলের উদ্যোক্তরা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হলেন। আসলে পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজ কোন অবস্থাতেই পুরুষের একান্ত 'পুরুষালি' আঙিনা ফুটবলে মেয়েদের প্রবেশকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। উপনিবেশিক আমলেও নয়। সত্তরের দশকেও নয় এমনকি বর্তমানেও নয়। আর এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মেয়েদের ফুটবল খেলায় নানাভাবে কখনও প্রত্যক্ষ- কখনও বা পরোক্ষভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে। আর এই বহুমাত্রিক বাধার সম্মুখীন হয়ে এই বাধার প্রাচীরগুলি অতিক্রম করে বাংলার মহিলা ফুটবল নারীমুক্তির এক অনন্য অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং পারিবারিক বাধাকে উপেক্ষা করে ১৯৭০ দশকে যখন ভারত তথা পশ্চিম বাংলায় মহিলা ফুটবল প্রচলনের প্রচেষ্টা শুরু হয়, পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করে এবারেও প্রতিরোধের প্রচেষ্টা শুরু হয়। অবশ্য প্রেক্ষাপটটা

এবার কিছুটা হলেও বদল হয়েছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ভারত বিভাজিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ পরিবারের পশ্চিম বাংলায় শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ বাংলায় প্রচলিত আর্থ সামাজিক কাঠামোর ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল এবং জীবন জীবিকার জন্য বা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শরণার্থী পরিবারের মেয়েরা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসে। চাকরী, ব্যবসা বা অন্যক্ষেত্রগুলিতে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। ক্রীড়া জগৎও এর ব্যতিক্রম ছিল না।[৫] সত্তরের দশকে যখন পশ্চিম বাংলায় মেয়েদের ফুটবল প্রচলনের প্রচেষ্টা শুরু হয় তখন কিছুটা হলেও ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধি এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রটি ছোট হয়ে গিয়েছিল তা ভাববার কোন অবকাশ নেই। ১৯৭৫ সালের শুরুতে যুগান্তর পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বাংলায় মেয়েদের ফুটবল চালু হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় এবং ইচ্ছুক মেয়েদের কালিঘাট মাঠে ট্রায়ালের জন্য উপস্থিত হতে বলা হয়। এই সময় থেকেই মহিলা ফুটবলের প্রসারের বিষয়ে সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হয়ে পরেন প্রাক্তন খেলোয়াড় তথা বিশিষ্ট ফুটবল ব্যক্তিত্ব প্রদীপ ব্যানার্জীর (পি.কে. ব্যানার্জী) স্ত্রী আরতি ব্যানার্জী। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ক্রীড়া সাংগঠক এবং তৎকালীন কালিঘাট ক্লাবের সভাপতি নতুকোলে। মেয়েদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন সুশীল ভট্টাচার্য্য। ইতিমধ্যে আরেকটি বির্তকের সৃষ্টি হয় যেটি হয়ে দাঁড়ায় ফুটবল প্রসারের প্রধান অন্তরায়। তৎকালীন ও বর্তমান সময়ের এক নামজাদা ক্রীড়া চিকিৎসক খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে বসেন যে মেয়েদের ফুটবল মেলা তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কেননা এতে মেয়েরা তাদের প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। প্রথম প্রশিক্ষক সুশীল ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতায় 'সব দেখে শুনে আমার পবিচিত, শুভানুধ্যায়ীরা আমায় এসবের মধ্যে না জড়াতে পরামর্শ দিয়েছিল। শত প্ররোচনা সত্ত্বেও যে সমস্ত মেয়েরা ট্রায়াল ক্যাম্পে রয়ে গিয়েছিল প্রায়শই তাদের অভিভাবকরা এসে বলতেন যে তাঁর মেয়ে আর ফুটবল খেলবে না। আমরা বিশেষত আরতিদি তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে নিরস্ত করতেন"।[৬] এত সত্ত্বেও বাংলার মেয়েদের রোখা যায়নি। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মহিলাদের প্রথম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই দলের অন্যতম খেলোয়াড় এবং বর্তমানে ভারতীয় দলের কোচ কুন্তলা ঘোষ দস্তিদারের স্মৃতিচারণায় মাত্র তিন সপ্তাহের প্র্যাকটিসে বিদর্ভকে হারিয়ে আমরা সেবার চ্যাম্পিয়ন হই। লক্ষ্ণৌয়ের বাবু সিং স্টেডিয়ামে আমাদের খেলা অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। উত্তপ্রদেশের সরকারের এক মন্ত্রী আমাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পর তাঁর

ভাষণে বলেছিলেন যে, কোন মেয়ে এত সুপার ফুটবল খেলতে পারে তা তিনি নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না। তবে তাঁর সন্দেহ বেশকিছু ছেলে বাংলার মেয়েদলে গোপনে ফুটবল খেলেছে। কথাটা শুনে ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলাম, আবার দুঃখও পেয়েছিলাম।'[৭] ১৯৭৬ সালে ভারতীয় মহিলা দলের সিঙ্গাপুর সফরে অধিকাংশই ছিলেন বাংলার প্রতিনিধি। শান্তি, কুন্তলা, মিনতি, কুড়ি, রমা, দীপ্তিদের সাফল্য দেখে ময়দানে চলে আসে চৈতালী চ্যাটার্জী, অনিতা সরকারের মতো আরো এক ঝাঁক নতুন মুখ। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতীয় মহিলা দলের বিশ্বকাপে (তাই ওয়ান ১৯৮২) অংশগ্রহণ। তাইওয়ান বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ভারত জার্মানীর সঙ্গে ০-০ গোলে খেলা অমীমাংসিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ঐ বিশ্বকাপ দলে ন'জন ফুটবলারই ছিলেন বাংলার। অধিনায়িকা কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, শান্তি মল্লিক, মিনতি রায়, জুডি সিলভা, রমা দাস, ইন্দ্রানী সাহা, চৈতলী চ্যাটার্জী, শুক্লা নাগ ও শুক্লা দত্ত, আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বকাপ ছাড়াও এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে ১৯৭৯ ও ১৯৮৩তে রানার্স হওয়ার সম্মান ভারত অর্জন করেছে।

কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট সাফল্য সত্ত্বেও মেয়েদের ফুটবল খেলার বাধার প্রাচীরগুলি আজও আলগা হয়নি। মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রাথমিক বাধা আসে অবশ্যই পরিবারের মধ্য থেকে। যেহেতু চারিপাশে মহিলা ফুটবলারের সংখ্যা নগণ্য তাই ফুটবল খেলতে গেলে বাড়ীর মেয়েকে পাড়ার মাঠে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে হবে তা ভেবে বাধা দেন বাড়ীর অভিভাবকরা। আজকের ময়দানে যারা প্রতিষ্ঠিত মহিলা ফুটবলার তাদের অধিকাংশেরই বাড়ীর ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে তাদের অদম্য ঈচ্ছাশক্তির কাছে অভিভাবকরা হার মেনেছেন বা অনেকক্ষেত্রে বাড়ীর কোন বিশেষ সদস্যের সাহায্যে তারা ফুটবলে পা দিতে পেরেছেন। কিন্তু এটাই বাস্তব যে ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে মাত্র গুটি কয়েক মহিলা সাফল্যের মুখ দেখেছেন আর অসংখ্য প্রতিভা পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিকতা ইত্যাদি পিতৃতান্ত্রিক বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে।[৮]

সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলা ফুটবলারদের সমস্যা আরো ভয়াবহ। পেশীবহুল শক্ত চেহারার জন্য মহিলা ফুটবলাররা অনেক সময়েই হয়ে উঠেন উপহাসের পাত্র। মেয়েদের পক্ষে ফুটবল খেলা সম্ভব নয় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ফুটবল মাঠে ভালো দক্ষতা দেখানো মহিলা ফুটবলারটির 'নারীত্ব' নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। গড়ের মাঠে অনেক সময় নানা আলাপ আলোচনায় মহিলা ফুটবলারদের নারীত্ব

নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বা উপহাস করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠকরা ক্লাবকর্তারা এর থেকে বাদ যান না। অসংখ্য মহিলা ফুটবলারের সুস্থ পারিবারিক জীবন যাপন সত্ত্বেও আজও সাংসারিক জীবনে মহিলা ফুটবলারদের প্রবেশ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠে আসে। নানা গুঞ্জন শোনা যায়, পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে পুরুষ ফুটবলারদের তুলনায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি কৃতিত্বের অধিকারিনী হয়েও সামাজিক সম্মানের প্রশ্নে মহিলারা আজ প্রায় কয়েক শত যোজন দূরে অবস্থান করছে।

এই বৈষম্য যে শুধুমাত্র পারিবারিক বা সামাজিকক্ষেত্রে তা নয়, রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রেও আজ মহিলা ফুটবলাররা চূড়ান্ত অবিচারের শিকার। কোন পুরুষ ফুটবলার যেখানে এক রাজ্য দলে খেললেই চাকরি পেয়ে যান সেখানে মহিলাদের চাকরির ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া সুযোগ নেই বললেই চলে। মনিপুর যেখানে বছরের পর বছর জাতীয় প্রতিযোগিতা জিতে চলেছে সেখানে আই.এফ.এ.-র কর্তাব্যক্তিরা নির্বিকার। ১৯৯১তে লীগ চালু করা আর উইমেন্স ফুটবল প্রোজেক্ট ডিরেক্টর পদ তৈরি করেই আই.এফ.এ খুশি। মেয়েদের না আছে কোন চাকরির সুযোগ, না পোষাক পরিবর্তনের জন্য তাঁবু, না মিডিয়ার প্রচার। নব্বুইয়ের দশকের শেষের দিকে মোহনবাগান সচিব অঞ্জন মিত্র কিছুটা সক্রিয় উদ্যোগে ইউ.বি. গ্রুপের সহযোগিতায় মোহনবাগানের মহিলাদল গঠন করে মণিপুর থেকে চৌবা দেবী রবিতা কুমারী কিংবা উড়িষ্যা থেকে সন্ধ্যাঞ্জলী সামন্ত রায়, প্রথমা প্রিয়দর্শিনী কলকাতা মাঠে এনে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। মোহনবাগানের দেখাদেখি ইস্টবেঙ্গলও মহিলা দল গঠন করেছিল এবং ২০০০-২০০১ সালের মহিলা ফুটবল লীগ কিছুটা হলেও প্রচারের আলো দেখেছিল। কিন্তু আদালতের রায়ে অঞ্জন মিত্র ক্ষমতাচ্যুত হলে মোহানবাগানে তাঁর বিরোধীগোষ্ঠী মহিলাদল তুলে দেন। ফলে ইস্টবেঙ্গলও আর এ বিষয়ে উৎসাহ দেখায়নি। অদ্ভুতভাবে ভারতে নারী আন্দোলনকারীরা তাত্ত্বিক নারীবাদীরা ক্রীড়াক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। তাই নারীর বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ক্রীড়াজগৎ অনুপস্থিত।

তবু বাংলার ফুটবলার মেয়েদের লড়াই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কুন্তলা, শান্তি, জয়ারা কোচিং ডিগ্রি নিয়ে ময়দানে কোচিং করাচ্ছেন। অনামিকা সেন বাংলার প্রথম মহিলা ফিফা কাজধারী রেফারি হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলিয়েছেন। খেলিয়েছেন ২০০৩ সালের মোহানবাগান-উয়াড়ির লীগ ম্যাচও। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বাংলার মহিলা ফুটবলাররা নারীমুক্তির এক অনন্য ধারার সূত্রপাত করেছেন।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**


১) কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ঔপনিবেশিক বাংলায় আধুনিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক বিকাশ (ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা ২০০৫, পৃ. ৫৭৬-৬০৩)

২) এ বিষয়ে বিস্তৃত ও ইতিহাসনিষ্ঠ বিশ্লেষণের জন্য দেখুন Kausik Bandyopadhyay - '1911 in Retrospect : A Revisionist Perspective on A famous Indian Sporting Victory. (The International Journal of the History of Sport, Vol. 21, No. 314, June-September 2004, pp. 363-383)

৩) Boria Majumdar - Forwards and Backwards : Women's Soccer in Twentieth-century India - (Soccer and Society, Vol.-4, Nos. 2/3, Summer/Autumn. 2003, Edited by J.A. Mangon, Fan Hong. pp. 80-93)

৪) তদেব।

৫) শুভ্রাংশু রায় ঃ পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ফুটবললের ইতিহাস (ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা ২০০৫, পৃ. ৬১১-৬২০)।

৬) সুশীল ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ১৭.০৯.২০০৪।

৭) কুন্তলা ঘোষদস্তিদার ঃ বছর ত্রিশের পর ঃ বাংলায় মহিলা ফুটবল ফিরে দেখা (নববিশারী, ভল্যুম, ১১, নং-১, দক্ষিণ ২৪-পরগণা, সম্পাদনা নিরঞ্জন বৈদ্য)

৮) শুভ্রাংশু রায় ঃ পিতৃতন্ত্রের বেড়াজালে পিষ্ট বাংলার মহিলা ফুটবল, (তৃতীয় সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেস, প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার, ২০০৪)

# ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে পণ্য নারী, প্রতিবাদে নারী

## ব্রততী হোড়

১৯৪২-এ চট্টগ্রামে, জাপানী বোমাবর্ষণের ফলে যুদ্ধসঙ্কট ভারতে দেখা দেয়। যুদ্ধসঙ্কটের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে এবং শোষণে ও অন্যান্য কারণে ১৯৪৩ মন্বন্তর, বাংলাদেশে গণমৃত্যু ও ভয়াবহতার দিক থেকে অন্য সব মন্বন্তরকে ছাড়িয়ে গেছিল।[১] দুর্ভিক্ষ যে কেবল মৃত্যু এবং মহামারী ডেকে এনেছে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ভিতকে একেবারে নড়িয়ে দিয়েছে তাই নয়, সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে দুর্বলতর নারী সমাজের উপর। দুমুঠো অন্নের জন্য, বেঁচে থাকার তাগিদে, অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছিল গ্রাম থেকে নগর অভিমুখে অভিপ্রয়াণ যার শতকরা হিসাবে প্রায় অর্ধেক-ই ছিলেন নারী এবং শিশু। যেমন চট্টগ্রাম শহরে খিচুড়ি বিতরণ কেন্দ্রের পুরুষ শরণার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ শতাংশ।[২]

দুর্ভিক্ষের সূচনায় কাজের খোঁজে পুরুষেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেন, আবার পরবর্তীকালে ভাল আমন ধানের আশায় যখন তাঁরা গ্রামে ফিরে আসেন, এবং মহিলাদের রেখে আসেন শরণার্থী প্রাণ কেন্দ্রে। তারক দাস তাঁর Bengal Famine-এ দেখিয়েছেন যে দুর্ভিক্ষে প্রবল ঝাপটায়, খাদ্যের তাগিদে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী এবং সন্তান পরিত্যাগের গড় ছিল ১৯.৮৫% এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামী পরিত্যাগের গড় ছিল ৫০.৪২%। আবার সরকারী ঔদাসীন্যে যখন ত্রাণ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেল, তখন এই বিপন্ন, অসহায়, অশক্ত নারীদের কোথাও যাওয়ার জায়গা আর রইল না। অপুষ্টি এবং দীর্ঘদিন না খেতে পাওয়ায় তাঁদের সন্তান ধারণের শক্তিও নষ্ট হয়।[৩] জেলা বোর্ডের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভবানী সেন দেখিয়েছেন চট্টগ্রামের জন্ম মৃত্যুর হার।

| সাল | জন্ম | মৃত্যু |
|---|---|---|
| ১৯৪২ | ২২.০১ | ২২.০৭ |
| ১৯৪৩ | ১৫.১০ | ৪৭.০৫ |
| ১৯৪৪ | ১৩.৯২ | ২৮.৬০ |

কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে মহিলারা বাধ্য হয়েছেন পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে। প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রকাশিত হয়েছে সেই সংবাদ। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তৎকালীন সম্পাদিকা শ্রীমতি এলারীড ১৯৪৪-এ একটি বিবৃত্তিতে জানান যে, পূর্ব বাংলায়, নৌকায় নাবালিকাদের গ্রাম থেকে আনা এবং নিয়মিত বেচাকেনা চলছে।[৪] একই বিবৃতি দেন শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।[৫] আলি সর্দার জাফরির সমীক্ষায় দেখা গেল কিভাবে এমনকি পাঁচ বছরের শিশুও পতিতাদের দালালের কাজ করছে।[৬]

চট্টগ্রাম হাসপাতালের উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকেই যৌন রোগে আক্রান্ত। সেদিন কেবল নিরন্ন মানুষেরই মৃত্যু হয়নি, মৃত্যু হয়েছিল মানবিকতার, আদর্শের, মূল্যবোধের। পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা সামাজিক পরিকাঠামোর অবলম্বনে সহায়তা করেছিল। শুরু হয়েছিল এক সর্বগ্রাসী ক্ষয়ের।[৭]

৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ছাড়াও যে সোয়া লক্ষ নিঃস্ব, নিরাশ্রয়ের ভীড় ছিল কলকাতা শহরে, তার মধ্যে ৩০,০০০ কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে প্রবেশ করেছেন পতিতালয়ে।[৯] কেবলমাত্র কলকাতা শহরে ১০০০-এর উপর নতুন পতিতালয় গড়ে উঠেছিল। ডঃ সৌরেন বোস-এর লেখা থেকে কলকাতায় পতিতা সংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে নিচের সংখ্যাটি দ্রষ্টব্য।[১০]

১৯২১ সালে পতিতাদের সংখ্যা ১০,২০৭

১৯২৫ সালে পতিতাদের সংখ্যা ১৯,২২০

১৯৩৮ সালে পতিতাদের সংখ্যা ২০,০০০

১৯৪৪ সালে পতিতাদের সংখ্যা ৪৫,০০০ -এরও উপর।

উল্লেখ্য, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৮৮-এ পতিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। এই সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল সরকারও। 'বার্মিংহ্যাম মেইল'-এ এক বৃটিশ অফিসার কর্তৃক এক টাকায় এক বালিকা ক্রয়ের খবর ছাপা হয়।[১১] এর প্রেক্ষিতে যে তদন্তের আদেশ বাংলাদেশে দেওয়া হয় সেখানে প্রায় সব জেলাভিত্তিক রিপোর্টে? ব্যাপক মহিলা কেনাবেচার খবর স্বীকার করে নেওয়া হয়।[১২] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা শ্রীমতি অপর্ণা পালচৌধুরী নিজের দেখা বিবরণীতে "নৌকা বোঝাই করে ব্যবসায়ীরা মেয়েদের চালান দিতো - এসব প্রত্যক্ষ ক'রেছি।"[১৩] ক্ষুধা, মৃত্যু, নৈতিক অবক্ষয়ের চেহারা বড় সাধারণ হয়ে যায় রেনু চক্রবর্ত্তীর ভাষায়, "মেয়েরা দেহ বেচে - নিত্য নৈমিত্তিক ঘাটনা....। দলিতপুরে একজন জোতদার ছ বছরের একটি কুলি মেয়েকে দশ টাকায় কেনে। বাঘরগঞ্জে এক মা তার ছ বছরের মেয়েকে এক দালালের কাছে বেচে দেয়। এই হল ক্ষুধার সর্বগ্রাসী চেহারা।"[১৪]

মন্বন্তর এবং মহামারীর পর অভূতপূর্ব বস্ত্রদুর্ভিক্ষে, মহিলারাই ছিলেন সর্বপেক্ষা বিপর্যস্ত। প্রায় প্রত্যেকদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বস্ত্রাভাবে মহিলাদের আত্মহত্যার খবর ছাপা হত। এক টুকরো কাপড়ের তাগিদে অনেক মহিলারা বাধ্য হ'লেন পতিতাবৃত্তিতে। গ্রাম বাংলার ঘরে তখন দুঃশাসনদের প্রভূত্ব।[১৫]

কিন্তু নারী কেবলই পণ্য নয়, সমস্যাসঙ্কুল দিনগুলির মোকাবিলায় নারীরাই এগিয়ে এলেন প্রতিবাদে, প্রতিরোধে। মানবিকতার এই নিদারুণ সঙ্কটে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পূর্ণোদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমিতির নীতি এবং কর্মসূচিতে এক নতুন মাত্রা এল। এই পর্বে লক্ষ্যই ছিল সব কিছুর আগে প্রাণ বাঁচানো। তাই সমিতির কাজ হল মানুষকে মরতে দেখে নির্বিকার না থেকে যে করে হোক লঙ্গরখানা খোলানো সরকারকে চাপ দিয়ে, শিশু ও সন্তানবতী মায়েদের জন্য দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা, বস্ত্র সঙ্কটে বস্ত্র জোগানো ও সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আন্দোলনে, রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, গোপন মজুত ও কালোবাজারী খুঁজে বের করা, কন্ট্রোলের দোকানে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং নিরাশ্রয় ও দুর্গত মেয়েদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। সমস্যার ব্যাপকতায়, সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বলিত চেষ্টায় গড়ে উঠলো Bengal Womens' Food Committee, Bengal Medical Relief Co-ordination Committee এবং নারী সেবা সংঘ। এইভাবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ধ্বংসের মধ্যেই বাংলার নারী সমাজে এক নতুন চেতনা ও সংহতি গড়ে ওঠার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের আঘাত জনিত সমস্যা, মেয়েদের নিশ্চিত গণ্ডী থেকে বের করে এনেছে। মেয়েরা ক্রমেই বুঝতে পারছেন যে মানুষের মত বাঁচার অধিকার সমাজ তাকে দেয়নি— অথচ ঐ অসহায় অবস্থায় বাঁচানোর দায়িত্বও নিতে পারছে না। সুতরাং তার অধিকার অর্জনের লড়াই তারই। তাই ১৯৪৪-এ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সমিতি দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত নারীদের পুনর্বাসন দাবী, পতিতাবৃত্তি নিবারণ ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির প্রস্তাব নিচ্ছে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় দুঃস্থ মহিলাদের জন্য গড়ে উঠল বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্র, উদ্ধার কেন্দ্র। ঐ সব কেন্দ্রে হাতের কাজ শিখিয়ে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে মহিলাদের পুনর্বাসন এবং সংগঠনের চেষ্টা করা হচ্ছে। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বরিশালে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মনোরমা বসু (মাসীমা) কর্তৃক পরিচালিত নারী কল্যাণভবন এবং মাতৃমন্দির যা গড়ে উঠেছিল সমজে পরিত্যক্তা মহিলাদের নিয়ে যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অবিবাহিতা মা, স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী অথবা একদা পতিতাবৃত্তিতে রত নারী।[১৬] এইভাবে সর্বগ্রাসী এক

ধ্বংসের অন্ধকারের মধ্যে বাংলার নারীত্বের গোপন উৎস থেকে উৎসারিত ঐশী আলোর রেখা দেখা গেল।

**সূত্র-নির্দেশ :**


১) ক) বোধায়ন চট্টোপাধ্যায় — Notes towords an understanding of the Bengal Famine of 1943 (*Yramaction*, June 1981)

খ) Nanavati Papers - Unpublished documents Vol-I.

গ) অমর্ত্য সেন — Famine Mortality : A study of the Bengal Famine of 1943, in Peasent in History, (Essays in honour of D. Thorner) দিল্লী, ১৯৮০।

২) ভবানী সেন — 'Slave trade in Chittagong, Gruersome Picture of Traffic in Women Destitutes'. - Peoples War, ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৪৫।

৩) কে.এম.ফিচ্ — Medical History of Bengal Famine 1943, কলকাতা, ১৯৪৬।

৪) জনযুদ্ধ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪।

৫) জনযুদ্ধ ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৪।

৬) এ.এম. জাফ্রি — 'Through our Attitude of Helplessnss', Men became profiteers, women prostitutes, Children Piimps' - Peoples War, জুলাই ১, ১৯৪৫।

৭) ক) কল্পনা দত্ত — 'Among Chittagong women' Peoples War, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৩।।

খ) ভবানী সেন — 'where civilization Ends and Hell begins : Down the Arakan Road'- Peoples War, ১০ই জুন, ১৯৪৪।

গ) ভানু দেবী — 'স্মৃতিচারণা', একসাথে, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ. ২৫।

৮) ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — 'A plan for rehabilitation in Bengal, কলকাতা, ১৯৪৬।

৯) রজনী পাম দত্ত — India Today, মনীষা, ১৯৭০।

১০) জনযুদ্ধ ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৪।

১১) বার্মিংহ্যাম মেইল, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪।

১২) Confidential Fortnightly reports - (বিভিন্ন জেলা সংক্রান্ত তথ্য) Home Political Files, ১৯৪৩।

১৩) অপর্ণা পাল চৌধুরী — নারী আন্দোলন, স্মৃতিকথা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৫-১৬।

১৪) রেণু চক্রবর্তী — ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা ১৯৪০-১৯৫০, মনীষা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮-৩৯।

১৫) ক) মনি কুন্তলা সেন -- বস্ত্রদুর্ভিক্ষ বাংলার নারী সমাজ, স্বাধীনতা, ১লা জুন, ১৯৪৭।

খ) ভূপেন দত্ত -- 'Women drive to suicide for want of clothes' Peoples War, ২২শে জুলাই, ১৯৪৫।

গ) ভূপেন দত্ত - 'No cloth even to cover the dead' Peoples war, ১১ই মার্চ, ১৯৪৫।

১৬) ক) কনক মুখোপাধ্যায় — 'একটি স্মরণীয় নাম ঃ মনোরমা বসু' — মনোরমা বসু স্মারক গ্রন্থ, সমন্বয়, ১৯৮৭, পৃ. ১৬।

খ) সত্যেন সেন — মনোরমা মাসীমা, খান এন্ড কোং, ঢাকা ১৯৭০।

গ) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় — 'মনোরমা বসু একজন সাচ্চা কমিউনিষ্ট', ইতিহাস অনুসন্ধান-১৬, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ৫৩৯।

# মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে নারী ঃ নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতে

আফরোজা খাতুন

১০ই অক্টোবর ২০০৪-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'আদর্শ নিকাহনামা তৈরি করতে চায় মুসলিম ল-বোর্ড' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে ছিল 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল-বোর্ড তিন তালাকের সমাধান খুঁজতে আদর্শ নিকাহনামা তৈরির কথা ভাবছে। কিন্তু মেয়েদের তালাক চাওয়ার অধিকার দিতে রাজি নয় বোর্ড। এ ব্যাপারে বোর্ডের ঘোষণা 'নিকাহের চুক্তিতে আর্থিক দায়ভার যেহেতু পুরুষকেই নিতে হয়, তাই তালাকের অধিকারও তার হাতেই থাকা উচিত। মেয়েদের ওই অধিকার দেওয়ার কোন যুক্তি নেই।' বর্তমানে যেসব মহিলারা নিকাহের লিখিত চুক্তিতে না হলেও বাস্তবে আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করছে অথবা আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করতে না পারলেও স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি শ্রম দিচ্ছে সংসারে, তাদের ব্যাপারে ল-বোর্ডের নীরব ভূমিকা নজর কাড়ে।

২০০৪-এর শেষ সপ্তাহে 'একচল্লিশ সদস্যের মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতি সর্বসম্মতভাবে একটি আদর্শ বিবাহচুক্তি বা নিকাহনামার খসড়া গ্রহণ করেছে।'[১] এই নিকাহনামায় লেখা হয় 'তিন তালাক আসলে পাপ। যে কোনো ধর্মবিশ্বাসী মুসলিমের উচিত এই পাপ থেকে বিরত হওয়া।'[২] অর্থাৎ তিন তালাক প্রথাকে বাতিল না করে, তাকে পাপ আখ্যা দিয়েই দায়মুক্ত হয়েছেন ল-বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা। আর আদর্শ শরিয়তি মুসলিম স্বামীদের তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু যারা আদর্শ স্বামী নয় তাদের বিরুদ্ধে ল-বোর্ড কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তার কোন খবর আমরা জানতে পারিনি। পাপ, অন্যায়, উচিত নয়, বিরত থাকবেন, মুসলিম পিতৃতন্ত্রের এমন নীতিমূলক শব্দ আরোপে নারী কতটা নিরাপদ সে প্রশ্ন এসেই যায়। অথচ এমন অগণতান্ত্রিক মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন চাইলেই 'গেল গেল' রবে ফেটে পড়ে সুবিধাবাদীরা।

'আমাদের দেশে মুসলিম সমাজ মূলত তিনটি ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে আছে। সেটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মান্য করা হয়। এক, বিবাহসংক্রান্ত, দুই, বিবাহবিচ্ছেদ, তিন,

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বণ্টন পদ্ধতি।[৩] এই নিবন্ধে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত শরিয়তি আইন, তার প্রয়োগ ও নারীর আর্থিক শোষণ এবং মানসিক অত্যাচারের চিত্রকে বিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা উপন্যাসে খোঁজার চেষ্টা করেছি। দেড় হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের অন্ধকারময় দেশের প্রেক্ষাপটে রচিত আইনকে আজকের আধুনিক সমাজে জোর করে টিকিয়ে রাখার পরিণতি কত মর্মান্তিক রূপ নিতে পরে তার দলিল এই উপন্যাসগুলি।

আবুল বাশারের 'ফুল বউ' (১৯৮৮) উপন্যাসের হাজী নিসার হোসেন, তিন স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও চতুর্থবার বিয়ে করেন রাজিয়া নাম্নী এক শিক্ষিতা ষোড়শীকে। অর্থের প্রাচুর্য আর ইসলামী পিতৃতন্ত্রের দাপটে নিসার হোসেনের মন '...... চারটে বিয়েই চায়। সেই বিয়েতে যে-মেয়ের কষ্ট হয় না, নবীর কৃপায় তেমন মেয়ের আকাল হয়নি।[৪] ইসলামী আইনের জোরে দরিদ্র রাজিয়াকে তার অমতেই বিয়ে করেন। 'কবুল' (বিয়ের সম্মতিসূচক স্বীকৃতি) বলতে সে বাধ্য হয়েছিল বাহ্যিক চাপে। তবু এটাও ইসলামিক আইনসম্মত চুক্তিবদ্ধ বিবাহ। যে চুক্তিবদ্ধ বিবাহের আধুনিকতায় মুসলিম সমাজ গর্ব অনুভব করে। রাজিয়াব অনিচ্ছা বিয়ে আটকাতে পারেনি, আটকেছিল যৌন মিলন। স্বামীকে অতৃপ্ত রাখার কারণে ধর্মীয় বিধানে তাই রাজিয়া পাপী সাব্যস্ত হলো।

রাজিয়া চেয়েছিল জীবন। আর সে জীবনকে পুনরায় উদ্ধার করতে হলে স্বামীর কাছে তালাক নেওয়া দরকার। কিন্তু বিয়ে তার ইচ্ছায় ঘটেনি। মুক্তিও (তালাক) তার অধিকারের বাইরে। বিয়েব সময় চুক্তিমূলে তালাক দেওয়ার অধিকার মেয়েদের চেয়ে নিতে হয়। এই সামান্য অধিকারটুকুও পুঁথিগত। প্রচলিত নয়। তাই রাজিয়ার মতো মুসলিম নারীদের স্বামীর কাছে মৌখিক তালাক ভিক্ষা করে ব্যর্থ হতে হয়। যেমন হতে হয়েছে নিসার হোসেনের মেয়ে, প্রাথমিক শিক্ষক সাদিকের স্ত্রী নবীনাকে। সাদিকের দ্বিতীয় বিয়ের পর নবীনা তালাক চেয়েছিল। কিন্তু সাদিক নবীনাকে তালাক দেয়নি। তালাক পাওয়ার জন্য মরীয়া নবীনার প্রশ্ন জ্ঞানী রিয়াজের কাছে 'কোন প্রসিদ্ধ পাপ করলে আমার মুক্তি হবে?'[৫] লেখকের মানসপুত্র রিয়াজ, মুসলমান কোর্টের কথা মানবে না জেনেও বিষণ্ণ নবীনাকে মামলা করার পরামর্শ দেন। ছাড়পত্র পাওয়ার লড়াইয়ে ক্লান্ত নবীনা, বুকে চিনচিনে ব্যাথ্যা নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আবুল বাশারের ধর্মের গ্রহণ (১৯৯২) উপন্যাসে, অনার্স পাঠরত নাস্তিক বেলালের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পাশ দশপারার হাফেজ (কোরানের দশটি অধ্যায় মুখস্থ) নাজনিনের বিয়ে হয়। ধর্ম ও রুচি সংস্কৃতিতে নাজনিন-বেলালের মিল হয় না। তবু সকল ধর্মের

চেয়ে ভালোবাসা বড় এটা যেমন বেলাল বোঝে, তেমনি সূক্ষ্ম এক অনুভূতিতে নাজনিনও অনুভব করে 'ধর্মের সকল নীতি জীবনের সমগ্রকে বাঁধতে পারে না। জীবন যেমন ধর্মের সমান, তেমনই ধর্মের অতিরিক্ত।'[৬] অথচ নাজনিনকে ভুল বুঝে শিল্পময় পৃথিবীর বাসিন্দা নাস্তিক বেলালও তালাক শব্দের সুযোগ নিল রাগের মুহূর্তে। আখ্যানের শুরু থেকে লেখক, যুক্তিবাদী উদার বেলালের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। যার কাছে তালাক শব্দের কোন মূল্য নেই। সেই বেলালও মুসলিম পিতৃতন্ত্রের ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে, ইসলামী আইনের অধিক ক্ষমতায় বলদর্পী হয়ে, সুযোগমতো নারী মনকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। নাজনিন কিন্তু এ তালাক মেনে নেয়নি। সে নিজেকে বেলালের বউ বলেই মনে করে। কিন্তু সহসা তার মনে হয় '...... বেলাল তাকে আর গ্রহণ করবে না, যে কুৎসিত পথে তাকে ফিরতে হবে, অন্যের সঙ্গে বিবাহ, তালাক এবং বিবাহ, এপথ সে মাড়াতে পারবে না।'[৭] দশপারার হাফেজ ধার্মিক নাজনিন জীবনের অসম্মান দিয়ে উপলব্ধি করে ইসলামী আইনের এই নোংরা পথকে।

আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়' (১৯৯০) উপন্যাসে, মালেকার জীবনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একপেশে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে, বিবাহ বিচ্ছেদের জটিলতা। মালেকা কাসেম হাজির বড় সন্তান স্কুল শিক্ষক আলালের স্ত্রী। হাজি বাড়ির শ্বাসরোধকারী পরিবেশে তার বিদ্রোহ শুরু হয় আলালের বিরুদ্ধে। আলালের হাতে অত্যাচারিত মালেকা, অসচ্ছল পিতার জন্য বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবতে পারে না। মানসিক এই অস্থিরতার সময় সে খবর পায় 'দেশে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে। শাহবানু মামলা। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে।'[৮] মুসলমান ব্যক্তিগত আইনের শুদ্ধতা নষ্ট হওয়ায় এই রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম মৌলবাদীরা ক্ষেপে উঠেছেন। অথচ সেই রায়কে মালেকা দরকারী মনে করেছে নিজের জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধের প্রশ্নে। মালেকার ধর্মবোধ, সুপ্রিম কোর্টের রায় শরিয়তি আইনের বিশুদ্ধতার বিরোধী জেনেও এর বস্তুগত প্রয়োজনকে স্বাগত জানায়। সুপ্রিম কোর্টের একটা রায়, গুটিয়ে থাকা মালেকাকে অনেক বেশি প্রতিবাদী করে তোলে। মালেকার সেই প্রতিবাদকে মেনে নিতে না পেরে শিক্ষক স্বামী আলাল ঠিক করে তাকে '........ তার বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে। খোরপোষের দাবি দাওয়া করলে সোজাসুজি তালাক। আর একটা বিয়ে করে নিতে পারবে।'[৯] মালেকাকে তালাক চাবুকে জব্দ করার কথা ভাবার পর মুহূর্তেই আলালের মনে হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের রায় নিশ্চয় মালেকা পড়েছে। এটাই হয়ত তার সাহসের চাবিকাঠি। আর তাই চরম দ্বন্দ্বের সময় মালেকা বাবার বাড়ি যেতে চাইলে মুসলিম পিতৃতন্ত্রের কঠোর গর্জন

ধ্বনিত হয়ে ওঠে আলালের কণ্ঠে— 'তালাক দেব না, পাঠাবও না'।[১০] মুসলিম স্বামীর প্রতিনিধি আলাল চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় শরিয়তে যতটা না আঘাত করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত করেছে মুসলিম পিতৃতন্ত্রের পৌরুষত্বে। সেই পৌরুষত্বের প্রকাশে মালেকার শারীরিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়। সে ঠিক করে স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে কোর্টের সাহায্য নেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে শরিয়তের পক্ষে পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়ে যায়, 'স্ত্রীকে তালাক দিলেও খোরপোষ দিতে হবে না'।[১১] সংসদের মুসলিম নারীবিলে ভেঙ্গে পড়েও মালেকা আইনেরই দ্বারস্থ হল মধ্যবয়সী জাভেদ উকিলের সহায়তায়। কিন্তু সেখানেও মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বাইরে গিয়ে মুসলিম নারীর ন্যায্য বিচার পাওয়ার কোন ব্যবস্থা, ভারতীয় আইনে গড়ে না ওঠার জটিলতাকে জাভেদ উকিলের আইনি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে লেখক তুলে ধরেন, 'আপনি ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নং ধারা অনুসারে মামলা করতে পারেন স্বামীর বিরুদ্ধে। মনে রাখতে হবে আপনার স্বামী কিন্তু কোর্টের চোখে আসামী নয়। আর আপনাকে যে কোন অবস্থাতে তালাক দেবার তার হক আছে। এমন কি আপনার অনুপস্থিতিতে মাতাল অবস্থায় তালাক দিতে পারেন।'[১২] কিন্তু মালেকা জানে ভয়ঙ্কর অহংকারী হাজি বাড়ি থেকে সে তালাক বা খোরপোষ কোনটাই পাবে না।

শরিয়তের অন্ধতা মেনে নিতে না পারায়, জাভেদ উকিল মালেকার পক্ষ নিয়ে লড়াইয়ের বলিষ্ঠ মানসিকতা প্রকাশ করেন। আইনের ব্যবসা করেন বলেই যুক্তি দিয়ে শরিয়ত আইনের উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন তিনি। ধর্মের মধ্যের জীবনসত্যকে আইনব্যবসায়ী জাভেদ উকিল মেনে নেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনে মনগড়া অসত্য আর মৌলবাদীদের অন্ধতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। প্রগতিমনস্ক এই উকিল তাই মুসলমান সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আঘাত হেনে হাসনাতকে বলেন 'এই শরিয়তি আইনেই স্ত্রী, স্বামীকে তালাক দেবার অধিকার পায়। কিন্তু কটা হতে দেখেছেন আপনি? নারীরও যৌন স্বাধীনতা আছে— কিন্তু তা কি হয়? কোরান হাদিস বাদ দিয়েও দুটি পথ অবলম্বন করে মুসলমন আইন তৈরি হয়েছে। এক, 'ইজমা', দুই, 'কিয়াস'। কোরান হাদিসে সমাধান পাওয়া না গেলেও শাস্ত্রকারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল 'ইজমা'। আর 'কিয়া' হল, কোরান হাদিস ও 'ইজমা' দিয়ে সমাধান না হলে জ্ঞান বিবেক দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। 'কিয়াস'-এর জ্ঞান বিবেকের সহায়তায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল শাহবানু মামলার ক্ষেত্রে।'[১৩] এক মনুষ্যত্বহীন, অমানবিক বিধানের পক্ষে পার্লামেন্টের বিল পাশ হওয়াকে মুসলিম সমাজের একাংশ স্বাগত জানাতে

পারেনি। জাভেদ উকিলের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক সেই মতকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট মালেকা দেখেছে, অনেকক্ষেত্রেই শরিয়তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে। 'হজের পাসপোর্টে তো ফটো লাগে। মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে পাসপোর্টের ফটো সরকার নির্দিষ্ট করেনি কোথায়?........ টিভিতে মৌলনারা কোরান পাঠ করে, সেখানে শরিয়তের খেলাপ হয় না?'[১৪] এই ভাবা থেকেই মালেকা জানতে চেয়েছে, কেবল মুসলিম নারী সমাজের বিধানের পরিবর্তনেই, কেন শুদ্ধতা নষ্ট হয় শরিয়তের?

তালাক নিয়ে গ্রাম জীবনের সাময়িক চটুলতাও ভয়ঙ্কর খড়্গারূপে দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝখানে এসে কিভাবে আছড়ে পড়তে পারে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে আফসার আমেদের 'বিধির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' (১৯৯৫) আখ্যানের নতুন ঢঙে। জাহান নাসিমের স্ত্রী, সে দুপুরে পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে শাড়ী হারিয়ে ফেলে। তাই নিয়ে নাসিমের সঙ্গে রাগারাগি হয়। অভিমান করে ভোররাতে জাহান পালিয়ে যায় বাপের বাড়ি। কেউই বুঝতে পারে না জাহানের চলে যাওয়ার কারণ। বেকার যুবক গাজি সকাল থেকে চায়ের দোকানে গুলতানি করে যার দিন কাটে, '........ সে মাঝে মাঝে সামাজিক নানা ঘটনা মিথ্যে করে বলে জনমানসে শোনায়।'[১৫] গাজি জেনেছে, নাসিমের বউ রাতের অন্ধকারে, বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। তাই সে প্রচার চালায়, নাসিম তার বউকে তালাক দিয়েছে। তালাকের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে লোকজনের কাছে। কেউ কেউ মতামতও দেয় 'তালাক দেওয়া তো অন্যায় কিছু নয়। কোরানে আছে কেতাবে আছে।'[১৬] পিতৃতন্ত্রের দাপটে কিভাবে তালাকের বাস্তবতা গড়ে ওঠে তার চিত্র ধরা পড়েছে এই আখ্যানে। একটি ধ্বনির তিনবার পুনরাবৃত্তির সরলতার নিষ্ঠুর রূপকে সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

যদিও নাসিম তার বিবি জাহানকে তালাক দেয়নি কিন্তু 'সে জানে টানা তিনবার তালাক বললেই স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তার কোন বিরোধ নেই। যেহেতু তার ধর্মে মতি আছে। কিন্তু তালাক না দিয়ে, তালাক প্রচার হওয়ার বিরোধী।

সাক্ষী রেখে তিনবার টানা তালাক দিলেই যখন বিবি ত্যাগ হয়ে যায়, এই সরল প্রক্রিয়ার জন্যই নাসিম বিপদাপন্ন হয়েছে, এটা আর একভাবে বোঝে নাসিম।'[১৭] নাসিমের তালাক না দেওয়ার সত্যতাকে অস্বীকার করে, গ্রামের ইমাম আজমত জানিয়ে দেয়, তালাক দেওয়া অন্যায় নয়। একটা নারীর চেয়ে ধর্ম বড়। সবার ধারণা মুহূর্তের রাগে তালাক দিলেও এখন স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য তালাক অস্বীকার

করছে নাসিম। এই সময় কিছু লোকের মনে দরদ দেখা যায় নাসিমের প্রতি। তারা চায় জাহানকে বিয়ে করে আবার তালাক দিতে, যাতে করে পুনরায় নাসিম তার বিয়ে করা স্ত্রীকে নিকা করতে পারে। এমনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আজমত ইমামও। 'তালাক দেওয়া বউও ফেরৎ হয় জানো তো ছোটামিএগ?'[১৮] 'মেইয়াছেলার' জন্য ইমাম নষ্ট না করার পরামর্শ যে মৌলবি দিতে পারে, তার মনেই 'স্বার্থদরদ' উথলিয়ে ওঠে 'মেইয়াছেলা' ভোগের সুযোগ পেয়ে। ইসলাম ধর্মের ধ্বজধারী এই মৌলবিরা, বিবিকে তালাক দেওয়াটা অন্যায় বলে মনে করে না। বিবাহ বিচ্ছেদের এই অমানবিক, চটুল পদ্ধতি এবং তার বিকৃত প্রয়োগে জাহানকে ভাবতে হয়, 'সে যেন খেলনার মতো। কারুর ভালো লাগলে খেলে, তারপর ফেলে দেয়।'[১৯]

আফসার আমেদের অন্তঃপুর (১৯৯৩) উপন্যাসের জাহিরা, একপেশে ইসলামী আইনের সুযোগ নিয়ে স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতায়, জীবনের সব সৌন্দর্য হারিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে ফেরে। স্বামী মইবুর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায়, দুচারদিনের জন্য জাহিরা বাপের বাড়ি চলে যায়। সেই ফাঁকে মইবু বিয়ে করে নিয়ে আসে হাসিনাকে। সতীন আনার ব্যাপারে জাহিরার সমর্থন ছিল না। তাই তার অনুপস্থিতিতে স্বামী বিয়ে করে ফেলে। বিশেষ বিশেষ কারণে প্রথম স্ত্রীর মত নিয়ে, তবে বিয়ে করতে পারার ইসলামী আইন, প্রহসন মাত্র। স্ত্রীর সম্মতি আদায় করতে না পারলেও পুরুষের একাধিক বিয়ে আটকায় না। জাহিরার স্বামী মইবুরও আটকায়নি। সতীনের সংসারে আশ্রিতা হয়ে, কেবল টিকে থাকে জারিহা। আর নারীর অপমানের জায়গা থেকে অপত্নীপ্রসূত বিরোধও তৈরি করে ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাসিনার কৌশলে স্বামীর তালাক পেয়ে, সংসার অধিকারের লড়াইয়ে হেরে যায় জাহিরা। আর তখনই তার মনে হয়, স্বামীর সংসারে 'তালাকের পরে থাকাটা আর বিধিসম্মত নয়। মসজিদের মোল্লা মৌলাধরা নড়ে চড়ে উঠবে। পুকুর ধারে শুষনি শাক তোলার সময় পায়ে উঠে জোঁক নিঃসাড়ে যে রক্ত চুষে খেয়ে মোটা হয়ে খসে পড়ত, তখনই জানতে পারত রক্ত শুঁষে নিয়েছে জোঁকটা। এখন মোল্লা মৌলবিদের দিকে ঘুরে তাকালে এমনটা মনে হয় জাহিরার।[২০] মুসলিম নারীর রক্ত শোষণকারী মোল্লা মৌলবিরূপ জোঁকেরা, কখনও নারীর এহেন বিপদাপন্ন অবস্থার কারণ খতিয়ে দেখে, তাকে নির্মূল করার চেষ্টা করে না।

গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' (১৯৮১) উপন্যাসের দাউদ, স্ত্রী ফুটকিকে রেখে, কালোজিরেকে বিয়ে করার জন্য নিয়ে পালায়। এই খবর নিরাপত্তাহীন ফুটকি অপমান থেকে মুখ লুকোতে পুকুরের জলে আত্মহত্যা করে। আর মুসলিম পুরুষ দাউদ শাস্তির

আইনে না পড়ায়, অন্যায় করেও মনে ভাবে 'মুসলমানের ঘরে দুই বিবি পুষা, কিছুই অন্যায় নয়'।[২১] ফুটকির মৃত্যুতে দাউদ অবাক হয়ে যায়, সে মুসলমানের ঘরের মেয়ে হয়েও সহ্য করার ক্ষমতা না থাকায়। মুসলিম পুরুষের এই মনগড়া অসত্যে আর শরিয়ত আইনের ছোবলে ফুটকিদের মৃত্যু ঘটে।

'কোরানে বলা আছে ঈশ্বর যে কটি কাজ সব চাইতে ঘৃণ্য বলে মনে করেন তার মধ্যে তালাক তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে। কোরানে তালাকের ঢালাও অনুমতি নেই।'[২২] তবু তালাকের অপপ্রয়োগে, যখন নারী জীবন বিপর্যস্ত, তখনও মুসলিম ল-বোর্ডের বৈষম্যমূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী কেন? ল-বোর্ড ঠিক করেছে 'বৈবাহিক সংঘাতের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রথমে মিটমাটের চেষ্টা করবেন। তা না হলে বিষয়টি স্থানীয় উলেমা, শরিয়তি পঞ্চায়েত বা শরিয়তি আদালত দারুল কাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে।'[২৩] কিন্তু যেখানে মেয়েদের তালাক দেওয়া বা চাওয়ার অধিকার বোর্ড দেয়নি, সেখানে এই সব আদালতের কাছে খুব সুবিচার পাবে বলেও মনে হয় না। পুরনো আইনকে নতুন মোড়কে উপহার দেওয়ার এ এক হাস্যকর পদ্ধতি না মেনে 'একই দেশে একই আইন সবার জন্য প্রযোজ্য ...........'[২৪] এই দাবি তুলব না কেন?

## সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) শাশ্বতী ঘোষ, দেশ ঃ ১৭ জানুয়ারী, ২০০৫।

২) উষসী চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১১ জানুয়ারী, ২০০৫।

৩) মইনুল হাসান, মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ৪৬।

৪) আবুল বাশার, ফুলবউ ঃ ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭।

৫) ঐ, পৃ. ১৮৯।

৬) আবুল বাশার, ধর্মের গ্রহণ ঃ তৃতীয় মুদ্রণ ২০০০, পৃ. ১৪২।

৭) ঐ, পৃ. ১৫৬।

৮) আফসার আমেদ, আত্মপরিচয় ঃ ১৯৯০, পৃ. ১১৮।

৯) ঐ, পৃ. ১৩২।

১০) ঐ, পৃ. ১৩৪।

১১) ঐ, পৃ. ১৪৯।

১২) ঐ. পৃ. ১৯৬।

১৩) ঐ, পৃ. ১৯৪।

১৪) ঐ, পৃ. ১১৯।

১৫) আফসার আমেদ, বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পখির কিসসা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩।

১৬) ঐ, পৃ. ৩৪।

১৭) ঐ, পৃ. ৩৯।

১৮) ঐ, পৃ. ৪৮।

১৯) ঐ, পৃ. ৭৯।

২০) আফসার আমেদ, অন্তঃপুর ঃ ১৯৯৩, পৃ. ১৯৪।

২১) গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই ঃ ২০০০, পৃ. ১৪৬।

২২) মইনুল হাসান, মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ৪৮।

২৩) শাশ্বতী ঘোষ দেশ ঃ ১৭ জানুয়ারী, ২০০৫, পৃ. ৪১।

২৪) মইনুল হাসান, পূর্বোক্ত ঃ পৃ. ৪৮।

# যশপালের ছোটগল্পে নারীচেতনা

নমিতা জয়সওয়াল

পরাধীন ভারতের দুঃসহ পরিস্থিতি যশপাল নিজের চোখে দেখেছিলেন। যশপাল প্রেমচাঁদের কেবলমাত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, বস্তুতঃ তিনি হিন্দী সাহিত্যের প্রেমচাঁদ উত্তর উজ্জ্বলতম কথাশিল্পী এবং দার্শনিক। প্রেমচাঁদের পর যশপালই কথাশিল্পীদের নতুন প্রজন্মকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছেন। নিজের ৭৩ বছরের জীবনে (ডিসেম্বর ১৯০৩-ডিসেম্বর ১৯৭৬) মোটামুটিভাবে ৪০ বছর তিনি নিরন্তর লেখালেখি করেছেন। সংখ্যার হিসাবে তিনি প্রায় ২৫০টি গল্পের স্রষ্টা।

মার্ক্সীয় চিন্তার আলোকেই জীবন এবং জগৎকে তিনি দেখেছেন এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কেবল পাঠকদের কছেই নয়, লেখকদের কাছেও তার রচনা সমানভাবে আকর্ষণীয়। বিপ্লবী যশপালকে হিন্দী সাহিত্যের বাস্তববাদী গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম গণ্য করা হয়।

১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ফিরোজপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে যশপালের জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন কাংড়ার অধিবাসী। প্রারম্ভিক শিক্ষা গুরুকুল কাংড়ীতে। উত্তরকালে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে পড়ার সময় তিনি ভগৎসিং এবং সুখদেবের সান্নিধ্যে আসেন। এখানেই যশপালের বিপ্লবী চেতনা বিকশিত হয়। ১৯৩২ সালে তিনি এলাহাবাদে গ্রেফতার হন। বিচারে তার ১৪ বছরের কারাবাস হয়। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার হস্তক্ষেপে ১৯৩৮ সালে তিনি মুক্ত হন। কারাবাসের দিনগুলো তার পঠন-পাঠন এবং গল্প রচনার মধ্যে কাটে। স্বভাবতই যশপালের প্রারম্ভিক রচনাগুলি এই সময়ের লেখা।

নিজের গল্পের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কাহিনীর মাধ্যমে আমি মানুষের সেইসব ব্যক্তিগত এবং সমগ্রিক অবস্থান, আচরণ গ্রহণযোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করি অথবা সেগুলির প্রতি চিন্তাভাবনার ইন্ধন যোগাই, যেগুলো আমার মতে জীবনের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে আছে। এই কার্যে কাল্পনিক গল্প বা উদাহরণ আমার কাছে খুব উপযোগী মনে হয়।'......[১]

যশপালের কাহিনীতে কোথাও কোথাও যেমন নারীকে পুরুষের নৃশংসতা, বর্বরতা

এবং অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে, তেমনই আবার কোথাও ক্ষুধার তাগিদে রূপজীবি হতে হয়েছে। ধনবান পরিবারের অর্থনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা এবং পুরুষের ভৃত্য নারীদের ভ্রান্ত স্বাতন্ত্রের প্রতি তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন। আবার কোথাও একই সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে প্রতিবাদী প্রগতিশীল নারীচরিত্রও তাঁর লেখায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। যশপাল কুণ্ঠিত, মানসিক বিকারগ্রস্ত, শোষিত এবং পরাধীন নারীচরিত্রকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। "যশপাল সমাজকে জাগ্রত করার জন্য লিখেছেন এবং সমাজকে নিদ্রিত থাকতে দেখে অত্যন্ত তীব্রভাবে তাকে লেখনী বিদ্ধ করেছেন।"[২]

মোটামুটিভাবে যশপাল মার্ক্সবাদী নারীচেতনার অনুগামী। তিনি এমন এক সমাজের কল্পনা করেন যেখানে নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং পুরুষের সমানাধিকার ভোগের দাবী করে।

নারীচেতনা একবিংশ শতাব্দীর এক জ্বলন্ত বিতর্কের বিষয়।। নারী চেতনার উন্মেষ পৃথিবী ব্যাপী একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এটি একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যা ক্রমেই উন্নত দেশসমূহের গণ্ডি পেরিয়ে অনুন্নত দেশেও অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। আধুনিক নারী প্রতিরোধের মন্ত্রে দীক্ষিত। এই প্রতিরোধক্রিয়া যদি সেই তীব্রতায় উন্নীত না হত তবে ১৯৭৫ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালনে বাধ্য হত কি? সেই প্রাক্রিয়া পরবর্তী ত্রিশ বছরেও অমলিন। এই সন্ধিক্ষণ থেকেই সমাজে নারীর ভূমিকা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এই পরিবর্তনক্ষণ সম্পর্কে ক্ষমা শর্মার উক্তি, 'আমাদের দেশে এর উৎপত্তি, স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল থেকেই নির্দিষ্ট ছিল।'[৩] যশপালের লেখনী নারীর প্রতি অধিকতর কেন্দ্রীভূত ছিল। তার মতে আমাদের সমাজে নারী যথেষ্ট সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত নয়। তিনি এ ব্যবস্থায় নারীকে নিরুপায় এবং পরাধীন বলে মনে করেন। নারী যখন পরাধীনতার এই শৃঙ্খল ভঙ্গ করে তখন তার স্বতন্ত্র রূপ পরিলক্ষিত হয় এবং তখনই নারী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। "নারীকে পুরুষের প্রাসঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে না দেখে নিজস্ব সত্তায় দেখা শুরু হল। নারীসত্তা স্বতন্ত্র লিঙ্গ রূপে স্বীকৃত হল। একাধারে যেমন লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র হল তেমনই অন্যদিকে নারী চেতনা ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন হল।"[৪]

যশপাল 'প্রেম কা সার' গল্পের মাধ্যমে পুরুষ সমাজকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। তার সৃষ্ট রফিয়া ২৩/২৪ বৎসর দিবারাত্র পরিশ্রম করেও স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকে। পতির সন্ধানে সে লাহোরে পৌঁছায়। পীর হুসেনের হাতে ধরা পড়ে সে বলে "ও আমার সারা জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। আমি যা কিছু করেছি সবই ওর জন্য। ওর জন্যই আমি বন্ধ্যা হয়েছি। এখন যদি ও আমার সাথে না ফিরে যায় তাহলে আমি

ওকে হত্যা করব।"[৫] এমন একনিষ্ঠতার পরেও সে যখন দেখে যে তার স্বামী প্রতারক এবং নিকৃষ্ট তখন সে একথা বলে ফিরে আসে 'আমি ওর মুখ দেখতে চাই না'।[৬] যে স্ত্রী একাধারে ত্রিশ বছর স্বামীর প্রতীক্ষায়ও থাকতে পারে প্রয়োজনে সে এক লহমায় তাকে পরিত্যাগও করতে পারে। গল্পের অন্তিম পংক্তিতে লেখক বলেন, 'এটাই ত্রিশ বছর সাধনার ফল।'[৭]

নারীবাদী সমাজের প্রবক্তা যশপাল পুরুষকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং বলেছেন 'অধুনা স্ত্রী পুরুষের নিজ নিজ জীবনসঙ্গী চয়নের স্বাধীনতা অনেক বেশী। আবার সহজেই নিজেরা বিচ্ছিন্নও হতে পারে। বয়স এবং সংস্কৃতিতেও এখন উভয়ের পার্থক্য পূর্বের চেয়ে কম। পতি পত্নীর স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয়।" যশপালের 'বৈষ্ণবী', 'শিকায়ত', 'জাঁহা হাসদ নহী', 'ছলিয়া নারী', ইত্যাদি গল্পের নায়িকারা নিজেদের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় সফল।

পতিব্রতা গল্পে নায়িকা শেঠের রক্ষিতা হয়ে থাকতে অস্বীকার করে। কারণ সে 'নারীকে ভোগ্যবস্তু মনে করা' শেঠের বশ্যতা মানতে রাজী নয়।

আজকের নারী নিজের জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। সে জানে যতক্ষণ তার অর্থনৈতিক স্বকীয়তা অর্জিত না হচ্ছে ততক্ষণ প্রগতি সম্ভব নয়। কেননা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পুরুষের কুক্ষিগত। ফলত আধুনিক নারী ধনসম্পত্তির বৃত্তে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনে ক্রমেই উৎসাহ দেখাতে থাকে এবং তাকে নিজের অনুকূলে আনার প্রচেষ্টায় থাকে।

'হালাল কা টুকরা'-র নায়িকা 'ফুলিয়া' বারবণিতা হয়েও বিবেক এবং সততার আশ্রয় ছাড়ে না। দু'টাকায় বিক্রি হওয়া রূপজীবি, কংগ্রেস নেতা 'রাবতের' দু'হাজার টাকা অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে। 'আমরা কি পীর ফকির যে অঞ্জলি পেতে দান গ্রহণ করব। পরিশ্রমের বিনিময়ে অথবা সেবা করে প্রাপ্য জিনিসে আমার ন্যায্য অধিকার থাকবে। অবস্থা এমন নয় যে ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিতে হবে।"[৮]

জ্ঞানদান নামক গল্প সংগ্রহের 'গাস্তেরী' গল্পে বিগতযৌবনা এক বাইজীর শুকনো তনুদেহ দেখে দর্শকের মধ্যে লালসার উন্মত্ততার বদলে ঘৃণা এবং বিকর্ষণের অনুভূতি হয়।

"এই বাইজী ইক্ষুসম, কিন্তু ক্রমাগত পেষণে নিঃশোষিত। এখন সে নীরস। এখন আর এর মূল্য কি?"[৯]

'দুখী দুখী', 'আবরু' এবং 'আদমী যা প্যায়সা' ইত্যাদি গল্পে সমাজ, জীবন এবং সামাজিক মূল্যবোধের উপর লেখকের ব্যঙ্গ এত তীব্র যে আমাদের নাড়া দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে কেবল আর্থিক সমস্যাই কি নারীকে দেহজীবি হতে বাধ্য করে? নারীচেতনার সারকথা হল যে যখন নারী নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারবে তখনই সে চেতনভাবে নিজের অন্তরে লুক্কায়িত অপার সম্ভাবনার সন্ধান পাবে। এইসব সম্ভাবনা প্রকাশ করতে যশপাল নিজের 'কারবাকা ব্রত', 'জবরদস্তি', 'পরায়া সুখ' ইত্যাদি গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। "কারবাকা ব্রত" গল্পে নারীচেতনার এক নতুন রূপ পরিলক্ষিত হয়। "এই ধর্মান্ধ জগতে কেবল নারীই কেন স্বামীর দীর্ঘজীবনের জন্য উপবাসের ব্রত উদ্‌যাপন করবে? পুরুষও কেন স্ত্রীর জন্য ব্রত করবে না, কেন স্ত্রীকে সমানাধিকার দেবে না।"[১০] গল্পের শেষে কানাইয়ালাল স্ত্রীকে বলে, "পরের জন্মে যদি তোমার আমাকে প্রয়োজন থাকে, আমার কি তোমার প্রয়োজন নাই?"[১১]

নারীচরিত্র চিত্রণের ব্যাপারে যশপালের উপর অভিযোগ করা হয়, কিন্তু এটাও সত্য যে নারীচরিত্রের বৈচিত্র্যের প্রশ্নে যশপলের চেয়ে বেশী মুখর এবং সাহসী লেখক তার সময়ে কেউ ছিলেন না।

যশপালের রচনায় যৌনতা ও অশ্লীলতার চিরন্তন যে অভিযোগ, আজ তার পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্ন উঠেছে। মার্কসবাদ সুস্থ জীবনের দ্যোতক। তাই দেহজ সম্ভোগ যশপাল অনিবার্য এবং প্রত্যাশিত মনে কবেন। যৌনতাকে যশপাল আবশ্যিক মনে করেন, কিন্তু অবশ্যই সেভাবে নয়, যেভাবে প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শন যৌনতাকে দেখত। তাঁর মতে মানুষের শারীরিক পরিতৃপ্তির প্রশ্নের সমাধান স্বেচ্ছায় হওয়া উচিৎ এবং কোন বিধিনিষেধের বেড়াজাল থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু একথার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে যশপাল উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অরাজকতা সমর্থন করেন। মার্কসবাদ নিজেই উচ্ছৃঙ্খলতাকে অপরাধ মনে করে। যৌনসমস্যা সংকুল গল্পগুলির মধ্যে 'প্রতিষ্ঠা কা বোঝ', 'আতিথ্য', 'উত্তমী কী মা', 'দুসরী নাক', 'তুমনে কিউঁ কহা থা ম্যায় সুন্দর হুঁ', 'জিম্মেওয়ারী', 'আবরু', 'খানদান', 'নির্বাসিত' ইত্যাদিকে অন্যতম মনে করা হয়।

'তুমনে কিঁউ কহা থা ম্যায় সুন্দর হুঁ' গল্পে এমন এক শিক্ষিত নারীর বেদনার বর্ণনা আছে যে যৌন পরিতৃপ্তির অভাবে আজীবন কুণ্ঠিত ছিল। শ্বাসকষ্ট, কুণ্ঠা এবং মর্মবেদনায় সে ক্রমে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময় তার পরিচয় হয় নিগম নামে এক শিল্পীর সাথে। অনিবার্যভাবে সে নিগমের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু নিগম অক্ষমতা ব্যক্ত করায় সে বলে, "তুমনে কিঁউ কহা থা ম্যায় সুন্দর হুঁ"।

যশপাল সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম দেখে মনে হয় যে, "যৌন সততার প্রশ্নই হোক বা রাজনৈতিক পারস্থিতির বিশ্লেষণ— সচেতনভাবে ও সামাজিক দায়িত্বশীলতায়

বাস্তবসম্মত প্রশ্নের উত্থাপন এবং তার সমাধানের প্রশ্নে তিনি পলায়নী মনোবৃত্তি দেখাননি।''[১২]

যশপাল আজ আমাদের মধ্যে নেই। যদি থাকতেন তাহলে দেখতেন, যে নারীকে তিনি মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন, পূর্ণ অস্তিত্ব ও আকাঙ্খার সাথে দেখতে চেয়েছিলেন, সেই নারী সমাজ বঞ্চিত থেকে হয়ত সেভাবে নতুন রূপে উন্নীত হয়নি, কিন্তু আজ নারী নিজের অধিকার সম্বন্ধে নিজেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আজ বৃহৎ সংখ্যক লেখিকা সক্রিয়ভাবে নারীর অস্তিত্বের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা শরীরের উর্দ্ধে উঠে নিজেদের মূল্যায়নের দাবী করছেন। যশপালের পরবর্তী প্রজন্মের 'মন্নু ভাণ্ডারী', 'কৃষ্ণা সোবতী', 'উষা প্রিয়ংবদা' এবং তৎ পরবর্তী প্রজন্মের কথাশিল্পী 'প্রভা খৈতান', 'চিত্রা মুদ্গল', 'মৈত্রেয়ী পুষ্পা', প্রভৃতি লেখিকারা নারীচেতনাকে পরিবর্তনশীল সময়ের উপযোগীরূপে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যায় যে, যশপালের কথাসাহিত্য পারম্পরিক ধর্মান্ধতার গোলামী থেকে নারী চেতনা এবং মুক্তির প্রথম জ্বলন্ত দলিল।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) যশপাল, 'ম্যায় কিঁউ লিখতা হুঁ'— পৃ. ২২, ২৩।
২) যশপাল, 'ন্যায় কা সংঘর্ষ'— ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২।
৩) শর্মা, ক্ষমা, স্ত্রীত্ববাদী বিমর্ষ ঃ সমাজ অব সাহিত্য, পৃ. ২০।
৪) সিং, সুধা, স্ত্রীবাদী প্রেমচাঁদ, তদ্ভব, অঙ্ক ৭, এপ্রিল ২০০২ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৮।
৫) প্রেম কা সার, যশপাল কী সম্পূর্ণ কহানীয়াঁ, (খণ্ড ১, পৃ. ৩৭)।
৬) ঐ, পৃ. ৩৮।
৭) ঐ, পৃ. ৩৮।
৮) হালাল কা টুকরা, যশপাল কী সম্পূর্ণ কহানীয়াঁ, খণ্ড ১ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৮।
৯) গাড্ডেরী, যশপাল কী সম্পূর্ণ কহানীয়াঁ, খণ্ড ১ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২২৪।
১০) ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতী, বর্ষ ১৫, অঙ্ক ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩, যশপাল বিশেষাঙ্ক, পৃ. ৬০।
১১) 'করবা কা ব্রত'— যশপাল কে সম্পূর্ণ কহানীয়াঁ, খণ্ড ১ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৭।
১২) মধুরেন ক্রান্তিকারী যশপাল. পৃ. ৪১।
১৩) ইন্দ্রগ্রস্থ ভারতী, (বর্ষ ১৫, অঙ্ক ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩), যশপাল বিশেষাঙ্ক, পৃ. ৬১।

# বিপ্লবী আন্দোলনে নারী—কিছু ভাবনা, কিছু প্রশ্ন

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

"সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ।
হে ভৈরব শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো।
দূর করো মহারুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কাহতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত
তব দীপ্তরৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তর শৃঙ্খল মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ"

কবির আবেগ নয়, দুঃখ নয়, হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা শ্রদ্ধা।

এ পথ কঠিন, এ পথে পদে পদে বাধা, এ পথে হাঁটতে নিজের কাছে নিজের বার বার জিজ্ঞাসা — তবুও এ পথ বার বার টানে অস্থির অশান্ত তরুণ তরুণীকে, সব দেশে সব কালে। এ পথের নাম বিপ্লব - সশস্ত্র বিপ্লব - এ পথে মানুষ আসে দেশকে ভালবেসে দেশকে অত্যাচার মুক্ত করতে, দেশকে স্বাধীন করতে। মৃত্যুকে এরা ভয় পায়না, মৃত্যুকে এরা বুক পেতে নেয়।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের যথার্থ স্থান নির্ণয়ের বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা খুব কমই হয়েছে — তবে নেই এমন কথা বলা যাবে না। অধিকাংশ ইতিহাসবিদই সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলনকে বিপ্লবীদের দেশপ্রেম, বীরত্ব, দুর্জয়, সাহস, আত্মত্যাগের এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় মনে হয়েছে এরা আমাদের নাগালের বাইরে। আমরা এদের শ্রদ্ধা করেছি, এদের মৃত্যুভয়হীন লড়াই আমাদের মনে আলোড়ন তুলেছে। কিন্তু আমরা বোঝার চেষ্টা করিনি, কোন পটভূমিতে কি রকম পরিবেশে বিপ্লব চিন্তার উন্মেষ হয়েছিল।

আন্দোলনের গোপন চরিত্রের দরুণ, দলিল ও প্রামাণ্য তথ্যাদি লোকচক্ষুর অন্তরালে

রয়ে গিয়েছিল। কারণ বিপ্লবীরা কোন কাগজ পত্র, ইস্তাহার, চিঠি রাখেননি, অধিকাংশই পুড়িয়ে ফেলেছেন। তবে অনেককিছুই গোয়েন্দা দফতরের তৎপরতায় পুলিশের হেফাজতে রয়ে গেছে। প্রশাসনিক স্তরেও খবরা খবর সংগ্রহ করে ফাইলবন্দী করা হয়েছে। আজকাল এগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে, তবে পুলিশ রিপোর্ট কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বিবেচনা করে দেখা দরকার।

আজকাল যে সব গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে তথ্যের প্রাচুর্য্য আছে, তবে বিশ্লেষণের চেষ্টা ততখানি নেই বলে মনে হয়। বিপ্লবীরাও যে রক্তমাংসের মানুষ তাদের মনেও যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে, পরিবার পরিজন ছেড়ে তাঁরা যে 'মারের সাগর পাড়ি' দিয়েছেন, তাদের মনের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাদের জীবনের আশা আকাঙ্খা — এসব আমরা ভেবে দেখিনা। শুধুমাত্র নথি পত্র ঘেঁটে মানুষকে ঠিক চেনা যায়না। সে কারণে বিপ্লবী আন্দোলনকে অনেকে বলেছেন রোমান্টিক - অর্থাৎ খানিকটা আবেগতাড়িত হয়ে ছেলে মেয়েরা এই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, এমনকি শহীদের মৃত্যুও বরণ করেছেন। তাদের দেশপ্রেমে কোন সংশয় প্রকাশ না করেও বলেছেন, এই ভাবে কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করে দেশ তো স্বাধীন করা যায়না। তাছাড়া এদের আন্দোলনের গোপনীয়তা, এদের জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। দেখা গেছে গ্রামের লোকেরা কখনও কখনও বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা পুলিশকে বলে দিয়েছে, নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও রেষারেষি আন্দোলনের সফলতার পথে বিরাট বিঘ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। এমনকি অনেক গোপন পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় গোপন আস্তানা থেকে পলাতক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। দেশপ্রেম ও বিপ্লবীদের দুর্জয় সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েও কোন কোন ইতিহাসবিদ ব্যর্থ আন্দোলনের জন্য বিপ্লবীদের ভুল নীতিকেই দায়ী করেছে। তাদের মতে এ পথ যে ঠিক নয় দেরীতে হলেও বিপ্লবীরা বুঝতে পেরে মূল রাজনীতির স্রোতে শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছেন।

তথ্যবিশ্লেষণ করে তখনকার পরিস্থিতি রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং ইতিহাসের তথ্যগুলিকে আরেকটু তলিয়ে দেখলে সম্ভবত অন্যরকম চিত্রও বেরিয়ে আসতে পারে। মেয়েদের ইতিহাসও কিন্তু ভিন্ন নয়।

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার 'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা'য় লিখছেন "বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশী আন্দোলন এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কার্যকলাপের কথা প্রথম শুনি আমার মায়ের মুখে। ......হঠাৎ একদিন দেখি মা কয়েকখানা বই নিয়ে গোপনে রান্নাঘরে ঢুকছেন সেগুলি পুড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে। দুটি বইয়ের নাম এখনও মনে আছে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা "ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত', এবং রজনী গুপ্তের লেখা 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস'। মাকে নানান প্রশ্ন করি মার কাছেই শুনি অগ্নিযুগের নানা কাহিনী। রূপকথার মতই রহস্যময় রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনীর বীর, বীরাঙ্গনারা আমার কাছে হয়ে দাঁড়ায় এক নতুন মহত্তর জীবনের প্রতীক।

আবার মনে পড়ে চারণকবি মুকুন্দদাস মাথাভাঙ্গাতে (কুচবিহার) এলেন তাঁর স্বদেশী যাত্রার দল নিয়ে। পর পর কয়েকদিন ধরে পালাগান শুনি। এ যেন নতুন ধরনের যাত্রা। মনে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার জোয়ার এনে দেয়। অত্যাচারী জমিদার, ভন্ড সমাজপতি, সুদখোর মহাজন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সবাইকে হুঁশিয়ারী দিয়ে মেঘমন্দ্র স্বরে গান ধরেন

"সাবধান! সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়েরই দন্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান।"

'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন' নাটকটির অভিনয় দর্শকদের হৃদয়ে স্বাধীনতার প্রেরণাকে দুর্বার করে তুলত। শুধু আবেগ নয়, রোমান্টিক উত্তেজনা নয়। দেশভক্তির দর্শন। সে দর্শনে মানবতা আর স্বাদেশিকতা একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে।[১] জাতীয় অবমাননা সবারই মনে গ্লানি আর বেদনাবোধের জন্ম দেয়। অধিকাংশ মানুষই সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারেনা, তবে কেউ যদি প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়ায় তবে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ দিতেও কুণ্ঠিত হন না।

ঠিক তেমনই রিভলবার ধরতে অনেকেই সাহস পাননা। বিপ্লবের দুর্গম পথে যাবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্খা সব মানুষেরই আছে। তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যারা জীবনকে পণ করে বিপ্লবের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন, মানুষ তাদের ভালবেসেছেন, বিপ্লবীদের ফাঁসি হলে সাধারণ মানুষের মন দুঃখে ভেঙ্গে গেছে, পারলে তারা বিপ্লবীদের নানানভাবে সাহায্যও করেছেন।

মনিকুন্তলা সেন "সেদিনের কথায়" - লিখছেন, 'বিপ্লবী আন্দোলনের বীর ও বীরঙ্গনাদের আত্মত্যাগ আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করছে। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনও আমাকে নাড়া দিচ্ছে। এর মধ্যে মনুষ্যত্বের আহ্বান পাচ্ছি।

দেশের জন্য যারা এভাবে ফাঁসীতে যেতে পারেন তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ তাঁরা তো সকলের জন্য নিজেকে দান করলেন।

আবার গান্ধীজিও একজন তপস্বী হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য এভাবে জনসাধারণকে পথ দেখাচ্ছেন আমার সেখানেও সমর্থন আছে। আমরাও তো স্বাধীনতা চাই।[২]

মনিকুন্তলা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিছু একটা করতে হবে এই প্রেরণা কেবলই যেন তাকে ঠেলতে লাগল। বিপ্লবীরা মন জুড়ে আছেন। 'যুগান্তর' নামে এক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হতে ইচ্ছে করছে, শান্তি সুধা ঘোষের সঙ্গে আলাপ হবার পর।

আমার মায়ের মধ্যে দেখি দেশপ্রেমের পরিষ্কার চেতনা। একদিন মা খেতে বসেছেন। খবরের কাগজ এল দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির সংবাদ নিয়ে। দেখলাম মার চোখে অবিরল জলের ধারা। না খেয়ে মা উঠে গেলেন। ক্ষুদিরাম ও ভগৎসিং এর ফাঁসির সংবাদেও মা এমনই বিচলিত হয়েছেন। মায়ের কান্না আমার বুকে যেন হাতুড়ি পিটাত। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের কয়েকখানা ছবি পেয়েছিলাম। তার মধ্যে প্রীতিলতার ছবিও ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ছবি গুলো দেখতাম ও মনে মনে এই পথে যাবার জন্য প্রবল আকর্ষণ বোধ করতাম।[২]

১৯২৩ সাল, কংগ্রেসের অধিবেশন হল বরিশালে। এটুকু শহরে এতবড় একটা ব্যাপার শহরময় তোলপাড় শুরু হল। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হল স্কুলের বিরাট মাঠে। সেখানে ভাষণ দেবেন গান্ধীজি।

গান্ধীজি এসেই শুনলেন যে ঐটুকু শহরে পতিতা নারীর সংখ্যা প্রায় তিন শত। তারাও সভায় এসেছেন গান্ধীজির আমন্ত্রণে। গান্ধীজি অসহযোগের কথা বললেন, তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি পতিতা মেয়েদের বললেন, 'তোমরা দেশের কাজে আত্মদান করো আমি তোমাদের জীবিকার দায়িত্ব নেবো। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে পনেরো-কুড়িজন মেয়ে কংগ্রেসে এলেন এবং চরকা ও খাদির কুটির শিল্পাশ্রমে যোগ দিলেন।

"এদের মধ্যে একজনের কথা মনে আছে, তার নাম সরোজিনী। সবাই সরোজদি বলে ডাকত। তিনি জগদীশ আশ্রমে (বরিশালে) পূজাঘরের কাজের দায়িত্ব পেলেন। জগদীশচন্দ্র তাকে লেখাপড়া শেখাতেন, তার হাতের রান্নাও খেতেন। ঘটনাটি শহরে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল"।[৩]

মনিকুন্তলা সেন শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিপ্লবী আন্দোলন অথবা কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিলেন না, যোগ দিলেন কমিউনিষ্ঠ পার্টিতে, তাঁর ধর্মবোধ কমিউনিস্টপার্টিতে আসার পথে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলছেন, শেষপর্যন্ত বহু বই পড়ে, আলোচনা করে এবং এ.বি.সি. ও কমিউনিজম বইখানা পড়ে আমার মনে হল এর মধ্যে আমার ধর্ম ও রাজনীতি দুইই খুঁজে পাচ্ছি, বইখানা পড়ে পড়ে মুখস্ত করে ফেলেছি। পরে মাকে পড়ে শোনালাম মা বললেন, এই যদি রাজনীতি হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। এতো মানুষের জন্য কাজ করা, এটাই ধর্ম।[৪]

বিপ্লবীজীবনের কাহিনী চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত গোপনে থাকবে এই ছিল বিপ্লবীদের শিক্ষা ও সাধনা। সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার লিখছেন 'জিতেশদা একজন প্রথম সারির বিপ্লবী নেতা, তবে আমাদের সঙ্গে সহজ ভাবে কথাবার্তা বলেন।' আমি বলি 'বাংলায় বিপ্লববাদ' বইটিতে তখনকার যুগের কিছু আভাষ পাওয়া যায়। উত্তরে তিনি বলেন 'বই পড়ে কতটুকু বোঝা যায়'।

আজ তোমরা কিছু কিছু বই পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাও, প্রকাশ্য সভা সম্মেলনে আলোচনা কর। সব কথা খোলাখুলি না বলতে পারলেও আভাষে, ইঙ্গিতে অনেক কিছু বলতে পারো। কত নতুন মত ও পথের কথা জানতে পারো। সেই তুলনায় আমাদের সুযোগ ছিল কতটুকু! চারিদিকে যেন অন্ধকার। একদিন যে ভোর হবে সেকথাই বা তখন কজন ভাবতে পারে? ভীরুতা আর নিষ্ক্রিয়তার জীবনদর্শন পায়ের শিকল হয়ে পিছনে টেনে রেখেছে। সেই অবস্থার মধ্যে বসে দেশকে স্বাধীন করবো এই স্বপ্ন দেখাটাই ছিল মস্তবড় দুঃসাহসের ব্যাপার! আর যারা স্বপ্ন দেখেই থেমে থাকেনি, ঘর ছেড়ে ব্যক্তিগত জীবনের কামনা বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে পথে বার হয়ে এসেছে তাদের সেই পদক্ষেপের প্রকৃত মূল্য যদি বুঝতে নাও পারো, তার অমর্যাদা করোনা। জেলে অমানুষিক অত্যাচার, বন্দী অবস্থায় দিনের পর দিন নিদারুণ লাঞ্ছনা আর অপমান। এই ছিল দেশসেবার পুরস্কার, বিপ্লব সাধনার আশীর্বাদ।

নিছক রোমান্টিক উন্মাদনাকে সম্বল করে তো এই রকম সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কেউ কেউ পথভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগই শিরদাঁড়া সোজা রেখে বেরিয়ে এসেছে। এসেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আবার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। তাদের সামনে কেউ পথের রেখা চিহ্নিত করে দেয়নি। বিজ্ঞেরা কেউ পাশে থেকে হাত ধরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেনি। সেদিনের বোঝায় হয়ত ভুল ছিল, ছিল অনেক অসম্পূর্ণতা। কিন্তু দেশপ্রেমে ফাঁকি ছিলনা। তোমরা তাদের পদচিহ্ন ধরেই এগিয়ে চলেছ। এটুকু যদি ভুলে যাও তাহলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে।[৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে অস্ত্র রেখে বা পারাপার করে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে অনেক মহিলা দুঃখ নির্যাতন ভোগ করেছেন। দুকড়িবালা দেবী এবং ননীবালা দেবী শুধু অসম সাহসের কাজ করেছিলেন তা নয়, সেকালের রক্ষণশীল সমাজে হিন্দু ঘরের বিধবা হয়ে শাখা সিঁদুর পরে যে ভাবে এক বিপ্লবী বন্দীর সঙ্গে দেখা করে অস্ত্রের সন্ধান নিয়ে এসেছিলেন, তা দুঃসাহসিক কাজ কোন সন্দেহ নেই। এরা দুজনেই জেল খেটেছিলেন এবং জেলের মধ্যেও যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, এ কথা আজ সবারই জানা।

কিন্তু মেয়েরা সক্রিয় ভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন অনেক পরে, ত্রিশের দশকে। ১৯২৮ এ সাইমন বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে মেয়েরা প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রথম আসেন। ১৯২৮'র কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে ওঠে, যার নেতৃত্বে ছিলেন লতিকা ঘোষ এবং অরুবালা সেন। বেথুন কলেজ এবং স্কটিশচার্চ কলেজের মেয়েরা এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন মেয়েদের খুব একটা প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না। স্বদেশী বয়কট ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মেয়েদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও মেয়েদের সহযোগিতা আন্দোলনকে সফল করেছে। তবে গান্ধীজির ডাকেই মেয়েরা প্রথম সাড়া দিয়েছেন সক্রিয় ভাবে। ১৯২৭-২৮ সালেই কলকাতায় ও ঢাকায় মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবী দল ও চরিত্র গড়বার প্রেরণা দেখা দিয়েছে। সেই আবর্তন তরুণ চিত্তকে ঘিরে ফেলতে চাইছিল।

কমলা দাশগুপ্ত *রক্তের অক্ষরে* বইতে লিখছেন ১৯২৭-২৮ সাল, গান্ধীজির প্রভাব তখন দেশকে এক বিপুল ধাক্কায় চঞ্চল করে তুলেছে। ......ওদিকে বেরিয়েছে শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*। সেই বই রাত জেগে পড়ে যেন অভিভূত হয়ে যাই, যেন নতুন জগতের আভাষ পাই। গান্ধীজিকে চিনি, যেন বেশী বুঝি। সহানুভূতিটুকু কিন্তু কেড়ে নিয়েছে ভারতী আর ডাক্তার।[৬]

কমলা দাশগুপ্ত তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী। কলেজের মেয়েদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। কলেজের দুই বন্ধু কল্যানী দাস ও সুরমা মিত্রর সঙ্গে একদিন কমলা দেখা করতে গেলেন শচীন মিত্রর সঙ্গে, তিনি ছিলেন ছাত্রসংঘের সম্পাদক। দীর্ঘ আলোচনায় শচীন মিত্র একটা কথাই জোর দিয়ে বললেন সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া আর কোন পথেই স্বাধীনতা আসতে পারে না। তিনি পৃথিবীর নানান দেশের বিপ্লবের কাহিনী বলে এটাই প্রমাণ করতে চাইলেন — এটাই ইতিহাসের চিরন্তন শিক্ষা। কমলারা তিন বন্ধুই তর্ক করলেন গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনই স্বাধীনতা এনে দেবে। এরা ফিরে এলেন মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা নিয়ে। এত কালের বিশ্বাসের ভিত্তি যেন টলে উঠল। নতুন পথ হাতছানি দিচ্ছে। আসলে শচীন মিত্র ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। পরে তিনি গান্ধীবাদী হয়েছেন এবং ১৯৪৬র কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় নিজের জীবন আহুতি দিয়েছেন।

এরপর কমলা আরও নানান গুপ্ত দলের কাছে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন — কিন্তু মনের সংশয় কাটেনি। তারপর আবার কল্যাণী দাসই নিয়ে গেলেন দীনেশ মজুমদারের কাছে। তিনি স্বদেশী করেন। কল্যাণীর অনুরোধে তিনি

মেয়েদের লাঠি খেলা শেখাতে রাজী হয়েছেন। তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য। কমলাও এলেন লাঠিখেলা শিখতে। এখানেই কমলার রাজনীতির যাত্রাপথ পাল্টে গেল।

দীনেশ মজুমদার একদিন কমলাকে নিয়ে গেলেন দলের একজন নেতার কাছে। সবটাই গোপন। দীর্ঘ আলোচনার পর কমলা দাশগুপ্ত ১৯২৯-এ যোগদিলেন বিপ্লবী যুগান্তর দলে। তিনি বলেছিলেন "এখানে সবই দুঃখকষ্ট, তবুও আমরা কাজ করে যাই। স্বাধীনতা আনবার জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি। পরাধীনতার অপমান নীরবে সহ্য না করে একটা অসম সাহসিক চেষ্টায় ইংরেজকে জানাব আমাদের প্রতিবাদ, হানব আঘাত, দেশব্যাপী বিপ্লবের পর সেদিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসবে, সেদিন আমাদের সাফল্য ও সার্থকতা।"[৭]

কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা রক্ষিত রায় এরা কেউই এমনকি ছেলেরাও বাড়ির কাউকে জানিয়ে এ পথে আসেন নি। বিশেষ করে মেয়েরাতো বাড়ির অনুমতিই পেতেন না। তাছাড়া সবটাই এত গোপন যে জানাবার কথা ভাবতেই কেউ পারতেন না।

কমলা দাশগুপ্ত লিখছেন "পরাধীন দেশের যত ছেলে মেয়ে, বাবা মায়ের চরম অবাধ্য হয়ে সেদিন সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিল, তাদের সব বাবা মাই বুঝি এমনিতরো গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন, আবার এমনি করেই সন্তানের কর্মপথে অজস্র আশীর্বাদ দুহাতে ছড়িয়ে গেছেন। সার্থক হয়েছিল দুর্গম যাত্রাপথ"।[৮]

"আমাদের বাড়িতে স্বাদেশিকতার ঢেউ প্রথম এসে যখন লাগে, তখন আমি খুব ছোট। ১৯২১ সালের আন্দোলনে আমাদের বাড়িতে বেশ একটু সাড়া পড়েছিল। আমার সেজ ভাই পড়া ছেড়ে সত্যাগ্রহ করে জেলে গেলেন। বাড়িতে চরকা ঢুকল। বাবার কিনে দেওয়া চটের চেয়েও মোটা একখানা লাল খদ্দরের শাড়ি দিয়ে ফ্রক থেকে শাড়িতে পদোন্নতি হল। ......বাড়িতে শুনতাম বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র সুভাষবাবুর কথা — তিনি আই. সি. এস. ছেড়ে দিলেন রাজনীতি করবেন বলে।"[৯]

মনে মনে ঠিক করলেন আমরাও দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবো। এই সময় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইটি প্রকাশিত হল। বইটি বাজেয়াপ্ত হল, তাই পড়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল। সেবার ম্যাট্রিক দেবো। পরীক্ষা সামনে। বইটি একবার পড়ে আশ মেটে না, কেবলই পড়ি, বার বার পড়ি, বইটা যেন আগাগোড়া মুখস্ত হয়ে গেল। ....বাবাকেও দেখলাম রাত জেগে বইটি শেষ করলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইংরেজী ফার্ষ্ট পেপারে প্রশ্ন ছিল 'তোমার প্রিয় উপন্যাস', লিখে এলাম 'পথের দাবীর' উপর ইংরেজিতে এক প্রবন্ধ।

কলেজে গিয়ে বড় লাইব্রেরী পেলাম। নানারকম ইতিহাস আর ইংরেজী উপন্যাস

পড়া আরম্ভ করলাম। পড়লাম 'নির্বাসিতের আত্মকথা', কারাকাহিনী, বাংলায় বিপ্লববাদ প্রভৃতি বই নিয়ে আসত বন্ধুরা। কলেজের পিছনে বসে পড়তাম। ভাবতাম "এমনি জীবন আমাদের হয়না কেন!"[১০]

সুভাষচন্দ্র একদিন বাড়িতে এলে বীনা তাকে হাঠাৎই জিজ্ঞেসা করলেন "আচ্ছা আপনার কী মনে হয়, কীভাবে দেশ স্বাধীন হবে — হিংসার পথে না, অহিংসার পথে'? খানিকটা চুপ করে থেকে সুভাষবাবু বললেন ' আসল কথা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জন্য আগে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীনতার জন্যও আমাদের সারা দেশটাকে পাগল করে তুলতে হবে। তখন হিংসা অহিংসার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠবে না।

বীনা দাস গুপ্ত দলে যোগ দিলেন, এর পর থেকে তার জীবনের ধারা ক্রমে ক্রমে বদলে গেল। বেথুন কলেজ ছেড়ে ডায়োসেসানে চলে এলেন। বিপ্লবী দলও তো একটা না। যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসংঘ এগুলো বড় দল তাছাড়া আরও ছোটখাটো দল ছিল। সমস্ত কিছুই একটা গভীর গোপনীয় রহস্যে আবৃত। কোন প্রশ্ন করা চলেনা, অবান্তর প্রশ্ন নিষিদ্ধ, কারও নাম জানা যেতনা। কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনা। প্রথমটায় মনে ধাক্কা লেগেছিল, পরে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

বীনা দাসের মত কত মেয়ে সেদিন এসেছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে — শান্তি, সুনীতি, প্রীতিলতা, কল্পনা, উজ্জ্বলা — কি অপরিসীম সাহস, এদের দেশপ্রেমের মধ্যে কোন খাদ ছিলনা।

*শৃঙ্খল ঝঙ্কারে* বীনা দাস লিখছেন — "অনেক সময় ভাবতাম জেলে যদি না আসতাম কী হতে পারতাম? হয়তো ভাল করে এম. এ. পাশ করতাম, একটা স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে যাওয়াও অসম্ভব ছিলনা। তারপর ফিরে এসে মোটা মাইনের চাকরি ....জীবনের গোপন অতৃপ্তি কি ঘুচত, গভীর আকুতি কি মিটত? একটা লুকোনো কাঁটা ভিতরে ভিতরে কি ক্ষতবিক্ষত করে তুলত না? এর চেয়ে কি শতগুণে ভাল নয়, এই যে দেশের জন্য মানুষের জন্য যারা লড়াই করে চলেছে তাদের পাশে চিরদিনের জন্য নিজের একটুখানি স্থান করে নেওয়া।"[১১]

দেশের ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে বাঙলার যুবক এগিয়ে এল। হাতে তাদের মারণ অস্ত্র, চোখে মুখে বিদ্রোহের বহ্নি। তাদের সেদিনের অভিযান কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছিলনা, তাদের আঘাত ছিল যাদের অত্যাচারের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল অতবড় সাম্রাজ্য তাদেরই বিরুদ্ধে। তাঁরা জানতেন এতে স্বাধীনতা আসবেনা। তবে তারা এও জানতেন তাদের আদর্শ ব্যর্থ হবে না — তাদের মৃত্যু দেশকে প্রতিবাদ করার, রুখে দাঁড়াবার সাহস দেবে।

"মহাত্মাজীর অসহযোগ অস্ত্রের উপযোগিতা এই নিরস্ত্র দেশে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করবে কে? তবু ১৯০৮ সাল থেকে সেই ক্ষ্যাপা তরুণের দল যদি জাতির হৃদয়কে এমনি করে মৃত্যুবরণের জন্য, দুঃখবরণের জন্য, ঘুম ভাঙিয়ে প্রস্তুত না করে যেত, মহাত্মাজীর অসহযোগ অস্ত্র ধারনের মতো শক্তি হোত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভারতবর্ষের মুক্তির ইতিহাসে শুধু তার নাম ও তার কাজ লেখা থাকলেই সে ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। সেখানে থাকতে হবে বাঘা যতীনের কথা, থাকবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গৌরবময় অধ্যায়, নেতাজীর ইমফল অভিযানের কাহিনী। বাদ পড়বেনা মেদিনীপুর, বালুরঘাট, সাতারা, বালিয়ার জাতীয় সরকার গঠনের ইতিহাস, স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুলিশের গুলির মুখে দরিদ্র মজদুর কিষানের অবিচল দাঁড়িয়ে থাকার কথা।"[১২]

৭ বছর পর জেলের বাইরে এসে বীনা দাস দেখলেন ১৯৩২ সালের রাজনীতি আর ১৯৪০ সালের রাজনীতি এক নয়। স্বাধীনতার আকাঙ্খা ছড়িয়ে পড়েছে জনসাধারণের মধ্যে। শুরু হয়েছে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন। যুব সমাজের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব খুব বেশী। সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ — একটা নতুন আদর্শ, নতুন সমাজ ব্যবস্থার দিকে বিপ্লবীরাও আকৃষ্ট হচ্ছেন।

১৯৪৭ সাল ১৫ আগষ্ট দেশ স্বাধীন হল, বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃহত্যা, ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ কলহ সব কিছু নিয়ে। তবুও তো স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কালিমা আজ মুছে যাচ্ছে। কিন্তু এ কোন ভারতবর্ষ? জীবনের শেষ জন্মদিনে কবি এ কি দৈববাণী করেছিলেন! "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে?" কিন্তু মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে কবি শেষ কথা বলে গেলেন "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।"[১৩]

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার — *আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা*, ১ম পর্ব, (১৯২৭-১৯৪৫) পৃ: ৩০,৩৭ - ১৯৭৩, মনীষা গ্রন্থালয়।

২) মনিকুন্তলা সেন — *সেদিনের কথা*, পৃ: ২৫-২৬, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

৩) ঐ — পৃ: ২৬-২৭।

৪) ঐ — পৃ: ২৯-৩০।

৫) সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার — *আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা*, পৃঃ ১২৬-২৭।
৬) কমলা দাসগুপ্ত — *রক্তের অক্ষরে* (২য় সংস্করণ-সাহিত্য সংসদ পৃঃ ২-৩, ১৯৯৫)।
৭) কমলা দাসগুপ্ত — *রক্তের অক্ষরে*, পৃঃ ১৪।
৮) ঐ — পৃঃ ৮৪।
৯) বীনা দাস — *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, জয়শ্রী প্রকাশন, ২য় সংস্করন ১৪০২, পৃঃ ৬।
১০) ঐ — পৃঃ ৮-৯।
১১) ঐ — পৃঃ ৩৭।
১২) ঐ — পৃঃ ১৫।
১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *সভ্যতার সংকট*, ১৯৪১।

# সারাংশ

## ঊনিশ শতক থেকে একবিংশ শতকের আলোয় সতীদাহ

বলরাম চক্রবর্তী

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বাধীন ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। বস্তুত সতীদাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের ওপর এত কেন ভাবতে হচ্ছে সেটাই চিন্তার বিষয়। আজকের তথাকথিত উন্নততর ভারতে বিতর্কের শর্তগুলো পাল্টে গিয়ে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু সতীদাহের চেহারার রূপান্তর ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত আইন থাকা সত্ত্বেও এই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আজও ঘটে চলেছে ভিন্ন চেহারারূপী সতীদাহ বা নারী নির্যাতন। ভাবতে অবাক লাগে যে দেশে, যে সমাজে নারীরা হচ্ছে পর্বতাবিজয়ী, যারা আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রণী, একাধারে সেনা ও সেনানী, যারা আজ মরু ও মহাকাশ অভিযানে পুরুষের সহযাত্রী, যারা আজ সংসারে গর্ভধারিণীমাতা, কন্যা, ভগ্নি ও বধূর ভূমিকা পালন করে সেই নারীদেরই এক নৃশংস জঘন্য সামাজিক প্রথা আজও তাদের দগ্ধ করে মারছে এটা সত্যি মর্মান্তিক।

এই প্রবন্ধে আমি যে বিষয়টা উত্থাপন করতে চেয়েছি সেটি হল— প্রথমে ঊনিশ শতকের সতীদাহের বর্ণনা এবং তার পরবর্তী শতকগুলিতে সতীদাহের চেহারা বদল হয়ে কিভাবে নারীরা আজ দুষ্ট ক্ষতর যন্ত্রণায় ভুগছেন সেই বিষয়টাই আলোচিত হয়েছে।

ঊনিশ শতকের গোড়ায় যে প্রথাটি বাঙালী সমাজকে আলোড়িত করেছিল সেটি হল সতীদাহ প্রথা। খ্রীষ্টপূর্বকাল থেকেই এই প্রথার প্রচলন ঘটেছে। সতীর উল্লেখ পাওয়া যায় নানা তথ্য থেকে। যেমন— ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের ৭ম ও ৮ মে, রামায়ণ-মহাভারতে, পরাসর সংহিতা ইত্যাদিতে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পেও এই প্রথার চিত্র ধরা পড়ে।

সতীদাহের অন্যতম কারণ হল পুরুষাধিকারের ঘোষণা। এছাড়া কুসংস্কারের শিকার হয়ে সতী প্রথা ঘটত। এই কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণগুলি ছিল বংশমর্যাদা, বংশকে পবিত্র করার ইচ্ছা। রাতারাতি লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ ইত্যাদি। তবে স্বেচ্ছায় সতীর ঘটনাও ঘটত। ১৮২৯-এর আইন হওয়ায় সতীদাহ পূর্বের তুলনায়

কম হলেও একেবারে পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এরপর ১৯৮০ ও ১৯৮৭ তে আবার সতীদাহ-র ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই জঘন্য প্রথা সমাজের ভিতরে শিকড় গেঁড়ে বসল? কেন সতীর রূপ বদলে গিয়ে নারী নির্যাতন-এর স্থান দখল করল? এর কারণ হল মেয়েদের অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা, অজ্ঞানতা, শিক্ষাহীনতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব এবং সচেতনতার অভাব। এই সমস্যার সমাধান হলেই নারী সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। নতুন করে নারী তার নিজস্বতাকে খুঁজে পাবে।

# মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ১৯০৪-১৯৩৫

সুমনা ঘোষাল

আমার প্রবন্ধের শিরোনাম হল 'মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' ঃ ১৯০৪-১৯৩৫। অর্থাৎ মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকরা তাদের সমাজের মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে কি ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তাঁরা কি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, না তার বিরোধিতা করেছিলেন? হিন্দু মেয়েদের তুলনায় পশ্চাৎপদ, মুসলিম সমাজের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ পর্দানশীন, ধর্মভীরু, নানাবিধ উৎপীড়ক বিধিনিষেধের অনুশাসনে বন্দিনী নারী কীভাবে কুসংস্কারের মায়াজাল ছিন্ন করে, জেনানা মহলের দুর্ভেদ্য অবরোধের প্রাচীর ভেঙে ফেলে শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়েছিলেন?

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় মুসলিম মহিলাদের অধিকারের কথা, তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছে ১৯০৪ সাল থেকে। কারণ এই বছরই রোকেয়ার প্রথম লেখা 'আমাদের অবনতি' (পরে নাম পাল্টে হয়েছিল 'স্ত্রীজাতির অবনতি') প্রকাশিত হয় 'নবনূর'-এ, যা একটি যুগের সূচনা করেছিল এবং এটা ছিল আধুনিক নারীজাগরণের যুগের প্রথম সার্থক পদক্ষেপ। এই প্রবন্ধ শেষ হয়েছে ১৯৩৫-এ। ১৯৩৫ সালের পর থেকে বহু ঘটনাবলী বাঙালি সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল যার প্রভাব পড়েছিল নারীর মনোজগতেও। ফলে মেয়েদের চিন্তাচেতনার

পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৫ সালের ভারত সংস্কার আইনে নারীর ভোটাধিকার না থাকায় মুসলিম মেয়েরাও আন্দোলন শুরু করেন, ফলে মেয়েদের দাবী আর শিক্ষাতে সীমাবদ্ধ থাকে না।

রোকেয়া থেকে শামসুননাহার মাহমুদ— বাঙালি মুসলমান মহিলার শিক্ষা, কর্ম এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণের এটা ছিল একটা নতুন যুগ। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা, তাদের শিক্ষাব মাধ্যমে কর্মে প্রবেশের কথা, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কথা এই সময়কার মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় ফুটে উঠেছিল। বেগম রোকেয়া, শিক্ষাব্রতী খায়রন্নেসা, মিসেস এম. রহমান, নূরন্নেছা খাতুন, আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, ফজিলতুন নেসা, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, শামসুননাহার মাহমুদ প্রমুখ মহিলা সাহিত্যিকগণ মুসলিম সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে তাদের মুক্তির উপায় স্বরূপ নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে তাঁদের প্রবন্ধগুলি তুলে ধরেছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা— যা মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী করেছিল এবং যার মাধ্যমে তারা পেয়েছিল মুক্তির আস্বাদ— সে সবই এই প্রবন্ধে আলোচিত।

# বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকাল

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলে বর্তমান উত্তর প্রদেশের ব[illegible]জেলার উত্তরে কপিলাবস্তু রাজ্যের শাক্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোদন ও মাতা রানী মহামায়া। তিনি ছিলেন রাজসন্ন্যাসী সর্বত্যাগী মহাপুরুষ। জীবনের প্রাচুর্যের মধ্য হতেই তিনি জীবন সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে দুঃখ অনন্ত ও অসীম এবং সময় অতি ক্ষণস্থায়ী। তিনি মানুষকে সঠিক পথ বা দুঃখমুক্তির উপায় দেখানোর জন্যই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মমত ছিল সে সময়ে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য কিংবা অপরাপর আজীবিক ধর্মমতের চাইতে ভিন্নতর এবং একান্তভাবে বাস্তবমুখী ও সার্বজনীন। তিনি অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য প্রথা এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য বা অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরঞ্চ এসবের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে। তাই বুদ্ধের ধর্মমতকে বলা যায় 'একটি বিপ্লবী প্রতিবাদী সুসংস্কৃত ধর্মমত'। বুদ্ধ তাঁর সুসংগঠিত সংঘকে নিয়ে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এ সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের হাজার হাজার মানুষ বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে সংঘে প্রবেশ করেন। ফলে বুদ্ধের জীবিতকালেই মগধ, কোশল, বৎস, গান্ধার, বৈশালী, শাক্যরাজ্য প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারলাভ ঘটে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরও উপরোক্ত অঞ্চলের রাজন্যবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ এবং পরবর্তীকালে মগধ সম্রাট মহামতি অশোক (খ্রিঃপূঃ ২৭৩-২৩২), কনিষ্ক (১ম শতক), হর্ষবর্ধন (৭ম শতক), পালবংশীয় রাজগণ (খ্রিষ্টীয় ৭৫০-১২৫০) প্রমুখদের সক্রিয় সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষসহ বহির্বিশ্বে প্রচার, প্রসার ও বিকাশ ঘটে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কখন এবং কিভাবে প্রচারিত হয় তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। পিটকান্তর্গত কোনো গ্রন্থে বাংলাদেশের নামোল্লেখ নেই। সুত্ত পিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়ে মগধ, কাশী, কোশল আদি ষোলটি মহাজনপদের নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু এতেও বাংলাদেশের নাম নেই। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁর পবিত্র দেহভস্ম (ধাতু) ও অস্থিধাতু বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী ও রাজন্যবর্গ বন্টন করে নিয়েছেন।

এসব রাজ্যের মধ্যেও বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশের নাম দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন যে, বাংলাদেশ যেহেতু শক্তিশালী মগধের নিকটতর অঞ্চল সেহেতু বাংলাদেশ হয়ত তখন মগধ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পিটক-পরবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য এবং কিছু প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী অনুমান করা যায় যে, বুদ্ধের সমসাময়িক কালেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ ঘটে। সিংহলী ইতিহাসাশ্রয়ী মহাবংশ ও দীপবংশ নামক কাব্যে নিম্নরূপ একটি আখ্যান পাওয়া যায় ঃ

বঙ্গদেশের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, সেই রাজকন্যা মগধে যাবার সময় পথিমধ্যে রাঢ়দেশে এক সিংহ কর্তৃক অপহৃত হন। উক্ত সিংহের গুহায় তাঁর সীহবাহু ও সীহ সীবলী নামে এক পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তিনি পুত্র-কন্যাসহ পালিয়ে এসে বঙ্গদেশের সেনাপতিকে বিয়ে করেছিলেন। যথাসময়ে বঙ্গরাজ্যের মৃত্যু হলে অমাত্যগণ সীহবাহুকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সীহবাহু সেনাপতিকে রাজ্যাভিষিক্ত করে রাঢ় দেশে চলে যান। এখানে তিনি সীহপুর নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সীহসীবলীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁদের বহু সন্তানের মধ্যে বিজয় সীহ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বিজয়ের স্বভাব ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। রাজা তাঁর চরিত্র শোধনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে রাজা সাতশ সঙ্গীসহ বিজয়সীহ (বিজয় সিংহ)কে একটি জাহাজে করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বে তাঁরা সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) উপনীত হন। কথিত আছে, বুদ্ধের নির্দেশক্রমে দেবরাজ ইন্দ্র ভবিষ্যতে লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বিজয় সিংহের উপর ভার অর্পণ করেছিলেন। বিজয় সিংহ লঙ্কার যক্ষদিগকে পরাস্ত করে রাজ্য ও সধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিজয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেবকে বঙ্গদেশ হতে লঙ্কায় এনে রাজ্যাভিষিক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বহুকাল এবংশের রাজগণ সিংহল শাসন করেছিলেন। বিজয় সিংহের নামানুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হয় সিংহল।[১] আখ্যানটির ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু বলা কঠিন। তবে প্রাচীন কাল হতে ভারতবর্ষের সাথে সিংহলের যোগাযোগ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের সাথে সিংহলরাজ প্রিয়তিষ্যের মধ্যে যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্বন্ধ গভীরভাবে গড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ও অন্যান্য সাহিত্যে প্রমাণ রয়েছে। উপরোক্ত আখ্যানটির সত্যতা স্বীকার করলে বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

পিটকগ্রন্থ সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ একবার সুম্ভভূমির (সুহ্মভূমি) অন্তর্গত সেতক নামক নগরে আগমন করে কিছুদিন অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

তেলপত্ত জাতকেও (১ম খণ্ড, জাতক নং ৯৬) সুমভ্‌ বা সুহ্ম জনপদের নামোল্লেখ রয়েছে। এজনপদটি ছিল গঙ্গাভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বহুলাংশ পশ্চিম এবং হাবড়া জেলা নিয়ে গঠিত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।[২] অঙ্গুত্তর নিকায়ে 'কজঙ্গল' নামে একটি সূত্র থেকে জানা যায়, বুদ্ধ একসময় কজঙ্গলার সুবেসু বনে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ চম্পা হতে কজঙ্গল গিয়েছিলেন। বর্তমান এ জনপদের নাম কাঁকজোল। এটা প্রাচীন অঙ্গ, উত্তর রাঢ় ও গৌড়ের মধ্যবর্তী রাজমহলের পার্শ্ববর্তীতে অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ ও কজঙ্গলকে বঙ্গের অন্তর্গত বলে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃত বিনয় গ্রন্থে এ সীমা পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বলে উল্লেখ আছে।[৩]

সুত্তপিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়ে বঙ্গান্তপুত্ত নামে এক খ্যাতনামা বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরদিকে পিটকগ্রন্থ থেরগাথা ও সংযুক্ত নিকায়ে বঙ্গীশ নামে একজন প্রতিভাবান ভিক্ষুর উল্লেখ রয়েছে। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তাঁর কবিত্বের প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাৎক্ষণিক স্বরচিত কবিতাছন্দে তিনি বুদ্ধ ও বুদ্ধ-শিষ্যদের গুণগান রচনা করে সকলকে অভিভূত করে দিতেন। পণ্ডিতদের ধারণা বঙ্গান্তপুত্র ও বঙ্গীশ বঙ্গ দেশের আদিবাসী ছিলেন বলেই এরূপ নামে অভিহিত হয়েছিলেন।[৪]

অবদান শতক[৫] এবং একাদশ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা[৬] নামক গ্রন্থদ্বয়ে জানা যায়, শ্রাবস্তী নিবাসী বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের কন্যা 'সুমাগধা'কে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের বৃষভদত্ত নামক জনৈক নিগণ্ঠনাথ পুত্রের অনুসারীর সাথে। তাঁর শ্বশুর বাড়ির সকলেই ছিলেন জৈনধর্মমতে বিশ্বাসী। কিন্তু সুমাগধা ছিলেন আজন্ম গৌতম বুদ্ধের ধর্মে একান্তভাবে আস্থাশীল। একদা সুমাগধা ধ্যানযোগে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে নিমন্ত্রণ করলে তিনি পাঁচশত ভিক্ষু শিষ্যসহ আকাশমার্গে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে সুমাগধার শ্বশুর বাড়িতে উপনীত হন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে সুমাগধার শ্বশুরবাড়ির লোকজন বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিউয়েন সাঙ বলেছেন যে, বুদ্ধ দীর্ঘ ছয় মাস বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), সমতট (পূর্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ বা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ) ও কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ) রাজ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি উপরোক্ত জনপদ বা রাজ্যগুলো পরিদর্শনকালে অশোক কর্তৃক নির্মিত বহু স্তূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকে রচিত দিব্যাবদান গ্রন্থে জানা যায় যে, মধ্যদেশের পূর্বসীমা পুণ্ড্রবর্ধন নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৭]

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী শিলালিপি থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মৌর্য

আমলে পুন্ড্রবর্ধন বর্তমান মহাস্থান একটি প্রসিদ্ধ শাসনকেন্দ্র ছিল এবং এখানে একজন 'মহামাত্র' বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সূচনা হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক) শাসনামল থেকে। তিনিই প্রথম তৎকালীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা সমগ্র বাংলাদেশ তখন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮] মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী-শিলালিপিখানি মৌর্যসম্রাট অশোক কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে স্থিরকৃত হয়েছে। এ লিপিতে ছবগ্গীয় বা ষড়বর্গীয় থেরবাদী ভিক্ষুদের উল্লেখ রয়েছে। এ শিলালিপির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের প্রতি রাজকীয় কোষাগার এবং শষ্যভাণ্ডার থেকে তেল, ধান, গণ্ডক ও মূদ্রা সাহায্যদানের নির্দেশ রয়েছে। এ নির্দেশনামা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কিংবা মৌর্যসম্রাটের আজ্ঞাবহ্ সামন্তরাজ্য ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে পুন্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচী স্তূপের দুটি দানলিপি থেকে। এ লিপিদ্বয় থেকে জানা যায়, পুঞবঢন বা পুন্ড্রবর্ধনবাসী ঋষিনন্দন নামে জনৈক পুরুষ এবং ধর্মদত্তা নাম্নী জনৈক মহিলা সাঁচী স্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ নির্মাণে অর্থ দান করেছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মানুরাগী বা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন বলেই এ মহৎ দানকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৯]

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আরো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ নাগার্জুনকোণ্ডায় একটি শিলালিপি থেকে। এ শিলালিপিতে অন্যান্য দেশের নামের তালিকার সাথে থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অন্যতম আবাস হিসেবে বঙ্গের নামোল্লেখ রয়েছে।[১০]

অপরদিকে মহাযান সাহিত্যে ষোড়শজন মহাস্থবিরের নাম রয়েছে, এঁদের মধ্যে কালিক থের ছিলেন তাম্রলিপ্তিবাসী বাঙালি ভিক্ষু। সম্ভবত তিনি প্রাক-গুপ্তযুগের ব্যক্তি ছিলেন।[১১]

প্রাক্-গুপ্তযুগের মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি অস্থিখণ্ড। এ লেখটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটা সম্ভবত 'ধর্মীয় দান' রূপে প্রদত্ত হয়েছিল। লেখটির সম্পাদক অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনা অনুযায়ী লেখপাঠ হল 'চেতগোঠ'। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এ শব্দটির অর্থ করেছেন 'চেত' (চৈত্ত>চেত্ত>চেত) এবং 'গোঠ' (গেঠ>গোষ্ঠী) অর্থাৎ মিলনস্থল; অর্থাৎ চৈত্য নামক একটি বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসকদের মিলনস্থল। এই চৈত্যক বা চৈতীয় গোষ্ঠী ছিল মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা। মহাবস্তু অবদানে এই শাখার কার্যাবলী

সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে যে, স্তূপ প্রদক্ষিণ বা চৈত্য উপাসনার ধর্মীয় বিধিই এই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মাচরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এজন্য এগোষ্ঠীকে 'চৈত্যক' বলা হত। খ্রিষ্টীয় প্রথম কয়েক শতকে এ চৈত্যক গোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ রেছিল। উল্লেখিত খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লেখটির সময়কাল নাগার্জুনকোণ্ডা ও অমরাবতীর লেখগুলোর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক নাগাদ অন্ধ্র প্রদেশের মৌলকেন্দ্র থেকে এই 'চৈত্যক' গোষ্ঠীর কিছু উপাসক বঙ্গ অঞ্চলে অভিবাসিত হয়ে প্রাক-গুপ্ত বঙ্গে তাদের দ্বিতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত একটি ভগ্নবুদ্ধের বা বোধিসত্ত্বের মূর্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূর্তিতত্ত্বের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সরস্বতী এটাকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের বলে সনাক্ত করেছেন।[১২] এই ঐতিহাসিক বিষয়টি প্রমাণ করে যে, প্রাক-গুপ্তযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছিল।

অপরদিকে পিটক বহির্ভূত পালি সাহিত্য বিশেষ করে বংশ সাহিত্য পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের আট বছর পর গবম্পতি থেরর প্রার্থনায় মিয়ানমার (বার্মা) প্রাচীন রামঞঞ রাষ্ট্রের সুধর্মপুরে উপনীত হয়েছিলেন।[১৩] এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। মিয়ানমারে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ সেদেশে গমন কালে তাঁর সাথে বিশ হাজার অর্হৎ ভিক্ষু সঙ্গী ছিলেন।[১৪] পালি মহাবগ্‌গ মতে (অনু. পৃঃ ৪-৫) গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের সপ্তম সপ্তাহের শেষ দিন তপস্‌সু ও ভল্লিক নামে দুজন মধুবণিক মধু ও মধুপিণ্ঠক দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেছিলেন। এ দু'জন ছিলেন বুদ্ধের প্রথম গৃহী উপাসক। পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন তাঁরা ছিলেন উড়িষ্যার অধিবাসী। অপরপক্ষে Dr. Earrnests Halenyi এবং U Thein Haing দাবী করেছেন যে, তপস্‌সু ও ভল্লিক বণিকদ্বয় মিয়ানমার অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা বাণিজ্যার্থে ভারতে গমন করেছিলেন এবং বুদ্ধ বোধি জ্ঞান লাভের পর তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তাঁরা বুদ্ধকে মধু ও মধু পিণ্ঠক দান করেছিলেন; বুদ্ধ তাঁহাদিগকে আটটি কেশধাতু প্রদান করলে তাঁরা ইয়াঙ্গুন শহরের সোয়েডাগন প্যাগোডায় উক্ত কেশধাতু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বুদ্ধ যদি স্বয়ং মিয়ানমার গমন করে থাকেন তাহলে তাঁকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হয়েই যেতে হয়েছিল, কারণ তখন এটাই ছিল মিয়ানমার যাবার প্রশস্ত ও সহজ পথ। কাজেই তখন চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া, কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধ স্বয়ং একবার চট্টগ্রামের হস্তীগ্রামে এসে পক্ষকাল অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেই হস্তীগ্রাম পটিয়ার হাইদগাঁও বলে মনে করা হয়। এখানে একটি বুদ্ধমন্দির বা কেয়্যাংও ছিল।[১৫] আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদও

উল্লেখ করেছেন যে, বৌদ্ধরা এদেশের আদি অধিবাসী।[১৬] পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরীও একই মতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, মগধদেশ হতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকগণ পূর্ব দেশে এসে ধর্ম প্রচার করেন এবং চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম।[১৭]

বৌদ্ধসাহিত্য মহাবংস মতে[১৮] তৃতীয় সঙ্গীতি সমাপ্তির পর সম্রাট অশোক নিম্নদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক (ধর্মদূত) প্রেরণ করেছিলেন। তখন সোন ও উত্তর ভিক্ষুর নেতৃত্বে একটি প্রচারকদল প্রেরিত হয়েছিল সুবর্ণভূমি বা বর্তমান মিয়ানমারে। কিংবদন্তী অনুযায়ী ধারণা করা হয়, তাঁরা চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান ও মিয়ানমার গিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা চট্টগ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বিষয়টি প্রচলিত ধারণা বা কিংবদন্তী হলেও যুক্তিপূর্ণ। অশোক কর্তৃক ধর্মদূত প্রেরিত দেশ সমূহের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। এছাড়া অশোকের কোনো শিলালিপিও (ধর্মলিপি) বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। একারণে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, অশোকোত্তর যুগে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল। অপরপক্ষে ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ মনে করেন যে, অশোকের আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাংলায় কোনো কোনো স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল।[১৯] পূর্বোক্ত মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিখানি মৌর্য সম্রাট অশোক কর্তৃক বিজ্ঞাপিত বলে ক্যানিংহাম মনে করেন। যদিও এটাতে মূলত আপদকালীন সময়ে রাজ্যবাসীকে সাহায্য প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। এছাড়া অশোক পরবর্তী যুগে হিউয়েন সাঙ, ইৎসিঙ প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকগণ বাংলাদেশের সর্বত্র যে যে স্থানে গৌতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন সেই সেই স্থানে মৌর্য সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত স্তূপগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ মগধের অতি নিকটতর একটি রাজ্য। তখন এটা মগধ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাও বিচিত্র নয়; বিশেষ করে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে তো বটেই। অপরদিকে বুদ্ধ মহাবোধি প্রাপ্তির পর আদি মধ্য অন্তকল্যাণ কর নৈবানিক ধর্ম দিকে দিকে প্রচার করার জন্য নবদীক্ষিত ষাটজন ভিক্ষুকে নির্দেশ দিয়ে নিজেও বিভিন্ন এলাকায় ধর্ম প্রচারে বের হয়েছিলেন; দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচারের সময় তিনি এবং তাঁর শিষ্যগণ বাংলাদেশে আগমন করা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত বলেই মনে হয়। নিরেট ঐতিহাসিক দলিল না থাকলেও উপরোক্ত যুক্তিগুলো উপেক্ষা করার নয়। বাংলার যুবরাজ বিজয় সিংহ সেই বুদ্ধের সময় কালেই শ্রীলঙ্কায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছিলেন, সিংহলী কিংবদন্তী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

উপরোক্ত আলোচিত বৌদ্ধ ঐতিহ্য, বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য, প্রচলিত কিংবদন্তী, চৈনিক পর্যটকদের বিবরণ, ঐতিহাসিক ও গবেষকদের বস্তুনিষ্ঠ অভিমতের

পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে, বুদ্ধের সময়কাল (খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক) থেকে খ্রিঃ পূঃ ৩য় শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রচারলাভ করেছিল এবং মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পরবর্তীতে স্থানীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি সমগ্র বাংলাদেশে একটি প্রধান ধর্ম হিসেবে দীর্ঘকাল বেঁচেছিল এবং এদেশের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতির সামগ্রিক বিকাশে অসীম অবদান রেখেছিল।

## সূত্র নির্দেশ ঃ

১) মজুমদার, রমেশ চন্দ্র; বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা, ৭ম সং, ১৯৮১, পৃঃ-২৫।
২) রায়, নীহার রঞ্জন; বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৪০২, পৃঃ-১১৭।
৩) রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১০০, ৪৯৪।
৪) Malalasekera, G.P; The Proper Names of Pali Dictionary, Vol. P. 803।
৫) Mitra, R.L.: The Sanskrit Literature of Nepal, Delhi, 1981, pp. 73, 237।
৬) অনুবাদ-শরৎ চন্দ্র দাশ, কলিকাতা, ১৩৩৮, পৃঃ ২৬৫-৭১।
৭) Law, B.C.; Geography of Early Buddhism, Delhi, 1973, pp. 1-2।
৮) আহমদ, নাজিমুদ্দীন; পাহাড়পুর, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ-৩।
৯) Epigraphica of Indica, Vol. II, No. 102, p. 108; No. 217, P. 380।
১০) Epigraphica of Indica, Vol. 20, 192-30, p. 22।
১১) রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৪৯৫।
১২) ইতিহাস অনুসন্ধান : প্রবন্ধ-প্রাক-গুপ্তবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব, সরিতা ক্ষেত্রী, ২০০০, পৃঃ ৮৭-৮৮।
১৩) মহাস্থবির, ধর্মাধার; অনুঃ শাসন বংশ পৃঃ-৫৫।
১৪) প্রাগুক্ত, পৃঃ-৫৫।
১৫) আলম, ওহিদুল; চট্টগ্রামের ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে আধুকিকাল), চট্টগ্রাম, ১৯৮, পৃঃ-৮।
১৬) ইসলামাবাদ, পৃঃ-১২।
১৭) চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রাম, ১৯২০, পৃঃ-২।
১৮) Geiger, W.; ed.; Mahavamsa. PTS. London, 1958, ch XII।
১৯) মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২০৯; রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ৪৯৪-৯৬।

# *প্রবাসী* পত্রিকায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

মোঃ শাহাদাত হোসেন সরকার

**বাংলায় মুসলমানদের আগমন**

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব সম্ভবত ১২০৪ সালে তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়।[১] যদিও বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের অনেক পূর্ব থেকে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার উপলক্ষে বাংলায় মুসলিম আগমন ঘটে,[২] তথাপি তার রাজ্য জয়ের পরই বিদেশাগত পীর দরবেশগণ ও সমসাময়িক মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় সারা বাংলায় ধর্ম প্রচার শুরু করায় বাংলার মাটিতে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর আগেই তারা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।[৩]

বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বৃটিশ কর্মকর্তাগণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণকেই দেখিয়েছেন, যাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না এবং যারা বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হতো।[৪] বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আরো উল্লিখিত হয়েছে যে, বিদেশ থেকে আগত মুসলমানগণ যারা বাংলার স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তাদের দ্বারাও বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৫] আবার ১৯১১ সালের আদমশুমারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।[৬] মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামে জাতিভেদ প্রথার প্রচার ও প্রসার ছিল না। আর এজন্যই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে আকৃষ্ট হয়েছে। ভারতের বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্ম পরিবর্তনে বল প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয়নি।[৭] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, "সুফী ও দরবেশ নামে পরিচিত মুসলমান পীর ও ফকির সম্প্রদায়ের চেষ্টায় বাঙ্গালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি সুম্ভবপর হইয়াছিল। তাহাদের দৃষ্টান্ত আর উপদেশে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত"।[৮] এভাবে মুসলিম শাসনকর্তাগণ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং সুফী ও দরবেশগণের অক্লান্তভাবে ধর্ম প্রচারের ফলে বাংলার মাটিতে

মুসলিম সমাজের ভিত সু-প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হয়।[৯] ধীরে ধীরে মুসলমানগণ বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।[১০]

**হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব**

বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জাগতিক সম্পর্ক ছিল কিছুটা পরস্পর বিরোধী। শাসিত ও শাসকের, স্বভাষী ও বিভাষীর, স্বদেশী ও বিদেশীর। এ দুইয়ের আদর্শগত বিভেদ ছিল ধর্ম ও দর্শনের, আচার ও আচরণের। ধর্মাদর্শের স্বাতন্ত্রের মূলে ছিল নিরাকার সাকারের, একেশ্বরবাদ ও বহুদেববাদের যা সামাজিক আচার ব্যবস্থা এবং কুসংস্কারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মাত্রায় হিন্দু মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছিল।[১১] জাগতিক ও আদর্শগত এই বৈপরীত্য ও বিভেদ থেকেই সৃষ্টি হয় ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, বিরোধ-সংঘাত।[১২]

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক নেতা-কর্মী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলার জন্য আন্তরিক হলেও সামাজিক ও ধর্মীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক বিভেদও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দায়ী ছিল। জনৈক লেখকের মতে, তিনটি কারণে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাধারণত দ্বন্দের সূত্রপাত হতো। যথা ঃ (১) গুজবে কান দেওয়া, (২) ভবঘুরে ও বেকার যুবকদের উশৃংখল কার্যকলাপ এবং (৩) একে অন্যর ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত দেওয়া।[১৩] এছাড়াও মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে হিন্দুদের শোভাযাত্রা, মুসলমানদের গো-হত্যা এমনকি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থেকেও হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রথম দীর্ঘমেয়াদি এবং দুঃখজনক দাঙ্গা হয় ১৮০৯ সালে বেনারসে। এ দাঙ্গায় কয়েকশত লোক নিহত হয় এবং প্রায় পঞ্চাশটি মসজিদ ধ্বংস হয়।[১৪]

অন্যদিকে বাংলায় দীর্ঘদিন সহাবস্থান, প্রতিবেশীক সু-সম্পর্ক, বৈবাহিক বন্ধন প্রভৃতি অবস্থা পরস্পরকে নিকটতর করে এবং পরস্পরের ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারাও উভয় সম্প্রদায় পরস্পর প্রভাবিত হয়।[১৫] উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে হিন্দু মুসলিম যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৭ সালে ইংরেজী, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে যে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হয় তাতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাধাকান্ত দেবের সাথে মৌলভী করম হোসেন, মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ ও মৌলভী মুহাম্মদ আমিনুল্লাহ যুক্ত ছিলেন।[১৬] এ সোসাইটি বাংলা ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, শিশু শিক্ষা সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা করেন

এবং আরবী ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে নীতি কথা অনুবাদ করেন। এ সোসাইটির রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কি গভীর অধ্যাবসায় সহকারে এ সোসাইটির কর্মকর্তারা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষা ও সহিত্যের ভিত সুদৃঢ় করে জাতীয় চেতনার পথ প্রশস্ত করেন।[১৭]

শাসনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে ও অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[১৮] হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভেবে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেব ইন্ডিয়া বোর্ডের নিকট একটি আবেদন পত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের মনোন্নয়নের ব্যাপারে যে মনোভাব ব্যক্ত করেন তা উল্লেখযোগ্য।[১৯]

### হিন্দু মুসলিম মিলিত আন্দোলন

বাংলায় হিন্দু মুসলমান সু-সম্পর্ক গড়ে উঠার পশ্চাতে রাজনৈতিক ঘটনাবলীরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বাংলার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠে মূলত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিকে কেন্দ্র করেই। কারণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উভয় সম্প্রদায়ের অনেক নেতা কর্মীরই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।[২০] সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ সত্ত্বেও ইংরেজ বিরোধিতার ক্ষেত্রে উভয়ের সমচিন্তা মুসলমান ফকির আর হিন্দু সন্ন্যাসীদের পরস্পরের কাছে টেনে আনে।[২১] হয়ত সে প্রেক্ষাপটেই ফকির নেতা মজনুশাহ এর সাথে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।[২২]

বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহে ও গণ বিক্ষোভে হিন্দু মুসলমান সর্বক্ষেত্রেই ছিল সমান অংশীদার। সেজন্যই হয়ত জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ঠ সন্যাসী আর ফকির বিদ্রোহ দীর্ঘকাল (১৭৬০-১৮০০) কোম্পানীর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২৩]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহেরও উৎস ছিল হিন্দু ও মসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অসন্তোষ। আর সে কারণেই বিদ্রোহের শুরু থেকেই হিন্দু মুসলমান সামন্ত প্রভুরা সিপাহীদের আহ্বানে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এ বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকা প্রধান থাকলেও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়-এর সিপাহীরা এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ায় জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য সমর্থন তারা লাভ করতে সক্ষম হয়।[২৪]

স্বায়ত্বশাসনের জন্য আন্দোলনেও এই দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর নিকটবর্তী হবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস যৌথভাবে এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল,

যা ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই দুই সংগঠনের সভায় অনুমোদিত হবার পর ইতিহাসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (Bengal Pact) নামে পরিচিত হয়।[২৫] এ চুক্তি বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।[২৬]

আবার ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময়ও আমরা বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলমানের এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে দেখতে পাই। ভারতের বিভিন্ন স্থানের মত বাংলাতেও খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলনে ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত আন্দোলন।[২৭] মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মহম্মদ আলী এবং আরও অনেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দু মুসলমান সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছিলেন।[২৮]

**সম্পর্ক অবনতির কারণ**

হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সচেতন ব্যক্তি ভারতবর্ষে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাজনৈতিক মত-বিরোধ, হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্ন প্রকার ইসলামিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়।[২৯] ফলে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়।[৩০] হিন্দু-মুসলমানগণও একে-অপরকে সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগোষ্ঠীও একে-অপরের কাছাকাছি আসতে পারে না।[৩১]

এরই মাঝে ১৯২৬ সালে কলকাতায় প্রচণ্ড হিদু মুসলমান দাঙ্গা মিলনের সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করে দেয় ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অনেক নেতা-কর্মী হিন্দু মুসলিম মিলন চুক্তির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। অবশেষে সাম্প্রদায়িক মিলনের বিরোধী হিন্দু নেতৃবৃন্দ ১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[৩২]

***প্রবাসী* ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক**

*প্রবাসী* পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়তে আমরা বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক অবনতির কারণ ও তার প্রতিকারের নির্দেশনা পাই। প্রবন্ধ নিবন্ধগুলি বিস্তারিত আলোচনা করলে আমরা এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হব।

**সম্পর্ক অবনতির কারণ নির্দেশনায় *প্রবাসী***

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক কেন অবনতির দিকে এগুচ্ছে তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে

*প্রবাসী* জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিল যে, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশরা চলে গেলেও এখানে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমানেরা পরস্পরের প্রতি ছুরি চালাচালি করবে বা একে-অপরকে সদা আক্রমণ করতে উদ্যত হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই :

> ইংরেজ কথায় কথায় বড়াই করিয়া থাকেন যে, আমরা চলিয়া গেলেই হিন্দু-মুসলমান ভারতবর্ষে পরস্পর পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইবে। তাহাদের এই বড়াই আমাদের ভুলাইতে পারিবে না। দক্ষিণদেশে হায়দ্রাবাদের নিজাম মুখ্যত হিন্দুদের উপর আর উত্তর দেশের কাশ্মীরের জম্মুপতি মুখ্যত মুসলমান সমাজের উপর আধিপত্য করিতেছেন; কিন্তু কোথাও হিন্দু মুসলমানের ছুরি চালাচালির কথা শুনিতে পাইতেছি না। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়েই যেভাবে পরকে আপন করিতে জানে তাহা পৃথিবীর আর কোন জাতি জানে না। অন্তত কোন খ্রীষ্টান জাতি জানে না। হিন্দু-মুসলমান এত কাল ধরিয়া এক গ্রামে এক ছাদের নিচে বসবাস করিয়া অসিতেছে। কিন্তু এতদিন খ্রীষ্টান মুসলমানের সান্নিধ্য সহিয়াছেন, তাহা ইতিহাস লেখে না।[৩৩]

*প্রবাসী* আরও উল্লেখ করেছিল যে, 'ভারতবর্ষে প্রগাঢ় প্রণয়ের সাথে বসবাসকারী হিন্দু মুসলমান একে-অপরের শাসনামলে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বসবাস করে এসেছে শুধুমাত্র উভয়ের চিন্তা চেতনায় উদারনৈতিক ভাবধারা ছিল বলেই। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকবর্গ হিন্দু-মুসলমানর আন্তরিকতার বিষয়টি তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে মনে করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করে'।[৩৪] প্রবাসী এ সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানকে সতর্ক হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল ঃ

*প্রবাসী* গভীরভাবে উপলব্ধি করত যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। আর এর জন্য দরকার হিন্দু-মুসলমানর পরস্পর বিশ্বাস ও আস্থা। রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের একতার কোন বিকল্প নাই। কারণ হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাস অল্প বিস্তর কমাতে পারে, তবে তা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে।[৩৫] *প্রবাসী* হিন্দু আর মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিল ঃ

> হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে ভয় আর অবিশ্বাসের চোখে দেখে বলিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের সমবেত চেষ্টা এ পর্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া আছে। উভয়ের মধ্যে ভয় আর অবিশ্বাস যদি কিয়ৎ পরিমাণেও কমে তাহাতে

> দেশের মঙ্গল, উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। কাহারো কথায় এই অবিশ্বাস আর ভয় দূর হইবার নয়। পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা এবং নানা দেশের অতীত আর বর্তমান ইতিহাসের জ্ঞান হইতে শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যকার অবিশ্বাস আর সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে।[৩৬]

*প্রবাসী* উল্লেখ করেছিল, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই পরস্পরের হিতকরী। কেউই কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে চলতে পারে না। কোন না কোন প্রকারে, কি পরোক্ষ, কি প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহায়তা সহানুভূতি সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বলেই এই দুই জাতির মধ্যে মনোমালিন্যের প্রভাব এখনও যেমন তেমন। তা না হলে এই দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতিতে ভারতমাতার ভাগ্য এতদিনে সুপ্রসন্ন হওয়া উচিত ছিল।[৩৭]

*প্রবাসী* মন্তব্য করেছিল যে, দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতির মধ্যে ভারতবর্ষে বসবাস করে আসছিল কিন্তু কোথাও কোন বড় ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় নাই। ব্রিটিশ শাসকবর্গ এদেশে আগমনের পর থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন হানাহানি, দাঙ্গা ফাসাদ শুরু হলো, জনৈক লেখক হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছিল ঃ

> হিন্দু মুসলমান ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত অনাবিল প্রেম প্রীতি নিয়ে পাশাপাশি বাস করেছে; কোন দিন যে হিন্দুর আচরণে কোন মুসলমান ব্যাথা বোধ অথবা মুসলমান প্রভূত্যের আসনে থেকেও হিন্দু দাসের প্রতি কটাক্ষ করে নাই, ইংরেজ বেনিয়াদের দৌলতে তাদের সে স্বর্গীয় সুখ একটা ঝাপটা বাতাসে উলট পালট হয়ে গেল। হিন্দু শুরু করল মুসলিম নিপীড়ন উৎপীড়ন। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে হানাহানি, মারামারি, দাঙ্গা, ফাসাদ, খুন-খারাবী চলতে লাগল সারা উপমহাদেশ জুড়ে।[৩৮]

*প্রবাসী* প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য থাকলেও, তাদের বিরোধ ধর্মকে কেন্দ্র করে নয়-বরং তা আচরণগত ঃ

> মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুগণের ধর্ম লইয়া কোন বিবাদ নেই। নিষ্ঠাবান হিন্দুগণও মুসলমান ফকিরদের শ্রদ্ধা, ভক্তি করিয়া থাকে এমনকি সময় সময় মুসলমান সিদ্ধ পুরুষদিগকে হিন্দুরা উপগুরু পদে বরণ করিয়া

> থাকে। কাজেই হিন্দুর সহিত মুসলমানের যাহা কিছু বাদ বিসম্বাদ তাহা আচরণগত তথা সামাজিক দিক দিয়েই প্রচলিত।[৩৯]

স্যার সৈয়দ আহমেদের উক্তি উদ্ধৃত করে *প্রবাসী* উল্লেখ করেছিল যে, যেহেতু হিন্দু মুসলমানের একই দেশে জন্ম ও বসবাস, উভয়ে একই অন্ন-বস্ত্রে প্রতিপালিত, কাজেই ধর্মের প্রাচীর উভয়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেও জাতিগত ক্ষেত্রে সবাই এক। পত্রিকাটি বলেছিল ঃ

> স্যার সৈয়দ আহমদ হিন্দু নামক পত্রে লিখিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান একত্রিত হইতে চেষ্টা কর। কারণ একত্রিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আপদে বিপদে সহায়তা করিতে পারিবে। আর যদি একত্রিত না হও, তাহা হইলে তোমাদের বিরোধ উভয়কে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। হে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি একই দেশে বাস কর না? তোমরা কি একই দেশে জন্মগ্রহণ করো নাই? তোমরা কি একই মাতা ধরিত্রী হইতে আহার্য পাও না? জানিও হিন্দু মুসলমান শব্দদ্বয় কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই নতুবা সকল ভারতবাসী এক ও একই নেশন।[৪০]

## সম্পর্ক উন্নয়নের উপায় ও *প্রবাসী*

*প্রবাসী* হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অবনতির কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি এর প্রতিকার ও সম্পর্কের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছিল এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তুলে ধরেছিল। সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মীয় গোড়ামী পরিহার করে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রটি উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছিল। প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করার মাধ্যমে *প্রবাসী* পত্রিকা বিবদমান সম্প্রদায় দুটির মনে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও সম্মানবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

*প্রবাসী* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধায় ভারতবর্ষের একই আলো বাতাসে ও অন্ন বস্ত্রে প্রতিপালিত একই ঈশ্বরের ছায়াতলে বসবাসকারী হিন্দু মুসলমানকে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করে, আন্তরিকভাবে মিলেমিশে সুখ স্বাচ্ছন্দে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'হিন্দু মুসলমানের মিলন' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল ঃ

> হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের দুটি ভিন্ন জাতি কিন্তু একত্রে বাসস্থান। তাহারা সামান্য কিছু দিক দিয়া তাহাদের মুলনীতির ব্যাপারে আলাদা থাকিলেও একই ঈশ্বরের ছায়াতলে বসবাস করিয়া আসিতেছে। কাজেই হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক মিলন একান্ত আবশ্যক। তাহা যাহাতে হয় এই চেষ্টা করা হিন্দু মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।[৪১]

তিনি অপর এক সংখ্যার সম্পাদকীয়তেও মন্তব্য করেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দীর্ঘদিন একত্রে বসবাসের যে নজির স্থাপন করেছেন, তা এক ধর্মাবলম্বী জাতির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না। এই সুসম্পর্ক যাতে আরো দীর্ঘস্থায়ী হয় তার জন্য পরস্পরকে পরস্পরের আপদে বিপদে এগিয়ে আসার মাধ্যমে মিলনের ভাবধারা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন যে,

> প্রায় শতাব্দীকাল ধরে একতাবস্থানের নিবন্ধনহেতু হিন্দু মুসলমানের যে গভীর মৈত্রীভাব ক্রমেই জমিয়া আসিতেছে, তাহা সভ্যতাদীপ্ত প্রতিচ্যভূমিতে এক ধর্মাবলম্বী জাতিদ্বয়ের মধ্যেও আশা করা যায় না। সেই যখন মুসলমান জেতা, হিন্দু বিজিত ছিল, তদবধি এই ভাব সঞ্জাত এবং প্রতিবেশী হিন্দু মুসলমান পরস্পরের আপদে বিপদে পরস্পরের সাহায্য করায় ক্রমশ ইহা পুষ্ট হইয়াছে।[৪২]

ধর্মীয় আচার আচরণকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু করলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিদেবী ''ব্যাধি ও প্রতিকার'' শিরোনামে লিখেন ''ধর্মগত ও আচরণগত উৎকট পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ক্ষমা ও শ্রদ্ধা করিতে জানেন এবং সেইজন্য ভারতবর্ষে উভয় সম্প্রদায়ের প্রীতি রক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে''।[৪৩]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একতা রক্ষার জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগ করার জন্য উভয় সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি একই ভারত মাতার সন্তান হিসাবে উভয় সম্প্রদায়কে সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি অসুবিধাগুলিও ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে নিঃস্বার্থ প্রেমের চর্চা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে করে সুবিধাগুলি পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করা যায় আর অসুবিধাকে বুক দিয়ে ঠেকানো যায়। *প্রবাসীতে* প্রকাশিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন ঃ

> হিন্দু মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা তাহা হিন্দু ও মুসলমান

> উভয় ভাইদেরই জানা আছে বলিয়া আশা করি। দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে যেমন বিষয় কর্ম ভালো চলে ঠিক সেই রূপ হিন্দু মুসলমান এক সাথে থাকলে সকল ধর্ম কর্ম সব ক্ষেত্রেই সুবিধা অনেক বেশী। যদিও ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় তথাপি আসল কথা হলো আমরা এক দেশে এক দুঃখ সুখের মধ্যে বাস করি একত্রে, আমরা মানুষ— আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান— আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনাবসতঃ শুধু সুবিধা নহে অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরো গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহা বুক দিয়া *ঠেকাইতে* পারিব।[৪৪]

*প্রবাসীর* অন্য এক প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ *ঠাকুর* হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যেকার সুসম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাক্ষাৎ ও আলাপ, পাশাপাশি চলা, কাছাকাছি আসা, মানুষ বলে মানুষকে আপন করা ইত্যাদি বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন : 'আমরা যদিও হিন্দু-মুসলমান কিন্তু নানা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তাহলেই দেখতে পাব, মানুষ বলে মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ'।[৪৫]

এ সম্পর্কে তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনাও *প্রবাসীতে* উদ্ধৃত করেছিলেন। উক্ত ঘটনার বর্ণনা করে তিনি *প্রবাসীতে* লিখেছিলেন— কিভাবে কোরবানীকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতার অবসান ঘটিয়েছিলেন :

> আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানী নিয়ে যখন দেশে একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমার কাছে নালিশ করলে আমি মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যাতে এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে অকারণে হিন্দুদের মনে আঘাত না লাগে। তারা তখনি তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত আর কোন উপদ্রব হয়নি। যদিও হিন্দুরা আমাকে মুসলমানদের প্রথাকে চিরবিনাশ করার দাবী করেছিল। কিন্তু আমি সঙ্গত কারণে তা সঠিক বলে মনে করিনি।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ *ঠাকুর* উক্ত ঘটনার দ্বারা একথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মনুষ্যত্বের

বিচারে বিবেচনা করলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সহজ। কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে দূরে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে মনুষ্যত্বের মিলটা চাপা পড়ে আছে।

**রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —**

"এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্ম কর্মের মতবিরোধ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে যে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু মুসলমান পৃথক হয়ে গেছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে দূরে রেখে অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। মনুষ্যত্বেও মিলটাকে দিয়েছে চেপে। আমি হিন্দু তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানদের ত্রুটি বিচারটা থাক— আমরা মুসলমানদেরকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সে জন্য লজ্জা স্বীকার করি"।[৪৭]

*প্রবাসী* শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়— ভারতে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। চৈত্র ১৩১৪ সালে 'হিন্দু-মুসলমান' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল ঃ

> শুধু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নয়, সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই আমরা সদ্ভাব আর সহযোগিতা কামনা করি। ইহার জন্য যদি কোন কার্য প্রণালী নির্ধারিত হয় এবং তা যদি সমদর্শীতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহা আমরা মানিয়া লইতেও বাধ্য। আমরা যদি উভয়ে উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখি তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য তাহা সুখের বিষয় হইবে। একই সাথে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করিবে।[৪৮]

হিন্দু মুসলমান সম্পর্কোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবাসীতে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘদিন থেকে প্রতিবেশীরূপে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উভয় সম্প্রদায়কে উদার মন নিয়ে একে অপরকে গ্রহণ করার জন্য উজ্জীবিত করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, জাতীয় স্বার্থে এধরনের মিলন প্রয়োজন— যদিও শাসকবর্গ তা চায় না। *প্রবাসী* কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিল ব্রিটিশ রাজন্যবর্গের কৌশল সম্পর্কে, কারণ এই দুই সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে হুমকীস্বরূপ। তাই ব্রিটিশ শাসকবর্গের মিষ্টি কথায় কর্ণপাত না করে হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রেমের চর্চা

করার জন্য *প্রবাসী* উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল। *প্রবাসী* মনে করত, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও হিন্দু-মুসলমান একই ভারতমাতার সন্তান। আর তাই ভ্রাতৃপ্রতিম এ মধুর ও পবিত্র সম্পর্ক সুন্দর রাখার মাধ্যমে যে কোন রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করা সম্ভব। *প্রবাসী* বিভিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধে ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে একথাই উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল যে, ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে এবং মুসলমান শাসনামলে এই দুই সম্প্রদায়ের সুসম্পর্কের যে সাক্ষ্য বিদ্যমান ছিল, সে সম্পর্কের অবনতির জন্য ব্রিটিশ শাসকবর্গের শাসননীতিই দায়ী। আর তাই প্রবাসী তার অধিকাংশ প্রবন্ধ নিবন্ধে উভয় সম্প্রদায়কে ব্রিটিশদের এ নীতির কাছে মাথা নত না করে যেকোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। একে অপরের মনে আঘাত না দিয়ে নিজ ধর্ম পালন করা যেতে পারে বলে প্রবাসীতে উদাহরণ সহ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছিল।

*প্রবাসী* পত্রিকায় উল্লিখিত বিভিন্ন, প্রবন্ধ নিবন্ধ, আলোচনা সমালোচনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার চলমান সুসম্পর্কের ইতিহাস নতুন গতিপথের সন্ধান দিতে পেরেছিল। প্রবাসীর প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভবত এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ, অবিশ্বাস, সংশয় প্রভৃতি দূর হয়ে মিলনের একটি ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছিল। যে ধারার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, "সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াস পাচ্ছে। তাদের ঐক্য যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষেও হিন্দু-মুসলমানেরও মিলন সম্ভব"।[৪৯] তিনি বিশ্বাস করতেন, এই দুই জাতির মিলন হবে— ধর্মে না হলেও জনমবন্ধনে হবে। তিনি বলেন, "যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোন মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়ে হবে না। কারণ সমকালীন ভারতের প্রচলিত অনেক কীর্তিই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার সৃষ্ট, মিলিত অবদানে পুষ্ট"।[৫০] এছাড়াও খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ফকির আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ সহ বিভিন্ন প্রকার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভারতবর্ষে যতটুকু সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল, তা একাত্মভাবেই হিদু-মুসলমানের মিলিত সাধনার ফল।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রবাসী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে নিবন্ধগুলি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দেয়।[৫১] যা ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম মিলনের ভাবধারাও সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। *প্রবাসীর* এ প্রচেষ্টার সাথে সংহতি প্রকাশ করে সংকীর্ণতা বর্জিত কিছু উদারচেতা ব্যক্তিও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এগিয়ে আসেন, যাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর, শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, অশ্রুমান দাসগুপ্ত, শ্রীমতি অতশীদেবী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রী মইনউদ্দিন হোসেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা বিভিন্ন সময়ে তাদের লেখনীর মাধ্যমে ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই সম্প্রদায়ের মন থেকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিষাদ দূর করে মিলনের ভাবধারা সৃষ্টিতে যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন— সেকথা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল করিম 'মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়' *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা,* (ঢাকা: ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৭৪), পৃঃ-৭৫।

২) তুর্কীদের বাংলা বিজয়ের আগেই, মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলার সঙ্গে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য, ভৌগোলিক বিবরণ ও জনশ্রুতির মাধ্যমে। তবে মুসলমানদের এ যোগযোগ ছিল একান্তভাবেই বাণিজ্যিক। চীন পর্যন্ত বাণিজ্যিক পথ বর্ণনাকালে আরব ভৌগোলিকগণ একটি দেশ আর একটি সামুদ্রিক বন্দরের উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে ঐতিহাসিকগণ যথাক্রমে বাংলা ও চট্টগ্রাম রূপে সনাক্ত করেছেন। তাদের সাক্ষ্য নির্ভূলভাবে প্রমাণ করে যে, বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের অনেক আগেই আরব থেকে ব্যবসায়ীরা বাংলার উপকূলে বাণিজ্য করতে আসত। তবে বাংলায় ইসলাম প্রচার এবং মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের সময় থেকেই নির্ধারিত হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Dr. Abdul Karim, *Social History of the Muslims of Bengal,* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1959).

৩) *Census of India,* 1891, Vol-3 (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1893), P.147.

৪) H. Baverly, *Report on the census of Bengal-1872* (Calcutta: Bengal Secretariate Press. 1872) P.149.

৫) Khondka Fuzli Rubbee. *The Origine of the Musalmans of Bengal.* (Calcutta: Thacker Spink and Co, 1895), P. 89.

৬) *Censue of India,* 1911, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1913), P.129.

৭) James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dhaka,* (Calcutta: Military Orphan Press, 1940), P.244.

৮) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), (কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৭৬), পৃ. ২৪৫-৪৭।

৯) Abdul Karim, Social History of the Muslims of Bengal, op-cit. P.40.

১০) Amalendu Dey, *Islam in Mordern India,* (Calcutta: Maya

Prakashan, 1982). P.1.

১১) Ramesh Chandra Majumder, (ed), *History and Culture of the Indian People*, Vol-vi, (Bombay: Asia Publishing House 1960), P. 636.

১২) Ramesh Chandra Majumder, *Glimses of Bengal in the nineteenth Century,* (Calcutta: Firms, K.L. Mukhapadhya, 1960), P.7.

১৩) Rafiq Zakaria, Rise of Muslims in Indian Politics, (Bombay: Sumaiya Publications Pvt. Ltd. 1970), Cited in, M. Nurul Quaiyum, "Efforts of the Bengali Muslim Journalists to Promote Hindu-Muslim Relations in Bengal in the First Half of the twentieth Century", *Rajshahi University Studies,* Part. A, Vol. xvi, 1988, P.140.

১৪) Sir Regenald Coupland, Hindu Moslem Antagonism', *The Indian Problem 1833 1935,* (Oxford: At the Clarendon Press, 1968), P.29.

১৫) A.R. Malick, *Op.Cit,* P.47.

১৬) অমলেন্দু দে, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ-১৫৪।

১৭) *ঐ,* পৃঃ-১৫১।

১৮) *ঐ*।

১৯) ডঃ নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,* (কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স, ১৪০১), পৃঃ-২২৪।

২০) Ram Gopal, *Indian Muslims, A Political History,* (1858-1947), (Bombay: Asia Publishing House, 1969) P.36.

২১) মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ১৮৫৭-১৯২০, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭০) পৃঃ-৩।

২২) নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, (কলিকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৫৭) পৃঃ-৫৩।

২৩) J.M. Ghose, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bangal,* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1933), P.62. .

২৪) Ramesh Chandra Majumder, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1957,* (Calcutta: Maya Prokashan, 1963) P.169.

২৫) *ঐ,* পৃ. ২২৫।

২৬) Shila Sen, *Muslim Politics in Bangal 1937-47,* (New Delhi: Impex India, 1976) PP. 86-88.

২৭) M. Nurul Quaiyum, "Efforts of the Bengali Muslim JOurnalists to Promote Hindu-Muslim Relations in Bengal in the First Half of the twentieth Century", *Rajshahi University Studies,* Part. A, Vol. xvi, 1988, P.139.

২৮. Chitta Ranjan Das, *India for Indians,* (Madras: Ganesh and Co, 1918), 86-88.

২৯. Humayun Kabir, *Muslim Politics 1906-1947 and Other Essays,*

(Calcutta: Firma KLM Mukhapadhya, 1969) P. 94.
৩০. Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal 1927-1936,* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987) P. 18.
৩১. Sir Regenald Coupland, 'Hindu Mslim Antagonism', *op.cit.,* P.29.
৩২. Humayun Kabir, *o.cit.,* P.98.
৩৩. শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, 'ব্যাধি ও প্রতিকার', *প্রবাসী,* ৭ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৪, পৃ. ৩৪৫।
৩৪. 'হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের ফল', *প্রবাসী,* ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৪, পৃঃ-২০০।
৩৫. 'পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস', *প্রবাসী,* ২৮শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৫, পৃঃ-৯৩৭।
৩৬. *ঐ,* পৃঃ-৯৩৮।
৩৭. মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ-২২।
৩৮. চৌধুরী মোহাম্মদ বাদরুদ্দোজা, "সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক", *জিলা পাবনার ইতিহাস,* (ঢাকা: তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৯৮৬), পৃঃ-৩৫-৩৬।
৩৯. শ্রী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, "হিন্দু ও মুসলমান (সামাজিক পার্থক্য)" *প্রবাসী* ১০ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১৭, পৃঃ-৫৮২।
৪০. *ঐ,* পৃঃ-৮২৪।
৪১. সম্পাদকীয় : 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন', *প্রবাসী,* ২২শ ভাগ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৯, পৃঃ-১৪৯।
৪২. 'বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান', *প্রবাসী,* ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য, শ্রাবণ, ১৩১৪, পৃঃ-১৯৭।
৪৩. শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, 'ব্যাধি ও প্রতিকার', *প্রাগুক্ত,* পৃঃ-৩৪৪।
৪৪. শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবাসী, ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৪, পৃঃ-২৪০।
৪৫. শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-মুসলমান" *প্রবাসী,* ৩১শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, পৃঃ-৪৫৩।
৪৬. ঐ, পৃঃ-৪৫৪।
৪৭. ঐ।
৪৮. 'হিন্দু ও মুসলমান', প্রবাসী, ৭ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র, ৩১৪, পৃঃ-৪৪।
৪৯. ডঃ মুহাম্মদ মজির উদ্দিন মিয়া, *রবীন্দ্র সাহিত্যে মুসলিম সমাজ জীবন,* (কলিকাতা: চারুবাক, ১৯৯০) পৃঃ-৪৩।
৫০. রবীন্দ্র রচনাবলী (১২শ খণ্ড), (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৬৭) পৃঃ-১৯১।
৫১. ক্ষিতিমোহন সেন, *ভারতে হিদু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা,* (কলিকাতা: মডার্ন পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৫৬) পৃঃ১৯৬।

# *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বঙ্গীয় নারী সমাজ

# (১৮৬৩-১৯০৫)

**রেখা রানী সাহা**

ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজী ও প্রথম স্বদেশী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের দিক থেকে বাংলা এক অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছে।[১] প্রথম ইংরেজী ও প্রথম বাংলা ভাষার সংবাদপত্র এই বাংলা থেকেই প্রকাশিত হয়। কারণ উনবিংশ শতকে বাংলাতে নবজাগরণের সূত্রপাত হওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন একই সাথে তাল মিলিয়ে চলে। পলাশীর পর ইংরেজ সম্প্রদায় কলিকাতাতেই ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং কলিকাতাকে কেন্দ্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।[২] কলিকাতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ— যারা সংবাদপত্রের মর্ম অনুধাবন করতে শেখে এবং পড়ে, এছাড়াও কলিকাতা কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি এবং ব্যবসার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া।[৩] আর এসব কারণেই ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র বাংলার তদানীন্তন প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেন কলিকাতায় বসবাসরত ইউরোপীয়গণ। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি জেম্‌স অগাস্টাস হিকি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুভসূচনা করেন।[৪] বেঙ্গল গেজেটের সূত্র ধরেই ১৮১৮ সালের বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা থেকে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।[৫]

উল্লেখ্য যে ইংরেজী সংবাদপত্র বাঙালি সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে উদাসীন ছিল বলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যার নাম মাসিক দিকদর্শন।[৬] পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। মাসিক দিকদর্শন প্রকাশের মাস খানেক যেতেই ১৮১৮ সালের ২৩মে সমাচার দর্পণ নামের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সমাচার দর্পণ প্রকাশের পর বাঙালি পরিচালিত একখানি সমাচার পত্রের অভাব মারাত্মকভাবে অনুভূত হয়। এ সময় কুলুটোলা নিবাসী দেওয়ান তারাচাদ দত্ত এবং

ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিলে ১৮২১ সালে সংবাদ কৌমুদী নামে একখানি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৭] সংবাদ কৌমুদী প্রকাশের কিছুদিন পর ভবানীচরণ সমাচার চন্দ্রিকা নামের আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৮] এ ছাড়াও হিন্দু সমাজের সংবাদ তিমির নাশক, সংবাদ প্রভাকর ইত্যাদিসহ আরও অনেক সাময়িকপত্রের আবির্ভাব আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে লক্ষ্য করি।

***বামাবোধিনী* পত্রিকা**

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হিন্দু সমাজের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা সমাজ সংস্কার তথা নারীমুক্তি আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাসিক *বামাবোধিনী*। এটি কলিকাতা বাইর সীমূলিয়া রঘুনাথ চাটুর্য্যে স্ট্রীট ১৬ নং বাড়িতে *বামাবোধিনী* সভার কার্যালয় থেকে ১৮৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭)।[৯] তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্য সাধক, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও সমাজসেবী। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনের মাধ্যমে উমেশচন্দ্র আমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের সেবায় বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন।[১০] উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বঙ্গীয় নারী সমাজের উন্নয়নে তিনি বালিকা বিদ্যালয় এবং *বামাবোধিনী* সভা স্থাপন করেন। *বামাবোধিনী* পত্রিকাটি ছিল *বামাবোধিনী* সমাজেরই মুখপত্র।[১১] সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিলো বামাগণের হিত সাধন। পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেও এ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এতে বলা হয়—

> ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান সে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে না। অন্তঃপুরের মধ্যে বিদ্যা লোকের প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্বসাধনের হিত সাধন হইতে পারে না। ... এই পত্রিকাটিতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদয় বিষয় লিখিত হইবে। তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ... ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি ইহা সাধু সমাজে গৃহীত হইয়া বামাগণের কিছু মাত্র উপকারজনক বোধ হয় তাহা হইলেই ইহার জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।[১২]

সুতরাং বঙ্গীয় নারী সমাজের উন্নয়নের মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যে পত্রিকাটি তার যাত্রা শুরু করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বঙ্গরমণীকে সর্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা *বামাবোধিনীর* উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য সর্বপ্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই

এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। জ্ঞান প্রচার *বামাবোধিনীর* প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এ জ্ঞান যাতে ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নারী জীবনের যথার্থ শোভা সম্পাদন ও কল্যাণ বিধান করতে পারে *বামবোধিনীর* এটা প্রাণগত ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পূরণে *বামাবোধিনী* প্রথম থেকেই প্রয়াস চালিয়েছে।[১৩]

### *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বঙ্গীয় নারী সমাজের অবস্থা

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থা যে উন্নত ছিল না, এ বিষয়ে একটা অস্পষ্ট ধারণা সবারই আছে। কিন্তু নারীদের সামাজিক মর্যাদা কতটা ছিল, সে বিষয়ে সবার জ্ঞান সমান নয়। তখনকার অত্যাচারিত কোনো নারী এ সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রমাণ রেখে না গেলেও পুরুষদের রচনা থেকেও বাংলার নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট জানা যায়। এ সময় বাংলার নারী জাতি সবদিক থেকে ছিল পশ্চাদপদ। নারী সমাজের এই পশ্চাদপদতার জন্য সমাজে প্রচলিত নারী নিপীড়নমূলক প্রথাসমূহ যেমন, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অবরোধ প্রথা, নারী শিক্ষার অভাব এবং পুরুষের উদাসীনতা দায়ী ছিলো। এই পশ্চাদপদ বাংলায় নারীদের অগ্রগতি সাধনে সংবাদপত্রগুলো একাধিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রচনা, সচিত্র প্রতিবেদন, সমালোচনা, অভিমত প্রকাশ করত এবং নারী শিক্ষা এবং নারী মুক্তির আহ্বান জানাত।

পুরুষের তুলায় নারীর সামাজিক অবস্থানের নিম্নমান লক্ষ্য করে *বামবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'কন্যা বিক্রয়' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়,

> "এদেশীয় লোকেরা কন্যা সন্তানদিগকে পুত্রের ন্যায় তাদৃশ্য স্নেহ ও আদর করেন না। গর্ভবতী নারী পুত্র প্রসব করিলে যেমন সকলে আনন্দ ও উৎসব প্রকাশ করেন, কন্যার জন্মকালে তদ্রূপ হর্ষ ও আনন্দ প্রদর্শন করেন না, বরং সকলে একেবারে দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়েন।"[১৪]

বঙ্গীয় নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা এমনই নিম্নে ছিল যে তা পশুর জীবনের সাথে তুলনীয়। এ প্রসঙ্গে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়,

> স্ত্রীজাতি এবং পশু জাতি উভয়েই সমান, ইহাদিগের পিঞ্জরে বদ্ধ না করিলে ইহারা ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারে না, এবং আমাদের মান রক্ষা হইবে না। অতএব স্ত্রীদিগকে পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য।[১৫]

বঙ্গীয় নারীর অসহায় হীনবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'আদর্শ বঙ্গ রমনী' প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করে,

> বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতি অতি ঘৃণিত, অপমানিত ও পদদলিত। এ সমাজে স্ত্রীজাতি দাসী ও বিলাস ভোগের সহচরী মাত্র। পুরুষের উপকার, তৃপ্তি সাধন এবং গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্যই যেন রমনীর জন্ম হয়।[১৬]

ব্যক্তি হিসেবে সমাজে নারীর কোন স্বাধীনতা ছিল না। নারীর পরাধীনতা সম্পর্কে *বামাবোধিনী* পত্রিকা মন্তব্য করে,

> এদেশে নারী সকল বিষয়ে সম্পন্নরূপে পুরুষের কর্ত্তৃত্তাধীনে। কৈশোরে পিতা বা অভিভাবক আত্মীয়ের। যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকাই এদেশে নারীর প্রকৃতি। নারী জীবন যেন কলের পুতুলের মত; আত্মদৃষ্টি ও স্বাধীন চিন্তা যেন তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।[১৭]

শুধু সমাজে নয়, পরিবারেও নারীকে হীন ও অবহেলায় দৃষ্টিতে দেখা হতো। এ সম্পর্কে *বামাবোধিনী*, কার্ত্তিক ১২৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়,

> একে স্বামী উপেক্ষা ও অনাদার তাহার উপর আত্মীয় স্বজনের তাড়না এই গেল পারিবারিক সুখ। সামাজিক সুখের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য রুদ্ধ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথও অনর্গল নহে।[১৮]

নারীর অবরুদ্ধ জীবনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়,

> স্ত্রীজাতি একেতে কোমল অঙ্গ, তাহাতে আবার সর্বদাই পিঞ্জরে রুদ্ধ থাকিয়া দুর্বল প্রকৃতি হইতেছে। ইহাদের দ্বারা কি সন্তানের মঙ্গল সাধন হইতে পারে? কেবল অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইবার সম্ভবনা হইতে পারে। যদি স্ত্রীদিগকে স্থানান্তরে গমনাগমন কবিতে দেওয়া হয় এবং উত্তমরূপে বায়ুসেবন করান হয়, তাহা হইলে তাহারা সবল প্রকৃতি ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যে সন্তান উৎপাদন করিবে, সেই সন্তান হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে।[১৯]

বাল্য বিবাহ প্রথার ফলে বাংলার নারীদের করুণ চিত্র তুলে ধরে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়,

> স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সে বিবাহিত হইয়া যেকোন কার্যই উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে না পারিয়া নানা প্রকার বিপদগ্রস্ত হয়। উত্তমরূপ লালন পালন না করাতে শিশু সন্তান নষ্ট হইয়া যায়, স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন না করাতে স্বামী দুর্বিনীত এবং পাপপথাবলম্বী হইয়া

উঠে; সাংসারিক কার্যে অপটুতা নিবন্ধন সংসার নানারূপ দুঃখের আগর হইয়া উঠে। পরিশেষে আশ্রয় না পাইয়া নীচ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে জীবন কলঙ্কিত করিয়াছে, উহার এ সমস্ত দুর্দশার কারণ কে? নিদারুণ বাল্য বিবাহ কি এই অভাগিনীর সমস্ত সুখ হরণ করিয়া পরিশেষে উহাকে পাপ সাগরে নিমজ্জিত কবে নাই?[২০]

নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারীর শিক্ষিত হওয়া। তবেই নারী নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে *বামাবোধিনী* পত্রিকার মন্তব্য নিম্নরূপ,

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে লইয়াই সংসার। বিদ্যাধন লাভে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েই সমান অধিকার, স্ত্রীলোক যদি শিক্ষা দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য অবগত হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে তৎসম্পাদনে সক্ষম হয়েন তদ্বারা পুরুষের ভার অনেক লাঘব হয়। কিন্তু বিদ্যাহীনা স্ত্রীর হৃদয় অন্ধকারময়। অল্পবুদ্ধি বশত সর্ব্বদা তিনি অহংকারিনী হয়েন, মনুষ্যকে মনুষ্যজ্ঞান করেন না। সকল লোককেই ঘৃণার চোখে দেখেন।[২১]

শিক্ষার অভাবেই নারী জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই দুঃখের সাথে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়,

মুর্খতা বশতই আমাদের দেশের পুরুষেরা রমনীদিগকে ঘৃণা করেন ও তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করেন, বিদ্যাবিহীনতাই ইহার প্রদান কারণ। নারী প্রকৃতি যে অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীন চিন্তার অভাবে নারী জীবন যে বদ্ধ জলাশয়ের মত নিশ্চল এবং বিবিধ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। জ্ঞানের আলোক সেখানে থাকে না, সেখানে হিংসাদ্বেষ স্বার্থপরতা কলহ ও অশান্তি পূর্ণভাবে রাজত্ব করিতে পায়।[২২]

শিক্ষা বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার। এ সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয়,

জ্ঞান শিক্ষাই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি তাহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রী জাতি ও পুরুষ জাতির সমান অধিকার থাকা একান্ত বিধেয়।[২৩]

স্ত্রী জাতির উচ্চ শিক্ষা যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ প্রসঙ্গে *বামাবোধিনী* পত্রিকার মন্তব্য নিম্নরূপ,

উচ্চশিক্ষা স্ত্রীলোকদিগের অনুপোযোগী, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অনুচিত। ইহাতে সমাজের ও তাহাদিগের সমূহ অনিষ্ঠ হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষার কঠোর পরিশ্রম কোমল অবলার সৌখিন স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন করে, সুতরাং সংসারের সকল কার্যে সে পরাঙ্মুখ হয়। অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রায়ই বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা হয়, বা দুর্বল সন্তান প্রসব করিয়া অচিরে অপত্যশোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে।[২৪]

হিন্দু সমাজের উচ্চ জাতীয় বিধবাদের জীবন যাত্রার করুণ চিত্র লক্ষ্য করে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়,

উচ্চ জাতীয়া হিন্দু বিধবার জীবন অত্যন্ত নিয়মবদ্ধ ছিল। আহার, পোষাক সকল বিষয়েই বড় আঁটা আঁটি। প্রথমত পনেরো আনা আহার্য্য জিনিসে তাঁর অধিকার নাই; তার উপর যে কয়টার আছে, তাহাও সকল সময় নয়। বৎসরের মধ্যে অনেকদিন আহার তাঁর পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ; উদরপূর্ণ আহার বিধবার পক্ষে দিনের মধ্যে একবার মাত্র কর্তব্য। সমাজ ও শাস্ত্রের ইচ্ছা বিধবা কোন প্রকারে জীবন ধারণ মাত্র করুন, ভোগ-তৃষ্ণা আমোদ স্পৃহা প্রভৃতি যেন তাঁর মনে স্থান না পাইতে পারে।[২৫]

সে সময়ে হিন্দু সমাজে এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশু বিধবার হার যে দ্রুত বেড়ে চলেছিল, সেদিকে লক্ষ্য করে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়,

হিন্দুর ঘরে বিধবার সংখ্যাই অধিক, ইহা সকলের জানা কথা। কিন্তু বিধবা অর্থে সচরাচর বয়স্কা, অন্তত বালিকা বিধবা মনে হয়। সেন্সাসে এদেশে শিশু বিধবার তালিকা এইরূপ ঃ—

| | |
|---|---|
| ১ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবা — | ৫৩৫ |
| ২ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবা — | ৫৭৪ |
| ৩ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবা — | ৬৫১ |
| ৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবা — | ৫৭৬ |
| ৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবা — | ৩৮৬[২৬] |

বিধবাদের সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়,

সমাজের বর্তমান অবস্থায় যখন হিন্দু বিধবাকে বিধবাই থাকিতে হইবে, তখন বৈধব্য দশার আরম্ভ হইতেই বিধবাকে আত্ম-সংযম শিক্ষা দেওয়া

প্রয়োজন। যখন ১৫ বৎসরের বিধবাকেও চিরকাল বিধবা থাকিতে হইবে তখন প্রথম হইতে তাহার সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা না করাও তাহার প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুরতা।[২৭]

**উপসংহার ঃ** পরিশেষে একথা বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে *বামাবোধিনী* পত্রিকা নারী সমাজকে জাগ্রত ও সচেতন করে তুলতে যে ভূমিকা পালন করেছিল তা সত্যই প্রশংসনীয়। আমরা দেখি যে পরবর্তীতে একাধিক সাময়িক পত্র হিন্দু ও মুসলমান নারী সমাজকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। এই সকল সাময়িক পত্রের মধ্যে মুসলমান সমাজে *সওগাত* ও হিন্দু সমাজে *প্রবাসী* পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সাময়িক পত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নারী সমাজকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রগামী করে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নারী সমাজের উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের সার্বিক উন্নয়ন যে সম্ভব নয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে *বামাবোধিনী*সহ একাধিক সংবাদপত্র তা অনুধাবন করেছিল।

সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) Naemai Sadhan Bose, *Indian Awakening and Bengal* (Calcutta` Firma, K.L.M. Mukhapadhyay, 1960), p. 134.

২) অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স, ১৯৭১), পৃঃ-১৯।

৩) A.F. Salahuddin Ahmad, *Social Ideals and Social Change in Bengal (1318-1835)* (Ledden: E.J. Brill, 1965), p. 47.

৪) মো. শাহাদাত হোসেন সরকার, "জেম্‌স অগাষ্টাস হিকি ও ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র", *ইতিহাস অনুসন্ধান*-১৬, কলিকাতা ২০০২, পৃঃ-৫৮৪।

৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)* (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪০), পৃঃ-১৭।

৬) সাখাওয়াত আলী খান "উন্মেষকালে বাংলা সাংবাদিকতা" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* ৭ম ও ৮ম খণ্ড, আষাঢ়-১৩৮৫, পৃঃ-৫৪।

৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ-১৯।

৮) পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালী নবজাগরণ* (কলিকাতা: মণ্ডল এন্ড সন্স, ১৯৮৮), পৃঃ-১৫।

৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ-১৮৮।

১০) *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, দশম খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭০), পৃঃ-১৯।

১১) Shahanara Husain "Glimpsesin the Condition of Bengali Muslim Women during the Latter Half of the Nineteenth Century: A study Based on the Bamabodhini Patrika", *IBS Journal,* Vol. III, 1987, p. 20.

১২) *বামাবোধিনী পত্রিকা,* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলা ভাদ্র-১২৭০, ইংরেজী আগষ্ট, ১৮৬৩, পৃঃ-১।

১৩) বিনয় ঘোষ, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (কলিকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৭৮), পৃঃ-২৭।

১৪) *বামাবোধিনী পত্রিকা,* ৩৪শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১২৭, পৃঃ-২২৪।

১৫) *তদেব,* ৩৯শ সংখ্যা, কার্তিক ১২৭৩, পৃঃ-৩৮১।

১৬) *তদেব,* ১৯২ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৬, পৃঃ-৫।

১৭) *তদেব।*

১৮) *তদেব,* ২১৪ সংখ্যা, কার্তিক ১২৮৯, পৃঃ-১২০।

১৯) *তদেব,* ৩৯শ সংখ্যা, কার্তিক ১২৭৩, পৃঃ-৩৮২।

২০) *তদেব,* ২২১ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, পৃঃ ৬১-৬২।

২১) *তদেব,* ২২৬ সংখ্যা, কার্তিক ১২৯০, পৃঃ ২২১।

২২) *তদেব,* পৃঃ ২২২।

২৩) *তদেব,* ৩২২ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৯, পৃঃ ২৯।

২৪) *তদেব,* ২৭০ সংখ্যা, আষাঢ় ১২৯৪, পৃঃ ৯০।

২৫) তদেব, ৪৯৬ সংখ্যা; চৈত্র ১৩১১, পৃঃ ২৭৬।

২৬) *তদেব,* ৪৮৪ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃঃ ২২৭।

২৭) *তদেব,* ৪৯৬, সংখ্যা, চৈত্র ১৩১১, পৃঃ ২৭৮।

# বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৯০৫-১৯১৬

ড. মোসাঃ হাজেরা খাতুন

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় অধঃপতনের প্রবণতা। বিজিত মুসলিম সমাজ মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে অতীত গৌরবের স্মৃতিতে থাকে মোহগ্রস্ত এবং তার ফলে তারা অনেক বাস্তব সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়।[১] এর ফলে ব্রিটিশ কোম্পানী কর্তৃক ১৯০৬ সালে রাষ্ট্রভাষা ফার্সীর স্থলে ইংরেজীকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হলে মুসলমানরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের চরম অবনতি পরিলক্ষিত হয়।[২]

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করাকে বিজিত মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পনের সামিল মনে করে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।[৩] উপরন্তু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলমান ধর্মমত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকায় ঐ শিক্ষা গ্রহণ করা তারা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে। আবার রাজভাষার সম্মান হতে ফারসী স্থানচ্যুত হওয়াকে মুসলমানরা দেখেছিলেন শাসক গোষ্ঠীর সাথে কোলকাতার ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে। তাদের আশঙ্কা হয়েছিল ফারসী ভাষা ত্যাগ করলে তারা স্বাধীন মনোবৃত্তি হারিয়ে 'দাস মনোভবাপন্ন' হয়ে পড়বেন।[৪] ইংরেজী প্রবর্তনকে কোন কোন মুসলমান খৃষ্টান ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণের পথে এক পদ অগ্রসর হওয়া বলেও বিবেচনা করেছিল। এছাড়া সমকালীন খৃষ্টান মিশনারীগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও মুসলমান শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন নি।[৫]

Aminur Rahim এর মতে, শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই যে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে অসমর্থ ছিল তা নয় হিন্দুরা যখন ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে তখন তারা অর্থনৈতিকভাবে ছিল সচ্ছল, পক্ষান্তরে মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল কৃষক শ্রেণি এবং তাদের অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করত। তাদের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের

শহরের ইংরেজী স্কুলে বা কলেজে পাঠিয়ে লেখাপড়ার খরচ চালানো ছিল ব্যয় বহুল। অনেক ক্ষেত্রে গরীব কৃষকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল কলেজের বেতন দিতে না পারার কারণে ফিরিয়ে নিত। এসকল কারণে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে যায় এবং ইংরেজী শিক্ষিত প্রতিবেশী হিন্দুরা সরকারী বেসরকারী পদগুলি দখল করে নেয়।[৬]

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে বাংলার মুসলমান সমাজ যখন বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত, যখন তারা তাদের আকস্মিক পতনের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত তখন এদেরই এক শ্রেণির চিন্তাবিদ সংস্কারক মনে করেছিলেন যে, স্বধর্মের সকল কিছু আঁকড়ে ধরে ও ধর্মের অনুশাসনমালার সনাতনী ব্যাখ্যার আলোকে সামাজিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজ তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করে আশু সর্বনাশের হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। এর ফলাফল হিসাবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে ওহাবী[৭] ফরায়েজী আন্দোলন লক্ষ্য করি।[৮] কিন্তু এই আন্দোলনগুলি উনবিংশ শতাব্দীর পতনশীল বাঙালী মুসলিম সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও যুগোপযোগী কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন মুসলিম মনীষী বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মানসকে যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খৃঃ)[৯] নবাব আব্দুল লতিফ খান বাহাদুর (১৮২৮-১৮৯৩ খৃঃ)[১০] এবং সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮ খৃঃ)।[১১] এই নেতৃত্রয় মুসলমানদের নিকট আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালান এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের প্রতি আবেদন জানান পশ্চাদপদ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য।

উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান সর্বপ্রথম মুসলমানদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসন গ্রহণ করে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন এবং আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ১৮৬৪ সালে 'Aligarh Scientific Society' প্রতিষ্ঠা করেন।[১২] উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মত নবাব আব্দুল লতিফের ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত Mohamedan Literary Society'র ও উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা এবং ইংরেজ শাসনকে সহজভাবে মেনে নেওয়া। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের কথা চিন্তা করলেও মুসলমান সমাজের জাগরণের ক্ষেত্রে

তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি।[১৩] অপর দিকে সমাজের জাগরণের জন্য সৈয়দ আমির আলী ১৮৭৭ সালে কোলকাতায় *'National Mohomadan Association'* প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, নবাব আব্দুল লতিফের *Mohamedan literary society* ও সৈয়দ আমির আলীর প্রতিষ্ঠিত *'National Mohamadan Association'* মুসলমান সমাজের জাগরণের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।[১৪]

উপরোক্ত কারণাবলীর প্রেক্ষিতে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ যখন সবদিক থেকে বিপর্যস্ত তখন মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করতে এগিয়ে এসেছিলেন একদল সমাজ হিতৈষী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি যাদের হাতে বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন হয়।[১৫] উল্লেখ্য মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন হয়েছিল যাদের হাতে তাদের অধিকাংশ ছিলেন মৌলভী, মওলানা ও মুন্সী শ্রেণির ব্যক্তি এবং বলা যেতে পারে ব্যাপক অর্থে সেকালে বাংলাদেশে মুসলিম জনমতের উদ্বোধন সম্ভব হয়েছিল মৌলভী, মাওলানা, মুন্সীদের আন্তরিক সাধনায়।[১৬] এ সকল সাংবাদিকদের লক্ষ্য ছিল পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করে উন্নয়নের পথে চালিত করা, তথা সমাজের সেবা করা। এটা সত্যই প্রশংসনীয় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল সমাজ হিতৈষী মুসলমান সাংবদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারা একটি বিশেষ আদর্শের বশবর্তী হয়েই এ পথে পা রাড়িয়েছিলেন অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের জন্য নয়।[১৭] সাময়িক পত্র প্রকাশনারও যে ব্যবসায়িক দিক অপরিহার্য সেজন্য রীতিমত পুঁজি বিনিয়োগ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে এ বাস্তব বিষয় সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন না। সংবাদপত্রের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমান সমাজের যে সকল ব্যক্তি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে আধুনিক অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ, সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় দিক থেকে কুসংস্কার মুক্ত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত জাতিরূপে গড়ে তোলা। আর এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তারা মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক দৈনিক ইত্যাদি সংবাদপত্র ও সাময়িকি প্রকাশনা ও সে সবের সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন।[১৮]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। নতুন প্রদেশে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির সূচনা হবে এই আশায় অধিকাংশ মুসলিম সম্পাদিত সংবাদপত্র বঙ্গভঙ্গ

কে স্বাগত জানায়। ইসলাম প্রচারক পত্রিকা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন দান করে মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার লক্ষ্যে যে পরামর্শ দিয়েছিল তাহা হল ঃ

> এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপারে মুসলমানগণ লাভবান হইবেন একথা বলিতে অনেক হিন্দু ভ্রাতাই কুণ্ঠিত হন না। আমরাও বুঝিতেছি যে, এ বঙ্গ বিভাগে মুসলমানগণ কিছু না কিছু সুফল ভোগী হইবেন। সুতরাং আমরা এরূপ জাতীর স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারি কি? .......... নতুন গভর্মেন্টের অধীনে মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ আসামে মুসলমান দিগের চাকরী যে কিছু বেশী পরিমাণে হইবে সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। সুতরাং আমরা এমন কোনও কার্য করিতে পারি না যাহাতে গভর্মেন্টের বিরাগ ভাজন হওয়ার আশঙ্কা আছে।[১৯]

অনুরূপভাবে *নবনূর* পত্রিকায় জনৈক এবনে মা' আজ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ

> ইংরেজ আমাদের জাতীয় কোন স্বার্থেই আঘাত প্রদান করেন নাই........ ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানগণ সর্ব প্রকারেই লাভবান হইয়াছেন।[২০]

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা সব দিক থেকে লাভবান হয় এবং মুসলিম রাজনীতিতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আর এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *আখবারে এসলামীয়া, আহমদী, The Mussalman, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, মিহির ও সুধাকরা হাফেজ, নুরঅল ইমান* প্রভৃতি পত্রিকা মুসলিম সমাজে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরবর্তীতে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নিখিল ভারত কংগ্রেস সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। যদিও কংগ্রেস প্রথমে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কংগ্রেস ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেস এই আন্দোলনের চালিকা শক্তি হওয়ায় কংগ্রেসের চরিত্র সাম্প্রদায়িক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বা স্বদেশী আন্দোলনে যত সভা সমাবেশ হয় তার সবই হয় কংগ্রেসের আয়োজনে কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে।[২১] যদিও হিন্দুদের স্বদেশ স্বধর্মীয় আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী মুসলমান নেতা স্বদেশীর সক্রিয় সমর্থক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মজিবুর রহমান, আব্দুর রসুল, আবুল কাসেম, আব্দুল হালিম গজনবী, খাজা আতিকুল্লা প্রমুখ।[২২] এসকল নেতা স্বদেশী আন্দোলনের

প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য সারা বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানের সভা সমাবেশের আয়োজন করেন। স্বদেশী আন্দোলনে সমর্থন দান করে *নবনূর* পত্রিকাটিও কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। এতে জনৈক লেখিকা বলেন :

> ...............আজ প্রত্যেক জেলার গ্রামে শহরে রাজা মহারাজা উকীল মোক্তার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই বিরাট সভার আয়োজন করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ পরিকর হইতেছেন যে, বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিব না। এই মহা আন্দোলনের সময় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নয়। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য।[২৩]

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের অধিকাংশই এ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কারণ মুসলমানরা মনে করতেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলা হয় যা ছিল মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন দেয়নি। কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে মুসলমান সমাজের মনোভাব *ইসলাম প্রচারক* তুলে ধরেছিল :

> ...............স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে মনোযোগী হওয়া উত্তম কথা। কিন্তু গভর্মেন্টের কর্মে নারাজ ও অন্যায় জেদের বশবর্তী হইয়া এরূপ হুজুগ উপস্থিত করা আমাদের মতে কোন ক্রমেই ন্যায় সঙ্গত নহে। তাহারা জেদ করিয়াও হয়ত অনেকটা কাজ উদ্ধার করিতে পারিবেন। আমাদের মত সর্ব প্রকারের দুর্বল জাতি ও শক্তি সামর্থহীন সম্প্রদায় কি ওরূপ জেদ করিয়া কোনও কাজ করিতে পারে?[২৪]

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতৃবৃন্দের আয়োজিত মিছিল প্রতিবাদ সভা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মুসলমানদের বৃহত্তর একটি অংশ ক্রমে জাতীয় কংগ্রেস থেকে স্বতন্ত্র পথে এবং ইংরেজ সহযোগিতার হাত ধরে এগোতে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শের সাথে যেহেতু মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের দাবী একীভূত হয় না, তাই তারা একটি সংগঠনের মাধ্যমে তাদের দাবী আদায়ের মনোভাব ব্যক্ত করেন। মুসলমানরা শিক্ষা লাভ করে যে, স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে তাদেরকে আরো অধিক পরিমাণে সংগঠিত হতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন এমন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা প্লাটফর্ম যাতে শুধুমাত্র মুসলমানদের সদস্য পদ থাকবে। ভারতীয় মুসলমানদের একটি অংশ জাতীয় কংগ্রেস থেকে সরে আসে এবং

এ অবস্থায় পরিপূর্ণতা লাভ ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় মুসলমানদের জন্য আলাদা সংগঠন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।[২৫]

পরবর্তীতে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার ফলে মুসলমানরা বড় ধরনের ধাক্কা খায়। ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমান নেতারা হতাশ হয়ে পড়েন। তারা বুঝতে পারেন যে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে অধিকার আদায় সম্ভব নয়।[২৬] মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে *নবনূর* যথার্থই মন্তব্য করেন ঃ

> মুসলমানরা এক যুগ ধরিয়া গভর্মেন্টের কৃপা ভিখারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে? মুসলমানরা এই দীর্ঘকলের মধ্যে কোন্ অধিকার কোন্ সত্ত্বা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।[২৭]

অপর একটি পত্রিকা হিন্দুদের চাপের মুখে সরকারের বঙ্গভঙ্গ রদের সমালোচনা করে লিখেছিল ঃ

> ন্যায়ের খাতিরে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে সরকারের দুর্বল নীতিই বোমাওয়ালাদের উৎসাহ বর্ধনের একটা বিশেষ কারণ। কেননা বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারকে নির্দিষ্ট বিষয় বলিয়া ঘোষণা করিবার পর বোমাওয়ালদের অনাচারের ভয়ে অকস্মাৎ তাহাকে অনির্দিষ্ট বিষয়ে পরিণত করিয়া ১৯১১ সালে সরকার ভুল করিয়াছেন।[২৮]

কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনাও ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে বিচলিত করে। ১৯১১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ইটালী অটোম্যান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে ত্রিপলী দখল করে নেয়। ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে বলকান যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার তুরস্ক আক্রমণ করলে তুরস্ক সাম্রাজ্য তার ইউরোপভুক্ত অংশ হারায়। যেহেতু ভারতের বিপুল সংখ্যক মুসলমান তুরস্কের সুলতানকে তাদের খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল সেহেতু তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের শত্রুতামূলক আচরণ ও তুরস্ক অঞ্চল দখল করে নিলে ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠে।[২৯] ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিশ্ব মুসলিমবাদের চেতনা (Pan Islamism) বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে ইসলাম দর্শন পত্রিকা মন্তব্য করেছিল ঃ

> আমি বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের হিতাকাঙ্খী রূপে বলিতেছি যে...... মোসলমান শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু জাতি। কিন্তু তাহাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগিলে তাহারা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা

করিয়া গভর্মেন্টের উচিৎ যে, যে সমস্ত স্থান পূর্বে তুর্কী গভর্মেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল এবং এক্ষনে তাহাদের নিকট থেকে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে যে সকল স্থান আপনাদিগের অঙ্গীকার মত তাহাদিগকে ফিরিয়ে দিন। নচেৎ ভারতবর্ষে বিরাট অশান্তি ও বিপদের আশঙ্কা আছে।[৩০]

উপরে উল্লিখিত কার্যকলাপের দরুণ মুসলমানরা নিজেদের দুরবস্থার জন্য ব্রিটিশদেরকেই দায়ী করে। তারা মনে করে যে, ব্রিটিশ নীতির দরুণ মুসলমানরা সবদিক থেকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতির দরুন মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সঞ্চার হয়। এসব ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়, যার অনিবার্য ফল স্বরূপ ১৯১৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতা মূলক এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভারতের ইতিহাসে এই চুক্তি *লক্ষ্ণৌ চুক্তি* নামে পরিচিত।[৩১]

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**


১) W.W. Hunter, *The Indian Mussalman,* Dacca : W. Rahman, 1975, P. 45.

২) A.F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835,* Leiden : 1965, P. 17.

৩) M. Aziul Huque, *History and problems of Moslem Education in Bengal,* Calcutta : 1917, P. 17.

৪) বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট,* ঢাকা : ১৯৭০, পৃঃ-৫৫।

৫) *Op.cit.* P. 25.

৬) Aminur Rahim, *Politics in National Formation in Bangladesh,* Dhaka : 1997. P. 118.

৭) ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জনার জন্য দেখুন ঃ Qeyamuddin Ahmad, The Wahabi Movement in India, Calcutta : 1966, আরো দ্রষ্টব্য : আব্দুল মওদুদ, *ওহাবী আন্দোলন,* ঢাকা ১৯৬৯।

৮) ফরায়েজী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন ঃ Muin-Ud-din Ahmed Khan, *History of the Faradi Movement in Bengal,* 1818-1906 Karachi : 1965.

৯) স্যার সৈয়দ আহম্মদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন : J.M.S. Baljo, *The Reforms and Religions ideas of Sir Syyed Ahmad Khan,* lahore : 1949.

১০) নবাব আব্দুল লতিফ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Enamul haque (ed.) *Nawab Bahadur Abdul Lalif his writings and Related Documents,* Dhaka : 1968.

১১) আমির আলী সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : K.K. Aziz, *Ameer Ali : His life and work,* Lahore : 1968.

১২) J.M.S. Bal Jon. *op.cit.*

১৩) M. Mohar Ali (ed.) *Autobiography and other writings of Nawab Abdul latif Khan Bahadur,* Chittagong : 1968, P. 113.

১৪) মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম 'উনিস শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ' *সুন্দরম,* ঢাকা : ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯১, পৃঃ ৫৬-৫৮।

১৫) মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম, 'বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য', *'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃঃ-৮০।

১৬) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; 'আধুনিক জনমতের উন্মেষ ও সাময়িক পত্র সাধনা', *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* রাজশাহী : মিত্র সংঘ, ১৯৬৯, পৃঃ-৬।

১৭) সম্পাদকীয়, *মোসলেম সুহৃদ,* ৯ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩১৫, পৃঃ-২।

১৮) মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম, 'বঙ্গীয় মুসলিম সংবাদপত্রে কৃষক সমাজ (১৯২০-১৯৪০)' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০১, পৃঃ ১৬৯।

১৯) বিষম সঙ্কট, ইসলাম প্রচারক, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১২ (আগষ্ট ১৯০৫) পৃঃ ১৭২।

২০) এবনে মা'আজ, 'বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন' *ইসলাম প্রচারক,* ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩১২ পৃঃ ১৮৯-৯২।

২১) Hossainur Rahman, *Hindu Muslim Relations in Bengal 1905-1941.* Bmbay : Nachiketa publishing Ltd, 1975, PP. 20-23.

২২) Chandiprarad Sarker, *The Bengali Muslims : A Study in their politicization 1912-1927,* Calcutta, K.P. Bagchi and Company, 1991. PP. 23-25.

২৩) খায়রন্নেসা খাতুন, 'স্বদেশানুরাগ', *নবনূর,* ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১২, পৃঃ ২৭৭।

২৪) বিষম সংকট, *ইসলাম প্রচারক,* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১২ পৃঃ ১৭২-১৭৬।

২৫) Syed Sharifuddin Pirzada (ed.), *Foundation of pakistan All India Muslim League Documents : 1906-1947.* Dhaka : National Publishing House Ltd. 1969, P.1.

২৬) Abdul Hamid, *Muslim separatism in India : A Brief survery, 1858-1947.* Dhaka : Oxford University press, 1967, P. 88.

২৭) খয়ের খাহ্ মুনশী, 'রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান' *নবনুর*, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১২।

২৮) সম্পাদক, 'বোমাও বিপ্লব' *শরিয়তে এসলাম*, ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৯৩৭।

২৯) B.N. Pandey, *The Break-up British India,* London, Macmillan and Co. 1969, PP-84-85.

৩০) মাওলান শাহসুফী মোহম্মদ আবুবকর সাহেব, আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালীর তৃতীয় সঠিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ *ইসলাম দর্শন*, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩২৭।

৩১) Waheed-Uz-Zaman, *Towards Pakistan,* Lahore : publishers United Ltd. 1964 p.22.

# সংবাদপত্রে বাংলদেশের নারী (১৯৭২-১৯৮০)

শামসুন নাহার

## পটভূমি

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার নারী সমাজের একটি সমীক্ষা নিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় নারী সমাজ ছিল উপেক্ষিতা তাদের কোন স্বাধীন সত্ত্বা স্বীকার করা হত না। প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পেরোনো পর্যন্ত বাংলার নারী ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় এবং লোকাচার ভিত্তিক অনুশাসনের বাইরে কোন মানবিক চর্চার সুযোগ পেতেন না।[১] যে সকল ইতিহাসবিদ বাংলার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন, তারা বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নারী পুরুষের পার্থক্যকে বিবেচনায় আনেননি। কিন্তু সর্বদাই পুরুষ মানুষের সাথে যুক্ত।[২] মূলত প্রাচীন যুগে নারী অবস্থান নিয়ে তেমনভাবে আলাদা করে কিছু লেখা হয়নি। প্রাচীনকালে পুরুষ প্রধান সমাজে নারী ছিল পরান্নজীবী ও অসহায়। সারা জীবনে তার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। কন্যা রূপে পিতার, জায়া রূপে স্বামীর এবং মাতা রূপে পুত্রের অভিভাবকতায় কাটত তার জীবন। তার বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুর বাড়ি ছিল। কিন্তু নিজের বাড়ি ছিল না।[৩] বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রাচীন বাঙ্গালী স্মৃতিকারদের অভিমত অনুযায়ী পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে হত। বহুপত্নী গ্রহণও সমাজে প্রচলিত ছিল। ধর্মশাস্ত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত ছিল না। স্বামীর অনুগতা সাধ্বী স্ত্রী হওয়াই ছিল প্রাচীন বাঙ্গালী নারী সমাজের আদর্শ।[৪] শাস্ত্রে আছে "পিতাই যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, কন্যা বর প্রার্থনা করিবে না। ইহাই সনাতন ধর্ম"।[৫] প্রাচীন বাংলায় রমনীর পরিধেয় ছিল শাড়ী এবং তারা অনেক সময় দেহের উপর অংশ শাড়ী দ্বারা আবৃত্ত করত না। একখণ্ড কাপড় থাকে ওড়না বা উত্তরীয় বলা হত তা দিয়ে আংশিকভাবে নারীদের উপরাঙ্গ আবৃত্ত রাখার কথা পবনদূত হতে জানা যায়।[৬] সে সময় রমণীরা তাদের চুল তৈল দ্বারা সুগন্ধ যুক্ত করত, তাদের গোছাবন্ধ চুলে ফুলের মালা জড়াত। অন্য একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে গ্রাম্য নারীরা কপালে কাজলের বিন্দু বা টিপ দিত এবং সাদা পদ্মের ডাটার বলয় বা চুড়ি হাতে দিত।[৭]

প্রাচীন যুগের মতো মধ্যযুগে নারী সমাজ ছিল পরনির্ভরশীল, অসহায়, এখানেও

সারা জীবনে তার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। কন্যা রূপে পিতার, জায়া রূপে স্বামীর এবং মাতা রূপে পুত্রের অভিভাবকতায় কাটত তার জীবন।[৮] সাধারণভাবে বলা হয় ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় থেকে মধ্যযুগের সূচনা।[৯] ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রবেশ, ব্যাপক ধর্মান্তর ও ধর্মান্তরিত বাঙালী নারীদের সম্পত্তি, দেনমোহর, তালাক ও পূর্ণ বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধিকার প্রাপ্তি ঘটে মুসলিম আইন অনুযায়ী।[১০] মধ্যযুগে সামাজিক জীবনে বিয়ে সাদি নারী পুরুষ প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ধুমধাম আমোদ-প্রমোদ সমারোহের মাধ্যমে অতি অল্প বয়সে বালক-বালিকাদের বিয়ে দেওয়া ছিল সমাজের রীতি, মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যে এটা প্রতিফলিত হয়েছে। 'লাইলী মজনু' কাব্যের নায়ক মজদুর পিতা তাঁর পুত্রের বিয়ের প্রস্তাব করেন যখন বালক কেবলমাত্র পাঠশালায় বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তো সে সময় মজনু নিশ্চয়ই বারো বছরের কম বয়সের হয়ে থাকবে। এই কাব্যের নায়িকা লায়লীকে তার প্রাথমিক বিদ্যা শেষ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১১]

এরপর ব্রিটিশ শাসন জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারী প্রশ্নটি ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে এবং প্রভাবশালী ব্রিটিশ লেখকগণ ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকে নিকৃষ্টতর বলে রায় দিতে গিয়ে নারীদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত সে বিষয়টি উল্লেখ করেন।[১২] আর এর প্রভাবে সামগ্রিকভাবে বাংলায় যে আধুনিকীরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার প্রভাব নারী সমাজকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছিল। নতুন জ্ঞানের বিকাশ এবং মানুষের কাজে তার প্রয়োগই আধুনিকতার সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১৩] ইউরোপে রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং এই রেনেসাঁর প্রভাবে আধুনিক যুগের সূচনা।[১৪] বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম এ দুটি প্রধান সম্প্রদায় প্রভাবিত হয়েছিল ভিন্নভাবে। মুসলমান সম্প্রদায় নিজেকে গুটিয়ে নিলে ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ তাদের নিজেদের সমাজকে পর্যালোচনা ও সংস্কারের লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তখন থেকেই নারী সম্বন্ধীয় আলোচনায় সতীদাহ, বাল্য বিবাহ, বৈধব্য, বহু বিবাহ এবং শিক্ষার ব্যাপারে বাধা নিষেধ আরোপের মতো বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়।[১৫] আধুনিক বাংলার নারী সম্পর্কে ১৮১৯ সাল প্রকাশিত সতীদাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তিকায় রামমোহন রায় বলেন, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের

আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না।[১৬] বস্তুত আধুনিক যুগে নারী সমাজ কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও তাকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়।

**সংবাদপত্রে নারী সমাজের চিত্র (১৯৭২-১৯৮০)**

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঙালীর জীবন মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারী আন্দোলন মূলত জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। নারী সমাজ ধীরে ধীরে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। মহিলা সংগঠনগুলি তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের মাধ্যমে নারী সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে।[১৭] তারপরও নারী সমাজকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সংবাদপত্রে নারী সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের এবং একই সঙ্গে নারী নির্যাতনের চিত্র প্রকাশিত হত। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলো প্রবন্ধ, নিবন্ধ রচনা, সম্পাদকীয়, সচিত্র প্রতিবেদন, সমালোচনা, অভিমত ইত্যাদি প্রকাশ করতো।

সংবাদপত্রে যে সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ, রচনা সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, আলোচনার সুবিধার্থে সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী

খ. অর্থনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী

গ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারী

ঘ. নির্যাতিতা নারী

**সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী**

১৯৭২ সালের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় উল্লেখ করেছিল মহিলা সমাবেশে কবি সুফিয়া কামাল মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তা তুলে ধরে পত্রিকাটি লিখেছিলেন ঃ

> মহিলা সমাবেশে কবি সুফিয়া কামাল দেশের পূর্ণগঠন কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। কবি সুফিয়া কামাল সব ধর্মান্ধতা ভুলে গিয়ে বাংলাদেশকে একটি সুন্দর ও পবিত্র রাষ্ট্র তথা সোনার বাংলায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে সর্বস্তরের জনসাধারণকে পূণর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলদেশের শত সহস্র

> মুক্তিযোদ্ধাসহ যে সকল নারী, শিশু ও বুদ্ধিজীবি নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই অগণিত শহীদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি অশ্রু ভারক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারের উপর জোর দিয়ে বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা পালনের সুযোগ প্রদান এবং সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা।[১৮]

১৯৭২ সালের দৈনিক আজাদ উল্লেখ করেছিল কিভাবে একজন কলেজ ছাত্রী শরনার্থী শিবিরে সেচ্ছা সেবিকা হিসাবে কাজ করতে করতে দেশত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন অস্ত্র চালনা শিখেছিলেন।

> রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ফেরদৌস পারভিন ডলি, ঘটনাক্রমে ডলি শরনার্থী শিবিরের সেচ্ছা সেবিকা নিযুক্ত হন। তিনি শুধু স্বেচ্ছাসেবিকাই ছিলেন না। মাত্র ১০-১৫ দিনের মধ্যে এম.এল.আর রাইফেল, স্টেন্যান এল.এম.জি ব্যবহারে নিপুণ দক্ষতা লাভ করে।[১৯]

১৯৭৩ দৈনিক ইত্তেফাক উল্লেখ করেছিল যে শুধুমাত্র ঘর সংসার নিয়ে নয়, বাংলাদেশের নারীদের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত।

> রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তর সামাজিক মানুষকে সজোরে নাড়া দিয়েছে। সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সঙ্গে সংসারের মধ্যেও তাই আজ এক নতুন প্রাণ চেতনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আর সেই জন্যই নারী সমাজ সংসার জগৎ থেকে ক্ষণে ক্ষণে বর্হিজগতে তাদের সৃষ্টিকে প্রসারিত করে তুলেছে। একথা স্বীকার্য যে, নারী সমাজ আজ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে নারী আন্দোলনকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া চলে না। যেখানে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের স্পর্ধা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সেখানে দেশেরই অন্যান্য শক্তির সঙ্গে নারী শক্তিও তার সবটুকু সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।[২০]

১৯৭৭ সালে দৈনিক সংবাদ-এ উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুক্তিযুদ্ধে মহিলাসহ বাংলাদেশের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠী যে ত্যাগ স্বীকার করে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা থেকে উৎরানোর জন্য বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে এসেছিল। এ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ঃ

> স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রায় আড়াই লাখ মহিলা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নারী পুণর্বাসনের ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হল। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো, সামাজিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা থেকে মেয়েদের মুক্তি দেওয়া। যাতে করে তারা ক্রমে ক্রমে স্বাবলম্বী হতে পারেন। নারী মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করেছিল মহিলা সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কিছু স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংস্থা।[২১]

*সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাজনীতিবিদ সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

> বাঙ্গালী মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদান সৃষ্টি করেন জোবেদা খাতুন চৌধুরী। তাঁর জন্ম ১৯০১ সালে আসামের জোড়হাটে। জোবেদা খাতুন চৌধুরী তার রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বিচিত্রা প্রতিনিধিকে জানালেন, আমি যখন ছোট তখনই আমি শুনেছি বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। অথচ আমরা পরাধীন, একথা শুনে মনে খুব ব্যাথা পেতাম, ১৯২২ সালে প্রথম মহিলা জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সিলেটে। হিন্দু মেয়েরাই ঐ সভায় যোগদান করেছিল। কিন্তু মুসলমান মেয়েরা যোগদান করেনি। ত্রিশ দশকের শুরু থেকে জোবেদা খাতুনের যে সংগ্রামী জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজও অব্যাহত রয়েছে। তিনি হচ্ছেন এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মুসলমান বাঙালী মহিলা।[২২]

**অর্থনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার নারী ঃ**

শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতির জন্য তৎকালীন শিক্ষাবিদ কামরুজ্জামানের অভিমত দেশে একই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা উচিত। এ সম্পর্কে ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭২ দৈনিক আজাদ উল্লেখ করে ঃ

> অবিলম্বে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে তিনি সরকারের কাছে আহ্বান জানান। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অনগ্রসরতার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন।[২৩]

১৯৭২ সালের দৈনিক আজাদ-এ বিশিষ্ট সাহিত্যিক মকবুলা মঞ্জুর তার প্রবন্ধে নির্যাতিতা মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে স্বাবলম্বী হতে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

> যে সব শিক্ষিতা মহিলা লাঞ্ছিতা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, বোর্ড তাদের জন্য আর একটি ক্ষেত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন। এখান থেকে এই সব মহিলাদের চাকুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষা দান করা হবে। অর্থাৎ শটহ্যান্ড, টাইপ রাইটিং, নার্সিং ইত্যাদির ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করা হবে।[২৪]

১৯৭৩ সালের ২১শে জানুয়ারী দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিতরাই পারে একটা জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে। এখানে নারী সমাজে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার আহ্বান জানান হয়েছে।

> নারী সমাজের অশিক্ষা যে কেবল সামাজিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে তা নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথেও প্রবল বাধার সৃষ্টি করছে। যে অচলায়তন এদেশের নারী সমাজকে করেছে শিক্ষায় বঞ্চিত এবং ঠেলে দিয়েছে প্রায় মানবেতর পর্যায়ে সেই সমাজ ভেঙ্গে চুরে নতুন প্রগতিশীল ও বন্ধনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হয়েছে বাংলাদেশের জন্ম।[২৫]

**সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারী ঃ**

নির্যাতিতা, অসহায় মেয়েদের বাসস্থানের জন্য মাদার টেরেসা একটি আশ্রম উদ্বোধন করেন, এ সম্পর্কে সংবাদ ১৯৭২ সালের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

> মাদার টেরেসা ইসলামপুর রোডের আমপট্রিস্থ সাবেক এ্যাডোরেশন মোনাষ্টারীতে নিগৃহীতা মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি আশ্রম উদ্বোধন করেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে নিগৃহীতা মহিলা ও এতিম শিশুদেরকে এই ভবনে আশ্রয় দেওয়া হইবে।[২৬]

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার এবং তুলনামূলকভাবে নারীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিভিন্ন কারণে আরও শোচনীয়। তার মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অন্যতম, দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সীমিতকরণ এক নম্বর সমস্যা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ১৯৭৩ সালে দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল ঃ

> পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এখানকার মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরা ৩৪০ জন মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।[২৭]

সংসারে মেয়েদের দায়িত্ব সম্পর্কে ১৯৭৪ সালে দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখা হয় ঃ

> সংসারে মেয়েদের দায়িত্ব ও সমস্যা অপরিসীম। কিশোরী কাল থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মেয়েদের নানা দায়িত্ব ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন কিশোরী কালে কন্যা ও ভগিনী রূপে এবং বিবাহিত জীবন বধূ জায়া রূপে নানা দায়িত্ব পালন করতে হয়। সর্বাপেক্ষা কঠিন দায়িত্ব মেয়েদের জননীরূপে।[২৮]

ইসলামের দিক থেকে নারী মুক্তি সামাজিকভাবে কি দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হতে পারে সে সম্পর্কে ১৯৭৬ সালের সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ

> নারী মুক্তির সাথে গোটা মানব জাতির অর্ধেকের স্বার্থ জড়িত প্রত্যক্ষভাবে। আর বাকী অর্ধেকের স্বার্থ জড়িত পরোক্ষভাবে অর্থাৎ পারিবারিক সম্পর্কের মাধ্যমে। সুতরাং নারী মুক্তির প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে সাবর্জনীন গুরুত্বের দাবীদার ইসলামেই নারীর পরিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে।[২৯]

**নির্যাতিতা নারী ঃ**

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নিরীহ মহিলাদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ২১শে জানুয়ারী ১৯৭২ সালের দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

> রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পাকিস্তানী বাহিনীর একটি বিরাট ক্যাম্পে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। মঞ্জিলা ও তার বোনদের সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই আরো ৩০টি যুবতীর সাথে একটি কক্ষে তাদের তালাবন্ধ করে রাখা হয়। এই কক্ষে বন্দী যুবতীদের সেখানে কর্মরত সামরিক অফিসারদের লালসার খোরাক হতে হয়েছে।[৩০]

১৯৮০ সালের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে "নারী মুক্তি ও সামাজিক প্রেক্ষিত" শিরোনাম একটি নিবন্ধে যৌতুক প্রথা, বহুবিবাহ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল যে ঃ

> নারী সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যেমন যৌতুক প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা, পতিতাবৃত্তি, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি। সমাজকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে এবং গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের বিকাশের স্বার্থেই এসব ব্যাধির অবসান হওয়া দরকার।[৩১]

**উপসংহার ঃ**

পাকিস্তান যুগের অবসান ঘটার পর নতুন রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত বাংলাদেশের নারী সমাজ কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অধিকতর সক্রিয় করে তুলতে শুরু করে। মেয়েরা অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতকে জয় করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের নামে মেয়েদের ঘরের মধ্যে থাকার জন্য ইতিপূর্বে যতটা প্রবণতা ছিল— এখন তা অনেকটা কমতে থাকে। ১৯৭২-৮০ সালের সংবাদপত্রে মেয়েদের সম্পর্কে যে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়— সেগুলিতে নতুনভাবে নারী সমাজকে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**


১) মাহমুজ শামসুল হক, *হাজার বছরের বাঙালী নারী,* পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০০০, পৃঃ-১৬।

২) জেরাল্ডিন ফোর্বস, *বাংলাপিডিয়া,* সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ৫ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃঃ-৮৮।

৩) আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ,* স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, মুক্তধারা, পৃঃ-৩২৭।

৪) শাহানারা হোসেন, প্রধান সম্পাদক আনিসুজ্জামান, *বাংলার ঐতিহাসিক পরিচয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, পৃঃ-৬৯।

৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, *শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড,* চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়, পৃঃ-৬০৮।

৬) R.C. Majumder (ed.), *History of Bangal,* University of Dacca, 1943, Vol. 1, p. 613.

৭) S. Hussain, *Everyday Life in the Pala Empire,* Dacca, 1968, p. 148, 16.2.

৮) মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃঃ-১৪৯।

৯) C. Stewart, *History of Bengal* (London, 1813), p. 27.

১০) মাহমুদ কবীর, *বাংলাদেশের নারী, নারী অগ্রগতির কালপঞ্জি,* বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, সূচীপত্র প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃঃ-৩১৬।

১১) ডক্টর এম.এ.রহিম, *বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ-২৪৮।

১২) জেরাল্ডিন ফোর্বস, *বাংলাপিডিয়া, পূর্বোক্ত,* পৃঃ ৮৯-৯০।

১৩) গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ-৫।

১৪) মাহমুদা ইসলাম, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃঃ-৭৩।

১৫) *বাংলাপিডিয়া, পূর্বোক্ত,* পৃঃ-৯০।

১৬) গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত,* পৃঃ-১২।

১৭) *বাংলাপিডিয়া, পূর্বোক্ত,* পৃঃ-১০৫।

১৮) মহিলা সমাবেশে কবি সুফিয়া কামাল, দেশের পূণর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান, *দৈনিক আজাদ,* ১২ জানুয়ারী ১৯৭২, পৃঃ-২।

১৯) রওশন আরা জলি, মুক্তিসেনা শরনার্থীদের সেবিকা ডজি এখন নিজেই হাসপাতালে, *দৈনিক আজাদ,* ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২, পৃঃ-৯।

২০) বদরুজা নাসরিন, নারী সমাজ ও রাজনীতি, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ-৩।

২১) বিদেশে মহিলা সেমিনার, *দৈনিক সংবাদ,* ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭. পৃঃ-৬।

২২) মাহমুদ শফিক, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ২৫শে এপ্রিল ১৯৮০, পৃঃ-২২।

২৩) দেশে একই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা উচিত, *দৈনিক আজাদ,* ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭২, পৃঃ-৫।

২৪) মকবুলা মঞ্জুর, লাঞ্ছিতা মহিলাদের পূণর্বাসন, *দৈনিক আজাদ,* ২০শে মে ১৯৭২, পৃঃ-৩।

২৫) সম্পাদকীয়, নারী শিক্ষা, *দৈনিক সংবাদ,* ২১শে জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ-৪।

২৬) মাদার টেরেসা কর্তৃক ঢাকায় মহিলা উদ্ধার আশ্রম উদ্বোধন, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২৯শে জানুয়ারী ১৯৭২, পৃঃ-৫।

২৭) সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি ভিন্ন ধরনের হাসপাতাল, *দৈনিক বাংলা,* ৫ই মে ১৯৭৩, পৃঃ-৫।

২৮) মোমতাজ বেগম, আজকের আমরা ও আমাদের সন্তান, *দৈনিক আজাদ,* ১৯শে অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ-৪।

২৯) বেগম হাসনা শফিক, নারী মুক্তি অর্জনে ইসলামের অবদান, *সাপ্তাহিক বেগম,* ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ-৩৩।

৩০) বর্বরদের বন্দী শিবিরে তিনটি তরুণীর নারকীয় অভিজ্ঞতা, *দৈনিক পূর্বদেশ,* ২১শে জানুয়ারী ১৯৭২, পৃঃ-৩।

৩১) সম্পাদকীয়, নারী মুক্তি ও সামাজিক প্রেক্ষিত, *দৈনিক সংবাদ,* ১৩ই মার্চ ১৯৮০, পৃঃ-৪।

# মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ

মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন

উনিশ শতকের শেষের কয়েক দশক হতে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে জাগরণের যে সূত্রপাত ও পর্যায়ক্রমিক বিকাশ হয় উলামা-মাশয়েখ[১] তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তখনকার প্রচলিত পাশ্চাত্য ধারার গতিকে অবলম্বন করে মুসলমানদের প্রগতিবাদী যে অংশটি রেনেসাঁ গড়ে তুলতে চেয়েছিল ধর্মীয় নেতৃত্ব স্পষ্টতই তাদের বিরোধিতা করেছে এবং বিকল্প পন্থা হিসেবে তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে শহর থেকে সুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাহন হিসেবে পত্র-পত্রিকাকে বেছে নেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমানেরা তাদের শিক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তুলনামূলকভাবে উন্নততর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হওয়ার একটি সুযোগ খুঁজে পায়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মৌলভী আলিমুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদপত্র *সমাচার সভারাজেন্দ্র*, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মৌলভী ফরিদুদ্দীন খাঁ সম্পাদিত জগদুদ্দীক ভাস্কর ও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলাহেদ খাঁ সম্পাদিত *ফরিদপুর দর্পণ* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মুসলিম সম্পাদিত আর কোন পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৭০ থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশ পায় *আজিজুন নেহার* ও *পারিল বার্তাবহ* সহ আরো দু-একটি পত্রিকা। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশ অভিযানের মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যেই কলকাতা থেকে মৌলভী আব্দুল খালেক সম্পাদিত *মহাম্মদী আখবার* নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। *মহাম্মদী আখবার* সংবাদপত্রের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যবাহী। মুস্তফা নূরুল ইসলামের মতে, "বাস্তবিক পক্ষে মহাম্মদী আখবার থেকেই সাময়িকপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের যাত্রা শুরু"। উল্লেখ্য যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাশিয়া যখন তুরস্ক আক্রমণ করে, তখন তুরস্কের বিপদকে বাঙালি মুসলিম সমাজ নিজের বিপদ বলেই মনে করেছিল। এ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই প্রকাশিত হয় *মহাম্মদী আখবার*। আব্দুল কাদির বলেন, "এই সংবাদপত্রখানির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উর্দ্দু ও বাংলা ভাষাবাষী সাধারণ মুসলমানের

নিকট রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের বিস্তারিত খবর প্রচার। .... যুদ্ধ শেষ হবার অল্পকাল পরে তা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।"[২] এ পত্রিকাটির মাধ্যমে তুরস্কের জন্য বাঙালি মুসলমানদের আন্তরিকতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি বিশেষ কোন ইস্যুতে ব্যাপকভবে জনমত গঠন ও প্রতিবাদের পথ খুঁজে পায় একথার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৮৮০ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কমপক্ষে বিভিন্ন ধরনের তেত্রিশটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বলা যেতে পাবে, এটা ছিল প্রস্তুতি পর্ব। তখন বাঙালি মুসলিম জনমত সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে।[৩] এরপর থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের গতিতে আর ভাটা পড়েনি।

অধিকাংশের মতে, শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা হয়। মিশনের এ পত্রিকায় স্বভাবতই খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সাথে সাথে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও বিদ্বেষ প্রচার করা হত। উনিশ শতকে শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হিন্দু সমাজ-এর তীব্র প্রতিবাদ করে পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করে। এমতাবস্থায় মুসলমানেরা বসে থাকেনি। তাঁরা ইসলাম ধর্মের অপপ্রচার অপনোদনের জন্য প্রথম পত্র-পত্রিকার আশ্রয়ে যায়। আর এ প্রয়াসের নেতৃত্বে ছিল উলামা— মাশায়েখ সমাজ। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, হিন্দু মধ্যবিত্তের জাগরণ শুরু হয়েছিল কলকাতা শহর কেন্দ্রিক, সঙ্গত কারণে এ জাগরণ মফস্বলের নিম্ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভবে সংগঠিত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে আলিমদের নেতৃত্বে মুসলমানদের এ জাগরণ ছিল শহর থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত। বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই কৃষক শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষিত উলামা ও মাশায়েখ সমাজের সাথে তাঁদের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। উলামা-মাশায়েখ সমাজ তখনকার সকল সামাজিক আন্দোলন, রাজনীতি চিন্তাধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

জাগরণের প্রথম সময়কার পত্রিকাসমূহের নামকরণের দিক থেকে একটি বিশেষত্ব ধরা পড়ে। ১৮৩১ ও ১৮৪৬ সালে মুসলিম কর্তৃক প্রকাশিত দুটো পত্রিকারই নামকরণ করা যথাক্রমে *সভারাজেন্দ্র* ও *জগদুদ্দীপক ভাস্কর*। এ পত্রিকা দুটোর নাম ইসলাম ধর্মের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বহন করে না। কিন্তু ১৮৭৭ সলে রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক আক্রমণ করার কারণে মৌলভী আব্দুল খালেক তুরস্কের যুদ্ধের খবরাখবর বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে *মহাম্মদী আখবার* প্রকাশ করেন। *মহাম্মদী আখবার* নামের মধ্য দিয়ে মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার আলাদা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। *মহাম্মদী আখবারের* পর থেকে ১৯২৬ সালের *ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ* গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকায় একই ধারা অব্যাহত থকে। মূলত তখনকার বাঙালি

মুসলমানের সাময়িকপত্র সাধনার মূলে সক্রিয় ছিল তাদের 'মুসলমানত্বের প্রেরণা'। মুসলমানত্বের প্রেরণা থেকেই অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার নাম *ইসলাম* ও *মুসলিম* দুটি শব্দের বিশেষণে বিশেষায়িত ছিল। নামকরণে এতদসহ আরো ব্যবহৃত হয়েছে *'হাদিছ'*, *'শরিয়ত'*, *'মসজেদ'*, *'তবলীগ'*, *'মোয়াজ্জিন'*, *'ইমান'*, *'হেদায়েত'*, ইত্যাদি ধর্মীয় চেতনা নির্দেশক শব্দাবলী। এ নামকরণের মাধ্যমে দুটো বিষয় পরিষ্কারভাবে সকলের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। হিন্দু সমাজ যেমন তাদের উন্মেষপর্বে সংবাদ ও সাময়িকপত্রের নামকরণে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় পরিচয়বাহী শব্দাবলীর ব্যবহার করে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা দিয়েছিল, মুসলমানদের উন্মেষপর্বেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। এতে মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা পাওয়ার সাথে সাথে আলাদা স্বাতন্ত্র্য যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি মুসলিম সমাজ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্যতা থেকে বেরিয়ে আসার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ফিরে পেয়েছে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উলামা-মাশায়েখ সম্পাদিত এসব পত্রিকায় বাংলার মুসলমানের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চেতনার প্রচার করতে গিয়ে সংকীর্ণতার চোরাবালিতে পতিত হয়নি। সম্পাদক লেখকগণ এক্ষেত্রে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংস্কারমুক্ত মানসিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁরা চেয়েছেন মুসলমানদের জাগরণ। মাসিক *হাফেজ*-এর নিবেদন ছিল, ''হাফেজ সেই ভোগবিলাস-সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অতীত গৌর ও ধর্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য প্রকাশিত হল।''

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্পাদিত এবং প্রভাবিত পত্রিকায় কেবল মুসলমান এবং মুসলিম বিশ্বের আলোচনা আসেনি বরং একই সমাজে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দু রেনেসাঁর জোয়ার জাগরণের পথে মুসলিম সমাজকে আরো আগ্রহী করে যা হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে আরো তরান্বিত করে। ১৮৮৭ সালে মুসলিম সম্পাদিত একটি পত্রিকার নামই ছিল *হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী*। এ পত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ ছাপা হয় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে। ১৩২৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যা *আল-এসলামে* এস.এম. আকবর উদ্দিন একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ''তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান, তোমার এক ধর্ম, আমার এক ধর্ম, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তোমায় আমায় কি বন্ধুত্ব হইতে পারে না? তুমি আমি কি ভাই ভাই হইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি না''[৪] উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সাথে বাঙালি মুসলিম সমাজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়েই বসবাস করতে চাইত। হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে মুসলমানদের এরূপ উদারনৈতিক ধারণা উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। উলামা-

মাশায়েখ আরবী ফার্সী ও উর্দু ভাষায় শিক্ষিত হলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁরা যথেষ্ট টান অনুভব করতেন। উলামা-মাশায়েখ কর্তৃক বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকপত্রই এর প্রমাণ। উলামা-মাশায়েখ তাঁদের সম্পাদিত পত্রিকায় 'মুসলমানিত্ব ও বাঙালিত্ব'-এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেননি।

উনিশ শতকের নব্বই-এর দশক মুসলিম সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল দশক হিসেবে পরিগণিত। এদশকে মুসলমান কর্তৃক প্রায় ১৭টি সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। যার অধিকাংশই উলামা-মাশায়েখ সম্পাদিত। মৌলানা মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ-এর *ইসলাম প্রচারক*, 'মওলানা শেখ আবদুর রহিম-এর *হাফেজ, মিহির ও সুধাকর*, মোসলেম উদ্দীন খাঁর *টাঙ্গাইল হিতকরী*, মুন্সী ময়েজউদ্দিন আহমদের *প্রচারক, 'ইসলাম'*, মৌলভী মুজিবর রহমান-এর *'ইসলাম রবি'*, এবং মৌলভী ইউসুফ আলীর *'নূর-আল-ঈমান'* প্রকাশিত হয়। বিষয় ও লেখনির দিক থেকে পত্রিকাগুলো মুসলমানদের জাগরণকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

বঙ্গে সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশনা সম্পাদনা ও এর পরিমার্জনে মওলানা আবু বকর ছিদ্দিকি (র) (১৮৫২-১৯৩৯) অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফীসাধক, আলিমকুল শিরোমনি ও ইসলাম প্রচারক। তিনি মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্যপত্র-পত্রিকা প্রকাশ পয়েছিল। *'নবনূর', 'ইছলাম দর্শন', 'মোছলেম হিতৈষী', 'বঙ্গনূর', 'সোলতান', 'রওশনে হেদায়েত', 'ইসলাম জগত', 'শরিয়ত ইসলাম', 'হেদায়েত', 'হানাফী', 'হানাফী জামায়েত', 'মোছলেম', 'ইসলামের ঝাণ্ডা', 'ছুন্নত অল জামায়াত'*, প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া মাওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার জন্যও তিনি পৃষ্ঠপোষকতার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, যাতে এগুলো অর্থ সঙ্কটের কারণে বন্ধ হয়ে না যায়। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলা বিহার ও আসামের অগণিত মুরীদকে উল্লেখিত পত্র-পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে পত্রিকাগুলো বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন।[৫] তাঁর মুরীদ ও অন্যতম প্রখ্যাত আলেম মওলানা রুহুল আমন আবু বকর ছিদ্দিকি (র)-এর নির্দেশে এসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও দেখাশুনা করতেন।

মওলানা আকরম খাঁ বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার এক প্রবাদ পুরুষ। ছাত্রজীবনেই মাদ্রাসায় বাংলা প্রবর্তনের আন্দোলন করেন। *আহলে হাদীছ* নামক এটি পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি। মুসলিম বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতিকল্পে

একে একে *'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক সেবক', দৈনিক জামানা* ও *'দৈনিক আজাদ'* প্রকাশ করে এদেশের মুসলিম সাংবাদিকতাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন।[৬]

আগা মঈনুল ইসলাম (১৮৬৩-১৯৩০) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে স্বীয় সম্পাদনায় *হাবলুল মতীন* নামক একটি ফার্সী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর প্রকাশনা ১৯৩০ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ড. আব্দুল্লাহ্ সুহ্‌রাওয়াদী (১৮৭৭-১৯৩৫) সম্পাদনায় ইংরেজীতে *হাবলুল মতীন* উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক রূপে কিছুদিন প্রকাশ পেয়েছিল। বলকান যুদ্ধ চলাকালে (১৯১১-১৩) মওলানা এসলামাবাদীর সম্পাদনায় বাংলা দৈনিক *হালুল মতীন* কিছুকাল প্রকাশিত হয়। মওলানা মুনীরুজ্জামান এছলামাবাদীর সম্পাদিত *দৈনিক সুলতান* দেশের সাহিত্য সাংবাদিকতা, বাংলাভাষার উন্নয়ন ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।[৭] উল্লেখ্য, মওলানা মুনীরুজ্জামান এসলামাবাদী ছিলেন জামালুদ্দিন আফগানীর (১৮৩৯-১৮৯৭) চিন্তা ধারায় প্রভাবিত।

কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্গের প্রথম ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি বৃটিশদের কাছ থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। প্রথম ব্যক্তি ছিলেন উর্দু কবি মওলানা ফজলুল হাসান হসরৎ মোহানী। এ স্বাধীনতার দাবীর জন্য তাঁকে জেলে গিয়ে নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সম্পাদিত ধূমকেতুর মাধ্যমে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেন। এ পত্রিকার উৎসাহদাতা ও অর্থদাতা ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হাফেজ মাসউদ।[৮] তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আলিম সমাজ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেতে কতটুকু ব্যাকুল ছিল এবং পত্র-পত্রিকাকে এ দাবী অর্জনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে করত উল্লেখিত দুটো ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। কাজী নজরুল ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হননি তবে তিনি ইসলামী শিক্ষার আলোকে আলোকিত মানুষ ছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি কিছুদিন ইমামতি করেছিলেন বলে তাঁর জীবনী গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত অসংখ্য ইসলামী কবিতা ও প্রবন্ধ উল্লেখিত কথার সত্যতা প্রমাণ করে। নজরুল চিত্তে লালিত এ ইসলামী চেতনা তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিভিন্ন সময় প্রতিফলিত হয়েছে।

বৃটিশরা শাসন ক্ষমতা হতে নেওয়ার পর এদেশে পাদ্রীর আগমন এবং অপেক্ষাকৃত মুসলিম দরিদ্র জনপদের খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসার, উপমহাদেশের মুসলমানদের চোখে খেলাফতের প্রতিনিধিত্বকারী তুর্কী সালতানাৎ থেকে ইউরোপীয় খ্রীষ্ট শক্তি কর্তৃক 'বলকান

অঞ্চল' বিচ্ছিন্ন করা এবং বৃটিশদের বিতর্কিত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত আলিম সমাজকে 'বঙ্গীয় সমাজ ও বিশ্ব রাজনীতির' ব্যাপারে সচেতন ও আগ্রহী করে তুলে। তাছাড়া খ্রীস্টান প্রশাসন কর্তৃক আমদানী করা অপসংস্কৃতির ভয়াবহতাও তাদেরকে আরো সতর্ক হতে সাহায্য করে। এ সচেতনতা ও সতর্কতা থেকেই মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২) বঙ্গীয় আলেমদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯১৩ সালে ১৫-১৭ মার্চ বগুড়ার বানিয়াপাড়া গ্রামে হানাফী ও আহলে হাদীছ আলিমগণ যৌথভাবে একটি উলামা সম্মেলন করেন এবং এখান থেকেই আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা গঠিত হয়।[৯] আঞ্জুমান-এ-ওয়ারেজীন[১০]-এর দু বছর পর আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ বাংলা গঠিত হয়।[১১] এ সম্মেলনেই সম্ভবত প্রথম জাতীয় ও ধর্মীয় ইস্যুতে এদেশের হানাফী ও আহলে হাদীছ আলেম সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে (১৩২২ সালের বৈশাখ) আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ বাংলা এর মুখপত্র *আল-এসলাম* প্রকাশিত হয়। মওলানা মুনীরুজ্জামান এসলামাবাদী ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মওলানা ফররুখ আহমদ নিযামপুরী ছিলেন সহ-সম্পাদক। ১৯২১ সালের জানুয়ারী (১৩২৭ সালের মাঘ) পর্যন্ত মোট ছয় বছর পত্রিকাটি স্থায়ী হয়। ধর্ম, মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যসহ সকল বিষয় এ পত্রিকায় স্থান পেত। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও মাতৃভাষার সেবা করা। *আল-এসলাম* পত্রিকাটি ছিল নিঃসন্দেহে ইসলাম ও ধর্মীয় সাময়িকী সমূহের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম জাতীয়তাবাদ, মুসলিম ঐক্য, মুসলিম রাজনীতি সহ মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ সাধন ও বিকাশ সাধনে এ পত্রিকার ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। পরবর্তীতে জমিয়ত-এ-উলামা-এ-বাংলা-ও-আসাম গঠিত হলে তিনটি পত্রিকা এর মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। তিনটি মুখপত্র হল যথাক্রমে, *ছুন্নত অল জামায়াত, শরিয়তে এসলাম,* ও *হেদায়েত*।[১২]

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে বেশ কয়েকজন আলিম সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইনের অধীন ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সালের পূর্বক্ষণ পর্যত ৪টি কাউন্সিল নির্বাচনে বিশিষ্ট কোন আলিম পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অবতীর্ণ হননি। ১৯৩৫ সালের 'ইন্ডিয়া বিলে' আইনসভার সদস্য সংখ্যা ও তার এখতিয়ার বর্ধিত করা হয়। পার্টি প্রধানের হাতে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে এ আইন বৃটিশ গর্ভমেন্টের অনুমোদন লাভ করে। সংশোধিত এ এ্যাক্ট অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের ১৮

জানুয়ারী সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হয়। এ নির্বাচনে মুসলমানদের দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথাক্রমে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা সমিতি। *জমিয়ত-এ-উলামা-এ-বাংলা-ও-আসাম* পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুসলিম লীগ ও জমিয়তের যৌথ প্রার্থীদের ব্যাপারে জনমত গঠন করতে ব্যাপক সহায়তা করে। মওলানা আকরম খাঁর দৈনিক আজাদ যেমন মুসলিম লীগকে বলিষ্ঠ সমর্থন দিতে কোন ত্রুটি করেনি, তেমনি জমিয়তের উল্লেখিত তিনটি পত্রিকাও মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার চালাতে কার্পণ্য করেনি।

১৯২৯ সালের জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ২৫জন মুসলিম সদস্য কলকাতার রিপন স্ট্রীটে একসাথে মিলিত হন। এখানে আলোচনান্তে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের প্রস্তাবক্রমে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হয়। স্যার আবদুর রহিম ও মওলানা আকরম খাঁ যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারী মনোনীত হন।[১৩] এ সমিতি গঠিত হবার পর মুখপত্র হিসেবে *কৃষক* নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং এর সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় মওলানা সামসুদ্দিন আহমদের উপর।[১৪] ১৯৪৫ সালে পার্টি থেকে পদত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দরিদ্র মুসলমানের অধিকার আদায়ের জন্য সর্বত চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা-পার্টি ও মুসলিম লীগকে নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা গঠনের কিছুদিন পর ফজলুল হক নিজেই মুসলিম লীগে যোগদান করেন। *জমিয়ত-এ-উলামা-এ-বাংলা-ও-আসাম* ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। তাই এ উলামা পরিষদ মন্ত্রীসভার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। জমিয়ত-এর মুখপত্রগুলো হক মন্ত্রিসভার সমর্থনে খবরাখবর ফলাও করে প্রচার করে। এ অঞ্চলে মুসলিম লীগকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে জমিয়ত মুখপত্র ও দৈনিক আজাদের ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ-এর ২৭তম অধিবেশনে এ.কে.ফজলুল হকের উত্থাপিত 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বলে পরিচিত। পাকিস্তান প্রস্তাব সম্মেলনে মাধ্যমে গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলার জন্য গতি পেল। আলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলোও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে জনমত গঠনে প্রচার অব্যাহত রাখে। অবশ্য কংগ্রেসপন্থী ওলামাদের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সমর্থিত পত্রিকাসমূহ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেনি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই পাকিস্তানের রাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উলামা-মাশায়েখ-এর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হতে থাকে।

উলামাগণ মনে করল, মুসলমানদের রাষ্ট্র কায়েম হওয়া পর্যন্তই তাদের দায়িত্ব ছিল। এখন ইসলামী হুকুম-আহকাম রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। তাঁরা মূলত ইসলাম ও পাকিস্তানকে সমার্থবোধক করে ফেলেছিল। ফলে রাজনীতি ও সমাজনীতিসহ অনেক ক্ষেত্র থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। সংগত কারণেই এর প্রভাব পড়ল পত্র-পত্রিকার উপর। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন হতে শুরু করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাতে কিছুটা হলেও ভাটা পড়ে। তবে এ ক্ষেত্র থেকে একবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন ব্যাপারটি এ রকম নয়। এদেশের মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত উলামা সমাজের অনেকেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্র-পত্রিকার লালন ও পোষণ অব্যাহত রাখে।

মওলানা আকরম খাঁ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন এবং নব উদ্যমে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা *দৈনিক আজাদের* প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন। *দৈনিক আজাদ* সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের পূর্বাংশে আগের মতই জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, ফলে এর প্রতিদ্বন্দী কোন পত্রিকা সে সময় ছিল বলে জানা যায় না। আকরম খাঁর মাসিক মোহাম্মদী ও নবপর্যায়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর *হক কথা* প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে একটি ঝড় তুলেছিলেন। ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* (বর্তমানে দৈনিক) এখনো অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে। ইসলামী ভাবধারা নিয়ে পাকিস্তান সরকার প্রকাশ করেন *মাহে নও* ১৯৪৮ সালে। মাওলানা আবদুর রহিমের *জাহানে নও*, ১৯৫৮', মওলানা নূরুল হকের *আল-ইসলাহ*। উল্লেখ্য *আল-ইছলাহ* পূর্ব থেকেই প্রকাশ হয়ে আসছিল। উলামা-মাশারেখ সম্পাদিত আরো বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন— *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ১৩৫৪', *অর্ধসাপ্তাহিক নবনূর*, *২১শে মার্চ*, ১৯৪৮', *পাক্ষিক জিহাদ*, ১৩৫৬', '*সাপ্তাহিক তানজীম*, ১৩৬৫', '*সচিত্র মাসিক নওবাহার*, ১৩৫৬', *মাসিক তর্জুমানুহহাদীছ*, ১৩৬৯', '*মাসিক তাহজীব*, ১৩৫৭', '*মাসিক মুকুল*, ১৩৬২', '*মাসিক নতুন সকাল*, ১৩৬৩', '*পাক্ষিক তাবলীগ*, ১৯৫০', '*মাসিক নূর*, ১৩৬২', '*সাপ্তাহিক জামানা*, ১৯৫৪', '*সাপ্তাহিক মুজাহিদ*, ১৯৫৬', '*সাপ্তাহিক আরাফাত*, ১৯৫৭', '*মাসিক আলইসলাম*, ১৯৫৮', '*যুগরবি*, ১৩৭৪', '*দৈনিকনাজাত*, ১৯৫৮', '*ষান্মাষিক মিনার*, ১৮৫৮', '*দিশারী*, ১৯৬০', '*ত্রৈমাসিক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা*, ১৯৬১', '*যুগরবি*, ১৩৭৪', '*দৈনিক নাজাত*, ১৯৫৮', '*ষান্মাষিক মিনার*, ১৮৫৮', '*দিশারী*, ১৯৬০', '*ত্রৈমাসিক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা*, ১৯৬১', '*মাসিক মদীনা*, ১৯৬১', '*কিশোর মাসিক সবুজ পাতা*', ১৯৬২', '*পাক্ষিক*

*সুরমা*, ১৯৬৫', '*মাসিক আলহেরা*, ১৯৬২', *মাসিক পৃথিবী*, ১৯৬৩', '*মাসিক সন্ধান*, ১৯৬৪', '*মাসিক তমদ্দুন*, ১৯৬৯', '*মাসিক মনজিল*, ১৯৭০', '*ত্রৈমাসিক ইকবাল একাডেমী পত্রিকা*, ১৩৭৮', '*দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯৭০'-সহ আরো কিছু দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী।

পকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত যে সমস্ত উলামা-মাশায়েখ পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও সাংবাদিকতার মানসপুত্র হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছেন মওলানা মহিউদ্দিন খান', 'মওলানা আমিনুল ইসলাম', 'আব্দুল মান্নান তালিব', 'মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী', 'মওলানা নুর মুহম্মদ আজমী', 'মওলানা রুহুল আমীন', 'মওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ', আবদুর রহমান সিংকাপনী', অন্যতম প্রধান। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে উলামা-মাশায়েখ সম্পাদিত অনেক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হত, বাংলাদেশ হওয়ার পরেও যার অনেকগুলো অব্যাহত আছে।

উলামা-মাশায়েখ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি দুর্বলতম বেশ লক্ষণীয়। তাহল, তাঁদের সম্পাদিত অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ছিল ক্ষণস্থায়ী। অর্থাভাবে বহু পত্র-পত্রিকা অকালে বন্ধ হয়ে যেত। এ দুর্বলতা প্রমাণ করে সেকালে মুসলিম সমাজ দারিদ্র্যতাকে আলিঙ্গন করে বেঁচে ছিল। অপরদিকে বারংবার পত্রিকা প্রকাশ তাঁদের জাগরণের আকাঙ্খা ও তীব্রতাকেই প্রমাণ করে। জাগরণের এ উন্মাদনাই একটি পত্রিকা বন্ধ হলে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছাকে প্রবল থেকে প্রবলতর করে তুলত। সুতরাং আমরা বলতে পারি, বারবার পত্রিকা প্রকাশ ও অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া মুসলিম সমাজের জাগরণের চেতনাকে আরো শাণিত করেছে।

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) উলামা-মাশায়েখ তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বলতে দেশে প্রচলিত সরকারী বেসরকারী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসায় প্রত্যক্ষভাবে যারা পড়াশুনা করেছেন এবং যারা সমাজে মওলানা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২) আব্দুল কাদির, "মহাম্মদী আখবার" *মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র* (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ১৯৬৬), পৃঃ ১৮-১৯।

৩) মুস্তফা নূরুল ইসলাম, *সাময়িক পত্রেজীবন ও জনমত*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০১) ২য় সং, পৃঃ-৪।

৪) এস.এম. আকবর উদ্দিন, অগ্রহায়ণ সংখ্যা '*আল-এসলামে*', ১৩২৩।

৫) দৈনিক ইনকিলাব, ৪ঠা জুন, ২০০২।

৬) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সম্পাদিত, *বার্ষিক সওগাত,* ১৩৩৩, পৃঃ-৪৮৯।

৭) মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃঃ-৩২।

৮) অরুণ কুমার বসু, *নজরুল জীবনী,* (কলকতা : ২০০০) পৃঃ-৮৭।

৯) আল্লামা আব্দুর রহমান, *আব্দুল্লাহেল কাফীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩) পৃঃ-৮।

১০) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী রবিবার কলকাতার গ্রীয়ার পার্কের এক সভায় 'আঞ্জুমান-এ-ওয়ায়েজীন' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১১) সুনীল কান্তি দে, *আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ,* (কলকাতা : মল্লিক লাইব্রেরী, ১৯৯২) পৃঃ ১৪-১৫।

১২) ছুন্নত-আল-জামায়াত, ৩য় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৪৩/আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, পৃঃ ৪৪-৪৫।

১৩) Statesman, Calcutta 2, July, 1929 , p. 6; Bengali, Calcutta, 3 July, 1929, p.4.

১৪) শ.ম. সওকত আলী, *কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ১৯৮৯), পৃঃ-৮৫।

# বাংলা ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার "বিহারি" সম্প্রদায়ের ভূমিকা

ড. আবু মাঃ দেলোয়ার হোসেন

## এক

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির কালে পূর্ব বাংলার মোহাজেরদের (শরণার্থী) আগমন শুরু হয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় আগত মোট মোহাজের ৬,৯৯,০৭৯ জনের মধ্যে ৩,২৮,৪৩৩ জন অবাঙালি।[১] অবাঙালিদের বড় অংশ ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা থেকে আগত। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই উর্দুভাষী এই মোহাজেরদের পুনর্বাসন, বাংলাভাষা সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ৪ মাসের মধ্যে বাঙালি-বিহারি সংঘাতের প্রথম প্রকাশ্য সূচনা ঘটে এবং তা বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে। আলোচ্য প্রবন্ধে দুই পর্বে বিভক্ত (১৯৪৮ ও ১৯৫২ সাল) ভাষা আন্দোলনে বিহারি মোহাজেরদের ভূমিকা, বিহারিদের এ ভূমিকা পূর্ব বাংলার কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা তুলে ধরা হবে। যদিও চূড়ান্ত পর্বে উর্দুর পক্ষে বিহারিদের পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের পক্ষে ভূমিকা বাঙালিদের কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। বাংলা ভাষা কেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় হয় যার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে উর্দুর পক্ষাবলম্বনকারী মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং বাংলার পক্ষে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন।

## দুই

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফরের সময় বিভিন্ন বক্তৃতার উর্দুর পক্ষে বক্তব্য এবং একই বছর ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক বক্তৃতার একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা[২] পূর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করে। শুরু হয় বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার বাংলাভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৫৪.৬

শতাংশ বাংলা, ২৮.৪ শতাংশ পাঞ্জাবি এবং ৭.২ শতাংশ উর্দু ভাষাভাষী এবং বাকিরা অন্য ভাষাভাষী। পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার দিক থেকে দেখা যায় এসময় বাংলা ভাষাভাষী ৯৮.১৬ শতাংশ, উর্দু ভাষী ছিল ১.১০ শতাংশ। অথচ পাকিস্তান সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে। জিন্নাহ'র নিজের ভাষা গুজরাটি হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানের সংহতির ভাষা হিসেবে উর্দুকে উপস্থাপিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এক বক্তৃতায় বলে বসেন যারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার বিরোধিতা করে তারা পাকিস্তানের শত্রু।[৩] পাকিস্তানে আগত মোহাজের যাদের মাতৃভাষা উর্দু এ ঘোষণা তাদের অনুপ্রাণিত করে এবং পূর্ববঙ্গে আগত উর্দুভাষীরা মুসলিম লীগ ও সরকারের ছত্রছায়ায় উর্দুর পক্ষে ভূমিকা রাখতে থাকে। অথচ পূর্ব বাংলার তাদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার নগণ্য অংশ, তবে ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের ১৪ শতাংশ। পূর্ব বাংলায় অবাঙালিরা ভাষা সঙ্কটের আড়ালে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ পূর্ব বাংলার নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। উর্দু ভাষার সমর্থন করে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা আশ্রয়দানকারী বাঙালিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই পুরনো ঢাকার চকবাজার, পলাশী এলাকার উর্দুভাষীদের তৎপরতা লক্ষ্য করা হয়। ১২ ডিসেম্বর পলাশী ব্যারাক ও পুরনো ঢাকার বিভিন্ন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। পরের দিন বিকেলে চকবাজারে উর্দুভাষীদের উদ্যোগে একই দাবিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উর্দু ভাষাভাষী মোহাজের ও পুরনো ঢাকার কয়েকজন ছিল এর উদ্যোক্তা। ১২ ডিসেম্বর উদ্যোক্তরা গাড়িতে করে এ দাবির পক্ষে শ্লোগান ও প্রচার পত্র বিলি করলে বাংলা ভাষার পক্ষে একদল ছাত্র তাতে বাধা দেয়। এতে সংঘর্ষ বাধলে ২০ জন আহত হয়।[৫]

## তিন

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন নিজে ছিলেন উর্দুভাষী, ভাল বাংলাই বলতে পারতেন না। ঢাকার নবাব পরিবারও ছিল উর্দুভাষী। এছাড়া প্রদেশিক রাজধানীসহ দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী পুরনো ঢাকার অধিবাসীদের বড় অংশ বাসার 'ঢাকাইয়া উর্দু' ভাষায় কথা বলতো, বিশেষ করে প্রভাবশালী সর্দারদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল উর্দু। তখন ঢাকার রাজনীতি মূলত ছিল নবাবদের নিয়ন্ত্রণে, মহল্লার সর্দারদের হাতে। এর ফলে বিহারিরা ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলনের আগে উর্দুর পক্ষে পুরনো ঢাকায় প্রকাশ্যে সভার সাহস দেখায়। আর ১৯৪৮ সালের মার্চে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার ঢাকাইয়া মস্তান এবং সর্দারদেরও ব্যবহার করে। পুরনো ঢাকার বাসিন্দা,

রাজনীতিবিদ কামরুদ্দিন আহমদ এ সম্পর্কে একটি বর্ণনায় বলেন "ঢাকার খাজা পরিবার, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) সর্বস্ব পণ করলেন এ আন্দোলন বন্ধ করার জন্য। ঢাকাবাসীদের ভুল বুঝানো হল। ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লেলিয়ে দিলেন তারা গোটা ছাত্র সমাজ ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে।[৫] অবশ্য ছাত্রনেতা ও রাজনীতিবিদের প্রভাবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মহল্লার সর্দাররা নিরপেক্ষ ভূমিকা নেন। মাওলা সর্দার, পিয়ার সর্দার, ইলিয়াস সর্দার, মতি সর্দার ৫২'-এর ভাষা আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। পুরনো ঢাকার অনেক ছাত্র ও যুবক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

## চার

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরে অবাঙালিরাও উর্দুভাষার পক্ষে কাজ করে এবং এর ফলে বাঙালিদের সাথে সংঘাত বাঁধে। তখন অনেক জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসক ছিলেন অবাঙালি। সরকারি দল মুসলিম লীগ প্রশাসনকে ব্যবহার করে অবাঙালিদের মাধ্যমে উর্দুর পক্ষে ভূমিকা রাখে। বগুড়ার জেলা প্রশাসক অবাঙালি আব্দুল মজিদ মোহাজেরদের বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ব্যবহার করেন। ভাষা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেককে প্রশাসন থেকে সরিয়ে সেখানে বিহারিদের পুনর্বাসন করা হয়।[৬] রংপুর কারমাইকেল কলেজের উর্দুভাষী অধ্যক্ষ সৈয়দ শাহাবউদ্দিনের হুমকি ও দমননীতির কারণে কলেজ ও রংপুরে ছাত্রদের আন্দোলন বাধাগ্রস্থ হয়। তাঁরই ইঙ্গিতে কলেজের শিক্ষক জমিরউদ্দিন ও কলিমউদ্দিন মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর দমননীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে দীর্ঘদিন কলেজে ছাত্র ধর্মঘট চলে। ১৮ মার্চ যশোরে মুসলিম লীগ ও স্থানীয় প্রশাসনের উস্কানিতে হাজার হাজার অবাঙালি ঝুমঝুম থেকে সশস্ত্র অবস্থায় শহরে ঢুকে পড়ে। তারা দড়াটানা মোড়ে বক্তৃতা করে ঐ এলাকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বাংলা ভাষার পক্ষাবলম্বনকারী দু'জন মালিকের দুটি মিষ্টির দোকান তারা লুট করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নোমানী ও অবাঙালি পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এ সময় শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে জনগণের বাংলা ভাষার দাবিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা করা হয়। গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল রেল ষ্টেশনে দু'জন বাঙালিকে বিহারিরা ছুরি মেরে হত্যা করেছে। শহরে তখন ভীষণ উত্তেজনা। ভাষা আন্দোলন পরিষদ বিষয়টি উপলব্ধি করে ১৮ মার্চ প্রায় ৩০০০ লোক নিয়ে মিছিল করলে মিছিলের বিশালতা দেখে অবাঙালিরা পিছিয়ে যায়।[৭] বাঙালির ওপর অবাঙালিদের এই আক্রমণের সত্যতা ২৪ মার্চ পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন স্বীকার

করে বলেন, "১৮ মার্চ শহরে বিরাট সংখ্যক বিহারি যশোর প্রবেশ করছিল। পুলিশ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সরিয়ে দেয়।"[৮]

## পাঁচ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আরো ব্যাপকভাবে উর্দুভাষী মোহাজেরদের বাঙালিদের বিরুদ্ধে দেখা যায়। ইতোমধ্যে ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উর্দুভাষীরা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। দাঙ্গার আবরণে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অবাঙালিদের ব্যবহার করে বহু বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনকারীদের আঘাত হানা হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে আগত উর্দুভাষী মোহাজেররা। ১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী ঢাকার দাঙ্গা সম্পর্কে তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো, "শরণার্থীরা বিশেষ করে বিহারিরা এই গোলযোগের জন্য দায়ী। স্থানীয় জনগণ যদিও এসবের বিপক্ষে নয়, তবে তারা উদাসীন। সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম লুট, হত্যা আর অগ্নিসংযোগ চলল। পুলিশ এসব বন্ধ করার কোন চেষ্টাই করল না। অবাঙ্গালি পুলিশরা বরং উৎসাহ যোগাচ্ছিল। পুরো প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল। সরকারের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কারফিউয়ের ঘোষণা দেওয়া হলেও তা কার্যকর করা হল না"।[৯] অন্যদিকে বগুড়ায় দাঙ্গার আবরণে মুসলিম লীগ সমর্থক ও বিহারিদের দ্বারা হতাহত হয় অগণিত ভাষা আন্দোলন সমর্থক।[১০] দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে উর্দু ভাষী মোহাজেরদের হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলের প্রচেষ্টা থেকে তাদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এর ফলে স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি, ব্যবসা, ঘরবাড়ি অবাঙালি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অনেক অবাঙালি বরাদ্দ নেয়। এছাড়া হিন্দু চাকরিজীবীদের শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে।[১১]

বাঙালি-উর্দুভাষীদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে সশস্ত্র রূপ নেয় পরের বছর (১৯৫১) সালের জুন মাসে। ১৯৫১ সালের ১লা জুন যশোরের রামনগরে মোহাজের কলোনিতে একদল লোক আক্রমণ চালায়, আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ব্যাপক সম্পত্তি লুট করে। আক্রমণকারীরা ৩ জন মহিলা ও ২ জন শিশু ধরে নিয়ে যায়।[১২] অবশ্য সরকারি রিপোর্টে আক্রমণকারী কারা বলা হয়নি। এ ঘটনা সম্পর্কে ১১ই জুন যশোর জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আব্দুল খালেক এবং পূর্ববঙ্গের রিলিফ কমিশনার আহসান উদ্দিন কর্তৃক মুখ্যসচিব আজিজ আহমদকে দেওয়া এক পত্রে ঘটনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। জেলা মুসলিম লীগ এ ঘটনাকে রাজনৈতিক চরিত্র দিয়ে ঘটনার জন্য

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দু'জন অনুসারী মশিউর রহমান ও সৈয়দ শামসুর রহমানকে দায়ী করেন। আব্দুল খালেকের ভাষায়, "তাঁরা (এ দুজন) প্রথম থেকেই শরণার্থীদের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত এবং শরণার্থী ও স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিতে নিয়েজিত রয়েছেন। এরা দুজন উর্দুভাষা বিরোধী আন্দোলনের নের্তৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের অপপ্রচার ও অনুপ্রেরণার ফলে কয়েকদিন আগে বাঙালি-অবাঙালি শরণার্থীদের মধ্যে এক ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দেয় এবং এতে বেশ কয়েকজন অবাঙালি আহত হয়"।[১৩] এখানে মুসলিম লীগ জেলা সেক্রেটারি ঘটনার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস.পি., সিভিল সার্জনকে দায়ী করেছেন।[১৪] তিনি তদন্তের পর রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও অনুরোধ করেন। অথচ রিলিফ কমিশনারের মুখ্য সচিবকে দেওয়া পত্রে সুস্পষ্ট বলেন, "আমরা উপলব্ধি করছি অবাঙালি প্রশ্নে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মহল কাজ করছে এবং এর পেছনে মুসলিম লীগের জেলা পর্যায়ের কিছু অবিবেচক কর্মীর ভূমিকা রয়েছে"।[১৫] এই পত্রটি হতে জেলা মুসলিম লীগ নেতাদের উর্দুভাষীদের বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। অন্যান্য জেলাযও ভাষাকেন্দ্রিক যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাতে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও উর্দুভাষীরা যৌথ ভূমিকা রাখে। মুসলিম লীগ শুধু ভাষার প্রশ্নেই নয় বরং ১৯৫২ সালের গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে উর্দু ভাষীদের লেলিয়ে দেয়। যে সব স্থানে উর্দু ভাষীরা পুনর্বাসিত হয়েছিল তাঁর অনেকগুলো স্থানে বিচ্ছিন্ন বা পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষার সমর্থকরা তাদের আক্রমণের শিকার হয়। কুমিল্লার সুধারামে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার পক্ষে একটি মিছিলে উর্দুভাষীরা আক্রমণ চালিয়ে ১৫ জন ছাত্রকে আহত করে।[১৬]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এমনিভাবে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অবাঙালি বা বিহারিরা বাঙালিদের প্রাণের ভাষা বাংলার বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং কোথাও কোথাও প্রকাশ্য সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আর এর পেছনে সমর্থন জোগায় স্বয়ং সরকার ও মুসলিম লীগ। উর্দুভাষীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় গড়ে তোলে আঞ্জুমানে মোহাজেরিন (মোহাজের সমিতি) নামে একটি সংগঠন। ১৯৫২ সালের প্রথম থেকে যখন বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন জোরালো হতে থাকে এ সংগঠনটিও এর বিপক্ষে সোচ্চার হয়। মোহাজের নেতা রাগিব আহসান ১৯৫২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে দেওয়া এক পত্রে বাংলা ভাষা আন্দোলনকে প্রাদেশিকতাবাদ, বর্ণবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে পকিস্তান ও ইসলামর স্বার্থে এ আন্দোলন থেকে বিরত থাকার অনুরোধ

জানান।[১৭] এরপরও তিনি থেমে থাকেননি। পরের মাসের ৭ তারিখে ঢাকা সফররত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী আব্দুর রব নিশতারকে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান এবং কলকাতার জনৈক মন্ত্রীর বাংলা ভাষার পক্ষে বিবৃতি প্রদানের কারণে তাঁকে মোনাফেক আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর ফাঁসি দাবি করেন।[১৮] ১৪ মার্চ এক পত্রে রাগিব আহসান সোহরাওয়ার্দীকে উর্দুর পক্ষে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ৯৫ শতাংশ বাঙালি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চায়।[১৯]

রাগিব আহসান এরপরও তাঁর তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১১ই জুন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার আওয়ামী মুসলিম লীগের ভাষা আন্দোলনে সমর্থনের জন্য তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি এ দলটিকে কেন্দ্র, উর্দু বিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা, জিন্নাহর আদর্শ বিরোধী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা আখ্যা দিয়ে এ দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। একই পত্রে তিনি এ দলের সমর্থক বাংলা দৈনিক পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড, শিক্ষা বিভাগ, প্রচার বিভাগ, ঢাকা রেডিও ও পূর্ব বাংলা পুলিশ বিভাগের আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করেন।[২০] এছাড়া বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে তিনি বাংলার বিপক্ষে ও উর্দুর পক্ষে ভূমিকা রাখেন যা অন্য বিহারিদের সমর্থন লাভ করে। একই বছর আগষ্ট মাসে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকা সফরে এলে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে মোহাজেরিনের উদ্যোগে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং এ অনুষ্ঠানে দেওয়া স্মারকলিপিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য উর্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরবি হরফে বাংলার দাবি জানানো হয়। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ও হিন্দু প্রভাবিত আখ্যা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'পাক বাংলা' ভাষার পক্ষে সুপারিশ করেন। বলা হয়, "Pakistani Bengal must be delinked from Bharatee Brahminism and relinked with the Quran and Islam through the arabic scrip"।[২১]

## ছয়

বিহারিদের এমনি ধরনের বাঙালিবিরোধী মনোভাবের ফলে বাঙালি-বিহারি সংঘাত প্রকাশ্য রূপ নেয়। সরকারের প্রতি বাঙালিদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে তাদের এদেশীয় প্রতিভূ বিহারিদের ওপর। বিহারিরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সরকার ও মুসলিম লীগের প্রতি আরো ঝুঁকে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় গঠিত মোহাজের সমিতি ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের

ঘটনার পর আরো তৎপর হয়ে ওঠে। জনবিচ্ছিন্ন ও জনসমর্থনহীন মুসলিম লীগ কোথাও কোথাও প্রকাশ্যে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ১৯৫২ সালের ২৭-২৮শে মার্চ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এই সমিতির একটি সম্মেলন। এ সময় ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহের জন্য মোহাজেরদের দাবী-দাওয়াকে প্রদেশের বৈষম্যমূলক দাবী থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়। রংপুরে ১৯৫৩ সালের ১-৩রা মার্চ মোহাজের সমিতির সম্মেলনেও একই দাবী জানানো হয়। ১৯৫৩ সালে নাগরিকত্ব প্রদানের পরও এ ধরনের সমিতির তৎপরতা, ১৯৫৪ সালে আদমজি, চন্দ্রঘোনা, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ এবং এতে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা দুই সম্প্রদায়ের পারস্পারিক অবিশ্বাস ঘনীভূত করে। এ দাঙ্গার প্রধান কারণ ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি বিহারি সম্প্রদায়ের উর্দুভাষীরা নিজেদে অস্তিত্ব ও স্বার্থহানী হিসেবেই বিবেচনা করে এর বিরোধিতা করে। ১৯৬০ এর দশকে আইয়ুব খানের আরবি অথবা উর্দু হরফে বাংলা ভাষার সংস্কারে বিহারিদের সমর্থন পাওয়া যায়। অধিকন্তু ১৯৬০ এর দশকে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে উর্দুভাষীরা বাঙালির বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

এভাবে বাংলাদেশে বাস করেও এদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষা বিদ্বেষী ভূমিকার কারণে বিহারিরা ক্রমান্বয়ে বাঙালিদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ সম্প্রদায় অবাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ


১) *First Census of Pakistan 1951,* Vol. 8, (Karachi : Ministry of Home and Kashmir Affairs, 1951), Vol. 8, pp. 1-13.

২) *Quaid-Azam Mohammad Ali Jinnah, Speeches as Governor General of Pakistan 1947-48,* (Islamabad : Ministry of Information and Broadcasting, Government of Pakistan, n.d.), p.93.

৩) দ্রষ্টব্য Keith Callard, *Pakistan : A Political Study* (London : Allen, 1957) p. 182.

৪) *একুশের সংকলন '৮০* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮০), পৃঃ-৩৫।

৫) উদ্ধৃত আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃঃ ৫৭-৫৮।

৬) আবুল হোসেন খোকন, "ভাষা আন্দোলনে বগুড়া", দ্রষ্টব্য আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃঃ-১৫১।

৭) আকসাদুল আলম, "ভাষা আন্দোলনে যশোর", দ্রষ্টব্য আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃঃ-২২৬।

৮) *ঐ*।

৯) *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী* ১৯৪৯-১৯৫০ (ঢাকা : প্রতিভাস, ২০০০), পৃঃ-৭৩।

১০) আবুল হোসেন খোকন, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৪৭-১৪৮।

১১) Taj-ul Islam Hashmi, "The Bihari Minorities in Bangladesh the Myth and Reality", Paper Presented in Department of Intetnational Relations, University of Dhaka. p.5.

১২) *Government of East Bengal B-Proceedings,* Home Department Political Branch, Bande No. 80, Prgs. 508-514, July 1953. এ ঘটনার হতাহতের সংখ্যা ২০০ বলে রিলিফ কমিশনার আহসান উদ্দিন প্রদেশের মুখ্য সচিবকে ১৩ জুন ১৯৫৩ এক পত্রে জানান।

১৩) *Governmental of East Bengal, B-Proceedings,* Home Department, op.cit.

১৪) *Ibid.*

১৫০ *Ibid.*

১৬) বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃঃ-৩৫৪।

১৭) উদ্ধৃত রতন লাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, *ভাষা আন্দোলনের দলিল পত্র* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃঃ-১০৬।

১৮) ঐ, পৃঃ-১০৭।

১৯) ঐ, পৃঃ-১০৮।

২০) ঐ, পৃঃ ১০৯, ১১১-১১৩।

২১) *Government of East Bengal, B-Proceeding,* Political Department, Bandle No. 139, Proceedings No. 10-20.

# ইতিহাসের আলোকে ব্রজলাল কলেজ

## মালতী লতা বাড়ই

ছোটবড় অসংখ্য নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত অধুনা খুলনা জেলার জন্ম খুব বেশি দিনের নয়। এর ভূমিরূপ এবং ভূমিগঠন প্রণালী দেখে দেখে তা স্পষ্টত বোঝা যায়। প্রাচীন সভ্যতার কোন স্পর্শ এখানে না পড়লেও এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সহজ সরল জীবন প্রবাহ, এখানকার মানুষকে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

কোম্পানীর শাসনামলে খুলনা যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৪২ সালে খুলনা মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮২ সালে খুলনা, বাগের হাট, সাতক্ষীরাকে নিয়ে খুলনা জেলার যাত্রা শুরু।

বাংলাদেশের জেলা সমূহের মধ্যে খুলনা জেলার অধিকাংশ পরিবার নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র। এখানকার অধিকাংশ মানুষ ন্যুনতম খোরাকীর সংস্থান করতে পারে না।[১] গ্রামাঞ্চলে প্রধান আয়ের উৎস ভূমি। ভূমি চাষের সাথে তিন শ্রেণির লোক জড়িত— ১) ভূমির মালিক, ২) বর্গাচাষী, ৩) কৃষি দিন মজুর। ভূমির মালিকরা ভূমির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। এরা বর্গাভাগে জমি চাষ করান। তারা শহরাঞ্চলে বাস করে বর্গাচাষী স্থানীয় অধিবাসী। এরা ভূমি অর্থনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্গা বা ভাগ চাষির দুর্বিসহ জীবনের কথা বলা যায় না। ১৮৪৬ সালে ক্যালকাটা রিভিয়্যুতে পিয়ারী চান্দ মিত্র বেনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে তিনি লেখেন, "বাংলার যেকোন স্থানেই যাই না কেন চোখে পড়বে সে একই দৃশ্য; রায়তদের খাদ্যের মধ্যে শুধু ভাত আর কাপড়ের মধ্যে শুধু একটি নেংটি। তার শ্রম থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা উধাও হয়ে যায় নিমিষের মধ্যে। তার উপর উপর ওয়ালাদের পাওনা দাবী অনন্ত। সবদাবীই একে একে তাকে মেটাতে হয়। এরপর সঞ্চয় বলতে তার কাছে আর কিছুই থাকে না। ফলে তার হাতে কোনদিন পুঁজি সৃষ্টি হয় না। বাধ্য হয়ে তাকে দারস্থ হতে মহাজনের কাছে। তার রক্ত শোষণ করে ফুলেফেঁপে উঠে মহাজন।[২]

দেশের এই আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করাতে না পারলে বা তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে না পারলে উপনিবেশিক শাসন যন্ত্র বিকল হয়ে

পড়বে। সুতরাং পরিবর্তন হয় দৃষ্টিভঙ্গির। ১৮১৩ সালে বৃটিশ সরকার দেশীয় জনগণের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। ফলশ্রুতিতে ১৮১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। ১৯০২ সালের পূর্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশের পশ্চিমবঙ্গে ২২টি এবং পূর্ববঙ্গ ১০টি আর্টস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

শিক্ষা হচ্ছে আত্মবিকাশের চাবিকাঠি। এর সঙ্গে আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রশ্ন জড়িত, যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অপর দিকে শিক্ষাকে আদর্শবাদের সঙ্গে যুক্ত করে বলা হয় শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে বিপ্লব। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক বিপ্লব সংগঠনে শিক্ষা সহায়ক উপাদান। মহান ফরাসী বিপ্লব সংগঠনে সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অবদান তাই অনস্বীকার্য।

অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত দক্ষ জনশক্তি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ সম্পদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও যোগ্যতম ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করে দেশের জনগোষ্ঠী। জনগণের দক্ষতা নির্ভর করে শিক্ষার উপর। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার মূল উপাদান মৌলিক শিক্ষা। তাছাড়া শিক্ষা মানুষের আত্মিক, নৈতিক, মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। পৃথিবীর সকল দেশে তাই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।[৪]

১৯০২ সালের জরীপমতে খুলনা জেলায় যারা লিখতে পড়তে পারে তাদেরকে শিক্ষিত বলে ধরা হত। সেই আলোকে ঐ সময় জেলার শিক্ষিতের হার ছিল ৬৯ শতাংশ। ঐ সময় কলকাতা ব্যতিত সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ, রাজশাহী, পাবনা, নড়াইল এবং বরিশাল ছাড়া আর কোথাও কলেজ ছিল না। খুলনার নিকটবর্তী কলেজ ছিল নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজ। এ সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র ছিল সীমিত। এই সীমাবদ্ধতার কারণ হিসেবে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল এলাকার উৎসাহী লোকের অভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন নিবেদিত প্রাণ একাজে এগিয়ে আসেন নাই। কারণ তৎকালীন ধনী জমিদার শ্রেণির বেশিরভাগই এলাকায় বসবাস না করে শহর কলকাতায় বসবাস করতেন। বছরান্তে খাজনা সংগ্রহের জন্য একবার মফঃস্বলে আসতেন। এর ফলে প্রজাকুলের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। যারা এলাকায় বসবাস করত তারা অধিকাংশ ছিল হতদরিদ্র। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে স্বভাবতঃই একটা শূন্যতা বিরাজ করছিল।[৫]

এই শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন খুলনা জেলার ফকিরহাট থানার বা ঐ ডাঙ্গা গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার মস্তান ব্রজলাল চক্রবর্তী এতদাঞ্চলে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দিকে কতিপয় শিক্ষিত এবং উৎসাহী

ব্যক্তিবর্গের কাছে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ১৯০২ সালে বিষয়টি অনেকে ভাবতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ব্রজলাল চক্রবর্তী "The Decennial Report" এ যা উল্লেখ করেছিলেন তা হল "The promoters of the collee took up the work inhand and formed themselves into a community about the begining of the year 1902"।[৬]

ব্রজলাল চক্রবর্তীর মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বাগেরহাটের দশানির জমিদার যদুনাথ বিশ্বাস, খুলনার ঘাটভোগ নিবাসী ত্রৈলক্ষ্য চট্টোপাধ্যায় সহযোগিতার হাত বাড়ান। মূলত এই তিন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কলেজটি খুলনা শহর থেকে ৫ মাইল দূরে ভৈরব নদীর তীরে দৌলতপুরে স্থাপিত হয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য, খুলনা শহর ছেড়ে ৫ মাইল দূরে কলেজটি কেন স্থাপিত হতে গেল? কারণ হিসেবে দেখান হয়েছে যে, শহর কলকাতা থেকে দৌলতপুরের দূরত্ব ১০৫ মাইল। তাছাড়া, পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সাথে রেল, সড়ক পথে দৌলতপুরের যোগাযোগ ছিল সন্তোষজনক। তখন কলকাতার ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব থাকলেও দৌলতপুর ছিল ম্যালেরিয়া মুক্ত। তদুপরি দৌলতপুরের আশেপাশের গ্রাম সমূহ যেমন সেনহাটি, মহেশ্বর পাশা, ফুলতলায় অনেক উচ্চ বর্ণের হিন্দুর বসবাস ছিল। উদ্যোক্তরা মনে করেছিলেন, কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ঐসব ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে নৈতিক, মানসিক, আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এছাড়া শহরের কোলাহল থেকে নির্জন নদী তীরে একটা মনোরম পরিবেশে জ্ঞানার্জন অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কলেজটি দৌলতপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান কলেজটি মাত্র ২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করে এর যাত্রা শুরু। উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা ছিল, একবার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে আশপাশ থেকে কলেজের স্বার্থে আরও জমি পাওয়া যাবে।

বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ কলেজের নামকরণ নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেন। অবশেষে ব্রজলাল চক্রবর্তীর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম "দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী" রাখা হয়। কলকাতা হিন্দু কলেজের আদর্শের অনুকরণে হিন্দু একাডেমীর গঠন প্রণালী প্রস্তুত করা হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ৮৬ বছর পর "দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী" প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরেও কেন কলকাতা হিন্দু কলেজের আদলে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়? উত্তরে বলা হয়, কলেজ প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তী ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। তাছাড়া ঐ সময় কলকাতার সর্বত্রই সংস্কারের ঢেউ লেগেছিল। এ প্রসঙ্গে সমাচার দর্পণ পত্রিকায়

একখানা পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রের মন্তব্য হল— "পুত্রকে কলিকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি করিবার কিছুকালের মধ্যেই বিপরীত রীতি হইতে লাগিল। দেশের রীতি অনুসারে আচার ব্যবহার ও পোশাক ত্যাগ করিলেন। উপদেশের কথা কহিলে Nonsense কহে। পুত্রটি দেশীয় সভায় যাইতে চাহে না। দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে। আমার নিকট বসিতে চাহে না। কারণ আমি ইংরেজী জানি না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ডাকাত বলে। পিতা পিতৃব্যকে নির্বোধ বলে। উচ্চ শিক্ষিত রসিককৃষ্ণ আদালতে ঘোষণা করলেন যে, তিনি গঙ্গার পবিত্রতা মানেন না। আরও কয়েকজন ঘোষণা করেন যে, হিন্দুধর্মও কুসংস্কারে পূর্ণ। তাদের ভাষায় ইহা "vile corrupt and unworthy"। হিন্দু ধর্মের এই অবক্ষয়ের যুগে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ব্রজলাল চক্রবর্তী হিন্দু ধর্ম, দর্শন এবং এর গভীরতায় শিকড় গাড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন ঘটুক।[৭]

১৯০২ সালে ৩রা জুলাই কলেজের অফিসিয়াল কার্যাদি শুরু হয়। ২৭শে জুলাই আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে কলেজের ক্লাশ শুরু হয়। একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের জন্য ছাত্র ভর্তি হয়। পূর্ববর্তী বছরের অকৃতকার্য ছাত্রদের কেউ কেউ দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হয়ে ১৯০৩ সালে পরীক্ষা দেয়। পাকা ভিত, পাকা মেঝে , বাঁশের বেড়া ও টিনের ছাউনি দিয়ে কয়েকখানা ঘর নির্মিত হয়। এসব ঘরে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা বাস করতেন। দশানির জমিদার যদুনাথ বিশ্বাস কলেজে নগদ পাঁচশত টাকা এবং একটি পাকা ভবন নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঐ বছর প্রশাসনিক ভবন নির্মিত হয়।

ব্রজলাল চক্রবর্তীর চিন্তাধারার দুটি দিক ছিল— ১) কলেজ নির্মাণ, ২) ধর্মীয় শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী নির্মাণ। সম্ভবত ব্রজলাল চক্রবর্তী হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালে ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার কুফল সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষার বিকিরণ পুস্তিকাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি, তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা চাকুরী চলেছে আনুসঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশি শিক্ষাবিধি রেল কামরার দ্বীপের মতো। কামরাটি উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলছে ছুটে, সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণ বেদনায় পূর্ণ। সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।"[৮] ব্রজলাল চক্রবর্তী ও পশ্চিমী শিক্ষার ভয়াবহ পরিণতি থেকে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য রবীন্দ্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আশ্রমিক শিক্ষার জন্য চতুষ্পাটী নির্মাণ করেন। ১৯০৪-এর ১লা ফেব্রুয়ারী একখানা কুঁড়ে ঘরে দেবতার প্রতীক স্বরূপ "নারায়ণ শীলা" স্থাপন করা হয়। পণ্ডিত দেবনাথ স্মৃতি তীর্থ চতুষ্পাটীর প্রধান নিযুক্ত হন।

১৯০২-এ ক্রয়কৃত ২ একর জমি যা দেবতার নামে উৎসর্গীত, মন্দির এলাকাধীন জুড়ে আছে। এ জমির পাশেই হাজী মুহাম্মদ মহসীনের দানকৃত সৈয়দপুর ট্রাস্টের জমি। উল্লেখ্য যে, শ্রী ত্রৈলক্ষ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রী ব্রজলাল চক্রবর্তী ইংরাজী ১৯০৪-এর ৫ই এপ্রিল ১৪৬৩ নং দলিলে ১৫০০ টাকা মূল্যের যে সম্পত্তি আশ্রমের জন্য রেজিষ্ট্রী করেন তার পরিমানও তপশীলে অনুল্লেখিত। ১৯১৩ তে মোট জমির ৪২ একর যার আর্থিক মূল্য ১৫,০০০/- টাকা। ১৯০৭-০৮ সালের শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত সরকারী অর্থ মঞ্জুরীর পরিমান দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে ৪০ একর জমি হুকুম দখল দেখানো হয়েছে। এ সম্পর্কে ব্রজলাল চক্রবর্তীর স্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ্য "The Asset is however subject to some qualification. The Government has retained its ownership over the lands and buildings it has paid for and retained its lien upon the books and apparatus purchased with its money subject to these conditions the property is available for use of the college" [১]

[১] কথিত আছে ব্রজলাল চক্রবর্তী ১৯০০ এ খুলনা জেলা প্রশাসক আহসান আহমদ-এর কাছে (হাজী মুহাম্মদ মহসীনর দানকৃত সৈয়দপুর এস্টেটের জমি) কলেজের কাজে ব্যবহারের আবেদন জানালে তিনি এর সঙ্গে একমত নন বলে জানিয়ে দেন। ১৯-০৯-০৮ এ বিচারপতি শারদাচরণ মিত্রের নিকট পুনরায় আবেদন জানালে তিনি একই বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য হল, "দুর্ভাগ্যক্রমে এটা হিন্দু প্রতিষ্ঠান। ট্রাস্ট এস্টেট একটি মুসলিম ওয়াকফ।" ২২-১১-১৯১১ খুলনা জেলা প্রশাসক মিঃ বাডলে বার্ট কলেজ পরিদর্শনের সময় উল্লেখ করেন, "সরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। যতদূর সম্ভব জমি হুকুম দখল নিতে হবে"। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার এবং বঙ্গদেশ সরকারের মুখ্য সচিব মিঃ জে.জি. বিউমিং কলেজ পরিদর্শনে এসে ১৬-০৮-১৯১২ তারিখে উল্লেখ করেন, "ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য সরকার প্রদত্ত ৫০ হাজার টাকার আংশিক দিয়ে জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে।" কলেজ প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তী তাঁর "Decemial Report of Hindu Academy of Khulna, Bengal" -এর ১৬ পাতায় উল্লেখ করেছেন, "In 1912, we received a monthly grant of Rs. 50/- from the Estate of late illustrious Mohammd Muhasin within whose Estate the College is situated". ১৯১২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ৫০ টাকা হারে কলেজ ফাণ্ডে জমা পড়েছিল ১৮,৫০০ টাকা।

১৯০২ সালের জুন মাসে হিন্দু একাডেমির জন্ম। ২৭শে জুলাই অধ্যক্ষ সহ ৪ জন অধ্যাপক নিয়ে ক্লাস শুরু। প্রথম বছরে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা

এবং গণিত পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১ম ও ২য় বর্ষে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৯। ১৯০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে কলেজ অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ কলেজ পরিদর্শনে এসে একে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ বলে স্বীকৃতি দেন এবং কলেজ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট অর্থ আছে কিনা জানতে চান। আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য এসময় ত্রৈলক্ষ্য চট্টোপাধ্যায় ১০ হাজার টাকার সিকিউরিটি বণ্ড দিয়ে দেন।[১০]

কলেজ পরিচালনার মূল দায়িত্ব ছিল ৫ জনের উপর। এঁরা হলেন—

১) পণ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ (প্রেসিডেন্ট),

২) দেবীবর চট্টোপাধ্যায় (সদস্য),

৩) যদুনাথ বিশ্বাস (সদস্য),

৪) ত্রৈলক্ষ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (সদস্য),

৫) ব্রজলাল চক্রবর্তী (সম্পাদক)।

১৯০২-এর জুন মাস হতে ১৯৪৬-এর মার্চ মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি "দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি" নামে চলছিল। ১৯০৪-এর ৮ জুলাই ব্রজলাল চক্রবর্তী মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় কলেজে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন খগেন্দ্র নাথ মিত্র, সাহিত্যিক মনোজ বসু, বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, সঙ্গীতজ্ঞ সুকৃতি সেন, যদুনাথ বিশ্বাসের পুত্র প্রমথ নাথ বিশ্বাস, সিভিল সার্জন আর. এল. বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাতে ব্রজলাল চক্রবর্তীর অবদানের কথা স্মরণ করে কলেজের নাম "ব্রজলাল হিন্দু একাডেমী" রাখা হয়। ১৯৪৯-এ কলেজের নাম থেকে হিন্দু শব্দ বাদ দিয়ে "ব্রজলাল একাডেমি" রাখা হয়। ১৯৪৬-এর পর থেকে বেশ কয়েকবার কলেজের নাম পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তী পরিবর্তনটা এসেছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে প্রেষণে কর্মরত অধ্যক্ষ আবু সহিদ আহমেদ কলেজের নাম থেকে ব্রজলাল শব্দটি বাদ দিয়ে দৌলতপুর কলেজ করার জোর প্রচেষ্টা চালান। এ প্রেক্ষিতে রশিদ বহি ও সীলমোহরে "দৌলতপুর কলেজ" নামে মুদ্রিত হয়। তৎকালীন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এস.এম.এ.কে. মোস্তফা, গণিতের অধ্যাপক শেখ হারুন-এর রশীদ প্রমুখের প্রতিবাদের মুখে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নাই।[১১] বর্তমানে কলেজের নাম "ব্রজলাল কলেজ দৌলতপুর" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জাতীয়করণের পর কলেজের নামের পূর্বে সরকারী শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্রজলাল চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত কলেজের প্রথম পত্রিকা "দেবায়তন" ১৯২৩ সালে

প্রথম আলোর মুখ দেখে। সম্পাদক ছিলেন ভুবনমোহন মজুমদার। ছাত্র অধ্যাপকদের রচনা দেবায়তনে প্রকাশিত হত।। এর মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেনের ‘পুস্তক পরিচয়’ অন্যতম। ১৯৪৯-এ দেবায়তনের নাম পরিবর্তিত হয়ে দৌলতপুর কলেজ পত্রিকা রাখা হয়। ১৯৬২ পর্যন্ত এ নামে চলে। ১৯৬৭-৬৯ পর্যন্ত এর নাম রাখা হয় ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বার্ষিকী। ১৯৮০ সালে দেবায়তন বিহঙ্গতে পরিণত হয়। বর্তমানে বিহঙ্গ নামেই কলেজ বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে।

বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে আইন অমান্য, বিলাতি দ্রব্য বর্জন ভারতছাড় প্রভৃতি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শশীভূষণ দত্ত, হরিদাস মুখার্জী, শীতল মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র সেন, সরোজ সেন, সতীশচন্দ্র রায়, বিধুভূষণ রায় প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালী জাতির পাকিস্তান বিরোধী গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন ব্রজলাল কলেজের ছাত্র শিক্ষকরা। (ভাষা আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তারা হলেন, একে চাঁদ মিয়া, আমিনুল ইসলাম, আব্দুল গফুর, আব্দুল জলিল প্রমুখ।)

এরপর শুরু হয় ৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রজলাল কলেজের বহু প্রাক্তন, বর্তমান ছাত্র অধ্যাপক অংশগ্রহণ করে বিজয়ের পথকে সুগম করেছিল। (অনেকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। জাতি কোনদিন এসব মহান বলিদানকারীদের ভুলতে পারবে না। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন স,ম, কবর আলী, মোঃ ইউনুস মিয়া, চিত্তরঞ্জন দত্ত, কর্ণেল গাফফার, অজয় দত্ত, রহমতুল্লাহ সহ নাম জানা আরও অনেকে।) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দত্ত, কর্ণেল গাফফারকে যুদ্ধে তাদের কৌশল ও সাহসিকতার জন্য বীর উত্তম এবং রহমতুল্লাহকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১২]

ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস পর্যালোচনা করা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। স্বল্প সময় ও পরিসরে যেটুকু করা হয়েছে তা শুধুমাত্র এর বহিরাঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে ব্রজলাল চক্রবর্তী ও তাঁর সহযোগীরা যে শ্রম, অর্থ, সময় ব্যয় করেছেন তা জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। যে জ্ঞানালোক তাঁরা প্রজ্জলিত করে রেখে গেছেন তার আলোকবর্তিকা আজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) মোঃ নুরুল ইসলাম, খুলনা জেলা সাপ্তাহিক খুলনা, জেলা পরিষদ, দাউদপ্রেস এ্যান্ড প্যাবলিকেশন, খুলনা জুন, ১৯৮২, ১ম সংস্করণ, পৃঃ-৪১।

২) সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা, বাংলা একডেমী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ-১৩৮।

৩) মল্লিকা ব্যানার্জি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই একটি ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলন-২০০০, বেথুন কলেজ, কলিকাতা।

৪) ঐ

৫) মোঃ নুরুল ইসলাম, সাপ্তাহিক, খুলনা, জেলা পরিষদ, পৃঃ ৪৮৮-৯১।

৬) Brajalal Chakravarty (Edited) The Decenial Reprt of Daulatpur Hindu Academy 1902-12.

৭) মোঃ বজলুল করিম, ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস, পিপলস প্রেস, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৩-২০।

৮) রচনা চক্রবর্তী ঔপনিবেশিক কাল পর্বে নারী শিক্ষা একটি আলেখ্য, পশ্চিম ইতিহাস সংসদ স্মরণিকা—ষোড়শ সমেলন-২০০০।

৯) মোঃ বজলুল করিম ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস, পিপলস প্রেস, খুলনা, ১ম সংস্করণ-২০০০, পৃঃ ২১-৪৭।

১০) ঐ, পৃঃ ২৬৮-৯০।

১১) ঐ, পৃঃ ৩৬২-৬৮।

১২) ঐ, পৃঃ ৪০১-২৩।

# শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং সাংবাদিকতায় মুনশী মেহের উল্লাহর অবদান

মো: জহীর রায়হান

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। মুসলমানেরা একদিকে ইংরেজদের নিকট তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন ইংরেজদের সাথে সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দেয় এবং অন্যদিকে ইংরেজদের নিষ্ঠুর দমন নীতির শিকারে পরিণত হয়। এক কথায়, মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠে। উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাঙ্গালী মুসলমানদের ইংরেজ শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নে বিপন্ন হয়ে পড়ে। এরপর বৃটিশ নীতির ফলে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকেরও দুর্দশা শুরু হয়। ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় স্বত্বার উপর আঘাত হানতে শুরু করে খৃষ্টান মিশনারীরা। এ সময় খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়! দারিদ্র কবলিত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মুসলমানেরা খৃষ্টান-জীবনের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে ব্যাপক হারে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। এভাবে শুরু হয় ধর্ম হরণের পালা। এই সময় প্রাদ্রীগণ খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের নামে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করে। তাছাড়া খৃষ্টান পাদ্রীরা মুসলমানদের পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে অপব্যাখ্যা দিতে লাগলো। এই সময় সামাজিক বা সরকারীভাবে কোন প্রতিবাদ ছিল না। বাঙালী মুসলমানদের জীবনে নেমে আসে এক ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতির, শান্তির আগমনী বার্তা নিয়ে আবির্ভাব হয় মুনশী মেহের উল্লাহর।

বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাসে মুনশী মেহের উল্লাহ এক বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করে আছেন। তিনি বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ এর (ইংরেজী ১৮৬১ সালে ২৬শে ডিসেম্বর) সোমবার যশোরের এক অজ্ঞাত পল্লী বারবাজারের অঞ্চলস্থ সোপপাড়া নামক গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সোপপাড়া গ্রামটি ছিল তার মাতুলালয়। তাঁর পিত্রালয় হলো যশোর জেলার ছাতিয়ান তলা নামক গ্রাম। তার পিতার নাম ছিল মরহুম ওয়ারেসুদ্দীন। তিনি ছিলেন সাধারণ একজন ধর্মপরায়ণ

মুসলমান। বাল্য কালেই মুনশী মেহের উল্লাহ্ তার বাবাকে হারান। তখন তিনি তার মাতার কাছ থেকে অর্ধাহারে ও অনাহারে বড় হন। পাঁচ বছর বয়সে তার মা তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে তার লেখাপড়া জীবন বিঘ্নিত হয়।[১]

মুনশী মেহের উল্লাহ্ সংসারের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তার মাতা দুই কন্যা ও এক সন্তান নিয়ে চারিদিকে অন্ধকার অনুভব করছিলেন। তখনকার দিনে মাদ্রসা মক্তব খুবই কম ছিল এবং গ্রামের মৌলভীর সংখ্যা ছিল নগন্য। ১৪ বছর বয়সে তিনি অভাবের তাড়নায় নিজ গৃহ ত্যাগ করে কয়লাখলী গ্রামে মৌলভী মোসহাব উদ্দীনের কাছে লেখা পড়া ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর ৩ বছর পর করচিয়রা গ্রামের মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের কাছে ৩ বছর আরবী, ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হাদিস কোরআন সমন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সুন্দরভাবে ফার্সী ভাষা পাঠ করতেন যা সাধারণ মানুষ শুনে মুগ্ধ হতেন। তাছাড়া পান্দ্রেনামা, শেখ সাদীর গুলিস্তা বুস্তা ও মনসুরে মোহাম্মদী নামক উর্দু পত্রিকা পাঠের ভিতর দিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।[২]

পেশাগত জীবনে তিনি প্রথমে যশোর জেলা বোর্ডের কেরাণী এবং পরবর্তীতে দর্জির পেশা অবলম্বন করেন। তাঁর ব্যবহারে শহরের এদিকে সুরুচী সম্পন্ন খরিদ্দার আকৃষ্ট হত লাগলো। অন্যদিকে এলাকার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা দোকানটিতে আসতেন এবং এটি একটি জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। এই সময় খৃষ্টান পাদ্রীরা এই দোকানে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নানা কুৎসা রটাতে থাকে। মুনশী মেহের উল্লাহ্ বুঝতে পারলেন যে খৃষ্টানদের তৎপরতা প্রতিরোধ করতে না পারলে সবাই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবে। এজন্য তিনি খৃষ্টান ধর্মের অগ্রসারতা ও ইসলাম ধর্মের সঠিকতা প্রমাণ ও প্রচারের জন্য চার প্রকারের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ধর্ম প্রচার করা মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করার মাধ্যমে গণ সচেতনতা গড়ে তোলা, মুসলিম সমাজের জনমত গঠন করার জন্য মুসলিম সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটানো এবং সমাজের কুসংস্কার দূর করতে ব্রতী হন।[৩]

মুসলমাদের মধ্যে বাংলাভাষার চর্চার প্রসার ঘটানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা মুনশী মেহের উল্লাহর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। বাংলা ভাষায় ধর্ম বিষয়ক বই লিখেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, বরং মাতৃভাষায় সর্বাঙ্গীন জ্ঞান চর্চার উপরও তিনি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলাভাষার প্রতি মুনশী মেহের উল্লাহর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে।[৪] এ সময় এক শ্রেণীর

মোল্লা মৌলভীদের কার্যকলাপের প্রতি তিনি কক্ষাট করে বলেন যে,

> মাতৃভাষা বাংলা লেখাপড়ার প্রতি তাহাদের এতই ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিনাম ফল কি সর্বনাশ তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। যে দেশের বায়ু, জন, অন্ন, ফল, মৎস্য, মাংস এবং দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাহারা যে বিদৃশ সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছেন, তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।[৫]

মুনশী মেহের উল্লাহ্ বাংলা ভাষার একজন সমঝদার হলেও মুসলমানদেরকে যুগের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বিদেশী ভাষা ইংরেজীর প্রতিও ছিল তার সমান শ্রদ্ধাবোধ। বিদেশী ভাষাকে অবহেলা করে দূরে ঠেলে রাখলে জাতির উন্নতির কোন আশা নাই একথা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি চারিদিকের প্রবল চাপ ও বিরোধিতা সত্বেও যুগোপযোগী করে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তুলবার জন্য নিজের প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন।[৬]

মাতৃভাষার প্রতি ছিল তার অপরিসীম শ্রদ্ধা। মাতৃভাষার প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন। তাঁর ভাষায়, যে দেশের প্রায় সব মানুষের মাতৃভাষা বাংলা সেই দেশের লোকের কাছ আরবী বা উর্দু ভাষায় মিলাদ পাঠ বা রাসুল (স:) জীবন কাহিনী বয়ান করলে তারা কি বুঝিবে? তাই তিনি বাংলা ভাষায় মিলাদ মহফিল বা রাসুল (স:) জীবন সম্পর্কে মানুষের সামনে বাংলায় উপস্থাপন করতেন। তার রচিত বাংলা ভাষায় *মেহেরুল ইসলাম* গ্রন্থখানী ওয়াজ ও মিলাদ মাহ্‌ফিলের জন্য খুবই যুগোপযোগী। তিনি তার গানের ছন্দে লিখেছিলেন,

ভাব মন দমে দম, রাহা দুর বেল কম
ভুখ বেশী অতি কম খানা
ছামনে দেখিতে পাই, পানি তোর তরে নাই
কিস্তরে পিপথ (ষোল আনা)।[৭]

উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ সংস্কারক ও সমাজ হিতৈষীদের মত মুনশী মেহের উল্লাহ্ মুসলমানদের উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপর তিনি কেন এত বেশি গুরুত্বারোপ করেন তা তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ এবং নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র

সাথে তুলনা করা চলে। শুধু তাদের সাথে মুনশী মেহেরুল্লাহ্ পার্থক্য ছিল এই যে, ব্যক্তিগতভাবে তার আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষা-দীক্ষা তাদের মত ছিল না। কিন্তু সমাজ দর্শন ও কর্মকান্ডের প্রকৃতি একই ধরনের ছিল। তিনি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৮] মাদ্রাসা স্থাপনের কারণ সম্পর্কে মাদ্রাসা তাঁর কর্মকান্ডকে কারামতিয়ার বিবরণী সম্বলিত সাময়িক পত্রে তিনি বলেন যে,

> যশোর জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুন, কিন্তু ১১৩ এর মধ্যে ৫ জন লোকও লেখাপড়া জানেন কিনা সন্দেহ, বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্মালোচনার অভাবে মুসলমানদিগের অবস্থা এতই নীচ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নীতি এবং ধর্ম সমন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। নীতিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ করিতে না পারে এমন পাপ কাজ নাই...তাই আমরা কতিপয় দীনহীন দরিদ্র মুসলমান একযোগে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত কৃষক সমাজ যাহাতে বিনা ব্যয়ে মহান বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্মালোচনা করিতে পারে, মাদ্রাসা কারামাতিয়াতে তাহার উৎকৃষ্ঠ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।[৯]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে,

> যে দেশের কৃষক শ্রেণী অশিক্ষিত ও নীতিহীন, সে দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই, তাহারা হিসাব কেতাব জানে না বলিয়া ধূর্ত ও দুষ্ট মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, বরকলাম, মালী এবং অত্যাচারী জমিদারগণ তাহাদের অতি পরিশ্রম জাত ধান্য, কলাই এবং পয়সা ইত্যাদি সমস্ত ফাঁকি দিয়াই লইয়া থাকে। তাহারা মূর্খতাবশতঃ কৃষি কাজেও উন্নতি করিতে পারে না। অধিকাংশ নরনারী সমস্ত দিবস ভূতের মত খাটিয়া রাত্রিতে যাইয়া উপবাস মুখে সন্তানাদিসহ অন্ন বলিয়া ক্রন্দন করে। তাহাদের সন্তানদিগকে কিছু শিক্ষা দিতে পারিলে তাহারা স্ব স্ব অবস্থায় অবশ্যই উন্নতি করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যেই উন্নতি করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই মাদ্রাসা ও নূরুল ইসলামের সূত্রপাত হইয়াছে।[১০]

মাদ্রাসা ছাড়াও পল্লী বাংলার অবহেলিত অঞ্চলে তিনি শিক্ষার আলো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে অনেক মক্তব স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এভাবে কর্মবীর মুনশী মেহের উল্লাহ্ বিভিন্ন প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে এই পিছিয়ে পড়া বাঙ্গালী মুসলমানদের শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তিনি বহু মুসলমান ছাত্রের শিক্ষা দান

করার জন্য আর্থিক, বৈষয়িক এবং নৈতিক সহায়তা দিয়েছিলেন। সে সময় বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই এসব কর্মকান্ড গ্রহণ করেছিল। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে নিজ গ্রাম ছাতিয়ানতলার পার্শ্ববর্তী মনোহরপুরে ছোট একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা না করে প্রথমেই মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ সে সময় পশ্চাদপদী গ্রামীন মুসলমান সমাজ তখনও পর্যন্ত বৈদিশিক তৎপরতার ব্যূহ বেধ করে বের হয়ে আসার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাঁর জীবদ্দশাতেই এই মক্তবটি চতুর্থ শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এটি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এই মক্তবটি মেহেরুল্লাহ্ একাডেমী নামে ঝাউদিয়া গ্রামে অবস্থিত।

চুড়ামনকাঠি এই প্রতিষ্ঠানটি জুনিয়র হাইস্কুলে পরিণত হয়। কিন্তু মনোহরপুর স্কুল কর্তৃপক্ষ দাবী করেন যে, এই প্রতিষ্ঠানে একটি অংশ ঝাঁউদিয়া বাজারে স্থানান্তরিত করা হোক। এই সময় এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। শেষ পর্যন্ত নানা বিতর্কের মধ্যে এখানে স্থানান্তর করা হয় ও নাম রাখা হয় মুনশী মেহের উল্লাহ্ একাডেমী।[১২]

তাছাড়া তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন অংশে অনেক মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে শিক্ষা বিস্তারে মুনশী মেহের উল্লাহ ছিল স্যার সৈয়দ আহমেদের মত। শিক্ষা বিস্তার বিশেষ করে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে মোল্লারা যে ফতোয়া জারী করেন তা তিনি রোধ করে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে ব্রতী হন।[১৩]

১৮৭৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর এখানে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। সামরিক বিজয়লাভের পর বৃটিশ সরকার মুসলমানদেরকে শত্রুরূপে চিহ্নিত করে এবং নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন আলোচনাকে দমন করতে থাকে। তাছাড়া সুচতুর ইংরেজ শাসকেরা অভিনব পন্থায় উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে থাকে। সম্প্রদায়গত শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভের মানসে হিন্দু সমাজের একাংশ এবং এক শ্রেণীর অর্থলোভী মুসলমান ইংরেজদের মোসাহেবী করা শুরু করে। মুসলমানরা কোন প্রকার সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে ইংরেজী তথা আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করার পরও মুসলমানেরা অসহযোগিতা করছিল।[১৪]

মুনশী মেহেরুল্লাহ্ তৎকালীন বাংলার সকল ধর্ম ও সমাজের কুসংস্কার অন্ধত্ব ও গোড়ামীর বিরুদ্ধে ক্ষুরধার কলম চালনা করেন। মুনশী মেহের উল্লাহ কেবল খৃষ্টান, পাদ্রী, হিন্দু ব্রাহ্মণ ও তাদের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, বরং মুসলমান মোল্লা

মৌলভীসহ মুসলিম সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি সকল কুসংস্কার ও গোড়ামির বিরুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রচার চালান। তিনি হিন্দু বিধবাদের দুঃখ, গঞ্জনা, বিড়ম্বনার বিপক্ষে এবং দুর্দশাগ্রস্থদের পুনঃবিবাহের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর এসব যুক্তির সমাহার ঘটেছে 'বিধবা গঞ্জনা' নামক কাব্যের মধ্যে। এই কাব্য প্রকাশিত হবার পর তাঁকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লালনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও তার মতাদর্শের পক্ষের অবস্থানে ছিলেন তৎকালীন মহৎপ্রাণ হিন্দু ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।[১৫]

মুনশী মেহের উল্লাহ ইসলাম ধর্মের পক্ষ নিয়ে খৃষ্ট ও হিন্দু ধর্মের গোড়ামি ও আধিপত্যবাদের বিপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিলেও তিনি আদৌ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি কোন সময় সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টিতে উসকানি দেননি বা নেতৃত্ব দেননি। মূলতঃ মুনশী মেহের উল্লাহ বিশাল উদার ও মুক্ত মনের যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলমান এবং ইসলামী চিন্তাবিদ। এজন্য একস্থানে তিনি লিখেছেন "গাওরে মুসলীমগণ নবীগুণ গাওরে পরাণ ভরিয়া সবে সাল্লেআলা গাওরে।[১৬]

মুনশী মেহের উল্লাহ ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোড়ামীকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। এজন্য জীবদ্দশায় তিনি একটি তালাকও করিয়েছেন এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ, বিবাদ-বিসম্বাদ নিরসন করে বহু পতনোম্মুখ সংসারকে তিনি রক্ষা করেছেন। তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের মত যুগ প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে ধর্মান্ধ গোড়া মোল্লা মৌলভী, ব্রাহ্মণ, পাদ্রীদের বিরুদ্ধে একইভাবে ভূমিকা নেন। কেউ তাঁর যৌক্তিক আক্রমণের সুতীক্ষ্ণ কষাঘাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। কেউ কেউ তাকে ধর্মান্ধ মোল্লা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান কিন্তু তা ঠিক নয়।[১৭]

কবি হিসেবে মুনশী মেহের উল্লাহ ইংরেজ কবি কীটস ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবশিষ্য ছিলেন। কীট্‌স যেমন লিখেছেন, 'Time is short but art is long' অর্থাৎ সময় কম কাজ বেশি। একইভাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, "দিনের আলোর যার ফুরালো সন্ধ্যের আলো জ্বললো না সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়"

অথবা,

"আমার বেলা যে যায়
শেষ বেলাতে---

মুনশী মেহের উল্লাহ একইভাবে লিখেছেন যে,

"ভাব মন দমে দম
রাজা দূর বেলা কম।

এই উক্তির ভাব, ভাষা, কাব্য ও সাহিত্য মূল্য কোন অংশে কম নয়। এই দর্শনই তাঁর ধর্মভীরুতাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল এবং তাঁর আত্মিক চেতনাবোধ মানবতাবোধকে বিকাশ লাভ করতে সহায়তা করে। এর মধ্যে দিয়ে তাঁর অসীম উদ্যম ও ইচ্ছাশক্তি পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই স্বত্বা তাঁকে মহান কর্মবীরে পরিণত করে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ এবং মুনশী মেহের উল্লাহ্ কে কাকে প্রভাবিত করেছিলেন তা বলা মুশকিল। কেননা তারা উভয়ে ছিলেন সমকালীন।[১৮]

মুনশী মেহেরল্লাউহ মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা, স্ত্রী শিক্ষাসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য বায়তুল মাল তহবিল গঠন, স্বদেশী শিল্প গ্রহণ এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি যে কয়দিন বেঁচে ছিলেন তা জনগণের কল্যাণের জন্য তার জীবনটাকে সারা জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন (প্রফেসর শরীফ হোসেন)। মুনশী মেহেরউল্লাহ্ অন্তর্জলি যাত্রা, গঙ্গাগর্ভে সন্তান নিক্ষেপ, নরবলি, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম থেকেই সমালোচনামূলক লেখনী প্রকাশ করেন। তিনি এগুলো রহিত করণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিভিন্ন 'কর্মের' জন্য তাঁকে কর্মবীর খেতাব দেওয়া হয়। তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজকে কি ভাবে কল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তা উদ্ভাবন করা। সংক্ষেপে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক।[১৯]

সমজসংস্কারের ক্ষেত্রে মুনশী মেহরল্লাউহ কয়েকটি পদ্ধতি করেন। এগুলি হলোঃ বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি ও বক্তৃতা করা এবং পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচনা করা এবং খৃষ্টান ধর্মের অযৌক্তিক বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে ইসলামী মূল্যবোধকে সমুন্নত করা।[২০]

শিক্ষার সাথে সাথে কর্মবীর মুনশী মেহেরউল্লাহ্ সংবাদ পত্রের উন্নতির জন্য ও নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মনে সংবাদপত্র হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধন এবং মুসলিম সমাজের জন্য 'মিহির' 'সুধাকর' ও 'ইসলাম' প্রভৃতি পত্রিকা প্রচারের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। মুনশী মেহেরউল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যেসব বাঙ্গালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন তাদের মধ্যে সৈয়দ ইসলাইল হোসেন সিরাজী, কবি শেখ হাবিবুর রহমান, সাহিত্যরত্ন অন্যতম। মুনশী মেহেরউল্লাহ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর *অনল প্রবাহ* ও শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদদের তহবিল থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন তার সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন স্থানের মন্তব্য প্রসঙ্গে মুনশী মেহেরউল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহের কথা বারবার কতৃজ্ঞতার সাথে স্মরণ

করেছেন। তৎকালীন ঐ সমস্ত তরুণ লেখক মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য।[২১]

মুসলিম বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কয়জন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল তার মধ্যে কর্মবীর মুনশী মেহেরউল্লাহ ছিলেন অন্যতম। তিনি জাতির এক দুর্দিন মূহুর্তে ভারতবর্ষে উদয় হয়েছিলেন। মুনশী মেহেরউল্লাহ ছিলেন একজন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তার কর্মপরিধি ছিল ব্যাপ্ত, তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক। তাছাড়া তিনি সাংবাদিকতার দিক দিয়েও পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি বাংলার মুসলমানদের বিপর্যয় রোধ করতে সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের নীতি অনুসরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি এক দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দারিদ্রের স্বাথে কঠোর সংগ্রাম করে যে অবদান রেখে গেছেন তা যশোরবাসী তথা বাংলার মুসলমান সমাজ স্বর্ণাক্ষরে স্মরণ করেছে।[২২]

সংক্ষেপে মুনশী মেহের উল্লাহ্ উনবিংশ শতকে বাংলার মুসলিম পূনর্জাগরণের অন্যতম প্রতিকীর্তি ছিলেন। তাঁকে সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আঃ লতিফ, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং আলীগড় আন্দোলনের নায়ক স্যার সৈয়দ আহম্মেদ খানের সাথে তুলনা করা হলেও অতিশয়োক্তি হবে না। মুনশী মেহেরউল্লাহ তৎকালীন বাঙালী সমাজকে আধুনিকতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন, এজন্যই তাঁকে যথাযথভাবে কর্মবীর আখ্যা দেওয়া হয়।[২৩]

**সূত্র-নির্দেশ ঃ**

১) মসিউল আযম, *শিক্ষা বিস্তারে মুনশী মেহের উল্লাহ,* মুনশী মেহের উল্লাহ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, স্মরণিকা, শতবার্ষিকী উৎসব, ১৯৯৯, ঝাউদিয়া যশোর, পৃ. ৬৪।

২) এ. এস. এম. সাখাওয়াত হোসেন, *মুনশী মেহের উল্লাহ,* মুনশী মেহের উল্লাহ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত স্বরণিকা, শতবার্ষিকী উৎসব, ১৯৯৯, ঝাউদিয়া যশোর, পৃ. ৩৫।

৩) এ. এস. এম. সাখাওয়াত হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।

৪) হুমায়ুন আব্দুল হাই, *মুনশী মেহের উল্লাহ ও কর্ম সম্পাদন,* আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৫) মসিউল আযম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৬) ঐ, পৃ. ৩৫।

৭) খন্দকার আব্দুল মোমেন (সম্পাদিত) "প্রেক্ষন", মুনশী মেহের উল্লাহ স্বরণীকা, ১৯৯৬।

৮) মুহাম্মদ আবু তালিব, *মুনশী মেহের উল্লাহর 'দেশ কাল সমাজ',* ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ১৮।

৯) আব্দুল জব্বার, *মুনশী মেহের উল্লাহ কর্ম ও জীবন*, মুনশী মেহেরউল্লাহ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত স্বরণীকা, ১৯৯৯, পৃ. (৬০-৬১)।

১০) হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ. (৬৫-৬৬)।

১১) হাসান আব্দুল কাইয়ুম, 'অগ্রপথিক', ৪র্থ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

১২) আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, লেখন সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪ পৃ. ৭৭।

১৩) ওয়াকিল আহম্মদ, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক প্রত্রিকা*, জুন ১৯৯৪ পৃ. (২৯-৩০)।

১৪) *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

১৫) ঐ, ২৪শে জৈষ্ঠ, ১৪০১।

১৬) 'পান্দেনামা', (অনুবাদ ২য় সংস্করণ ৫ই জুলাই, ১৯০৮)।

১৭) আব্দুল জব্বার, প্রাগুক্ত, পৃ. (৬২-৬৩)।

১৮) 'পান্দেনামা', (অনুবাদ ২য় সংস্করণ ৫ই জুলাই, ১৯০৮)।

১৯) *দৈনিক দেশ*, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

২০) শেখ মুহাম্মদ জমীর উদ্দীন, (সম্পাদনায় নাসির হেলাল), *মুনশী মেহেরউল্লাহর জীবনী*, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, (৪০৫-১০৬)।

২১) *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

২২) মসিউল আযম, প্রাগুক্ত, ৬৪।

২৩) আব্দুল জব্বার, পৃ. ৬২-৬৩।

# "ভারত-পাক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপায়ণের সম্ভাবনা ঃ সাম্প্রতিক সফরের অভিজ্ঞতার ফসল"

নূপুর দাশগুপ্ত

জন্মলগ্ন থেকে বিরোধিতার সম্পর্কে বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তান এমন এক ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যেখানে বিরোধিতা দুইয়ের পক্ষেই ক্ষতিকার এবং সমঝোতা তৈরী করতে পারে আন্তর্জাতিক স্তরে দক্ষিণ এশীয় শক্তিসমূহের মজবুত সোপান।

একথাই আমার মনে হয়েছিল সাম্প্রতিক কালে লাহোরের আল্লামা ইকবাল বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে। পাকিস্তান পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি আমাদের দলের সদস্যদের হাসিমুখে আহ্বান জানালো তাঁদের দেশের মাটিতে।

বিগত আটান্ন বছরের পরস্পর বিরোধী কার্যাবলী ও মনোভাবের ইতিহাস প্রত্যেক ভারতীয় ও পাকিস্তানীর জ্ঞাত। সংবাদ মাধ্যমে হেডলাইনের বিষয়। কিন্তু গত ৩-৪ বছর ধরে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম। ১৯৯৯ এর লাহোরে চুক্তির ভাঙন ও তার পর পরই কার্গিল যুদ্ধের ঘটনা পাক প্রেসিডেন্ট মুশারফের পক্ষে পাকিস্তানের অভ্যান্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে লাভজনক হত যদি না ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের জমিতে অপ্রতিহত সন্ত্রাসবাদ এক গুরুতর আন্তর্জাতিক আকার ধারণ করত এবং তার ফলে ২০০১ এর ভয়ঙ্কর নাইন ইলেভেন এর বিস্ফোরণ পশ্চিমী দুনিয়ার ভিত নড়িয়ে দিত। এর ফলবশত বিশ্বের আঙিনায় পাক নেতৃবৃন্দ এক সংকটপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হলেন। পাকিস্তান পুষ্ট সন্ত্রাসবাদ এবার আর একান্তভাবে ভারতবাসীর মাথা ব্যাথা রইল না। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলিরও চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল।

অন্যদিকে কার্গিল যুদ্ধের ভারত-পাক বিরোধের চরম যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি দুই দেশের পক্ষেই ধরে রাখা কঠিন এবং বিপজ্জনক। সুতরাং পরিস্থিতি এখন ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রকেই ভিন্নতর পন্থায় সমঝোতার পথে চলতে নির্দেশ করছে।

আজকের এই একবিংশ শতকের বিশ্বায়নের পটভূমিতে কোন যুদ্ধই শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ভারত-পাক সম্পর্কের বিষয়টি তো

সেখানে অবশ্যম্ভাবী রূপেই গোটা বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পেশাদারী রাজনীতির জগৎ থেকে শুরু করে গবেষক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক - এমন কি সাধারণ মানুষের কাছেও - অন্তত দক্ষিণ এশিয়ায় বিষয়টি বহু বিতর্কিত, আলোচিত।

এর সাথে বিগত বছর দশেকে বিষয়টি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে দুই কারণে দুটিই আমাদের সমকালীন সময়ের কেন্দ্রীয় ঘটনা - এক, বিশ্বায়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদের বিপুল উত্থান। এ দুই ঘটনার মাঝে দোলায়মান দক্ষিণ এশিয়াবাসীর সামনে প্রশ্ন একটাই - অস্তিত্ব ও আত্মপরিচিতির শিকড় নতুন পরিস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে প্রেথিত করতে হবে।

সম্প্রতি পাকিস্তান সফরকালীন অনুভব করা গেছে একটাই সত্য - ভারত-পাক বিরোধিতার থেকেও যে প্রশ্ন আজ সাধারণ পাকিস্তানবাসীর কাছে মুল তা অস্তিত্বের প্রশ্ন। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পাক জনগণের সাংগঠনিক ভূমিকার অনুপস্থিতি ইতিহাসের প্রাণিধান যোগ্য বিষয়। লরেন্স জাইরিং তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের দুর্বলতার দিকগুলি আলোচনা করেছেন।[১] সন্ত্রাসবাদের উত্থান পাকিস্তানে কেন এর জোরদার সে কথা বলতে গিয়ে জাইরিং লিখছেন যে বিশ্বের যে সমস্ত দেশ রাষ্ট্রগঠন এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানেই প্রজাতন্ত্রের বিকাশ বিঘ্নিত হয়েছে। পাকিস্তানের জন্মলগ্নই রাষ্ট্রের সংগঠনের প্রধান কারণ রূপে নির্ধারিত হয়েছে ইসলাম। তার থেকেও যে ব্যাপারটি বেশী লক্ষণীয় তা হল পাকিস্তানে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের গুণাগুণ সম্পর্কে গণ আলোচনার বিশেষ অভাব। সাধারণ বুদ্ধিজীবি স্তরে সে ধরনের বিতর্ক বা আলোচনা প্রজাতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করতে পারতো - তা ঘটেনি। জাইরিং লিখছেন যে এমন কোন সংস্থা বা বুদ্ধিজীবি মহল পাকিস্তানে গড়ে ওঠে নি যা রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্র সংগঠনের উদ্দেশ্য, ও পন্থা সম্বন্ধে চর্চা করে।[২] গবেষকগণ আলোচনায় বিরত থেকেছেন এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এ ধরনের আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক অস্বাভাবিক রাজনৈতিক শুণ্যতা। কিন্তু পাক জনসাধারণের মনে বারংবার রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে নেতৃবর্গের প্রতি অবিশ্বাস ও রাষ্ট্রের সাংগঠনিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের দুর্লভ্তাজনিত জন্ম নিয়েছে অনীহা এবং অন্যদিকে এক ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদ। দ্বিতীয়টিকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদও স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইদানীং এই মনস্কতায় এক তৃতীয় উপাদান কাজ করছে - বিশ্বায়নের ফলে অবারিত আন্তর্জাতিক তথ্যসরবরাহের দরুণ পাক জনগণের সামনে আজ বিশ্ব হাতছানি

দিচ্ছে। শুধু পশ্চিম দুনিয়া নয়, এখন পাশের এশীয় দেশগুলির উন্নততর জীবনযাত্রার ছবি নিত্যদিন চোখের সামনে দৃশ্যমান।

অন্যদিকে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। পাকিস্তানের বিশেষ পরিবেশে পুষ্ট সন্ত্রাসবাদ আজ খোদ পাকবাসীর পক্ষেই হয়ে উঠেছে মারাত্মক। ২০০১ এর নাইন ইলেভেনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর এবং প্রায় অসমর্থন যোগ্য প্রতিহিংসার ফলে শুধু আফগানিস্তান নয় - পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থান এখন বিপর্যস্ত। আন্তর্জাতিক স্তরে ব্রিটেন ও আমেরিকার যে সহযোগিতার হাত প্রসারিত ছিল তা এখন গোটানো, শুধু তাই নয় সাম্প্রতিক সফর কালে দেখলাম এক নতুন পরিস্থিতি। পাক পর্যটন বিভাগের সাধারণ কর্মীদের কাছে শোনা গেল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে ব্যবসায়িক দিক থেকে পর্যটন কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান থেকে দলে দলে যে পর্যটকগণ মহেঞ্জোদড়ো ও তক্ষশীলা দর্শনে বা কে ২ অঞ্চলে ভ্রমণে আসতেন তা বন্ধ হয়ে গেছে গত ৩ বছরে। পর্যটন বিভাগ আয়োজিত একটি ভোজে আমন্ত্রিত হওয়ায় পরিচয় হল বহু উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণের সাথে। আলাপ আলোচনায় বুঝতে পারা যায় সন্ত্রাসবাদ এখন তাঁদের কাছে দুঃস্বপ্ন প্রায় — তা সে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সিন্ধু বা বালুচ আন্দোলনকারী দ্বারাই অনুষ্ঠিত হোক অথবা পাক ও আফগান সন্ত্রাসবাদীদের বহির্মুখী কার্যকলাপই হোক। শুধু তাই নয় পারস্পরিক খোলামেলা কথাবার্তায় স্পষ্ট হয় সাধারণ মানুষের মনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গুরুতর প্রয়োজনীয়তা এখন অনেক বেশি আলোচনার বিষয়। কাশ্মীর বা ভারত-পাক বিরোধ এখন পিছনের সারিতে। পশ্চিমী দুনিয়ার বিরোধী মুখ এখন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্তরেই দৃশ্যমান নয় - সাধারণ মানুষের নিত্য অনুভূত।

পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি শুধু নয় গোটা রাজনীতিই বহুদিন ধরেই এবং বহুলাংশেই মার্কিন বৈদিশিক নীতি দ্বারা চরিত্রায়িত। স্টিফেন কোনে পাক-মার্কিন সম্পর্ক সম্বন্ধে ডেনিস কাক্স এর 'দ্য ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ এন্ড পাকিস্তান ঃ ডিসএনচ্যান্টেড এ্যালাইস' গ্রন্থে আলোচনার দিকে নির্দেশ করেছেন।[৩] গোড়ায় মার্কিন রাষ্ট্রের পরম মিত্র "the most allied" of American allies - রূপে অবস্থান থেকে ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনকালে পাকিস্তানের ভূমিকা নির্ধারিত ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের দাঁড়িপাল্লার ওঠানামা দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জোরদার উপস্থিতি ও চায়নার রাজনৈতিক ভূমিকা ফাঁস করেছিল। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি অনুযায়ী ওঠানামা করেছে সম্পর্কের গভীরতা। তবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা সর্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক কর্মসূচী চিরকালই থেকে গেছে। তৎক্ষণাৎ - উঠে - আসা

মার্কিন বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্যের আড়ালে। ২০০০ সালেও ক্লিনটন সরকারের কাছে পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত দিকগুলি ও তালিবান বিন লাদেন সমঝোতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে যে লাগেনি তা আজ পাক সাধারণ জনগণ বুঝতে শুরু করেছেন।[৪] কোহেন লিখছেন - " During the last two years of Clinton's final term and in the first year of the new Bush administration, Pakistan was more or less ignored in favor of the emerging India, and the prevailing American view of Pakistan, when it was thought of at all, was that it was an irritation."[৫]

নাইন - ইলেভেন সেই অবজ্ঞা সূচক অবহেলার জায়গা থেকে পাকিস্তানকে এক নতুন অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এখন পাকিস্তান বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের জন্মদায়ক রাষ্ট্র" রূপে গণ্য এবং "The rogue nation" বলে অভিহিত। পশ্চিমী দেশগুলির জনমতে ও রাজনৈতিক মহলে পাকিস্তান সম্পর্কে এই অভিমত দৃঢ় আকার ধারণ করছে।[৬] এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার মুখে পাক অর্থনীতি ও বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে পাক রাষ্ট্রের অবস্থান! পাক - মার্কিন সম্পর্কে সম্বন্ধে কোহেন-এর সহৃদয় ও গভীর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার পরেও কিন্তু এক ধরণের মুরুব্বিয়ানার সুর শোনা যায় - যা পশ্চিমী উন্নত রাষ্ট্রগুলি সামগ্রিক ভাবে এশীয় ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলির প্রতি আজও পোষণ করে। কোহেন আলোচনা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে পুনরায় পাকিস্তানের জন্য ইতিবাচক কার্যসূচী গ্রহণ করতে পারে যার দরুণ পাকিস্তানকে একটি মোটামুটিভাবে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে তার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। এই সমগ্র কার্যসূচীই যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধায়নেই একমাত্র সম্ভব - " With America again assuming the role of Pakistan's chief external supporter, there is an opportunity to correct old mistakes. Getting the new relationship right might just bring Pakistan into the category of stable and relatively free status."[৭]

পাকিস্তানের ভাগ্যে ইরাকের অবস্থায় পৌঁছনোর সূচনা রয়েছে এই বক্তব্যে। এই ধরনের মনোভাব কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে এখন ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে। সফরকালীন শুনতে পাওয়া গেছে পশ্চিমী মুরুব্বিয়ানার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রুদ্ধ মন্তব্য। এই বিদ্বেষ এখন শুরু মৌলবাদী ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক নেতৃস্তরে আবদ্ধ নেই। এখন এক অভূতপূর্ব মনোভাব জন্ম নিচ্ছে সচেতন পাকবাসীর মধ্যে

এশিয়া মুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। একথাও সত্য যে দক্ষিণ এশীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তথা মুশারফ সরকার এখন বিশ্বরাজনীতিতে এশীয় শক্তির সম্মিলিত উপস্থিতির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। প্রশ্নটা বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকার। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের পক্ষে সবথেকে প্রয়োজনীয় কি? কোহেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের প্রয়াসের যে কথা বলেছেন তা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু এই মূহুর্তে পাকিস্তানের প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি সাধন। ১৯৮০'র দশকের শেষ থেকে ১৯৯০ এর দশকে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভরাডুবি, দুর্নীতিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা, মৌলবাদের চরম বিকাশ ও মানবাধিকার বিরোধী পরিস্থিতির উদ্ভব দেশটিকে আজকের সংকটে নিয়ে এসেছে।[৮] কিন্তু আরও বড় প্রয়োজন বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করা। এই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্যই মুশারফ সরকার একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কর্মসূচী বা আরও বেশি যা সত্যি - বিশ্বরাজনীতির এককেন্দ্রিকতার সুযোগে কর্তাসুলভ আচরণের কাছে মাথা নীচু করছে - অন্যদিকে ভারতের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছে।

তবে অনেকগুলি ব্যাপার এখানে জড়িত। দুইদেশের বুদ্ধিজীবি, সরকারী নীতি প্রণয়ন কারী আধিকারিক বর্গের মধ্যে এ বিষয়ে নানা ধরণের ব্যক্ত অভিমত থেকে এ কথা স্পষ্ট যে আজকে দুই রাষ্ট্রের স্থির নিশ্চিত যে সামরিক মোকাবিলা আন্তরাষ্ট্র সম্পর্কের টানাপোড়েনের নিষ্পত্তি করতে পারবে না। অন্যদিকে ভারতের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের আলাপ আলোচনায় বসতে গেলে দুই দেশেরই প্রয়োজন বাস্তব সম্মত, নির্দিষ্ট কিছু সম্ভাবনাময় কর্মসূচীতে। যুগ্ম অংশগ্রহণের কথা মাথায় রেখে এগোতে হবে। এর মধ্যে সর্বজন মতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুরু হয়েছে দিল্লী - লাহোর বাস চলাচল। শ্রীনগর - মুজাফফরাবাদ বাস চলাচল অবশ্য বহু বাধার সম্মুখীন। কিন্তু এই সমস্ত বাঁধা - যা এক বৃহত্তর সমস্যার প্রতীক - তা বারংবার উপর্যুপরী আলাপ আলোচনা ও দুই দেশের বাস্তবসম্মত ভাবে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার অকৃত্রিম প্রয়াসের উপর নির্ভর করছে।

বুদ্ধিজীবি স্তরে আলাপ - আলোচনা এক বিশেষ সেতু নির্মাণে লাগতে পারে। এ ব্যাপারে অতি সম্প্রতি দুই দেশেরই বেত্তা মহল এগিয়ে এসেছেন।

ইসলামাবাদের ইনস্টিটিউট অফ রিজিওনাল স্টাডিস এবং দিল্লীর ইনস্টিটিউট অফ পীস এণ্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিস এর ইদানীং প্রকাশিত কিছু লেখা ও বক্তৃতার বিবৃতিতে ভারত - পাক মৈত্রী স্থাপনের সম্ভবনাময় কিছু বিষয়ের উপস্থাপনা লক্ষণীয়।

ইনস্টিটিউট অফ রিজিওনাল স্টাডিস প্রকাশিত ২০05 এর জার্নালের একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ তুলে ধরি। মেজর জেনারেল জামশেদ আয়াজ খান লিখছেন যে পারমাণবিক শক্তিসংঘে পাকিস্তান ও ভারতের প্রবেশাধিকার এখন অনস্বীকার্য।[৯] যদিও এ ধরনের চিন্তাভাবনা শান্তি স্থাপনে সহায়ক নয়। তবু পরোক্ষভাবে এই বক্তব্য পারমাণবিক শক্তির ভারসাম্য বজায়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বোঝাপড়ার একটি সূত্র লুকিয়ে রয়েছে। এখানে স্বপ্ন দেখার কোন সম্ভাবনা নেই এবং ঘটনার গতি পাল্টানোরও কোন পথ নেই। তবে রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত - পাক শক্তির ভারসাম্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

তবে এর থেকে অনেক বেশি ইতিবাচক প্রেক্ষিত ভারত - পাক যুগ্ম অর্থনৈতিক প্রকল্পের দিকে ইঙ্গিত করে। এখানে বিশ্বায়নের যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থানের কথা একটু ভাবা যাক। সমকালীন পরিস্থিতিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিকল্পনায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশগুলির মধ্যে প্রযুক্তির আদান প্রদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তাতে পাকিস্তানকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে সামিল করতে হবে। খ্যাত অর্থনীতিবিদ গুরুচরণ দাসের সম্প্রতি প্রকাশিত 'দ্য এলিফ্যান্ট প্যারাডাইস' গ্রন্থটিতে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়। গুরুচরণ দাস লিখছেন - " Ignore Pakistan, Heed China" পাকিস্তানকে অগ্রাহ্য করে চায়নার নীতি লক্ষ্য করে এগিয়ে যাওয়ার এই মত সমর্থনযোগ্য শুধু এক ক্ষেত্রে ভারতের বৈদেশিক নীতি ও বাজেট যুদ্ধ বাবদ অতিরিক্ত মোটা অঙ্ক ধার্য কারার প্রবণতা পাল্টানোর সময় এসেছে। গুরুচরণ দাস এর মতে চায়নায় যেভাবে শহর ও গ্রামীণ স্তরে শিল্প উদ্যোগের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং গ্রামোন্নয়ন ও কৃষিব্যবস্থার তৃণমূল সংস্কার ঘটেছে সার্বিক উন্নয়নের অঙ্গরূপে তা ভারতের অনুসরণীয়।[১০] একথা এবশ্য স্বীকার্য। তবে একট কথা এখানে ভুললে চলবে না যে বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য পটভূমিতে উন্নয়নের অঙ্ক একটু অন্যরকম। এখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। উন্নয়ণের পরিকল্পনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অবস্থান, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের দাঁড়িপাল্লা কিভাবে ন্যস্ত, অন্তরাষ্ট্রীয় বাজারের অবস্থা ও তার নিরবচ্ছিন্ন বর্ধনশীলতা ইত্যাদি মূল সম্পদানকারী গুণক। সে ক্ষেত্রে আবার ফিরে আসতে হবে ভারত - পাক সমঝোতার আলোচনায়। প্রশ্ন ওঠে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক স্তরে অগ্রগতি ছাড়া একক ভাবে ভারতের উন্নয়ন স্থায়ী হবে কি না।

অথবা, আন্তর্জাতিক বাজার ছাড়া ভারতের বাণিজ্য এগোবে কি না এবং সেই বাজার কি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে পাওয়া যাবে? না কি এশীয় দেশগুলিতে তার সম্ভাবনা বেশি এবং অধিক লাভজনক?

এ কথা অনস্বীকার্য যে পাকিস্তানের উন্নয়ন পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তবে পরিস্থিতি পাকিস্তানকে দ্বীপে অন্তরীণ থাকতে দেবে না। পাক জনসাধারণের জীবনে বিশ্বায়ন প্রভাব বিস্তার করেছে। একদিকে সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের গতি আপাত ভাবে অপ্রতিহত হলেও অন্যদিকে সাধারণের মনে অস্থিরতা লক্ষ্য করার মত। সরকারী মহলেও সেই অস্থিরতা প্রসারিত। যে জনমত থেকে পাক রাজনীতি চিরদিন দূরে সরে ছিল আজ তা সংস্কার সাধন ও সন্ত্রাসবাদ দমনে কাজে লাগতে পারে। প্রেসিডেন্ট মুশারফের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিবৃতিগুলিতে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। লরেন্স জাইরিং লিখছেন যে আজ কেবলমাত্র মুশারফ নন, পাকিস্তানের শিক্ষিত, পরিশীলিত মানুষ স্বীকার করছেন যে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে তার পথ বেছে নিতে হবে এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ চরিত্র কি হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে। প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের আড়ালে। বেছে নিতে হবে হয় সেনা পরিচালিত, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি নয়তো বা সেনা নিয়ন্ত্রিত পুরোহিত তন্ত্র।[১১] এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট মুশারফ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর দ্রুত রূপরেখার মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। পাকিস্তানের সাধারণ জনগণও মানসিক ভাবে প্রস্তুত এবং অপেক্ষমান। জাইরিং লিখছেন - "Pakistanis have by and large risen to the present day challenge and have demonstratd genuine resistance to the forces of chaos."[১২]

সফরকালীন আলাপ আলোচনায় দেখেছি শুধু শহরের শিক্ষিত পদাধিকারী নন, মফস্বলের সাধারণ মানুষও প্রগতির কথা ভাবছেন — নারী শিক্ষার কথা আলোচনা করেন, ভারতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পথ অনুসরণ করতে চান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকাশ চান।

ইনস্টিটিউট অফ রিজিওনাল স্টাডিস্ এর ২০০৫ এর জার্নালে অপর একটি প্রবন্ধে মুহম্মদ রমজান আলি আঞ্চলিক স্তরে অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা আলোচনা করেছেন - বিশেষ করে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি খতিয়ে দেখেছেন।[১৩] দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক প্রগতি ও শক্তি স্থাপনে নির্দিষ্ট যুগ্ম প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট। সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ২০০৪ এ নিউইয়র্কে এবং নভেম্বর ২০০৪

এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত) ভারত - পাক বৈঠকে আলোচিত ইরান - ভারত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সমঝোতার হাত শক্ত করবে এবং এ সম্পর্কে ভারতের দ্বিধা দুর হলে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সমৃদ্ধি ঘটবে — " The dream of regional prosperity can gain a new boost once these pipeline projects are materialized."[১৪] আঞ্চলিক জোট বাঁধার সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে রমজান আলি ইউরোপীয়ণ ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

এ ধরনের ভারত - পাক যুগ্ম প্রকল্প আজও সম্ভব তবে তার জন্য পাকিস্তানকেও প্রস্তুত হতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ও শক্ত হাতে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে হবে। ১৯৯৬ সালেই ভারত পাকিস্তানকে " Most Favoured Nation" - সবথেকে অনুমোদিত রাষ্ট্রের মর্যদা দিয়েছে। উল্টোটি আজও ঘটে ওঠে নি। তবে ভারত - পাক বাণিজ্যিক বিনিময় ২০০২ -০৩ সাল থেকে ২০০৩ -০৪ সালে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ বছরে পাকিস্তানে ভারতের রপ্তানী দাঁড়িয়েছে ভারতের সমগ্র রপ্তানীর প্রায় ০ ৪৪ শতাংশ। পাকিস্তানের মত স্বল্প উন্নত বাজারে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ্য।[১৫]

যুগ্ম অর্থনৈতিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদন বা পেট্রোলিয়াম বিনিময় ছাড়াও আরও নতুন সম্ভাবনার কথা ভাবা যায়। তারই একটি পর্যটন। সাম্প্রতিক সফরকালে এ ধরনের চিন্তাভাবনার আভাস পাওয়া গেল পাকিস্তানের পর্যটনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে থেকে।

পর্যটন ইদানীং কালের এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ রূপে বিশ্ব অর্থনীতিতে গণ্য। দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষত ভারত - পাক সীমান্ত ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা ধরণের পর্যটন প্রকল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের যুগ্ম প্রয়াস পর্যটনের ক্ষেত্রে উত্তরের পর্বতমালায় বিপুল প্রাকৃতিক পরিবেশের ভান্ডার। সাংস্কৃতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যমন্ডিত পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের গুজরাট, রাজস্থান থেকে পাকিস্তানের মুলতান থাট্টায় ছড়িয়ে আছে দুর্লভ প্রত্নক্ষেত্র, ঐতিহাসিক স্মারক বিশিষ্ট পর্যটনযোগ্য স্থল। যৌথভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য সমৃদ্ধ নিদর্শন স্থল বিশ্বের পর্যটন বাজারে বাণিজ্যিক তাৎপর্যে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ধরনের প্রকল্প সংঘটনের আগে প্রয়োজন শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন। পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তনের সম্ভবনা সম্পর্কে আস্থা বিজ্ঞপিত হলে অনেক ক্ষেত্রেই হতাশ জনিত সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা যেতে

পারে। আশার কথা এই যে আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চারিত না হলেও - এ ধরণের যৌথ প্রয়াসের ভবিষ্যৎ রূপায়ণ সম্বন্ধে মনোভাব ব্যক্ত করা তাৎপর্যপূর্ণ। এর পিছনে পাকিস্তানের সাধারণ আমলা স্তরে বিশ্বায়ণের পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা কাজ করছে বলে বোঝা যায়। উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে মহেঞ্জোদড়োয় স্থানীয় অধস্তন পর্যটন কর্মীর সাথে খোলামেলা আলোচনায় একটা সুর ধরতে পারা যায়, তারা নতুন পরিস্থিতিতে মার্কিনী তথা পশ্চিমী সাহায্যের আস্থা হারিয়েছেন এবং উপলব্ধি করছেন স্বনির্ভরতার একান্ত প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় জোট সম্পর্কে তাঁদের মনে জেগেছে নতুন আশা।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে দুই দেশের সংবাদ মাধ্যম বা ইন্টারনেট-এ প্রকাশিত সরকারী মতামত বা পণ্ডিত মহলে অনুষ্ঠিত আলোচনার থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের চাহিদা ও সচেতনতা। আমরা সংবাদ-প্রচারক বা বিশিষ্ট মত নির্মাণকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের ছাঁকনি-স্বরূপ কার্যকলাপ থেকে মুক্তি যদি চাই তাহলে সাধারণ মানুষের স্তরে লেনদেন এর বৃদ্ধি ঘটা দরকার। সে ক্ষেত্রে দিল্লী - লাহোর বাস চলাচল এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। শ্রীনগর মুজাফফরাবাদ বাস চলাচলের তাৎপর্য অনেক বেশি এবং সে ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তিও অপরিসীম - তা আমরা অতি সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির দরুণ বুঝতে পারছি। কিন্তু শান্তি স্থাপনের মাধ্যম রূপে এ ধরনের যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে বিদগ্ধ ও বিশেষজ্ঞ জনের মতামত পাওয়া গেল ইন্টারনেট-এ প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান পীস এণ্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিস সেন্টার আয়োজিত আলোচনা সভার বিবৃতি থেকে। ভারত - পাক মৈত্রী আলোচনা সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ ভাবে মনে হয়েছে যে এই মৈত্রী সম্পর্কের সেতুবন্ধন আজ সম্ভাবনাময় এবং মেলবন্ধনের গতি মোটামুটিভাবে স্থির। কাশ্মীর এখন আর ভারত - পাক সম্পর্ক আলোচনায় একমাত্র বিষয় নয়। দুই দেশের সরকার এখন নানা ধরণের যুগ্ম প্রকল্প ও সহযোগিতার কথা ভাবেছেন। এ ক্ষেত্রে সীমান্ত থেকে বাস চলাচল, সিন্ধু নদীর জল বন্টন বা সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের পরিবেশে উন্নয়ন সাধন, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ইত্যাদি এই মূহুর্তে দুই দেশের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ।[১৬] আলোচনার মধ্যে অনেকের বক্তব্যেই একটা কথা বার বার উঠে এসেছে - ব্যক্তি স্তরে সম্পর্ক স্থাপন এখন বোধ হয় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রিকেট, ছাত্র-শিক্ষক স্তরে যোগাযোগ, বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক, সাংবাদিক মহলে আলাপ-আলোচনা ও পর্যটন -- এক বিশেষ আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা দুই দেশের সরকারী ও আমলা স্তরে কূটনৈতিক বৈঠকে কখনোই ঘটে না। একই

অতীত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ দুই দেশের মেধ্য সহজতম সেতু তৈরী করে তাদের সংস্কৃতি। সেই সাধারণ মৌল সংস্কৃত নিত্য জীবনের অংশ যে 'কমনালিটি' বা সর্বজনীন সত্ত্বা আমাদের রাষ্ট্রীয় সত্ত্বার থেকে চেতনার অনেক গভীরে প্রোথিত তা অনুভব করি ইসলামাবাদের এক স্কুল শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে হরপ্পার ভগ্নস্তূপ দর্শন করে। আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে দুই আধুনিক রাষ্ট্রের সেই সাধারণ ঐতিহ্যটির চেতনা। মৌলবাদ - তা হিন্দুই হোক অথবা ইসলামীয় - যে আত্মসত্ত্বার সংকট থেকে তা জাত বলে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন - সেই মানসিক সংকট থেকে মুক্ত হয়ে তার বিনাশ করতে হবে। ইতিহাস তাই বর্তমান সমাজের এখন অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

### সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) লরেন্স জাইরিং - পাকিস্তান অ্যাট দ্য ক্রসকারেন্ট অফ হিস্ট্রী, লাহোর, ২০০৪, পৃ. ২৭৬-৭৭।
২) ঐ, পৃ. ১৭৭।
৩) স্টিফেন কোহেন, দ্য আইডিয়া অফ পাকিস্তান, নয়া দিল্লী, ২০০৫, পৃ. ৩০২-৩।
৪) ঐ, পৃ. ৩০৩।
৫) ঐ, পৃ. ৩০৩-৮।
৬) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, মাহমুদ মামদানি, গুড মুসলিম ব্যাড মুসলিম, ইসলাম, দ্যা ইউ এস এ, এ্যান্ড দ্য গ্লোবাল ওয়ার এ গেপ্স্ট টেরর, দিল্লী ২০০৫, বিশেষত পৃ. ২৫৬-৫৭।
৭) স্টিফেন কোহেন, উপরোক্ত গ্রন্থ, নিউ দিল্লী, ২০০৫, পৃ. ৩০৬।
৮) লরেন্স জাইরিং, উপরোক্ত গ্রন্থ, লাহোর, ২০০৪, ফৃ. ৩৫৯-২৬৫ তে আলোচিত।
৯) মেজর জেনারেল জামশেদ আয়জ খান, (রিটায়ার্ড) "ওপেন্‌স্ অফ মাস ডেস্ট্রাকশন ঃ পাকিস্তান্‌স্ পার্সপেক্টিভ", রিজিওনাল স্টাডিস, ভ্যলিউম, ২৩ সংখ্যা, ২, পৃ. ৩, ১২।
১০) গুরুচরণ দাস, দ্য এলিফ্যান্ট প্যারাডাইস ঃ ইন্ডিয়া রেসল্‌স্ উইথ চেঞ্জ, নিউ দিল্লী, ২০০২, পৃ. ২৬৮-২৭১।
১১) লরেন্স জাইরিং, উপরোক্ত গ্রন্থ, লাহোর, ২০০৪, পৃ. ৩৬৮-৬৯।
১২) ঐ, ৩৬৮।
১৩) মুহম্মদ রমজান আলি, " এনার্জী রিসোর্সেস এ্যান্ড রিজিওনাল ইকনমিক কোঅপারেশন" রিজিওনাল স্টাডিস, খণ্ড ২৩, সংখ্যা ২, পৃ. ১৪-৪৩।
১৪) ঐ, পৃ. ১৫।
১৫) ঐ, পৃ. ৩১।
১৬) ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ, আই পি সি এস, অর্গ/ইণ্ডিয়া পাক সেমিনার্‌স্ ২, জে এস পি ? এ্যাকশন = শো ভিউ এ্যান্ড কে ভ্যালু = ৪৭৪, ১৮ই মার্চ ও ২২ মার্চ প্রকাশিত।

# সারাংশ

## বঙ্গবন্ধুর বাক্শাল গঠন : বামপন্থী মহলে প্রতিক্রিয়া

অজিত কুমার দাস

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একক রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ সংক্ষেপে বাক্শাল গঠন করেন। স্বাধীনতার পর বিরোধী দলগুলো বিশেষ করে পিকিংপন্থী দলগুলোর অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে দেশ মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হলে বঙ্গবন্ধু বাধ্য হয়েই বাক্শাল গঠন করেন এবং সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর একদলীয় শাসন বাক্শালকে 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা' এবং 'শোষিতের গণতন্ত্র' বলে উল্লেখ করেন। মস্কোপন্থী বাম দলগুলো বঙ্গবন্ধুর এই বাক্শাল গঠনকে সমর্থন করলেও পিকিংপন্থী দলগুলো বাক্শালকে 'একদলীয় ফ্যাসিবাদী শাসন' বলে প্রত্যাখান করে এবং মুজিব সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে সশস্ত্র কার্যক্রম জোরদার করে।

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র

মাহবুবুল হক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের দখলদার সেনাবাহিনী 'অপারেশান সার্চ লাইট' নামক গণহত্যার নীল নকশা বাস্তবায়ন শুরু করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ হতবিহ্বল ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্ম ও কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ ও সংগ্রামী তরুণদের জনযুদ্ধে সাহস ও পথনির্দেশনা জোগায় এবং সংগঠিত শক্তি হিসেবে সংগ্রামী অবস্থান নিতে

অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বেতার কেন্দ্রটি বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হয় এবং জনচেতনা উদ্বোধক অনুষ্ঠানমালা প্রচারে সক্রিয় থাকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যেসব দলিলপত্র বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির কাছে সংরক্ষিত আছে সেগুলো প্রকাশিত ও আলোচিত হলে মুক্তিযুদ্ধে ঐ বেতার কেন্দ্রের প্রকৃত ভূমিকা স্পষ্টতর হবে। এই প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র সমূহের উপর আলোকপাত করাই বর্তমান গবেষণাকর্মের লক্ষ্য।

# জিহাদ : একটি পরীক্ষামূলক আলোচনা

শুকুর আলি মণ্ডল

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনে, ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের অবসানে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার নামে এবং 'বিশ্বায়ন' নামক অদ্ভুত অলীক এক তত্ত্বের আড়ালে আজ সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করার চক্রান্তে লিপ্ত, গণতন্ত্রের ঠিকাদার সমগ্র দুনিয়ার জনগণের স্ব-ঘোষিত পাহারাদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার ও তার দোসর রাষ্ট্রগুলি। তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নতুন নতুন কাল্পনিক শত্রুর অন্বেষণ, আর সেই শত্রু হিসাবে একদিকে যেমন চিহ্নিত করা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী দেশগুলিকে, অপরদিকে তেমনি তেল সম্পদে সমৃদ্ধ ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশগুলির সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার নামে, তেল সম্পদ কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে কাল্পনিক শত্রু হিসাবে 'ইসলাম'কে চিহ্নিত করা হচ্ছে কেবলমাত্র একটি মৌলবাদী (Fundamentalist) শক্তি হিসাবে যে শক্তি নাকি সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী জনগণের পক্ষে এক বিপজ্জনক ভয়াবহ শক্তি। যাইহোক, ইসলামিক ফাণ্ডামেন্টালিস্ট ইসলামিক টেররিস্ট (Islamic Fundamentalist, Islamic Terrorist) বা ইসলাম সম্পর্কে এই ধরণের শব্দগুলির বহুল প্রচার এবং প্রয়োগ মূলত বিগত শতাব্দীর আশির (৮০-এর) দশক থেকে প্রচারমাধ্যমের বদান্যতায় জনমানসে একটি বিশেষ স্থান করতে পেরেছে, বিশেষত বিশ্বের স্ব-ঘোষিত ঠিকাদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা এবং তাদের দোসর রাষ্ট্রগুলির এই ধরণের শব্দগুলি প্রচারের মুখ্যভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বদান্যতায়। এমনকি এই সকল প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় 'গোয়েবলসীয়' কায়দায় যে কোন মুসলিম ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং অনেক সময় কোন কোন রাষ্ট্রকেও ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিস্ট বা ইসলামিক টেররিস্ট দেশ বা রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যায়িত করার প্রবণতাও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং অদ্ভুতভাবে লক্ষণীয় যে এই সমস্ত পোষিত প্রচার মাধ্যমগুলি তাদের প্রভুদের অঙ্গুলি হেলনে ইসলামে বহু আলোচিত 'জিহাদ' (Jihad) বা 'জেহাদ' (Jehad) শব্দটিকেও ইসলামিক মৌলবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত করে দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই রকম এক পরিস্থিতিতে ইসলাম এক অত্যন্ত বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে পড়েছে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ইসলামের মূল তত্ত্ব উপলব্ধি না করে কেবলমাত্র আপসহীন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তা সে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত যে স্বার্থই হোক না কেন - যিনি বা যাঁরা ইসলামীয় মতাদর্শের আত্মিক বাণীকে বিকৃত করে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ইসলামের প্রধান শত্রু এবং সেই সঙ্গে যাঁরা কেবলমাত্র ইসলামের উপরিকাঠামোকেই সাধারণ মুসলিম জনগণের বা অ-মুসলিম জনগণের সামনে উপস্থাপিত করে সেটিকেই 'ইসলাম' বলে প্রচার করেন বা করে থাকেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা ইসলামিক মৌলবাদী হিসাবে চিহ্নিত এবং তাঁদের সমর্থনে যারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয় নিঃসন্দেহে তারা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত এবং ঘৃণিত। কাজেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি, সংগঠন বা কোন রাষ্ট্রকে নমুনা হিসাবে খাড়া করে পৃথিবীকে বিপদমুক্ত করার অছিলায় সমগ্র মুসলিম জনগণকেই ইসলামিক মৌলবাদী বা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী তক্‌মায় চিহ্নিত করা এক আমার্জনীয় অপরাধ। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই বিশেষত অ-মুসলিম জনগণ মনে করেন যে 'একত্ববাদী' (Monist) মুসলমানগণ ইসলামের অন্যতম মহান আদর্শ 'বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ' (Universal Brotherhood)-এর আদর্শের আহ্বানে যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র অন্ধ ধর্মীয় আবেগের বশে 'জিহাদ'-এর ছত্রছায়ায় সংগঠিত হয়ে থাকেন। ইসলামের বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত 'জিহাদ'-এর তত্ত্বটি সম্পর্কে সম্যক এবং স্বচ্ছ ধারণা না থাকার জন্যই এর অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয় বলেই মনে হয়। যাইহোক, সমগ্র মুসলিম জনগণকে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ শক্তির নিশানায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে যে সকল ধারণাগুলিকে অস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত এবং প্রয়োগ করা হয়ে থাকে 'জিহাদ' হলো একটি অন্যতম ধারণা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে পশ্চিমী দুনিয়ার অ-মুসলিম জনগণের মতো ভারতেরও অ-মুসলিম জনগণের সাথে সাথে মুসলিম জনগণেরও বিশাল এক অংশের 'জিহাদ'-এর তত্ত্ব বা গুরুত্ব সম্পর্কে কেবল কোন স্বচ্ছ ধারণাই যে নেই তাই নয়, বরং 'জিহাদ' বলতে তাঁরা যা বুঝে থাকেন বা তাঁদের যা বোঝানো হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠাতা মহান চিন্তাবিদ হজরত মহম্মদের চিন্তার বিরোধী, অ-ঐসলামিক এবং ইসলামের আকর গ্রন্থ কোরানের আত্মিক বাণীর বিপরীতমুখী একটি ধারণা। অলোচ্য পরিসরে 'জিহাদ'-এর আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না হলেও এ সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা দেওয়া সম্ভব।

ইসলামীয় মতাদর্শে 'জিহাদ' বা 'জেহাদ' শব্দটি দীর্ঘকালব্যাপী একটি মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার শিকার এবং তা হলো 'জিহাদ'-এর তথাকথিত ব্যাখ্যাকারীগণের

অধিকাংশের ব্যাখ্যায় 'জিহাদ' শব্দটি 'যুদ্ধ' (War) শব্দটির ধারনার সমার্থক বা পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত।[১] এমন কি বর্তমান সময়েও একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বৌদ্ধিক বিকাশের এক চরমতম পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য দুনিয়ার খ্যাতনামা গবেষক বুদ্ধিজীবিরাও বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করে সাধারণ কোনও আরবী শব্দকোষের কিম্বা ইসলামের আকর গ্রন্থ কোরাণের পাতা উল্টে দেখার সামান্য যন্ত্রণাটুকুও অনুভব করেন না বা করতে চান না যে 'জিহাদ' শব্দটি যথার্থভাবে কি অর্থ বহন করে এবং কোন প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত। যেমন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ইসলাম বিশেষজ্ঞ A. J. Wensinck তাঁর বিখ্যাত A Hanbook of early Muhammadan Tradition-গ্রন্থে 'জিহাদ' শব্দটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বা শব্দটির প্রয়োগ করেছেন যার থেকে মনে হয় 'যুদ্ধ' (War) এবং 'জিহাদ' যেন দুটি সমার্থক শব্দ। এমনকি The encyclopaedia of Islam-এ জিহাদ সম্পর্কে একটি রচনার (Article) আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে শুরুতেই যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো— সাধারণভাবে অস্ত্রের দ্বারা ইসলামের বিস্তার প্রত্যেকটি মুসলমানের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। (The spread of Islam by arms is a religious duty upon Muslim in general.) অর্থাৎ যেন জিহাদ-এর অর্থ কেবলমাত্র যুদ্ধ নয় বরং ইসলামের প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক যুদ্ধ। এছাড়াও বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক Ktein তাঁর The Religion of Islam গ্রন্থেও প্রায় একই রকমের বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর মতে, জিহাদ হলো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এই উদ্দেশ্যে যে হয় তাদের অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের বুঝিয়ে ইসলামের অধীনে আনা অথবা তারা যদি মুসলমান হতে কিম্বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের পরাভূত করা এবং উচ্ছেদ বা নির্মূল করা। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে, ইসলামের কারণে অন্য সকল ধর্মকে আবৃত করে, ইসলামের বিস্তার ঘটানো এবং প্রচার করা সমগ্র মুসলিম জাতির একটি পবিত্র কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত এই জিহাদ।[২] দুঃখের বিষয় উল্লেখিত বিশেষজ্ঞরা যদি বিন্দুমাত্র কষ্ট স্বীকার করে সাধারণ একটি আরবী শব্দ ভাণ্ডারের অভিধান খুলে দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁরা জিহাদ শব্দ সম্পর্কিত এই স্পষ্ট অসত্য প্রচার এবং প্রকাশে নিজেদের কখনই যুক্ত করতেন না। জিহাদ কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধশব্দের দ্যোতক নয়। তবে এ প্রসঙ্গে এটিও কম দুঃখজনক ঘটনা নয় যে এক শ্রেণীর মুসলমান ভাষ্যকারেরাও জিহাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যার অ-মুসলিম জনগণের মনে মারাত্মক এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকেন, বিশেষত এক শ্রেণীর মুসলিম জুরিষ্টদের এ বিষয়ে অনেকটাই অগ্রণী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।[৩]

ইসলামের প্রামাণ্য গ্রন্থ কোরাণের বিভিন্ন ছত্রে 'জিহাদ' বা 'জেহাদ' শব্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যা অ-মুসলিম বা ইসলামে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষাভিযান, যুদ্ধাভিযান, সংগঠিত যুদ্ধাভিযান, বৈরিতা অথবা লড়াই শব্দের সমার্থক তো নয়ই, এমনকি কোরাণের কোন সুরায় (Verse) কোনভাবেই কখনই 'যুদ্ধ' বৈরিতা বা বিদ্বেষ বা উপরিউল্লেখিত কোনো অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি বা কোন প্রয়োগও ঘটেনি; যদিও সাধারণভাবে মুসলিম এবং অ-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই উল্লেখিত অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যে আরবী শব্দগুলি যুদ্ধ, সংগঠিত যুদ্ধ, লড়াই অর্থে ব্যবহৃত হয় সে শব্দগুলি হলো 'হারব', 'কিতল', 'শিরাস', 'মারক' (Harab, Kital, Siras, Maaraka) ইত্যাদি।[৫] তাছাড়া একটি বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয় যে, যদি ইসলামীয় মতাদর্শের মূল মন্ত্র হতো এই শব্দগুলি, তাহলে এগুলি ইসলামের আকর গ্রন্থ কোরাণেও এর ব্যবহার বা প্রয়োগ প্রায়শই পরিলক্ষিত হতো, অথচ এই শব্দগুলির অনুপস্থিতিই সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়।

'জিহাদ' শব্দটি আরবী শব্দ 'Jahd' বা 'Juhd' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো, 'প্রয়াস' বা 'প্রয়োগ' বা 'প্রচেষ্টা' এবং 'জিহাদ' ও 'মুজাহিদা'-র অর্থ হলো শত্রুকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষমতার প্রয়োগ বা প্রচেষ্টা বা প্রয়াস। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় জিহাদ শব্দের অর্থ 'দৃঢ়তার সাথে প্রয়োগ বা প্রচেষ্টা করা'।[৫] আরবী ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে ইসলামীয় মতাদর্শে 'জিহাদ' শব্দটির ধ্রুপদী[৬] বা চিরায়ত (classical) এবং ধ্রুপদী উত্তর বা পারিভাষিক (Post-Classical বা Technical) অর্থে ব্যবহার বা প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদী অর্থে 'জিহাদ' বলতে বোঝায় ব্যক্তির (কোন কিছুর জন্য বা সঙ্গে বা বিরুদ্ধে) কঠোর পরিশ্রম বা মেহনত বা প্রচেষ্টা, নিজের অন্তঃস্থিত ক্ষমতা, উদ্যম, প্রচেষ্টা বা প্রয়াস ইত্যাদি দৃঢ়তার সাথে প্রয়োগ বা ব্যক্তির (কোন কিছুর জন্য, সঙ্গে বা বিরুদ্ধে) তীব্র কষ্ট সহ্য করা অর্থেও ব্যবহৃত। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই শব্দটি অবিশ্বাসী, অ-মুসলিম বা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। ধ্রুপদী-উত্তর' পর্বে পারিভাষিক অর্থে জিহাদ-এর ধারণার রূপান্তর ঘটে। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় জিহাদ শব্দটি ধ্রুপদী অর্থ হারিয়ে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ পর্ব থেকেই জিহাদ কেবলমাত্র যুদ্ধ শব্দের পরিপূরক হিসাবেই নয়, ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার ইঙ্গিতবাহী হিসাবেও প্রয়োগ শুরু হলো। বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ E.W. Lane, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Maddool Kamoos-এ পরিষ্কার দেখিয়ে

দিয়েছেন যে জিহাদ 'সংগঠিত যুদ্ধাভিযান নির্বাহ করা'— অর্থে প্রয়োগ একটি কোরাণ-উত্তর বা কোরাণ-পরবর্তী (post-koranic) প্রথা। মহম্মদ পরবর্তী সময়ে ধ্রুপদী-উত্তরকালে যখন আরবীয় ভাষা দ্রুততার সাথে অপভ্রষ্ট হতে শুরু করল, জিহাদ শব্দটিও সেই সময় থেকেই 'সংগঠিত যুদ্ধ বা লড়াই' অর্থের তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠল, যদিও তা ছিল সম্পূর্ণ সাময়িক অর্থে।[৮] সুতরাং কোরাণোত্তর বা ধ্রুপদী উত্তরকালে কিছু ইসলাম বিশেষজ্ঞদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে স্ব-ঘোষিত বিশেষজ্ঞদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদ শব্দটির অপভ্রষ্ট অর্থে গ্রহণের বা স্বীকৃতির বিষয়টি চূড়ান্ত বা সন্তোষজনক একটি ব্যাখ্যা হিসাবে কখনই গণ্য হতে পারে না বা গণ্য করা সমীচীনও নয়।

ইসলাম ভাষ্যকার বা টীকাকার, আইন শাস্ত্রে পারদর্শী এবং ইসলামীর শাস্ত্র সমূহের গূঢ় অর্থের সরল টীকাকার, সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে জিহাদ শব্দটির প্রাথমিক এবং মৌলিক তাৎপর্য হলো শব্দটির ধ্রুপদী অর্থের বিশ্লেষণ এবং তার প্রয়োগ। আর ক্রুসেড্ অর্থে জিহাদ-এর প্রয়োগ বা ব্যবহার হলো একটি প্রচলিত প্রথাসম্মত এবং প্রতীকী ধারণা। এ সম্পর্কে কয়েকজন মুসলিম চিন্তাবিদ এবং আইন বিশারদ (ফিকা) ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা ক্রুসেড্ অর্থে জিহাদ শব্দের প্রয়োগ, ব্যবহার বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কখনই করেননি। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন হিজিরার প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য আইন শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। যেমন দ্বিতীয় খলিফা ওমরের পুত্র ইবন (Ibn), সোফিয়ান শৌরী (Sofian Souri), ইবন শোবরমাহ (Ibn Shobormah), আটা (Ata), এবং অমর-বিন-দিনার (Amar-bin-Dinar)। ইসলামের প্রথম যুগের এই সকল বিদগ্ধ ব্যক্তিরা জিহাদ সম্পর্কে তাঁদের যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাহলো ধর্মীয় দিক থেকে যুদ্ধ অবশ্যপালনীয় কোন কর্তব্য ছিল না, এটি ছিল কেবলমাত্র একটি ঐচ্ছিক কর্ম এবং কেবমাত্র মুসলমানকে যে অক্রমণ করে যুদ্ধ তার সাথেই করা যায়।[৯]

জিহাদ সম্পর্কে চিন্তাবিদ হজরত মহম্মদের এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্তিটি হলো 'অত্যাচারী, স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের মুখের উপর সত্য ঘোষণা করাই জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।[১০] কেউ কেউ অবশ্য জিহাদের তিন রূপের কথা বলে থাকেন— (১) দৃশ্যমান শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, (২) শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই এবং (৩) অহম বা অহং (নফ্স)-এর বিরুদ্ধে অবিরত লড়াই চালিয়ে যাওয়া।[১১] আবার কারুর মতে আধ্যাত্মিক অর্থে প্রয়োগের ক্ষেত্রে জিহাদ হলো পাপ ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই এবং এটিই হলো জিহাদের মুখ্য বা উত্তমরূপ; আর বস্তুগত বা

জাগতিক অর্থে 'জিহাদ' হলো 'যুদ্ধ' যেটি জিহাদের একটি গৌণ বা ক্ষুদ্রতর রূপ।[১২] আবার ইরাকী ফিকা বিশেষজ্ঞ মাজিদ খাদ্দুরি (Majid Khadduri)[১৩] মনে করেন যে একজন ইসলামে বিশ্বাসী জিহাদের দায়বদ্ধতা চারিটি পৃথক পৃথক পদ্ধতির মাধ্যমে পালন করতে পারেন— হৃদয়, জিহ্বা, হাত এবং তরবারি অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, হৃদয় জয় করে ভাষার মাধ্যমে, ক্রিয়া-কর্মের সহযোগিতায় এবং সর্বশেষে বল প্রয়োগের মাধ্যমে জিহাদ-এর কর্তব্য সম্পাদন করা যায়। উমায়েদ, আবাসাইদ, কাতিমিদ অটোম্যান এইসব সাম্রাজ্যবাদী মুসলিম শাসক সম্প্রদায়গুলি যে যুদ্ধাভিযান শুরু করেছিল, তাকে কিছুতেই জিহাদ বলে অভিহিত করা যায় না, বরং সংগঠিত যুদ্ধ হিসাবেই চিহ্নিত করা সমীচীন।[১৪] ইসলামিক ফাণ্ডামেন্টালিস্ট বা টেররিস্টরা (Islamic Fundamentalists or Terrorists) ইসলামের নামে যে সকল অমানবিক পাশবিক কাজকর্ম করে থাকে তাকে কখনই 'জিহাদ'-এর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। জিহাদ-এর ধারণার চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বেইরুটের (Beirut) ইসলামীয় শাস্ত্রের সুপণ্ডিত ইউসুফ ইবিশ[১৪] (Yusuf Ibish)। তিনি বলেন, আমাদের অন্তঃস্থ পশু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই-ই হলো উত্তম জিহাদ বা জিহাদের মুখ্য রূপ। এ লড়াই বাইরের নয়, এ লড়াই অন্তরের, মানুষের অন্তঃস্থ পশুবৃত্তিকে জয় করে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা বা প্রয়াস। মানুষের এই পশুবৃত্তি যদি সীমা অতিক্রম করে তাহলে মানুষ ভয়ঙ্কর এক জন্তুতে পরিণত হয়ে ওঠে। আর তার এই জান্তব বৃত্তিগুলিকে প্রশমিত করাই বা নিয়ন্ত্রণে আনাই হলো জিহাদের মূল অর্থ।[১৫] ইরাণের চিন্তাশীল মৌলবী মোরতাজা মোতাহারি জিহাদ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'আমি মনে করি না যে কারো মনে এমন কোন সন্দেহ আছে বা থাকতে পারে যে জিহাদ এবং যুদ্ধের সেই রূপই পবিত্রতম যা মানবজাতি এবং তার অধিকারকে রক্ষা করে।[১৬] ইসলাম বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন (Edward William Lane) তাঁর লেখায় একস্থানে বলেছেন, 'কোরাণে এমন কোন অনুশাসন নেই পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিচার করলে যা অপ্ররোচিত যুদ্ধ সমর্থন করে'।[১৭]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, কোরাণের মর্মার্থ সাধারণভাবে সর্বত্রই লড়াই বা যুদ্ধাভিযানের বিরুদ্ধে। সর্বসাকুল্যে কোরাণের ছত্রিশটি সুরায়[১৮] জিহাদ শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং কোন সুরায় জিহাদ-এর সমার্থক যুদ্ধ বা লড়াই কথাটি ব্যবহৃত হয়নি। কোরাণে মূলতঃ একটি মাত্র ক্ষেত্রেই 'জিহাদ' শব্দটি যুদ্ধ বা লড়াই-এর সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রটি হলো কেবলমাত্র 'আত্মরক্ষার্থে'।[১৯] অর্থাৎ রক্ষণার্থক অস্ত্র হিসাবে জিহাদের ব্যবহার অবশ্যই সর্বত্র সমর্থনযোগ্য। তবে

জিহাদের এই ভূমিকাটি প্রকৃতিগতভবে সাময়িক এবং জিহাদের ধারণাটিকে কখনই কোরাণের একটি সদর্থক পদক্ষেপ হিসাবে তুলে ধরা সঙ্গত হবে না।

পরিশেষে বলতে হয় ইসলামিক মৌলবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর মুসলিম রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবিরাও কখনও কখনও যথেষ্ট সাহায্য এবং সহযোগিতাও করে থাকেন। মুসলিম সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়গুলি চিন্তা-ভাবনা না করে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার বিকাশ এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে বাধা-বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে তার মোকাবিলা করতে যত্নবান না হয়ে হতাশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই শূন্যস্থান পূরণ করতে যে সকল ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি এগিয়ে আসছে তারাই আজ ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। এরা মুখে ইসলামের কথা বলে অথচ সহনশীলতা এবং করুণা সম্পর্কিত ইসলামের অনুশাসনগুলি সম্পর্কে এঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। দুঃসাহসী সৃজনশীলতা এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ইসলামীয় মতাদর্শের আত্মিক শক্তি পুনরালোচনা এবং পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। তাহলেই বদ্ধ জলাভূমি থেকে ইসলাম তার পূর্ণগতিতে এগিয়ে যাবে।

## সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) a) The Religion of Islam-Maulana Muhammad Ali-Motilal Banarasidas publishers pvt. ltd., Delhi and the Ahmadiyya Anjuman Ishat 'at Islam, (Lahore) U.S.A. p. 405.

b) A Critical Exposition of the popular Jihad - Moului Cheragh Ali, Idarah-I, Adabyati-I, Delhi, Qasimjan St, Delhi (INDIA), 1884, p. 114-115.

c) Islam and Jihad - A.G. Noorani, Left word Books, 12 Rajendra Prosad Road, New Delhi-I, 2002, p. 35.

d) A History of Muslim Philosophy, Vol-I - M.M. Sharif - Low price publications, Ashok Bihar, phase-IV, Delhi-52, 1989, p. 360.

e) Sahih Muslim - Imam Muslim (Rendered into English by Abdul Hamid Siddiqi), Kitab Bhavan, New Delhi, 1977, p. 938 (Vol-III-IV).

২) (a) ibid : (1a), p. 405, 406, (b) ibid : (1b), p. 138-146, (c) ibid (1c) p. 938.

৩) (a) ibid (1a) p. 409, (b) ibid (1B) p. 129, (c) Islam and Jihad - A.G. Noorani, p. 40, 45.

৪) (a) ibid (1B) p. 163, (b) ibid (1C) p. 39.

৫) (a) ibid (1A) p. 405-406, (b) ibid (1B) p. 163-164, (c) Mohammedanism : A Historical Survey - H.A. R. Gibb (2nd Edn.) New York, OUP, 1962, p. 66-67. (d) The Holy Qur'an - A. Yusuf Ali, Amana camp, Brent Wood, Maryland 20722, U.S.A. 1983, p. 444, Note - 1270, (e) ibid (1E) p. 938.

৬) (a) ibid, (1B) p. 163.

৭) (a) ibid (1B) p. 164.

৮) (a) ibid, (1B) p. 164, 168, (b) History of the Arabs (Tenth Edition) philip R. Hitti, Macmillan Co. Ltd. St. Martin's Press, London We2, 1970, p. 137-138, 712, (c) ibid (1D) p. 1472, 1474, 1477, (d) ibid (1E) p. 1006.

৯) (a) ibid (1B) p. 134, (b) ibid, (1C) p. 46.

১০) (a) ibid (1C) p. 35, (b) ibid (1D) p. 658.

১১) (a) ibid (1A) p. 405.

১২) (a) ibid (1C) p. 35, (b) ibid (1D) p. 360.

১৩) (a) ibid (1C) p. 35.

১৪) (a) ibid (1C) p. 36.

১৫) (a) ibid (1C) p. 36, 37, (b) ibid (1D) p. 319.

১৬) (a) ibid (1C) p. 38.

১৭) (a) ibid (1B) p. 138, (b) ibid (1C) p. 46.

১৮) (a) ibid (1B) p. 166.

১৯) (a) ibid (1A) p. 411-412, (b) ibid (1B) p. 115.

# ভারত-আমেরিকা সম্পর্কে কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা ও উদ্দেশ্য — ১৯৪৭-১৯৬৬

মধুমিতা সাহা

আমেরিকার বিদেশনীতির সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্দ্ধমান সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন আমেরিকান কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান পৃথিবীর অধিকাংশ বাসিন্দাকে চিহ্নিত করেন 'অনুন্নত'[১] বলে। ট্রুম্যানের বক্তব্য ছিল প্রাচুর্য্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের মধ্যে যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। ট্রুম্যান উত্তর গোলার্দ্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধে প্রযুক্তি হস্তান্তরের পক্ষে উদাত্ত আহ্বান জানান।

১৯৪৯ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রসচিবের অনুরোধে বিখ্যাত ভূপদার্থবিদ লয়েড ভি. বার্কনার বিজ্ঞান ও বৈদেশিক সম্পর্কের ওপর এক পর্যালোচনায় লেখেন 'রাষ্ট্রদপ্তর একদিকে সামলাচ্ছে বৈদেশিক নীতি সমূহ যা অসীম প্রভাব ফেলছে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক নীতির ওপর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড প্রভাবিত করছে আমেরিকার বিদেশনীতিকে ......'[২] তিনি ৪টি প্রস্তাব রাখেন সরকারের কাছে[৩] —

(১) আমেরিকার বৈদেশিক সম্পর্কে বিজ্ঞানকে অনেক বেশী সদর্থক এবং সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

(২) এই ক্ষেত্রে সবথেকে উপকার পাওয়া যাবে রাষ্ট্রদপ্তর যদি বেসরকারি ভাবেও প্রযুক্তিগত সাহায্য প্রদান ও বৈজ্ঞানিকদের আদান প্রদান ত্বরান্বিত করতে পারে।

(৩) আমেরিকার উদ্দেশ্যসমূহ চরিতার্থ এবং বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নততর করতে রাষ্ট্রদপ্তর এবং আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে সম্পর্ক গাঢ়তর করতে হবে।

(৪) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অবস্থান নির্ধারণ করতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলির সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে।

এই প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ২টি পদক্ষেপ মার্কিন সরকার নিল— (১) রাষ্ট্রদপ্তরে একটি ছোট বিজ্ঞানের আপিস তৈরি হল, (২) কিছু বিশেষ আমেরিকান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের সহকারী হিসাবে বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত হলেন।

সেই বছরই ট্রুম্যান তার উদ্বোধনী ভাষণে আমেরিকার বিদেশনীতির ৪টি মূল সূত্র তুলে ধরেন[৪] — (১) রাষ্ট্রপুঞ্জকে সমর্থন প্রদান (২) ইউরোপকে পুনর্জীবিত করা, (৩) সামরিক আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রদান, (৪) একটি সাহসী নতুন কর্মসূচি তৈরী করা যার ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সুফল অনুন্নত ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন এবং বিকাশের কাজে লাগানো যায়। এই চতুর্থ প্রস্তাবটি 'পয়েন্ট ফোর' (PT 4) নামে বিখ্যাত।

এই PT4 কে ভিত্তি করে আমেরিকা আইন প্রণয়ন করে ২টি বিষয় নিরূপণ করার চেষ্টা করে[৪ক] — (১) অনুন্নত দেশগুলিতে আমেরিকান সাহায্যের উদ্দেশ্য এবং নীতি কি হবে? (২) বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শাসনব্যবস্থা, খনিজবিদ্যা এবং শিল্পোন্নয়নে সারা পৃথিবী ব্যাপী মার্কিন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো হবে। এই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ দলগুলিই পরবর্ত্তীকালে PT4 কর্মসূচির সব থেকে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, ফলে PT4 মানেই দাঁড়িয়ে যায় প্রায়োগিক সাহায্য।

PT4 -এর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় ৩টি বিষয়কোণ থেকে — (১) জাতীয় সুরক্ষা, (২) মানবিকতাবাদ, (৩) আমেরিকার পক্ষে লাভজনক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ। বৃহত্তর সাহায্যের অঙ্গীভূত প্রায়োগিক সাহায্যকে দেখা হতে লাগল শীতল যুদ্ধের এক হাতিয়ার হিসাবে যা কিনা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এবং মিত্র বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং বিপ্লবী/কমিউনিষ্ট ব্যবস্থাগুলিকে খর্ব করবে। মার্কিনিদের কাছে মানবিকতাবাদ আর 'উদার', 'গণতান্ত্রিক', রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমার্থক ছিল।

আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী ও সরকারী কর্মচারীরা তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক বিকাশকে ব্যাখ্যা করতেন প্রধানতঃ এক স্থায়ী, অনাদিম, সাংবিধানিক, শান্তিপূর্ণ এবং আমেরিকাপন্থী এক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে তাদের এই আকাঙ্খিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে একমাত্র অর্থনৈতিক প্রগতির হাত ধরে। মার্কিন সরকার বিশ্বাসী ছিল যে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে ভুবন ব্যাপী এক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে যা আসলে রুখে দেবে আরও এক বিশ্বযুদ্ধকে। তাই কেনেডির বর্ণনা মতো মার্কিনিরা আসলে 'The Watchman on the walls of World Freedom'।[৫] এই দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে হো চি মিন হয়ে যান হিটলার, ভিয়েতনাম হয় রাইনল্যান্ড এবং যে কোন আপোষ আলোচনা উস্‌কে দেয় মিউনিখের স্মৃতি। আমেরিকার কল্পিত ত্রাস ছিল বিপ্লবীদের যদি ভিয়েতনামে আটকানো না যায়, তাহলে তাদের মুখোমুখি হতে হবে একেবারে সান্‌ফান্সিসকোতে।

ট্রুম্যান প্রযুক্তিবিদদের স্পষ্ট করে বুঝে নিতে বলেছিলেন যে আমেরিকা যদি প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয় এবং সেই সূত্র ধরে বাদবাকি পৃথিবীর জীবনযাত্রার মান অন্ততঃ ২% বৃদ্ধি করতে পারেন তাহলে আমেরিকার ব্যবসা বাণিজ্য উদ্ভূত চাহিদাকে মিটিয়ে শেষ করতে পারবে না।[৬]

শেষপর্যন্ত আমেরিকান কংগ্রেস যে আইনপ্রণয়ন করল সেটা প্রায়োগিক সাহায্য কর্মসূচিকে বর্ণনা করল এইভাবে, 'অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পদ এবং উৎপাদন ক্ষমতার সুষম এবং সংহত বিকাশার্থে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং দক্ষতার আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান।'[৭] এক্ষেত্রে যেটা অনুচ্চারিত থাকল সেটা হল কিভাবে অর্থনৈতিক বিকাশ প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যকে সাহায্য করবে। এমনকি প্রায়োগিক সাহায্য এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে সঠিক কি সংযোগ আছে তাও বিবৃত করা হল না।

১৯৫০ পরবর্ত্তী সময়ে দঃ কোরিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলে, অর্থনৈতিক এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়োগিক সাহায্যও একটি একমুখী রূপ নিল যথা কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করতে ৩টি কর্মসূচিই একসাথে 'স্বাধীন' পৃথিবীকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে।

৬০ এর দশকের প্রথমে কেনেডির দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ পরিকল্পনার অংশীদার ছিল হার্ভার্ড এবং এম.আই.টির কিছু সমাজবিজ্ঞানী যাদের মতে যেকোন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সামগ্রিকভাবে সমস্ত সমাজের চিন্তাধারার এবং জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এই সামগ্রিক সংযুক্ত সাহায্য নির্মিত হয় ৩টি উপাদানের উপর ভিত্তি করে — প্রযুক্তি, পুঁজি এবং পণ্যদ্রব্য যার চরিত্র এবং পরিমাপ প্রত্যেকটি দেশের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ধরে নেওয়া হল এর ফলশ্রুতি হিসাবে যা পাওয়া যাবে তা হল রাজনৈতিকভাবে এক গুচ্ছ 'ভালো জিনিস'[৮] - বেশি গণতন্ত্র - কম কমিউনিজম,[৮ক] দেশগুলির অধিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। স্লেসিঙ্গার[৯] দেখান এই 'চার্লসরিভার' গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী আসলে প্রতিফলিত করে আমেরিকার প্রচেষ্টাকে যা কিনা প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে প্ররোচিত করে তাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে মার্ক্সের ওপর ভিত্তি না করে লকের ওপর করতে। এমন একটা পৃথিবী ডীন রাস্কের[১০] মতে আসলে আমেরিকার সুরক্ষার এবং শান্তির পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি।

উপরোক্ত আমেরিকান বিদেশনীতি ও প্রয়োগিক সাহায্যের উদ্দেশ্য সমূহ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে ১৯৫২ সালে ২০শে জুন ভারতের সাথে আমেরিকা সরকার

কেন প্রায়োগিক সহযোগিতা কর্মসূচি সই করল। সরকারিভাবে যদিও বলা হল যে কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য যথারীতি ভারতের সংহত অর্থনৈতিক বিকাশকে সাহায্য ও ত্বরান্বিত করা; আসল উদ্দেশ্যটা প্রকাশ পায় **চেস্টার বয়েলসের** লেখায়, 'আমার বদ্ধমূল ধারণা স্বাধীন পৃথিবীকৃত PT4 হচ্ছে বিশৃঙ্খলা এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সব থেকে সম্ভাবনাময় ও শক্তিশালী গঠনমূলক কর্মসূচি।'[১১] প্রায়োগিক সাহায্য পেতে গেলে যে যে 'যোগ্যতা' থাকতে হয় ভারতের সবই ছিল— বিশাল জনসংখ্যা, অসহনীয় দারিদ্র্য এবং কমিউনিজমের শঙ্কা।

প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অসাম্য ও শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক উপাদানে বিশিষ্ট ছিল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা। ফ্রসঙ্কেলের[১২] মতে ভারতে শস্য ফলন শুধু উন্নত দেশগুলির তুলনায় নয় এমনকি সমপর্যায়ে থাকা দেশগুলির থেকেও কম ছিল। একর পিছু ধান উৎপাদন চীনে ভারতের দ্বিগুণ ছিল।

**চেস্টার বয়েলসের** মতে একটি ভালো কর্মসূচি যদি মানবজাতির ২/৩ যারা দারিদ্রতায় বাস করছে তাদের স্বপ্নকে সাকার করতে পারে তাহলে কমিউনিস্ট চক্রান্ত বা সোজাসাপ্টা আক্রমণকে বহুলাংশে কমানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। যেমন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং বিকাশমুখী ভারতবর্ষের থাকবে লক্ষ লক্ষ অনুগত নাগরিক যারা কিনা দেশকে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবে। কিন্তু ১০ লক্ষাধিক মার্কিন সৈন্য বা শত পরমাণু বোমার সাহায্য সত্ত্বেও কিন্তু ক্ষুধার্ত এবং দুঃখী ভারতবর্ষকে রক্ষা করা খুবই শক্ত হবে।[১৩]

ল্যাডজেনস্কির[১৪] মতে কমিউনিস্টরা জানে যে এশিয়ার সমস্যা হচ্ছে মূলত জমির সমস্যা। কারণ এটি কৃষিপ্রধান মহাদেশ তাই খামারগুলো থেকেই খুঁজে বার করতে হবে এর সমাধান সূত্র। চীনের উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখান যে সেখানে কমিউনিস্টদের সাফল্যের পেছনে যতো না বাইরে থেকে প্রদত্ত বাহুবল কাজ করেছে তার থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল রুশ কমিউনিস্টদের পরিকল্পনা যে দারিদ্র্য পীড়িত ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে তাদের স্বপক্ষে টানা। এমনকি পল হফম্যান্ যিনি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রথম অধিকর্তা ছিলেন তিনি **চেস্টার বাওলস্‌কে** লিখে পাঠান যে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ যদি চীনে নেওয়া যেত যেমন ফরমোজায় নেওয়া হয়েছে তাহলে সেটা কমিউনিস্ট আবেদনের বিরুদ্ধে চীনে সম্পূর্ণ প্রতিষেধকের কাজ করত। ভারতের অবস্থা তাঁর মতে ১৯৪৬ এর চীনের মতন।[১৫]

তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে আমেরিকা আরোও বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। C.P.I.-এর শহরে অভ্যুত্থানের এবং

ধর্মঘটের পন্থা ছেড়ে অন্ধ্র কমিউনিস্টরা মাও সে তুঙ্ নির্দেশিত নয়া গণতন্ত্রের পথ ধরে কৃষি অভ্যুত্থানের দিকে ঝোঁকে এবং ১৯৫০ সালে তাদের এই লাইন 'কমিনফর্ম' দ্বারা সমর্থিতও হয়। ল্যাডজেনস্কির মতে এই অভ্যুত্থানের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল তারা এশিয়ায় কমিউনিস্টদের প্রদর্শিত নীতি 'জমি ও স্বাধীনতা'-র অনুগামী ছিল। এবং এই ধরনের কৃষক অভ্যুত্থান রোখার একমাত্র উপায় হল কৃষকরা আইন নিজে হাতে তুলে নিয়ে গ্রামে আগুন জ্বালানোর আগে শান্তিপূর্ণ ভাবে সময়োচিত সংস্কার করতে হবে।[১৬]

ল্যাডজেনস্কি ভারতীয় কৃষিকে নববিন্যস্ত করতে ৪টি পদক্ষেপের কথা লেখেন[১৭]—(১) উৎপাদন বাড়াতে কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন (২) জীবন ধারণের মান পর্যাপ্ত ভাবে বাড়াতে মাথা পিছু উৎপাদন বাড়ানো, বাজারের বিস্তৃতি, ঋণ দেওয়া এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা চালু করা, (৩) ভূমি ও জল সম্পদের সঠিক ব্যবহার, (৪) ভূস্বামী ও কৃষকের সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ল্যাডজেনস্কির বোঝার ক্ষমতা ছিল প্রযুক্তির উন্নতির সাথে (২) কৃষিজ আয় সুবণ্টন করতে হবে নইলে প্রায়োগিক কর্মসূচির সব পূর্বশর্ত বানচাল হয়ে যাবে।

১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করে। রাজ্যস্তরের নির্বাচনে তেলেঙ্গনাতে তারা বিস্ময়কর সাফল্য পায় (৯৮ খানা সীটে তারা ৪২ টায় প্রার্থী দেয় এবং ৩৬ টায় জেতে এবং তাদের সমর্থিত ১০ জন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীও জেতে। ১/৩ ভোট তারা পায়)।[১৮] তেলেগু ভাষাভাষি অঞ্চলে তারা ১৪০ আসনের মধ্যে ৭৫টিতে প্রার্থী দেয়, জেতে ৪১টায় এবং ২৫% ভোট পায়।[১৯] এই নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশে C.P.I. ২১.৮% ভোট পায় এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ২য় স্থান অধিগ্রহণ করে।[২০] কিষাণগড় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে PEPSU তে কমিউনিস্টরা যে সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল তার ফলে রাজ্যস্তরের নির্বাচনে তারা পেল ৮২% ভোট এবং ৩য় স্থান। ট্র্যাভাঙ্কোর কোচিনে তারা পেল ১৭.৫% ভোট এবং দ্বিতীয় স্থান, পশ্চিমবঙ্গেও তাই সঙ্গে ১০.৪% ভোট।[২১] পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে ৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫টি জিতল এবং ৯.৫% ভোট পেল। ত্রিপুরা ২টি আসনই জিতল সঙ্গে ৬১.১% ভোট।[২২]

৫২-র নির্বাচনের ফল মার্কিনিদের কাজে অশনি সঙ্কেত হিসাবে এল। জনকয়েলস্ লিখলেন, 'সমগ্র প্রাচ্যের চাবিকাঠি ভারতবর্ষ ....... চীনের মতন ভারতকেও যদি আমরা হারাই তাহলে আমরা নিশ্চিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে হারাব এবং এর অনুরণন পৌঁছবে আফ্রিকা পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতেও এটা বোঝা কঠিন যে জাপানকে কিভাবে

ধরে রাখা যাবে এবং অনতিবিলম্বে আমরা আমাদেরকে একটি দুর্গের মধ্যে কোণঠাসা অবস্থায় খুঁজে পাব।'[২৩]

ডগলাস এন্সমিঙ্গার[২৪] প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'উদিত চাহিদা যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন' আসছে— সাহায্য আন্দোলনের[২৪ক] শিকড় সেখানেই।[২৫] তার বাক্য বিনির্মাণ করলে যা পাওয়া যায় তাহল চাহিদাগুলো যা উল্টেপাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে (যে অন্য বৈপ্লবিক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে) তাকে সামগ্রিকভাবে, সুষ্ঠুভাবে (স্থিতাবস্থা না ভেঙ্গে) এবং কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত করে মেটানোই প্রায়োগিক সাহায্যের উদ্দেশ্য।

এন্সমিঙ্গার ভারতের উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থার ৪টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন— (১) শ্রেণী উন্মুক্ত সমাজ (Open class society) সেখানে নীচ থেকে উপরে ওঠা সহজ এবং প্রচলিত। (২) বহুত্ববাদী সমাজ যেখানে শতাধিক উদ্যোগ এবং সহস্রাধিক উদ্যোগপতি থাকবে। (৩) আদান প্রদানে সক্ষম এক সমাজ (Communicative society)। (৪) ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন সাধারণ মানুষের সমাজ (mass consumption society)। যদি ভারতবর্ষ এই ৪টি বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হতে পারে তাহলে নিশ্চিন্ত বলা যেতে পারে ভারত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সফল। এবং চতুর্থ বৈশিষ্ট্যে পৌঁছনোর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে দেশের খাদ্যের জোগান বাড়াতে হবে যা কিনা সম্ভব কৃষিতে আমেরিকা প্রদত্ত প্রায়োগিক সাহায্যের ব্যাপক ব্যবহারে।[২৬]

প্রায়োগিক সাহায্য চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা থেকে ভারতে যে সাহায্য এসেছিল তা কার্যকরী হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন খাদ্য ও কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ, শিল্প ও খনি, শিক্ষা ও গবেষণা ইত্যাদি। ১৯৫৪ সাল থেকে তহবিল ভাগ হয়ে আলাদা ভাবে প্রযুক্ত হতে লাগল ২টি ক্ষেত্রে (১) উন্নয়ন (২) প্রায়োগিক সাহায্য। শেষোক্তটির সিংহভাগ ($ 422,271,000) গেল বিদেশী মুদ্রায় কেনা মেশিন ও বিদেশী কুশলীদের মাইনে দিতে এবং বাকি $ 27,776,000 গেল ভারতীয়দের বিদেশে প্রশিক্ষণ দিতে।[২৭]

আমি যেহেতু কৃষির ওপর জোর দিচ্ছি আমি এক্ষেত্রটা বিশ্লেষণ করে দেখব। জুন ১৯৫৯ পর্যন্ত আমেরিকা দিয়েছে ২১৪.০০ কোটি টাকা তার সিংহভাগ ৪৭.২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নে।[২৮]

কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে জুন ১৯৫৯ পর্যন্ত পড়ছে ২৭টি প্রকল্প যার মধ্যে ৪টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ— (১) সার গ্রহণ এবং বিতরণ (২) লোহা ও স্টীলের কৃষি যন্ত্র গ্রহণ ও বিতরণ (৩) শস্যের রক্ষণ এবং পঙ্গপাল প্রতিরোধ (৪) মাটির উর্বরতা নিরূপণ এবং সারের ব্যবহার। প্রারম্ভিক বছরগুলিতে কৃষকদের কাছে

নির্দিষ্ট দামে সার বিক্রি করা হয়েছিল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য। পরবর্তীকালে সার বিনামূল্যে দেওয়া হত শুধু উন্নত ফসল প্রদর্শনীতে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন জমিতে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় কত সার লাগছে।[২৯]

২য় প্রকল্পেরও উদ্দেশ্য ছিল উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। নির্দেশ ছিল এই যন্ত্রগুলি তৈরি করতে হবে গ্রামের কামারদের সাহায্যে।[৩০] ৩য় প্রকল্পে পঙ্গপাল প্রতিরোধের সাথে সাথে সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছিল মড়ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।[৩১] ৪র্থ প্রকল্পটির বিস্তার ছিল আরো বেশি[৩২] (১) মৃত্তিকার পরিমাপ নিতে ৪০টি কেন্দ্র চালু হল বিভিন্ন আবহাওয়া মণ্ডলে এবং ২০টি বিভিন্ন মৃত্তিকা ক্ষেত্রে। (২) জমির মানচিত্র তৈরি করতে I.A.R.I. তে কার্টোগ্রাফিক গবেষণাগার খোলা হল। (৩) রেডিওট্রেসার ল্যাব এবং গ্রীন হাউস খোলা হল I.A.R.I. তে। (৪) সারের নমুনা সংগ্রহ ও কৃষিকর্মী এবং কৃষকদের সারের ব্যবহার নিয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য খোলা হল ২৪টি মৃত্তিকা পরীক্ষণাগার (৫) ৪০টি বিশেষ গবেষণাগার খোলা হল ধান ও গমের ওপর পরীক্ষার জন্য। (৬) বিভিন্ন কেন্দ্রে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ওপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হল। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ওপর যে বারংবার জোর দেওয়া হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে আরও বিপুলাকারে দেওয়া হবে তারই প্রতিফলন এই প্রকল্পগুলিতে।

কর্মসূচির ২য় ভাগ অনুযায়ী ১৯৬১-৬৫ সালের মধ্যে ২১৭ জন ভারতীয় ২১টি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে আমেরিকা গিয়েছিল।[৩৩] এদের মধ্যে ৫৮ জন কৃষির সঙ্গে যুক্ত। প্রশিক্ষণের চরিত্র ছিল মূলত পুঁথিগত। মূল্যবান বিদেশী পুঁজি ব্যবহার করে যারা গেছিলেন তারা উৎপাদন বাড়ানোর কাজে কতটা সাহায্য করতে পেরেছিলেন তার আন্দাজ পাওয়া যাবে এই তথ্যগুলি থেকে — ৪৮% যোগদানকারী প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাননি। নীরবতাও অনেক সময় বাঙ্ময়, যদি মনে রাখি এদের মধ্যে ৯০% ছিলেন ৩১-৪৪ বছরের মধ্যে। কেউ ছেলেমানুষ শিক্ষানবীশ নন।[৩৪] ৯% স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিৎ ছিল। কোর্সে ঢোকানো উচিৎ আধুনিকতম তথ্যসমূহ এবং বেশকিছু জন মনে করেছেন প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ ভারতের কি সমস্যা সেটা মাথায় রেখে।

আমেরিকা যেকোন ধরনের সাহায্য দিতে চাইলেই ভারতবর্ষকে তা গ্রহণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে বয়েলস্ তার বইতে বারংবার ভারতীয় নেতৃত্বের (পড়ুন নেহরুর) আত্মাভিমানের কথা বলেছেন।[৩৫] উল্লেখ করেছেন যে প্রায়োগিক সাহায্য দেওয়ার সাথে আমেরিকা সরকারের গোপন কোন

শর্ত নেই। তাই সবুজবিপ্লবের প্রযুক্তি ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পেছনে জনমনের কিছুটা ভূমিকা থাকলেও প্রায়োগিক সাহায্যের ক্ষেত্রে অন্তত তা হয়নি। গরজ ভারতীয় নেতৃত্বেরও ছিল। প্রায়োগিক চুক্তির বছরই ৩১শে ডিসেম্বর নেহরু বলেন,[৩৬] '....... কৃষি এবং শিল্পে অধিক উৎপাদন অত্যন্ত জরুরি যদি আমরা দারিদ্র্য দূর করতে এবং জীবন ধারণের মান উন্নত করতে চাই। ........ আমাদের লক্ষ্য একটি শ্রেণীহীন সমাজ ........ যেখানে সবার সুযোগ থাকবে। এটা সফল করতে আমাদের শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগোতে হবে ....... (এল্মহিঙ্গারের প্রতিধ্বনি!) ....... বিগত ১৫০ বছর ধরে বিজ্ঞানই সব থেকে বড় বৈপ্লবিক শক্তি যা মানুষের জীবন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পাল্টে দিয়েছে।' নেহরুর আরও একটা শঙ্কা ছিল, 'অতি উন্নত এবং অনুন্নত অঞ্চলে পৃথিবীর বিভাজন সংঘর্ষের বিপজ্জনক সম্ভাবনাকে বহন করে ....... বৃহৎ শক্তিগুলো আমাদের এই দৃষ্টিকোণ বুঝতে পেরেছে যে পৃথিবীর সামনে এখন প্রধান সমস্যা হল অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য ও অপুষ্টি।'[৩৭]

বয়েলস্ বুঝতেন এশিয়া মানে চীন নয়, ফোরমোজাও নয়, তার বাইরেও বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে এশিয়া রয়েছে, যার কেন্দ্রে অবস্থিত ভারত। এবং এশিয়ার আর কোনও দেশ নয়। ৭০০ কোটি এশিয়বাসী ভারতবর্ষকেই তাদের মুখপাত্র হিসাবে দেখে।[৩৮] আর নেহরু এই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। তাই নেহরুকে যদি মার্কিন কর্মসূচিতে আশ্বস্ত করানো যায়, এশিয়ার বিশ্বস্ততাও পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।

ফলে প্রায়োগিক সাহায্য এই প্রারম্ভিক বছরগুলিতে সীমিত থাকবে না। তার বিস্তৃতি আরও বাড়বে। ১৯৫৬-৫৮ কৃষি উৎপাদন প্রায় ২০% কমে যাওয়ায় ভারত বাধ্য হবে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা ব্যয়ে ৬০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য কিনতে।[৩৯] এই সময় খাদ্যমন্ত্রী এ.পি. জৈন চেতাবনী দেবেন যে জোর করে শস্যের দাম কমিয়ে তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার চেষ্টা করলে ফল হিতে বিপরীত হবে। যা দরকার তা হল এমন একটি কৃষি পরিকল্পনা যা বৈজ্ঞানিক অভ্যাসের ওপর জোর দেবে যেমন উন্নত বীজ, কীটনাশক, সার, সাংগঠনিক পরিবর্তনের ওপর নয়।[৪০] ফলে প্রায়োগিক সাহায্য Intensive Agricultural Development Project-এর হাত ধরে ১৯৬৬ সালের পর সবুজ বিপ্লবের বিজয়কেতন ওড়াবে, যখন পরিকাঠামোগত সংস্কারের বদলে হরোহরি বিজ্ঞান ও মার্কিন প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলার চেষ্টা হবে ভারতের খাদ্যশস্যে 'স্বনির্ভরতা'।

**সূত্র-নির্দেশ :**

১) অখিল গুপ্তের মতে (পোস্ট কলোনিয়াল ডেভেলপমেন্টস্ : অক্সফোর্ড ১৯৯৮) 'অনুন্নয়ন' সব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শুধুমাত্র একটা কাঠামোগত অবস্থান বোঝায় না। অনুন্নয়ন একধরনের পরিচয়ের সূচকও বটে, যা একটি দেশের বাসিন্দার আত্মপরিচয় নির্মাণার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অনুন্নতের পরিচয় মুছে ফেলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে পশ্চিমি উন্নয়নের মোড়ক। ডেভিড লুডেনের মতে (ইন্ডিয়া'স্ ডেভেলপমেন্ট রেজিম', 'কলোনিয়ালিসম্ এন্ড কালচার' (সম্পা) এল.বি. ডার্কস্, ১৯৯২, পৃ. ২৪৭-৮৭) 'অনুন্নয়ন' এবং 'উন্নয়নশীল' ইঙ্গিত করে এক ধরনের অপরিণত এবং অনালব্ধ সম্ভাবনা।

২) 'কার্নেগি রিপোর্ট অন ইউ.এস. ফরেন পলিসি গোলস্ সায়েন্স, টেকনোলজি, গভর্নমেন্ট, ১৯৯২।

৩) ঐ

৪) 'লিবারেল আমেরিকা এন্ড দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড'— রবার্ট প্যাকেনহ্যাম ব্রিন্সটন, ১৯৭৩।

৪ক) ডীন এ্যাকেসন, 'এ্যাক্ট ফর ইন্টারন্যাশানল্ ডেভেলপমেন্ট' কমিটি অন ফরেন রিলেশন, ১৯৫০।

৫) উদ্ধৃত ডেভিড এ. বল্ডউইন— 'ফরেন এড এন্ড আমেরিকান ফরেন পলিসি', নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৬।

৬) পাবলিক পেপারস্, হ্যারি এস. ট্রুম্যান, ১৯৪৯, পৃ. ৫৪৬-৪৭।

৭) সেকশন ৪১৮ (এ) অফ দ্য এ্যাক্ট।

৮) উদ্ধৃত (৪)-এ।

৮ক) লক্ষণীয় বিষয় হল কম কমিউনিজম মানেই বেশি গণতন্ত্র। কিন্তু এই সমীকরণটা কখনই ব্যাখ্যা করা হয়নি। তারা কখনোই মার্ক্সকৃত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমালোচনার উত্তর দেননি। তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে একজনের আমেরিকার পক্ষে থাকা মানেই গণতন্ত্রের পক্ষে থাকা।

৯) স্লেলেসিঙ্গার, 'আ থাউজেন্ড ডেজ্', পৃ. ৫৮৮-৮৯।

১০) ডীন রাস্ক, 'দ্য বেসেস্ অফ ইউ.এস. ফরেন পলিসি', পৃ. ১১০।

১১) চেস্টার বয়েলস্, 'এ্যামবাসাডরস্ রিপোর্ট', ১৯৬৪, পৃ. ২০৩।

১২) এফ. ফ্র্যাঙ্গেল, 'ইন্ডিয়াস্ পলিটিকাল ইকোনমি'।

১৩) ১১-ঐ পৃ. ২০৫।

১৪) উল্ফ ল্যাডজেনস্কি, 'টু লেট টু সেভ এশিয়া', জুলাই ১৯৫০।

১৫) উদ্ধৃত জর্জ রোসেন, 'ইস্টার্ন সোসাইটি এন্ড ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক্স'।

১৬) ঐ ১৪।

১৭) ঐ

১৮) ঐ ১১, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৯) ঐ

২০) + ২১) ডি. বাটলার, 'ইন্ডিয়া ডিসাইডস্', ১৯৮৬।

২২) সি. ব্যাকস্টার, 'ডিস্ট্রিক্ট ভোটিং ট্রেন্ডস্', ১৯৬৯।

২৩) উদ্ধৃত ১৫ তে।

২৪) ভারতে এসেছিলেন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি হিসাবে। আদতে ছিলেন ফরেন এগ্রিকালচারাল রিলেশন দপ্তরের এক্সটেনশন, এডুকেশন এবং ট্রেনিং ডিভিসনের অধিকর্তা।

২৪ক) একটি কর্মসূচিকে আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করা হলে সেটা কর্মসূচিকে কি ভাবে দেখা হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর আলোকপাত করে। এটা একেবারেই আমেরিকান উন্নাসিকতার ফসল। চেস্টার বয়েলস্ এ্যামবাসডরস্ রিপোর্টে লিখছেন, 'The tradition of spontaneous aid from man to man broadened from its original setting of the pioneer community, first is to America as a whole and finally into the world and after WWI through Hirbert Hoover's efforts is Belgium and France (and) after WWI (through) Marshall plan. পৃ. ২০৩।

২৫) ডি. এনসমিঙ্গার, 'ইন্ডিয়াস্ রুটস্ অফ ডেমোক্রেসি', ১৯৬৫।

২৬) ঐ

২৭) থেকে ৩২) রিপোর্ট অন দ্য ইন্ডো-ইউ.এস. টেকনিক্যাল কোঅপারেশন প্রোগ্রাম, ১৯৫৯। পর্যায়ক্রমে পৃ. ২, ৩, ১৮, ১৯, ২০, ২১।

৩৩) রিটার্নড ইউ.এস.এ.আই.ডি. পার্টিসিপেন্টস্ ঝাইমোর গভর্মেন্ট, ১৯৬৮।

৩৪) ঐ - ৬৫% দেশে প্রযুক্তিবিদ হিসাবে কাজ করেছেন, ২৯% -এর ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল সরকারি কাজের।

৩৫) ঐ ১১, পৃ. ১৩১।

৩৬) 'বিল্ডিং নিউ ইন্ডিয়া'— নেহরু যোজনা কমিশন, ১৯৫২।

৩৭) 'ফিলজফি অফ মিঃ নেহরু' আর.কে. কারাঞ্জিয়া, ১৯৬৬।

৩৮) ঐ ১১, পৃ. ৯।

৩৯) + ৪০) ঐ ১২, পৃ. ১৪২-১৪৭।

# কুমারখালির পুরাকীর্তি : প্রসঙ্গ মন্দির

মো. আতিয়ার রহমান

**ভূমিকা**

কুমারখালি কুষ্টিয়া জেলার একটি ঐতিহাসিক প্রশাসনিক ইউনিট[১] এবং বর্তমানে একটি থানা ও পৌর শহর। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুমারখালি অনেক আগে থেকে উন্নত। এক সময়ের হিন্দু অধ্যুষিত এই অঞ্চলে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। অধিকাংশ বাড়িতে ছিল পূজামণ্ডপ ও মন্দির। বছরের বিভিন্ন সময়ে এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বন ও উৎসবাদির দ্বারা কুমারখালির ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন মুখরিত থাকত; আজ আর তেমনটি নেই। গাতিদারি ও জমিদারির বিলুপ্তির সাথে সাথে ঐসব উৎসব অনুষ্ঠানাদিও ক্রমান্বয়ে লোপ পেয়েছে। ফলে অধিকাংশ মণ্ডপ-মন্দির পরিত্যাক্ত হয়ে ও অরক্ষিত থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু নিদর্শন জরাজীর্ণরূপে এখনও টিকে আছে। বিদ্যমান এই মন্দিরগুলো কুমারখালির পুরাকীর্তি ও ইতিহাসের জীবন্ত উৎসরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। কাজেই এদের বিবরণ গ্রন্থিত হওয়া আবশ্যক। এজন্য প্রবন্ধটিতে কুমারখালি থানার অন্তর্গত মন্দির স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর বিবরণ এবং তদসংশ্লিষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের বিষয়ও উপস্থিত করা হয়েছে।

ভূমি পরিকল্পনার ভিত্তিতে কুমারখালি থানাব মন্দির স্থাপত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায় : আয়তাকার মন্দির, বর্গাকার মন্দির এবং অষ্টভূজাকার মন্দির।

**১) আয়তাকার মন্দির :**

মন্দির স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শনের ক্ষেত্রে কুমারখালি খুব একটা সমৃদ্ধ নয়। সমগ্র কুমারখালি অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত উদাহরণগুলোর অধিকাংশই আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এই রীতির মন্দিরসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

**১.ক) চণ্ডিমণ্ডপ মন্দির : প্রাচীনতম উদাহরণ**

কুমারখালি প্রসিদ্ধ বাউল কাঙাল হরিনাথের বাড়িতে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরের চণ্ডিমণ্ডপ নাম থেকে বুঝা যায় এখানে দুর্গা-কালী প্রভৃতি দেব-

দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হত।[২] এর ছাদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে পড়ছে এবং দেওয়াল ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্দিরে একটি লিপিতে উৎকীর্ণ ১০১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক এই প্রাচীন নিদর্শনটি ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।[৩] এই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় চণ্ডীপমণ্ডপই কুমারখালি থানার প্রাচীনতম মন্দির নিদর্শন।

চণ্ডীমণ্ডপ মন্দিরে প্রতি বছর শরৎকালে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত। এছাড়া সারা বছর ধরে এখানে গোপাল পূজা চলত। এজন্য গোপালের বিগ্রহও মন্দিরে রাখা হয়েছিল। আঠার শতকের শেষ দিকে জমিদার পান্না লাল তার নতুন বাড়িতে একটি মন্দির নির্মাণ করায় চণ্ডীমণ্ডপের পূজা নতুন মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। ফলে চণ্ডীমণ্ডপ মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। (চিত্র ২) অতঃপর কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা (১৮৭৩) ছাপার জন্য ১২৯২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটি সংস্কার করে[৪] এখানে 'মথুরানাথ' বা 'এম.এন. প্রেস' স্থাপন করেন। প্রেসের পুরাতন মুদ্রণ যন্ত্রটি এখনও ভাঙা মন্দিরের মধ্যে পড়ে আছে (চিত্র নং ৩)। কাঙাল পরিবারের নিকটে সংরক্ষিত একখানি পত্র থেকে জানা যায় সংস্কারের সময়ে তিনি চণ্ডীমণ্ডপের ছাদ ও ছাদের কড়ি-বরগা নতুনভাবে স্থাপন করেন।[৫] তবে চণ্ডীমণ্ডপটি তিনি ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের আগে থেকে ব্যবহার করে আসছিলেন বলে জানা যায়।[৬] চণ্ডীমণ্ডপের দুর্গা পূজা বন্ধ হয়ে গেলেও কাঙাল হরিনাথের বাড়িতে এখনও কালীপূজা এবং সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

### ১.খ) গোপীনাথ মন্দির, খোরশেদপুর

শিলাইদহ ইউনিয়নের অন্তর্গত খোরশেদপুর একটি গ্রাম ও মৌজার নাম। এখানে একটি বাজারও আছে। কুমারখালির বিশিষ্ট দরবেশ খোরশেদ উল্-মুল্কের নামানুসারে খোরশেদপুর গ্রামের নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায়।[৭] বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য শিলাইদহ কুঠি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে খোরশেদপুর বাজার অসংলগ্ন গোপীনাথ দীঘির দক্ষিণ পাড়ে গোপীনাথের মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে গোপীনাথ বাড়ি নামে একটি কমপ্লেক্স গড়ে উঠে। দীঘিসহ দুইটি মঠ, একটি মন্দির, একটি দোলমঞ্চ এবং পুরোহিত ও সেবক নিবাস, রন্ধনশালা-অতিথিশালার জন্য বহু কক্ষ, বেষ্টনি প্রাচীর ও একটি সুরম্য তোরণ সমন্বয়ে কমপ্লেক্স নির্মিত। এর নির্মাতা ছিলেন ভূষণার প্রজাহিতৈষী রাজা সীতারাম রায়, নাটোর রাজগণ এবং শিলাইদহ জমিদারীর অধিকর্তা কবি-জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথ বাড়ি সংস্কারসহ এর সুউচ্চ ও মনোরম তোরণ স্থাপত্যটি

নির্মাণ করেন। সীতারাম মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করেন।[৮] এইভাবে গোপীনাথ বাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু জীর্ণদশাগ্রস্ত একটি মঠ ছাড়া তাঁর প্রায় সকল কীর্তি আজধ্বংসপ্রাপ্ত।

খোরশেদপুরের বিদ্যমান গোপীনাথের মন্দিরটি নাটোর রাজের কীর্তি। মন্দির সংযুক্ত একটি শিলালিপির বরাত দিয়ে 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস' প্রণেতা শ.ম. শওকত আলী উল্লেখিত ১৬৫৭ শকাব্দ মোতাবেক ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দ নাটোরের মহারাজা রামকান্ত রায় কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।[৯] গোপীনাথ বাড়ির প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচীন মঠের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গোপীনাথের মন্দিরটি সংস্কারকৃত হয়ে মূল কাঠামো নিয়ে আজও দণ্ডায়মান (চিত্র নং ৪)। মন্দির নির্মাণের পর এখানে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায় এর নাম হয় গোপীনাথের মন্দির। এখানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে গোপীনাথ পূজা অনুষ্ঠিত হত।

মন্দিরের আসন আয়তাকার এবং ভিত প্রায় ২ ফুট উচু। বাহিরে পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে ২৫ ফুট। মন্দিরের দুটি অংশ— গর্ভগৃহ ও বারান্দা (চিত্র নং ৫)। বারান্দার সামনে পাঁচটি প্রবেশপথ কৌণিক খিলানের সাহায্যে নির্মিত। খিলানের সম্মুখভাগ বহু খাঁজ বিশিষ্ট। প্রতিটি খিলানপথ আয়াকার ফ্রেমে আবদ্ধ। খিলানগুলো বিশালাকৃতি চতুষ্কোণ স্তম্ভশীর্ষ হতে উত্থিত (চিত্র নং ৪)। পার্শ্ববর্তী খিলানপথদুটির উভয় কোণে অলঙ্কৃত পোস্তা সংযোজিত আছে। স্তম্ভগুলো এক সময়ে ব্যাপক ট্যারাকোটা সজ্জায় অলঙ্কৃত থাকলেও একাধিক সংস্কারের ফলে তা সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গর্ভগৃহে বারান্দার খিলানপথ বরাবর ৫টি এবং পশ্চিম দেয়ালে ২টি কাঠের দরজা সংযোজিত আছে। পশ্চিম পার্শ্বের একটি দরজা বারান্দার ন্যায় বহু খাঁজ খিলান বিশিষ্ট এবং অন্যান্যগুলো খিলানের পরিবর্তে সর্দলের সাহায্যে নির্মিত। পশ্চিম পাশের সর্দলযুক্ত দরজাটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়াতে লোহার গ্রীল দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালগুলো প্রায় ২ ফুট পুরু। গর্ভগৃহের অভ্যান্তর দেওয়াল বড় বড় আয়তাকৃতির প্যানেলে বিভক্ত। মন্দিরের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেওয়ালের বর্হিগাত্রও অনুরূপ প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। সম্মুখ প্রাসাদে মন্দিরের প্যানেল সজ্জা এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্যানেলগুলো সমরূপ নয়। কার্ণিশের নিম্নের একসারি প্যানেল এবং খিলান পথের পার্শ্ববর্তী প্যানেল সারির প্যানেলগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির। অন্যান্য প্যানেলগুলো বৃহদাকৃতির। আদি অবস্থায় সম্মুখ ফ্যাস্যদের এই প্যানেলগুলো ট্যারোকোটা সজ্জায় অলঙ্কৃত ছিল। বর্তমানে সমগ্র মন্দিরটি পলেস্তারা আস্তরণে ঢাকা। মন্দিরের ছাদ সমতলভাবে নির্মিত; কিন্তু

অভ্যন্তরভাগে তা ভল্ট বা ছই আকৃতির। মেঝেটি শ্বেত পাথরে বাঁধানো। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ মূল মেঝেটি সংস্কার করে শ্বেত পাথরে মোড়ানো হয়েছিল বলে প্রধান প্রবেশ পথের একখণ্ড পাথরে উৎকীর্ণ লিপি থেকে অনুধাবন করা যায়। তখন ছিল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি কাল। ঢাকা নিবাসী শ্রী রোহিনী কুমার আচার্য সম্ভবত সংস্কারকৃত মন্দিরটি উদ্বোধন করেছিলেন। তাঁর নামটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে।[১০]

### ১.গ) মহাপ্রভুর আখড়া

কুমারখালির হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মস্থল মহাপ্রভুর আখড়া। এলঙ্গীপাড়ার নবগ্রহ মন্দির ও গড়াই নদী থেকে প্রায় ১০০ গজ দক্ষিণে এবং কুমারখালি গার্লস স্কুলের ১০০ গজ উত্তরে একটি পাকা সড়কের ধারে অবস্থিত আখড়াটি প্রাচীর বেষ্টিত। বেষ্টনির অভ্যন্তরে একটি বিগ্রহ মন্দির এবং একটি নাট মন্দির আছে (চিত্র নং ৬)। ইমারতদ্বয়ের স্থাপত্যের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

বিগ্রহ মন্দির : এটি মহাপ্রভুর মন্দির। এর আসন আয়তাকার এবং প্রায় সাড়ে ৩ ফুট উঁচু ভিতের উপরে নির্মিত। এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২১ ফুট। পোড়ান ইট, টালি, চুন-শুরকি, লোহা ও কাঠের কড়ি-বরগা এবং পলেস্তারা উপাদানে নির্মিত। দেওয়ালগুলো প্রায় ২ ফুট চওড়া। মন্দিরটি তিনটি আয়তাকার অংশে বিভক্ত (চিত্র নং ৭)। মধ্যবর্তী অংশ মন্দিরের গর্ভগৃহ বা বিগ্রহ কক্ষ। এখানে মহাপ্রভুর বিগ্রহের সাথে কাঠের তৈরী নিতাই-গৌড়ের মূর্তি আছে। বিগ্রহ কক্ষের সম্মুখ ভাগে (দক্ষিণ) তিনটি খিলানপথ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাশে একটি করে প্রবেশদ্বার আছে। এছাড়া পশ্চিম দেওয়ালে আর একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। দরজা বরাবর একটি সিঁড়িপথ দিয়ে মন্দিরে আরোহন করতে হয়। বিগ্রহ কক্ষের উত্তর পাশের আয়তাকার অংশটি তিন ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কুঠরিটি দেবতার শয়ন কক্ষ। বিগ্রহ কক্ষ থেকে দেবতার গমনাগমনের জন্য এর দক্ষিণ দেওয়ালে একটি দরজা আছে। আর মধ্যবর্তী অংশটি প্রবেশ কক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়। এর উত্তর দিকে একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ কক্ষে ঢুকতে হয়। এর পশ্চিম দিকেও একটি দরজা রয়েছে। এটি ভাঁড়ার ঘরে গমনাগমনের জন্য ব্যবহৃত হয়। গর্ভগৃহের দক্ষিণ বা সম্মুখের অংশটি মন্দিরের বারান্দা। ৪টি গোলাকার স্তম্ভ দ্বারা বারান্দাটি দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত। এর পশ্চিম দেওয়ালে একটি খিলানপথ আছে। মন্দিরের সমতল ছাদ টালি, চুন-শুরকি ও কড়ি-বরগা, দ্বারা নির্মিত। মন্দিরপাত্র পলেস্তারা আচ্ছাদনে ঢাকা।

নাট মন্দির : মহাপ্রভুর বিগ্রহ মন্দিরের সামনে তিন/চার ফুট দূরে রয়েছে মহাপ্রভুর নাট মন্দির। বর্গাকার নক্‌শার এই ইমারতের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৯ ফুট ৬ ইঞ্চি। এটি চতুর্দিকে অর্ধবৃত্তাকারে খিলান দ্বারা উন্মুক্ত একটি হল কক্ষ (চিত্র নং ৬)। ভূমি সমতলে নির্মিত মন্দিরের ছাদ চারদিকের বড় বড় আয়তাকার স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত ও বিগ্রহ মন্দিরের ন্যায় সমতলভাবে নির্মিত। নাট মন্দিরটি ১৩১০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বলে মন্দির স্তম্ভের একটি শুভ্র প্রস্তর ফলকের লিপিতে উল্লেখিত হয়েছে। শিলালিপিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, লোহারাম কুণ্ডুর পত্নী শ্রীমতী সহচরী দাসীর অর্থানুকূল্যে ও শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে মহাপ্রভুর নাট মন্দিরটি নির্মিত। তাছাড়া ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে নাট মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছিল। উক্ত লিপিতে উল্লেখ আছে সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর পত্নী পূণ্যশীলা শ্রীমতি যমুনা সুন্দরী দাসী এই সংস্কার করেছিলেন।[১১] মহাপ্রভুর আখড়ায় এখনও কুমারখালির হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে।

**১.ঘ) মদনমোহন মন্দির**

মদনমোহন বিগ্রহের নামানুসারে মন্দিরটি মদনমোহন নামে পরিচিত। কুণ্ডুপাড়াস্থিত মন্দিরটি কুমারখালি শহর রক্ষা বাঁধের সামান্য উত্তরে অবস্থিত। বারান্দা ও একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট বিগ্রহ বা মূল মন্দির, নাট মন্দির এবং মন্দির সংযুক্ত রন্ধনশালা ও একটি ইদারা নিয়ে গঠিত মদনমোহনকেও একটি মন্দির কমপ্লেক্স (চিত্র নং ৮) বলা যায়। প্রায় ৬ ফুট উঁচু ভিতের উপরে নির্মিত মূল মন্দিরটি এখনও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান ও সচল আছে। বর্গাকার আসন ও সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দিব কয়েকটি কক্ষ সমবায়ে গঠিত (চিত্র নং ৯)। পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য এর ৩৭ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ততা ২৯ ফুট। দেওয়ালগুলো ২ ফুট পুরু। মূল মন্দিরের চারটি কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো অসম আকৃতির। উত্তর দিকের মধ্যবর্তী আয়তাকার কক্ষটি বিগ্রহ কক্ষ, এখানে মদনমোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ দেওয়ালে একটি করে দরজা আছে। অন্যান্য কক্ষগুলো বর্গাকার এগুলোর একটি পশ্চিম পাশে এবং দুটি পূর্ব পাশে অবস্থিত। পশ্চিম পাশের কক্ষটির নাম জলকুঠি। এখানে দেবতার ভোগ ও পূজার্চনার যাবতীয় দ্রব্যাদি রাখা হত। কক্ষের পূর্ব এবং পশ্চিম দরজা যথাক্রমে বিগ্রহ কক্ষ ও রন্ধনশালার সাথে সংযুক্ত। পূর্ব পাশেরটি দেবতার বিশ্রামের জন্য তৈরি এবং শয়ন কক্ষ নামে পরিচিত। এটি পশ্চিম দেওয়ালে একটি দরজা দ্বারা বিগ্রহ কক্ষের সাথে যুক্ত। শয়ন কক্ষের দক্ষিণ দিকের অপর কক্ষটির নাম গয়না কক্ষ। এর পশ্চিম দেওয়ালে একটি দরজা আছে যা বিগ্রহ কক্ষের

সামনের বারান্দার সাথে সংযুক্ত। বারান্দাটি গয়না কক্ষ থেকে মন্দিরের পশ্চিম দেওয়াল পর্যন্ত প্রসারিত। বারান্দার উত্তর দিকে সংযোজিত একটি দরজা দিয়ে বিগ্রহ কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এটিই বিগ্রহ কক্ষের দক্ষিণ দরজা বা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। বারান্দার দক্ষিণে দেওয়ালের পূর্বাংশে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানপথ মন্দিরের সম্মুখে অপর বারান্দার সাথে সংযুক্ত আছে। খিলানগুলো বগাকার স্তম্ভশীর্ষ হতে উত্থিত। বিশাল আকৃতির এসব স্তম্ভের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশে একজোড়া করে গোলাকার সরু পোস্তা সংযোজিত আছে। পরবর্তী বারান্দাটি অপেক্ষকৃত সরু এবং মন্দিরের সম্মুখভাগ জুড়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এর দক্ষিণ দিক ৬টি গোলাকার স্তম্ভ দ্বারা সামনের দিকে উন্মুক্ত। স্তম্ভগুলোর উপরিভাগ সর্দল দ্বারা সুদৃঢ়কৃত। মন্দিরে আরোহনের জন্য শেষোক্ত বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি সিঁড়িপথ রয়েছে। মন্দিরের ছাত সমতল এবং লোহা ও কাঠের কড়ি-বরগা, চতুষ্কোণ পোড়ান টালি ও চুন-শুরকি দ্বারা নির্মিত। ছাদের উপরে ২/৩ ফুট উচু প্যারাপেট আছে। সমগ্র মন্দির পলেস্তারা আচ্ছাদনে ঢাকা।

**রন্ধনশালা** : এটি আয়তাকার এবং মন্দিরের পূর্ব দেওয়াল সংযুক্ত করে নির্মিত (চিত্র নং ৮)। এটি মন্দিরের উত্তর দেওয়াল থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় নাট মন্দির সমান দীর্ঘ। এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৭০ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯ ফুট। পূর্ব দেওয়ালে কয়েকটি করে কাঠের দরজা ও জানালা ছিল। অনেক আগেই এগুলো চুরি হয়ে গেছে। রন্ধনশালা থেকে পূর্ব দিকের আর একটি দরজা দিয়ে মন্দিরের জলকুঠিতে প্রবেশ করা যায়। জলকুঠির পশ্চিম দরজা হিসেবে এটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। মন্দিরের ন্যায় রন্ধনশালার উপরিভাগও একইভাবে সমতল ছাদে আবৃত। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি সিঁড়িপথ দিয়ে এর ছাদে আরোহন করা যায়।

**নাট মন্দির** : মন্দিরের সামনে ৩/৪ ফুট দূরে ভূমি সমতলে অবস্থিত নাট মন্দিরটি বর্তমানে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। বহুদিন অব্যহৃত ও অযত্নে থাকায় এর ছাদটি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। প্রায় বর্গাকৃতির এই ইমারত চারদিকে উন্মুক্ত একটি পিলার হলস্বরূপ (চিত্র নং ৮)। এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৩৩ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৭ ফুট। চতুর্দিকে বিন্যাসিত গোলাকার স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত ছাদ সমতলভাবে কড়ি-বরগার সাহায্যে নির্মিত। হলের মধ্যভাগে ছাদের ভার রক্ষার জন্য উত্তর-দক্ষিণে ২ সারি লোহার খুঁটি স্থাপিত হয়েছে। মেঝেটি কংক্রিটের (সিমেন্ট-বালুর) বড় বড় ফলক দ্বারা মণ্ডিত।

বিগ্রহ ও নাট মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী কন্‌ক্রিটে বাঁধানো ফাঁকা জায়গায় কয়েকটি এবং

নাটমন্দিরের উত্তর পাশের একটি উৎকীর্ণ লিপি থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ও প্রতিষ্ঠাতাদের নাম জানা যায়।[১২] লিপিতে ১২৮২ এবং ১৩৪১ বঙ্গাব্দের উল্লেখ থাকায় প্রথমটিকে বিগ্রহ মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার এবং দ্বিতীয়টিকে নাট মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই হিসেবে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কুমারখালি কর্মকার সম্প্রদায়ের শ্রী রণময়ী দাসীকর্তৃক মূল মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আশুতোষ কর্মকার, সুরেন্দ্রনাথ কর্মকার, রণচন্দ্র কর্মকার এবং পূর্ণচন্দ্র কর্মকার নাট মন্দির নির্মাণ করেন। নির্মাতাগণ তাঁদের পিতা ও মাতার নামে মন্দিরটি উৎসর্গ করেছিলেন বলে লিপিতে উল্লেখ আছে। আশুতোষের মাতা মুক্তাসুন্দরী, সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ এবং রণ... পূর্ণচন্দ্রের পিতা রণ কর্মকার ও মাতা মুক্তাময়ী দাসীকে উৎসর্গ করা হয়েছে।[১৩] নাট মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পাকা উদারা নির্মিত আছে।

মদনমোহন মন্দিরটি দুটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে কুমারখালির কর্মকার সম্প্রদায় কর্তৃক মন্দির নির্মাণ তাঁদের অর্থনৈতিক মৃদ্ধি ধারণা দেয়। অন্যদিকে মাতার নামে মন্দির উৎসর্গ থেকে তাঁদের নারীবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

### ১.ঙ) ভট্টাচার্য বাড়ির সিদ্ধাসন

কুণ্ডুপাড়ার ভট্টাচার্য বা...টি গড়াই নদীর একেবারে জলসীমায় অবস্থিত। প্রায় চারশ' বছর ধরে কুমারখ...তে ভট্টাচার্য পরিবারে বসবাস। সাধকশ্রেষ্ঠ জয়দেব ভট্টাচার্য ছিলেন পরিবারে... প্রতিষ্ঠাতা ও আদিপুরুষ। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে তিনি বর্তমান ফরিদপুর জেলার মাহিশালা থেকে কুমারখালিতে এসে বসতি স্থাপন করেন।[১৪] ভট্টাচার্য ছিলেন কালী উপাসক। এজন্য তিনি শ্মশান স্থলেই বাসস্থানের ১০১টি মরার মাথা দিয়ে তাঁর সাধনপিঠ তৈরী করেছিলেন। জয়দেবের মহাশয়ের সাধনপিঠে দুটি মন্দির ছিল। তবে এগুলো স্থায়ী উপকরণে নির্মিত আধুনিক স্থাপত্য ছিল না। মন্দির দুটি একাধিকবার পুনর্নির্মিত ও সংস্কারকৃত হয়ে এখনও টিকে আছে। এদের বিবরণ নিম্নরূপ।

### ১.ঙ-১) ভট্টাচার্য বাড়ির কালী মন্দির

জয়দেব মহাশয়ের সিদ্ধাসনের প্রাচীনতম মন্দিরটি ছিল কালী দেবীর। কখন যে মন্দিরটি স্থাপত্যরূপ পরিগ্রহ করেছিল তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে আয়তাকারে নির্মিত মন্দিরটি ছিল সুবৃহৎ এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এসময় কুণ্ডু পরিবার কর্তৃক উক্ত ধ্বংসস্তুপের পরেই বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়।[১৫] ইটের দেয়াল ঘেরা মন্দিরটি টিনের ছাউনি দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানে কষ্টি পাথরের তৈরী

কালী দেবীর যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল স্বাধীনতাত্তোর কালে সেটি চুরি হয়ে যায়। বর্তমানের কালী মূর্তিটি সিমেন্ট বালু দ্বারা নির্মিত। ভট্টাচার্যবাড়ির অপর মন্দিরটি বর্গাকৃতির মন্দিরে অন্তর্ভূক্ত করে উল্লেখ করা হল।

**২. বর্গাকৃতির মন্দির :**

কুমারখালিতে বর্গাকৃতির মন্দির নেই বললেই চলে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত একমাত্র বগাকার মন্দিরটি শহরের কুণ্ডুপাড়াস্থ জয়দেব ভট্টাচার্যের সিদ্ধাসনের শিব মন্দির।

**২. ক) ভট্টাচার্য বাড়ির শিব মন্দির**

কালী মন্দিরের দক্ষিণে ভট্টাচার্য পরিবারের দ্বিতল বসতবাড়ির পূর্বে দেওয়াল সংযুক্ত করে মন্দিরটি নির্মিত। শিব মন্দিরটি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়।[১৬] এর গঠন ও উপকরণ দেখে মনে হয় ব্রিটিশ যুগেই তৈরী। ক্ষুদ্রাকৃতির মন্দিরটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ০৮ ফুট। নিচের তলটি চারটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সাহায্যে তৈরী। এই অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানগুলো মুসলিম স্থাপত্য দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত। চারদিকে উন্মুক্ত খিলান বিশিষ্ট তলাটি বাড়ির প্রবেশকক্ষ হিসেবে নির্মিত। প্রবেশকক্ষের উপরের স্তরটি মন্দিরের বিগ্রহ কক্ষ (চিত্র নং১০)। কুঠুরির মধ্যভাগে একটি শিবলিঙ্গ আছে। কষ্টি পাথরের শিব লিঙ্গটি মেঝের মধ্যে মজবুতভাবে প্রোথিত। মন্দির কক্ষের দক্ষিণদিকে একটি দরজা রয়েছে। দরজার উপরে খিলানের পরিবর্তে হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণে সর্দল ব্যবহৃত হয়েছে। একটি দীর্ঘ সিঁড়িপথ ভূমি থেকে বিগ্রহ কক্ষের দরজা অবধি প্রসারিত। কক্ষের উপরিভাগের আগের ছাদ সমতল এবং কড়ি-বরগার সাহায্যে চতুষ্কোণ টালি ও চুন-শুরকি দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের দেওয়াল পলেস্তারা আচ্ছাদনে ঢাকা। শিব মন্দিরের সংস্কার কাজটিও কুণ্ডু পরিবার কর্তৃক সাধিত হয়।[১৭]

**৩. অষ্টভূজাকৃতির মন্দির :**

গোপীনাথের স্নান মন্দির কুমারখালি থানায় এই রীতির মন্দির স্থাপত্যের বিরল উদাহরণ। থানার একমাত্র নিদর্শনটি শিলাইদহ ইউনিয়নের খোরশেদপুরে অবস্থিত।

**৩.ক) গোপীনাথের স্নান মন্দির**

মন্দির কমপ্লেক্সের বাইরে প্রায় আড়াই শ' গজ পশ্চিমে গোপীনাথ ঠাকুরের স্নান মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। সম্প্রতি ছাদ ভেঙে পড়ায় মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এটি দই ঢালার মন্দির নামেও পরিচিত। গোপীনাথ পূজার সময় মূল মন্দির থেকে বিগ্রহটিকে এখানে স্থাপন করে দই দিয়ে স্নান করানো হত। এই

উপলক্ষ্যে গোপীনাথের স্নানযাত্রা উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে পালিত হত। পাকিস্তান আমলে উৎসবটি বন্ধ হবার পর থেকে পরিত্যক্ত এই বিরল স্থাপত্য নিদর্শনটি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এর ছাদের বিভিন্ন অংশ ধ্বংসে পড়েছে।

মন্দিরটি অষ্টকোণ ভূমি পরিকল্পনায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু একটি ভিতের উপরে নির্মিত। ভিত্তি বেদীর উপরি ভাগের পরিমাপ ২১১/২ X ২১১/২ ফুট। ভিতের প্রতি কোণে স্থাপিত গোলাকার স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত ছাদটি সমতলভাবে কড়ি-বরগার সাহায্যে নির্মিত (চিত্র নং ১১)। মন্দিরের স্তম্ভ মূল চতুষ্কোণ। দেওয়াল বিহিন এই ইমারতটিকে একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপত্য বলা যায়। এর পাকা মেঝের কেন্দ্রস্থলে আয়তাকার বিগ্রহ-বেদীটি এখনও অক্ষত আছে। এর উপরেই গোপীনাথের মূর্তি রেখে স্নান করানো হত। মন্দিরে আরোহনের জন্য পূর্ব দিকে দুটি সিঁড়িপথ রয়েছে। হাতীর মাথার নকশা বিশিষ্ট সিঁড়িটি কেবল গোপীনাথের বিগ্রহ উঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত হত। মন্দিরগাত্র পলেস্তারা ঢাকা। গঠন বৈশিষ্ট্যে গোপীনাথের স্নান মন্দিরটি নান্দনিক। সম্ভবত গোপীনাথ মদিরের বেশ কিছুকাল পরে এটি নির্মিত হয়েছিল।

উপসংহার : কুমারখালি থানার পুরাকীর্তির এই নিদর্শনগুলো বর্তমানে অবহেলিত এবং এদের কয়েকটি পরিত্যক্ত থাকায় দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ ধর্মীয়, স্থাপত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এদের বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কাজেই আলোচ্য প্রবন্ধ রচনা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গোপীনাথ মন্দির, মহাপ্রভুর আখড়া ও মদনমোহন মন্দির সংস্কার করলে এখনও কুমারখালির হিন্দু সম্প্রদায়ের জাঁকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্থানে পরিণত করা যায়।

## সূত্র-নির্দেশ :

১) প্রশাসনিক একক হিসেবে কুমারখালি বিভিন্ন সময়ে চারটি জেলার অন্তর্ভুক্ত থেকেছে। প্রথমে যশোর জেলাভুক্ত ছিল। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে পাবনাতে জেলা প্রতিষ্ঠা করে কুমারখালিকে পাবনার অধীনে আনা হয়। পাবনাধীন কুমারখালির ইতিহাস প্রায় তিন দশকের। এর সর্বাধিক প্রশাসনিক উন্নয়ন পাবনা জেলার অধীনেই হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কুমারখালিকে মহকুমায় রূপান্তরিত করা হয়। এটিই এর সর্বোচ্চ প্রশাসনিক মর্যাদা। এর উন্নয়নের অপর একটি বড় পদক্ষেপ ছিল ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পৌরসভার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অচিরেই প্রশাসনিক একক হিসেবে এর উন্নয়নকে খর্ব করা হয়। তখন ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ; কুমারখালিকে মহকুমা থেকে অব্যাহতি দিয়ে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার একটি থানা এককে

পরিণত করা হয়। ফলে কুমারখালির জেলা হওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে রহিত হয়ে যায়। বর্তমানে কুমারখালি কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত একটি থানা ও পৌর শহর। বর্তমানে এই পৌরসভাটিই কুমারখালির গর্ব। (দেখুন, ডাঃ আব্দুস সাত্তার খুশি, "কুমারখালির ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)", ১২৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা (১৮৬৯-১৯৯৪) : কুমারখালি পৌরসভা, সম্পা, নুরল ইসলাম আনছার, ১৯৯৪, পৃ. ২৯-৩১।

২) শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সং, ১৯৭১, পৃ. ২২০।

৩) চণ্ডীমণ্ডপের উৎকীর্ণ লিপি থেকে উল্লেখিত। মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'ক'।

৪) মন্দিরলিপি থেকে উদ্ধৃত। মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'ক'।

৫) ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ মেতাবেক ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বীরভূমবাসী ভোলানাথ মজুমদার নামক কাঙালের জনৈক আত্মীয় কর্তৃক তদীয় পৌত্র অতুল চন্দ্রকে লেখা পত্রের অনুলিপি থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২। পত্রটির একটি ফটোকপি প্রবন্ধকারের সংগ্রহে আছে।

৬) তদেব, পৃ. ১।

৭) শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা : কলকাতা, পৃ. ৩৬৯।

৮) তদেব, পৃ. ৩৭৩-৩৭৫।

৯) শ.ম. শওকত আলী, কুষ্টিয়ার ইতিহাস, মণিকা শওকত : কুষ্টিয়া, ১৯৭৪, পৃ. ১২৪। আরও দেখুন, পরিশিষ্ট 'গ'-১।

১০) লিপিটির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'খ'-২।

১১) মন্দির লিপি থেকে উল্লেখিত। মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'গ'।

১২) মন্দির লিপি থেকে উল্লেখিত। মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'ঘ'।

১৩) তদেব।

১৪) কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকীর, "মাতৃমহিমা", কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারক গ্রন্থ, সম্পা, আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৪৭।

১৫) মন্দির লিপি থেকে উল্লেখিত। মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'ঙ'।

১৬) মন্দির লিপি থেকে উল্লেখিত। মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'চ'।

১৭) মন্দির লিপি থেকে উল্লেখিত। মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট 'চ'।

## পরিশিষ্ট

**ক. চণ্ডীমণ্ডপ মন্দিরের দেওয়াললিপি**

"স্থাপিত ও ১০১১ সন

কাঙ্গাল কুঠির

*হরিনাথ কর্তৃক সংস্কার*

ও নামাঙ্কিত-১২৮০।

১৩৭১

**খ-১. গোপীনাথ মন্দিরের ইষ্টকলিপি**

** যে সাগর শায়ক ঋতু
শীতাংশু চাত : শকে গতেষু
শ্রীহরে গৃহং শয়ন প্রথং
কীর্তি : স্থিতৌ। ত্রিনেত্র পতি : রাম
কান্ত নৃপতি না নির্ম্মনে সংস্থপত্যগ্রণী
শ্রী * নাথ জগত্তাপতে : স্থপিত ভি:
** মাদায় নির্ম্মমে ** নাথ।

অর্থ সাগর-৭, শায়ক-৫, ঋতু-৩, শীতাংশু-১; অঙ্কের বামগতি অনুসারে ১৬৫৭ শকে অর্থাৎ ১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে রাণী ভবানী পতি রামকান্ত রায় কর্তৃক নির্মিত। উদ্ধৃত শ.ম. শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

**খ-২. গোপীনাথ মন্দিরের প্রবেশপথের মেঝের শিলালিপি**

"চির প্রণত
শ্রী রোহিণ কুমার আচার্য
পাইকাড়া (ঢাকা)
১৩১০"

**গ. মহাপ্রভুর নাট মন্দিরের শিলালিপি**

"শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর নাট মন্দির
১৩১০ সালে শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর
তত্ত্বাবধানে স্বর্গীয় লোহারাম কুণ্ডুর
পত্নী শ্রীমতী সহচারি দাসীর ব্যয়ে নির্ম্মিত
এবং
১৩৩৮ সালে শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর পত্নী
পূণ্যশীলা শ্রীমতী যমুনা সুন্দরী দাসী
কর্তৃক সংস্কারকৃত।

**ঘ. মদনমোহন মন্দিরের শিলালিপি**

"স্বর্গীয় পিতা দূর্গাচরণ কর্ম্মকার
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
শ্রী আশুতোষ কর্ম্মকার
মাতাঃ মুক্তাসুন্দরী দাসী
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
পিতা ঃ দুর্গাচরণ কর্ম্মকার

রণ ও পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার
পিতা ঃ রণ কর্ম্মকার ও মাতা ঃ মুক্তাময়ী দাসী
সন-১৩৪১ সাল।"

**ঙ. ভট্টাচার্য বাড়ির কালী মন্দিরের পূর্ব দেওয়ালে সংযুক্ত শিলালিপি**

"সিদ্ধ আসন মায়ের মন্দির ভগ্ন সংস্কার
স্বর্গীয় পির্তৃদেব ললিত মোহন কুণ্ডু
তস্য পত্নী কুমুদিনী কুণ্ডু
স্বর্গীয় স্বামী রাধারমন কুণ্ডু
তস্য পত্নী ধর্মশিলা ননীবালা কুণ্ডু
সাং কুমারখালি
সন ১৩৪৩ সাল।"

**চ. ভট্টাচার্য বাড়ির শিব মন্দিরের পূর্ব দেওয়ালে সংযুক্ত শিলালিপি**

"ভৈরব ভগ্ন মন্দির সংস্কার
সন ১৩৪৩ সাল
২৭শে আষাঢ়
কুমারখালি।
নদীয়া ননীবালা কুণ্ডু।"

## সারাংশ

# বাবু কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহন রায়ের ভূটান সফর — ঐতিহাসিক ভিত্তি

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

এই রচনায় রামমোহনের জীবনের সেই সময়ের কথা বলা হবে যখন রামমোহন রায় রাজা রামমোহন রায় হয়ে ওঠেন নি। বাবু কৃষ্ণকান্তের সঙ্গী রামমোহনের ভূটান সফরের কোন বিবরণ যেমন রামমোহন নিজের কোন রচনায় দেননি, তেমনি ভূটান সফরের পর বাবু কৃষ্ণকান্তের দীর্ঘ বিবরণিতে কোথাও রামমোহনের নামোল্লেখ নেই। অথচ ভূটানী সূত্র অনুযায়ী এটি কিন্তু ইতিহাসে প্রমাণিত ঘটনা।

রামমোহন রায় জন ডিগবীর ব্যক্তিগত দেওয়ান হিসাবে কাজ করছিলেন সম্ভবতঃ ১৮০৫-১৮১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত।

দীর্ঘ দশ বছর ব্যক্তিগত দেওয়ান থাকার সুবাদে রামমোহনের সাথে ডিগবীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রামমোহনের সাথে ডিগবির পরিচয় হয়েছিল কলকাতা যাওয়া আসার সময়। 'রামমোহনের এতবড়ো বন্ধু আর ছিল না'। ১৮০৯ খ্রীঃ ডিগবি রঙ্‌পুরের কালেক্টর হয়ে আসেন। ১৭৭৪ থেকে কোচবিহার ও ভূটানের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত যে বিরোধ ছিল তাতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সালিশীর ভূমিকায় পাওয়া গিয়েছিল। সীমানা সংক্রান্ত বিরোধে রঙ্‌পুরের কালেক্টরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ডিগবি কুচবিহার ভূটান সীমান্ত অঞ্চলে বিবাদীয় স্থানগুলি দু'পক্ষের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে সিলন্দী নদীকে উভয় রাজ্যের সীমানা বলে নির্দিষ্ট করলেন। এই বিভাজন ভূটানের দেবরাজা না মেনে গভর্নর ও রঙ্‌পুরের কালেক্টরের কাছে ক্রমাগত চিঠি লিখতে লাগলেন। এই চিঠিগুলিতে রামমোহনের ভূমিকা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ভূটানের দেবরাজার পক্ষে দুই প্রতিনিধি বাংলা ১২২২ সালের ৮ই আশ্বিন তারিখে রঙ্‌পুরের কালেক্টর স্কট সাহেবের কাছে যে তথ্য পেশ করে তাতে বলা হয় যে ডিগবির দেওয়ান রামমোহন রায় এবং মুনসি হেমায়েতুল্লাহর ব্যর্থতায় কোচবিহারের মহারাজা মিঃ ডিগবির কাছ থেকে একটি নির্দেশনামা পেয়েছেন যা তাকে (দেবরাজাকে) সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ডিগবির বিধান দেবরাজা মেনে নেননি।

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ শুরু হলে ভূটানের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ভূটানিরা

যাতে নেপালের পক্ষে না যায় সেইজন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রঙ্পুরের কালেক্টর ডেভিড স্কট তার কর্মচারি কৃষ্ণকান্ত বসুকে ভূটানে পাঠান। বেসরকারীভাবে রামমোহন তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। পত্রাদি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, রামমোহন এই দৌত্য কার্যের নেতা ছিলেন। কারণ ভূটান দরবারের মধ্যে রামমোহনের নামই প্রথম করা হয়। যিনি নেতা তাঁর নামই প্রথম করা স্বাভাবিক।

রামমোহন যে ভূটানে গিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে বর্তমানে সূত্রও আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। কোচবিহার ও ভূটানের সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধে ডিগবী ও রামমোহনের ভূল ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে মেরামত করে নেবার জন্য বেসরকারী প্রতিনিধি হিসাবে রামমোহনের ভূটান গমন খুব একটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বাবু কৃষ্ণকান্ত এই কারণে যে বিবরণী লিখেছিলেন তাতে রামমোহনের নামোল্লেখ করেন নি। তবে বিবরণীর শেষে ভূটান যাবার জন্য তারা যে পথ ব্যবহার করেছিলেন তার দীর্ঘ বিবরণ আছে। সেখানে বহুস্থানেই কৃষ্ণকান্ত 'We' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণকান্তের বর্ণনায় রামমোহনকে চেনার জন্য 'We' শব্দটি একমাত্র সূত্র।

## ইরাক যুদ্ধ ও এর ভিয়েতনাম পরিণতি

### মজির হোসেন চৌধুরী

আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে। ইরাকে মার্কিন সামরিক অভিযান নিয়ে আরব দুনিয়ায় প্রবল ক্ষোভ জমেছে। তাদের অনেকের মতে পরাজয়টা সাদ্দামের নয়, আরবদের হয়েছে। কিন্তু তা এলাকা বা ধর্ম বিবেচনায় ধরা হবে সংকীর্ণ অর্থে। আজ সময় এসেছে এলাকা, দেশ কিংবা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর বিপর্যয় বিশ্ব মানবতার দৃষ্টিতে দেখার। তাদের মতে মূল কারণ ছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ।

ইরাক আক্রমণের মার্কিনী কারণ সাদ্দাম হোসেনকে পদচ্যুত করে ইরাকীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দান, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুদ ভাণ্ডার বিনষ্ট করা এবং ১১/৯-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিনী নিরাপত্তার প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রকৃত কারণ হল মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার প্রধান মিথ, অপ্রতিরোধ্যতা। রয়েছে মার্কিনীদের নতুন গণতান্ত্রিক মধ্যপ্রাচ্য এবং ইসরায়েল পন্থী আরব রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা। ইরাকের ক্ষেত্রে আমেরিকা চায়নি একা আক্রমণকারী হতে। তাই আমেরিকা

মিত্রবাহিনী গঠনের অপচেষ্টা করে। সে চেষ্টায় সম্পূর্ণ সফল না হলেও ব্যর্থ হয়নি মার্কিনীরা। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে মিত্র হলো বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, স্পেন, ফিলিপাইন, ইতালী, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, ইউক্রেন সহ অনেক দেশ। সেই একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমেরিকা জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করে।। কারণ বিশ্বের দেশ সমূহের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ রক্ষার জন্য নাম ভূমিকায় আছে *জাতি সংঘ*। সাদ্দাম হোসেনের মজুদকৃত ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে পাওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় *জাতিসংঘের* উপর। *জাতিসংঘের* অস্ত্র পরিদর্শক দল তন্ন তন্ন করে ইরাকের সর্বত্র তথাকথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান করে। তারা ইরাকের কোথায়ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান পায়নি। আমেরিকার দাবী অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ ইরাক আক্রমণের অনুমতি দিয়ে প্রস্তাব পাশ করতে অস্বীকার করে। ইরাকে যুদ্ধে না যাওয়ার বিশ্ব জনমতকে এবং জাতি সংঘকে উপেক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের কথিত মিত্রদের নিয়ে এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে ২০শে মার্চ, ইরাক আক্রমণ শুরু করে।

মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই অসম যুদ্ধ শেষ হয়। ২০০৩ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে মার্কিন দখলদার বাহিনী বাগদাদ দখল করে এবং সাদ্দাম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এই যুদ্ধে নিহত হয় ১২ হাজার ইরাকী নাগরিক। অমানবিক এই যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা অনুভব করা যায় ১১ই এপ্রিল, ০৩ এবং সমকালীন বিশ্বের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত আলী ইসমাঈল আব্বাসের ছবি দেখে। মার্কিন মিসাইলের আঘাতের শিকার হয়ে ১২ বছরের কিশোর আলী ইসমাইল আব্বাস দুটি হাত হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে। পত্র পত্রিকায় আরও দেখেছে মানুষ, বাগদাদের রাস্তায় কুকুরে খায় মৃত মানুষের লাশ। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-এর দিকে তাকিয়ে মার্কিন বিমান হামলায় আহত ইরাকী কিশোরীর করুণ মুখচ্ছবি মানুষের চোখে অশ্রু ঝরায়।

বাগদাদ আক্রমণ এবং সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর শহর ভিত্তিক ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু করে দখলদার মার্কিন বাহিনী। কিরকুক, সামারাহ, ওমকাসর, সদর সিটি, নাজাফ, বসরা, মসুল, কারবালা, কুফা, ফানুজা, নাসিরিয়া, রামাদিসহ বিভিন্ন শহরে ধ্বংস যজ্ঞে মেতে উঠে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত যৌথ বাহিনী। এসব শহরে হাজার হাজার মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি হানাদার বাহিনী। শহরগুলোকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে।

অন্যায় ও অমানবিক যুদ্ধ, বর্বরতা ও ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে মার্কিন বিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় পৃথিবীব্যাপী। এ প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে মার্কিন পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নেতৃত্বে ৭০ দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

আগ্রাসন চালায় ভিয়েতনামে। পরাজয়ের মুখে ভিয়েতনাম থেকে প্রত্যাহার করা হয় মার্কিন সৈন্য। সেই ভিয়েতনাম যুদ্ধকে অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে ইরাকবাসী। তারা মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ইরাকের সর্বত্র। সাদ্দাম হোসেনের সহযোগী ও সৈন্যরা গেরিলা যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করে। ২০০৪ সালের ৪ই এপ্রিল তারিখ থেকে ঐক্যবদ্ধ ইরাকবাসী সশস্ত্র অবস্থায় আমেরিকা ও তার সহযোগী বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিপরীত পক্ষে মার্কিন বাহিনী ৭ই এপ্রিল, ২০০৪ থেকে ইরাকে ট্যাঙ্ক, কামান, মিসাইল নিয়ে পাল্টা আক্রমণ জোরদার করে।

ইরাকীদের বিদ্রোহ প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। আর তাই শিয়াসুন্নী নির্বিশেষে ইরাকবাসী জানবাজী রেখে ইরাকের স্বাধীনতা উদ্ধারের সংগ্রামে সামিল হয়েছে। এই প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে চালিত যুদ্ধাবস্থা থেকে বিরত রাখতে মার্কিনীরা এক নাট্যচক্রের আশ্রয় নেয়। মার্কিনীরা ইরাকের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

ইরাকবাসীর প্রতিরোধে মার্কিনীদের স্মরণ হয়েছে ভিয়েতনামের কথা। প্রতিদিনের এইসব আক্রমণ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ইরাকের ভিয়েতনাম হওয়ার সম্ভাবনায় মার্কিনীদের অনেকে আতঙ্কিত হয়।

ইরাকী গেরিলাদের অভাবনীয় প্রতিরোধের মুখে চরম মূল্য দিতে হয় মার্কিন গেরিলা ও তাদের দোসরদের। ইরাকী জনগণ ও গেরিলাদের তুলনায় ক্ষয়ক্ষতির এ সংখ্যা সামান্য হলেও মার্কিন সৈন্যবাহিনীর জন্য এটা বড় ধরনের বিপর্যয়।

আজ প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিনীদের ইরাক আক্রমণের যৌক্তিকতা নিয়ে। জাতিপুঞ্জে মহাসচিব কোফি আন্নান ইরাক আক্রমণ অবৈধ ছিল বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭শে জুন, ২০০৩, শুক্রবার, জর্জ ডব্লিউ বুশের ইরাক হামলা ও দখলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ আহ্বানের প্রতিফলন ঘটেছে দেশে দেশে। সর্বত্র মার্কিনীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমনকি বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে মার্কিন মিত্র বলে কথিত দেশগুলোতেও মার্কিন বিরোধী আন্দোলন প্রবল রূপ নিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক নম্বরের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট পহেলা নম্বরের সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। আজ এটা দিবালোকের মত সত্য যে, মার্কিন প্রশাসন ভিয়েতনামের মতো একটি নিষ্ক্রমণের পথবিহীন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।